অজেয় রায়

সরস গল্পসমগ্র

সংগ্রহ ও সম্পাদনা : অরিন্দম দীঘাল ও সমুদ্র বসু

কিশোর সাহিত্যে অজেয় রায়ের অবদান ছিল প্রতিটি ক্ষেত্রে। অ্যাডভেঞ্চার, রহস্য, ভৌতিক কাহিনিতে ওঁর যতটা দক্ষতা ছিল, হাসির রচনার ক্ষেত্রেও সেটা কোনও অংশে কম ছিল না। প্রতিটি জনপ্রিয় কিশোর পত্রিকায় নিয়মিত হাসির গল্প, উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি। অ্যাডভেঞ্চার, রহস্য ও অলৌকিক অমনিবাসের পর ওঁর সমস্ত রম্য কাহিনিগুলো এবার দুই মলাটে নিয়ে আসা হল।

ISBN : 978-93-89890-03-7

অরিন্দম দীঘাল— পেশায় গিটারিস্ট এবং গিটার শিক্ষক। নেশা-রহস্য ও গোয়েন্দা সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক ও সংগ্রাহক। ভীষণভাবে ফুটবল-পাগল মানুষ। ফুটবলের টানে ভারতবর্ষের সব জায়গায় ছুটে বেড়ান। সংকলক হিসেবে কাজ করছেন বেশ কিছু বাংলা বইয়ে।

সমুদ্র বসু—পেশা-বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় উচ্চপদে কর্মরত সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। নেশা—শিশু ও কিশোর সাহিত্যের গবেষণা ও আর্কাইভ তৈরি করা। শুকতারা, কিশোর ভারতী, চির সবুজ লেখা সহ প্রায় সমস্ত শিশু-কিশোর পত্রিকায় নিবন্ধকার হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন। বেশকিছু বইতে সম্পাদনার কাজেও নিযুক্ত আছেন সম্প্রতি।

অজেয় রায়

সরস গল্পসমগ্র

অজেয় রায়

সরস গল্পসমগ্র

সংগ্রহ ও সম্পাদনা

অরিন্দম দীঘাল ও সমুদ্র বসু

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

SARAS GALPO SAMAGRA
A Collection of Bengali Humours stories *by* Ajeo Roy
Compiled and Edited By Arindam Dighal and Samudra Basu
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : (033) 2241 2330/ (033) 2219 7920, (033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
www.deyspublishing.com
₹ 500.00

ISBN : 978-93-89890-03-7

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২০, মাঘ ১৪২৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : রঞ্জন দত্ত

৫০০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণগ্রন্থন : অনুপম ঘোষ, পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

শ্রদ্ধেয় শ্রীহিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত-কে

লেখকের অন্যান্য বই

রহস্য সমগ্র
অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র
অলৌকিক রোমাঞ্চ সমগ্র

ভূমিকা

দে'জ পাবলিশিং থেকে ইতিমধ্যেই অজেয় রায়ের 'রহস্য সমগ্র', 'অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র' আর 'অলৌকিক রোমাঞ্চ সমগ্র' প্রকাশিত হয়েছে যেখানে দু-মলাটে অজেয় রায়ের রহস্য, অ্যাডভেঞ্চার, ভৌতিক বা রোমাঞ্চকর কাহিনিগুলিকে একত্রে তুলে ধরার একটা প্রয়াস ছিল। তবে অজেয় রায় ছিলেন একজন যথার্থ ভার্সেটাইল লেখক যিনি অ্যাডভেঞ্চার বা রহস্য বা ভৌতিক লেখাতেই থেমে থাকেননি। এর বাইরেও লিখেছেন অসংখ্য হাসির গল্প বা উপন্যাস। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আসা যাক শিব-দেবু সিরিজের কথায়। দুই হরিহর আত্মা। শিবের ভালো নাম শিব দত্ত। বাবা মণিময় দত্ত। শিব ডানপিটে, মাথাগরম। সাধারণত বুদ্ধির চেয়ে হাতের প্রয়োগেই উৎসাহী বেশি। দেবুর ভাল নাম দেবু মজুমদার। বাবার নাম প্রফুল্ল মজুমদার। দেবু শান্ত, কিন্তু বুদ্ধির কৌশলে অনেককেই জব্দ করেছে। দুজনের বয়স ১৩-১৪। গ্রামের নাম কখনো ফুলডাঙা, কখনো বা চন্দনা। তারা দুজনে নানা রহস্যে জড়িয়ে পড়ে ও তার সমাধান করে। এই সিরিজের উপন্যাসগুলির মধ্যে কিশোর ভারতীতে প্রকাশিত 'গোয়েন্দা মানিকজোড়' (১৯৮৮) 'যাত্রা বিভ্রাট' (১৯৯১), 'দশকপূর্তি উপাখ্যান' (১৯৯২), 'উপকারের ফ্যাসাদ' (১৯৯৩) ইত্যাদি খুবই জনপ্রিয় ছিল। এবারে অজেয় রায়ের এই সংকলনে ওঁর লেখা সমস্ত হাসির উপন্যাস ও গল্পগুলি একত্রিত করে পাঠকের কাছে তুলে দিতে চেষ্টা করেছি। এর বেশিরভাগ গল্পই বর্তমানে অগ্রন্থিত যা পাওয়া গেছে অনেক পুরনো কিশোর ভারতী, সন্দেশ, শুকতারা, আনন্দমেলা বা কোনো লুপ্ত পত্রিকায়।

দে'জ পাবলিশিং ও অপু দে-কে সাধুবাদ জানাই এরকম এক অনবদ্য পরিকল্পনার জন্য যেখানে খণ্ডে খণ্ডে অজেয় রায়ের একটা 'থিম'-এর গল্প-উপন্যাসগুলিকে দুই মলাটে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। এই উদ্যোগ আগে কোনো প্রকাশক করেননি। এই সংকলনকে সম্পাদনা করা সম্ভব হয়েছে অপুদার প্রবল উৎসাহ ও অনবরত লেগে থাকার জন্য। এই সংকলনের প্রাথমিক গল্প বাছাই যাঁর সাহায্য ছাড়া সম্ভবপর ছিল না তিনি অর্ণব দাস, ওঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা জানাই। সবশেষে, এই সংকলন আপনাদের সবার ভালো লাগা বা না-লাগার বিচার আপনাদের হাতেই তুলে দেওয়া হল।

সমুদ্র বসু
অরিন্দম দীঘাল

সূচি

ছো টো গ ল্প

উপন্যাস

সাজ ধরার সাজা

এক

বটতলা বাস স্টপেজে দাঁড়ালে চোখ পড়ে, পিচঢালা রাস্তাটা উত্তর দক্ষিণ বরাবর চলে গেছে বহুদূরে। তারপর ঢাকা পড়ে গেছে গাছপালার আড়ালে।

বটতলা-স্টপেজের ঠিক গায়েই কোনো গ্রাম নেই। কাছে দূরের তিন-চারটি গ্রামের লোক এখানে আসে বাস ধরতে। একটি অতি প্রাচীন বটগাছের পাশে বাস থামে। স্টপেজের নাম তাই বটতলা-স্টপেজ।

ডালপালা মেলা ছাতার মতো গাছ। তপ্ত রোদের দিনে লোকে তার ছায়ায় বসে অপেক্ষা করে। এ সব মফস্বল লাইনে বাসের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। মর্জিমতো আসে যায়।

বসে থাকতে থাকতে যাত্রীদের খিদে পায়, তেষ্টা পায়। তারা কেউ কোঁচড় খুলে মুড়ি বের করে কিংবা বংশীর দোকান থেকে আসে মুড়ি, তেলেভাজা, গরম চা। বটতলায় বংশীর ঝুপড়ি চায়ের দোকান। দোকানে একটি বেঞ্চি আছে কাঠের। কিন্তু খদ্দের খোলা আকাশের তলে ঘাসে বা বটের শিকড়ের আসনে বসে চা খেতে ভালোবাসে।

মাঘ মাসের সকাল। বটতলায় মুখোমুখি বসেছিল নারাণ আর মদন। দু-জনের হাতেই চায়ের গেলাস।

নারাণ কদমপুরের লোক। মদনের বাড়ি নবগ্রাম। বয়সে দু-জনেই যুবক। বাসরাস্তার পুবে কদমপুর আর পশ্চিমে নবগ্রাম।

হাতে সময় আছে। বাস আসতে অন্তত আধঘণ্টা দেরি। একই দিকে যাবে দু-জনে। অবশ্য নামবে আলাদা আলাদা জায়গায়। প্রথমে খোসগল্পই হচ্ছিল। হঠাৎ কথাবার্তা বাঁকা পথে মোড় নিল।

নারাণ একজন বহুরূপী। আর মদন করে যাত্রা থিয়েটার। লম্বা-চওড়া কথা বলার অভ্যেস মদনের।

অভিনয় নিয়ে কথা হচ্ছিল। কে কেমন ছদ্মবেশ ধরতে ওস্তাদ। সাজ-পোশাক, হাব-ভাব পালটে কে কেমন লুকোতে পারে নিজেকে।

বড়বড় গুণীদের গুণকীর্তন করতে করতে একসময় মদন নিজের গুণ-গান শুরু করল :

যাত্রাথিয়েটারের মেকআপ আর অ্যাকটিং অনেক শক্ত জিনিস রে নারাণ। এ তোর কালি লেপে, নকল হাত, জিব লাগিয়ে মা-কালী সাজা নয় বা লেজ লাগিয়ে হনুমান সাজাও নয়। এ সব অ্যাকটিং হবে এক্কেবারে স্বাভাবিক। লোকে আসল না নকল ধরতে পারবে না।

একবার বুঝলি প্লে-র আগে পার্টটা পরখ করতে নিজে নিজে মেকআপ নিয়ে বাড়ির সামনে হাজির হলাম। সন্ন্যেসীর পার্ট। হেঁকে বললাম—জয় হোক। বউদি বেরিয়ে এল। চিনতে তো পারলই না উলটে গড় হয়ে এক প্রণাম। তখন লাফ দিয়ে পিছিয়ে গিয়ে আসল গলায় কথা বলতেই একেবারে হই হই কাণ্ড!

আর একবার বুঝলি, এমন ফিমেল সেজেছিলেম যাত্রায় যে নিজের বউ-ই চিনতে পারেনি। ঘরে এসে বলল, হ্যাঁ গা, তোমায় তো দেখলেম না পালায়। তবে যে শুনতাম রিহারসেল দিচ্ছ। বোঝ ব্যাপারখানা। কী পার্ট করেছিলাম বললেও কিছুতে বিশ্বাস করতেই চায় না।

মদনের জাঁক হজম হল না নারাণের। বহুরূপী সাজে বলে যাত্রা-থিয়েটারের লোকে তাকে একটু হীন চোখে দেখে, তা সে জানে। ম্যারাপ খাটিয়ে অভিনয় করে কিনা তাই ওদের গুমোর।

সে বলে বসল,—আমিও পারি।

—কী পারিস?

—এমন সাজব আর অ্যাকটিং করব যে লোকে চিনতেই পারবে না। একবার এমন দারোগা সেজেছিলাম যে একটা দাগা চোর আমার দেখে ছুটে পালিয়েছিল।

হুঁ!—নাক দিয়ে একটা অবজ্ঞাসূচক আওয়াজ ছাড়ল মদন : বেটা চোরের কি মুখ দেখার সাহস ছিল? পুলিশের ড্রেস দেখেই চম্পট দিয়েছে। আমি দেখলে একনজরেই চিনে ফেলতাম তোকে।

এমন তাচ্ছিল্যে চটে যায় নারাণ। বলে,—আমিও ফেলতাম।

—বটে! চিনে ফেলতিস?

—হুঁ-উ।

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল মদন,—তোর ক্ষমতায় কুলবে না রে নারাণ। বাড়ির লোকেই পারেনি।

হুঁ, পারবই।—দৃঢ় গলায় জানাল নারাণ।

বেশ। বাজি।—চোখ কুঁচকে কড়া দৃষ্টিতে তাকাল মদন।

অ্যা!—থতমত খেল নারাণ।

হ্যাঁ। সাহস থাকে ফেল বেট।

—কী বেট?

—একদিন আমি ছদ্মবেশ ধরব, তোকে চিনতে হবে। আর একদিন তুই মেকআপ নিবি আমি ধরব। দশ টাকা বাজি। যে হারবে দিতে হবে। আর দু-জনাই পারলে কাটাকাটি।

রোগো চেপে গেল নারাণের,—বেশ রাজি। কোথায় সাজব?

কপালে ভাঁজ ফেলে চায়ে চুমুক দিতে দিতে মিনিট খানেক ভাবল মদন। তারপর বলল, —হুঁ, হয়েছে! মেলায়।

—মেলা!

—ফকির-ডাঙার মেলা শুরু হচ্ছে আজ থেকে। সেখানেই পরীক্ষা হবে।

—মেলা সে তো খুব ভিড়!

মদনের ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফোটে। বলে,—ভিড়ের মাঝে থেকেই তো চিনে নিতে হবে। নইলে কি তোর বাড়ি বয়ে গিয়ে ডেকে বলব—মশাই চিনতে পারেন? আর গাঁয়ের ভিতর একজন অচেনা লোককে দেখে বলে দিবি—ওঃ বুঝেচি। তুই মদন। না চিনলেও স্রেফ আন্দাজেই মেরে দিবি। আমি কিন্তু তোকে এক নজর দেখেই বুঝে ফেলব। তা সে যে মেকআপই নিস না, আর যত ভিড়ের মাঝেই হোক না কেন। তা যাকগে, তোর যদি ভরসা না থাকে দরকার নেই হ্যাঙ্গামায়।

আঁতে ঘা লাগল নারাণের। বলল,—কে বলেছে আমি পিছোচ্ছি? বেশ রইল বাজি। কবে হবে?

—আগামী পরশু আমার দিন। আমি মেকআপ নিয়ে যাব মেলায়। তুই আমায় ধরবি। পর দিন তুই মেকআপ নিয়ে আসবি আমি ধরব। ঠিক আছে?

বেশ। কিন্তু দূরে দূরে থাকিস যদি? কাছে না এলে দেখব কী করে? মুখখানা তো দেখতে হবে তোর।

—নারাণের ভয়, চতুর মদনটা ধোঁকা দিয়ে না বাজি জেতে।

—না। দূরে দূরে থাকব কেন? একবার এসে তোর সঙ্গে কথাও বলে যাব। অন্তত দুটো কথা। ওরই ভিতর বুঝে ফেলতে হবে। শুধু বুঝলেই চলবে না, তখুনি ডেকে জানাতে হবে তুই বুঝেছিস। তোর বেলাতেও ওই শর্ত।

ঠিকঠাক মানবি তো নিয়ম। শেষে যদি ধাপ্পা দিয়ে বাজি হারাস? —সন্দেহ যায় না—নারাণের।

দেখ নারাণ!—ধমকে থামাল মদন : মদন ঘোষ কথার খেলাপ করে না। এই মায়ের নামে দিব্যি গালছি। হল তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়েছে হয়েছে।—লজ্জা পেল নারাণ।

শর্তটা নিয়ে আরও দু-চার কথা হল।

মদন বলল,—হুঁ, সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে অবধি। এর মধ্যে যা খোঁজাখুঁজি। ব্যস্।

দূরে বাস আসছে দেখা গেল। উঠে দাঁড়াল দুজনে। মদন মিচকে হেসে বলল,—কি থাকবে বাজি? ভেবে দেখ। আমি কিন্তু জোর কচ্ছি না।

হ্যাঁ বাজি রইল।—তেজের সঙ্গে বলল নারাণ?

বাস এসে থামল! বাসের দিকে এগোতে এগোতে নিচুস্বরে বলল মদন,—থাকগে, দিলি গচ্চা দশটা টাকা।

রাগে চিড়বিড় করে নারাণ। বাসে উঠে সে আর একটিও কথা বলল না মদনের সঙ্গে। শুধু তার গন্তব্যে পৌঁছে নামতে নামতে বলল মদনকে,—পরশু দিন দেখা হচ্ছে মেলায়, মনে রাখিস।

দুই

সকাল বেলা মুড়ি আর নারকেল নাড়ু দিয়ে পেটভরে জল খাবার খেয়ে মেলার উদ্দেশে পথে বেরল নারাণ।

দশটার মধ্যে পৌঁছতে হবে। প্রায় চার মাইল পথ। বাসে যাওয়ার উপায় নেই। হেঁটে যেতে হবে, ক্ষেতের আলে আলে আর মেঠো পথ ধরে।

হাতে একটু সময় নিয়েই বেরোল নারাণ। একটা মতলব আছে। নবগ্রাম থেকে ফকিরডাঙার মেলায় ঢোকার ঠিক মুখে সে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকবে। মদন ওই পথেই ঢুকবে মেলায়। যারা আসবে ওই পথে সবাইকে খুঁটিয়ে লক্ষ করবে। মদনকে চিনতে পারলে ক্যাঁক করে ধরবে চেপে বাছাধনকে, এক্কেবারে গোড়াতেই। একেবারে সিন ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ফাঁস করে দেবে ছদ্মবেশ। তার সঙ্গে কথা কইবার দরকারটুকুও হবে না। মেলার ভিড়ে খোঁজার ঝামেলাটা বাঁচবে। তক্ষুনি আদায় করে নেবে বাজির টাকাটা।

আর যদি চিনতে না পরে? তাতে কী? ও পথে যারা মেলায় ঢুকছে চিনে রাখবে তাদের। তাদের মধ্যে অচেনা কেউ মেলার ভিতরে গায়ে পড়ে কথা বললেই খুঁটিয়ে দেখবে তাকে।

মদনের চেহারাটা মনে মনে ভালো মতো ছকে নিতে চেষ্টা করে নারাণ—মুখ, নাক, চোখ—বিশেষ চিহ্ন কী কী আছে।

কিন্তু ক্রমেই যেন চেহারাটা ধোঁয়াটে হয়ে উঠে। বিশেষত্ব কিছুই মনে পড়ছে না কেন! সাধারণ লম্বা, মাঝারি গড়ন, নাক মাঝারি, চোখ না ছোট না বড়, রং ফর্সার দিকে—তবে মেকআপে কালো করা যায় অনায়াসে।

নাঃ মুশকিলে ফেলল! কোনো একটা বাইরের চিহ্ন দেখে চট করে ধরে ফেলার উপায় নেই লোকটাকে। গায়ের খোলা জায়গায় জরুলটরুল বা তিল আছে কি না খেয়াল করেনি আগে। ইস্! সেদিন চায়ের দোকানে বসে দেখে রাখতে হত নজর করে, বোকামি হয়ে গেছে।

মনে হয় গোঁফ, দাড়ি লাগাবে। রং বদলাবে এবং পরচুলা পরবে। চলনবলন তো পালটাবেই সাদা মুখে থাকলে তাকে ফাঁকি দেওয়ার সাধ্যি নেই। সন্দেহজনক কেউ তার সঙ্গে কথা বললেই দেখতে হবে ভালো করে। এবং মদন বলে দেবে ডাক—লাগে তুক, না লাগে তাক।

আরও এক ফ্যাসাদ। মেয়েছেলে সাজতে পারে মদনটা। আগে যাত্রায় ফিমেল পার্ট করত। অচেনা মেয়ে যদি কেউ আগ বাড়িয়ে কথা বলে অমনি দেখতে হবে খুঁটিয়ে।

এমনি ভাবতে ভাবতে চলছিল নারাণ। শুধু আজকের সমস্যা নয়—সমস্যা আছে আসছে কালও। কী ভেক ধরবে সে নিজে?

পথে যেতে যেতে চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে মাঝে মাঝে।

ডেকে বলল ভূষণ,— নারাণ, মেলায় নাকি? আমিও যাচ্ছি। এবার নাকি একটা সার্কাস এসেছে। বেশ ভালো পার্টি।

নারাণ কায়দা করে ভূষণকে এড়িয়ে গেল। সে একা একা হাঁটে। নিজের মনে মাথাটা একটু খেলানো দরকার। তাছাড়া এক্ষুনি সে মেলায় ঢুকছে না। ফকিরডাঙার খুব কাছে ধর্মঠাকুরের

স্থান। ওর পাশ দিয়ে নবগ্রামের লোক আসবে মেলায়। অবশ্য অন্য গাঁয়ের লোকও আসে ওই পথে। একটা গাছের আড়ালে বসে সে লক্ষ রাখবে মেলায় আগন্তুকদের ওপর। যদি ওখানে পাকড়াও না করতে পারে মদনকে, ঠিক দশটায় ঢুকবে মেলায়।

নিজের রাস্তা ছেড়ে একটু ঘুরে ধর্মঠাকুরের থানে পৌঁছল নারাণ। ধর্মঠাকুরের নামে কটা পয়সা ফেলে দিয়ে প্রণাম করল। তারপর বসল একটা মোটা তেঁতুল গাছের গুঁড়ির পিছনে গা ঢাকা দিয়ে।

রাস্তা দিয়ে স্রোতের মতো লোক চলেছে মেলায়। বহুকণ্ঠের কলরব মিশে একটা গমগমে আওয়াজ আসছে কানে। গরুর গাড়ির চাকায় ওঠা ধুলোর মেঘ জমেছে আকাশে। এখনও আধ ঘণ্টা বাকি দশটা বাজতে।

গরুর গাড়ি চেপে হাজির হবে নাকি মদন? তবে তো বৃথা প্রতীক্ষা। দেখা যাক।

শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। বৃষ্টি হয়ে গেছে দিন দুই আগে। আজ রোদ পেয়ে ভিজে মাটি থেকে ঠান্ডা উঠছে। মেলার যাত্রীরা বেশিরভাগই চাদর মুড়ি দিয়ে চলেছে। ফাঁকা মাঠে কনকনে হু হু হাওয়ায় মুখের একটু শুধু বের করে রেখেছে। অবশ্য মেলায় লোকের ভিড়ে গায়ের তাতে শীত কম লাগবে। একটা বিড়ি ধরিয়ে পথের ওপর চোখ রেখে বসে রইল নারাণ।

এক বুড়ি আসছে, লাঠিতে ভর দিয়ে ঠুকঠুক করে। থুত্থুরে বুড়ি। পরনে ময়লা কাপড়। তার ওপর একটা চাদর জড়ানো। মাঝে মাঝে থামছে। চাইছে এদিক সেদিক। ধনুকের মতো বেঁকে হাঁটছে।— হতে পারে মদন। ঠিক দশটায় ঢুকছে। নির্ঘাৎ ও।

বিড়িটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠল নারাণ। ছুটে গিয়ে আগলে দাঁড়াল বুড়ির পথ।

বুড়ি থমকে দাঁড়াল। মুখের আধখানা ঢাকা ঘোমটার ফাঁকে পিটপিট করে দেখল নারাণকে। খনখনে গলায় শুধাল,—কে বটে?

—কেন, আমি নারাণ। চিনতে পারছ না? আমি তো বাপু ভেক পালটাইনি। উঃ জব্বর মেক-আপ চড়িয়েছিস বটে। নে এবার খাড়া হয়ে দাঁড়া। মাজায় ব্যথা হয়ে গেছে তো।

বুড়ি একটুও দমল না। বলল,—হাঁ বাবা, ফকিরডাঙার মেলা তো ওই সুমুখে?

হুঁ।—হাসি মুখে জানাল নারাণ : আর এখন মেলার গিয়ে কাজ কী? টাকাটা ছাড়। তারপর ড্রেস পালটে সুস্থির হয়ে মেলা দেখতে এস'খন।

বুড়ি নারাণের দিকে বাঁ কান এগিয়ে দিয়ে বলল,—কী বললে, গো, অনেক পথ?

কী ঘোড়েল! কালার ভান করছে। এখনও ভাবছে ফাঁকি দেবে।

নারাণ চেঁচিয়ে বলল,—না, ওই তো মেলা। এবার টাকাটা ছাড় দিকি মদনা। ঢের হয়েছে।

হঠাৎ বুড়ি এক পা এগিয়ে খপ্ করে নারাণের ডান হাতখানা চেপে ধরল। কাঁদ কাঁদ গলায় বলল,—হেইবাবা, আমায় গুরুপদর দোকানে এট্টু পৌঁছে দাও। চোখে দেকি না ভালো, নিজে নিজে খুঁজে পাব না।

বুড়ি গায়ে হাত দিতেই নারাণ চমকে উঠল। এ তো জোয়ান পুরুষের স্পর্শ নয়। দুর্বল অশক্ত হাতের ছোঁয়া। বুড়ির দিকে ভালো করে দেখল সে—তার মুখে, হাতের চামড়ায় অজস্র ভাঁজ। ছানি পড়া ঘোলাটে চোখ।

নাঃ এ মদন নয়। কালের অমোঘ বিধান ছাড়া কারো সাধ্য নেই মানুষের দেহে এমন ছাপ ফেলে।

কে গুরুপদ?—বিব্রতভাবে জিজ্ঞেস করল নারাণ।

—আমার নাত-জামাই গো। নাতনিটারে কতদিন দেখি নাই। জামাইকে বলে আসব নাতনি মেলায় এলে যেন একটিবার নিয়ে যায় আমার কাছে। বুড়ো মানুষ একা থাকি, কেইবা নিয়ে যাবে আমায় নাতনির শ্বশুরবাড়ি।

গুরুপদর কীসের দোকান? চেঁচিয়ে জানতে চাইল নারাণ।

—শুনেছি খেলনার দোকান দেছে। গাঁয়ের লোক বলল।

ভ্যালা বিপদে পড়া গেল। নারাণ ভেবে পায় না কী করবে? বুড়ির মুখে অসহায় মিনতি। না বলতেও কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কে গুরুপদ? কোথায় তার দোকান? বুড়ির সঙ্গে খুঁজে মরতে হবে নাকি এই ভিড়ে? শেষ চেষ্টা করল সে—আমি তো চিনি না গুরুপদকে।

আমি ঠিক চিনব বাবা,—বুড়ি বলল।

অনাথা বুড়ির পাশে পাশে খুটখুট করে মেলার দিকে হাঁটতে থাকে নারাণ। যারা পেরিয়ে যাচ্ছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করে তাদের। বুড়ি সমানে তার সুখদুঃখের কথা বলে চলেছে ইনিয়ে-বিনিয়ে।

হট্ যাও। অ্যাই হট যাও।—হুড়মুড় করে এসে পড়ল একটা মোষের গাড়ি। নারাণ তড়াক করে পাশে গিয়ে গাড়োয়ানের মুখটা দেখে নেয়। নাঃ নেহাত ছোকরা। চাঁচাছোলা মুখ। মদন নয়।

ভিড়, সাইকেল আর গরু-মোষের গাড়ির ধাক্কা থেকে বুড়িকে বাঁচিয়ে চলতে চলতে সে আনমনা হয়ে পড়ছে। এই ফাঁকে কেউ যদি দুটো কথা কয়ে চলে যায় হয়তো খেয়ালই করতে পারবে না। বুড়ির জন্যেই হারবে বাজিটা। বেজায় রাগ হয় নিজের ওপর। কী দরকার ছিল পরোপকারে? ঝেড়ে ফেললেই হত বুড়িকে। কিন্তু তাও যে পারছে না। বৃদ্ধার করুণ মুখখানা টেনে রেখেছে।

—কী হে নারাণ, পিসিমাকে নিয়ে চললে কোথা? পিছনে ডাক শুনে নারাণ ফিরে দেখল নবগ্রামের ছিরু ঘোষ।

নারাণ বলল,—চেন একে। দেখ না ভাই কী মুশকিলে পড়েছি। নাত-জামাইকে খুঁজতে চলেছেন। আমায় ধরেছে খুঁজে দিতে। কে না কে গুরুপদ—খেলনার দোকান দিয়েছে। বুড়োমানুষ তাই ভিড় থেকে আগলে নিয়ে যাচ্ছি। পথেই আলাপ। আমার আবার কাজ আছে। দেরি হয়ে যাচ্ছে। — ও, বুঝেছি। পশ্চিম দিকে পুকুরপাড়ে গুরুপদর দোকান। আমাদের গাঁয়ের গদাই বলছিল। পিসির তিনকুলে কেউ নেই। ওই নাতনিটিই সম্বল।

—চেন গুরুপদকে?

—হুঁ চিনি বইকি।

একটা উব্‌গার কর ভাই। তোমাদের পিসিকে গুরুপদর ওখানে পৌঁছে দাও। বড্ড জরুরি কাজ আছে আমার। লোক অপেক্ষা করবে। দেরি হয়ে গেছে।— বলতে বলতে নারাণ পিসিমার হাতখানা ছিরুর হাতে গছিয়ে দিল।

পিসিমা ছিরুর মুখের কাছে চোখ এনে তাকে চিনে ফেলে একগাল হেসে বলল,—ও ছিরু, আমায় নিয়ে চল্ বাবা গুরুপদর দোকানে।

আচ্ছা চলি ভাই—পরে দেখা হবে।—হনহনিয়ে হাঁটা দিল নারাণ। ফাঁদে পড়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে ছিরু।

একটু গিয়ে থেমে নারাণ ফিরে ছিরুকে বলল,—মদনকে দেখেছ? তোমাদের গাঁয়ের মদন ঘোষ।

কই না!—জবাব দিল ছিরু।

আবার জোরে পা চালাল নারাণ।

তিন

মেলায় দোকানপাটের চৌহদ্দির মাঝখানে ঢুকে থামল নারাণ। দেখল চারপাশ।

সরু সরু রাস্তা গেছে সোজা সোজা—দু ধারে দোকান। পথের ওপরেও পসরা সাজিয়ে বসেছে কেউ কেউ।

ঘুরে দেখা যাক। ধীর পায়ে হাঁটতে লাগল নারাণ। চোখ কান সতর্ক। ঘেঁষাঘেঁষি করে সারি দিয়ে লোক চলেছে। একসারের পাশ দিয়ে অন্য সার চলেছে উল্টো মুখে।

বাসনের দোকানের সারি—ছিট কাপড়ের সস্তা জামাকাপড়—খেলনা—পাথরের জিনিস—দেখতে দেখতে চলল নারাণ। কোনো দোকানের সামনে কখনও থামে একটু। পিছন থেকে কোনো আওয়াজ বা ডাক শুনলেই চট করে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নেয় সঙ্গে সঙ্গে।

উঃ! খুব ভিড় হয়েছে আজ! কে কার সঙ্গে কথা বলছে বোঝা দায়। ফট করে কেউ দুটো কথা বলে চলে গেলেও হয়তো খেয়াল করতে পারবে না। ফকিরডাঙার ফকির ছিলেন সাধক মানুষ। হিন্দুমুসলমান সবাই শ্রদ্ধা করে ফকিরকে।

তাই সবরকম লোক আসছে। মুসলমানদের অনেকেরই দাড়ি আছে। হিন্দুদের মধ্যেও দাড়ি গোঁফওলা লোক নেহাত কম নয়। এই মেলায় ছদ্মবেশ চেনার ব্যাপারটা যে এত কঠিন, নারাণ আন্দাজ করেনি আগে। দুত্তেরি, মেলা দেখা মাথায় উঠেছে—কেবল মানুষের গলার আওয়াজে চমকে চমকে উঠছে।

দু-চারজন কদমপুরের লোকের দেখা হল। ডাকল কেউ কেউ। নারাণ কিন্তু এড়িয়ে গেল। সঙ্গী থাকলেই গল্প হবে। এবং সেই ফাঁকে মদন যদি দুটো কথা শুনিয়ে দিয়ে ভিড়ের মধ্যে সটকে পড়ে টেরই পাবে না সে।

শর্ত হয়েছে, মদনকে বলতে হবে কোথায়, কী কথা সে শুনিয়ে গেছে নারাণকে। তখন কী করছিল নারাণ। কী পোশাক ছিল তার গায়ে। অবশ্য যদি না তখুনি ধরা পড়ে যায়। যদি নারাণ বোঝে মদন ঠিক বলছে, মেনে নিতে হবে তাকে। নারাণ যেদিন ছদ্মবেশ ধরবে তার বেলাতেও ওই একই কড়ার।

একা একা ঘুরতে ভালো লাগছে না। নারাণ ভাবল, জুটিয়ে নিই কোনো বন্ধু। এভাবে মুখ বুজে মেলায় ঘোরা ভারি যন্ত্রণা। একটা মোড়ে দাঁড়িয়ে ইতস্তত তাকায় নারাণ। চেনা কারও দেখা মেলে যদি। একটা বিড়ি ধরাল সে। চা খেতে হবে, গলাটা শুকিয়ে গেছে।

—দাদা, আগুনটা এট্টু, দেবেন?

ভাঙা সর্দিবসা ফ্যাসফেসে গলায় কথা শুনে চমকে পাশে তাকায় নারাণ। কান ঢেকে, মাথা ও মুখের অর্ধেক পেঁচিয়ে কম্ফটার জড়ানো। হাঁটু অবধি ঝোলা কালো ওভারকোট। মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি গোঁফের জঙ্গল। চোখে মোটা কাচের চশমা। এক বিচিত্র মূর্তি। ডান হাতের দু আঙুলে একটা বিড়ি উঁচিয়ে নারাণের দিকে চেয়ে আছে।

নারাণ দেশলাই বের করে লোকটির হাতে দিল। অমনি ধাঁ করে মাথায় এল—এ ঠিক মদন।

কালোকোটের সামনে ঘুরে দাঁড়িয়ে নারাণ বলল,—বাবা মদন, চিনে ফেলেছি।

লোকটি বেজায় অবাক ভাবে বলল,—অ্যাঁ।

চিনে ফেলেছি। তুই মদন।—নারাণ বলল ফের।

কী বলছেন মশাই যা-তা।—ভাঙা কাঁসি বাজল যেন।

নারাণ থতমত খেয়ে বলল, তুই, মানে তুমি, মানে আপনি মদন না?

কে আপনার মদন?—কালোকোট গর্জন ছাড়ল।

—আজ্ঞে নবগ্রামের মদন ঘোষ। আমার চেনা লোক।

— চিনি না মশাই কস্মিন কালে। আমার নাম সুধাকান্ত সাধুখাঁ। নিবাস মকরন্দপুর। নবগ্রামে গেছলাম একবার হালের বলদ কিনতে। ব্যস্। হ্যাঁ, আমার এক ভাইপো আছে মদন – হুগলিতে থাকে।

তবু নারাণের সংশয় যায় না। সত্যি মদন নয়? মদন মহাধূর্ত। হয়তো অ্যাকটিং করছে। পরে বলবে— ও তো আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিলি। যদি ঠিক চিনেছিলি তবে ছাড়লি কেন? এর দাড়িটা একবার টেনে দেখব নাকি? না, যদি ভুল হয়?

শুধু সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল— ঠিক বলছেন?

—আলবাত। গলার জোরে আমার নাম পালটে দেবেন নাকি! ইঃ, আবদার।

রাগের চোটে লোকটা হুস্‌হুস্ করে টেনে বিড়িটা অর্ধেক করে ফেলে।

এমনি সময় দু-জন লোক এসে কালো-কোটের কাছে দাঁড়াল। একজন বলল, — এই সুধা চেল্লাচ্ছিস্ কেন?

—আরে, দেখ্, না হুজ্জুতি। কোথাকার এক পাগলের পাল্লায় পড়েছি। বলে কিনা আমি হচ্ছি মদন। নবগ্রামে বাড়ি। মানছে না কিছুতেই।

সুধানন্দের সঙ্গী দুটি বেশ গাট্টাগোট্টা। তারা কটমট করে দেখে নিল নারাণকে। একজন বলল, মশাইয়ের মদন কি এইরকম দেখতে?

হ্যাঁ, মানে — নারাণ তোতলায়।

অন্যজন রসিকতা করল— সুধা তোর যমজ ভাই আছে জানতাম না তো!

ঘোড়ার ডিম আছে। বেটা আহাম্মুক। চ-চ—সঙ্গীদের ঠেলে নিয়ে সুধানন্দ সাধুখাঁ ভিড়ে মিশে গেল।

বাপ্ রে!—হাঁপ ছাড়ল নারাণ।

এভাবে যাকে-তাকে হুট্ করে মদন বলে ডাকার বিপদ সে টের পায়। সাবধানে বুঝে শুনে এগোতে হবে। নইলে ফ্যাসাদে পড়তে পারে।

যাঃ, লোকটা যে তার দেশলাইটা নিয়ে চলে গেল। যাক গে। ওই বদরাগী সুধানন্দকে খুঁজে বের করে দেশলাই ফেরত চাইতে নারাণের সাহসে কুলল না।

মিষ্টির দোকানগুলো দেখতে দেখতে চলছিল নারাণ। রকমারি মিষ্টি সাজানো থরে থরে। ল্যাংচার দোকান এসেছে একটা। একেবারে খাস শক্তিগড়ের মাল। দেখলেই জিভে জল আসে। বাড়ির জন্যে এক হাঁড়ি নিয়ে গেলে হয়। বাজিটা জিতে ফেললে নিয়ে যাবে ঠিক। গোটা দুই এখন চেখে দেখলে কেমন হয়?

—বাবু দুটো ভিক্ষে দেবেন?

কাতর আবেদন শুনে পাশে তাকিয়ে দেখল নারাণ, এক বুড়ো ভিখিরি। মুখে খামচা-খামচা দাড়ি-গোঁফ। বাঁ পায়ে হাঁটুর নিচে মস্ত এক পট্টি জড়ানো। কোনো ঘা-টা আছে হয়তো। গায়ের চামড়াই ছোপছোপ ময়লা। পরনে একটা ছেঁড়া আলখাল্লা। মাথার চুল রুক্ষ, জট পাকানো। এক হাতে ধরা লাঠির ওপর কুঁজো হয়ে ভর দিয়ে আছে। অন্য হাতে একটা টিনের বাটি—এগিয়ে দিয়েছেন নারাণের সামনে।

নারাণ পকেট হাতড়াতে লাগল একটা পাঁচ পয়সার খোঁজে! পয়সাটা বের করে বাটিতে ফেলতে মাথা নুইয়ে কৃতজ্ঞতা জানাল ভিখিরিটি।

চলে যাবে বলে সে পিছনে ফিরেছে, অমনি নারাণ তড়াক করে গিয়ে তার মুখোমুখি হল, — কে মদন না? হুঁ, ঠিক চিনেছি।

অ্যাঁ! —ভয়ার্ত একটা চাপা আওয়াজ বেরোল ভিখিরির গলা দিয়ে। সে সজোরে মাথা নাড়ল।

ফের না! — চাপা গর্জন ছাড়ল নারাণ,— আমার চোখে ধুলো দিবি! ওটা তোর আসল চুল? আমায় পরচুলা চেনাবি?

সঙ্গে সঙ্গে ভিখিরিটি হনহন করে একদিকে হাঁটকে শুরু করল। পা টেনে টেনে চলা অক্ষম বৃদ্ধের চলন নয়, রীতিমতন দ্রুত পদক্ষেপ।

কয়েক মুহূর্ত থ হয়ে রইল নারাণ। একী পালাচ্ছে কেন মদন!

রেগে নারাণ হাঁক ছাড়ল— মদন, পালাচ্ছিস কোথা?

ভিখিরি প্রায় দৌড়তে শুরু করল। ভিড়ের ফাঁকে ফাঁকে পুরো ছোটা অবশ্য সম্ভব নয়—খুব জোরে হাঁটাই বলা উচিত।

মিষ্টির দোকানের একজন খদ্দের দুর থেকে লক্ষ করছিল ব্যাপারটা। সে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে বলল নারাণকে— কী দাদা পালাল যে! পকেটমার?

নারাণ ততক্ষণে মদনকে ধরতে ধাওয়া করেছে। সে হাত নেড়ে জানাল —না।

প্রশ্নকর্তা ভাবল তাকে ডাকছে সাহায্য করতে— নির্ঘাৎ পকেটমার।

সে বিকটস্বরে চিৎকার দিল — 'চোর চোর'— এবং উৎসাহের চোটে ছুটল নারাণকে টপকে, লোকজনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে, ভিখিরির পিছু পিছু।

এমনি মুহূর্তে বহুকণ্ঠের গর্জন উঠল — চোর চোর।

ভিড়ের একটা অংশ ধেয়ে গেল একদিকে। হই হই মারমার রব। চারদিক থেকে লোক ছুটে আসছে। অনেক দোকানী চটপট দোকানের ঝাঁপ ফেলে দিল লুটপাটের ভয়ে।

এক জায়গায় কুণ্ডলী পাকাচ্ছে ভিড়টা। ভিতরে যে কী ঘটছে ঠিক বোঝার জো নেই। তবে তর্জন-গর্জন ও হুঙ্কারের আওয়াজে মনে হচ্ছে ধরা পড়ে মার খাচ্ছে চোরটা।

নারাণ তখন সেই জমাট ভিড়টার বাইরে নিজের চুল ছিঁড়ছে আফশোসে। হায় হায় এ কী কাণ্ড হল! কী বোকামি করল মদন। চোরের মার এই মেলার মাঝে। মরে যাবে ও। বাঁচাতেই হবে ওকে।

পাগলের মতো নারাণ ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিনি পয়সায় হাতের সুখের লোভ অনেকেরই। যারা চোরের কাছে পৌঁছতে পারেনি, ঠেলাঠেলি করছে ভিতরে ঢুকতে। তাদের গুঁতোয় ঢুকতে পারে না নারাণ।

অ্যাই। হট্ যাও। হটো হটো। — দুই জাঁদরেল পাহারাওলা রুল ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে এল। তাদের রুলের ঘা থেকে গা বাঁচাতে একটু সরে গেল জনতা। সিপাই দুজন এগোল। তাদের পিছনে পিছনে নারাণও ঢুকে পড়ল ভিতরে।

ভিড়ের ফাঁক দিয়ে ওর অবস্থা দেখে শিউরে উঠল নারাণ। — উবুড় হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। আলখাল্লা কুটিকুটি। গায়ে জামায় রক্তের ছোপ। পরচুলা উধাও। একজন মুঠো করে ধরেছে তার চুল।

নারাণের হাত-পা কাঁপতে লাগল। দুঃখে অনুশোচনায় যেন ক্ষণকালের জন্য বোবা হয়ে গেল। কী করবে সে? কী করে বোঝাবে এই অবুঝ উন্মত্ত জনতাকে — ও মদন। আমার বন্ধু। চোর নয়।

পুলিশের অধিকারে অন্যে ভাগ বসিয়েছে দেখে চটল পাহারাওলারা। যে লোকটি ভিখিরির চুল পাকড়েছিল তাকে ধমক লাগাল এক সেপাই — অ্যাই ছোড়।

লোকটি চুল ছেড়ে সরে দাঁড়াল।

ভূপতিত লোকটি যে চোর তাতে সন্দেহ ছিল না সেপাইদের। তাদের একজন গদাম করে এক সবুট লাথি লাগাল চোরটাকে এবং হুকুম করল — অ্যাই ওঠ।

এবং সঙ্গে সঙ্গে চোরের জামা ধরে হেঁচকা টানে তাকে খাড়া করিয়ে দিল।

একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে আসতে আটকে গেল নারাণের গলায়। নিপীড়িত লোকটার মুখ দেখতে পেল সে। একী এ তো মদন নয়!

জনতার হিংস্র টান পরচুলার সঙ্গে সঙ্গে নকল দাড়ি-গোঁফও খুলে গেছে লোকটার। বেরিয়ে পড়েছে আসল রূপ। ও চেহারা মদনের নয়, হতে পারে না। তাহলে কে!

রহস্য তখুনি উন্মোচিত হল।

সিপাহিজি লোকটার মুখ একবার ভালো করে দেখে নিয়ে তার ঘাড়ে মোক্ষম রদ্দা কষিয়ে দিয়ে হুংকার ছাড়ল — আরে বেটা মদনা। আভি তু মিলা। আবে চল্।

ভ্যাবাচ্যাকা নারাণ পাশের জনকে জিজ্ঞেস করল,— ও কে দাদা, ওই যে মার খেল?

উত্তর এল,— চেনেন না, ও মদন। দাগি চোর। ফেরারি হয়েছিল।

দুই সিপাই চোর মদনের দুই হাত পাকড়ে বীর দর্পে এগোল। ভিড়ের একটা বড় অংশ চলল তাদের পিছনে পিছনে।

শীতের সকালেও ঘাম মুছল নারাণ। উঃ ভাগ্যিস ও মদন নয়। নবগ্রামের মদন ঘোষের এই

পরিণতি দেখার চেয়ে সে বরং বাজি হারতে রাজি আছে। ওঃ তাই লোকটা অমন পালাচ্ছিল। তাকে হয়তো ভেবেছিল পুলিশের চর।

গলাটা একদম শুকিয়ে গেছে। একটু চা খেতেই হবে। চটের ছাউনি দেওয়া ছোট্ট একটা চায়ের দোকান থেকে এক ভাঁড় চা কিনল সে।

চার

মেলার রাস্তায় দাঁড়িয়ে চা-য়ে চুমুক দিচ্ছিল নারাণ। গরম চায়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ভাঁড়ের তলায় একটা এবং ওপরে একটা আঙুল দিয়ে সাবধানে ধরেছে। ভাঁড়ে কানায় কানায় ভর্তি চা। একটু হাত কাঁপলেই চলকে গায়ে পড়বে, আঙুলে ছেঁকা লাগবে।

মানুষের জমাট স্রোত গা ঘেঁষে বয়ে চলেছে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে নারাণ। তবু কেউ কেউ তার গায়ের ওপর এসে পড়েছে। দোকানগুলোর দিকে সে মুখ করে রয়েছে। ধাক্কাটা পিঠেই লাগুক।

দাদা এট্টু সরে। — একটি অদৃশ্য হাত নারাণের কোমরের কাছে আলতো ভাবে ঠেলা দিল এবং পরক্ষণেই একজন পাশ দিয়ে হুড়মুড় করে পেরিয়ে গেল।

ভাঁড়ের কিনারে ঠিক তখন ঠোঁট ঠেকিয়েছে নারাণ। কোনো রকমে বাঁচাল চা-টা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল।

নীল রঙের শার্টের পিঠ। মাথা ঘন কালো চুল। — এইটুকু সে দেখতে পেল চলে যাওয়া লোকটির সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে ধাঁ করে মনে জাগল— মদন।

চমকে উঠে নারাণ তাড়াতাড়ি দু-পা এগিয়ে গেল ওর পিছনে পিছনে।

উঃ! চা চলকে পড়েছে হাতে। জামাতেও পড়েছে চা। ভাঁড়টা সে দিল ছেড়ে । চা ভর্তি মাটির পাত্র ফটাস করে আছড়ে পড়ল পায়ের কাছে।

আই ব্বাস্! — পাশেই একজন ছিটকে উঠল গরম চায়ের ছিটে পায়ে লাগাতে : এটা কী হল দাদা? দৃকপাত নেই নারাণের। সে প্রায় ছুটে এগোল। দূরে ভিড়ের ভিতর চলমান নীল শার্টকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। চলতে চলতে নারাণ চিৎকার ছাড়ল— মদন।

আট-দশ পা গিয়ে সে গেল আটকে।

চার-পাঁচটি যুবক হেলে-দুলে হাঁটছিল। তাদের একজনের জামার বোতামে নারাণের চাদরের সুতো গেল জড়িয়ে।

— দাদা আপনার চাদর।

হেঁচকা টানে সুতোটা ছিঁড়ে ফেলে চাদর মুক্ত করে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখল নারাণ— নীল শার্ট হাওয়া। নাঃ ঠিক উধাও বলা উচিত নয়। ভিড়ের মাঝে চোখ বুলিয়ে সে বরং একের বদলে তিনটে নীল জামা আবিষ্কার করল। কিন্তু ওদের মধ্যে কে যে তার সঙ্গে কথা বলেছে ধরতে পারল না।

মরিয়া হয়ে আন্দাজে এক হাঁক পাড়ল নারাণ— মদন।

— কে মদন? কোথায়?

নারাণের চোখ-মুখের উদভ্রান্ত ভাব দেখে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল ছেলেগুলো।

কথা কয়ে সময় নষ্টের ইচ্ছে ছিল নারাণের। কিন্তু পাছে পিছনে ছুটলে লোকে নীল শার্টকে পকেটমার ভাবে এই ভয়ে সে জবাব দিল — আমার বন্ধু। ওই যাচ্ছে।

—কই?

আঃ, ছেলেগুলো আচ্ছা নাছোড়বান্দা তো।

ওই যে নীল— বলতে বলতে আর কিন্তু তখন একটাও নীল-শার্ট নজরে এল না নারাণের। তার মুখ দিয়ে একটা আক্ষেপ বেরোল—যাঃ...!

কিছু হারিয়ে গেছে বুঝি? ঘাবড়াবেন না ডেকে দিচ্ছি — বলেই প্রশ্নকর্তাটি তারস্বরে চিৎকার ছাড়ল : মদন। ও মদনবাবু।

বাকি তিনজনও তার সঙ্গে গলা মেলাল। তাদের কানে তালা ধরানো চিৎকারে মেলার লোক আঁৎকে উঠে হাঁ করে দেখতে লাগল তাদের।

একজন রোগা ঢ্যাঙা লোক এগিয়ে এসে বিরক্তস্বরে বলল— কী হল ডাকছেন কেন?

এই যে উনি ডাকছেন। — একটা আঙুল নারাণকে দেখিয়ে দিল।

নারাণ থতমত খেয়ে বলল, — আজ্ঞে, আপনাকে নয়।

ওঃ।— আগন্তুক ফিরে গেল।

একটা মোটা-সোটা মাঝবয়সি ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলেন —কী ব্যাপার, কে ডাকছে আমায়?

ইনি। — নারাণকে দেখিয়ে দেওয়া হল।

আজ্ঞে, আপনাকে নয়। — নারাণ অপ্রস্তুতভাবে জানাল।

তবে ডাকছিলেন কেন? — ভদ্রলোক চটে গেলেন।

— আজ্ঞে আমি মদন ঘোষকে খুঁজছি। নবগ্রামের মদন ঘোষ।

ও সেটা বলবেন তো। আমি কি হাত গুনব? ঘোষ না মিত্তির। — মোটা ভদ্রলোক ফিরে চললেন।

নারাণকে সাহায্য করতে উৎসুক ছেলেগুলির মধ্যে একজন বলল, —হুঁ ঠিক! গুচ্ছের মদন তো ঘুরছে মেলায়। শুধু মদন বলে ডাকলে সব কটা সাড়া দেবে। কী নাম বললেন দাদা? মদন ঘোষ। নবগ্রাম। বেশ ডাকছি তাই—

মদন ঘোষ কে আছেন — নবগ্রামের মদন ঘোষ। আপনাকে খুঁজছে— ছোকরা বিকট হাঁক পাড়ল।

তার সঙ্গীরাও চেঁচাতে লাগল— মদন ঘোষ কে আছেন? — নবগ্রামের মদন ঘোষ—

ছোটখাটো ভিড় জমে গেল সেখানে। অনেকেই জিজ্ঞেস করতে লাগল : কী ব্যাপার মশাই? হারিয়ে গেছে? — বাড়িতে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে বুঝি? খবর পাঠিয়েছে? ইত্যাদি—

একজন নবগ্রামের লোক দৌড়ে এল-কি হল? মদনের কী হয়েছে?

নারাণ দেখল কেলেঙ্কারী। এভাবে ডাকাডাকি করলে মদন তো দেখা দেবেই না উলটে আরও ডুব মারবে। সে তাড়াতাড়ি থামাতে গেল, — থাক থাক, এত কষ্ট করে—

আহা কষ্ট কী দাদা। আমাদের জন্যে বন্ধুকে মিস্ করলেন। জরুরি দরকার বুঝি? — নারাণের হিতৈষী সেই চারজনের একজন জানতে চাইল।

তা জরুরি বটে। — স্বীকার করল নারাণ দেখা পেলে উপকার হত খুব।

তবে তো এটুক করতেই হয়। — পরোপকারী ছেলেগুলি একবাক্যে মত দিল।

চ, বরং ওই মোড়ের মাথায় গিয়ে ডাকি। — বলল এক জন : বংকা একটা চোঙা জোগাড় করতে পারিস।

— চোঙা কেন?

— ডাকটা জোরালো হবে।

ঠিক বলেছিস। একটা ছোঁড়া অবাক জলপান বিক্রি করছিল চোঙা ফুঁকে, আমি দেখেছি। দাঁড়া নিয়ে আসচি চেয়ে। — বংকা দৌড়োল।

হুঁ, নেহাত কালা না হলে নবগ্রামের মদন ঘোষকে আমি শুনিয়েই ছাড়ব। — নারাণকে নিশ্চিন্ত করা হল।

নারাণ আরও ব্যস্ত হয়ে বলল, — থাক থাক, আমি খুঁজে নেব। ঘুরতে ঘুরতে দেখা হয়ে যাবে ঠিক। অনেক ধন্যবাদ।

ধুত্তেরি, এই করতে গিয়ে একটুও মেলা দেখা হচ্ছে না। নারাণ দেখল তার গাঁয়ের ফণী আর দুলাল আসছে। ফণী ডাকল, — কীরে নারাণ একা একা? আসবি আমাদের সাথে?

নারাণ খুশি হয়ে ওদের সঙ্গে জুটে গেল। ভাবল— মদনকে ধরতে গিয়ে যা সব ঝামেলায় পড়ছি সঙ্গে দুটো বন্ধু থাকলে বুকে একটু বল পাওয়া যায়। এই রকম ঘুরতে ঘুরতেই চোখ-কান খোলা রাখলেই চলবে। মদনকে ধরে ফেললে পর তখন নাহয় বাজির কথাটা ফাঁস করা যাবে ফণীদের কাছে।

পাঁচ

এক জায়গায় নাগরদোলা বসেছে পাশাপাশি চারটে। মানুষসুদ্ধ নাগরদোলাগুলো বন বন করে ঘুরছে। দুলাল বলল— চ নাগরদোলা চড়বি?

বেশ। — রাজি হয়ে গেল তিনজনে। অনেকদিন নাগরদোলায় চড়েনি নারাণ।

তিনজনে উঠল একটা দোলায়। পাক খাওয়া শুরু হল। ওপর থেকে নীচে নামার সময় নারাণের পেটের ভিতর গুড়গুড়ুনি— এই জন্যেই নাগরদোলা চড়তে ভয়, আবার মজাও। ঘোরার সময় যখন টঙে ওঠে, গোটা মেলাটা দেখা যায়। শুধু মাথা আর মাথা।

মনটা হালকা লাগছে। মদনের চিন্তাটা আপাতত দূরে থাকুক। যতক্ষণ নাগরদোলায় বসে আছে ছদ্মবেশী মদনও দূরে রইল।

পঁচিশ পয়সায় কুড়ি পাক ঘোরা।

এক দফা পঁচিশ পয়সার মেয়াদ শেষ হল। কেউ নামতে চায় না। চলুক আরও।

দ্বিতীয় দফার পাক শুরু হয়েছে। চারপাশে কিছু লোক দাঁড়িয়ে মুখ উঁচু করে নাগরদোলার পাক খাওয়া দেখছিল। হয়তো তাদেরও ইচ্ছে হচ্ছে চাপতে কিন্তু ভরসায় কুলচ্ছে না। যারা দোলায় উঠেছে তারা অনেকে নানান উদ্ভট কাণ্ড করছে — কেউ ভয় পেয়ে, ভয় ঢাকতে চিৎকার করে হাসছে। কেউ পেট চেপে ধরে উবুড় হয়ে বসেছে। কেউ চেঁচাচ্ছে — বাবা গো। মরে যাব। নামব। থামাও। থামাও—

মাটিতে দাঁড়িয়ে অনেকেই দেখছিল এই তামাশা।

দাদা চাদর সামলে। — একজনের গলা শোনা গেল এবং একটা হাত উঁচু হয়ে দেখাল নারাণের দোলার দিকে।

রোদে গরম লাগছিল তাই নারণরা চাদর পাট করে কাঁধে রেখেছিল। কথাকটা কানে যেতেই তিনজনেই চমকে উঠে যে যার চাদর সামলাল। ঘুরপাকের সময় সবারই চাদর খানিক বেশি ঝুলে পড়েছিল, আর একটু ঝুললেই নাগরদোলার চাকায় জড়িয়ে যেতে পারত বা পড়ে যেত কাঁধ থেকে।

চাদর তুলে কোলে রাখার পর নারাণের খেয়াল হল।

ফণীকে জিজ্ঞেস করল,— কোন লোকটা বলল আমাদের লক্ষ করেছিল।

ফণী মাথা নাড়াল,— ওই চারজনের মধ্যেই হবে কেউ।

—তুই দেখেছিলি দুলাল?

বোধহয় ওই গোঁফওয়ালা লোকটা। না না, তার পাশেরটা। —দুলাল দেখাল।

বলতে বলতেই গোঁফওলার পাশের লোকটা পিছন ফিরে চলতে শুরু করল।

ওই লোকটা ঠিক? — বলল নারাণ।

— মনে তো হল।

কাকে বলল রে, আমাকে না? — নারাণ জিজ্ঞেস করল।

কে জানে হতে পারে। — ফণী তখন ঘূর্ণিপাকের ফুর্তিতে মশগুল।

বাঁই বাঁই করে ঘুরছে নাগরদোলা পুরোদমে। কোনোরকমে ঘাড় ঘুরিয়ে হাঁক ছাড়ল নারাণ— মদন।

অ্যাই কাকে ডাকছিস?— বলল ফণী।

— মদনকে।

— আমাদের মদন পাল?

— না, নবগ্রামের মদন ঘোষ।

—কই রে?

— ওই যে যাচ্ছে।

ওই লোকটা! ভ্যাট। ও কক্ষনো মদন ঘোষ নয়। আমি দেখেছি। — বলল ফণী।

কী করে বোঝাবে নারাণ মদন ঘোষকে দেখলে কি আর চেনার উপায় থাকবে। নিরুপায় সে চুপ করে রইল। সন্দেহজনক লোকটি মিলিয়ে গেল ভিড়ে।

নারাণের মনে কেবলই খচ্ খচ্ করে— কথাটা কি আমায় বলেছিল? তাই তো মনে হল। আমিই তো ছিলাম ওই ধারে। যদি সত্যি মদন হয়? স্রেফ বেকায়দায় ফেলে বাজিটা জিতে নিল। ইস্! ওই লোকটাই বলল, না পাশের গুঁফোটা? অরে গুঁফোটাও যে কেটে পড়েছে! এখুনি নেমে গিয়ে ভালো করে ওর মুখখানা দেখারও জো নেই। নারাণের নাগরদোলা চড়ার আনন্দ প্রায় মাটি হল।

নাগরদোলা ঘোরা শেষ করে যখন সে নামল তখন সন্দেহভাজন সেই চারজনের কারোরই আর পাত্তা পেল না।

তিনজনে মেলায় টহল দিল খানিক।

খিদে পেয়েছে। একটা ভাত খাওয়ার দোকানে ঢুকল তারা।

দোকানে আরও লোক খাচ্ছে। লোক ঢুকছে বেরচ্ছে। কথাবার্তা হচ্ছে। 'ও দাদা, ও মশাই'— ইত্যাদি কোনো সম্বোধন কানে এলেই চমকে চমকে ওঠে নারাণ। চারধারে তাকায়। কথাটা আমায় বলল নাকি? অমন ফার্স্ট ক্লাস রুই মাছের মুড়োটা নিশ্চিন্ত হয়ে উপভোগ করতে পারছে না বেচারা। নিজের ওপর রাগ হতে থাকে বাজি ফেলার জন্যে। এর ফল যে এমন শোচনীয় দাঁড়াবে কে ভেবেছিল!

বেঞ্চিতে বসে মাথা নিচু করে খাচ্ছিল নারাণ। হঠাৎ শোনা গেল— দাদা মাছ ভাত কত?

ঝট্ করে ফিরে তাকাল নারাণ। দেখল একটি বেঁটে রোগা লোক ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে আছে, বোধহয় উত্তরের আশায়।

নাঃ মদন নয়। কিন্তু বিষম খেয়ে কাঁটা ঢুকে গেল গলায়। অতঃপর শুকনো ভাতের ডেলা গেলা। জল টল খেয়ে অনেক কষ্টে সে সুস্থির হল।

ফণী বলল, —কীরে অমন করছিস কেন, কাকে খুঁজছিস? মদন ঘোষ?

— হুঁ।

— কী দরকার?

— এই মানে—

— টাকা কড়ি পাবি নাকি?

— হ্যাঁ, মানে—

— ও আর পেয়েছিস। লোকটা মহাপাজি। ধার দেওয়ার আর লোক পেলি না? তা মেলায় খুঁজে কী করবি, বরং ভোরে ওর বাড়িতে গিয়ে ধরিস।

হুঁ। — নারাণ মাথা নাড়ল।

সার্কাস দেখবি? — বলল দুলাল : ম্যাটিনি শো-তে? তাহলে চ শিগগিরি আরম্ভ হয়ে গেছে।

ফণীও রাজি হয়ে গেল।

তাই ভালো, ভাবল নারাণ। মেলায় ঘুরলে কেবল দুশ্চিন্তা। তার চেয়ে সার্কাস দেখি বসে বসে। মেলার মধ্যেই থাকছি। মদন বলতে পারবে না যে কথার খেলাপ করেছি।

তিনজনে টিকিট কেটে ঢুকল সার্কাসে। বসল গ্যালারিতে, তক্তার ওপর। খেলা ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। গ্যালারি প্রায় ভর্তি। একেবারে নীচের থেকে দু থাক ওপরে বসার জায়গা পেল।

খাসা জমেছে খেলা। ছোট সার্কাস। তাঁবুর বাহার নেই। ব্যান্ড পার্টিটা চলনসই। কিন্তু খেলাগুলো দেখাচ্ছে বেশ।

ট্র্যাপিজের খেলা। দড়ির ওপর মেয়েদের ছাতা নিয়ে ব্যালান্স। একজন পুরো এক বালতি জল খেল ঢক ঢক করে। জলে খুদে খুদে রঙিন মাছ সাঁতরে বেড়াচ্ছিল। সবসুদ্ধ গিলল। একটু পরেই সে হাঁ করে হোস্-পাইপের তোড়ে জল বের করে বালতি ভর্তি করে ফেলল। দেখা

গেল মায় মাছগুলো অবধি জ্যান্ত বেরিয়ে এসেছে। দুটো জোকার কিম্ভূত সাজ করে দারুণ হাসাচ্ছে দর্শকদের।

দেখতে দেখতে একটা বুদ্ধি খেলে গেল নারাণের মাথায়। কাল তো তার পালা। সে মেক-আপ করে আসবে এবং মদনকে ধরতে হবে তার ছদ্মবেশ।

সার্কাসের লোক সাজলে কেমন হয়? দুপুরে দেখে ছিল একজন জোকার হ্যাট-কোট পরা মাথায় চোঙার মতো লম্বা টুপি, রং মেখে মুখখানা মুখোশের মতো বানানো, একটা বিড়ির জ্বলন্ত দিকটা মুখের ভিতরে পুরে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঘুরছিল মেলায় আর সার্কাসের হ্যান্ডবিল বিলোচ্ছিল। ঠিক ওই রকম ড্রেস করা যায় যদি? বিড়ির জ্বলন্ত দিকটা মুখে নিয়ে টানতে আমিও পারি। মদনের সামনে গিয়ে ওর হাতে একটা হ্যান্ডবিল গুঁজে দিয়ে বললেই হবে — মর্নিং স্যার।

টুপিতে লেখা থাকবে — 'দি গ্রেট রয়াল সার্কাস।' মদনের সাধ্যি কি সন্দেহ করে। সার্কাসের লোকেরাও ধরতে পারবে না চট করে। ভাববে ওদেরই কেউ। তবে সার্কাসের তাঁবু থেকে যতটা সম্ভব দূর দূর থাকাই নিরাপদ।

কাজটা হাসিল হলেই টুক করে বেরিয়ে যাবে মেলা থেকে। মুখে রং না মেখে একখানা রঙচঙে মুখোশ পরে নেবে। মেলা থেকে বেরিয়ে খুলে ফেলবে মুখোশ আর টুপি। সার্কাস থেকে বেরবার সময় বেশ কটা হ্যান্ডবিল হাতিয়ে নেব দরজায় দাঁড়ানো লোকটার কাছ থেকে। বলতে হবে গ্রামে বিলোব। ফণী আর দুলালকেও বলতে হবে, কটা হ্যান্ডবিল নিয়ে নিতে।

খেলা দেখার ফাঁকে ফাঁকে প্ল্যানখানা বাগিয়ে ফেলছিল নারণ। হঠাৎ কানে এল — এই নারাণ।

চমকে মাথা তুলে ওপরে পাশে দেখতে লাগল নারাণ।

কে ডাকল আমায়? — একবার প্রশ্ন করল ওপরের এবং ডান পাশের দর্শকদের উদ্দেশে।

কিন্তু কেউ জবাব দিল না। তাদের চোখ তখন দড়ি ঘেরা গোল খেলা দেখানোর জায়গায়।

সেখানে তখন একটা কাঠের বড় তক্তা খাড়া করে রাখা হয়েছে। তক্তাটার সামনে বেঁধে দাঁড়িয়েছে ঝলমলে পোশাক পরা একটি সুন্দরী মেয়ে। কিছু দূরে এক চীনা সাহেবের চোখ বাঁধা হচ্ছে। তার হাতে অনেকগুলো বড় বড় ঝকঝকে ছোরা। চোখ বাঁধা অবস্থায় সে নাকি ওই ছোরাগুলো ছুড়বে একটার পর একটা — আর সেগুলো নাকি পরপর গেঁথে যাবে মেয়েটির গা ঘেঁষে ঘেঁষে তক্তার ওপর। দর্শক তাই রুদ্ধশ্বাস।

কে ডাকল নারাণ বলে? — চারপাশের গ্যালারিগুলো দেখতে দেখতে আবার জিজ্ঞেস করল নারাণ।

এবারও সাড়া মিলল না।

কী ছটফট কচ্ছিস! — ফণী ধমকে দিল নারাণকে।

— কে ডাকল আমায়।

— কেউ না। খেলা দেখ্।

— হুঁ মনে হল যে।

হারান বলে ডেকেছে। তোর নাম হারান? — ফণী খিঁচিয়ে ওঠে।

তর্ক করতে ভরসা না পেয়ে নারাণ সোজা হয়ে বসল। কিন্তু ফের অশান্ত হয়ে ওঠে মন। সত্যি হারান, না নারাণ! মদনের চালাকি নয় তো? হয়তো পিছনে পিছনে ঘুরছিল এতক্ষণ। এইবার বাগে পেয়েছে।

খানিক ডানধারে এক ধাপ ওপরে চাদরে মুখ ঢেকে একটা লোক বসে আছে, ও নয়তো? খেলা শেষ হলেই ধরতে হবে ওকে।

খেলা দেখতে আর মন বসল না নারাণের।

শো ভাঙতেই সবাই হুড়মুড় করে নামতে লাগল গ্যালারি থেকে। সেই সন্দেহজনক লোকটা যে কোথায় হারিয়ে গেল নারাণ হদিশই পেল না। মনটা এমন খিঁচড়ে গেল যে বেরবার সময় সার্কাসের বিজ্ঞাপন নেওয়ার কথাটাও সে বেমালুম ভুলে গেল।

ছয়

সার্কাসের বাইরে এসে নারাণ ভাবল দূর ছাই। চুলোয় যাক বাজি। হারি হারব, আর এই অশান্তি সহ্য হয় না। চারটে বেজে গেছে। এবার গাঁয়ে ফেরা যাক। যাওয়ার আগে বউয়ের জন্যে একটা মালা কিনে নিই। একটু কায়দা করে ফণী আর দুলালকে ছেড়ে দিয়ে নারাণ একলা হল।

এক জায়গায় পর পর কয়েকটা শৌখিন গয়নার দোকান। সাজানো রয়েছে রঙিন কাচে তৈরি নানারকম মালা। নকল সোনা বা রুপোর হার, দুল, চুরি। গালার গয়না। সবই মেয়েলি জিনিস। ছেলেদের পক্ষে কিছু একটা পছন্দ করা কঠিন কাজ।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে কয়েকবার ভাবল নারাণ— থাক আজ। আর একদিন আসবখন বউকে নিয়ে। ও নিজেই পছন্দ করে কিনবে। কাল হবে না। পরশু? না! পরপর তিনদিন মেলায় আসার ধকল পোষাবে না। একদিন অন্তত বিশ্রাম চাই।

ফিরলেই বউ ঠিক বায়না ধরবে, কাল মেলায় নিয়ে চলো। কোনো রকমে ঠেকিয়ে রাখতে হবে দুটো দিন। আজ যে সে মেলায় যাচ্ছে বলেনি বাড়িতে। তবে ঠিক জানতে পারবে বউ। আর জানলেই চটে যাবে, একা একা গেছে বলে। একটা পছন্দসই কিছু হাতে নিয়ে গেলে বেশি গোলমাল করবে না।

এক ফাঁকে একটা দোকানে ঢুকে তাড়াতাড়ি সে কিনে ফেলল একছড়া মালা— ঝুটো মুক্তোর মালা। কাচের পুঁতি মুক্তোর মতো দেখতে। বেশ দামি জিনিস কিনতে সাহস হল না। যা মালুম হচ্ছে, বাজি তো হারবে। দশটি টাকা যাবে গচ্চা! লোকসানটা হিসেব করে তহবিলের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিল।

নারাণ ভাবল— মদনের ছদ্মবেশ তো আজ ধরতে পারলাম না, এখন আসচে কাল যদি মদনকে ফাঁকি দিতে পারি নিজের ছদ্মবেশের জোরে তবে কিছুটা উসুল হয়। কাটাকাটি হয়ে যাবে বাজি। টাকাটা লোকসান যাবে না অন্তত। তখন নাহয় বউকে দেওয়া যাবে আরও একটা কিছু।

নারাণ দোকানিকে দাম চুকিয়ে মালাটা পকেটে পুরছে, কানে এল — কী গো জামাই, কেমন আছ? আমাদের বকুলরানী ভালো?

সে চেয়ে দেখল, সামনে একটা মাঝবয়সি বউ। কপালের আধখানা ঘোমটা ঢাকা। তার

নিচেই আধুলির সাইজের সিঁদুরের টিপ। নাকে নাকছাবি। ঠোঁট পানের রসে লাল। গায়ে জমকালো শাড়ি। তার ওপর হলুদ রঙের পাতলা চাদর জড়ানো। দুই হাতে গোছাভরা রঙিন কাচের চুড়ি।

নারাণ আমতা আমতা করে বলল, — আজ্ঞে আপনি?

চিনতে পারলে না তো ভাই। তোমার শ্বশুরবাড়ির লোক। তোমার বিয়েতে কত খাটলাম। এখন আর গরিব দিদিকে চিনবে কেন? আচ্ছা চলি ভাই। পুজোয় শ্বশুরবাড়ি গেলে দেখা হবে। — বউটি একটু অভিমানভরেই বিদায় নিতে যায়।

হুঁ, খুব চেনা চেনা। দেখেছি কোথায়! বুঝেছি। — এক পা এগিয়ে বউটির সামনে গিয়ে বলল নারাণ : মনে পড়েছে, তুমি, মানে আপনি মদন। মানে মদনদি।

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে উঠল বউটি। ঘাড় নেড়ে জানাল, — হয়নি।

চালাকি হচ্ছে? হয়নি। নির্ঘাৎ মদন। তাই চেনা চেনা ঠেকছে।

ঠিক ওরমই মতো নাক চোখ হাইট। রঙটা একটু ময়লা করেছে মেকআপে। আমার শ্বশুর বাড়ির গাঁ থেকে এদ্দুর এসেছে মেলা দেখতে! ভাঁওতা মারার আর জায়গা পাননি। এর গাল দুটো একটু টেবো টেবো। নিশ্চয় আলুর টুকরো পুরেছে গালে। তাই গলার স্বরও পালটে গেছে।

কী করি? কী করি? এরকম নাকের ডগা দিয়ে কলা দেখিয়ে ভেগে পড়বে তাই বা ছাড়ি কী করে? কিন্তু যদি না মেলে?

বউটির চাদরে ঢাকা হাত দুটির আধখানা করে দেখা যাচ্ছে। চেনবার অছিলায় ওর হাত ভালো করে লক্ষ করতে থাকে নারাণ।

—কীগো দাঁড়ালে কেন?

একটি গমগমে কণ্ঠ শোনা গেল ধুতি-জামা-চাদর গায়ে এক দশাসই পুরুষ হনহন করে এদিকে আসছেন। এক হাতে বিরাট এক লোহার কড়াই, অন্য হাতে বছর দশেকের একটি ছেলেকে টানতে টানতে আনছেন।

একে চিনতে পার? —বউটি মিচকে হেসে নারাণকে দেখিয়ে আঙুল তোলে।

মেটে হাঁড়ির মতো মুখখানায় মোটা গোঁফ জোড়াটি নাচিয়ে, রসগোল্লার মতো চোখ দুটি মিটমিট করতে করতে বোকা বোকা হাসি ফুটিয়ে ভদ্রলোক নারাণকে দেখতে থাকেন।

— আমাদের গাঁয়ের জামাই গো, বকুলের বর।

তা খবর সব ভালো তো? কেনাকাটি কী হল? এইটে কিনলেম। — কড়াইটা তিনি নারাণের নাকের সামনে ঝুলিয়ে দিলেন : খাসা, পেটা জিনিস। কেমন!

শিরশিরে হিমেল হাওয়াতে নারাণের কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে। বাপ্‌রে খুব বেঁচেছি। যা ভাবছিলাম, কাজে তাই করে ফেলিনি ভাগ্যিস।

নারাণ মিনমিন করে প্রশ্ন করল, — অ্যাদ্দুরে এলেন কী করে?

আরে ওখান থেকে কি আসা যায়। কাছেই এসেছি শ্যামপুকুর গাঁয়ে। আমার বোনপোর অন্নপ্রাশনে। তাই ভাবলেম মেলাটা দেখে যাই। পরশু ফিরব। — বললেন ভদ্রলোক!

বিদায় নেওয়ার সময় বউটি বলল, — বকুলকে বোলো, তার পুঁটিদির সঙ্গে দেখা হয়েছে। ফের দেখা হলে চিনো কিন্তু ভাই।

নিজের জন্যে একটা বেতের লাঠি কিনল নারাণ। অনেক দিনকার শখ। হাত তিনেক লম্বা, বেশ মোটা লাঠিটা। চকচকে। ডগায় লোহার খাপ পরানো। সাপ-খোপ মারতে কাজে দেবে।

নারাণের গ্রামের অনেকেই ফিরছিল মেলা দেখে। চেনা-শোনাদের সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছিল না নারাণের। মনটা বেজায় দমে গেছে। আল ভেঙে গিয়ে সে একটা অন্য পথ ধরল। এই পথে গাঁয়ে পৌঁছতে খানিক ঘুর হবে। তা হোক। একটু চিন্তা করা দরকার নিরিবিলিতে নিজের মনে।

মেলায় কয়েকজন তার সঙ্গে কথা বলে সরে পড়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কি মদন? হতে পারে। কিন্তু কে?

সার্কাসের লোকটা — যে নারাণ (বা হারান) বলে ডেকেছিল। বসেছিল চাদর মুড়ি দিয়ে?

না যখন চা খাচ্ছিল— 'দাদা এট্টু সরে' বলে পালাল।

না, যে লোকটা নাগরদোলার নিচ থেকে ডেকে কথা কইল?

হয়তো আজ রাতেই হাজির হবে মদন। এসে বলবে, ধরতে পারলি না তো? বাজি জিতে গেছি। এবার টাকা ছাড়।

তখন সে দুম করে বলে বসবে — 'হ্যাঁ চিনেছি বইকি।' ওই জন তো তুই।' — যদি লেগে যায় বরাত জোরে।

পিছনে সাইকেলের আওয়াজ। এক সাইকেলওলা এসে পড়ল ঠিক ঘাড়ের কাছে। নারাণ সরে গেল।

দাদা কটা বাজে? — হেঁড়ে গলায় শুধাল সাইকেলওলা।

হাত ঘড়ি দেখে উত্তর দিল নারাণ — পৌনে পাঁচটা। পাশ কাটিয়ে হুস্ করে বেরিয়ে গেল সাইকেল।

সাইকেলওলা হাত কুড়ি-পঁচিশ এগিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ তার দিকে মনোযোগ দিল নারাণ। ওর মুখটা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু গায়ে সবুজ রঙের আলোয়ান। মদনের এমনি একটা আলোয়ান আছে না?

তৎক্ষণাৎ সে হাঁক ছাড়ল — অ্যাই মদন। থাম্ বলছি।

সাইকেলওলা আধখানা ঘাড় বাঁকিয়ে একবার দেখল পিছনে। তারপরই সোজা তাকিয়ে ঝুঁকে পড়ে বন্‌বন করে প্যাডেল ঘোরাল।

মদন ভালো হবে না। পালাচ্ছিস কোথা? তবে রে! — বলতে বলতে উত্তেজনায় ধেয়ে গেল নারাণ।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল সাইকেল।

থেমে পড়ল নারাণ। ওকে ধরার চেষ্টা বৃথা। খুব সম্ভব ও মদন। জব্বর প্ল্যান ঠাউরেছিল। মেলায় সুবিধে করতে পারেনি কথা বলার, তাই পিছনে পিছনে এসেছে। সময় জিজ্ঞেস করার ফাঁকটুকুতে দিব্যি এগিয়ে যাবে। ওর মুখ দেখার সুযোগ পাবে না নারাণ। ঠিক আছে পালিয়ে কী হবে? বাজির টাকা চাইতে এলেই বলবে সে — চিনেছি তোকে। সাইকেলওলা।

সাইকেলওলা তখন বাঁ পাশে গ্রামের ভিতর অদৃশ্য হয়েছে। পথের ডান দিকে একটা প্রকাণ্ড বাগান। সেখানে আম, জাম, কাঁঠাল, তেঁতুল ইত্যাদি নানা বড় বড় গাছ গায়ে গায়ে ঘন আছে। বড় গাছগুলোর তলা সাফসুফ নয়। আগাছা ঝোপে ভর্তি। এই বাগানের পাশ দিয়ে ঘুরে গেছে রাস্তাটা।

হঠাৎ নারাণের নজর পড়ল গ্রামের দিকে।

পাঁচ-ছয় জন লোক বেরিয়ে আসছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে লাঠি সোটা, চকচকে বল্লম বা দা। তাদের সঙ্গে সেই সাইকেলওলা আরোহী। নারাণ থমকে দাঁড়াল।

লোকগুলো চিৎকার করে উঠল। তারপর চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়ে আসতে লাগল নারাণকে লক্ষ্য করে।

মুহূর্ত ভাবল নারাণ— পালানোই উচিত। তাকে ঠিক ভেবেছে চোর-ডাকাত কিছু। হাতের লাঠিটাই কাল হয়েছে। এদের বোঝাতে গিয়ে লাভ নেই। কে বিশ্বাস করবে এই উদ্ভট বাজির কথা। তার আগেই সে উত্তম-মধ্যম খেয়ে যাবে। নারাণ ডানধারের বাগান ভেদ করে সবেগে ছুট দিল।

বাগানের প্রায় অপর প্রান্তে এক ঘন ঝোপের ভিতর গা ঢাকা দিয়ে বসে রইল নারাণ। অনেকক্ষণ ধরে কানে এল গ্রামের লোকের উত্তেজিত কোলাহল। কিন্তু তারা বাগানের বেশি গভীরে ঢুকতে সাহস পেল না।

নারাণ যখন বাগান ছেড়ে বেরোল তখন রাত নেমে গেছে। আকাশে চাঁদ নেই। কুয়াশায় পথ-ঘাট দেখা যাচ্ছে খুব আবছা। পা টিপে টিপে এগোল সে। যখন সে বাড়ি পৌঁছল আর দাঁড়াতে পারছে না।

ঘণ্টাখানেক বিছানায় টান হয়ে শুয়ে থাকার পর খেতে উঠল নারাণ।

বউ বলল,— জানো, তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পরই নবগ্রাম থেকে একখান চিঠি দিয়ে গেল একটা ছেলে। বললাম, রেখে যাও, বাবু আসবেন এখুনি। তা তুমি যে মেলায় যাচ্ছ কও নি তো আমায়। আমি ভাবলেম, কাজে গেছ কোথায়। আসবে ঘুরে একটু পরে চা খেতে।

কই চিঠি? — নারাণ লাফিয়ে উঠল।

—ওই টেবিলের ওপর রেখেছি।

নারাণ চিঠির ভাঁজ খুলে ঝুঁকে পড়ল—

ভাই নারাণ, আজ আর মেকআপ করে যেতে পারব না মেলায়। ঘরে হঠাৎ কুটুম এসেছে। কিছু মনে কোরো না। কাল কুটুমকে নিয়ে মেলা দেখতে যাব। কাল তো তোমার ছদ্মবেশ ধরার দিন। কথা মতো সাজ করে এসো মেলায়। ও আমি ঠিক ধরে ফেলব। শর্ত মনে আছে নিশ্চয়ই। আমার সঙ্গে কথা বলতে হবে কিন্তু। পরদিন হবে আমার পালা। আমি সাজব। আশাকরি এ ব্যবস্থায় আপত্তি হবে না। কুশলান্তে শ্রীমদনচন্দ্র ঘোষ।

পুঃ— যদি কাল ছদ্মবেশ করে মেলায় না যাও তবে অবশ্যই নিজে বা লোক মারফত খবরটা আজ আমায় জানিয়ে দেবে।

কটা লম্বা লম্বা দম টানল নারাণ। বটে আজ যায়নি মদন। সে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল — হারু আছে?

আছে। — উত্তর দিল বউ।

একটা খাতা টেনে কলম খুলে নারাণ লিখতে শুরু করল :

শ্রীমদনচন্দ্র ঘোষ সমীপেষু—

তারপর একটুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে সে খাতাটা বন্ধ করল। কলমটাও রেখে দিল।

ভাবল সে, নাঃ কাল সে যাচ্ছে না মেলায় সাজ করে। ঢের হয়েছে। ফের পরশু ছদ্মবেশী মদনের খোঁজে ঘুরতে হবে নাকি। উরিব্বাস্! আর নয়। থাক্‌গে বাজি। চিঠিতে জানিয়ে দেব পরশু আমার জরুরি কাজ আছে, তাই বাজি নাকচ এ যাত্রা।

তবে হ্যাঁ, চিঠিটা পাঠাচ্ছি না আজ মদনকে আমার না যাওয়ার খবর জানিয়ে। পাঠাব কাল হারুকে দিয়ে, একটু দেরিতে। যখন মদন কুটুমকে নিয়ে বেরিয়ে যাবে মেলায়। খুঁজুক ও। খুঁজে মরুক ছদ্মবেশী নারাণকে। নারাণের আজকের অভিজ্ঞতার কিছু ভাগ, আজকের হয়রানির কিছুটা, আশাকরি ওর বরাতেও জুটবে।

[১৯৮১, কিশোর ভারতী শারদীয়া]

নীলকুঠির জঙ্গলে

এক

সকালে আটটা নাগাদ।

শিব যেতে যেতে দেখতে পেল, উল্টো দিক থেকে দূরে হনহন করে নিমাইচরণ মান্না আসছে। নিমাই মান্না থামল ভোলানাথ সাধুখাঁর বাড়ির সামনে। ভোলানাথ তাঁর দাওয়ায় বসেছিলেন বাবু হয়ে, হাতে চায়ের গেলাস। নিমাই মান্নার সঙ্গে কী জানি কথা হল ভোলানাথের। ভোলানাথ উঠে পড়লেন। দুজনে গিয়ে ঢুকলেন ভোলা সাধুখাঁর বৈঠকখানা ঘরে।

এই চওড়া কাঁচা পথটা গ্রামের বুক চিরে সোজা চলে গেছে। দু'ধারে বাড়ি। গেরস্থ চাষিবাসী লোকের বাস। বেশিরভাগ বাড়ির দেয়াল মাটির, খড়ের চাল। কয়েকখানা পাকা বাড়িও রয়েছে।

বাড়ি অর্থাৎ সাধুখাঁদের বাড়ির সদর দরজার পাশেই বৈঠকখানা ঘর। দুটো দরজাই বন্ধ। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শিব একটু ইতস্তত করে। — নেলোকে ডাকব কি এখন?

বৈঠকখানার ভিতরে গলার আওয়ার পাওয়া যাচ্ছে। জরুরি কথা হচ্ছে হয়তো। এখন চেঁচিয়ে ডাকলে ভোলাদা চটে না যায়? যা তিরিক্ষি মেজাজ। শিব ওকে এড়িয়ে চলে।

নিচু সুরে কথা বলছে নিমাইচরণ। হঠাৎ ভোলানাথের উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল, — অ্যাঁ বল কী হে! ঠিক বলছ?

হ্যাঁ হ্যাঁ। নইলে কি আর সাতসকালে ছুটে আসি। — জবাব দিল নিমাইচরণ।

কী ব্যাপার! শিবের বেজায় কৌতূহল হল। সে বৈঠকখানার দরজার কাছে এগিয়ে গেল।

ভোলানাথ বললেন, — ওঃ, তা হলে দারুণ ব্যাপার। যা একখানা দাঁও মারা যাবে। ওফ্।

কী ভোলাদা পারবে তো?— নিমাইচরণের গলা।

—আলবৎ। দেখই না আমার এলেম।

জানি জানি ওস্তাদ। তাই তো তোমার কাছে এলাম। — নিমাইচরণের উল্লসিত কণ্ঠ।

—কিন্তু খুব সাবধান। কেউ যেন টের না পায়। হারু আবার বলে ফেলবে না তো আর কাউকে। একবার আঁচ পেলেই আর রক্ষা নেই। সব ছুটে আসবে। লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাবে।

—আরে না না। হারুকে আমি সাবধান করে দিয়েছি—খবরদার এ খবর যেন আর কাউকে না বলে। ওর সাহস কি আমার কথা অমান্য করে। তা কবে যাবে বল? কাল?

—উঁহু কাল হবে না। পরশু যাব। তুমি ভোরে আমার এখানে চলে এসো।

নিমাই বলল— না না, আমি বরং নীলকুঠির সামনে অপেক্ষা করব তোমার জন্যে। বটগাছটার তলায়। দেরি কর না বেশি। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়বে। গাঁয়ের লোক যেন দেখতে না পায় আমরা জঙ্গলে ঢুকছি। সেদিন আবার বৃহস্পতিবার। হাটের দিন। একটু বেলা বাড়লেই ও পথে লোক চলবে খুব। সন্দেহ করে কেউ যদি পিছু নেয়, সব কেঁচে যাবে।

ঠিক আছে, তাই হবে। —ভোলানাথ জানালেন।

কিন্তু, দাদা, বখরা ওই যা বলেছি তার কম হলে চলবে না। এমন জব্বর খবর।— নিমাইচরণের গলা।

পাবে পাবে, তাই পাবে। — জানালেন ভোলানাথ।

মচমচ আওয়াজ হল। মনে হল ঘরে খাট থেকে কেউ নামছে। নিশ্চয় কাঠের তক্তাপোশে বসে কথা হচ্ছিল। শিব ছিটকে নেমে এল বারান্দা থেকে। দ্রুত পা চালাল। তার বুক তখন ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। দূর থেকে সে লুকিয়ে দেখল, আধঘণ্টাটাক বাদে নিমাই মান্না ভোলা সাধুখাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ধীরেসুস্থে ফিরে চলল।

কী ব্যাপার! কীসের দাঁও? কেন এত সাবধানতা? শিবের মাথায় চক্কর মারতে শুরু করে।

ভোলানাথ সাধুখাঁ লোকটি একটু খামখেয়ালি ধরনের। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। লম্বা রোগা। মাঝে মাঝে উনি গ্রাম থেকে উধাও হন। বলেন নাকি দেশ বেড়াতে যান। খুব ব্যবসার শখ। নানান ফিকিরে থাকেন। তবে ওঁর সম্বন্ধে তেমন খারাপ কিছু কানে আসেনি। কিন্তু নিমাই মান্না লোক মোটেই সুবিধের নয়। পাশের গ্রাম মথুরাপুরে বাড়ি। পেশায় স্যাকরা। একবার পুলিশ ওর বাড়ি সার্চ করেছিল চোরাই মালের সন্ধানে। লোকে বলে, চোর ডাকাতের সঙ্গে সাট আছে নিমাইয়ের। তাদের থেকে চোরাই সোনা-দানা কেনে সস্তায়। ওর চেহারাটাও গুন্ডার মতন। এমন লোকের সঙ্গে ভোলাদার ভাব কেন? তবে কি ভোলাদাও? কীসের খোঁজ পেয়েছে নিমাইচরণ? তাই ভোলাদা উত্তেজিত। নীলকুঠির ধারে অপেক্ষা করবে— তারপর জঙ্গলে ঢুকবে। — নিশ্চয়ই ওই কুঠিবাড়ির জঙ্গলে।

এখান থেকে মাইল দুই দূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে একটা নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। পোড়ো কুঠিবাড়ি ঘিরে সাত-আট বিঘার জঙ্গল। একদা যা বাগান ছিল, এখন যত্নের অভাবে আগাছায় ভরা।

বদনাম আছে কুঠিবাড়ির। কোনো কোনো রাতে ওখান থেকে ভেসে আসে অদ্ভুত অদ্ভুত আওয়াজ আর বিকট হাসির শব্দ। ভয়ে লোকে সন্ধ্যার পর ও তল্লাট মাড়ায় না। দিনের বেলাতেও কদাচিৎ কেউ কুঠিবাড়ির জঙ্গলে ঢোকে।

তবে শিব কুঠিবাড়ির জঙ্গলে ঢুকেছে কয়েকবার। ওখন বুনো জংলা গাছের সঙ্গে মিশে আছে কিছু ভালো ফলের গাছ। যেমন, আম-গাব-পেয়ারা, চমৎকার টোপা কুল। এদের কয়েকটা খুব পুরনো গাছ। কিছু জন্মেছে পুরনো গাছের বীজ থেকে। ওইসব মুখরোচক ফলের

লোভে গ্রামের ডাকাবুকো ছেলেরা ভয় তুচ্ছ করে এবং বাড়ির লোকের চোখরাঙানি অগ্রাহ্য করে মাঝে মাঝে ওই জঙ্গলের ভিতর হানা দেয়।

নীল সাহেবরা চলে গেছে একশো বছরেরও বেশি আগে। তারপর কয়েকবার হাত বদল হয়ে এই সম্পত্তির মালিক আপাতত রামপুরহাটের মুখুজ্যেরা। অনেক শরিকানার বিষয়। ফলে কেউ এদিকে নজর দেয় না। দেখাশোনা করে না। তাই দিনে দিনে কুঠিবাড়ি ঘিরে জঙ্গল বাড়ছে। জায়গাটা ভূতুড়ে হচ্ছে। পাহারাদার নেই, ফলে গাছের ফল যে পারে খায়।

ওই নীলকুঠির জঙ্গলে কী মতলবে ঢুকবে ভোলাদা আর নিমাই মান্না? রহস্য! একটা গভীর রহস্যের আভাস পায় শিব। কিন্তু রহস্যটা যে কী হতে পারে হদিশ করতে পারে না। দেবুকে চাই দেবু। তার প্রাণের বন্ধু। দুজনে একসঙ্গে পড়ে ক্লাস ইলেভেন-এ। সবসময় একসঙ্গে থাকে। তাই তাদের লোকে ডাকে মানিকজোড়।

দেবুর চোখা বুদ্ধি। ক্লাসে ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়। রহস্য ও গোয়েন্দা গল্পের পোকা। এসব ব্যাপারে ওর মাথা দারুণ খেলে। শিব খেলাধুলোয় চৌকস। হাতে পায়ের ডান পিটেমিতে ওর জুড়ি নেই। কিন্তু মাথা খেলানোর ব্যাপার হলেই —

কীরে ?— শিব ডাকতে দেবু তার ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি দিল : এত সকালে!

— একটা কথা আছে, বাইরে আয়।

হুঁ। — শিবের চোখ মুখের অবস্থা দেখে দেবু কিছু আন্দাজ করে বলল : দাঁড়া যাচ্ছি।

একটু বাদেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। বলল, — কোথায় বসবি? চল তেঁতুলতলায়।

দুই

নির্জন তালপুকুরের ধারে ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছটার মোটা মোটা শিকড় মাটির ওপর ঠেলে উঠেছে। তারই ওপর বসে শিব ও দেবু। শিব ভোলা সাধুখাঁ এবং নিমাই মান্নার বিষয়ে সকালের সমস্ত ঘটনা বলেছে।

জ্যৈষ্ঠ মাস। সকাল দশটাও বাজেনি। এখনই রোদের তাত বেশ। দু-একজন বউ-ঝি বাসন নিয়ে যাওয়া আসা করছে পুকুরে। দূরে কয়েকটা গরু চরছে মাঠে। তেঁতুলতলার ছায়ায় কিছু শালিক আর ছাতারে পাখির কিচিমিচি। অনেক উঁচু থেকে ভেসে আসছে একটা চিলের উদাস ডাক। আর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

দেবু পকেট থেকে একটা ছোট্ট কাগজের মোড়ক বের করল। তারপর মোড়ক খুলে তাই থেকে কটা হজমিগুলি নিয়ে নিজের মুখে ফেলে কটা শিবের হাতে দিয়ে বলল, — নে, মাথা সাফ হবে।

হজমিগুলি চুষতে চুষতে গম্ভীরমুখে খানিকক্ষণ বসে থেকে দেবু শিবকে বলল, — কী ভাবছিস তুই? কী হতে পারে।

আমি! — শিব মাথা চুলকোয় একটু। তারপর বলে ফেলে, ধুস্, আমি ঠিক কিছু বুঝতে পারছি না। তুই বল। তবে মনে হচ্ছে একটা গোপন ব্যাপার। তোর কী মনে হয়?

আমার মনে হচ্ছে গুপ্তধন।— চিন্তিত মুখে জানাল দেবু।

—অ্যাঁ বলিস কি?

—হ্যাঁ, হয়তো ওই নীলকুঠিতে গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছে নিমাই মান্না। মানে ওই হারুর কাছ থেকে। হারু তো নিমাইচরণের জমিতে চাষের কাজ করে। হারুকে ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে এখন ওরা দুজনে গুপ্তধনটা গাপ মারতে চায়। নীলকুঠির সাহেবরা প্রচুর ধন উপার্জন করেছিল। তখন তো ব্যাংক পোস্টাপিস ছিল না। বাড়ির মধ্যেই লুকিয়ে রাখত চোর ডাকাতের ভয়ে। তারপর যে লুকোল, সে যদি টপ করে মরে টরে যেত কোথায় লুকিয়েছে না বলে, ব্যস্ ওটা গুপ্তধন হয়ে যেত।

— ঠিক বলেছিস। তবে নীলকরদের গুপ্তধন, ডেন্‌জারাস্ হতে পারে। বাড়িটা শুনেছি ভূতুড়ে। আচ্ছা একটা কথা বুঝছি না, হারু নিমাইকে খোঁজটা বলল কেন? নিজেই তো নিতে পারত।

তা বটে।— দেবু ভুরু কুচকোয় : হয়তো বলে ফেলেছিল ভুলে। কিংবা গুপ্তধনটা উদ্ধার করা হারুর একার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই বাধ্য হয়ে নিমাইচরণের সাহায্য চেয়েছিল। আর সেইজন্যেই নিমাইচরণও ভোলাদার কাছে এসেছে। কারণ সেও একা পারবে না। বুঝলি শিব, ভোলাদা মোটেই সোজা লোক নয়, নিমাইচরণের সঙ্গে যখন ওর এত মাখামাখি।

শিব মাথা নেড়ে সায় দিল — হুঁ।

তারপর বলল, — হয়তো গুপ্তধন নয়। জঙ্গলে দুজনে কিছু লুকিয়ে রাখার মতলব করেছে। নিমাই মান্নার তো শুনেছি চোরাই মালের কারবার আছে। আর হারু জানে ব্যাপারটা। ওকে ভয় দেখিয়ে চুপ করাচ্ছে।

দেবু বলল, — হতে পারে, অসম্ভব নয়। যাক্‌গে আগে থেকে এত মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। কাল আমাদের দুটো কাজ। এক নম্বর, হারুকে ধরতে হবে। দেখা যাক, ওর পেট থেকে কোনো কথা বের করা যায় কিনা? দুই-একবার নীলকুঠিটা ঘুরে আসব। যাকে বলে সরেজমিনে তদন্ত। যদি কোনো ক্লু পাই। এবং পরশুদিন ওদের ফলো করব।

মথুরাপুর গ্রামের সীমানায় হারু বায়েনের বাস। জীর্ণ খড়ের বাড়ি। সকাল দশটা নাগাদ। হারুর উঠোনে অনেকগুলো মুরগি চরছে। তিন চারটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। মাঝবয়সি হারু বসে বসে তালপাতার চাটাই বুনছে। হঠাৎ মুখ তুলে দেখে সামনে দেবু ও শিব।

দুজনকেই চেনে হারু, তাই ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়। 'বসেন বসেন' বলতে বলতে, হারু একখানা চাটাই এনে পেতে দিল উঠোনে। শিব দেবু হারুর কাছে ঘন হয়ে বসল।

দেবু কথা শুরু করল। প্রথমে এটা-সেটা— এই এসেছিলাম এদিকে একটা কাজে।

তোমাকে দেখে ভাবলাম জিজ্ঞেস করে যাই। আমার দিদা বলছিল একটা চাটাই কিনবে। কত নেবে? কবে দিতে পারবে?...

মিনিট দশেক এমনি কথা চালাবার পর আচমকা দেবু বলল, — আচ্ছা হারুদা, একটা কথা শুনলাম। কী যেন দেখেছ তুমি, দারুণ জিনিস। কী ব্যাপার?

বলা মাত্র হারু চমকে উঠল। ফ্যাকাসে মুখে বলল, — কে বলল?

দুজন বলাবলি করছিল। আমরা চিনি না তাদের।

না না আমি কিছু দেখিনি। আমি কিছু জানি-টানি না — বলতে বলতে হারু সটান উঠে পড়ে তার ঘরে ঢুকে গেল।

দেবু শিব হতভম্ব।

ছোট ছেলে-মেয়েগুলো খেলা ফেলে ছুটে এসে দেবুদের ঘিরে প্যাট প্যাট করে চেয়ে রইল।

দেবু শিবের হাত ধরে টান মেরে বলল,— চ।

খানিক দূরে এসে দেবু বলল,— হারু ঠিকই কিছু জানে বা দেখেছে। কিন্তু বলবে না। হয়তো ভয়ে। যাকগে দুপুরে নীলকুঠিতে যাব। খেয়ে উঠে চলে আয়। অশথতলায় অপেক্ষা করব তোর জন্যে। ভাগ্যিস গরমের ছুটি পড়ে গেছে। নইলে এসব করার সময় পেতাম না।

গ্রীষ্মের দুপুর। চারদিক খাঁ খাঁ করছে। দিগন্তবিস্তৃত চাষের খেত এখন নেড়া। বৃষ্টি নামেনি তাই ধান পোঁতা শুরু হয়নি এখনও। সেই ধু ধু এবড়ো খেবড়ো হলুদ মাঠের মাঝে এক টুকরো ঘন সবুজ ছোপ— নীলকুঠির জঙ্গল। জঙ্গলে পৌঁছে, বড় বড় গাছ আর ঝোপ-ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে পায়ে চলা সরু একটা আঁকাবাঁকা ছায়াঘেরা পথ বেয়ে ভিতরে ঢোকে দেবু আর শিব। শিব এখানে এসেছিল আগের বছর, মাত্র একবার। আর দেবু এসেছিল তিন বছর আগে। ওদের গা কেমন ছমছম করে। যখনই এই জঙ্গলে ঢোকে এমনি ভাব জাগে মনে।

এ যেন আলাদা এক জগৎ। কী নির্জন! তবে এখানে প্রাণীর অভাব নেই। কত রকম শব্দ আসে কানে। পাখির কূজন, নানান কীটপতঙ্গের ডাক। গাছের নিচে, ডালে ডালে পাতায় পাতায়, খরখর সরসর ধ্বনি। কত অদৃশ্য জীবের চলাফেরার আভাস। শুধু মানুষই নেই।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নীলকুঠিতে পৌঁছল তারা। দোতলা কুঠিবাড়ির ইট বের হওয়া দেয়ালগুলো আজও খাড়া রয়েছে। বেশিরভাগ ঘরের ছাদ অবশ্য ভেঙে পড়েছে। কড়িবরগাগুলো খুলে নিয়ে গেছে লোকে।

প্রকাণ্ড বাড়ি ছিল এটা। ঘরের পর ঘর। দেবুরা নিঃশব্দে একটার পর একটা ঘরে ঢোকে। তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করে ভিতরটা। পাকা মেঝে ফেটে আগাছা ও ঘাস জন্মেছে। কোথাও কোথাও ভাঙা ইটের স্তূপ। সাবধানে ঘোরে তারা। এই বাড়ি, এই জঙ্গল সাপের আড্ডা।

প্রত্যেক বছর সাপুড়েরা এখান থেকে বিষাক্ত সাপ ধরে নিয়ে যায়। গত বছরই তাদের গ্রামে সাপ খেলাতে এসেছিল একজন সাপুড়ে। দেখিয়েছিল নীলকুঠি থেকে সদ্য ধরা প্রকাণ্ড এক গোখরো। কী ভীষণ গজরাচ্ছিল বন্দি সাপটা, এখনো শিবের চোখে ভাসে। শুধু গোখরো নয়, আরও আছে কেউটে ও বড় বড় চন্দ্রবোড়া। কাঁকড়াবিছেরও ডিবো এ বাড়ি। সাধে কি আর এখানে আসা নিষেধ। অতি বিপজ্জনক জায়গা।

কোনো সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। যাতে গুপ্তধনের হদিশ মিলতে পারে। তেমন কোনো খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্নও নেই। কোণের দিকে একটা ঘরে ঢুকে ওরা একটু অবাক হল। ঘরটা কিঞ্চিৎ সাফসুফ করা হয়েছে। মেঝেতে কয়েকটা পোড়া দেশলাইকাঠি এবং বিড়ির টুকরো ছড়ানো। কেউ বা কারা এখানে ছিল। হয়তো আসে এখানে মাঝে মাঝে। কিন্তু কেন?

বাড়ির সামনের দিকে উঁচু চওড়া বারান্দায় দেবুরা কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করল। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠল। সিঁড়ির বাইরে অবশ্য পা বাড়াবার উপায় নেই কারণ মেঝে ভাঙা বা ধসে

পড়েছে। ওরা ঘাড় বাড়িয়ে দেয়ালের ফোকরগুলোয় যথাসম্ভব দেখল। কিন্তু কিছু নজরে পড়ল না।

এরপর দেবু শিব ফের জঙ্গলে ঢুকল। অতীতের বাগান, এখনকার জঙ্গলে এক ধারে চারটে মস্ত মস্ত ইট বাঁধানো আগেকার নীল ভেজানোর চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চার ভিতর কাঁটা ঝোপের বন। সাপখোপের ভয়ে দুজনের হাতেই মোটা লাঠি। লাঠি দিয়ে আগাছা সরিয়ে উঁকি দিল চৌবাচ্চার ভিতরে। নাঃ কিছু নেই। দুজনে ঘুরতে ঘুরতে হাজির হল পুকুর পাড়ে।

জঙ্গলের মাঝামাঝি জায়গায় পুকুরটা। মস্ত পুকুর, প্রায় দিঘি বলা যায়। গভীর খুব। সারা বছর জল থাকে। এই গ্রীষ্মকালেও বেশ জল। পুকুরের চারধারে চারটে বাঁধানো ঘাট। ঘাটের সিঁড়িগুলো আজও বেশ মজবুত। কালচে সবুজ নিথর জল। লম্বা লম্বা গাছের ছায়া পড়েছে জলে। জলে কয়েক জায়গায় শালুক লতার বন। গোল গোল পাতা ভাসছে। মাথা তুলে আছে শালুক কুঁড়ি এবং কয়েকটি পাপড়ি মেলা গাঢ় লাল ফুল। জল ঘেঁষে পাড়ের কিনারে কলমি শাকের ঝাড় এবং বড় বড় ঘাস।

পুব দিকের ঘাটে দাঁড়িয়ে দেবু শিব পুকুর দেখল খানিকক্ষণ। কয়েকটা ঢিল ছুড়ল জলে। হঠাৎ মুখ তুলে তাকিয়ে শিব 'বাপ্‌রে' বলে লাফিয়ে সরে গেল। ঘাটের গায়েই একটা বড় আম গাছ। তার একটা নিচু ডালে ঝুলছে বিড়াট এক মৌচাক। পাতার আড়ালে থাকায় চট করে নজর পড়ে না মৌচাকটা। গাছটায় আম ধরেছে। আম পাড়তে ঢিল চালালেই হয়েছিল আর কী।

দুপুরে টঙে চড়া সূর্য পশ্চিমে হেলেছে। এবার জঙ্গল থেকে বেরোনো দরকার। এখানে বিকেল নামতে না নামতেই অন্ধকার হয়ে যায়। নানা দিক থেকে অনেক শুঁড়ি পথ ঝোপজঙ্গল ভেদ করে এসে পুকুর বা কুঠিবাড়ি ছুঁয়েছে। তারই একটা ধরে দুজনে ফিরে চলল।

একটা ঝমঝম আওয়াজ। থমকে দাঁড়ায় দেবুরা। দেখে, মস্ত এক শজারু ছুটে চলে গেল। এ বনে গোসাপও নাকি আছে। সাঁওতালরা শিকার করেছে কয়েকবার।

নীলকুঠির জঙ্গল থেকে বেরিয়ে দু'পা গিয়েছে, পিছনে সাইকেলের বেল-এর আওয়াজ। ফিরে ভূত দেখার মতন আঁতকে উঠল দেবু ও শিব। ভোলা সাধুখাঁ এবং নিমাই মান্না। বোধহয় গঞ্জের বাজার থেকে ফিরছে। দেবুদের দেখামাত্র তারা সাইকেল থেকে নেমে পড়ল।

ভোলানাথ শিবকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করে ধমকে উঠলেন — অ্যাই, এই জঙ্গলে ঢুকেছিলি কেন?

— আজ্ঞে, গাব পাড়তে।

— বটে, বাড়িতে জানে?

শিব চুপ।

ভোলানাথ কড়া সুরে বললেন, — লেখাপড়া নেই, ভর দুপুরে টো টো হচ্ছে — এই সাপখোপের আড্ডায়। ফের যদি দেখি এখানে, তোর বাবাকে বলে দেব ঠিক।

নিমাই বলল, — ছেলেটা কে?

অভয় দত্তর ছেলে।— জবাব দেন ভোলানাথ।

মানে তারক দত্তর ভাইপো? — ভুরু কোঁচকায় নিমাই।

—হুঁ। মহা বদমাশ ছোকরা। ওর জ্বালায় গাছে ফল-পাকুড় রাখা দায়। আরে গত বছরের আগের বছর আমার গাছ থেকেই এক ঝুড়ি বোম্বাই আম সাফ করে দিয়েছিল। আমার ভাইপো নেলোটাও এর সঙ্গে মিশে নষ্ট হচ্ছে।

ভোলানাথ দেবুর দিকে তাকিয়ে বললেন,— তা তুমি আবার এর সঙ্গে জুটেছ কেন? তোমায় তো ভালো ছেলে বলে জানতাম।

নিমাই মান্না মুখ ভেটকে মন্তব্য ছাড়ল,— দাদা, আজকালকার ছেলেপেলেগুলো যা হয়েছে না। বাঁদর স্রেফ বাঁদর। বাড়িতে শাসন নেই যে। আরে বাবা, মাঝে মাঝে এক প্রস্থ ধোলাই না পড়লে কি আর ছেলে মানুষ হয়?

যা যা শিগগির বাড়ি যা। — বলে ভোলানাথ সাইকেলে উঠলেন, দেখাদেখি নিমাইচরণও। পথটা কিছু দূর গিয়ে দু-ভাগ হয়ে গেছে। ভোলানাথ চললেন দেবুদের গ্রাম ফুলডাঙার দিকে আর নিমাইচরণ ধরল মথুরাপুরের পথ।

শিব গোঁজ মেরে দাঁড়িয়েছিল। তার চোখ দুটো যেন জ্বলছে রাগে। দেবু ওর পিঠে হাত দিয়ে বলল, — কী রে, খুব চটেছিস?

শিব ফেটে পড়ল, — লোকটা কি মিথ্যুক দেখলি? মোটে দুটো আম পেড়েছিলাম ওর গাছ থেকে — ঢিল ছুঁড়ে, আর বলে কিনা এক ঝুড়ি। আর নেলোকে আমি নষ্ট করছি! ও বেটা শয়তানের ধাড়ী। আমায় তাতায় আর নিজে ভালো মানুষ সেজে থাকে। ওই আমাকে ওর জ্যাঠার গাছ থেকে আম পাড়তে বলেছিল। দিতাম ঠিক মুখের মতন জবাব, নেহাত বাবাকে বলে দেবে বলল এইখানে আসার কথা, তাই আর ঘাঁটালাম না। কিন্তু যা রাগ হচ্ছিল না, কী বলব! আবার জ্ঞান দেয়, পড়াশুনা নেই। তা তোমার কী? নিজে তো বিদ্যেদিগ্‌গজ।

আর নিমাই মান্নার কথাটা শুনলি? ছেলে মানুষ করার ফরমুলা আওড়ায়। ওই ধোলাই যেদিন নিজে খাবে পুলিশের কাছে, তখন বুঝবে ঠেলা। — শিব রাগে ফুলতে থাকে।

দেবু সান্ত্বনা দিল, — হ্যাঁ লোকদুটো বাজে। কিন্তু ওদের আসল মতলবটা বুঝলি? আমাদের ধমকে ভয় দেখাল, যাতে এই নীলকুঠিতে আর না আসি। এই জন্যেই এত চোটপাট ভেবেছে আমরা খুব ঘাবড়ে গেছি— আর এ পথ মাড়াব না! হুঁ হুঁ, অত সহজে ছাড়ছি না। ঠিক হ্যায় শিব, কাল ভোর থেকে তুই ভোলাদার বাড়ির ওপর নজর রাখবি। তোরই সুবিধে। তোর বাড়ি কাছে। ভোলাদা বেরুবার পরই আমায় খবর দিবি। ওরা কুঠির জঙ্গলে ঢুকলে পর আমরা ঢুকব লুকিয়ে লুকিয়ে।

তিন

বৃহস্পতিবার। সকাল সাতটা নাগাদ ভোলানাথ সাধুখাঁ সাইকেল সমেত বাড়ি থেকে বেরোলেন। তার সাইকেলে বাঁধা লম্বা হুইল ছিপ এবং কাঁধে একটা ঝোলা। একবার রাস্তার দু-পাশটা দেখে নিয়ে ভোলানাথ সাইকেলে উঠে জোর প্যাডেল মারলেন।

শিব তাদের দোতলার জানলা থেকে ঠায় লক্ষ রাখছিল। সে ভাবল, বাঃ খাসা বুদ্ধি। ভোলাদার মাছ ধরার শখ আছে সবাই জানে। ভাবখানা যেন, মাছ শিকারে চলেছেন কোথাও।

নীলকুঠির জঙ্গলে ঢুকতে দেখলেও কৈফিয়ৎ দেওয়া যাবে। ওখানকার পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাবা, আমাদের ফাঁকি দিতে পারবে না।

ভোলানাথ চলে যাওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে শিব দেবুর বাড়ি হাজির হল এবং আধঘণ্টার মধ্যে তারা গ্রামের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

আকাশটা মেঘলা করেছে। অনেক দূরে দুটি লোক সাইকেলে চেপে নীলকুঠির গা ঘেঁষে ঘুরে অদৃশ্য হল। দেবুরাও রওনা হল নীলকুঠির উদ্দেশে।

মাঠে মাঠে, আলের নিচ দিয়ে, যতটা সম্ভব গা ঢাকা দিয়ে ওরা নীলকুঠিতে পৌঁছল। জঙ্গলে ঢুকে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে এগোল। প্রথমে তারা যাচ্ছিল কুঠিবাড়ির দিকে। কানে এল পুকুরের দিক থেকে কথাবার্তার আওয়াজ। ওরা তখন পথ বদলে পুকুরের দিকে চলল।

বড় বড় গাছের তলা দিয়ে, ঝোপের ফাঁক দিয়ে এগোয় দুজনে। শেয়ালকাঁটায় নাক মুখ ছড়ে যাচ্ছে। গা চুলকাচ্ছে। ক্রমে পুকুরটা নজরে এল। গুড়ি মেরে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেবুরা অবাক।

হাত কুড়ি তফাতে, জলের ধারে ফাঁকায় ঘাসের ওপর বসে গম্ভীর মুখে বিড়ি টানছে নিমাই মান্না, আর পাশে ভোলানাথ ছিপ ফেলার আয়োজন করছেন। সত্যি সত্যি ছিপ ফেলবে নাকি! তা ফেলতে পারে। যদি হঠাৎ কেউ আসে ভাববে সত্যি মাছ ধরতে এসেছে। ছিপটা মাটিতে আটকে রেখে এরপর ঠিক দুজনে যাবে আসল কাজে।

ওরা দেবুদের দিকে পিছন ফিরে রয়েছে। ছিপটা দুলিয়ে ভোলানাথ বঁড়শি ফেললেন জলে। বসলেন স্থির হয়ে। নিমাইচরণ এবং ভোলানাথ দুজনেরই দৃষ্টি জলের দিকে। দেবুরাও কাঠ।

এমনিভাবে মিনিট পনেরো কাটল। ভোলানাথদের ওঠার নাম নেই। সেই নটনড়নচড়ন ভঙ্গি। শিবদের অবস্থা কাহিল। সারা গা চুলকোচ্ছে, জ্বলছে। মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল বসে আছে ঠায়। ব্যাপারটা কী! ওরা উঠছে না কেন? আর কতক্ষণ এই ভান করবে।

হঠাৎ ভোলানাথ একবার ওপরে তাকিয়ে নিচু স্বরে বললেন,— আকাশের গতিক সুবিধের নয় হে। বৃষ্টি আসছে, ঝড়ও আসতে পারে। আজ আমাদের বরাত খারাপ।

নিমাইচরণ আকাশের পানে একবার উদ্বিগ্ন ভাবে চেয়ে আওয়াজ ছাড়ল —হুঁ।

আরও মিনিট কুড়ি কাটল। আকাশ কালো হয়ে উঠেছে। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকল বারকয়েক। ভোলানাথ বলে উঠলেন, — আজ আর নয় হে, ওঠা যাক। এমন দিনে মাছ গাঁথবে না। বৃষ্টি এলে স্রেফ ভিজতে হবে। এখানে গাছতলা ছাড়া মাথ গোঁজার উপায় নেই ত্রিসীমানায়।

তিনি ছিপের সুতো গুটোতে শুরু করলেন। হুইল ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন— আচ্ছা নিমাই, সেদিন হারু এখানে এসেছিল কী কত্তে?

নিমাইচরণ তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। একটু বিরক্তভাবে বলল,— বললাম তো সেদিন, শাকপাতা তুলতে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক। সত্যি এ পুকুরে এত বড় মাছ আছে কে জানত! আমি এখানে

আসিনি আগে। জায়গাটা ভালো নয় শুনেছি, তাই। তাছাড়া তিন বছর আগে মুখুজ্যেবাবুরা জাল ফেলে সব মাছ ধরে নিয়ে গেছলেন, শুনেছি। যাক্, হারু যখন নিজের চোখে দেখেছে—

পুকুরটার জলে খুব শাপলা হয়েছে। সুতো জড়িয়ে যেতে পারে। তোলা একটু কঠিন। তবে একবার আমার বঁড়শি গিললে আর নিস্তার নেই— বাছাধনকে ঠিক তুলব। মনে আছে নিমাই, আশি সালে বাঘাটি বিলে সের দশেকের একটা কাতলা তুললাম খেলিয়ে। সে বিলটায় তো এর চেয়েও বেশি ঝাঁঝারি ছিল।

নিমাইচরণ অধৈর্য ভাবে বলে উঠল, — তা আবার আসবে কবে? কাল পরশু তরশু আমার কিন্তু কাজ আছে।

ভোলানাথ বললেন,— বেশ সোমবার ফের ট্রাই করব। ভালোই হল। ক'দিন সময় মিলবে। কয়েকটা জিনিস জোগাড় করতে হবে। একটা স্পেশাল চার বানাব। এ যা পুকুর আর হারু যা সাইজ বলছে—। তাড়াহুড়োয় কাজ কী? হারু ছাড়া আর তো কেউ জানে না।

নিমাই মান্না একটু ইতস্তত করে বলল, — তাই তো মনে হয়—

— মনে হয় কেন? সেদিন যে বললে কেবল হারু দেখেছে।

—মানে তখন আর একটা বাগাল ছেলেও কাঠ কুড়োচ্ছিল এই জঙ্গলে। তবে মনে হয় না সে দেখেছে। মাত্র একবার লাফিয়েছিল যে মাছটা। তাছাড়া দেখলেই বা কী? খবরটা ঠিক জায়গায় পৌঁছলে তবে তো। মানে আমাদের মতো মাছ মারিয়েদের কানে। তা নইলে আর বিপদ কী?

তা বটে, তা বটে।—সায় দিলেন ভোলানাথ।

নিমাই বলল,—হারু শ্বশুর বাড়ি গেছে। ছুটি চাইল কাল। দিয়ে দিলেম। কাকে আবার নেশার ঝোঁকে গল্প-টল্প করে বসবে। ও এখানে না থাকলেই নিশ্চিন্তি।

ঠিক ঠিক। — বললেন ভোলানাথ, এখন যাবে কোথায়, আমার বাড়ি?

আকাশের দিকে চেয়ে নিয়ে নিমাই বলল,— না বরং আমার বাসায় চল, কাছে হবে।

ভোলানাথ ও নিমাইচরণ গোছ-গাছ করে তৈরি হলেন। কাছেই গাছের গায়ে তাদের সাইকেল ঠেসান দেওয়া ছিল। তাতে ছিপ বেঁধে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে জঙ্গলের পথ ধরে তাঁরা অদৃশ্য হলেন।

দেবু শিব হাঁ হয়ে শুনছিল সব কথা। মাঝে মাঝে চোখাচোখি করছিল নীরব বিস্ময়ে।

ভোলানাথদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই দেবু ফোঁস করে উঠল,—অ্যাঁ! এই ব্যাপার, মাছ! তাই এত লুকোচুরি।

শিব বলল, — ইস্, আমরা ভাবছিলাম কি না কি গুপ্তধন।

দেবু বলল, — গুপ্তধনই বটে, মানে মেছুরেদের কাছে। তবে তোকে যখন অপমান করেছে, ওদের এখানে মাছ ধরা আমি ভন্ডুল করব।

শিব বলল, — কী করে?

দেখি, একটু ভেবে। কিছু একটা বের করব ঠিক। এখন চল, তাড়াতাড়ি, বৃষ্টি এসে গেল। —তাড়া দিল দেবু।

দুজনে নীলকুঠির জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মারল ছুট। প্রায় যখন পৌঁছেছে গ্রামে, ঝেঁপে বৃষ্টি নামল, সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস।

বিকেলে দেবু শিবকে দেখেই এক গাল হেসে নিজের মাথায় একটা টোকা দিয়ে বলল— এসে গেছে।

— কী?

— একখানা মোক্ষম আইডিয়া। আচ্ছা তোর কাকার তো খুব মাছ ধরার শখ। বড় মাছ ধরতে গেলে কী কী লাগে জানিস?

— কী আবার। এই ধর হুইল ছিপ, নাইলন সুতো, বঁড়শি, চার—

— একটা ছিপ জোগাড় করতে পারবি? হুইল-টুইল নয়। ছোট কঞ্চির ছিপ।

— খুব পারব। আমাদের বাড়িতে অনেকগুলো আছে।

— বেশ, ওটা নিয়ে হাটে যাব রোববার সকালে। তোর পিসিমার জন্যে জর্দা কিনতে বাজারে যেতে হবে বলছিলি, সেই কাজটারই অজুহাত দিস বাড়িতে। ফেরার সময় এক কৌটো কিনে আনিস মনে করে।

কেন, ছিপ নিয়ে হাটে কি করতে। — শিব উদ্দেশ্যটা ধরতে পারে না।

এখন নয় সেদিন যাওয়ার পথে বলব প্ল্যানটা। — দেবু রহস্যময় হাসে।

চার

রবিবার। গঞ্জের হাট বসেছে। আশপাশের আট-দশখানা গ্রামের লোক আসে বেচাকেনা করতে।

দেবু ও শিব হাটে পৌঁছল সকাল দশটা নাগাদ। পথে হাটমুখো একটা গরুর গাড়ি পেয়ে দু'জনে চড়ে বসেছিল। তাই পুরোটা হাঁটতে হয়নি।

গমগম করছে হাট। দেবুরা একধারে দাঁড়িয়ে এদিক-সেদিক লক্ষ করে। হঠাৎ দেবু বলল, — ওই দেখ শিব, পলাশগাঁয়ের হরি মোড়ল। যা ধর ওকে।

হরিপদ মণ্ডল ওরফে হরি মোড়লের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। মাথায় খাটো, নাদুস-নুদুস শ্যামবর্ণ। অতি ধীর স্থির। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাছের আশায় ফাতনার দিকে তাকিয়ে বসে সারাটা দিন কাটিয়েও যদি শূন্য হাতে ফিরতে হয় তখনো দিব্যি হাসি মুখে থাকেন। হরি মোড়ল বাজারের থলি হাতে ধীরে সুস্থে চলছিলেন। তাঁর নজর মাটিতে নামানো ব্যাপারিদের আনাজের ঝাঁকায়— কচি পটলের খোঁজে।

— হরি কাকা।

ডাক শুনে হরি মোড়ল ফিরে দেখলেন ফুলডাঙার অভয় দত্তর ছেলে শিব। তার হাতে একটা ছোট ছিপ।

হরি মোড়ল বললেন,—কি রে?

আচ্ছা কাকা, বঁড়শি কোথায় কিনতে পাওয়া যায়? মানে বড় মাছ ধরার মতো বঁড়শি। — উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল শিব।

— কেন রে, বড় মাছ ধরার বঁড়শি নিয়ে কী করবি?

একটা মস্ত মাছ ধরব। এই এত্তো বড়। — শিবু-দু-হাত ছড়িয়ে মাপ দেখায়।

বটে বটে, তা অত বড় মাছ পেলি কোথায়? দেবে তোকে ধরতে? — হেসে বললেন হরি মোড়ল।

কেন দেবে না? — বলল শিব : ওই নীলকুঠির পুকুরে আছে। ওখানে ধরলে তো কেউ নিষেধ করে না।

—নীলকুঠির পুকুরে, অত বড় মাছ! ঠিক জানিস?

— হ্যাঁ হ্যাঁ।

— কে বলল?

— আমার বন্ধু দেখেছে নিজের চোখে। জল ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছিল মাছটা। আমি তখন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলাম তাই দেখতে পাইনি, তবে শব্দটা শুনেছি। খুব জোরে ঝপাং করে আওয়াজ।

— ওখানে গিয়েছিলি কী কত্তে?

শিব মাথা চুলকে বলল,— গাব পাড়তে।

ও! মোড়লমশাইয়ের মুখে সেই তাচ্ছিল্য মাখানো হাসি উবে গেছে। বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, — কবে গিছলি?

— আজ্ঞে কাল।

হরি মোড়ল একটু চিন্তা করে জানালেন, — বড় মাছ ধরার বঁড়শি তো এখানকার দোকানে পাওয়া যায় না। আমি কামারকে দিয়ে গড়াই। তা তোর জন্যে একটা গড়িয়ে রাখব'খন। আসছে শনিবার আসিস আমার বাড়ি।

বলতে বলতে তিনি পা বাড়ালেন অন্যমনস্ক ভবে। কচি পটলের দিকে আর তাঁর মন নেই।

হাটের এক কোণে অপেক্ষা করছিল দেবু। শিব ফিরতেই জিজ্ঞেস করল—কী?

শিব এক গাল হেসে জানাল, — মনে হল টোপ গিলেছে।

গুনুটি গ্রামের বজ্রপাণি ফৌজদার বেশ দশাসই পুরুষ। তাঁর গলার আওয়াজ যেমন বাজখাঁই, মেজাজটিও তেমনি চড়া। বজ্রপাণির মাছ ধরার নেশা। তবে সারাদিন ঠায় জলের ধারে বসে যেদিন তাঁর শিকার মেলে না সেদিন বেজোদা ওরফে বজ্রপাণির ধারে কাছে কেউ ঘেঁষে না অনর্থের ভয়ে। বেজোদা ছিপ ফেললে সেই পুকুর পাড়ে তিনি ছাড়া আর কারও কথা বলার উপায় নেই।

অনেক দর কষাকষির পর একটা মস্ত পাকা কুমড়োকে সস্তায় কব্জা করে, থলিতে পুরে বজ্রপাণির মনটা যখন ভারি খুশি ঠিক তখনই ডাক শুনলেন — বেজোদা।

মুখ ফিরিয়ে কে ডাকছে দেখে বেজোদা বললেন, — তুই শিব না? অভয়দার ছেলে? ভাল ফুটবল খেলিস?

— আজ্ঞে হ্যাঁ বেজোদা।

— কী ব্যাপার, ডাকলি কেন?

একটু আমতা আমতা করে শিব বলল,— আচ্ছা বেজোদা, খুব বড় মাছ ধরতে কীসের চার ছাড়া হয় জলে? আর টোপ কী দেব?

খু-উ-ব বড় মাছ। তুই ধরবি? অ্যাঁ!— শিবের হাতে পুঁটি মাছ ধরার ছোট্ট ছিপখানার দিকে তাকিয়ে বেজোদা হো হো করে অট্টহাসি জুড়লেন। পাশের লোক চমকে তাকাল তাদের দিকে।

বেজোদা গাঁক গাঁক করে বললেন, — তা তোর কাকাকে জিজ্ঞেস করলেই তো বলে দিত।

— না না, ছোটকাকা আমায় মাছ ধরতে দেয় না। বলে, সময় নষ্ট। পড়াশুনোর ক্ষতি। কিন্তু এ মাছটা আমি ছাড়ছি না।

কোন্ মাছটা? কোথায়? — বেজোদা কৌতূহলী হলেন।

— নীলকুঠির পুকুরে। এই এত্তো বড়ো রুইমাছ। দশ পনেরো সেরের কম নয়।

অ্যাঁ!— বেজোদার গলার স্বর হঠাৎ নেমে এল। জিজ্ঞেস করলেন, — কে বলল?

আমার এক বন্ধু দেখেছে। নিজের চোখে। কাল আমরা গাব পাড়তে গিছলাম ওই জঙ্গলে, তখন। ঘাই মেরে লাফিয়ে উঠেছিল মাছটা।

— তুই দেখিসনি?

— আমি? না। আমি তখন অন্য দিকে চেয়েছিলাম। কিন্তু মাছটার জলে পড়ার আওয়াজ শুনেছি — ঝপাং করে, কী জোর শব্দ হল!

এই মাছটার কথা আর কেউ জানে নাকি? — উদ্বিগ্ন সুরে প্রশ্ন করলেন বেজোদা।

— কে আর জানবে? কেই বা যায় ওখানে। আমরা দেখে ফেলেছি দৈবাৎ।

হুম্! — গোঁফ চোমরাতে চোমরাতে বেজোদা মাতব্বরি ঢঙে বললেন : তা তোর কাকা বলে ঠিকই। মাছ ধরায় বড্ড সময় নষ্ট হয়। বড় বাজে নেশা। তোরা এখন স্টুডেন্ট। তোদের এখন এ শখ না করাই উচিত। তবে ইচ্ছে যখন হয়েছে, একবার চেষ্টা করতে পারিস। কিন্তু ভালো চার বা টোপ তো বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। ঘরে বানাতে হয়। অনেক হ্যাঙ্গাম। এর পরের রোববার আসিস হাটে। তোকে আমার বানানো খানিকটা চার আর টোপ দেব। ঠিক আছে, এখন যা।

বেজোদা ব্যস্ত ভাবে বিদায় নিলেন।

সালামপুরের আকবর আলি প্রবীণ লোক। বয়স ষাট পেরিয়েছে। একহারা দীর্ঘ চেহারা। ফর্সা রং। লম্বাটে নাকের ওপর গোল পিতলের ফ্রেমের চশমা। থুতনিতে একগুচ্ছ সাদা ধবধবে দাড়ি। মুখখানা হাসি হাসি। মেছুরে হিসেবে আলিসাহেবের খুব নাম ডাক। তবে আজকাল আর স্পেশাল মাছের সন্ধান না পেলে শিকারে যান না। ধকল পোষায় না শরীরে। আলিসাহেব অনেকক্ষণ হাটে ঘুরছেন। রোদ চড়ছে। বগলের ছাতাখানা খুলবেন কিনা ভাবছেন, এমন সময় ডাক শুনলেন, — চাচা।

একটু ঝুঁকে ছেলেটিকে দেখে আলিসাহেব বললেন, — তুই ফুলডাঙার মাখন মজুমদারের ছেলে না? আগের বছর দেখেছি! তোদের বাড়িতে গিছলাম যখন। কী নাম জানি তোর? ভুলে গেছি।

উত্তর হল, — আজ্ঞে, আমার নাম দেবু।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক। মনে পড়েছে। তা ডাকলি কেন?

— আচ্ছা চাচা, হুইল ছিপ কিনতে কত লাগে? কোথায় পাওয়া যায়?

— কেন রে হুইল ছিপ নিয়ে কী করবি?

—একটা খুব বড় মাছ ধরব। হুইল ছিপ ছাড়া তো ধরা যাবে না। আমার তেমন ছিপ নেই। আমার জমানো পয়সা আছে, তাই দিয়ে কিনব।

— বড় মাছ! কোথায় রে?

— ওই নীলকুঠির পুকুরে।

—নীলকুঠির পুকুরে বড় মাছ আছে, কে বলল?

আমি নিজের চোখে দেখেছি। — অম্লান বদনে জানায় দেবু : ওই জঙ্গলে আম পাড়তে গিছলাম পরশু, তখন দেখলাম। এই বিরাট! টকটকে রং। পাকা রুই। পনেরো-বিশ সেরের কম হবে না। জল থেকে লাফিয়ে উঠেছিল মাছটা।

আলিসাহেবের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। বললেন, — ঠিক দেখেছিস?

— আজ্ঞে হ্যাঁ চাচা, স্পষ্ট।

আলিসাহেব তাঁর দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, — বড় মাছ কিছু ধরেছিস আগে?

— আজ্ঞে না।

— কী ধরেছিস?

— আজ্ঞে পুঁটি আর চারাপোনা।

— ব্যস্, এবার এক লাফে বিশ সেরে উঠবি— হুইল ছিপে। তোর আশা বলিহারি। ওরে, অত সোজা নয়। শুধু দামি ছিপ কিনলেই হয় না। সাধনা চাই। একটু একটু করে রপ্ত করতে হয় এই বিদ্যে। অনেক আঁটঘাট জানতে হয়। কেবল হুইল ছিপে কী হবে? তেমন মাছের পাল্লায় পড়লে আনাড়ির হাত থেকে এক টানে ছিপ নিয়ে চলে যাবে জলে।

দেবু হতাশ মুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

আলিসাহেব দেবুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, — মাছ ধরা শিখতে চাস তো আসচে রোববার কালী সায়রে আয়। ওখানে বসব সেদিন। তোকে দেখিয়ে-টেখিয়ে দেব হাতে কলমে। যা যা বাড়ি যা। এখনই হুইল টুইল কিনে মিছিমিছি পয়সা নষ্ট করিসনি। মন খারাপ করিসনি। চেষ্টা থাকলে একদিন ঠিক পারবি।

দেবুর গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে আকবর আলি বিদায় নিলেন।

পাঁচ

সোমবার। সকাল প্রায় সাতটা।

শিব ও দেবু নীলকুঠির জঙ্গলে একটা মস্ত বটগাছে চড়ল। অনেকটা উঠে মোটা ডালের খাঁজে পাতার আড়ালে বসল জুত করে। ওখান থেকে পুকুরের চারধার পরিষ্কার দেখা যায়। দেবু পকেট থেকে এক টুকরো আমসত্ত্ব বের করে আধখানা নিজের মুখে পুরল, বাকিটুকু শিবের হাতে দিয়ে বলল— নে। দেখি কতক্ষণে আসে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মিনিট পনেরো বাদেই শোনা গেল পায়ের শব্দ। জঙ্গল থেকে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে পুকুর ধারে এসে হাজির হলেন ভোলানাথ সাধুখাঁ এবং নিমাই মান্না। ভোলানাথ একবার চারপাশটা দেখে নিয়ে খুশির সুরে বললেন,—

—বাঃ, চমৎকার নিরিবিলি। হুঁ আজ চার আর টোপ যা এনেছি বাছাধনকে একেবারে পাঁচ মিনিটের মধ্যে টেনে আনব বঁড়শির ডগায়।

ভোলানাথ দেখেশুনে পুব ধারের ঘাটের গায়ে বসলেন। প্রথমে তিনি কৌটো থেকে চার বের করে জলে ছাড়লেন। একটু অপেক্ষা করে বঁড়শিতে টোপ গেঁথে সুতো দুলিয়ে ছিপ ফেললেন জলে। অতঃপর গম্ভীর মুখে ফাতনার ওপর নজর রেখে স্থির হলেন। তাঁর পিছনে বসে উদ্বিগ্ন মুখে বিড়ি টানতে লাগল নিমাইচরণ।

দশ মিনিটও কাটেনি। জঙ্গলের ভিতর পায়ের শব্দ।

ভোলানাথ এবং নিমাইচরণ স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন, উল্টোদিকের গাছপালা ভেদ করে, সরু পথ দিয়ে বেরিয়ে এল দুটি লোক— হরি মোড়ল এবং পিছনে হরি মোড়লের বন্ধু বৈকুণ্ঠ সরকার। হরি মোড়লের হাতে হুইল ছিপ, কাঁধে থলে। সরকারমশায়ের দুই বগলে দুটি বেঁটে সাইজের মোড়া।

ভোলানাথদের দেখে হরি মোড়লের দলও কম অবাক হয়নি। বোকার মতন দুই পার্টি দু'দলের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর দুদলই বিড়বিড় করে নিজেদের মধ্যে কী সব পরামর্শ করল। তাদের চোখমুখের ভঙ্গি দেখে বোধ হচ্ছিল দু'দলই বেজায় বিরক্ত এবং অস্বস্তিতে পড়েছে।

হরি মোড়লই প্রথমে সামলে নিলে। ভুরু কুঁচকে চারধারটা দেখে নিয়ে, হেঁটে গিয়ে পুকুরের দক্ষিণ ধারে একটু পুব দিক ঘেঁষে একটা জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়ালেন। পুকুরের এই দিকটায় বড় গাছ বা ঝোপ খুব কম। সরকারমশাই তৎক্ষণাৎ সেখানে মাটিতে একটা খোঁটা পুঁতে তাতে একখানা খোলা ছাতা বাঁধলেন। তার নিচে রাখলেন একখানা মোড়া।

হরি মোড়ল জলে চার ফেললেন। কিছুক্ষণ পরে ফেললেন ছিপ। তারপর ছাতার নিচে মোড়ায় বসে ফাতনার দিকে নজর আটকালেন। সরকারমশাই একটু দূরে গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে মোড়ায় বসে মুখে দু-খিলি পান ঠুসে দিলেন।

হরি মোড়ল এবং ভোলানাথ দুজনেই নট নড়নচড়ন হাঁড়িমুখ। তবে বোঝা যায় আড় চোখে পরস্পরের দিকে নজর রাখছেন। শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী মেছুরের ওপর নয়, তার ফাতনার ওপরেও খর দৃষ্টি।

এইভাবে আধঘণ্টা কাটল। সহসা জঙ্গলের মধ্যে আবার পায়ের শব্দ। শব্দ ক্রমে কাছে আসে। গুরুভার পায়ের চাপে শুকনো পাতা ও কাঠির আর্তনাদ। হেঁড়ে গলায় গানের আওয়াজ। এরপরই ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বিপুলবপু বেজোদার আবির্ভাব। পিছনে পিছনে একটি মাথায় খাটো রোগা ব্যক্তি— ডাবুদা। সবাই জানে এই ডাবুদা হচ্ছেন বেজোদার 'ফ্রেন্ড ফিলসফার অ্যান্ড গাইড।' শুধু মাছ ধরা নয়, প্রায় সব ব্যাপারেই ডাবুদার পরামর্শ ছাড়া বেজোদা অচল। অন্যদের ওপর বেজোদা যতই দাপট দেখাক না কেন ডাবুদার কাছে একেবারে কেঁচো। নানান ভুলের জন্য বেজোদাকে ডাবুদার কাছে হরদম বকুনি খেতে হয়।

অ্যাঁক! পুকুরে ধারে ছিপ ফেলা দু দলের দিকে চেয়ে বেজোদার গান আচমকা আটকে গেল।

একী! কী ব্যাপার! — গ্যাঁক গ্যাঁক করে ওঠেন বেজোদা।

হরি মোড়ল ভোলানাথ ইত্যাদিরা চারজন হাঁ হয়ে বেজোদাকে দেখতে থাকে।

আরে হরিদা, তোমরা কী কচ্চ এখানে? — বেজোদার প্রশ্নের গমকে একঝাঁপ ছাতারে পাখি উর্ধ্বশ্বাসে উড়ে পালাল।

দেখছই তো ভাই মাছ ধরছি। — হরি মোড়ল মিষ্টি হেসে জবাব দিলেন।

— হুম্। তা এখানে মাছ আছে?

— কে জানে। তোমার কী মনে হয়?

আমার? হুম্।— বেজোদা আর কথা খুঁজে না পেয়ে ডাবুদার মুখের দিকে তাকালেন।

ডাবুদা ভুরু কুঁচকে দেখছিলেন ব্যাপার। কথা না বলে একটু ঘাড় নাড়লেন কেবল।

বেজোদা হাতির মতো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলতে লাগলেন। বোধহয় ভেবে পাচ্ছিলেন না, এবার কী কর্তব্য। নিচু সুরে ডাবুদা কী জানি বলতেই চলমান হলেন।

ধুপ্‌ধাপ্ করে পা ফেলে এদিক সেদিক বেড়িয়ে তিনি পুকুরের দক্ষিণ দিকে হরি মোড়লের কাছ থেকে হাত পঁচিশ-তিরিশ তফাতে একটা জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়িয়ে ডাবুদার দিকে তাকালেন। ডাবুদা ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে বোঝালেন, হুঁ চলবে।

ব্যস্, সেখানেই তোড়জোড় করে ছিপ ফেললেন বেজোদা। ডাবুদা একটিপ নস্যি নিয়ে, একখানা জোরে হাঁচি দিয়ে, বেজোদার কাছে বসে পড়ে, পকেট থেকে একটা চটি বই বের করে পড়তে শুরু করলেন।

তিন মাছ মরা পার্টি স্থির গম্ভীর। প্রত্যেকের নজর ঘুরছে তিন তিনটে ফাতনার ওপর। কার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে কে জানে?

নিমাই মান্না একবার কাশল। অমনি বেজোদার হেঁড়ে গলা,— আঃ আস্তে।

নিমাইচরণ কটমটিয়ে তাকাল। নেহাত অশান্তি হলে মাছ ধরা নষ্ট হবে, তাই আর কথা বাড়াল না।

হরি মোড়লের ছিপের ফাতনা ডুব দিল। অমনি টান হয়ে বসলেন মোড়ল। তাক বুঝে মারলেন খোঁচ। বঁড়শি গেঁথেছে। কারণ হুইল ঘর্ঘরিয়ে সুতো টেনে ছুটে চলল জলের নিচের জীব। জীবটি বৃহৎ সন্দেহ নেই — যা জোর টান।

হরি মোড়ল এবং তাঁর সঙ্গীর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত আর অন্য দুই শিকারির মুখ যেন চিরতা গেলা।

হুইল কষে সুতোর টান রুখতেই জলের ওপর ভুস করে ভেসে উঠল শিকার। ওমা এ যে একটা কচ্ছপ! — ছোটখাটো কড়াইয়ের সাইজ।

হোঃ হোঃ হেঃ হেঃ হোয়াক্ হোয়াক্ — বেজোদার অট্টহাসিতে ভড়কে গিয়ে একঝাঁক টিয়া ট্যাঁ ট্যাঁ করতে করতে উড়ল আকাশে।

দেবু শিব কোনোরকমে হাসি চাপল।

অপ্রস্তুত হরি মোড়ল মহা খাপ্পা হয়ে হুইল ঘোরাতে লাগলেন। হোক কচ্ছপ, ওটাকেই তুলব। কিন্তু হাত চারেক টেনে আনার পরই ফুস। কচ্ছপের দাঁতে যা ধার। কেটে নিয়েছে বঁড়শি সুদ্ধ সুতো।

হেঃ হেঃ হোঃ হোঃ! — বেজোদার আরেক দফা হাসি।

হরি মোড়ল খানিক গুম্ হয়ে থেকে ফের একটা বঁড়শি জুড়ে টোপ লাগিয়ে ছিপ ফেললেন জলে। তবে তাঁর মাছ ধরার উৎসাহ উবে গেছে। যেন পালাতে পারলে বাঁচেন। ভাবছেন বোধহয়, এই বঁড়শিটিও না গচ্চা যায়।

প্রায় এক ঘণ্টা কাটল।

তিন ফাতনাই মাঝে মাঝেই ডুব মারল। খোঁচা মারা হল বার কয়েক। কিন্তু কোথায় সেই বিশাল রুই! কেবল ভোলানাথ আড়াইশো গ্রাম মতো একটা চারা পোনা তুললেন। বাকিদের বরাতে তাও জুটল না।

ফের আওয়াজ। গাছপালার ভিতর দিয়ে পুকুরের দিকে আসছে কেউ। আবার কে!

সবুজরঙা চেক লুঙ্গির ওপর চিকনের কাজ করা আদ্দির পাঞ্জাবি, মাথায় নকশা তোলা সাদা টুপি— আকবর আলি পুকুর পাড়ে হাজির হলেন। তাঁর পিছনে একটি বছর পনেরোর ছেলের হাতে একটা লম্বা ছিপ ও একটা ঝোলা। ছেলেটা আলিসাহেবের ভাগনে।

হায় খোদা, এ যে মেলা বসে গেছে। আলিসাহেব হতবাক।

যা বলেছে। মেলাই বটে। গাছের ওপর ফিসফিস করল শিব : কারও আর তর সয়নি। শুনেই এসে গেছে।

ইস্ ভুল হয়ে গেল। — বলল দেবু : নন্দ জেলেক খবরটা দিলে আর দেখতে হত না। এক্কেবারে জাল কাঁধে হাজির হত। তাহলেই সোনায় সোহাগা।

আকবর আলির ভাগনে একখানা কাপড়ের আসন বের করে বিছিয়ে দিল ঘাসের ওপর। আলিসাহেব বাবু হয়ে বসলেন তাতে। তারপর তিন ছিপধারীর দিকে চেয়ে চিন্তিত মুখে দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন। গতিক বুঝছেন। বোধহয় ভাবছেন, এখানে ছিপ ফেলা উচিত হবে কিনা? ভাগনে পিছনে ছিপ হাতে খাড়া।

দেবু খোঁচা দিল শিবকে। শিব ফিরে চাইল। দেবু আঙুল তুলে দেখাল, বাঁ ধারে নিচের দিকে।

পুব দিকে ঝোপজঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে চার হাত পায়ে গুড়ি মেরে পুকুরের দিকে এগোচ্ছে একটা ছেলে। তার বয়স হবে সতেরো আঠারো। কালো রোগা মাঝারি লম্বা, পরনে মাত্র একখানা মালকোঁচা মারা গামছা। ছেলেটা এগোয়। থামে। বকের মতো ঘাড় বাড়িয়ে দেখে। আবার এগোয়।

এ আবার কে? দেবুরা থ।

নতুন ছেলেটা একটা বড় গাছের আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর কোমরে গোঁজা কিছু একটা হাতে নিল। শিবরা দেখল — গুলতি! গুলতিটা বাগিয়ে ধরে, রবার টেনে টিপ করে সে গুলি ছাড়ল। ফট্ করে শব্দ হল। মেছুরেদের তখন পরস্পরের দিকেই সমস্ত মনোযোগ, তাই শব্দটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাল না।

ফের একবার গুলতি ছুড়ল ছেলেটা। ফট্! কী জানি সে দেখল মন দিয়ে। নিঃশব্দে হাসল একবার। কালো মুখে ধবধবে দাঁতের সারি ঝিলিক দিল। তারপর সে যেমনি ভাবে এসেছিল, তেমনি করে সরে পড়ল নিঃসাড়ে। মিলিয়ে গেল ঝোপের ভিতর।

উরি ব্বাস্, দেখ্। — দেবু আঙুল দেখাল।

পুকুরের পুব ধারে ঘাটের কাছে আম গাছের মৌচাকটা থেকে গাদা গাদা মৌমাছি উড়তে শুরু করেছে। বোঁ-ও-ও আওয়াজ হচ্ছে।

বেটা গুলতি মেরেছে মৌচাকে — বলল শিব।

আধ মিনিটের মধ্যেই ক্ষিপ্ত মৌমাছির দল সার বেঁধে ধেয়ে চলল, জমাট ধোঁয়ার মতন। তাদের লক্ষ্যে ভোলানাথ ও নিমাই মান্না। ওই দুজনেই সব থেকে কাছে। মৌমাছিদের নিশ্চয়ই ধারণা হল যে এরাই তাদের খুঁচিয়েছে। অতএব এই জঘন্য আচরণের জন্য মানুষগুলোকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া দরকার।

— বাপ্‌রে।

আর্তনাদ এবং এরপরেই — ঝপাং ঝপাং। মাথার ওপর হঠাৎ ক্রুদ্ধ মৌমাছির ঝাঁক দেখে জলে লাফ দিলেন ভোলানাথ। নিমাইচরণও বুদ্ধিমানের মতো তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল। দুজনেই ডুব দিলেন জলে।

শিকার হাতছাড়া হওয়ায় আরও খাপ্পা মৌমাছিরা এবার ছুটল হরি মোড়লকে তাগ করে।

মোটা মানুষ হরি মোড়ল যে এমন দৌড়াতে পারেন, না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। মুহূর্তে তিনি গা ঢাকা দিলেন ঝোপের ভিতরে। তাঁর সঙ্গী বৈকুণ্ঠ সরকার আগেই উধাও। ছিপ-টিপ রইল পড়ে।

ইয়া আল্লা! — ব্যাপার বুঝেই আলিসাহেব লাফিয়ে উঠে ভাগনের হাত ধরে পিছনের জঙ্গলে অদৃশ্য হলেন।

বেজোদার চট করে কোনো বুদ্ধি খেলেনা। কোন দিকে পালানো যায়, ভাবতে ভাবতে তিনি ছিপ গুটোতে লাগলেন। মৌমাছিরা তখন ভোলানাথ ও নিমাইচরণের মাথার ওপর পাক খাচ্ছে। ফলে ভোলানাথেরা কোনো রকম একদম নিশ্বাস নিয়েই পলকে ডুব মারছেন জলে। মৌমাছিরাও অমনি তাদের নাকের ডগা তাক করে ছোঁ মারছে। বেজোদার হাত ঘোরানোয় আকৃষ্ট হয়ে এবার তারা বেজোদাকে লক্ষ্য করে তেড়ে এল।

—হাঁদারাম, পালাও শিগগির।

পিছন থেকে ডাবুদার ধমক শুনে বেজোদার চৈতন্য হল। ভারী শরীর — জোরে দু কদম গিয়েই হোঁচট খেয়ে চিৎপটাং। কোনোরকমে উঠেই আবার মারলেন দৌড়। কিন্তু ততক্ষণে দু-একটি মৌমাছি তাঁর নাগাল ধরে ফেলেছে।

ওরে বাবারে, গেছিরে! — বলে চেঁচাতে চেঁচাতে বেজোদা ঝোপঝাড় ভেঙে ঢুকে গেলেন জঙ্গলে— যেন একটা গন্ডার ছুটছে।

ব্যস্, পুকুর পাড় সাফ্। গাছের ওপর দেবু ও শিব তখন পেট চেপে, ডাল আঁকড়ে কোনোরকমে হাসি চাপছে। অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে ফের তারা খাড়া হসে বসল।

মৌমাছির দল মিনিট পনেরো পুকুর ধারে, জলের ওপরে শত্রুর সন্ধানে টহল দিয়ে আবার চাকে গিয়ে আস্তে আস্তে থিতু হল। আরও অন্তত মিনিট দশেক কাটল। কারও দেখা নেই। এরপর জল থেকে উঠলেন ভোলানাথ এবং নিমাইচরণ।

দুজনেরই জামা কাপড় ভিজে সপ্‌সপ্ করছে। সর্বাঙ্গ দিয়ে জল ঝরছে। ওই অবস্থাতেই তারা চটপট মাটি থেকে ছিপটিপ কুড়িয়ে নিলেন। একখানা চোখ কিন্তু ঠায় মৌচাকের দিকে।

অর্থাৎ বিপদ বুঝলেই মারব ঝাঁপ। তারপর দুজনে গুটি গুটি চললেন পুকুরের একেবারে অন্য ধারে।

পশ্চিম ধারের ঘাটে পৌঁছেই নিমাইচরণ গোটা কয়েক প্রচণ্ড হাঁচলেন। এতক্ষণ প্রাণপণে চেপে রেখেছিলেন। ভোলানাথ প্রথমেই জামার পকেট থেকে একটা ভিজে নোট বের করে সন্তর্পণে শুকতে দিলেন। থলি থেকে একটা গামছা বের করে সন্তর্পণে শুকতে দিলেন ঘাসের ওপর। এরপর তারা জামা খুলে জল নিংড়োলেন। ধুতি নিংড়োলেন। থলি থেকে একটা গামছা বের করে গা মাথা মুছলেন। থেকে থেকেই তাদের ভীত চাউনি যাচ্ছে মৌচাকের দিকে। নাঃ অ্যাদ্দুরে ভয় নেই।

নিরিবিলি! এঃ নিরিবিলি! — ভোলানাথ গজরাচ্ছিলেন। এবার ফেটে পড়লেন,— তোমার হারু ঠিক বলে বেড়িয়েছে। নইলে এতগুলো লোক জুটল কী করে?

কক্ষনো না। হারু আর কাউকে বলেনি। হারু শ্বশুরবাড়ি গেছে পরদিনই। — নিমাইচরণ চাপা গর্জন ছাড়েন। এতক্ষণে জলে থেকেও তাঁর মেজাজ নরম হওয়ার বদলে বরং চড়েছে।

এই সময় জঙ্গল থেকে হরি মোড়ল ও বৈকুণ্ঠ সরকারের পুকুর ধারে আগমনে ভোলানাথদের তর্কে বাধা পড়ল।

মোড়ল ও সরকারমশাই মানে গা হাত চুলকোচ্ছেন। বোধহয় বিছুটি পাতার ছোঁয়া পেয়েছেন। মোড়লমশাই ধুতির কষি আটতে আটতে এলেন। বেজায় হাঁপাচ্ছেন দুজন। খুব সাবধানে তাঁরা খুঁটি থেকে ছাতা খুললেন। ছিপ কুড়িয়ে নিলেন এবং মোড়া দুটো বগদলদাবা করলেন। অতঃপর পা টিপে টিপে চললেন পুকুরের পশ্চিম পাড়ে। ঘাটের কাছে পৌঁছে মোড়লমশাই ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়লেন, মুখ দিয়ে আর কথা সরছে না।

মিনিট পাঁচেক জিরিয়ে হরি মোড়ল ফোস্ করে উঠলেন, —ছ্যা ছ্যা, এই পুকুরে মাছ ধরে। কচ্ছপের আড্ডা। আমার বঁড়শিটা গেল।

তুমিই তো নিয়ে এলে, — খিঁচিয়ে উঠলেন বৈকুণ্ঠ সরকার : ওফ্ এই বয়সে কী ভোগান্তি! হাঁপের টানটা না বাড়ে আজ!

এইবার আবির্ভূত হলেন বেজোদা, পিছনে গজগজ করতে করতে ডাবুদা। বেজোদা তাঁর ঘাড়ে এবং হাতের এক জায়গায় সমানে হাত বুলুচ্ছেন, আর 'উঃ আঃ', করছেন। তাঁর ধুতি ছেঁড়া, চুল খাড়া। নিজেদের জিনিসপত্র কুড়িয়ে দিল বেজোদা এদিক সেদিক ঘুরছেন দেখে ডাবুদার এক তাড়া, — আবার কী হল?

আমার এক পাটি চটি— কোথায় যে গেল খুঁজে পাচ্ছি না।

— থাক আর চটির মায়া করতে হবে না, প্রাণে বেঁচে গেছ এই ঢের। কী জায়গারে বাপ্! আজ মৌমাছি হুল ফুটিয়েছে এরপর এলে সাপে কাটবে। খোঁজ নেই, খবর নেই — কে এক চ্যাংড়ার মুখে কী শুনলে, আর নাচতে নাচতে চলে এলে। বলি, তোমার কাণ্ডজ্ঞান হবে কবে? চল চল, ওই কামড়ের জায়গায় তাড়াতাড়ি চুন-টুন না লাগালে পরে বুঝবে ঠেলা।

বেজোদা একবার কটমটিয়ে ভোলানাথ এবং হরি মোড়ল পার্টিকে দেখে নিলেন। ভাবখানা যেন তাঁর এই দুর্ভোগের জন্য এরাই দায়ী। তারপর গটগটিয়ে ফেরার পথ ধরলেন। পিছনে বকবক করতে করতে চললেন ডাবুদা।

হরি মোড়ল ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন। ভোলানাথ বললেন, — আচ্ছা হরিদা এখানে মাছ আছে আপনাদের কে বলেছে?

মোড়লমশাই মুখ ভেটকে জবাব দিলেন, — ওই যে দত্ত বাড়ির শিব, তোমাদের গাঁয়ের। ওর বন্ধু নাকি নিজের চোখে দেখেছে। এখানে এসেছিল গাব না কচু পাড়তে, তখন।

ভোলানাথ ও নিমাইচরণের চোখে চোখে কথা হয়। হুঁ ঠিক। সেদিন এখানে এসেছিল বটে ছেলে দুটো।

হরি মোড়লরা চলে গেলেন। ভিজে জামা কাঁধে ফেলে, ভিজে নোটখানা হাতে নিয়ে ভোলানাথও রওনা দিলেন নিমাইচরণের সঙ্গে। যেতে যেতে নিমাইচরণ বলল, — ওঃ ছেলে দুটো কী শয়তান! আরও কত লোককে যে বলে বেড়িয়েছে কে জানে? বুঝলে তো ভোলাদা, এ হারুর কাজ নয়। তোমার গাঁয়ের ওই গুণধর ছোঁড়া দুটোর কীর্তি! নাঃ এখানে আর নয়।

আলিসাহেব আর মোটেই ফিরলেন না। তার ভাগনে একবার ভয়ে ভয়ে দেখা দিয়ে, টুক করে আসনটা তুলে নিয়েই এক ছুটে পালাল।

পুকুর পাড় ভোঁ ভোঁ। শিব নামছে যাচ্ছিল। দেবু বারণ করল — দাঁড়া, সেই ছেলেটা গেল কোথায়?

উঃ বড্ড কাঠ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে রে। — শিব কাতরায়।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না তাদের। দেখতে পেল, পুব দিকের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে দু-জন। সেই কালো রোগা ছেলেটা এবং একজন মাঝবয়সি পুরুষ। বয়স্ক লোকটির চেহারা দড়ির মতো পাকানো, লম্বা, রং ঘোর কালো। তার পরনে শুধু মালকোঁচা দেওয়া ধুতি। মৌচাকটার বেশ খানিকটা তফাত দিয়ে ঘুরে দুজনে পুবদিকের ঘাটে গিয়ে দাঁড়াল।

ছেলেটা দাঁত বের করে হেসে বলল, — ইঃ পেতোদা, জব্বর বুদ্ধিখানা বের করেছিলে বটে। লোকগুলো আচ্ছা নাকাল হয়েছে।

পেতো নামধারী লোকটি ফস্ করে একটা বিড়ি ধরিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল,— আরে আমি তো ভয়ে মরি। ছালায় বঁড়শি এটকে গেলেই হত আর কী! এ কী উৎপাত রে বাপ? এত কষ্টে এনে লুকিয়ে রাখলেম, না আজ সব কটা মেছুরে এসে এখানে জুটেছে! দেখি সক্কাল থেকে একটার পর একটা এসে ঢুকছে জঙ্গলে। বলি হলটা কী? এ পুকুরে তো কস্মিনকালে কেউ ছিপ ফেলে না। কেউ এর জলেও নামে না। কেন রে বাপু আর কি কোথাও মাছ নেই? এই গুটে তোল ছালাটা। এ পুকুরে রাখা আর নিরাপদ নয়। আবার কে এসে ছিপ ফেলবে। কিংবা হয়তো জলে ঝাঁপাই জুড়ে দেবে! —যা সব অলুক্ষুণে কাণ্ড দেখছি।

গুটে সিঁড়ি বেয়ে জলে নেমে কোমর জল অবধি গিয়ে ডুব দিল। উঠল যখন হাতে একটা বড় চটের বস্তার মাথা। সে বস্তাটা টানতে টানতে ঘাট অবধি এনে হেঁচকা টানে সিঁড়িতে তুলে ফেলল। ঝনাৎ করে শব্দ হল। বস্তায় ভারী কিছু রয়েছে।

হাঁ হাঁ করে উঠল পেতো, — মারব এক থাবড়া। বেটা বেআক্কেলে কোথাকার। অত জোরে ফেললি যে? ভাঙে যদি বাসনগুলো।

পেতো বস্তার দড়ি বাঁধা মুখটা খুলে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একখানা মস্ত পেতলের থালা

বের করে আনল। তারপর আরও কয়েকখানা থালা বাটি বের হল। কোনোটা পেতলের, কোনোটা বা স্টিলের। সব নতুন ঝকঝকে।

পেতো বাসনগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর বলল, — চ গুটে, এগুলো পুঁতে রাখি। শাবলটা নিয়ে আয় গাছের ফোকর থেকে।

পেতো বাসন ভর্তি বস্তাটা কাঁধে ঝুলিয়ে জঙ্গলের ভিতর হাঁটা দিল, পিছনে চলল গুটে।

এর একটু বাদেই খপ্ খপ্ শব্দ ভেসে এল কুঠিবাড়ির দিক থেকে দেবু ফিসফিস করে বলল, — পেতোর নাম শুনেছি আমি। দাগি চোর।

মাটি খোঁড়ার আওয়াজ থামল। পেতো গুটে ফের এল পুকুর ধারে। জলে হাত পা ধুল। পেতো বলল, — গুটে তুই বাড়ি চলে যা। আমিও গাঁয়ে ফিরব। ঘুর পথে যাবি। এখানে এসেছিলি কেউ যেন টের না পায়। খদ্দের ঠিক করে মালটা তুলব। তখন খবর দেব তোকে।

গুটে বলল, — পেতোদা আজ রেতে এসে তোমার দানোর হাসিটা দাও একবার। কদিন আর ভয়ে লোক ঘেঁষবে না ইখানে।

পেতো বলল, ঠিক বলেছিস। আসব আজ সন্ধ্যায়। লোকের বড় বাড় বেড়েছে।

খুব সাবধানে গাছ থেকে নামল দেবু ও শিব। পা টিপে টিপে পৌঁছাল কুঠিবাড়ির কাছে। সদ্য বোজানো গর্তটা খুঁজে বের করতে তাদের বেশি সময় লাগল না। গর্তের ওপর কিছু শুকনো ডালপালা এবং দুটো ভাঙা ইট বসিয়ে চিহ্ন করা। ওরা কাঠ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আলগা মাটি তুলতে তুলতে দেখতে পেল বস্তাটা। দেবু বলল ওটা তুলিসনি। বাসনগুলো নির্ঘাৎ চোরাই মাল। হাত দেওয়া উচিত হবে না।

তাহলে? —শিবের প্রশ্ন :এমনি পড়ে থাকবে?

— না। পুলিশে খবর দিই। ওরাই এসে তুলুক।

—পুলিশ? মানে থানায় গিয়ে? ওরে বাবা আমার ভয় করে।

দেবু বলল, — দুর, ভয় কী। আমাদের থানার ছোটবাবু আমার মেজমামার বন্ধু। মেজমামার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ত ইস্কুলে। আমাদের বাড়ি এসেছেন দুদিন। আমায় চেনে। খুব ভালো লোক। চ শিগগির।

পুকুরপাড় দিয়ে চলেছে দেবুরা। এখন আবার সব কেমন অন্যরকম। একদল ছাতারে পাখি কিচিরমিচির করতে করতে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরছে গাছের তলায়। জলে ডুব মারছে একটা পানকৌড়ি। কয়েকটি নিরীহদর্শন মৌমাছি উড়ছে খোস মেজাজে। একটা বক এসে পুকুর ধারে দাঁড়িয়ে গেছে এক ঠ্যাঙে। জলে আলো-ছায়ার কাঁপন। প্রকৃতি রাজ্য আবার যেন তার ছন্দ ফিরে পেয়েছে।

হঠাৎ ঝপাং! বিরাট এক আওয়াজ।

পুকুরের মাঝখানে জল থেকে আধহাতখানেক লাফিয়ে উঠে ফের জলে আছড়ে পড়ল প্রকাণ্ড এক মাছ। যেন তাকে ধরতে লোভী মানুষগুলোর এত আয়োজন পণ্ড হতে দেখে মহা ফুর্তিতে একটা ডিগবাজি খেয়ে নিল।

খানিকক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দেবু বলল, — যাক, দেখলাম তাহলে নিজের চোখে। আর কেউ বলতে পারবে না মিছে কথা বলেছি।

শিব বলল, — আহা কী ওর রং দেখলি। আর কী তেজ! ওকে কেউ ধরতে পারেনি, ভালোই হয়েছে। কী বল্?

ঠিক বলেছিস, — বলল দেবু : ও নিশ্চিন্তে থাকুক এখানে। ও কী কম ধুরন্ধর! মুখুজ্যেদের জালে পড়েনি। আজ একঘন্টা ধরে চেষ্টা করল, কারও টোপই ছোঁয়নি। ওকে ধরবে কে?

থানার ছোটবাবু অফিসে বসে চা খাচ্ছিলেন। এক সেপাইয়ের পিছনে পিছনে এসে তাঁর সামনে হাজির হল দেবু ও শিব।

ছোটবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, — কী ব্যাপার দেবু?

দেবু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, — ওই নীলকুঠির জঙ্গলে এক বস্তা বাসন পুঁতে রেখেছে পেতো।

ছোটবাবু তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন, — অ্যাঁ, বাসন। পেতো! তা তোমরা জানলে কী করে? ইটি কে?

আমার বন্ধু শিব। আমরা আম পাড়তে গিছলাম ওখানে, তখন দেখলাম যে লুকিয়ে — বলল দেবু।

নীলকুঠিতে মেছুরেদের আগমন। তারা চলে যাওয়ার পর পেতো ও গুটের জল থেকে বাসন তোলা ইত্যাদি ঘটনার মোটামুটি বর্ণনা দিল দেবু। তবে মাছ শিকারিদের বা তাদের দুজনের নীলকুঠিতে যাওয়ার আসল উদ্দেশ্যটুকু চেপে গেল। সেই বিশাল মাছটির প্রসঙ্গ ঘুণাক্ষরেও তুলল না।

নির্ঘাৎ সাহাদের দোকানের বাসন। ছোটবাবু উত্তেজিত : পরশু চুরি হয়েছে ওদের দোকানে। চল চল শিগগির দেখিয়ে দেব। ড্রাইভার গাড়ি বের কর, কুইক।

শিব মাথা চুলকে আমতা আমতা করল, — আজ্ঞে, আমরা দেখেছি, যদি না কাউকে বলেন?

কেন? — ছোটবাবু হাঁ।

মানে নীলকুঠিতে গিছলাম জানলে বাড়িতে বকবে। — শিব কাঁচুমাচুভাবে জানাল।

ও! — শিবের মুখ দেখে কোনোরকমে হাসি চেপে ছোটবাবু বললেন : বেশ! তা না হয় বলব না। আর তোমাদের বাড়িতে জেনে ফেললেও যাতে বকুনি না খাও সে ব্যবস্থা করা যাবে। অবশ্য খবরটা যদি সত্যি হয়।

[১৯৮৪, কিশোর ভারতী শারদীয়া]

জুবিলি সার্কাসের আজব খেলা

সকাল প্রায় নটা। গেট খুলে দ্রুত পায়ে এগোতে এগোতে সুনন্দ আমায় ডেকে বলল, "অসিত, সার্কাস দেখতে যাবি?"

বারান্দায় ইজিচেয়ারে পা ছড়িয়ে আরাম করে বসে বই পড়ছিলেন মামাবাবু। সুনন্দর কথা শুনে বইখানা থেকে চোখ তুলে সুনন্দকে বললেন, "কোথায় সার্কাস?"

"বোলপুরে," উত্তর দিল সুনন্দ।

মামাবাবু বললেন,"কী নাম?"

"জুবিলি সার্কাস। তেমন নামকরা কিছু নয়। ছোট সার্কাস। তবে কয়েকটা নাকি দারুণ খেলা আছে।"

"তুমি জানলে কী করে?" মামাবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

সুনন্দ বলল,"বোলপুরে টর্চটা সারাতে গিয়েছিলাম। সেখানে দোকানে বসে কয়েকজন লোক গল্প করছিল সার্কাসের।"

সুনন্দর গলা পেয়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। বললাম, "চলুন না মামাবাবু সার্কাসটা আজ দেখেই আসি।"

মামাবাবু বললেন, "তা মন্দ নয়। অনেকদিন দেখিনি সার্কাস। খুব একটা বাজে যদি না হয়।"

সুনন্দ একটু থতমত খেয়ে বলল,"আপনি যাবেন? বেশ আমি গিয়ে টিকিট কেটে রাখব। পাঁচটার শো-ই ভালো। মনে হয় খেলাগুলো ইন্‌টারেস্টিং হবে।"

এখন মামাবাবু সুনন্দ এবং আমার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। মামাবাবু হচ্ছেন বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ প্রবেশর নবগোপাল ঘোষ। সম্পর্কে আমার বন্ধু সুনন্দর মামা। অবিবাহিত। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স। আমার নাম অসিত রায়। সুনন্দ বোস আমার ছেলেবেলার বন্ধু। মামাবাবুর কাছেই সে মানুষ। আমি ও সুনন্দ সবেমাত্র পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের চৌকাঠ ডিঙিয়েছি। এখন রিসার্চ করছি। সুনন্দর বিষয় প্রাণিতত্ত্ব, আমার ইতিহাস।

দুর্গাপুজার পর আমরা তিনজনে কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়েছিলাম কয়েকদিনের জন্য। মামাবাবুর পরিচিত একজনের একটা বাড়ি ছিল শান্তিনিকেতনে। সেখানে

উঠেছিলাম। রান্নার ভার বাড়ির মালি চণ্ডীর হাতে। চালিয়ে দিচ্ছিল মোটামুটি। শুধু শান্তিনিকেতনে নয়, কাছের খোয়াইয়ে, কোপাই নদীর ধারে, আশেপাশের গ্রামে খুব বেড়াচ্ছিলাম। বেড়ানোর উৎসাহটা আমার চাইতে সুনন্দরই বেশি। মামাবাবু বেশিরভাগ সময় বই পড়ে বা লেখালেখি করে কাটাচ্ছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে মাইল-দুই দূরে ছোট্ট শহর বোলপুর। ওখানেই রেলস্টেশন ও দোকানপাট।

সার্কাসটার তাঁবু পড়েছিল বোলপুর রেল-ময়দানে।

বিকেল পাঁচটায় দ্বিতীয় শো শুরু হওয়ার দশ মিনিট আগে মামাবাবু ও আমি সাইকেল-রিক্শা চেপে সার্কাসের সামনে হাজির হলাম। সুনন্দ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চিনেবাদাম চিবুচ্ছিল। আমাদের দেখে কাছে এল।

সার্কাসটির অবস্থা মোটেই সুবিধের মনে হল না। তাঁবুর কাপড় পুরনো ও জায়গায়-জায়গায় বড়-বড় তাপ্পি মারা। কোথাও কোথাও ফুটো। লাল কোট ও নীল পাতলুন পরা যে-লোকটি ভিতরে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে টিকিট চেক করছিল তার পোশাক বা চেহারা কোনোটাই তেমন চকচকে নয়। সার্কাসের সামনের দিকে খানিকটা জায়গা ঘেরা। লম্বালম্বি করে সাজানো ফাঁক-ফাঁক কাঠের তক্তা দিয়ে বানানো উঁচু বেড়া। ঘেরার গায়ে টিকিট কাউন্টারে ভিড়। নানান বয়সি লোক বাইরে থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে। টিকিট কেটে লোক ঢুকছে ভিতরে। সার্কাসের সামনে চায়ের দোকান বসে গেছে। তেলেভাজা, চিনেবাদাম ভাজারও খুব বিক্রি চলছে। মাইকে ক্রমাগত কান-ফাটানো আওয়াজে ঘোষণা করা হচ্ছে, "এবার সেকেন্ড শো শুরু হচ্ছে। চটপট টিকিট কেটে ঢুকে পড়ুন। চলে আসুন, চলে আসুন। আর দেরি নেই—"

টিকিট-কাউন্টারের মাথায় ঝুলছে কাঠের ফালির ওপর হাতে আঁকা সার্কাসের খেলার রঙচঙে বিজ্ঞাপন। নানারকম জন্তু-জানোয়ার ও নারী-পুরুষের দুর্ধর্ষ সব খেলার ভঙ্গি। এমন ছবি সব সার্কাসেই থাকে। এর মধ্যে ক'টা খেলা যে সত্যি দেখাবে, কে জানে! চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে সুনন্দকে জিজ্ঞেস করলাম, "হাতি আছে?"

সুনন্দ একটু অপ্রস্তুতভাবে মাথা নাড়ল।

"ধুস্। তাহলে আছেটা কী?"

"কেন সিংহ আছে, আমি খোঁজ নিয়েছি।" সুনন্দ উৎসাহভরে জানাল।

যা হোক আমরা ভিতরে ঢুকলাম। দর্শকের ভিড় ভালোই হয়েছে। তাঁবুর মাঝখানে খুঁটি পুঁতে দড়ি লাগিয়ে অনেকটা জায়গা গোল করে ঘেরা। ওর ভিতর খেলা দেখানো হবে। ঘেরার একধারে কয়েক সারি টিনের চেয়ার পাতা। এগুলোই সব চাইতে দামি সিট— দু'টাকার। তিনজনে বসলাম চেয়ারে। এছাড়া কাঠের গ্যালারি আছে। একটাকার টিকিট এবং মাটিতে শতরঞ্চিতেও বসেছে দর্শক। তাদের টিকিটের হার মাথাপিছু পঞ্চাশ পয়সা।

ঢং। ঘণ্টা দিয়ে সার্কাস আরম্ভ হল। তাঁবুর এককোণে একটা উঁচু মঞ্চের ওপর চেয়ারে বসে ছিল তিনটি যুবক। তাদের পরনে রঙিন শার্ট ও ট্রাউজার্স এবং প্রত্যেকের টেরির খুব বাহার। তাদের সামনে সাজানো ড্রাম, ঝাঁঝর, ফ্লুট ইত্যাদি নানারকম বাদ্যযন্ত্র। ওরা ব্যান্ড-পার্টি। ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা তিনজনে প্রবল বিক্রমে বাজনা শুরু করল।

সার্কাসের খেলোয়াড়দের রিংয়ে ঢোকার পথের পর্দা সরিয়ে ছুটে এল ঝলমলে পোশাক পরা দুটি বারো-তেরো বছরের ছেলেমেয়ে। জিমনাস্টিক্স্ দিয়ে শুরু হল।

এরপর একটার পর একটা খেলা। বছর-পনেরোর একটি মেয়ে এবং এক মহিলার এক চাকার সাইকেলের কসরত। একজন মাঝবয়সি পুরুষের মই নিয়ে ব্যালান্স, ইত্যাদি, ইত্যাদি। খেলোয়াড়দের অনেকের চেহারায় ভারি মিল। মনে হচ্ছিল হয়তো তারা একই পরিবারের লোক।

খেলাগুলো নেহাত মামুলি। তবে জমাচ্ছিল দুই জোকার। মুখে রং-মাখা, কিম্ভূত পোশাক পরা, মাথায় বিরাট গোল টুপি, পায়ে উল্টামুখো জুতো। দু'জনের মধ্যে বেঁটেটারই দাপট বেশি। লোকটি বামন, তিন ফুটের বেশি লম্বা নয়। সে চরকির মতো ঘুরছিল আর একখানা ফাটা কাঠ দিয়ে সার্কাসের যাকেই হাতের কাছে পাচ্ছিল তাকেই চড়াত করে এক ঘা-কষাচ্ছিল এবং ক্যানকেনে স্বরে চিৎকার করে ছাড়ছিল রসিকতা। অন্যরা তাকে ডাকছিল মাস্টার পটল নামে।

খেলোয়াড়রা সবাই তেমন পোক্ত নয়। কয়েকজন বেশ কাঁচা। জমি থেকে পাঁচ-ছয় হাত উঁচুতে টান করে টাঙানো মোটা তারের ওপর দিয়ে ছাতা হাতে নাচতে নাচতে যাওয়ার খেলায় দুটি মেয়ে দু'ধার থেকে এল বটে। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি মেয়ে আর কিছুতেই অন্য প্রান্তে পৌঁছতে পারল না। তিন-তিনবার সে চেষ্টা করল। কিন্তু প্রতিবারই টাল খেয়ে মাঝপথেই লাফিয়ে নেমে পড়ল মাটিতে। তখন মাস্টার পটল তার হাত থেকে ছাতা কেড়ে নিয়ে নিজে তারে উঠে দিব্যি নেচে নেচে একধার থেকে অন্য ধারে চলে গেল। ব্যর্থ মেয়েটি করুণ মুখে বিদায় নিল। পুরুষদের ট্রাপিজের খেলাও তেমন জমল না। একেবারে দায়সারা ব্যাপার।

মামাবাবু উসখুস শুরু করলেন, "নাঃ, সুনন্দ, আর একটু বেটার আশা করেছিলাম। ওই মাস্টার পটলটি অবশ্য খাসা।"

সুনন্দ কাঁচুমাচুভাবে মিনমিন করে কী জানি আওড়াল।

সহসা ব্যান্ড সুর পালটাল এবং তারপরই পর্দা সরিয়ে একজন রিং-এ ঢুকল, সঙ্গে সরু দড়িতে বাঁধা বড়সড় এক লালমুখো বাঁদর।

লোকটির বয়স মনে হল বছর-তিরিশের মধ্যে। নাক-মুখ বেশ চোখা, লম্বা ছিপছিপে, শ্যামবর্ণ। পরনে সাদা ট্রাউজার্স, সাদা ফুলহাতা শার্ট, কালো টাই। ঝকঝকে বাদামি জুতো। হাতে একটা ছোট বেতের ছড়ি। ইনি রিং-মাস্টার বা অ্যানিম্যাল-ট্রেনার সন্দেহ নেই। বাঁদরটার মাথায় কাপড়ের লাল টুপি, গলায় বকলস।

বাঁদরটি নানারকম খেলা দেখাতে লাগল। যেমন, বেহালা বাজানো, হুঁকো খাওয়া, ডিস্কো-ড্যান্স। ঘন-ঘন করতালি পড়ল। হঠাৎ ট্রেনার রিংয়ের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ডান হাত তুলল। দর্শকদের কোলাহল একটু কমলে ট্রেনার বলে উঠল, "লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন, সমবেত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ, আমার বাঁদর শুধু খেলা নয়, লেখাপড়াও শিখছে। কারণ ও জানে মুখ্যু হয়ে থাকলে ওর ফিউচার নেই। প্রোমোশন হবে না। মাইনে বাড়বে না। তাই ও ভাষা শিখছে। মানুষের ভাষা। যাতে বই-টই পড়তে পারে। তারপর পাশটাস দিতে মানুষের

ইস্কুল-কলেজে পড়তে চায়। তবে এখনও ওর শিক্ষা বেশি এগোয়নি। মাত্র কয়েকটা কথা শিখেছে। তবে ওর চেষ্টা আছে, হবে।"

কথা বলতে বলতে সে হাতের দড়ি, যা দিয়ে বাঁদরটা বাঁধা রয়েছে সেটা রিংয়ের ভিতরে একটা খুঁটির গায়ে বেঁধে দিয়ে নিজে খানিক তফাতে সরে গেল। তারপর হেঁকে বলল, "মানিকচাঁদ, খিদে পেয়েছে?"

মানিকচাঁদ ওরফে টুপি-পরা বাঁদরটি অমনি ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়তে লাগল।

ট্রেনার বলল, "ইয়েস্। মানিকচাঁদ বলছে, ওর খিদে পেয়েছে। অলরাইট, ইউ মাস্টার পটল, মানিকচাঁদকে একটা কলা খাওয়াও দেখি।"

অমনি বেঁটে জোকার মাস্টার পটল পাঁইপাঁই করে দৌড়ে চলে গেল পর্দা ঠেলে। সার্কাসের অন্দরমহলে। এবং প্রায় তক্ষুনি মস্ত একটা সিঙ্গাপুরি কলা হাতে নিয়ে উঁচু করে নাড়তে নাড়তে ঢুকল রিংয়ে। মানিক চাঁদকে ঘিরে এক চক্কর ঘুরল কলাটা দেখিয়ে দেখিয়ে। তারপর মানিকচাঁদকে এগিয়ে দিল কলাটা।

বাঁদরটা টপ করে কলাটা কেড়ে নিল। কলাখানা চটপট ছাড়িয়ে ভারি ফুর্তিতে সে সবেমাত্র এক কামড় বসিয়েছে, ট্রেনার আরও দূরে সরে গিয়ে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "ব্যস্ আর নয়। এবার কলা রাখো, মানিকচাঁদ।"

আশ্চর্য! অমনি বাঁদরটা কলা ফেলে দিল।

ট্রেনার এবার দর্শকদের উদ্দেশ করে বলল, "আপনারা হয়তো ভাবছেন আমি ইশারা করেছি। গলার স্বরের ইঙ্গিতে হুকুম করেছি। ওইভাবে কলা খেতে বলেছি বা বারণ করেছি। কিন্তু মোটেই তা নয়। আমি আগেই বলেছি, মানিকচাঁদ কিছু-কিছু মানুষের ভাষা শিখেছে। তাই ও আমার কথা বুঝে কাজ করছে। ও, আপনাদের বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? অলরাইট, আপনারাই কেউ ওকে অর্ডার করুন কলা খেতে। আবার হুকুম করুন খাওয়া বন্ধ করতে। দেখুন পরীক্ষা করে ও বুঝতে পারে কি না। ইংরিজি, বাংলা বা হিন্দি, যে-কোনো ভাষায়।"

ট্রেনারের কথা শেষ হতে না হতেই দর্শকদের মধ্যে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। বহু কণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল—

"মানিকচাঁদ কলা খাও।"

"এ মানিকচাঁদ কেলা খাও।"

"মানিকচাঁদ ইট বেনানা।"

মানিকচাঁদ নির্বিকারভাবে বসে বসে কান চুলকোতে লাগল। কলার প্রতি কোনো আগ্রহই দেখাল না।

ট্রেনার হাত তুলল। দর্শকদের জানাল, "এভাবে নয়। এভাবে নয়। মানিকচাঁদ আগে মিলিটারিতে ক্যাপ্টেন ছিল। মাংকি রেজিমেন্ট, বেনারস। খুব ডিসিপ্লিন মানে। এক-এক করে বলতে হবে, নইলে ও অর্ডার মানবে না। মিলিটারি নিয়ম।"

অমনি গ্যালারিতে একটি শুঁটকো ঢ্যাঙা লোক উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, "বাবা মানিকচাঁদ, কলাটা খেয়ে ফেলো। খাও, খাও।"

অবাক কাণ্ড। মানিকচাঁদ কলাটা কুড়িয়ে নিয়ে গোগ্রাসে কামড় দিল।

ঢ্যাঙা লোকটি ফের চেঁচাল, "ব্যস, আর খেও না।" অমনি মানিকচাঁদের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সে কলাটা ছুড়ে ফেলে দিল।

এবার চেয়ারে-বসা প্যান্ট-শার্ট পরা এক যুবক চেঁচাল, "ক্যাপ্টেন মানিকচাঁদ, ইট ইওর ব্যানানা।"

তৎক্ষণাৎ বাঁদরটি কলাটা তুলে নিয়ে ফের খেতে শুরু করল।

"স্টপ।" হুকুম দিল যুবক।

ব্যস, মানিকচাঁদের খাওয়া বন্ধ। যদিও হাতে তার আধখানা কলা। "ডোন্ট ইট ইওর ব্যানানা।" হঠাৎ মামাবাবুর হুঙ্কার শুনে, সব দর্শক অবাক হয়ে তাকাল তাঁর দিকে। মামাবাবুর ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি ফের হুকুম দিলেন, "নাউ স্টার্ট ইটিং।"

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে মানিকচাঁদ গপ্‌গপ্ করে বাকি কলাটুকু শেষ করে ফেলল।

মামাবাবু হতভম্বের মতো বললেন, "স্ট্রেঞ্জ।"

সুনন্দ ফিসফিস করে বলল, "সত্যি অদ্ভুত। আজব ব্যাপার। দোকানের লোকগুলো বলছিল বটে এইরকম দেখায় কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়নি।"

ট্রেনারসহ মানিকচাঁদ ফিরে গেল।

এরপর কালো ট্রাউজার্স ও ঘিয়ে রঙের ফুলহাতা শার্ট পরা একজন মাঝারি লম্বা, শক্তসমর্থ গম্ভীরদর্শন বয়স্ক পুরুষ এসে কতগুলো কাঠের বল এবং রবারের রিং নিয়ে জাগলিং অর্থাৎ লোফালুফির কসরত দেখিয়ে গেল।

আবার ব্যান্ড খুব তেজের সঙ্গে বেজে উঠল। সেই আগের ট্রেনার বা রিং-মাস্টারটি ঢুকল। তার পিছনে পিছনে এল একটা ছোট ধবধবে সাদা লোমওলা কুকুর।

কুকুরটি ট্রেনারের নির্দেশমতো নানারকম খেলা দেখাতে লাগল। যেমন, দুপায়ে হাঁটা, আগুনের বলয়ের মধ্য দিয়ে ঝাঁপ। হারমোনিয়াম বাজানো ইত্যাদি।

অনেকগুলো খেলার পর ট্রেনার কুকুরটিকে দেখিয়ে বলল, "এই পঞ্চুও কিছু-কিছু মানুষের ভাষা শিখেছে। আপনারা পরখ করে দেখতে পারেন। আমি দূরে থাকব। যেমন ধরুন, পঞ্চু খুব সৎ আর পাহারাদার কুকুর। তাই চোর বদনাম দিলে ও ভীষণ চটে যায়। আপনারা ওকে চোর বলে দেখতে পারেন, কী করে। বাংলা বা ইংরিজিতে বলবেন। হিন্দিটা এখনও ওর ভালো রপ্ত হয়নি। তবে সবাই একসঙ্গে চেঁচাবেন না। হ্যাঁ, ও চটে গেলেই কিন্তু মাপ চেয়ে নেবেন। নইলে ও তেড়ে গিয়ে কামড়ে দিতে পারে। তখন আমায় দোষ দেবেন না।"

কথা শেষ করে ট্রেনার পঞ্চু-কুকুরকে একটা টুলের ওপর বসিয়ে রেখে নিজে ওর পিছনে দূরে গিয়ে দাঁড়াল। এবং দর্শকদের ইশারা করল— বলুন।

গ্যালারির সেই ঢ্যাঙা লোকটি তাক করেই ছিল। তক্ষুনি চিৎকার দিল, "এই ব্যাটা পঞ্চু চোর।"

বলামাত্র কুকুরটা দাঁত বের করে গরগর করে উঠল। তার গায়ের লোম খাড়া। চোখ জ্বলছে যেন রাগে।

ঢ্যাঙা ভয় পেয়ে অমনি হাত জোড় করে বলে উঠল, "দোহাই বাপ, মাপ করো, ঘাট হয়েছে।"

ব্যস, পঞ্চু ঠান্ডা হয়ে গেল।

"ওকে ইংরিজিতে চোর বলো তো।" মামাবাবু সুনন্দকে নির্দেশ দিলেন।

সুনন্দ হাঁক ছাড়ল, "পঞ্চু ইউ থিফ।"

ফের পঞ্চু দাঁত খিঁচিয়ে গোঁ গোঁ করতে লাগল।

"ইয়েস ইউ আর এ থিফ্।" এবার মামাবাবুর গলা।

পঞ্চু রীতিমতো খেপে গেল। সে টুল থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে গর্জন ছাড়ল।

"এক্সকিউজ মি পঞ্চু।" সুনন্দ ঘাবড়ে গিয়ে চেঁচাল।

অমনি পঞ্চু শান্ত হয়ে ফের টুলে চড়ে বসল।

"আশ্চর্য! হতভম্ব মামাবাবু একেবারে চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন, আমার ও সুনন্দর মুখেও রা নেই। অন্য দর্শকরাও থ। মামাবাবু বললেন, "ভাবছিলাম হয়তো এমনভাবে শেখানো হয়েছে যে, প্রথম কথাটায় রাগ দেখায় এবং দ্বিতীয় কথাটায় শান্ত হয়। কিন্তু কই না! একদম ঠিকঠাক রিঅ্যাকশন হল। ঠিক যেন মানে বুঝে! আর যেন সত্যি সত্যি রেগে যাচ্ছিল চোর বললে। রাগের ভান বলে তো মনে হল না।"

পঞ্চুকে নিয়ে ট্রেনার ফিরে গেল।

আবার সেই বয়স্ক কালো ট্রাউজার্স পরা লোকটির আবির্ভাব। এবার দেখাল ছোট-ছোট রঙিন মাছসমেত বড় এক জগ জল খাওয়া এবং তা সবসুদ্ধ ও গরানোর খেলা। দু-চারটে হাততালি জুটল বটে, কিন্তু তখন দর্শকদের মন পড়ে রয়েছে জন্তু-জানোয়ারের খেলার দিকে। না জানি আবার কী চমক অপেক্ষা করছে। তাদের আশা পূরণ করতেই যেন ফের ট্রেনার ঢুকল। এবার তার সঙ্গে দড়িতে বাঁধা এক বিরাট কালো ভাল্লুক।

ট্রেনারের ইঙ্গিতমতো ভাল্লুকটা একটা মস্ত তিন চাকার সাইকেল চেপে চক্কর দিতে লাগল। কিন্তু অধৈর্য দর্শকরা চিৎকার করে জানতে চাইল, "এও মানুষের ভাষা বোঝে নাকি?"

"ইয়েস। হ্যাঁ, বোঝে," জানাল ট্রেনার, "তবে ব্যাটার বুদ্ধিসুদ্ধি কম। বেশি শিখতে পারেনি। মিস্টার জাম্ববান জোয়ান আদমি। খুব তাকত। রোজ ভোরে ও একসারসাইজ করে। আপনারা ওর একসারসাইজ দেখতে চাইলে দেখাবে। থামতে বললে থামবে। তবে দয়া করে বেশি খাটাবেন না। তাহলে ওর মেজাজ বিগড়ে যাবে।"

ট্রেনার জাম্ববান নামে ভাল্লুকটির গলাও নাকের ফুটোয় বাঁধা দড়িটা একটা খুঁটিতে আটকে দিয়ে পিছনে দূরে সরে গেল। অতঃপর হাত নেড়ে ইঙ্গিত করল দর্শকদের, এবার বলতে পারেন।

"এ বেটা জাম্ববান, থোড়া একসারসাইজ দেখলাও।" পঞ্চাশ পয়সার আসন থেকে পালোয়ান গোছের একটি লোকের কণ্ঠ শোনা গেল। জাম্ববান গম্ভীরভাবে মাটিতে উবু হয়ে বসেছিল। এবার সে তার সামনের ডান হাত (বা পা) তুলে একবার লম্বা করতে লাগল। আবার মুড়তে লাগল। এই রকম করেই চলল।

"ব্যস্ ব্যস্, ঠিক হ্যায়। লেকিন আউর কুছ কসরত তো দেখলাও।" মিনিটখানেক বাদেই হুকুমদাতা দর্শক অনুরোধ জানাল।

জাম্ববান এবার তার ঘাড় ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরাতে লাগল। দর্শকটি খানিক দেখে বলল, "বাহবা বাহবা, বহুত আচ্ছা। ঠিক হ্যায়, আভি রোক যা বেটা।"

জাম্ববান অমনি এক্‌সারসাইজ থামিয়ে শান্ত হয়ে বসে রইল।

ট্রেনার দর্শকদের উদ্দেশে বলল, "মিস্টার জাম্ববান পেয়ারা খেতে খুব ভালোবাসে। কেউ ওকে পেয়ারা খাওয়াবে শুনলে ভারি খুশি হয়। আপনারা ওকে পেয়ারা খাওয়াবেন এই কথা বলে দেখুন, কী করে?"

সঙ্গেসঙ্গে গ্যালারির সেই অতি তৎপর ঢ্যাঙা লোকটি চেঁচাল "এই জাম্ববান—"

কিন্তু ঢ্যাঙার বাকি কথা বার হওয়ার আগেই অপর এক কণ্ঠ শোনা গেল গ্যালারি থেকে, "তোকে পেয়ারা খাওয়াব।"

ঢ্যাঙা মহা চটে কটমট করে দেখতে লাগল চকরাবকরা শার্ট গায়ে ফাজিল ছোকরাকে, যে তার কথায় ভাগ বসিয়েছে।

যাই হোক, কাজ হয়ে গেল। ভাল্লুকটি নেচে কুঁদে গদগদ।

দর্শকরা হেসে অস্থির। মাস্টার পটল বলে উঠল, "বেশ, বেশ, এবার থাম বাপধন, খাওয়াবে তো বলেছে।"

জাম্ববানের নাচাকোঁদা থেমে গেল।

মাস্টার পটল গ্যালারির কাছে গিয়ে হাত পেতে খনখনে গলায় বলল, "ও মশায়, পঞ্চাশ পয়সা ছাড়ুন, পেয়ারার দাম। পাঁচজনার সামনে কথা দিয়েছেন। না দিলে কেস করব কিন্তু।"

ঢ্যাঙা চকরাবকরা শার্টের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "ও দেবে।"

চকরাবকরা খেঁকিয়ে উঠল,'ইঃ আবদার, আপনি দিন।"

ঝগড়া লেগে গেল। দু'জনেই বলে, "আমি দেব কেন?"

মাস্টার পটল দু'হাত বাড়িয়ে বলল, "দুজনেই ছাড়ুন দাদা, পঞ্চাশ করে। দুজনেই কথা দিয়েছেন, সব্বাই সাক্ষী।"

দর্শকও পটলের সমর্থনে চেঁচাতে শুরু করল, "দিয়ে দিন পঞ্চাশ পয়সা। দু'জনকেই দিতে হবে। প্রমিস করেছেন। আরে ছি-ছি, পঞ্চাশ পয়সার জন্যে ভাল্লুকের কাছে কথার খেলাপ! মানুষের নাম ডোবালেন মশাই।"

ঢ্যাঙা পয়সা বের করত কি না সন্দেহ। তবে দেখা গেল তার স্ত্রীর মুখ-ঝামটা খেয়ে অগত্যা একটা পঞ্চাশ পয়সা ছুড়ে দিল পটলকে। তখন চকরাবকরা শার্টও প্রেস্টিজ রাখতে আর একটা পঞ্চাশ পয়সা ছুড়ল। মাস্টার পটল পঞ্চাশ পয়সা দুটো পকেটে পুরে টুপি তুলে দু'বার সেলাম জানাল। শতরঞ্চির আসন থেকে এক দর্শক হুঁশিয়ার করে দিল,"অ্যাই পটল, জাম্ববানকে পেয়ারা কিনে দিবি ঠিক। পয়সাটা মেরে দিসনি যেন।"

পটল ফ্যাক করে হেসে বলল,"আধাআধি বখরা।"

মামাবাবুর দিকে চেয়ে দেখলাম তিনি ভুরু কুঁচকে দেখছেন। এত রগড়েও মুখে হাসি নেই। কেমন অন্যমনস্ক ভাব। কী ভাবছেন কে জানে।

এরপর লোহার শিক দিয়ে তৈরি ফ্রেম জুড়ে-জুড়ে চটপট একটা গোল উঁচু ঘেরা তৈরি করা হল। একটা খাঁচা টেনে এনে লাগানো হল ঘেরার দরজায়। খাঁচা খুলতে এক সিংহ বেরিয়ে এসে রিংয়ে ঢুকল। রিং-মাস্টারও ঢুকল ঘেরায়। এখন তার হাতে ছড়ির বদলে একটা চামড়ার লম্বা চাবুক।

সিংহটা খুব বুড়ো। তার গায়ের চামড়া ঢিলে। ঘাড়ের কেশর পাতলা হয়ে গেছে। চলাফেরা ধীর। কয়েকটা খেলা দেখাল সিংহটা। দু'পায়ে দাঁড়ানো। এক টুল থেকে অন্য টুলে লাফ। এই রকম কিছু। কিন্তু দর্শক উসখুস করছে। এসব মামুলি খেলায় তাদের আর মন ভরছে না। তারা জানতে চাইল, এও কি মানুষের ভাষা বোঝে?

রিং-মাস্টার জবাব দিল, "হ্যাঁ বোঝে, তবে দু-চারটে মাত্র। বয়স হয়ে গেছে তাই শেখার ধৈর্য নেই। কেবল ঘুম মারে। আপনারা ওকে ঘুমোতে অর্ডার করুন, দেখুন কেমন খুশি হয়ে কথা শুনবে।"

"ওর নাম কী?" দু'টাকার সিট থেকে একজন জিজ্ঞেস করল।

"মহারাজ," উত্তর দিল ট্রেনার।

ট্রেনার রিংয়ের বাইরে গিয়ে সিংহের পিছনে দাঁড়াল। অর্থাৎ, পশুরাজের চোখের আড়ালে গেল।

"মহারাজ, নিদ্ যা।" দ্বিতীয় কণ্ঠ শোনা গেল।

"মহারাজ, স্লিপ, স্লিপ।" দু টাকার সিটয থেকে অর্ডার হল।

সিংহটি একটি চওড়া টুলের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে ছিল। কয়েক মুহূর্ত বাদে সে গোটা দুই মস্ত -মস্ত হাই তুলল। তারপর টুল থেকে মাটিতে নেমে দুই থাবা টান করে পেতে তার ওপর মাথা রেখে চোখ বুজল। এবং রীতিমতো ভোঁস্-ভোঁস্ করে ঘুমোতে শুরু করল।

আধমিনিটটাক দেখেই ফের হুকুম হল, "মহারাজ গেট আপ্।"

গ্যালারি থেকে একজন ফুট কাটল, "গা তোলা বাবা মহারাজ। এখনই ঘুম কী? মাত্র সাড়ে ছ'টা বাজে।" হাসির রোল উঠল।

মহারাজ চোখ খুলল। পিটপিট করল। যেন নেহাত অনিচ্ছা উঠতে। রিং-মাস্টার কাছে এসে তাড়া লাগাল, "গেট আপ মহারাজ গেট আপ।"

তখন মহারাজ গা ঝাড়া দিয়ে ফের টুলে চড়ে বসল। বাজনায় ঝড় তুলে ব্যান্ডপার্টি ঝপ্ করে আওয়াজ থামাল। ব্যস্ শো শেষ।

ফেরার পথে সুনন্দ ও আমি উত্তেজিত। সত্যি দারুণ খেলা। সুনন্দ বলল, "মনে হয় যেন ম্যাজিক দেখছি।"

মামাবাবু শুধু একবার মন্তব্য করলেন,"ম্যাজিক-ট্যাজিক নয়, নিশ্চয় কোনও ট্রিক আছে। জন্তু-জানোয়ার মানুষের ভাষা বোঝে? ইম্‌পসিবল। শোনো, ওই ট্রেনারটি কে ? একবার আমার কাছে নিয়ে আসতে পারো?" ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

একদিন বাদে? সকালে সুনন্দ জুবিলি সার্কাসের রিং-মাস্টার অর্থাৎ অ্যানিম্যাল ট্রেনারকে আমাদের বাড়িতে এনে হাজির করল। সুনন্দ নাকি সেদিন ভোর থেকে সার্কাসের বেড়ার বাইরে ঘোরাফেরা করছিল। রিং-মাস্টারটি একবার বাইরে আসতেই তার সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ জমায়। এ-ব্যাপারে সুনন্দ ওস্তাদ। তারপর শান্তিনিকেতন দেখানোর ছুতো করে তাকে ঘোরাতে ঘোরাতে একেবারে নিজেদের বাড়িতে কফি খাওয়াবে বলে টেনে এনেছে।

মামাবাবু ও আমি বেরিয়ে এসে রিং-মাস্টারকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালাম। রিং-

মাস্টারটিরমুখ হাসি-হাসি, মনে হয় ফুর্তিবাজ ধরন। সবাই বসলাম বারান্দায় বেতের চেয়ারে। মামাবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার নাম?"

উত্তর এল, "মাইকেল দাস।"

"বাঙালি?"

"নিশ্চয়। কলকাতায় বাড়ি।"

"সার্কাসে ঢুকেছেন কদ্দিন?"

"প্রায় সাত বছর।"

"আপনার ট্রেনিং অদ্ভুত। জানোয়ারদের খেলা দেখাচ্ছেন কদ্দিন?"

"তিন বছর। আগে জিমনাস্টিক্স করতাম।"

"আপনি অ্যানিম্যাল ট্রেনিং শিখেছেন কার কাছে?"

"আমার গুরু নায়ারজি'র কাছ থেকে।"

"উনি এই সার্কাসে ছিলেন?"

"হ্যাঁ। আগে অবশ্য অনেক বড়-বড় সার্কাসে কাজ করেছেন। বয়স হয়ে শরীর খারাপ যাচ্ছিল। তখন এই ছোট দলে আসেন। আমাদের মালিক মুথুস্বামী ওঁর খুব বন্ধু।'

"নায়ারজি এখন কোথায়?"

"রিটায়ার করে দু-বছর আগে দেশে চলে গেছেন। সার্কাসের ঘোরাঘুরি আর তাঁর শরীরে পোষাচ্ছিল না।"

"এই সব জন্তু-জানোয়ারকে খেলা শিখিয়েছে কে? নায়ারজি?"

"হ্যাঁ, এরা নায়ারজির হাতেই তৈরি।"

'মানে এই মানুষের ভাষা বোঝার খেলা, এও কি নায়ারজির শেখানো?"

মাইকেল দাস কেমন আড়ষ্ট হয়ে মাথা নাড়ল।

"ও, নায়ারজি শেখাননি! তবে কি আপনি?"

মামাবাবুর প্রশ্নে দাস মুখ নিচু করে ফের মাথা নাড়ে।

"তাহলে?"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে দাস বলল, "এসব সাধুজির কৃপা।"

"মানে!" প্রশ্নটা আমাদের তিনজনের গলা দিয়েই একসঙ্গে বেরয়।

"মানে সাধুজির আশীর্বাদে ওরা কিছু-কিছু মানুষের ভাষা বুঝতে পারে। মাপ করবেন, এর বেশি আমি আর কিছু বলতে পারব না।"

মামাবাবু এই নিয়ে আর চাপাচাপি করলেন না। বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, ও প্রসঙ্গ থাক, আপনি বরং সার্কাসের গল্প বলুন। সার্কাসের লাইফ কেমন জানতে ইচ্ছে করে?"

মাইকেল দাস সার্কাসের গল্প শুরু করে। ক্রমে বেশ সহজ হয়ে ওঠে। সত্যি বিচিত্র জীবন তাদের। কত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। সাধারণ লোকের যা ধারণার বাইরে।

কফি ও কেক এল। খেতে খেতে মাইকেল দাসের গল্প চলে। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনি। ঘণ্টাখানেক বাদে সে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল।

দাস চলে যাওয়ার পর মামাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'উঁহু, রহস্যটা ক্লিয়ার হল না হে। ও

এড়িয়ে গেল। সুনন্দ, অসিত তোমরা সার্কাসটার ওপর নজর রাখবে। দ্যাখো কোনো ক্লু পাও কি না।"

দু'দিন পরে দুপুরবেলা সুনন্দ বলল, "জানেন মামাবাবু, আজ বাপি রায়কে দেখলাম সার্কাসে।"

"কে বাপি রায়?" মামাবাবু জানতে চাইলেন।

"সেই যে মেডিকেল কলেজের প্রফেসর, বিখ্যাত নিউরো সার্জন ডক্টর সেনের কাছে রিসার্চ করত। একদিন ডঃ সেনের সঙ্গে এসেছিল আমাদের বাড়িতে। খুব আমুদে।"

"হুঁ মনে পড়ছে," বললেন মামাবাবু, "ডঃ সেন বলেছিলেন, ছেলেটা ব্রিলিয়ান্ট তবে বড্ড খামখেয়ালি। খুব ভালো কাজ করছিল। কিন্তু হঠাৎ রিসার্চ ছেড়ে চলে গেছে। ডাঃ সেন আমায় বলেছিলেন যে বাপি নাকি জানিয়েছে যে ও মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি নিয়েছে। ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়। বাড়িতে টাকার প্রয়োজন তাই চাকরিটা নিতে হয়েছে। কিছুদিন পরে গিয়ে ফের রিসার্চে ঢুকবে। ডঃ সেন রাগ করেছিলেন, ওঁকে কেন বলল না চাকরি দরকার। তাহলে কলকাতাতেই কিছু একটা জুটিয়ে দিতে পারতেন। চাকরি ও রিসার্চ দুটোই চালাতে পারত। ছেলেটাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ডঃ সেন। কিন্তু ও এড়িয়ে গেছে, আসেনি। তা ও ওখানে কী করছে?"

সুনন্দ জানাল, "বাপি বলল, ও এই সার্কাসে চাকরি নিয়েছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। ওর নাকি সার্কাসের লাইফ খুব ভালো লাগে। খেলাও শিখছে। আরে, প্রথমে তো আমায় যেন চিনতেই পারে না। সকালে বাজারে গিয়েছিলাম। ভাবলাম সার্কাসটা এক চক্কর দেখে যাই। সার্কাসের বাইরে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখলাম ওকে। বাপি, বলে ডাকলাম। ও আমার দিকে একবার তাকিয়েই হন হন করে ভিতরে ঢুকে গেল। আমিও ছাড়বার পাত্র নই। লুকিয়ে নজর রাখলাম। ঘণ্টাখানেক বাদে মূর্তিমান গেটের বাইরে এল। এদিক-সেদিক দেখে গুটি গুটি গিয়ে দাঁড়াল কাছেই একটা সিগারেটের দোকানে। ব্যস্, আমিও গিয়ে খপ্ করে ওর হাত চেপে ধরে বললাম, আরে বাপি যে! আর যায় কোথা? তখন বলে কি না, হ্যাঁ, কে যেন ডাকল মনে হল। আমায় নাকি ও চিনতেই পারেনি। স্রেফ গুল। ইচ্ছে করে কেটে পড়েছিল।"

মামাবাবু কিঞ্চিৎ ভেবে বললেন, "আজ আমি আবার সার্কাস দেখতে যাব ভাবছি। তোমরা কেউ যাবে নাকি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব বইকি।" আমরা দুজন তৎক্ষণাৎ রাজি।

সেদিনও গেলাম পাঁচটার শোয়ে। মামাবাবুর নির্দেশমতো বসলাম চেয়ারে নয়, কাঠের তক্তা পাতা উঁচু গ্যালারিতে। জন্তু-জানোয়ারের খেলা শুরু হতেই দেখি মামাবাবু কাঁধের ঝোলা থেকে একটা দূরবিন বের করে চোখে লাগালেন।

বাঁদরের খেলা হল। কুকুরের খেলার শেষে মামাবাবু বললেন,"সুনন্দ, বায়নাকুলারটা দিয়ে দ্যাখ তো, পর্দার ধারে যে নিচু টুলে বসে, বাপি রায় কি না?"

সুনন্দ দূরবিন দিয়ে খানিক দেখে বলল,"হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে। তবে টুপি আর গোঁফ লাগিয়েছে। ওটা ফল্স গোঁফ, সকালে দেখিনি।"

সেদিনও প্রত্যেক জন্তুর সাধারণ খেলার শেষে ছিল তাদের মানুষের ভাষা বোঝার চমক!

তবে খেলাগুলো কিছু পাল্টানো হল। সেদিন মিলিটারি বাঁদর মানিকচাঁদকে দর্শকরা 'কুইক মার্চ' অর্ডার দিতেই খুঁটিকে পাক খেয়ে ঘুরতে শুরু করল। এবং হল্ট বলতেই থামল।

দর্শকরা মানিকচাঁদকে ভিতু বা কাওয়ার্ড বলতেই সে বেজায় খেপে গেল। 'দুঃখিত', 'মাপ কিজিয়ে' এবং 'সরি' বলতে তবে শান্ত হল।

কুকুর পঞ্চুকে সেদিন চোর অপবাদ দিয়ে চটানো হল না। ট্রেনারের কথামতো সেদিন পঞ্চুকে এক দর্শক বিস্কুট খাওয়াবার প্রতিশ্রুতি দিতে সে মহা ফুর্তিতে ল্যাজ নেড়ে দু'পা তুলে ঘুরে-ঘুরে নাচ দেখাল। এবং মাস্টার পটল সেই দর্শকের কাছ থেকে বিস্কুটের দাম বাবদ পঞ্চাশ পয়সা তক্ষুনি আদায় করে ছাড়ল। দর্শকদের অনুরোধ বা আদেশমাফিক ভাল্লুক জাম্ববান যথারীতি এক্সারসাইজ দেখাল এবং হুকুম করতেই থামল। সিংহ মহারাজও দর্শকদের কথায় মাটিতে শুয়ে নাক ডাকাতে শুরু করেছিল, কিন্তু বেশিক্ষণ আয়েস করা বেচারার ভাগ্যে নেই। কারণ একটু বাদেই তাকে উঠতে বলায় বাধ্য হয়ে গা তুলল। বোধহয় ভাল্লুক ও সিংহ এর বেশি মানুষের ভাষা বোঝে না।

ফেরার পথে মামাবাবুর মুখ থমথমে। কথা নেই। শুধু একবার বললেন, "বাপি রায়কে একবার আমার কাছে আনতে পারবে? নইলে অবশ্য আমিই যাব ওর কাছে।"

পরদিন সকালেই বাপি রায়কে নিয়ে সুনন্দ হাজির। সহজে তাকে পাকড়াতে পারেনি। কিঞ্চিৎ কৌশল করতে হয়েছিল। অনেকক্ষণ সার্কাসের ঘেরার বাইরে চক্কর মেরেও বাপির দেখা না পেয়ে সে সার্কাসের অন্য একজনকে ধরে। বলে,"আমি ভেটারিনারি হসপিটাল থেকে আসছি। আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মিস্টার রায়ের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।"

অনেক জন্তু-জানোয়ার নিয়ে কারবার, তাই সার্কাসওয়ালাদের কাছে ভেটারিনারি হসপিটাল বা পশু হাসপাতালের লোকদের খুব খাতির। ফলে জুবিলি সার্কাসের লোকটি তক্ষুনি সুনন্দকে নিয়ে সোজা হাজির করে বাপির তাঁবুতে। এরপর প্রফেসর ঘোষ ডেকেছেন শুনে বাপি সুড়সুড় করে চলে এসেছে।

বাপির চেহারাটা ছোটখাটো। সুশ্রী মুখ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বেশ স্মার্ট। তবে যেন কিঞ্চিৎ নার্ভাস। আমারই বয়সি। বাপির সঙ্গে সুনন্দ আমার আলাপ করিয়ে দিল।

মামাবাবু বললেন, "বোসো বাপি।" আমরা সবাই বসলাম বৈঠকখানায়।

মামাবাবু গম্ভীর গলায় বাপিকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই সার্কাসে কী করছ?"

"আজ্ঞে চাকরি," উত্তর দিল বাপি।

"তুমি না মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি নিয়েছিলে? ডঃ সেন বলেছিলেন আমায়।"

বাপি মাথা চুলকোয়। মুখে কথা নেই।

"জন্তুগুলোর মাথায় ইলেক্ট্রোড বসিয়েছে কে? তুমি?" ঠান্ডা গলায় কাটা-কাটা ভাবে মামাবাবুর মুখে এই অদ্ভুত কথাক'টি শুনে আমরা চমকে উঠলাম। বাপির চোখ বড়-বড়, ঢোক গিলছে।

মামাবাবু আবার বললেন, "তুমি বুঝি ওদের ব্রেন স্টিমিউলেট করছ রিমোট কন্ট্রোলে? আর ভাষা বোঝার খেলা দেখাচ্ছ?"

বাপি হতাশভাবে বলে উঠল,"হুঁ কট্। কাল আপনাকে বায়নাকুলার হাতে দেখেই ভয় হয়েছিল, হয়তো ধরা পড়ে যাব!"

"হঠাৎ এই মতলব হল কেন?" মামাবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"আজ্ঞে সে অনেক ব্যাপার।" বাপি করুণ মুখে উত্তর দিল।

"শুনি কী রকম?" বললেন মামাবাবু।

বাপি একটু ইতস্তত করে শুরু করল,"আজ্ঞে, আপনি তো জানেন ডক্টর সেনের কাছে আমার রিসার্চের বিষয়টা?"

"খানিকটা শুনেছিলাম," বললেন মামাবাবু।

"আমার রিসার্চ ছিল ব্রেনের বিভিন্ন নার্ভ সেন্টারগুলো খুঁজে বের করা। স্নায়ুকোষের নানান কাজের ফলে যেসব ইলেকট্রিক্যাল ইমপাল্সের সৃষ্টি হয়, তা পরীক্ষা করা এবং বাইরে থেকে পাঠানো ইলেকট্রিক্যাল ইমপালসের সাহায্যে ওই সমস্ত নার্ভ সেন্টারগুলোকে কৃত্রিম উপায়ে স্টিমিউলেট করা। জন্তু-জানোয়ার নিয়েই বেশির ভাগ এক্সপেরিমেন্ট করছিলাম। ভাবলাম, আমার বিদ্যেটা একটু হাতে-কলমে কাজে লাগাই।"

"তা এই সার্কাসে জুটলে কী ভাবে?" জিজ্ঞেস করলেন মামাবাবু।

"আজ্ঞে , এই জুবিলি সার্কাসের মালিক-কাম-ম্যানেজার মুথুস্বামীর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। যে লোকটি জাগলিং আর মাছসুদ্ধু জল খাওয়ার খেলা দেখায়, ওই মুথুস্বামী। বছর পাঁচেক আগে সোদপুরে আমার মামারবাড়ির কাছে যখন ওরা শো দিতে গিয়েছিল তখন পরিচয় হয়। সার্কাস আমার দারুণ ভালো লাগে। সুযোগ পেলেই তাই সার্কাসের লোকদের সঙ্গে ভাবজমাই। মুথুস্বামীর সঙ্গে ফের দেখা হল বছর-দেড়েক আগে ওই সোদপুরে। ওরা আবার খেলা দেখাতে এসেছিল। মুথুস্বামী দুঃখ করে বলল যে, তার সার্কাসের হাল খুব খারাপ। টিকিট বিক্রি কমে গেছে। বাজারে ধার জমেছে। এরকম চললে সার্কাস বিক্রি করে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তখনই আমার মাথায় এই আইডিয়াটা আসে। মুথু একটু দোনামনা করে রাজি হয়ে গেল আমার কথায়। কী করবে, বেচারার তখন নিরুপায় অবস্থা। তা আমার এক্সপেরিমেন্ট সাসসেস্ফুল। টিকিট সেল খুব বেড়েছে। ধার শোধ হয়ে গেছে। মুথুস্বামীর হাতে এখন দু-পয়সা জমেছে। এবার ওর সার্কাসের চেহারা ফিরে যাবে।

"ইলেক্ট্রোডগুলো জন্তুগুলোর রঙের সঙ্গে মিলিয়ে এমন ভাবে রাখা আছে যাতে দূর থেকে দেখলে মোটেই ধরা না যায়। তবে আপনার ট্রেণ্ড চোখ, আবার বায়নাকুলার দিয়ে দেখলেন। এই ভয়েই বড় শহরে খেলা দেখাতে যাইনি। পাছে আপনাদের মতো সায়ান্টিস্টদের কাছে ধরা পড়ে যাই।" বাপি ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

"তুমি কি সারাজীবন এই করবে?" মামাবাবু কড়া গলায় জানতে চাইলেন।

"না, না, তা কেন করব," বাপি আপত্তি জানাল, "এক বছরের কন্ট্রাক্ট। আর তিন মাস বাকি। ব্যস্, তারপরে আমার ছুটি। ফের তখন ডঃ সেনের কাছে রিসার্চে ঢুকব। তবে সার্কাসের লাইফটা কিন্তু ভারি ইন্টারেস্টিং।"

"প্লিজ একটু বুঝিয়ে বলবেন," আমি আর ধৈর্য রাখতে পারি না। "জন্তুগুলোর ভাষা বোঝার খেলার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?"

বাপি সপ্রশ্নভাবে মামাবাবুর দিকে চাইল। মামাবাবু বললেন, "দাও বুঝিয়ে, তবে অল্প কথায়।"

"অল রাইট, " বাপি নিজের মাথায় একটা টোকা দিয়ে বলল, "এই হচ্ছে আমাদের মস্তক, মানে মাথা। এই মাথার নীচে আছে ব্রেন, মানে মগজ। অতি রহস্যময় এবং দরকারি বস্তু। এর জোরেই আমরা করে খাই। মগজে আছে কোটি কোটি নিউরোন অর্থাৎ স্নায়ুকোষ। মগজের ভিতরে এক-এক জায়গাকার স্নায়ুকোষের কাজ এক-এক রকম। মগজের এই স্নায়ুকোষগুলির নির্দেশেই আমরা এক-এক ধরনের কাজ করি।

"বাইরের পরিবেশে কত রকম ঘটনা ঘটেছে, সেই সব খবর আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় গ্রহণ করে এবং স্নায়ুতন্ত্র মারফত তা ক্রমাগত ব্রেনে গিয়ে পৌঁছয়। জানেন তো, আমদের শরীরে প্রায় সব জায়গাতেই আছে স্নায়ুকোষ এবং স্নায়ুকোষগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। মগজ বা মস্তিষ্কই হচ্ছে স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান। কোনো খবর আমাদের মগজে পৌঁছনোমাত্র মগজ ঠিক করে ফেলে এর ফলে আমাদের শরীরে কী কী প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত এহং সেই অনুযায়ী নির্দেশ দেয়।

"যেমন ধরুন, চোখে একটা কিছু দেখলাম। চোখের স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে সেই ঘটনা পৌঁছে যাবে মগজে। মগজ হয়তো তৎক্ষণাৎ ঠিক করে ফেলবে যে, এই দৃশ্য দেখে আমার চটে যাওয়া উচিত। অমনি ব্রেনের যে স্নায়ুকোষগুলি রাগকে চালনা করে সেই কোষগুলি স্টিমিউলেটেড হবে, অর্থাৎ উদ্দীপিত হয়ে উঠবে এবং ওই কোষগুলি শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠাবে। যেমন ধরুন, আমার শরীর হয়তো গরম হয়ে উঠবে, হয়তো আমার চোখ বড় বড় হবে বা পেশি শক্ত হয়ে উঠবে।

"আবার যদি দৃশ্যটায় আনন্দ হওয়া উচিত বলে মনে করে ব্রেন, তাহলে প্লেজার সেন্টার বা স্ফূর্তির কেন্দ্রে খবর যাবে। প্লেজার সেন্টারের স্নায়ুকোষগুলি উদ্দীপিত হবে এবং তাদের নির্দেশে আমি স্ফূর্তির লক্ষণ দেখাব। যেমন, হাসতে পারি দাঁত বের করে, বা হো-হো করে। হয়তো আনন্দে গড়াগড়ি খাব, বা কুকুর হলে লেজ নাড়ব। সবই হবে আমার প্লেজার-সেন্টারের স্নায়ুকোষদের হুকুমে।

"মনে রাখবেন, বাইরের পরিবেশের প্রভাব ছাড়াও ব্রেন আমাদের চালায়। যদি সে মনে করে আপনার এখন ডান হাতখানা নাড়ানো উচিত, অমনি যে স্নায়ুকোষগুলি আপনার ডান হাতখানা চালনা করে, সেগুলি উত্তেজিত হয়ে নির্দেশ পাঠাবে এবং আপনিও আপনার ডান হাত নাড়াতে শুরু করবেন। নির্দেশ পাঠানো বন্ধ হলেই হাত নাড়া থেমে যাবে।

"এই ভাবে ব্রেনের স্নায়ুকোষ আমাদের চালায়। এখন পরীক্ষা করে জানা গেছে, প্রাণীর স্নায়ুকোষ উদ্দীপিত হলেই তাতে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়। এবং তার ফলে সেখানে ইলেকট্রিক্যাল ইমপাল্‌স অর্থাৎ বৈদ্যুতিক স্পন্দন সৃষ্টি হয়। খুব সূক্ষ্ম সেই স্পন্দন। এই বৈদ্যুতিক স্পন্দন বা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ স্নায়ুতন্ত্রের পথ বেয়ে ছুটে চলে।

"দেখা গেছে, মানুষ এবং উন্নত প্রকারের মেরুদণ্ডী প্রাণীর মগজের গঠন প্রায় একই রকম। বৈজ্ঞানিকরা খুঁজে দেখছেন, নানারকম প্রাণীর মগজের কোন্ কোন্ অঞ্চল কী কী কাজ করে। ব্রেনের কোন্ কোন্ জায়গাকার নিউরোন স্টিমিউলেটেড হলে কী ধরনের কারেন্ট তৈরি হয়।

তবে উন্নত প্রাণীর ব্রেনের বহু অংশের কাজই এখনও আমাদের অজানা। আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে।

"বৈজ্ঞানিকরা প্রাণীদের মগজের নানা অনুভূতির কেন্দ্র, যেমন স্ফূর্তি, খিদে, রাগ, বেদনা, ঘুম ইত্যাদির নার্ভ-সেন্টারগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে স্টিমিউলেট করতে চেষ্টা করছেন। ব্যাপারটা এমন কিছু কঠিন নয়। খুলি ফুটো করে খুব সরু একটা ইলেকট্রোডের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিক কারেন্ট পাঠাতে হবে। বিশেষ শক্তির বৈদ্যুতিক তরঙ্গ। তাহলেই যেখানে ইলেকট্রোডের ডগাটা ছুঁয়েছে সেখানকার স্নায়ুগুলি স্টিমিউলেটেড হবে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠাবে। আবার কারেন্ট পাঠানো বন্ধ করলেই কোষগুলি নিস্তেজ হয়ে পড়বে এবং নির্দেশ পাঠানো বন্ধ হবে। আমার সার্কাসের এক্সপেরিমেন্টও এই কায়দায় হচ্ছে।"

এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনছিলাম এই আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক বিবরণ। এবার জিজ্ঞেস করলাম, "ইলেকট্রোড কী?"

বাপি একটা লম্বা দম নিয়ে মামাবাবুর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে বলল, "উঃ, গলাটা শুকিয়ে গেছে। একটু চা-টা যদি—"

মামাবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। দ্যাখো কাণ্ড, খেয়ালই নেই। সুনন্দ, যাও তো একটু ব্যবস্থা করো।"

সুনন্দ ভিতরে উঠে গেল।

চা-টায়ের আশ্বাসে খুশি হয়ে বাপি আমার দিকে ফিরে বলল, "ইলেকট্রোড কী জানেন, সোজা কথায় খুব সরু শক্ত বিদ্যুৎ পরিবাহী তার। তারের গা-টা ইনসুলেটেড করা। কেবল ডগায় একটু চেঁছে ধাতু বের করা। তারের অন্য প্রান্তের সঙ্গে যোগ থাকবে ব্যাটারির। ইলেকট্রোডের ডগাটা ব্রেনের যে অনুভূতির কেন্দ্রকে চাগাতে চাই সেখানটা ছুঁয়ে থাকবে।"

সার্কাসের জানোয়ারদের মানুষের ভাষা বোঝার খেলার রহস্যটা এবার আমার কাছে খানিক পরিষ্কার হল। বললাম, "আচ্ছা সার্কাসের ভাল্লুকটা যে ঘাড় নাড়ল, হাত নাড়ল সেটা কি ওই?"

বাপি হেসে বলল, "হ্যাঁ, ওই ইলেকট্রোডের মহিমায়।"

"আচ্ছা বাঁদরটা কেন হঠাৎ কলা খাওয়া থামাল?" প্রশ্নটা সুনন্দর। সে ইতিমধ্যে চায়ের ব্যবস্থা করে ফিরে এসেছিল।

বাপি বলল, "ওর খিদে মিটে যাওয়ার নার্ভ-সেন্টার চাগিয়ে দিতেই ও খাওয়া থামায়। আবার হাঙ্গার-সেন্টারকে স্টিমিউলেট করলেই খেতে চায়।"

"আর কুকুরটা যে চটে গেল?" সুনন্দর কৌতূহল মেটেনি।

"নিজে থেকে চটেনি। আমিই চটিয়ে দিয়েছিলাম কৃত্রিম উপায়ে। ওর রাগের কেন্দ্রে ইলেকট্রোডের সাহায্যে ইলেকট্রিক কারেন্ট পাঠিয়ে। আবার কারেন্ট অফ করতেই শান্ত হয়ে গেল।"

মামাবাবু বললেন "হুম। আমি বায়নাকুলার দিয়ে ওই কুকুরটার মাথাতেই একটা তার আটকানো দেখে ইলেকট্রোড বলে সন্দেহ করেছিলাম। তা ওটা চার্জ করার ব্যাটারিটা কোথায় ছিল? বকলেসের গায়ে?

"আজ্ঞে ঠিক ধরেছেন।" জবাব দিল বাপি।

চণ্ডী ট্রে হাতে ঢুকল ঘরে। ট্রে রাখা হল সামনের টেবিলে। তাতে চার কাপ চা। একটা প্লেটে দু-টুকরো বড়-বড় কেক। এবং আরেকটা প্লেটে অনেকখানি চানাচুর।

বাপি সঙ্গে সঙ্গে একটা কাপ টেনে নিয়ে চায়ে একটা চুমুক দিয়ে গোটা একখানা কেক তুলে মুখে পুরল। মামাবাবু বললেন, "খাও খাও,কেক-টেক তোমার জন্য। আমরা শুধু চা খাব।" ব্যস, বাপির কথা বন্ধ, মুখ ভর্তি। বোঝা গেল সে আর বৈজ্ঞানিক লেকচারে রাজি নয়।

মামাবাবু বললেন, "আমি একবার সরেজমিনে দেখতে চাই ব্যাপারটা। এখন নিয়ে যেতে পারবে তোমাদের সার্কাসে? এখন তো খেলার টাইম নয়।"

চানাচুর চিবুতে চিবুতে বাপি ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

জুবিলি সার্কাসের সামনে আমরা চারজন যখন সাইকেল-রিকশা থেকে নামলাম তখন সকাল প্রায় দশটা। বাপি আমাদের নিয়ে গেট খুলে খেলা দেখাবার বড় তাঁবুর ভিতর দিয়ে সোজা চলল। দুটি ছেলেমেয়ে তখন তাঁবুতে একচাকার সাইকেলের কসরত অভ্যাস করছিল। আরও দুটি লোক ঠকাঠক শব্দে গ্যালারির তক্তা পেটাচ্ছিল। তারা নিজেদের কাজ ফেলে অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। বাপির দৃক্‌পাত নেই। আমরা বাপির পিছনে পিছনে হেঁটে তাঁবুর অন্য ধার দিয়ে বেরুলাম। এটা সার্কাসের পিছন দিক। এখানে সারি-সারি ছোট-ছোট তাঁবু। উনুনের ধোঁয়া উড়ছে। ঘরোয়া বেশে একটি মেয়ে মাটিতে চট পেতে বসে কী জানি সেলাই করছে। সার্কাসের স্ট্রংম্যান মিঃ ভীম, লুঙ্গি ও গেঞ্জি গায়ে একখানা ভিজে গামছা শুকোতে দিচ্ছে দড়িতে। এখানে-ওখানে জন্তুদের খাঁচাগুলো।

বাপি আমাদের নিয়ে কাছেই একটা তাঁবুর সামনে হাজির হল। তাঁবুর পর্দা তোলা। দেখলাম মুথুস্বামী ভিতরে চেয়ারে বসে টেবিলে রাখা একটা মোটা খাতায় কিছু লিখছে ঝুঁকে। তাঁবুর ভিতরে আরও কয়েকখানা চেয়ার। আমাদের পায়ের শব্দে মুথুস্বামী চোখ তুলে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল। আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বলে বাপি ঢুকে গেল তাঁবুতে।

মুথুস্বামীর সঙ্গে বাপি কী সব কথা বলল, আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে। মুথুস্বামী হন্তদন্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে এসে আমাদের বলল, "গুড মর্নিং জেন্টেলমেন" এবং হ্যান্ডশেক করল আমাদের সবার সঙ্গে। তারপর সে মামাবাবুকে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল, "আপনারা এই টেন্টে বসুন। এটায় জায়গা বেশি। এটা আমার অফিস। আমি আসছি।" এই বলে সে অত্যন্ত বিনীত ভাবে হেসে বিদায় নিল।

তাঁবুতে ঢুকে বসলাম চেয়ারে। মামাবাবু জিজ্ঞেস করলেন বাপিকে, "কী বললে তুমি আমাদের সম্বন্ধে?"

বাপি হেসে বলল, "বললাম, আপনি আমার এক্স প্রফেসর। নাম করা সায়ান্টিস্ট। আর অন্য দুজন আমার ক্লাসমেট ছিল। আপনারা সার্কাস দেখতে এসে জন্তুদের ভাষা বোঝার রহস্যটা ধরে ফেলেছেন এবং আমার এক্সপেরিমেন্টটা দেখতে চান। আমি আসছি এক্ষুনি।" এই বলে বাপি উধাও হল।

মিনিট দু-তিন বাদেই বাপি ফিরে এল, সঙ্গে কুকুর পঞ্চু। পঞ্চুকে আমাদের মাঝখানে রেখে

নিচু হয়ে তার গায়ে হাত দিয়ে বাপি বলল, "এই দেখুন।" বলতে বলতেই সে চকিতে মাথা তুলে এক ধমক— "এই পটল, এখানে কী? ভাগ।"

আমরাও ফিরে দেখি, তাঁবুর দরজায় মাস্টার পটল উঁকি দিচ্ছে।

পটলের মুখে তখন রঙচঙ নেই। মাথায় টুপি বা হাতে কাঠটাও নেই। খালি পা। তবে ঢলঢলে পোশাকটা একই রকম। পটল তার বোঁচা নাক ও কুতকুতে চোখ কুঁচকে ঝট করে একট স্যালুট ঠুকে আমাদের দেখিয়ে বলল, "সিনেমার লোক বুঝি? তা স্যার শুধু পঞ্চুকে কেন, আমাকেও নিন। ফাইটিং হিরো। বই বেরুলেই হিট। দেখবেন সব হলে টিকিট ব্ল্যাক হবে।" এই বলে সে হাত-পা ছুড়ে এক রাউন্ড ফাইট দেখিয়ে দিল।

বাপি তাড়া লাগাল, "পটল জ্বালাস নে। পালা বলছি। নইলে টঙে তুলে দেব। ডাকচি মাইকেলকে।"

শুনেই "উরে পিছিমা গো," বলে পটল পাঁই পাঁই করে মারল দৌড়।

"টঙ কী?" আমি জানতে চাইলাম।

"একটা খুব উঁচু টুল। পটলকে জব্দ করতে হলে ওর ওপর চড়িয়ে দেওয়া হয়। বেচারা আর নামতে পারে না। শাস্তিটা রিং-মাস্টার মাইকেলের আবিষ্কার। পঞ্চুকে একবার সিনেমায় অ্যাকটিং করতে নিয়েছিল। সেই থেকে পটল পিছনে লাগে। আসলে ও পঞ্চুকে খুব ভালবাসে। ওর কাছ থেকে পঞ্চুকে নিয়ে এলাম, তাই কৌতূহলে দেখতে এসেছে।"

আমরা এবার মন দিয়ে পঞ্চুকে দেখতে থাকি। বাপি পঞ্চুর মাথা ও ঘাড়ের লোম ফাঁক করে দেখাল, "এই যে ইলেকট্রোডের তার।"

দেখলাম, সাদা রঙের খুব সরু কয়েকটা তার পঞ্চুর মাথা থেকে নেমে এসে তার দু-ভাঁজ বকলসের ভিতর ঢুকে গেছে।

"এ যে অনেকগুলো তার", বলল সুনন্দ।

"হ্যাঁ, তিনটে। কারণ ওর মাথায় তিনটে ইলেকট্রোড বসানো আছে। তিন জায়গার নার্ভ-সেন্টার ছুঁয়ে আছে। বকলসে আটকানো ব্যাটারির সঙ্গে একটা করে ইলেকট্রোডের তার যোগ করা আছে।"

"মানে তিনটে ইলেক্ট্রোডের সঙ্গে তিনটে ব্যাটারি।" সুনন্দ জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ, খুব ছোট-ছোট ব্যাটারি।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "এইভাবে ইলেকট্রোড বসানো থাকলে প্রাণীর ব্যথা লাগে না?"

"মোটেই না," বলল বাপি, "যখন খুলি ফুটো করে বসানো হয় তখন তাকে অজ্ঞান করে নেওয়া হয়। ইলেক্ট্রোডগুলো এত সরু যে প্রাণী তাদের অস্তিত্বই টেরই পায় না। একই প্রাণীর ব্রেনে একসঙ্গে কয়েকটা ইলেক্ট্রোড বসানো থাকলেও তার ব্রেনের ক্ষতি হয় না। এবং অনেকদিন এইভাবে রাখা যায়।"

মামাবাবু এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। এবার প্রশ্ন করলেন, "ডক্টর সেন, মানে তোমরা মানুষের ব্রেনে ইলেক্ট্রোড বসিয়েছ কখনও?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ", বলল বাপি, "মাত্র দু-বার। জানেন তো মানুষের মাথায় ইলেকট্রোড বসানো কী ঝামেলা। এক্সপেরিমেন্টের জন্য লোকই পাওয়া যায় না। আমরা সাধারণত উন্নত ধরনের

মেরুদণ্ডী প্রাণী, যেমন বাঁদর, বেড়াল, কুকুর এইসব নিয়েই পরীক্ষা করতাম। ওদের মস্তিষ্কের গঠন প্রায় মানুষেরই মতন। এই জন্যেই তো সার্কাসে খেলা দেখানোয় সুবিধে হয়ে গেল।" একটু দুষ্টু হাসল বাপি।

"হুম্" মাথা নেড়ে মামাবাবু বললেন, "তুমি তো রিমোট-কন্ট্রোল করো, কীভাবে? তাহলে তো ট্রান্সমিটার চাই।"

"হ্যাঁ, ওই যে ট্রান্সমিটারটা, তাঁবুর কোণে চৌকির ওপর, ঝালর-লাগানো পাতলা কাপড়ে ঢাকা। ওটা খেলার সময় রিংয়ের ঠিক ধারে মাটিতে রাখা থাকে। লোকে বুঝতে পারে না জিনিসটা কী। ট্রান্সমিটারের সঙ্গে কয়েকটা ইলেকট্রিক তার লাগানো। ওই দেখুন গুটনো তার। তারগুলো এক খণ্ড কাঠের গায়ে আটকানো কয়েকটা সুইচের সঙ্গে যোগ করা। ওই যে সুইচ-বোর্ড। খেলার সময় সুইচ-বোর্ডটা থাকে দূরে আমার কাছে। আর ইলেকট্রিক তারগুলো মাটিতে এমনভাবে বিছানো থাকে যাতে করে দর্শকের নজরে না পড়ে। আর পড়লেই বা কী? ওর আসল উদ্দেশ্য কার মাথায় আসবে? আমি সুইচ টিপে ট্রান্সমিটার কন্ট্রোল করি। সুইচ্ অন করলে ট্রান্সমিটার থেকে রেডিও-ওয়েভ পাঠানো যায়। জন্তুদের বকলসের ভিতর ব্যাটারির সঙ্গে এমন ব্যবস্থা আছে যাতে ওই ওয়েভ ধরা পড়ে এবং বেতার-তরঙ্গ বিদ্যুৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে ইলেকট্রোডের মাধ্যমে মগজের অনুভূতি কেন্দ্রে গিয়ে ঘা দেয়।"

মামাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আলাদা আলাদাভাবে ইলেকট্রোডগুলো চালু করো কী ভাবে?"

বাপি বলল, "রেডিও-ওয়েভ লেংথ্ চেঞ্জ করে। আমি আলাদা আলাদা সুইচ্ টিপলে আলাদা আলাদা লেংথের রেডিও-ওয়েভ ট্রান্সমিটার থেকে বার হয়। এবং ব্যবস্থামতো এক-একটা ইলেক্ট্রোড এক-একরকম ডেরিও ওয়েভ লেংথে চালু হয়। সুইচ্ বন্ধ করলে ইলেক্ট্রোডও অফ্ হয়ে যায়।"

মামাবাবু বললেন, "এমন আশ্চর্য যন্ত্রটা বানাল কে? তুমি না ডক্টর সেন?"

বাপি বলল, "আজ্ঞে স্যারের কাছ থেকেই শিখেছিলাম মেকানিজম্টা। উনি সুইডেনের এক বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে যন্ত্রের ডিজাইনটা জেনে এসেছিলেন।"

মামাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "এই সিক্রেট তুমি এভাবে সার্কাসের খেলায় লাগাচ্ছ জানলে ডঃ সেন কি খুব খুশি হবেন?"

বাপি একেবারে মামাবাবুর পায়ের কাছে হামলে পড়ল, "প্লিজ প্রফেসর ঘোষ, দয়া করে স্যারকে বলবেন না এই সার্কাসের কথা। এ-বিদ্যে আমি আর কাউকে শেখাইনি। সার্কাসের লোকে কেউ-কেউ জানে এটা একটা বৈজ্ঞানিক কৌশল। ব্যস্, ওই পর্যন্ত। এর মাথামুণ্ডু কিছু বোঝে না। আবার কেউ ভাবে এটা ভূতুড়ে অলৌকিক ব্যাপার। ভয়ে তারা বাক্সটা ছোঁয় না অবধি। মুথুস্বামীর কড়া নিষেধ আছে এ-সম্বন্ধে একটি কথাও যেন কেউ বাইরে ফাঁস না করে। সার্কাসের প্লেয়ারদের মধ্যে ওর ছেলে, মেয়ে, জামাই, ভাইপো এমন আত্মীয়র সংখাই বেশি। এবং সবাই খুব বিশ্বাসী। সার্কাসের সবাই বোঝে ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলে সার্কাসের সর্বনাশ হবে, ফলে তাদেরও রুজি নষ্ট হবে।"

"ডঃ সেন এই এক্সপেরিমেন্টটা করছিলেন কেন? ডাক্তারিতে কী কাজে লাগাবে?" জিজ্ঞেস করল সুনন্দ।

বাপি বলল, "অনেক অনেক কাজে। এর বিরাট ফিউচার। যেমন ধরো, একজন মানসিক রুগি সর্বদা বিষণ্ণ। অর্থাৎ তার ব্রেনে ফুর্তি বা আনন্দের উৎস যে নার্ভ-সেন্টারে সেটা ঠিকভাবে কাজ করছে না। বাইরে থেকে যদি কৃত্রিম উপায়ে ওই স্নায়ুগুলোকে চাঙ্গা করা যায়, তাহলে রুগি তার মনের ফুর্তি ফিরে পাবে। সুস্থ হয়ে উঠবে।"

"আবার পশুদের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা গেছে যে, রাগ ভয় উত্তেজনা অতিরিক্ত হলে তাদের শরীরে নানা রকম রোগ দেখা যায়। মানুষের বেলাতেও ওই একই ব্যাপার ঘটে। তাই আমি সার্কাসের জন্তুদের বেশি রাগাতে বা উত্তেজিত করতে চাই না। যাহোক, এই ধরনের রোগ হবার কারণটা বোঝা গেলে, ওষুধ দিয়ে তার মানসিক উত্তেজনা কমিয়ে স্নায়ু সুস্থ করে তুললে, রোগও ভাল হয়ে যাবে। এছাড়াও আরও অনেক সম্ভাবনা আছে। পৃথিবীর নানান জায়গায় এই নিয়ে রিসার্চ চলছে।"

তাঁবুর দরজায় মুথুস্বামী দেখা দিল। পিছনে একটি লোকের হাতে ট্রে-তে সাজানো পাঁচ কাপ গরম কফি। ট্রে রাখল টেবিলে। মামাবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "আহা এখন কফি কেন? ছি-ছি অসময়ে হাঙ্গামা।"

মুথুস্বামী বলল, "প্লিজ কফিন খান। আমি শুনেছি আপনি একজন ফেমাস্ সায়ান্টিস্ট। সায়ান্টিস্টদের কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ।" সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বাপির দিকে তাকাল। বাপি খোশমেজাজে মাথা নেড়ে তক্ষুনি এক কাপ কফি তুলে নিল। মুথুস্বামীও আমাদের সঙ্গে কফি পান করতে বসল। বৈজ্ঞানিক আলোচনার ওখানেই ইতি। বাপি ইঙ্গিত করতে ট্রে-বাহী লোকটি পঞ্চুকে নিয়ে চলে গেল।

কফি খেয়ে তাঁবু থেকে বেরুতেই দেখি মাইকেল দাস দূরে দাঁড়িয়ে। সে আমাদের দিকে চেয়ে একবার হাসল। ও হয়তো বুঝতে পেরেছিল আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য। মাইকেল কিন্তু কাছে এগিয়ে এল না। বোধহয় ওর সঙ্গে যে আমাদের আলাপ হয়েছে তা মুথুস্বামী বা বাপির সামনে প্রকাশ করতে নারাজ। আমরাও পরিচয়টা চেপে গেলাম।

গেট থেকে বিদায় নেবার মুখে মুথুস্বামী বলল, "মিস্টার রায়ের এক্সপেরিমেন্টের কথাটা আপনারা বাইরে প্রকাশ করবেন না, প্লিজ। তাহলে আমাদের সার্কাসের খুব লোকসান হবে, বুঝতেই পারছেন—"

মামাবাবু আশ্বাস দিলেন, "না না, আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।"

আমরা রিক্‌শায় ওঠার সময় বাপি হেসে বলল, "যাক বাঁচলাম, ভয় হচ্ছিল স্যারকে বুঝি বলে দেবেন গিয়ে।"

"হুঁ, তাই দেব", মামাবাবু ধমকালেন, "সার্কাসে আর তুমি বেশিদিন থাকলে ঠিক জানিয়ে দেব মিঃ সেনকে।"

বাপি হাত কচলাতে কচলাতে বলল, "আর তিন মাস। ব্যস, তারপর আর একটা দিনও নয়। ফিরে গিয়ে স্যারের কাছে তেড়ে রিসার্চে লাগব। কথা দিচ্ছি।"

"ঠিক আছে, আমিও খোঁজ রাখব।" মামাবাবু ওয়ার্নিং দিলেন।

আরও চারটে দিন কেটে গেল। সার্কাসের দিকে আর যাইনি। বাপির সঙ্গেও আর দেখা হয়নি। পঞ্চম দিন সকালে বাপি আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। দু-একটা দায়সারা কথার পর চোখ মিটমিট করে বলল, "আপনারা আজ একবার সার্কাসে চলুন। একটা মজা হবে। লাস্ট শো আটটায়, যাবেন।"

"কী মজা?" জানতে চাইলাম।

বাপি রহস্যময়ভাবে বলল, "হেঁ-হেঁ এখন বলব না, পরে। যাবেন কিন্তু। নইলে খুব মিস্ করবেন।"

অবশ্যই সেদিন আমরা গেলাম সার্কাসে, আটটার শোয়ে বসলাম দু-টাকার সিটে। দেখলাম রাতের শোয়েও দর্শকের ভিড় বেশ। বোধহয় আজব খেলার খবরটা খুব ছড়িয়েছে।

খেলা যথারীতি শুরু হল। লক্ষ করলাম, দু-টাকার সিট থেকে বেশ খানিক তফাতে, এক টাকার গ্যালারি যেখানে শেষ হয়েছে তার কাছে খেলা দেখাবার গোল ঘেরা জায়গা অর্থাৎ রিংয়ের ঠিক ধারে দু'জন লোক পাশাপাশি চেয়ারে বসে। লোকদুটি চেনা। একজনের গায়ে ছাইরঙা স্যুট। বেঁটেখাটো ভারী চেহারা, মোটা গোঁফ। অপরজনের পরনে হলুদ রঙের স্পোর্টস গেঞ্জি, কালো ট্রাউজার্স এবং মাথায় সাদা কাউন্টি ক্যাপ। এই লোকটি মাথায় লম্বা, দোহারা শক্ত গড়ন। দু'জনেই মাঝবয়সি এবং ভারিক্কি ধরন। মনে হল লোক দুটি হোমরা-চোমরা কেউ হবে। নইলে অমন রিংয়ের ধারে আলাদা করে বসাবে কেন? কাপড়ে ঢাকা ট্রান্সমিটারের বাক্সটাও দেখলাম। রিং ঘেঁষে মাটিতে রাখা।

খেলা চলতে চলতে বাঁদর মানিকচাঁদের খেলা শুরু হল। আজ সে দর্শকদের অনুরোধে লেজ নাড়া দেখাল এবং থামতে বলা মাত্র থামল। এইসময়ে দেখি মুথুস্বামী এসে আলাদা চেয়ারে বসা লোকদুটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কী জানি কথা বলল দুজনের সঙ্গে। তারপর মুথুস্বামী চলে গেল তাঁবুর বাইরে। এবং ট্রেনার মাইকেল দাস মানিকচাঁদের থেকে খানিক তফাতে গিয়ে দাঁড়াল।

এবার টুপি-পরা লোকটি চেয়ারে বসে বসেই একটু ঝুঁকে নিচু গলায় কিছু বলল মানিকচাঁদকে। অমনি বাঁদরটা রেগে দাঁত খিঁচোতে খিঁচোতে খুঁটি ধরে ঝাঁকাতে লাগল। কাউন্টি-ক্যাপ চমকে পিছিয়ে বসলেন। তাঁর মুখ নড়ছে। মনে হল কিছু বলছেন। ফের মানিকচাঁদ শান্ত। বোধহয় বেগতিক বুঝে কাউন্টি-ক্যাপ মাফ চেয়ে নিয়েছেন মানিকচাঁদের কাছে। বাঁদরের খেলা আর হল না। মানিকচাঁদ ফিরে গেল। সেই স্পেশাল দর্শক দুজন গুম মেরে বসে রইলেন।

বাপিকে দেখলাম তাঁবুর গা ঘেঁষে ভালোমানুষের মতো একটা টুলে বসে রয়েছে। কে বলবে, উনিই এই রহস্যের আসল মেঘনাদ।

পঞ্চু কুকুর এল। অন্যান্য খেলা দেখানোর পর সেও দেখাল মানুষের ভাষা বোঝার কেরামতি। এবারও সেই কাউন্টি-ক্যাপ পরা দর্শকটি কিছু বলল পঞ্চুর উদ্দেশে। অমনি পঞ্চু রাগে গরগর করে উঠল। কাউন্টি-ক্যাপ আবার কিছু বলামাত্র পঞ্চু ঠান্ডা। বিশিষ্ট দর্শক দুজন পরস্পর চোখাচোখি করলেন।

ভাল্লুক জাম্ববানের খেলার সময়ও সেই একই ঘটনা। তবে এবার ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ গুরুতর দাঁড়াল।

জাম্ববান নিজের খেলা অর্থাৎ দর্শকদের কথামতো এক্সারসাইজ দেখানো শেষ হলে লক্ষ করলাম মুথুস্বামী এসে ওই দুই খাতিরের দর্শককে কিছু বলল। দুজনের মধ্যে স্যুট-পরা রাশভারী লোকটি এরপর হাত নেড়ে কী সব ইশারা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাইকেল সমেত সার্কাসের সব লোকজন চলে গেল খেলার তাঁবুর বাইরে। বেঁটে জোকার মাস্টার পটলও একছুটে পালাল। বাপিও লুকল পর্দার পিছনে। অর্থাৎ সার্কাসের লোকজনরা সবাই চোখের বাইরে গেল।

অন্য দর্শকরা অবাক। ভাবছে, এ নিশ্চয় নতুন কোনো খেলা। দেখলাম তাঁবুর কাপড় ফাঁক করে বাপির মুখ উঁকি মারছে। এবার সেই স্যুট-পরা ভদ্রলোক কিছু বললেন জাম্ববানকে উদ্দেশ করে। জাম্ববান নির্বিকার। লোকটি নিচু স্বরে কী জানি বলে চলেছেন।

হঠাৎ জাম্ববান বিকট গর্জন করে উঠল। তার শাঁকালুর মতো দাঁত এবং থাবার প্রকাণ্ড নখগুলো বিস্ফারিত। চোখ জ্বলছে। ভাগ্যিস সে বাঁধা ছিল খুঁটিতে, নইলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড হতে পারত। দর্শকদের ভিতর বাচ্চারা চিৎকার করে কেঁদে উঠল ভয়ে। বড়দের অবস্থাও সঙ্গিন। বেশির ভাগই হুড়োহুড়ি করে দাঁড়িয়ে উঠল। কেউ-কেউ ছুটে গেল বেরুবার গেটের দিকে। রীতিমতো এক বিপর্যয়।

স্পেশাল দর্শক দুজনও কম ঘাবড়াননি। জাম্ববানের রুদ্রমূর্তি দেখে কাউন্টি-ক্যাপ তৎক্ষণাৎ উঠে পিছনে মারলেন একলাফ। আর স্যুট-পরা চমকে পিছু হটতে গিয়ে পড়লেন চেয়ার উলটে।

জুবিলি সার্কাসের মালিক, রিং-মাস্টার এবং আরও কয়েকজন দৌড়ে এল। স্যুট পরাকে টেনে তুলল। রিং-মাস্টার মাইকেল দাস হাত নেড়ে জাম্ববানকে কিছউ বলতেই সে আবার ঠান্ডা হয়ে গেল। দর্শকরাও ক্রমে শান্ত হয়ে যে যার আসন নিল। ওই দুই মাননীয় অতিথি কিন্তু আর খেলা দেখার জন্য বসলেন না। স্যুট-পরা লোকটি পোশাকের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন, পিছু-পিছু কাউন্টি-ক্যাপ এবং তাদের পিছনে গেল বিব্রত মুথুস্বামী।

পরদিন ভোরেই বাপি আমাদের বাসায় হাজির। একগাল হেসে বলল, 'কী, কেমন জমেছিল কাল?"

"কে ওরা দুজন? মানে রিংয়ের ধারে আলাদা বসেছিল," আমি জিজ্ঞেস করলাম,"খুব খাতিরের লোক বলে মনে হল?"

বাপি বলল, "তা বটে। খাতিরের লোকই বটে। ডায়মন্ড সার্কাসের ম্যানেজার আর রিং-মাস্টার। ডায়মন্ড খুব বড় সার্কাস। কোত্থেকে খবর পেয়ে এসেছিল। পরশু আমাদের খেলা দেখল। তারপর ঝুলোঝুলি, এই কুকুর, বাঁদর, আর ভাল্লুকটাকে ওরা কিনবে। প্রচুর দাম দিতে চাইল। আবার লুকিয়ে-লুকিয়ে আমাদের রিং-মাস্টার মাইকেলকে টোপ দিয়েছিল মোটা মাইনের চাকরি। ওদের ধারণা, মাইকেলই এমন অদ্ভুত খেলা শিখিয়েছে। মানুষের ভাষা বোঝাটা আসলে ছল, খেলার কৌশল। যত বোঝাই ওদের ধারণা পালটায় না, কিছুতেই মানবে না।"

মামাবাবু বললেন,"অন্য ব্যাপারটা কী বললে?"

লাজুক হেসে মাথা চুলকে বাপি জানাল, "বলেছি এ এক সাধুর কৃপা। হিমালয়ের ভারি জব্বর সাধু। মুথুস্বামী গিয়েছিল কেদার-বদ্রীনাথে তীর্থ করতে। তখন ওই সাধুর দেখা পায়। মুথুর সেবায় তুষ্ট হয়ে আর তার সার্কাসের দুরবস্থার কাহিনি শুনে সাধুজি বর দিয়েছিলেন যে, এক বছরের জন্য ওর সার্কাসের পশুরা কিছু-কিছু মানুষের ভাষা বুঝতে পারবে। ডায়মন্ডকে যত বলা হয় এসব জন্তু বিক্রি করা হবে না, তবু নাছোড়বান্দা। কেবলই দর চড়ায়।

"শেষে তিতিবিরক্ত মুথু রেগেমেগে ভাবল, ব্যাটাদের কিঞ্চিৎ জব্দ করা যাক। আমিই দিলাম প্ল্যানখানা। মুথু ডায়মন্ডের ম্যানেজারকে ডেকে বলল, এই জানোয়ারদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করলে ওদের এই বিশেষ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে। সাধুজির এইরকম নির্দেশ আছে। এরা কেউ জুবিলি ছেড়ে যেতে চাইবে কিনা সন্দেহ। অনেকদিন আমাদের সঙ্গে আছে যে। আমাদের নিজের লোক হয়ে গেছে। যা হোক ভাষা বোঝার খেলা দেখানোর সময় আপনারা নিজেরাই ওই জানোয়ারদের জিজ্ঞেস করে দেখুন, ওরা ডায়মন্ডে যেতে রাজি আছে কিনা? যে রাজি থাকবে, সে ফুর্তি দেখাবে। আর রাজি না থাকলে হয়তো রেগে যাবে। যে যে রাজি হবে তাদের আমি ছেড়ে দেব কথা দিচ্ছি।

"দেখলেন তো তারপর কাণ্ডটা! বেচারিরা খুব নিরাশ হয়ে ফিরে গেছে। তবে সাধু-মহারাজের হদিশ নিয়ে গেছে মুথুস্বামীর কাছ থেকে। মুথু বলেছে, সাধু গুহায় বাস করেন। কেদারতীর্থের পুব দিকের পাহাড়ে। তবে ঠিক কোন্ গুহায় ওঁকে পাওয়া যাবে বলা মুশকিল। মাঝে-মাঝে ডেরা পাল্টান কিনা। পাহাড়িদের কাছে খোঁজখবর করলে হয়তো জানা যাবে।

"সাধুজির ইয়া তাগড়াই চেহারা। ছ'ফুট খাড়াই। টকটকে রং। মাথায় মস্ত জটা। ধবধবে পাকা দাড়ির বহর আড়াই হাত। খুব সাবধান। দিবারাত্র বুনো জন্তুরা তাঁর আস্তানার চারপাশে ঘোরাফেরা করে। সাধুজি হিংয়ের কচুরি খেতে ভীষণ ভালোবাসেন। জোগাড় করে খাওয়াতে পারলেই নির্ঘাত বর লাভ।"

একটু মিচকে হেসে জানাল বাপি, "মনে হয় সামনের গ্রীষ্মেই ওরা হিমালয়ে ছুটবে সাধুজির খোঁজে।"

গোয়েন্দা মানিকজোড়

শিবের মাথায় গোয়েন্দাগিরির ভূত চেপেছে।

শিব ছিল অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনির ভক্ত। গল্পের বই পড়ার ঝোঁক থাকলেও বেশি সময় পেত না। খেলাধুলো আর নানান ডানপিটেমি করেই তার সময় যেত। ক্লাসেরপড়াও রয়েছে। অন্তত মোটামুটি পাশ তো করা চাই। ডিটেকটিভ বই কিছু পড়লেও তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি আগে। কিন্তু পুজোর ছুটিতে দেবুর কল্যাণে খানকয়েক ঘোরালো গোয়েন্দা কাহিনি পড়ে ফেলে। মনে ধরে যায় গোয়েন্দাদের ব্যাপার স্যাপার। তারপর ক্লাসের বাৎসরিক পরীক্ষা হয়ে যেতে চুটিয়ে পড়ে প্রচুর গোয়েন্দা গল্প— গ্রামের লাইব্রেরি এবং এর-ওর কাছ থেকে চেয়ে এনে। ফলে আপাতত তার মাথায় গজগজ করছে নানা গোয়েন্দাদের কীর্তিকলাপ। বিচিত্র রকম অপরাধের বৃত্তান্ত এবং সেই সব কুকীর্তি ধরে ফেলার রকমারি উপায়।

পুরনো ও আধুনিক, দেশি ও বিদেশি গল্পের বহু নামজাদা গোয়েন্দার হালচাল তার নখদর্পণে। জয়ন্ত মানিক, ব্যোমকেশ, কিরীটি, পরাশর, ফেলুদা ইত্যাদি দেশি গোয়েন্দাদের যেমন সে গুলে খেয়েছে তেমনি অনুবাদের মাধ্যমে বা ইংরেজিতে পড়ে ফেলেছে শার্লক হোমস্, হারকিউল পয়রো, মিস মারপল প্রমুখ বিদেশি ডিটেকটিভদের ইতিবৃত্ত।

এমন বেদম পড়ে পড়ে মাথা গরম হয়ে গেল শিবের। ঠিক করে ফেলল যে শুধুমাত্র ছাপার অক্ষরে অন্যদের বাহাদুরি জেনে সন্তুষ্ট থাকা নয়, হাতে কলমে কাজে নামতে হবে। থিওরি থেকে প্র্যাকটিস। অতএব সে স্বয়ং গোয়েন্দাগিরিতে নামবে এবার। ওই সব বিখ্যাত গোয়েন্দাদের সঙ্গে শিব দত্তর নামটাও হয়তো যোগ হবে ভবিষ্যতে।

মনের এই প্রবল বাসনাটা দেবুকে জানানো নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ দেবু শিবের প্রাণের বন্ধু। লোকে তাদের ডাকে মানিকজোড়। দুজনে একই সঙ্গে পড়ে ক্লাস টুয়েলভে।

বই পড়ার নেশাটা আসলে দেবুর। শুধু ডিটেকটিভ বই নয়, সব ধরনের গল্পের বইয়ের সে পোকা। লেখাপড়ায় দেবু দারুণ। পরীক্ষায় ফার্স্ট সেকেন্ড হয়। তবে সে গোবেচারি ভালোমানুষ নয় মোটেই। ডানপিটেমিতেও পিছপা হয় না। ক্লাসের রেজাল্ট এবং বাইরে গুডি গুডি ভাব দেখে লোকে ধরতে পারে না তার আসল রূপ। সে খবর রাখে কেবল শিব।

হাতেকলমে গোয়েন্দাগিরিতে দেবুর মোটেই উৎসাহ নেই। দু-একবার খুঁচিয়ে দেখেছে

শিব। দেবু সাড়া দেয়নি। তা ও না করুক শিবই নেমে পড়বে কাজে। সিদ্ধান্তটা সে জানাতে চলল দেবুকে।

উত্তম গোয়েন্দা হওয়া কি তার পক্ষে সম্ভব নয়? যেতে যেতে প্রশ্নটা উদয় হয় শিবের মনে। কেন নয়? কার কোথায় প্রতিভা লুকিয়ে থাকে বোঝা দুষ্কর। সুযোগ আর সময় মানুষ চেনায়। এসব কথা দেবুরই। উদাহরণস্বরূপ সে বলেছিল, তাদের গাঁয়ের জগন্নাথের কথা। মুখচোরা একটু যেন বোকা টাইপ জগার ভেতর যে এমন ব্যবসার প্রতিভা লুকিয়ে ছিল কে জানত! নেহাতই চাকরি পাচ্ছে না দেখে বাপ তাকে ছোট্ট একটা চায়ের দোকান খুলে দেয় লাভপুর বাজারের কাছে। সেটাই ফুলে-ফেঁপে এখন মস্ত রেস্টুরেন্ট। জগার ভোল পাল্টে গেছে। এখন তার চোখে মুখে কথা। দোকানের কর্মচারী চালায়। খদ্দের সামলায় সমান দক্ষতায়।

আর মথুরাপুরের গোবিন্দ ঢোল যে একদা মিলিটারি হয়ে ইউনিফর্ম গায়ে, বুট মশমশিয়ে গাঁয়ে ঢুকবে ভেবেছে কেউ? হ্যাঁ, লম্বা চওড়া চেহারাখানা ছিল বটে। কিন্তু অতি গোবেচারা। আবার ভূতের ভয়। গ্রামে কঞ্চির মতন লিকলিকে ছোঁড়াগুলো অবধি গোবিন্দর ওপর মাতব্বরি ফলাত। সৎ মায়ের তাড়নায় বেচারা বাধ্য হয়ে ঘর ছেড়ে এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে মিলিটারিতে নাম লেখায়। কোনো মতে টিকেও যায়। এখন তাকে দেখলে উল্টে স্যালুট করে গাঁয়ে তার সমবয়সিরা। কী স্মার্ট আর ভারিক্কি চাল ওর। তলোয়ারের মতো মোচ। বাংলা হিন্দি ইংরিজি বুলি ছোটায়। সত্যি সত্যি একটা যুদ্ধে লড়েছে কামান বন্দুক নিয়ে। ছুটিতে দেশে এলে সবাই ভিড় করে যায় ওর মিলিটারি জীবনের গল্প শুনতে।

গোবিন্দর সৎমা এখন একদম টাইট। বাড়ি এলে বাবা-বাছা ছাড়া কথাটি নেই। যতবার চা চায়, তক্ষুণি বানায়।

দেবু বাড়ি ছিল। শিব ডাকল,— বাইরে চ। কথা আছে। সিরিয়াস্।

দুজনে গিয়ে বসল অশ্বত্থতলার বাঁধানো বেদিতে। দেবু পকেট থেকে হজমিগুলির শিশিটা বের করে একটা ধরিয়ে দেয় শিবকে,

— নে খা। বল কী বলবি?

শিব মনে মনে খানিক জুৎসই কথা হাতড়ায়। ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারে না যেন। শেষমেশ দুম করে বলে বসে,— আমি কী ঠিক করেছি জানিস?

—কী?

—আমি ডিটেকটিভ হব।

অ্যাঁ ডিটেকটিভ! তুই! —দেবু চমকায়।

কেন? পারব না?— শিবের কণ্ঠে উত্তাপ।

না না তা বলছি না। চেষ্টায় কিনা হয়।— দেবু সামাল দেয় : মানে তোর তো অন্য অ্যাম্বিশন ছিল। হয় নামকরা ফুটবল প্লেয়ার অথবা মেল ট্রেনের ইঞ্জিন ড্রাইভার। মত বদলালি যে?

এই লাইনটা আরও পছন্দ হচ্ছে।— সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—অলরাইট। তা কিছু ট্রেনিং-ফেনিং। মানে তদন্তের পদ্ধতি শিক্ষা?

—ট্রেনিং আবার কী? আমার মোটামুটি সব জানা আছে।

কার কাছে শিখলি?—দেবু অবাক।

—কারও কাছে নয়। বই পড়ে। বড় বড় ডিটেকটিভদের কাজের ধারা আমার মুখস্থ।

বটে। এইজন্যে গোয়েদা গল্প গিলছিলি? দেবু মনে মনে ভাবে। ওই করেই মাথাটি বিগড়েছে। বাইরে অবশ্য সে গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলে,—তারা তো গল্পের ডিটেকটিভ। সত্যি ডিটেকটিভ কারও কাছে কিছু ট্রেনিং নিলে সুবিধে হত না।

—সে পরে দেখা যাবে। আরে, অনেক গল্পের ডিটেকটিভের কাছে আসল ডিটেকটিভরা লাগে না। জানিস, শার্লক হোমস-এর লেখক কোনান ডয়েলের কাছে বিলেতে গোয়েন্দারা অবধি বুদ্ধি নিত। তারা শার্লক হোমস-এর গল্প পড়ে অনেক কিছু শিখেছে।

— ও। তাহলে তোতার ট্রেনিং প্রায় কম্প্লিট।

— তা বলতে পারিস। সব গোয়েন্দারা একটি মোদ্দা বাণী দিয়েছেন—চোখ কান খোলা রাখ। গ্রে সেল অর্থাৎ মগজের বুদ্ধিকে খেলাও তাহলে রহস্যের সন্ধান পাবে এবং তার সমাধানের সূত্র। অবশ্য এই গ্রে সেল-এর কোয়ালিটিটা একটু উঁচু দরের হওয়া চাই।

দেবুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শিবের মগজ যেন ফোঁড়ে। বোধহয় বুঝতে চায় ওর গ্রে সেল-এর মান। শিব কিঞ্চিৎ বিব্রতভাবে বলে, — তবে সত্যি কোনো গোয়েন্দাকে পেলে শেখা যাবে। শেখার কি শেষ আছে?

— বেশ কাজে নেমে পড়। আপিস কোথায় করবি? কলকাতায়?

—মানে এখন তো কলকাতায় যাওয়া সম্ভব নয়, থতমত খায় শিব, আগে পড়া শেষ হোক। ভাবছি আপাতত এখানেই—

—ঠিক বলেছিস। এখানেই হাতেখড়ি হোক। পাড়াগাঁ বলে অবহেলা করিসনি। ময়ূরাক্ষীর ধারে আমাদের এই ফুলডাঙা আর কাছাকাছি গ্রামগুলোয় কি রহস্যের অভাব? কত অপরাধ ঘটে। তার কিনারা হয় কই? বড় শহরে কিছু ঘটলে খবরের কাগজে বেরয়। তাই লোকে জানতে পারে। আমাদের গ্রাম দেশের অনেক খবরই কাগজে ছাপে না। গ্রামদেশে বহু রহস্যই রীতিমতো জটিল। অপরাধ বিদ্যায় এখানকার লোকের মাথা কি আর কম খেলে? না এখানে অদ্ভুত ঘটনা কম ঘটে? ট্রেনিং পিরিয়ডে সেসব রহস্য ভেদ করলে তোর ভিত খুব পোক্ত হবে।

হুঁ, ঠিকই বলেছিস।— শিব নিশ্চিন্ত হয়। এ নিয়ে তার মনে একটু খটকা ছিল।

দেবু একটা হজমিগুলি নিজের মুখে পুরে আর একটা শিবকে দিয়ে বলল,—তা অ্যাসিস্ট্যান্ট কাকে নিবি?

—অ্যাসিস্ট্যান্ট?

— হ্যাঁ। একজন উপযুক্ত সহকারী ছাড়া কি গোয়েন্দাকে মানায়? সে দেশি হোক কি বিদেশি। বিদেশি ডিটেকটিভ দুএকজন আছে বটে সরকারী ছাড়া, কিন্তু কোনো নামকরা বাঙালি প্রাইভেট ডিটেকটিভের কথা পড়েছিস যার সহকারী নেই? অ্যাসিস্ট্যান্ট মাস্ট। নইলে গোয়েন্দার দর কমে যায়?

তা বটে।—কথাটা মনে ধরে শিবের : কিন্তু আমি আবার সহকারী পাব কোত্থেকে?

আমায় দিয়ে কাজ চলবে?— গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করে দেবু।

— যাঃ ইয়ার্কি হচ্ছে?

—ঠাট্টা নয়। সিরিয়াসলি বলছি।

— তুই আমার সহকারী হবি কেন? তোর যা মাথা আর এ লাইনে পড়াশুনা, তুই বরং আমার সহযোগী হতে পারিস। আমরা হব পার্টনার। একসঙ্গে কাজ করব। জোড়া ডিটেকটিভের কথাও তো পড়েছি।

—না ভাই। আমার সহকারী হওয়াই ভালো। পার্টনার হলে দায়িত্ব বাড়বে। গোয়েন্দাগিরিতে অত শখ নেই আমার। সহকারী হওয়াই সুবিধে। তোর নাম হলে লোকে আমার নামটাও জানবে। অথচ দায়িত্ব কম। তা সহকারী হিসেবে কী কী করতে হবে আমায়?

সে তো তুই জানিসই,— বলল শিব।

—হ্যাঁ, দুরূহ অভিযানে তোর সঙ্গী হওয়া এবং কখনো সখনো পরামর্শ দেওয়া। সে পরামর্শ তুই নিতেও পারিস, নাও নিতে পারিস। এই তো?

তা যা বলেছিস।—হেসে বিষয়টা হাল্কা করে শিব। সে মনে মনে হাঁপ ছাড়ে। পার্টনার হয়ে দেবু এ লাইনে সিরিয়াসলি আসতে চাইলে সে কি আর পাত্তা পেত? শিবকেই বরং অ্যাসিস্ট্যান্ট বনে যেতে হত। নামে দেবু সহকারী থেকে, কাজে পার্টনার হলেও শিবের লাভ ক্ষতি নেই। তবে লোকে হয়তো ডাকবে গোয়েন্দা মানিকজোড়। তাতে অন্তত দুজনেই সমান প্রেস্টিজ পাবে।

ওই চটিজোড়া কার?

কয়েকদিন কেটে গেছে। শিবকে একদিন জিজ্ঞেস করল দেবু, —কী রে গোয়েন্দাগিরির ইচ্ছেটা আছে না ছেড়ে দিলি?

আলবাত আছে।— শিবের জবাব : কেস খুঁজছি। চোখকান খোলা রেখেছি। রহস্যের সন্ধান পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। তোকেও জানাব।

দেবু বলল,— দু একটা সাজেশান দিতে পারি?

— জরুর।

—এই অঞ্চলেই যখন কাজ করবি আপাতত, এখানকার কিছু খুঁটিনাটি ইনফর্মেশন আগে থাকতে জানা থাকলে সুবিধে হত। তাই নয়কি?

— কী রকম ইনফর্মেশন?

— এই যেমন ধর, আশেপাশে কাছাকাছি দোকান বাজারে কী কী পাওয়া যায়? কোন্ কোন্ ব্র্যান্ডের জিনিস? এখানে ধোপা নাপিত কামার স্যাকরা কে কে আছে? ওদের স্বভাব চরিত্র কেমন ? এমনই কিছু নানা পেশার লোকের খবরাখবর এবং তাদের বিশেষত্ব।

শিব ভেবে বলে,— বুঝেছি। অপরাধের জায়গায় পাওয়া কাপড়ের মালিকের পরিচয় জানতে ধোপার ছাপ। সিঁধকাঠি ইত্যাদি লোহার জিনিস পেলে, কামারটা কে? চোরাই সোনাদানা বিক্রির জায়গা খুঁজতে স্যাকরা। কিন্তু নাপিতের কী দরকার?

— হুঁ হুঁ, নাপিত ঢের কাজে আসে। ওরা ভারি সেয়ানা। লোকে নাপিতের কাছে চুল দাড়ি কামাতে বসে অনেক প্রাণের কথা বলে ফেলে। যে কামাচ্ছে তার মন সেদিন খিঁচড়ে আছে না খোশমেজাজ নাপিত ঠিক খেয়াল করে। গ্রামে নাপিত তার বাক্স নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘোরে আর সব্বার হাঁড়ির খবর কান পেতে শোনে। এ আমি লক্ষ করেছি। তাই নাপিতদের থেকে

অনেক ইনফর্মেশন পাওয়া যেতে পারে।

শিব বলল,— রাইট। মনে মনে ভাবল দেবুটার মাথা কী সাফ! জিজ্ঞেস করল,—আর কোনো সাজেস্‌ান?

দেবু বলল, — মানুষের হাত পায়ের ছাপ স্টাডি করবি নিশ্চয়ই?

তা তো করতেই হবে।— শিবের জবাব।

— গরু মোষ ছাগলের খুরের ছাপ নিয়েও কিছু স্টাডি করিস।

— গরু ছাগল কেন?

—কারণ গ্রাম দেশে গরু ছাগল চুরির কেস তো কম হয়না। কোন পথে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে পায়ের ছাপ দেখে বুঝলে সুবিধে হবে।

তা বটে। —শিবের সায়।

দেবু বলল,— আর বেশি কী বলার আছে, সবই তো তুই জানিস। হুঁ।—গম্ভীর চালে মাথা ঝাঁকায় শিব।

শিবের দেখা পাওয়া ভার হয়ে উঠল। এমনকী ছুটির দিনেও তার পাত্তা পাওয়া যায় না। দেবু একদিন শিবের খোঁজ নিতে যেতে সে জানাল, একটু ঘুরে ফিরে স্টাডি করছি। মানে গোয়েন্দাগিরির প্রিপারেশন।

—ভেরি গুড। কোনো কেস পেলি?

—একটা পেয়েছিলাম। নিইনি।

—কী কেস?

— আমাদের পাড়ার মোক্ষদা ঠাকরুণের নিরুদ্দেশ নাতি উদ্ধারের কেস।

—মোক্ষদামাসির নাতি? মানে বিল্টু?

হুঁ। চিনিস তো কী বিচ্ছু ছেলে! হরদম ইস্কুল ফাঁকি মরিছিল বলে বাপের কাছে পিটুনি খেয়ে গতকাল সকালে বাড়ি থেকে কেটেছে। দুপুরে খেতে আসেনি। মোক্ষদাঠাকরুণের ভয় তাঁর পেয়ারের নাতি সুইসাইড করবে অথবা মিলিটারিতে ঢুকে যুদ্ধে প্রাণ দেবে। ওই বলে শাসিয়ে বেটা প্রায়ই দিমিকে ব্ল্যাকমেল করে পয়সা বাগাত।

আসলে যা বুঝলুম, বাপের ধোলাইটা ঠিকমতো পড়েনি। দু-চার ঘা খেয়েই বাবার হাত ফসকে পালিয়েছিল। পাওনা বাকি পিটুনির ভয়েই ফিরছে না বিল্টু। বাপের রাগ পড়এল ফিরবে। ও যা ছেলে, হয়তো কুল পেয়ারা দিয়ে লাঞ্চ টিফিন সেরে কোনও জঙ্গলে লুকিয়ে বসে আছে। আর নয়তো মামার বাড়ি পালিয়েছে।ক্রোশ চারেক দূরে ওর মামার বাড়ি। আগেও গয়েকবার বিপদে পড়ে মামার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। মামারা বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফেরত দিয়ে গেছে। মোক্ষদামাসিকে বলেছি, নাতি দুদিন না ফিরলে তখন খোঁজ করা যাবে।

রাতে বিল্টু ফিরেছে কি?— দেবুর জিজ্ঞাসা।

জানি না,—ব্যাজার মুখে শিবের জবাব।

দেবু বলল,— এখন এখন নন্দ স্যারের বাড়ি যাব ভাবছি। একটা ইংরিজি রচনা কারেক্ট করে নিতে। স্যার ছুটির দিনে সকালে যেতে বলেছিলেন।

শিব বলল,— চল আমিও যাই। একটা ইংরিজি কবিতার মানে বুঝে নেব।

নন্দবাবুর বৈঠকখানায় উঁকি মেরে দেবুরা দেখল ঘর ফাঁকা।

নন্দবাবুর আট বছরের ছেলে বুবুনের আবির্ভাব হল। দেবু বুবুনকে বলল,— স্যার আছেন?

আছে।—বুবুন মাথা নাড়ে।

—বল আমরা এসেছি। পড়া বুঝতে।

বুবুন ভিতরে গেল।

একটু বাদে সে এসে বলল,— বাবা কথা বলচে। বসতে বলেচে। আসবে। বলেই বুবুন হাওয়া হল।

দুজনে বসল তক্তোপোষে। তাদের চোখে পড়ল, বৈঠকখানার দোরগাড়ায় একজোড়া চামড়ার চটি। পুরুষের।

শিব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চটিদুটো দেখতে দেখতে বলল, — মনে হচ্ছে এই চটির মালিকের সঙ্গেই স্যার কথা বলছেন।

তাই হবে।— দেবুর সমর্থন : তা চটি দেখে এর মালিকের সম্পর্কে তোর কি অনুমান?

শিব চটি নজর করতে করতে বলে,—চটির বড়সড় সাইজ দেখে মনে হয়এর মালিক বেশ লম্বা চওড়া। ভারি চেহারার। কারণ চটির গোড়ালির কাছে একটু ডেবে গেছে। অর্থাৎ ভারি ওজনের লোক এবং থপ্থপ্ করে পা ফেলে।

—বাঃ! তোর দারুণ অবসার্ভেশন! আর কিছু বুঝছিস?

—লোকটি বোধহয় পয়সাওলা কারণ চটিটা দামী।

—বেশ বেশ। আর কিছু?

আর কি?—শিব দ্বিধাগ্রস্ত। তার পর্যবেক্ষণ আর এগোয় না।

আমিকিছু বলতে পারি?— সহকারী দেবুর অনুমতি প্রার্থনা।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল্!

লোকটি প্রায় ছফুট লম্বা এবং নেটা। বাঁ হাতেছাতা ধরে হেঁটে এসেছে।—দেবুর মন্তব্য।

—এ্যাঁ! কি করে বুঝলি?

তাই মনে হচ্ছে। মানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। — দেবু এর বেশি কিছু ভাঙে না।

সে এবার চটিজোড়ার কাছে গিয়ে চটি উল্টিয়ে দেখে বলে,— চটির নিচের ধুলো দেখে মালুম হচ্ছে অন্য গাঁয়ের লোক। তার পরনে ধুতি ও শার্ট এবং স্যারের খুব পরিচিত।

শিবও চটির নিচটা দেখে। তার মুখে গভীর সংশয়ের ছাপ। বলে, —স্যারের খুব পরিচিত মানলেম। তাই ভিতরে গেছেন। কিন্তু বাকি সিদ্ধান্তগুলো? যা ইয়ার্কি মারছিস।

ঠিক এই সময় ভিতর থেকে বৈঠকখানায় নন্দস্যার এবং অপর একজনের আবির্ভাব হয়। দ্বিতীয়জন দেবুদের স্কুলেরই শিক্ষক। নন্দবাবুর সহকর্মী। বিজনবাবু।

বিজনবাবুর চেহারাখানা দশাসই। প্রায় ছফুট উচ্চতা। তিনি নেটা। বাঁ হাতে ধরা একটি ছাতা। ধুতি শার্ট পরা। ওঁনার বাড়ি পাশের গ্রাম মথুরাপুরে। শিব থ মেরে যায়। দেবু তো ঠিক বলেছে!

দেবু শিব উঠে দাঁড়ায়। বিজনবাবু ওদের পানে চেয়ে একবার হেসে পায়ে চটিজোড়া গলিয়ে বিদায় নিয়ে রাস্তায় নামলেন। নন্দবাবু এবার দেবুদের দিকে মনোযোগ দিলেন,— কী

দেবু, রচনা লিখে এনেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।—দেবু জবাব দেয়।

তোমার কিছু দরকার?—নন্দবাবু শিবকে প্রশ্ন করেন।

শিবের বিস্ময় তখনও কাটেনি। সে থতমত ভাবে বলে,— আজ্ঞে, একটা ইংরিজি কবিতা বুঝে নিতাম।

বেশ বেশ।— নন্দবাবু দুই ছাত্রকে নিয়ে বসলেন।

ঘণ্টাখানেক বাদে পড়ার পাট চুকলে নন্দবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়েই উদগ্রীব শিব প্রশ্ন করে,— হ্যাঁরেদেবু, ওসব কী করে বুঝলি? এমন কারেক্ট আন্দাজ?

—আন্দাজটা তুইও করতে পারতিস একটু চোখ খোলা রাখলে।

কী করে?—শিব থৈ পায় না।

—কারণ আমরা যখন পঞ্চাননতলার মোড়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম তখন দেখলুম ছাতা হাতে বিজনস্যার গেলেন। তুইও নিশ্চয়ই দেখেছিস। স্কুলেই লক্ষ্য করেছি, বিজনবাবু ওইরকম চটি পরেন। সুতরাং নন্দস্যারের বাড়িতে ওইরকম চটি দেখেই বুঝলাম বিজনবাবুই এসেছেন। ওইটে মাথায় খেলে গেলেই নন্দস্যারের বাড়ির আগন্তুক অর্থাৎ বিজনবাবুর কারেক্ট বর্ণনা তুইও দিতে পারতিস অনায়াসে।

শিব চুপ। মনে আপশোস, ইস্ এমন সোজা ব্যাপারটা খেয়াল হয়নি। ফালতু মাথা ঘামালাম কত।

পথে যেতে যেতে তারা দেখে একটা নিচু গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে পেয়ারা খাচ্ছে বছর বারোর একটি ছেলে। শিব তাকে দেখে থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল,—কীরে বিল্টু, কখন ফিরলি? রাতে?

হুঁ।— বিল্টু পেয়ারায় কামড় দিয়ে আড়চোখে চায়।

—মার খেয়েছিলি বাড়ি ফিরে?

—ভ্যাট্।

বাবা মারেনি সত্যি?— শিব খোঁচায়।

এয়েছিল মারতে। পারেনি।—বিল্টুর জবাব।

— কে বাঁচাল, ঠাম্মা বুঝি?

বিল্টু মিচকে হাসে।

দেবুরা কথা না বাড়িয়ে এগোয়। দেবু বলল,— ভাগ্যিস এর কেস নিসনি। বেকার খুঁজে মরতিস। এমন মিসিং কেশ ব্যোমকেশ বক্সিও নিত না।

হালদার বাড়ির চোর

একদিন স্কুলে টিফিন পিরিয়ডে দেবুকে আড়ালে ডাকল শিব। উত্তেজিত চাপা স্বরে বলল, — একটা কেস পেয়েছি। দারুণ রহস্যময় ব্যাপার।

কী?—জানতে চায় দেবু।

—চুরি। কিন্তু সাধারণ চুরি নয়। অসাধারণ।

ব্যাপারটা খুলে বল দেখি।—দেবু তাড়া দেয়।

—হালদার পাড়ায় নরেন হালদারের বাড়িতে মাসখানেক যাবৎ কিছু অদ্ভুত ধরনের চুরি হয়েছে। হয়েছে না বলে, বলা উচিত হচ্ছে।

— নরেন হালদার মানে পিন্টুর বাবা?

— হ্যাঁ। বাড়ির লোকের বদনামের ভয়ে পিন্টুরা এখনও বাইরে বেশি কিছু বলছে না। তবে পাড়ার অনেকেই দেখলাম মোটামুটি জানে কেসটা।

—কী চুরি হচ্ছে?

—ভেরি ইন্টারেস্টিং। মাথামুন্ডু নেই। কী কী চুরি হয়েছে জানিস? ডিম, আলু, গরমমশলার প্যাকেট, টফি, কিছু খুচরো পয়সা সন্দেশ মেয়েদের চুলের ফিতে টিপ এমনি অদ্ভুত সব জিনিস লোপাট হয়ে গেছে বাড়ি থেকে কাউকে ধরা যায়নি। একসঙ্গে বেশি নেয় না। রান্না ঘরে রাখা পাঁচটা ডিমের মধ্যে সকালে দেখা যায় একটা কম। আলু, হলুদ, এমনই টুকিটাকি মশলা আনাজ প্রায়ই কমে যাচ্ছে। রান্নাঘরে তালা দিচ্ছে রাতে। তবু জিনিস উধাও হয়েছে।

শুধু রান্নাঘর থেকেই যাচ্ছে?— দেবুর প্রশ্ন।

— তা কেন? খাবার ঘর থেকেও গেছে। শোবার ঘরের টেবিলের ওপর থেকে গেছে পিন্টুর দুটো টফি। পরে খাবে বলে বিকেলে টেবিলের ওপর রেখেছিল, রাতে দেখে উধাও। পয়সাও গেছে কিছু খুচরো ও আর দুটো এক টাকার নোট। পিন্টুর মা খুচরো টাকা পয়সা রাখেন শোবার ঘরের তাকে রাতে। তাই থেকে গেছে। সকালে আবিষ্কার করেন। একইভাবে কিছু খুচরো পয়সা আর নোট গচ্চা গেছে পিন্টুর মেজকাকার অন্য ঘর থেকে। আশ্চর্য ব্যাপার সবপয়সা না। কিছুটা মেরে দেয়। হয়তো চোর ভাবে অল্প অল্প সরালে মালিক খেয়াল করবে না। তা হয়তো অনেকদিন ধরেই সরাচ্ছে, খেয়াল হয়নি আগে।

কোনো দুষ্টু বাচ্চা ছেলে বা মেয়ের কীর্তি মনে হচ্ছে।— ভেবে বলে দেবু।

—হালদার বাড়ির লোকেও তাই ভেবেছিল প্রথমে। বাড়িতে জনা পাঁচেক আট থেকে বারো-তেরো বছর বয়সি বাচ্চা আছে ও সবাইকে বেদম জেরা করেছে বড়রা। ছোকরা চাকরটাকেও জেরা করেছে। কিন্তু কারও মুখ থেকে কিছু বের করা যায়নি। শুধু পিন্টুর ছোট ভাইটা স্বীকার করেছিল যে সে দিদির একটা টফি চুরি করেছিল মাত্র । আর একটা জিনিসও নেয়নি।

তেমন দামী জিনিস তো চুরি হয়নি। অত ঘাবড়াবার কী ?

—দেবুর কণ্ঠে তাচ্ছিল্য।

—কে বলল দামি জিনিস যায়নি? পিন্টুর দিদির দামি রিস্টওয়াচ গেছে। দুপুরের শো-য়ে লাভপুরে সিনেমা দেখে এসে খাবার ঘরে কুলুঙ্গিতে ঘড়ি খুলে রেখে মুখ হাত ধোয়, টিফিন খায়। রাতে শোবার আগে ঘড়ির কথা মনে পড়তে খোঁজ করে দেখে ঘড়ি উধাও।

আর গত পরশু ঘটেছে আরও রহস্যময় কাণ্ড। পিন্টুর বাবার ক্যাশ বাক্সের চাবি উধাও হয়েছে ওনার শোবার ঘর থেকে। রাতে মনিব্যাগ আর রুমালে বাঁধা চাবি ছিল টেবিলে। আলমারিতে তুলতে ভুলে গিয়েছিলেন। সকালে দেখেন রুমালসুদ্ধ চাবি নেই অথচ মনিব্যাগ রয়েছে। পিন্টুর বাবা ক্যাশ বাক্স বদলাতে বাধ্য হয়েছেন। ডুপ্লিকেট চাবি আছে যদিও। কিন্তু

যদি কোনো দুষ্টুলোকে চাবি সরিয়ে থাকে? ওদের ব্যবসার প্রচুর টাকা প্রায়ই থাকে ওই বাক্সে। ওরা বেশ ভড়কে গেছেন। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

তুই এত খবর পেলি কোত্থেকে?— দেবু জিজ্ঞেস করে।

—পিন্টুর থেকে। ওর পাশের বাড়ির ভুলোর মুখে প্রথমে শুনি কিছু আলগা খবর। তখন পিন্টুকে চেপে ধরি। আর আমি যে গোয়েন্দাগিরিতে নেমেছি সেটাও ওকে জানাই। বলি, হেল্প করতে চাই। কয়েকবার পিন্টুর সাথে ওদের বাড়িঘর ঘুরে দেখেও এসেছি নানান ছুতোয় তবে ওর বাড়ির আর কেউ জানে না আমার আসল উদ্দেশ্য। পিন্টুকে বলা আছে, সন্দেহজনক কিছু ঘটলেই আমায় জানাতে।

ওদের বাড়ির কাজের লোকেরা কেমন? মানে বাড়ির ভেতর যাদের যাওয়া আসা?—প্রশ্ন করে দেবু।

—পিন্টু তো বলছে, যারা আছে সবাই পুরনো আর বিশ্বাসী লোক। নতুন ছোকরা চাকরটাকে চুরি শুরু হওয়ার কদিন বাদেই ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

—ওরা পুলিশে খবর দিচ্ছে না কেন?

—ওদের ভয় পুলিশ ডেকে কোনও লাভ হবে না। কলা, সন্দেশ, ডিম চুরির কথায় পুলিশ হয়তো ঠাট্টাই করবে। ঘড়ি বা চাবির ব্যাপারটা যদিবা সিরিয়াসলি নেয়। তাছাড়া বাড়ি সুদ্ধুকে জেরায় অস্থির করে তুলবে। তারপর পেটপুরে ভোজন করে বিদায় নেবে। আসল কাজ কিস্‌সু হবে না। আর পুলিশ এলে খবরটা গোটা গাঁয়ে রটবে। লোকে মজা পাবে। বাড়ির নিরীহ কাজের লোকেরা হয়তো ভয় পেয়ে পালাবে। অর্থাৎ কাজের চেয়ে অকাজ বেশি। তাই আপাতত নিজেরাই চেষ্টায় আছে রহস্য উদ্‌ঘাটনের।

দেবুর চোখ আধবোজা। দৃষ্টি নত। মাঝে মাঝে তাল দিচ্ছে আঙুলে। অর্থাৎ সে ভাবছে। একটু পরে সে বলল,— কোনো বাড়ির লোকের কাজ।

আমারও তাই ধারণা।— শিবের সায়।

হয়তো একজনের কাজ নয়। ডিম টফির সঙ্গে ঘড়ি চুরি মেলে না। হয়তো ঘড়ি চোর এই সুযোগে ডিম চোরের ঘাড়ে তার অপরাধটি চাপিয়ে দেওয়ার মতলবেআছে? আর আর,— একটু ইতস্তত করে বলে দেবু : ও বাড়িতে বা আশেপাশে কারও পোষা বাঁদর আছে?

খানিক অবাক হয়ে থেকে দেবুর কথার মর্ম কিঞ্চিৎ উদ্ধার করে শিব। বলে, —মানে বাঁদর চোর?

— হতে পারে। এরকম ট্রেনড বাঁদরের কথা পড়েছি।

— কই শুনিনি তো। ঠিক আছে, খোঁজ নেব আরও।

দেবু বলল,—পিন্টুর ছোটকাকা, যে যাত্রা করে, তার একটু বদনাম ছিল হাতটানের। তাই না?

— হুঁ।

—দেখেছি লাভপুরে কালীমাতা কেবিনে আর গাঁয়ে কালোর দোকানে, পিন্টুর ছোটকাকা আড্ডা মারে। খুব সম্ভব ধারে খায়। খোঁজ নে, ঘড়ি চুরির পরই মনুদা হঠাৎ কিছু ধার শোধ করেছে কিনা?

—ইঙ্গিতটা ধরতে পারে শিব। নীরবে সায় দেয় মাথা নেড়ে। এবং দেবুর বুদ্ধিকে মনে মনে আবার তারিফ জানায়।

টিফিন শেষের ঘণ্টা বাজে। ক্লাসে যেতে যেতে দেবু বলে,— ইন্টারেস্টিং কেস। নজরে রাখ। খবর দিস।

তিনদিন বাদে একদুপুরে শিব উত্তেজিত ভাবে দেবুর কাছে হাজির হয়ে বলল,— জানিস, হালদার বাড়িতে আর এক কাণ্ড হয়ে গেছে। ফের চুরি। এবার গেছে পিন্টুর বাবার দামি পাথরবসানো সোনার আংটি।

কীরকম? — দেবু জানতে চায়।

কাল বিকেলে নরেন জ্যাঠা দুটো টবের মাটি তৈরি করেন গোলাপ গাছ পোঁতার জন্যে। তার আগে হাতের আংটিটা খুলে রাখেন রান্নাঘরের সামনে দাওয়ায়। কাজ সেরে হাতটাত ধুয়ে চলে যান। রাতে খাবার পর খেয়াল হয় আংটির কথা। মাঝে মাঝে ওঁর এমনই আংটি খুলে রাখা অভ্যেস। ভুলো মানুষ। প্রায় ভুলে যান কোথায় আংটি রেখেছেন। তবে হারায়নি। খুঁজে পাওয়া গেছে ঠিক।

—কিন্তু এবার পাওয়া যাচ্ছে না?

—হ্যাঁ তাই। আলো নিয়ে বারান্দায় তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে রাতে। পাওয়া যায়নি। সকালেও খুঁজেছে, পায়নি।

—আংটি ঠিক কোথায় রেখেছিলেন মনে আছে ওঁনার?

—সেই তো মুশকিল। নার্ভাস হয়ে গুলিয়ে ফেলেছেন। কখনো বলছেন এ জায়গায়, কখনো আর এক জায়গায়। আবার বলছেন, হয়তো চৌবাচ্চার পাড়ে রেখেছিলুম।

বারান্দা আর চৌবাচ্চার ধার দিয়ে গেছে নর্দমা। যদি আংটি গড়িয়ে নালায় পড়ে তারপর জলের ধাক্কায় দূরে চলে যায় বা কাদা ময়লায় ডুবে যায়— তাও হতে পারে। সুতরাং সেখানে খোঁজা দরকার। এটুকু ঠিক যে বারান্দায় বা চৌবাচ্চার পাড়ে নেই।

—বাইরের লোক কেউ এসেছিল ওখানে বিকেলে?

—না। ওদের পুরনো কাজের লোক হারু গিয়েছিল বটে একবার। কিন্তু ও খুব বিশ্বাসী। আর ছোকরা বাগালটা হলফ করে বলেছে যে সে বিকেলে বা তারপরে বারান্দার ধারে কাছে যায়নি।

—এখনো খোঁজা চলছে?

— হ্যাঁ। নর্দমার কাদা তোলা হচ্ছে। আর পিন্টুর বাবা কাকাদের মধ্যে খুব একটা তর্ক হয়ে গেছে এই নিয়ে।

—কেন?

পিন্টুর মেজকাকা বলছেন, পুলিশ ডাক। এরকম বারবার চুরি হজম করে যাওয়া ঠিক নয়। কিন্তু পিন্টুর বাবা আর ছোটকাকার মত আরও ভালো করে খোঁজা হোক। আসলে পিন্টুর বাবা লজ্জা পাচ্ছেন, যদি আংটিটা চুরি না হয়ে কোনো গর্তে টর্তে পড়ে গিয়ে থাকে? তাঁর দোষে মিছিমিছি হ্যাঙ্গামা ডাকা। আর পিন্টুর ছোটকাকা ভেবেছেন, যদি পুলিশ এসে ওর যাওয়া বন্ধ করে দেয়?

—কোথায় যাওয়া?

—যাত্রা করতে কীর্ণাহারে। আজ রাতে পালা। দুপুরে রওনা হবেন। ওঁর মেইন পার্ট আটকে গেলে পার্টি ডুববে। ছোটকাকার মত। আজ গোটা দিন খোঁজা হোক। না পাওয়া গেলে উনি কাল সকালে ফিরলে তখন যহোক করা যাবে। এতক্ষণ বোধহয় উনি রওনা হয়ে গেছেন যাত্রা দলের সঙ্গে

—তোকে এত খবর দিল কে? পিন্টু?

—হ্যাঁ। আমার ওপর ওর খুব ভরসা। আমি একটা কাজ করেছি।

— কী?

—ডাকুকে চিনিস তো? বায়েন পাড়ার। ও ভারতী অপেরা মানে পিন্টুর ছোটকাকার যাত্রা পার্টিতে চাকরি করে। দলের সঙ্গে যায়। মোট বয়। ফাইফরমাস খাটে। ডাকু আমার খুব ভক্ত। ওকে ফিট করে দিয়েছি পিন্টুর কাকার পিছনে। পার্টির বাইরে কোনো বাড়ি বা দোকানে গেলে ফলো করতে। অর্থাৎ আংটি যদি উনি সরিয়ে থাকেন, কোথাও লুরিয়ে রাখবেন নিশ্চয় বাড়ির বাইরে। যদি পুলিশ আসে, খবরটা কাজে লাগতে পারে। কী বলিস?

ঠিক করেছিস। —সায় দেয় দেবু।

শিব আপাতত বিদায় নিল।

পরদিন ভোরে শিবের ডাক শুনে দেবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে।

শিবের মুখ চোখে কেমন একটা হতচকিত ভাব দেখে দেবু অবাক হয়ে বলে,—কী ব্যাপার, এত সকালে?

শিব জবাব না দিয়ে বাইরে দাওয়ায় বসে পড়ে ফোঁস্ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে শুধু,—ধুস্।

—কী হল?

হালদার বাড়ির মিস্ট্রি সলভড্। চোর কট্।— শিব চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করে।

সেকী! কখন? কে?— দেবু উত্তেজিত।

শিবের আচরণে কিন্তু উত্তেজনার আভাস নেই। অতি নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে বলে,— একটু আগে পিন্টু এসে রিপোর্ট করে গেছে।

তা বুঝলুম। কিন্তু চোরটা কে?— দেবু অধৈর্য।

একটা মস্ত ধেড়ে ইঁদুর।

—অ্যাঁ!

—হুঁ তাই।

শিব চোর ধরার যা বর্ণনা দেয় তার সারমর্ম হল : গতকাল রাত নটা নাগাদ। তখনো হালদার বাড়িতে সার্চ চলছে আংটির খোঁজে। এইসময় পিন্টুর ছোট ভাই মিন্টু দেখে একটা মস্ত ইঁদুর ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ল ভাঁড়ার ঘরের কোণে একটা গর্তে। মাটির ঘর। ইঁদুরের গর্তে পরে বিষাক্ত সাপ যদি বাসা বাঁধে? তাই হারু শাবল দিয়ে গর্তটা খুঁড়ে ফেলে, গর্ত বুজিয়ে দিতে। ইঁদুর বেরল। ওটাকে মারাও হল। দেখা গেল বিরাট গর্ত এবং সেই গর্তে আবিষ্কার হল কী জানিস? পিন্টুর বাবার আংটিসমেত গত কয়েক মাসে হালদার বাড়ি থেকে খোওয়া যাওয়া

হরেক রকম জিনিস— পিন্টুর দিদির ঘড়ি। রুমালে বাঁধা ক্যাশ বাক্সের চাবি। টফি নেই তবে রাংতাটা রয়েছে। মশলার ঠোঙা। ডিম। এক টাকার কুচিকুচি নোট—এমনই কত কী! খাবার জিনিসগুলো অবিশ্যি মেলেনি। অর্থাৎ ইঁদুরের পেটে গেছে। কিছু জিনিস আবার পাওয়া গেল যেগুলো হারিয়েছে বলে খেয়ালই করেনি বাড়ি লোকে। ব্যাপার দেখে সব্বার চক্ষু চড়কগাছ।

শিব ফের একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মন্তব্য ছাড়ে,— গোয়েন্দাগিরিতে ঘেন্না ধরে গেল। এত মাথা ঘামাবার পর এই কালপ্রিট! কাল রাতে ভালো ঘুমই হয়নি ভেবেভেবে। পিন্টুর মা নাকি রসিকতা করে বলেছেন যে ইঁদুরটার মানুষ হওয়ার শখ হয়েছিল।

দেবু হেসে ফেলে। তারপর বলে,— আমাদের একটা সিদ্ধান্ত কারেক্ট।

—কোন্‌টা?

—চোর বাড়িরই কেউ।

হুম্‌। —শিবের মুখে মোটেই খুশির ছাপ ফোটে না।

দেবু বলে,— এ কেসটা থেকে আমাদের একটা শিক্ষা হল বলতে পারিস।

—কী শিক্ষা?

—শুধু মানুষকেই অপরাধী সন্দেহ করা উচিত নয়। তা হরেক রকম জীবই হতে পারে।

হুঁ। হজমিগুলি দে তো একটা।—নিরাশ শিব আপাতত সান্ত্বনা খোঁজে।

হত্যাপুরীর হাতছানি অন্তর্ধান রহস্য

হালদার বাড়ির কেসটা মিটে যাওয়ার কয়েকদিন বাদে এক ছুটির দিন সকালে শিব হাজির হল দেবুর কাছে। তার চোখমুখ থমথম করছে। দেবু বুঝল, গুরুতর কিছু ঘটেছে। কারণটা জানতে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। শিব গম্ভীর গলায় বলে, — পরশু আমাদের গ্রামের লাইব্রেরি থেকে একটা বই হারিয়েছে। হয়তো চুরিই গেছে! কেসটা আমি তদন্ত করব ঠিক করেছি।

কি বই? —জিজ্ঞেস করে দেবু।

—হত্যাপুরীর হাতছানি। লেখক— ইন্দ্রজিৎ। পড়েছিস বইটা?

—না।

—উঃ! দারুণ বই! গা শিউরে ওঠে পড়তে পড়তে। মাত্র দু মাস আগে বইটা কেনা হয়েছে। গ্রাহকদের মধ্যে মানে আমাদের মতো ছেলেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে গিছল বইটা নিয়ে। এত ডিমান্ড দেখে লাইব্রেরিয়ান ভবেশবাবু নিয়ম করেন যে একজন পাঁচ দিনের বেশি রাখতে পারবে না বইটা। আমার সঙ্গে ভবেশদার একটু খাতির আছে। তাই লাকিলি আসা মাত্র বইখানা পড়তে পেয়েছিলাম। ফের পড়ব বলে ডিমান্ড দিয়ে রাখি চার দিন আগে। ভেবেছিলাম এবার পেলে তোকেও পড়াব।

কীভাবে হারাল বইটা?—দেবুর জিজ্ঞাসা।

—গতকাল একজন বইটা ফেরত দেয়। এরপর বিজয়ের নেওয়ার পালা। লাইব্রেরিয়ান বইখানা ওঁনার টেবিলের একপাশে রেখে দেন। ঘণ্টাখানেক বাদে বিজয় এসে বই চাইতে দেখা গেল বই লোপাট। অনেক খুঁজেও পাওয়া যায়নি। অগত্যা ভবেশদা খাতায় বইখানার পাশে লিখে রাখেন—লস্ট। বললেন, অনেক বই-ই হারায় এমনিভাবে। বিশেষত যেগুলোর চাহিদা

বেশি। কখন যে টুক্ করে তুলে নিয়ে যায়। কত আর নজর রাখব, একা মানুষ। যাহোক আমি কিন্তু সহজে ছাড়ছি না।

কীভাবে এগুবি, ভেবেছিস?—দেবুর কৌতূহল।

—শুধু ভাবিনি। কাজেও এগিয়েছি খানিকটা। ভবেশদার থেকে হত্যাপুরীর ডিমান্ড লিস্টটা নিয়েছি। ওটা দেখলেই বোঝা যাবে, কার কার ওই বইটা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ ছিল। খুব সম্ভব তাদেরই কেউ সরিয়েছে। এদের পেছনেই আমি তদন্ত করব। মানে ইনভেস্টিগেশন।

—কজন বইটা চেয়ে নাম লিখিয়েছে?

—গত পরশু অবধি তেরোজন ছিল ডিম্যান্ড লিস্টে। এর মধ্যে দুজনকে বাদ দিচ্ছি। বিজয় এবং আমি। বাকি এগারো জনের যে কেউ অপরাধী হতে পারে।

—কীভাবে ইনভেস্টিগেশন করবি?

উপার্য় একটা ভেবেছি।— শিব রহস্যময় হাসে মাত্র। বোঝা গেল সে তার তদন্ত পদ্ধতি আপাতত গোপন রাখতে চায়।

দেবুও এনিয়ে আর জোরাজুরি করে না। শুধু বলে, — বইটা ফেরত দেওয়ার ঘণ্টাখানেক বাদে আবিষ্কার হয় যে বই উধাও। তাই তো?

—হুঁ।

তাহলে ওই সময়ের মধ্যে যারা যারা বই নিয়েছেন তাদের কাছে একবার খোঁজ করে দেখা যাক, যদি কেউ ভুল করে বইটা নিয়ে গিয়ে থাকে।

শিব বলল,— ভুল করলে নিশ্চয়ই দু একদিনের মধ্যে ভুলটা ধরা পড়বে এবং বইখানা ফেরত দিয়ে যাবে।

অত চাড়াতাড়ি ভুল দরা নাও পড়তে পারে। —দেবুর সংশয় অনেকে লাইব্রেরি থেকে বই এনে অনেকদিন স্রেফ ফেলে রাখে, না উল্টিয়েই।

বেশ তাদের কাছেও খোঁজ করব।—শিবের সায়।

এরপর কয়েকদিন দুই বন্ধুতে আর এ বিষয়ে কথা হয়নি। শিবের সদাই কেমন ব্যস্তসমস্ত ভাব। দেবু অপেক্ষায় থাকে— ও নিজেই বলবে তদন্তের ফলাফল।

পাঁচদিন বাদে স্কুল ছুটির পর শিব দেবুর সঙ্গ ধরল। খানিক নীরবে পাশে পাশে হাঁটে দুজনে।

খোঁজ পেলি বইটার?—দেবু নিজেই জানতে চায়।

—নাঃ। বই চেয়ে যারা নাম লিখিয়ে রেখেছিল তাদের এগারোজনকে বাজিয়ে দেখলাম। কিন্তু তেমন কোনো ক্লু পেলাম না। অবশ্য একটা কেস বাদে।

—কীভাবে বাজালি? সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলি নাকি?

—মোটেই না। আমি কি তেমন বুদ্ধু! সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলে কি চোর স্বীকার করবে? আমি অন্য কথা বলতে বলতে হঠাৎ ওই গল্পের বইয়ের প্রসঙ্গে যাই। বইয়ের গল্পটা ওরা জানে কিনা পরখ করি। যে বইটা পড়েনি তার পক্ষে গল্পটা না জানাই স্বাভাবিক। তাই না?

—হুঁ।

—কারও সঙ্গে খেজুরে আলাপ করতে করতে এই ধর হঠাৎ বলি, আচ্ছা ডক্টর মুস্তাফির কোন্ চোখটা কাচের ছিল?

— ড: মুস্তাফি কে?

রতনগড় অর্থাৎ হত্যাপুরীর মালিক। এক উন্মাদ নিষ্ঠুর কিন্তু অতি প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক। যে মানুষ জাতটাকে নতুন করে গড়ার স্বপ্ন দেখে এবং রতনগড়ে নিয়ে গিয়ে তার অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্টের খাতিরে একটার পর একটা মানুষের প্রাণ বলি দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।

—কাউকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছি, ডঃ মুস্তাফির সেই ভয়ংকর শিকারি কুকুরটার নাম কী ছিল যেন?

এমনই সব ছোটখাটো কিন্তু অব্যর্থ ফাঁদ পাতা প্রশ্ন। যা কিনা গল্পটা ভালো মতো না জানলে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

বাঃ, বেশ কৌশল করেছিলি তো।— দেবু সপ্রশংস ঃ কী রেজাল্ট পেলি?

—দশজন আমার প্রশ্নের জবাবই দিতে পারেনি। থতমত খেয়েছে। তাদের ভেতরে সাতজন বলেছে যে গল্পটার কিছুই জানে না, তবে শুনেছে বইটা দুর্দান্ত। আর তিনজন বলেছে, গল্পটা মোটামুটি শুনেছে অন্যের মুখ থেকে। এখন নিজে পড়তে চায়। কিন্তু লম্বু খোকন ঠিক উত্তরটা দিয়ে দিল।

কী করে জানলি তুই? এই বলে চেপে ধরতে বলে কিনা, বইটা ও একবার পড়ে ফেলেছে ছোটনের বাড়িতে বসে, খুব তাড়াহুড়ো করে কিন্তু নিজের বাড়িতে আনতে পারেনি—দেয়নি ছোটন। তাই ডিমান্ড দিয়ে রেখেছে। বলল, শুনেছে যে বইটা নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। তাই ও খুব আপশোস দেখাল। আমার ধারণা ওটা ওর ভান। ওই অপরাধী। চুরি করে নিয়ে পড়েছে বইখানা। আমার প্রশ্নে জবাবটা বেফাঁস বেরিয়ে যেতে সন্দেহ ঢাকতে ওইসব বানিয়ে বলল। আবার বলে কিনা লাইব্রেরিয়ানকে বলিস্‌নি যে আমি বইটা পড়ে ফেলেছি। তাহলে বই পেলে আমায় এখন দিতে চাইবে না। যারা পড়েনি মোটে তাদের আগে দেবে।

দেবু ভেবে বলল,— একদম উড়িয়ে দেওয়া যায় না ওর কথা তুইও তো একবার পড়েছিস। সাধ মেটেনি। তাই ফের পড়তে চাইছিস।

শিব দৃঢ়কণ্ঠে বলল,— উঁহু, খোকনটা মিটমিটে শয়তান। ও একবার তপনের স্ট্যাম্পের অ্যালবাম দেখতে দেখতে দুটো স্ট্যাম্প সরিয়েছিল। পরে ধরা পড়ে যায়। চুরি বিদ্যেয় বেটা দিব্যি পোক্ত। আমি ওকে নজরে রাখছি। আর সুযোগ পেলেই ওর ঘরে গিয়ে ওর বই-খাতা সার্চ করে দেখব লুকিয়ে। জানিস, সেদিন বই হারানোর সময় ও লাইব্রেরিতে ছিল।

তাই নাকি?—দেবুও সিন্দিগ্ধ। তারপর বলে,— আচ্ছা, যারা ওই সময় বই ইস্যু করেছিল তাদের কাছে খোঁজ নিয়েছিলি? মানে যদি কেউ ভুল করে নিয়ে থাকে?

—হ্যাঁ করেছি। মোট বারো জনের কাছে। লাভ হয়নি। পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে তো আচ্ছা ধ্যাতানি খেলাম।

—কেন?

—পণ্ডিতমশাইকে জিজ্ঞেস করতেই রেগে উঠে বললেন,— ভুল করে বেশি বই আনিনি। বরং ভুল করে একটা ইস্যু করা বই ফেলে এসেছিলুম। পরে গিয়ে নিয়ে আসি। তোমায় কে পাঠিয়েছে? লাইব্রেরিয়ান? এমন ভুল করলে কি ফাইন দিতে হয়? নতুন নিয়ম হয়েছে বুঝি?

—উনি বই ফেলে এসেছিলেন ভুলে?

—হ্যাঁ। লাইব্রেরিয়ান ভবেশদা বললেন, পণ্ডিতমশাই প্রায়ই বই ইস্যু করে, তারপর পত্রিকাটত্রিকা পড়ে, বই ভুলে লাইব্রেরিয়ানের টেবিলে ফেলে রেখেই চলে যান। কখনো একটা, কখনো দুটো বই-ই ফেলে রেখে গেছেন। পরে খেয়াল হলে এসে নিয়ে যান। এই নিয়ে ভবেশদা একবার অনুযোগও করেছেন, বই হারিয়ে যাবার ভয়ে। তাই পণ্ডিতমশাই শুনেই চটে গিছলেন। আমার ওপর ঝাল ঝাড়লেন।

যাকগে, লম্বু খোকনকে আমি ওয়াচ্ করব। আর ভাবছি, যারা আগে বইখানা পড়েছে ইস্যু করে তাদের মধ্যে যাদের চুরিটুরির রেকর্ড আছে, তাদের ওপরই নজর রাখতে হবে। মোটকথা হত্যাপুরীর হাতছানি অন্তর্ধান রহস্য আমি উদ্ঘাটন করবই।

দৃঢ়স্বরে নিজের সঙ্কল্প জাহির করে বিদায় নেয় শিব।

শীতের সন্ধ্যায় ছটার মধ্যে গ্রাম একটু নিঝুম হয়ে আসে। দেবু পড়ছিল তাদের বৈঠকখানায় বসে। শিবের ডাক শুনে বেরিয়ে এল। আজ স্কুলে শিবের সঙ্গে বিশেষ কথা হয়নি। এমন সময় হঠাৎ!

দুজনে বৈঠকখানায় ঢোকে। ফাঁকা ঘরে একখানা চেয়ারে ধপ করে বসে, শিব বলে ওঠে, — হত্যাপুরীর হাতছানি পাওয়া গেছে। কিন্তু এমন দারুণ খবরটা ঘোষণা করার সময় তার চোখে মুখে কোনও উচ্ছ্বাস উত্তেজনা ফোটে না।

কী করে? কে নিয়েছিল? —দেবু উত্তেজিত।

পণ্ডিতমশাই।—শিবের নিস্পৃহ জবাব : ভুল করে নিয়ে গেছলেন বইটা। আজ বিকেলে ফেরত দিয়ে গেলেন লাইব্রেরিতে।

—ভুল করে! কিন্তু তোকে যে বলেছিলেন?

—হ্যাঁ, সে বইটা ভুলে ফেলে গিছলেন ঠিকই। আর গতকাল রাতে নিজের বইপত্তর ঘাঁটতে ঘাঁটতে আবিষ্কার করেন হত্যাপুরী। কী করে যে বইটা ওখানে এল উনি বুঝেই উঠতে পারছেন না। তবে মনে করছেন যে ওঁনারই ভুল। কারণ যে বইটা ফেলে গিছলেন তার আর হত্যাপুরীর সাইজ ও বাঁধাইয়ে ভীষণ মিল।

—হত্যাপুরী বাঁধানো বই?

—হুঁ। মাসখানেকের ভেতর অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ওর মলাট ছিঁড়ে যায়। তখন বাঁধানো হয়।

—কীভাবে ভুলটা হল?

—পণ্ডিতমশাই বলছেন যে লাইব্রেরির বইয়ের সঙ্গে আরও কিছু বইখাতা ঘরে পড়ার টেবিলে নামিয়ে রেখেই উনি একবার মুদির দোকানে যান দেশলাই কিনতে। ফিরে এসে লাইব্রেরির বই দুটো আলাদা করতে গিয়ে দেখেন দুটোর মধ্যে একটা বই রয়েছে। অন্য বইটার জন্যে তেমন খোঁজাখুজি না করেই সোজা ছুটে যান লাইব্রেরিতে। পেয়ে যান দ্বিতীয় বইটা। ফলে ভাবেন, দুটোর বদলে একখানা বই-ই এনেছিলেন। এখন অবশ্য তাঁর মনে হচ্ছে যে প্রথমবার সংস্কৃত কাব্যটির বদলে হত্যাপুরীই এনেছিলেন এবং তাড়াহুড়োয় রাখার সময় হত্যাপুরী ওপর থেকে গড়িয়ে গিয়ে অন্য বইয়ের ভেতর মিশে যায়।

পণ্ডিতমশাই কৌতূহলী হয়ে কাল রাতে হত্যাপুরীর হাতছানি পড়েও ফেলেছেন। আজ ফেরত দেওয়ার সময়—এমন বিদঘুটে যাচ্ছেতাই, বাল্যশিক্ষার অনুপযুক্ত বই লাইব্রেরিতে রাখা উচিত নয়— ইত্যাদি কিছু উপদেশ ঝেড়ে গেলেন মিষ্টি মিষ্টি করে। তবে বইখানা ভুল করে নিয়ে গিছলেন বলে লজ্জাপ্রকাশও করেছেন। তখন আমি লাইব্রেরিতে ছিলুম, তাই শুনলুম সব।

দেবু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করে,—পণ্ডিতমশাই প্রথমবার ভুলে হত্যাপুরী নিয়ে গিছলেন হতে পারে। তাড়াতাড়ি রেখে বেরুনোর ঝোঁকে বইটা পাশে সরে গিছল, তাও সম্ভব। কিন্তু সাত দিনের মধ্যে বইখানা পণ্ডিতমশাইয়ের নজরে এল না, যখন ওটা টেবিলেই ছিল, এটা কেমন জানি অদ্ভুত ঠেকছে। উঁহু, মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অন্য।

আচ্ছা, পণ্ডিতমশাইয়ের ছেলে সন্তু কি হত্যাকারীর জন্য ডিমান্ড দিয়ে রেখেছিল?

হ্যাঁ। ওর নম্বর ছিল আট। —জানাল শিব।

—তুই ওর কাছে বইটার কথা পেড়েছিলি?

—হ্যাঁ।

—কী বলেছিল, বইখানা ও দেখেছে কিন্তু হাতে পায়নি। গল্পটাও জানে না। তবে শুনেছে দারুণ বই।

দেবু বলল,—দেখ শিব, আমার মনে হচ্ছে সন্তুই বইটা সরিয়েছিল পণ্ডিমশাইয়ের টেবিল থেকে। পণ্ডিতমশাই বইটই রেখে দোকানে যেতেই ও নিশ্চয়ই ঘরে ঢোকে। হত্যাকারীর হাতছানি চিনতে পারে এবং না বলে সরায়। তাই পণ্ডিতমশাই দোকান থেকে ফিরে আর বইটা দেখেননি। পড়া হয়ে গেলে কদিন বাদে সন্তু ফের বইখানা বাবার টেবিলে রেখে দেয়। বইটা দেখে সন্তু লোভ সামলাতে পারেনি। আর হয়তো আঁচ করেছিল যে বাবা ভুল করে বইটা এনেছে।

শোন্ শিব, তুই সন্তুকে চেপে ধর। দেখ ও অপরাধ কবুল করে কিনা? দরকার হলে ভয় দেখাবি যে নন্দপুরের সাধুবাবা গুণে বলেছিলেন যে একটা ছেলে হত্যাপুরীর হাতছানি চুরি করেছে। আর সাধুবাবার দেওয়া চোরের বর্ণনার সঙ্গে সন্তুর চেহারা একদম মিলে যাচ্ছে।

এই অস্ত্রেও কাজ না হলে সন্তুকে ভয় দেখাবি, পণ্ডিতমশাইকে বলে দেব যে তুই ওই বইটা পড়ার জন্যে নাম লিখিয়ে রেখেছিস। ওতে ঘাবড়ে যাবে। সব্বাই জানে পণ্ডিতমশাই রহস্য গল্পের ওপর কী ভীষণ খাপ্পা! আর সন্তু তার বাবাকে যমের মতন ভয় করে।

পরদিন বিকেলে নদীর ধারে বালির চড়ায় বসেছিল দেবু। দেখল হনহন করে আসছে শিব। এমনিই সে আশা করেছিল।

শিব কাছে এসেই উৎফুল্ল স্বরে জানাল,—তুই ঠিক ধরেছিস। সন্তুই হাতিয়েছিল বইটা। পণ্ডিতমশাই বই রেখে যেই দোকানে গেছেন সেই ফাঁকে। বইয়ের চেহারা দেখেই ওর সন্দেহ হয়। দু-দুবার পড়েছে। আমি যখন গিয়ে বইটার কথা তুলি তখন নার্ভাস হয়ে বইটা রেখে দেয় বাবার টেবিলে, অন্য বইয়ের ভিতর গুঁজে। সেইদিনই। তবে পণ্ডিতমশাই হত্যাপুরী আবিষ্কার করেন আরও তিনদিন বাদে।

—স্কুলে ওকে জিজ্ঞেস করলি বুঝি?

—হ্যাঁ। টিফিনে ধরেছিলাম। সাধুবাবার নাম করতেই ঘাবড়ে গিয়ে কবুল করে ফেলল। সন্তু কাল আলুর চপ খাওয়াবে বলেছে। মানে ঘুষ আর কী, মুখ বন্ধ করতে। যাতে পণ্ডিতমশাইকে বলে না দিই।

—এ্যাঁ, আলুর চপ! শুধু তোকে? আর আসিস্ট্যান্ট বুঝি বাদ?

না, না, তোকেও খাওয়াতে হবে বলে রেখেছি। —জানায় শিব।

যাক এবার তোর গোয়েন্দাগিরিতে কাজ হয়েছে।— দেবু উৎসাহ দেয়।

ধ্যুৎ! কোথায়?—শিবের আক্ষেপ : আমি ধরতে পারলেম কই? পণ্ডিতমশাই ভুল করলেন। আবার নিজেই নিজের ভুল ধরলেন। আমার ক্রেডিট কোথায়?

দেবু বলল,—তোর ক্রেডিট আছে বইকি। আরে তুই সন্তুকে ওই বইটা নিয়ে জিজ্ঞেস না করলে ও ঠিক মেরে দিত হত্যাপুরী।

তা হতে পারে।— শিব কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল হয়।

আর কেস করে এই প্রথম তোর ফিজও মিলল।—দেবু শিবের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে।

ফীজ! ফীজ আবার কোথায়?— শিব ভুরু কোঁচকায়।

—কেন, আলুর চপ। অবশ্য ওটা লাইব্রেরি কমিটিরই খাওয়ানো উচিত ছিল। যাকগে প্রথম প্রথম এ নিয়ে অত খুঁতখুঁত না করাই ভালো।

তা বটে।—শিব একগাল হাসে।

এক গভীর ষড়যন্ত্রের আভাস

শিব মনমরা। এই পোড়া দেশে কী করতে যে লোকে বাস করে? কোথাও রহস্যের নামগন্ধ নেই।

দেবু যদিও আশ্বাস দেয়,—আছে আছে। তলে তলে অনেক কুকম্ম হচ্ছে। কত রহস্যের জাল ছড়াচ্ছে। আরে হইচই করে খুন জখম মারপিট লাঠালাঠি করা পুলিশের ব্যাপার। ওসব মোটা দাগের কাজ। কিন্তু সূক্ষ্ম অপরাধ, যা সহজে চোখে পড়ে না, সেই রহস্য ভেদ করতে চায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রাইভেট ডিটেকটিভ। স্রেফ চোখ কান খোলা রাখ।

দেবু ভরসা দিচ্ছে। শিব নজরও রাখছে। তবু সে হতাশ

রহস্যের সন্ধান পেয়েছে ভেবে দু-বার শিহরিত হয়ে শিব নিতান্ত নিরাশ হয়। একদিন এক অচেনা বাউল ঢুকেছিল গ্রামে। শিবের কেমন সন্দেহ হয় তাকে। ডাকাত দলের গুপ্তচর নয়তো?

বাউলটির ব্যবহার অমায়িক। গান গায়। ভিক্ষা নেয়। কিন্তু ওর তীক্ষ্ণ নজর ঘুরছিল চতুর্দিকে। ওইটে লক্ষ করে শিবের মনে সন্দেহের মেঘ জমে। সে পিছু নেয় লোকটির আড়ালে অনুসরণ করে। বাউল কিন্তু শেষমেষ তাকেই পাকড়ে অনেক প্রশ্ন করে। এই গ্রামে গত তিন-চার দিনের ভিতর বছর পনেরো ষোলোর কোনো নতুন ছেলে এসেছে কিনা? ফর্সা রোগা বড় বড় চোখ, কপালে কাটা দাগ, এই এতটা লম্বা।

প্রৌঢ় বাউলটি বিষণ্নভাবে জানায়, ওই যে ছেলেটিকে খুঁজছে সে তার নাতি। বাউন্ডুলে স্বভাব। মাঝে মাঝে পালায় বাড়ি থেকে। ও ইস্কুলে পড়ে ক্লাস নাইনে। পড়াশুনোয় মন্দ নয়। গানের গলাও দিব্যি। অথচ ওই এক অদ্ভুত স্বভাব। বাড়িতে বেশি দিন মন টেকে না। খবর

পেয়েছি এই দিকেই এসেছে। ওর মা দিদিমা বড্ড কান্নাকাটি করছে। পুলিশে খবর দিয়ে ধরে নিয়ে গেলে হয়তো জন্মের মতন উধাও হবে অভিমানে রাগে। তাই নিজেই খুঁজছি। পেলে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে যাব। আগেও এমনই একবার খুঁজে খুঁজে ধরে এনেছি।

ব্যাজার হয় শিব। গুপ্তচরই বটে। তবে ভিন্ন জাতের। বাউলের ভেজা চোখের আক্ষেপে মনটা তার ভারী হয়ে রইল অনেকক্ষণ।

আর একদিন নির্জন সকালে পশ্চিমপাড়া দিয়ে সাইকেলে যেতে যেতে হঠাৎ কানে কতগুলো কথা আসতে শিব চমকে ওঠে। কথাগুলির উৎসস্থল এক নিরালা বাড়ির দোতলায় একটি ঘর।

নারী কণ্ঠে চাপা আর্তস্বর ভেসে এসেছিল,—ক্ষমা কর। ক্ষমা কর।...

ওই কাতর অনুরোধের যেন উত্তর হিসেবেই গর্জে উঠেছিল এক পুরুষ কণ্ঠ। তবে পুরুষটির কথাগুলি সে বুঝতে পারেনি।

শিব থমকে যায়। ফের নারী কণ্ঠের চাপা করুণ আবেদন এবং পুরুষ কণ্ঠের ধমক। 'প্রতিশোধ' এবং 'বিশ্বাসঘাতক' এই দুটি শব্দ সে স্পষ্ট শোনে পুরুষের গলায়।

অত্যন্ত অবাক হয় শিব। কারণ দোতলায় ওই ঘরে থাকেন নগেন দত্ত। তাদের স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক।

নগেন স্যারের বয়স বছর তিরিশের কাছাকাছি। বোলপুরের লোক। এই বাড়িতে দুটি ঘর ভাড়া নিয়ে একা থাকেন। পরিবার থাকে বোলপুরে।

এই প্রকাণ্ড পাকাবাড়িটা অন্তত শখানেক বছরের পুরনো। এককালের বাঁড়ুজ্যেদের অবস্থা খুব ভালো ছিল। নিশ্চয় গমগম করত বাড়ি। এখন মাত্র একজন শরিক বাস করেন বাড়ির এক কোণে। বাকি অট্টালিকা খালিই থাকে প্রায় বারো মাস।

নগেনবাবুর ঘরে কারা? পুরুষ কণ্ঠ তো নগেন স্যারের বলে মনে হল না। শিব উৎকর্ণ হয়ে শোনে। ফের কিছু নারী কণ্ঠের অনুনয় মেশানো বিলাপ এবং তাকে থামিয়ে দিয়ে পুরুষ কণ্ঠের চাপা কর্কশ ধমক।

দুরন্ত কৌতূহলে শিব সাইকেল রেখে সামনে একটা ঝাঁকড়া জামগাছে চড়ে ধীরে ধীরে। এডাল ওডাল করে এমন জায়গায় হাজির হয় সেখান থেকে নগেন স্যারের ঘরের ভিতর দেখা যায়। খোলা জানলাপথে।

শিব দেখে, ঘরে তিনজন পুরুষ। কিন্তু মেয়ে কাউকে চোখে পড়ল না। ছেলেদের মধ্যে একজন স্বয়ং নগেন স্যার। অন্য দুজন এই গ্রামেরই যুবক। নগেন স্যার বসেছিলেন চেয়ারে। সামনে টেবিলে একখানা খোলা চটি বই। অন্য দুই ব্যক্তি মেঝেতে দাঁড়িয়ে। তিনজনে কী কথা হচ্ছে, শিবের কানে তা পৌঁছয় না।

সহসা দণ্ডায়মান দুই যুবকের একজন কেমন বিচিত্র ভঙ্গি করে মেয়েলি গলায় বলে উঠল, — না না না। এ আমি কিছুতেই পারব না।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য যুবকটি হাতমুখ নেড়ে চেঁচিয়ে উঠল,— পারবে না? আমার আদেশ। মনে রেখো— সে কথা থামিয়ে নগেন স্যারের মুখপানে থতমতভাবে চায়।

নগেনস্যার অমনি টেবিলে এক চাপড় মেরে বিরক্ত স্বরে বলে উঠলেন,— ব্যস, আটকে

গেলে! আর কদিন পরে স্টেজ? এখনও পার্ট মুখস্থ হল না। হোপলেস! ডোবাবে দেখছি। তোমাদের সিনগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। রিহার্সালে ফাঁকি মারার এই ফল। কাল থেকে রোজ এখানে এসে প্র্যাকটিস করবে আলাদাভাবে। নইলে আমি তোমাদের এই হুজুগে নেই, বলে রাখছি। আর অত খেঁকিয়ে বলচ কেন এ জায়গায় একটু চাপা বিদ্রূপ মেশাও।

ধুত্তেরি। ওরা থিয়েটারের রিহার্সাল দিচ্ছে। শিব গাছ থেকে নামে। নগেনস্যারের থিয়েটারের শখ সবাই জানে। সরস্বতী পুজোর পরদিন ফুলডাঙা নাট্যসংঘ প্লে করবে, তারই মহড়া।

ছোঁক ছোঁক করতে করতে সত্যি এক রহস্যের সূত্র বুঝি মেলে।

দিনটা ছিল শনিবার। হাফ-ডে স্কুলের পর শিব এসে ঢুকেছিল ঘোষেদের বাগানে কুলের লোভে। তেমন বড় নয় বাগান। গ্রামের সীমানায় বিঘে দেড়েক জমিতে ছোট্ট পুকুর ঘিরে কটা আম নারকেল জাম পেয়ারা ইত্যাদি গাছ। তবে একটা কুলগাছ আছে অতি উৎকৃষ্ট।

শিব জামা প্যান্টের পকেট ভরে কুল নিল। তারপর ঝাল-নুন সহযোগে তারিয়ে তারিয়ে কুল খেতে লাগল মাটিতে বসে।

এ বাগানের তেমন কোনো রক্ষক নেই। বাগানের গায়েই সাধুচরণের কুঁড়ে। সাধুচরণই যেটুকু পাহারা দেয় বাগান। তবে আম আর নারকেল নিয়েই তার মাথা ব্যথা। অন্য ফল নিয়ে বিশেষ গা করে না।

সাধুচরণের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। একহারা লম্বা গড়ন। মুখখানা হাসি হাসি। সে একা মানুষ। স্ত্রী গত হয়েছে বছর দুই। একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে অনেককাল।

অল্প চাষের জমি আছে সাধুচরণের। তাই আবাদ করে তার পেট চলে। বাকি সময়টা আড্ডা দেয় আর গান বাজনা নিয়ে থাকে। গলাটি তার খাসা। বাউল কীর্তন সব গানেই সে ওস্তাদ। রসিক সাধুর সঙ্গে দুটো মজাদার কথা কইতে ভালোবাসে লোকে, গানও শোনে।

এখনকার সাধুর সঙ্গে বছর দশেক আগেকার সাধুর কিন্তু মিল নেই। এককালে সাধুচরণ ছিল নামজাদা চোর। গাঁয়ের লোক তার ভয়ে তটস্থ থাকত। বার কয়েক জেলও খেটেছে। তবে বেশিদিন মেয়াদ খাটতে হয়নি কখনো। পুলিশ কোনো দিনই জুৎসই কব্জা করতে পারেনি ধূর্ত সাধুচরণকে।

সাধুচরণের হঠাৎ এই পরিবর্তনের হেতু কী?

নানা মুনির নানা মত। কেউ বলে, চোর বাপের নামে শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের সম্মানহানি হচ্ছিল, তাই আদরের মেয়ের কান্নাকাটি অনুরোধে সাধুচরণ চৌর্যবৃত্তি ত্যাগ করে। কেউ বলে, এক সন্ন্যাসীর প্রভাবে সাধু চুরি ছেড়েছে। যাহোক, চোর সাধু সত্যি সাধু হওয়ায় গাঁয়ের লোক পরম স্বস্তি পেয়েছে।

সাধুচরণ লোকটিকে শিবের রহস্যময় ঠেকে, খানিক সমীহও করে। একবার এই বাগানে আম চুরি করতে এসে সে সাধুচরণের চোখে পড়ে যায়। সাধুচরণ তাকে ধমকে নামিয়ে বিদ্রূপের সুরে বলেছিল,—ছ্যা ছ্যা, ঠিক মতন আম চুরি করতেও শেখনি বাছা? তা ধরা যখন পড়লে খেসারত দিতে হবে বইকি।

এই বলে শিবের পকেট থেকে সবকটা কাঁচা আম কেড়ে নিয়েছিল। আরও বলেছিল,—

তোমার বাড়িতে নালিশ করব না। লঘু পাপে গুরুদণ্ড হয়ে যাবে।

শিব গাছ থেকে নেমে পালাবার চেষ্টা করতেই সাধু তড়িৎগতিতে তার হাত ধরে ফেলেছিল। ওর কঠিন মুঠির চাপে বুঝেছিল শিব লোকটির গায়ে কত জোর!

এরপর অবশ্য সাধুচরণ আর তাকে কিছু বলেনি। দেখা হলে হেসেছে বরং। একবার দুটো পাকা আমও দিয়েছিল নিজে থেকে। কুল খেতে খেতে কিছু দূরে সাধুচরণের কুটিরের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে শিব। সহসা সে দেখে, গাছপালার ভিতর দিয়ে আসছেন স্বয়ং ঘোষমশাই অর্থাৎ এই বাগানের মালিক বৃদ্ধ ক্ষমাপতি ঘোষ।

শিব চট করে একটা ঘন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসল।

ঘোষমশাই সাধুচরণের কুটিরের সামনে গিয়ে নিচু স্বরে ডাকলেন।—সাধু।

সাধুচরণ মুখ বের করল দরজা দিয়ে। তারপর দ্রুত বেরিয়ে এসে বলল,—পেন্নাম হই বাবু। আপনি আবার কেন কষ্ট করে এলেন?

ঘোষমশাই গম্ভীরভাবে বললেন,— সাধে কি আর এলাম। তোর পাত্তাই নেই। সেই ব্যাপারটা মনে আছে তো?

—আজ্ঞে তা কি ভুলি? কথা যখন দিইচি, কাজ ঠিক হাসিল করব। তবে বাবু এসব ঝঞ্ঝাটে জড়াতে আর মন চায় না। নেহাত আপনারা বলছেন তাই।

—কেন তোমার ভয় করছে?

ভয়? —নিঃশব্দে হাসে সাধু : স্বেচ্ছায় এ বৃত্তি ত্যাগ করেছি। আজ্ঞে ভয়ে নয়। ও বস্তুটি আমার নেই। তবে আবার বলছি মন চাইছে না। অন্য কাউকে এ ভার দিলে পারতেন।

না না।— বাধা দেন ঘোষমশাই : তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না।

ঘোষ আরও কীসব বললেন চাপা গলায়, শিবের সব কানে আসে না। সে উৎকর্ণ হয়ে শোনে টুকরো টুকরো বাক্য। যেমন—

—সময় হাতে বেশি নেই। প্ল্যানট্ল্যান সব—

সে আজ্ঞে, হয়ে গেছে মোটামুটি। কাল সকালে যাব আর একবার দেখে আসতে। —সাধুচরণের গলা খাদে নামে।

নরহরির মেজ ছেলেটা কিন্তু খুব হুঁশিয়ার আর দুর্দান্ত।

—ঘোষমশাইয়ের উদ্বিগ্ন কণ্ঠ।

জবাব হয়,— গুরুর কৃপায় সাধুচরণ মানুষকে পরোয়া করে না। তার বেশি ডর বরং কুকুরকে। ভারি বেয়াড়া জানোয়ার।

—কুকুর থাকলে কি সে বাড়িতে চুরি করনি?

এ কেমন কথা বললেন বাবু?—সাধুচরণ ফের দাঁত বের করে নীরবে হাসে : বাঘা ডালকুত্তার পাহারা দেওয়া কত বাড়ির সিন্দুক সাফ করেছি। কুকুরকে বশ করার বিদ্যে না জানলে কি আর এ লাইনে উন্নতি করা যায়! আপনি আর দুশ্চিন্তা করবেন ন। এখন বিদায় নিন। আপনি আমার ঘরে এসে কথা কইছেন দেখলে কে না কি সন্দেহ করে বসবে?

ঘোষমশাই সন্ত্রস্ত চোখে চারপাশ একবার দেখে নিয়ে গুটিগুটি ফিরে চললেন। সাধুচরণ ঢুকে গেল তার ঘরে।

আরও মিনিট দশেক লুকিয়ে বসে থেকে শিব চুপিচুপি কেটে পড়ল সেখান থেকে। কোনো অভাবিত রহস্যের সম্ভাবনায় তখন সে উত্তেজনায় থরথর।

পরদিন রবিবার ছুটির দিন। তাই সুবিধাই হল। ভোরে গিয়ে শিব বসে রইল ঘোষেদের বাগানে ঝোপের আড়ালে। বেশিক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে হল না। আধঘণ্টাটাক বাদে বেরিয়ে এল সাধুচরণ তার কুটির থেকে। গায়ে তার পরিষ্কার জামা ধুতি। খালি পা। কাঁধে ঝুলছে দোতারাটি।

সাধুচরণ ধীরে ধীরে চলল গ্রামের ভিতরে। নিরাপদ দূরত্ব রেখে, যাতে ওর চোখে না পড়ে, শিব অনুসরণ করল তাকে।

সাধুচরণ পথে দু-চারটি গ্রামের লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সামান্য আলাপ করল। একজনের বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কীর্তন গাইল কয়েক কলি। তারপর ফের হাঁটা দিল। সে গিয়ে ঢুকল এবার নরহরি বোসের বাড়ি। ওই বাড়িতে সে গেঁড়ে বসল।

মিনিট দশেক বাদে শিব বোসবাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার ছলে আড়চোখে দেখে নিল আধখোলা দরজা পথে ভেতরে।

বোসবাড়ির এলাকাটা বেশ বড়। প্রায় বিঘেখানেক জায়গা মানুষ সমান উঁচু মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভিতরে দোতলা পাকা বসতবাড়ি। রান্নাঘর, গোয়ালঘর ইত্যাদি আরও তিনটি বড় বড় ঘর রয়েছে লাগোয়া— সেগুলির দেওয়াল মাটির, খড়ের চাল। তকতকে উঠোন। উঠোনে যত্নে লাগানো কিছু ছোট ছোট ফল ও ফুলের গাছ। গাঁদা, গোলাপ, কুন্দ ফুলের বাহার। গাছে ঝুলছে নধর বেগুন, সবুজ লাল সতেজ লঙ্কার ঝাড় মাথা তুলে আছে। একটা পাতিলেবুর গাছ ভরে আছে ফলে। উঠোনের মাঝে তুলসী মঞ্চ। গোয়াল ঘরের চালে লতিয়ে উঠে ছেয়ে আছে মস্ত এক লাউ গাছ। বড় বড় লাউ ধরেছে তাতে।

শিব দেখল, বৃদ্ধ নরহরি বোসমশাই দাওয়ায় চেয়ারে বসে সমুখে উঠোনে নিচু জলচৌকিতে বসে হাসি মুখে কথা বলছে সাধুচরণ। একটু বাদে ভেসে আসে সাধুচরণের গান। পরপর দুখানা সে গান গাইল দোতারা বাজিয়ে। দুটিই বাউল গান। বোসমশাই বাউল গানের ভক্ত।

মিনিট চল্লিশ বাদে শিব ফের ঘোষবাড়িতে উঁকি দিয়ে দেখল যে, সাধুচরণ তখন চা খাচ্ছে এবং গল্পও চলেছে বোসমশাইয়ের সঙ্গে। প্রায় সোয়াঘণ্টা সেখানে কাটিয়ে সাধু ফের পথে বেরুল।

সাধুচরণ এপাড়া ওপাড়া কিছু ইতস্তত ঘুরে, কিছু গল্পগুজব করে ঢুকল ক্ষমাপতি ঘোষের বাড়ি। ঘোষ বাড়ির ধাঁচ প্রায় নরহরি বোসের বাড়ির মতনই। ঘেরা উঠোনের জায়গা বোধহয় সামান্য কম হবে। উঠোনে তেমনি কিছু ফল ফুলের গাছ। তুলসী মঞ্চ। তবে ঘোষ বাড়ির উঠোনের মাঝে উঠেছে একটি উত্তম জাতের কলমি আমের গাছ।

ঘোষ বাড়িতেও সাধুচরণ কাটাল ঘণ্টাখানেক। গানও গাইল একটি। শিব বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় লক্ষ করল যে আমগাছের ছায়ায় দড়ির খাটিয়ায় বসে ক্ষমাপতি ঘোষ। কাছেই সামনে টুলে বসে সাধুচরণ। দুজনে কথা হচ্ছে নিচু সুরে।

ঘোষবাড়ি থেকে বেরিয়ে সাধুচরণ সোজা ফিরে গেল তার নিজের কুটিরে।

সেদিন বিকেলে শিব গিয়ে দেবুকে রিপোর্ট করল সাধুচরণ বৃত্তান্ত। তার ভয় ছিল দেবু বুঝি বা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয় কোনো রহস্যের সম্ভাবনা। কিন্তু দেবু সে ভাব দেখাল না। সব শুনে চিন্তিতভাবে চুপ করে রইল খানিক। অতঃপর জিজ্ঞেস করল, —তুই কি শুনেছিস ঘোষমশাই নরহরিবাবুর মেজ ছেলের কথা বললেন?

—হুঁ স্পষ্ট শুনেছি। তাছাড়া—কাজ হাসিল। গোপন ব্যাপার। প্ল্যানট্ল্যান। এসবের অর্থ কী। একবার নরহরি নামটাও শুনেছি। আমার মনে হচ্ছে ক্ষমাপতি ঘোষ সাধুচরণকে দিয়ে নরহরি বোসমশাইয়ের বাড়ি থেকে কিছু চুরি করাতে চায়। দু বাড়ির যা সম্পর্ক? হয়তো সাধারণ চুরি নয়। কোনো দলিল টলিল বা দরকারি·কোনো কাগজপত্র সরাতে চায় বোসদের জব্দ করতে। কাজটা খুবই কঠিন। তাই সাধুচরণকে বলে কয়ে রাজি করিয়েছে।

দেবু বলল, —হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে ক্ষমাপতি ঘোষ এবং নরহরি বোসের দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্কটা কেমন তা একটু বলা দরকার।

নরহরি ও ক্ষমাপতি পরস্পরের দুর সম্পর্কের ভাই অর্থাৎ আত্মীয়। দুই বাড়ির মধ্যে এক সময় যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল। নরহরি ও ক্ষমাপতি দুজনে কাছাকাছি বয়সি। বছর সত্তর ছুঁয়েছে। ঘোষমশাই তখন প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় বোস বাড়িতে যেতেন নরহরি বোসের সঙ্গে দাবা খেলতে।

দুই পরিবারই বেশ অবস্থাপন্ন। চাষবাস ছাড়াও ছোটখাটো ব্যবসা আছে তাদের। ক্ষমাপতির দুই ছেলের মধ্যে ছোটজন চাকরি করে বাইরে। বড় ছেলে দেশে থাকে। আর নরহরির তিন ছেলের মধ্যে বড়টি রেলের চাকুরে। বাইরে বাইরে ঘোরে। মেজ ও ছোট দেশে জমি জায়গা দেখে, লাভপুরে আটাভাঙার কল চালায়।

বছর চারেক আগে দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠতায় হঠাৎ চিড় খায়। কারণটা অতি তুচ্ছ। ঘোষদের বড় এবং বোসবাড়ির মেজ ছেলে দুজনেই চায় ফুলডাঙা ক্লাবের দুর্গাপুজো উপলক্ষে যাত্রায় সেনাপতির পার্ট। তাই থেকেই মন কষাকষি। সেনাপতি হওয়া অবশ্য দুজনের কারোর ভাগ্যেই ঘটেনি শেষমেষ। কিন্তু সম্পর্কটা খারাপ হয়ে গেল। এরপর থেকেই খুচ্খাচ্ ঝগড়া লেগেই অঅছে। একখণ্ড জমি নিয়েও দুপক্ষে মামলা চলছে।

ক্ষমাপতি আর বোসবাড়িতে যান না দাবা খেলতে। তবে দাবার নেশা দুজনেরই। তাই যান সন্ধ্যায় দত্ত বাড়িতে দাবার আসরে। যদিও ঘোষ বোস কর্তার মধ্যে সোজাসুজি বিবাদের কারণ যদিও ঘটেনি। তবু পারিবারিক টানেই পাঁচজনের আসরেও দুজনে পরস্পরকে এড়িয়ে চলেন। কথাবার্তাও বলেন না। সুতরাং সাধুচরণের সাহায্যে ক্ষমাপতি যে নরহরিকে জব্দ করতে ষড়যন্ত্র করতে পারে তা অস্বাভাবিক নয়।

দেবুর সমর্থন পেয়ে শিব উৎসাহিত হয়ে বলে,—সাধুচরণ নির্ঘাৎ বোস বাড়িতে গিয়েছিল কিছু ওয়াচ করতে, পরে কোনো দুষ্কর্মের মতলবে।

হুঁ।— দেবু ভাবিত : শিগগিরি হয়তো কিছু একটা ঘটবে। তবে এখনি তা আঁচ করা যাচ্ছে না। সাধুচরণের ওপর নজর রাখতে হবে। তুই আমি পালা করে ডিউটি দেব।

পুলিশকে ওয়ার্নিং দিয়ে রাখলে কমেন হয়?— শিবের প্রস্তাব : থানার ছোটবাবু আমার কাকার বন্ধু। আমায় চেনেন।

প্রমাণ ছাড়া শুধু তোর কথায় পুলিশ আমাদের পাত্তাই দেবে না। — জানাল দেবু : তাছাড়া আমাদের গোয়েন্দাগিরির কী হবে? কোনো রহস্য ভেদ হলে পুরো ক্রেডিট নেবে পুলিশই। বরং অঘটন কিছু ঘটলে তখন সমস্ত জানানো যাবে পুলিশকে। আমাদের ইনফর্মেশন হয়তো সাহায্য করবে ওদের। কিঞ্চিৎ প্রশংসাও মিলবে। আগেভাগে পুলিশকে জানানোর দরকার কী ?

দেবুর প্রস্তাব মনে ধরে শিবের। বলে, — তবে ভাই, সাধুচরণের ওপর তেমন নজর রাখার সুযোগ কই আমাদের? সকাল সন্ধ্যায় পড়া। দুপুরে ক্লাস। বিকেলে যেটুকু সময় পাব।

তাছাড়া উপায় কী ! —দেবুর জবাব : তবে ছুটির দিনগুলো কাজে লাগাতে হবে। অবশ্য খুব বেশিদিন সবুর করতে হবে বলে মনে হয় না।

রহস্য উদ্‌ঘাটন

শিব জানাল,— উঃ, গোয়েন্দাগিরি বড্ড রিস্কি কারবার।

কেন?—দেবুর প্রশ্ন।

— কাল বুঝলি, খেলার পর সন্ধ্যায় বাড়ি পৌঁছে মনে হল সাধুচরণের ঘরে একবার ঢুঁ মেরে আসি। গেলাম তাই। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। ঘোষবাগান আর সাধুর ঘরের আশপাশ একদম আবছা। বাগানের ভিতর থেকে লক্ষ করলাম, সাধুর ঘরের পাশে দুটো ছায়ামূর্তি কথা বলছে। একজনকে চিনলাম সাধুচরণ— ওর গলা শুনেই। কিন্তু অন্যজনকে চিনতে পারলাম না। তার গলা শুনতে পাচ্ছিলুম না। আর সে আমার দিকে পেছন ফিরে ছিল। সাধুর ঘরে কুপি বা লন্ঠনের আলোর যে সামান্য আভাটুকু পড়েছিল দুজনের গায়ে তাতেও বুঝলাম না, লোকটা কে?

আরও ভালো করে দেখতে যেই কাছে গিয়েছি, অমনি সাধুচরণের কুকুরটা কোথায় ছিল ঘাপটি মেরে, একেবারে ঘাউ-ঘাউ করে তেড়ে এল আমায়। বেটা দেশি বটে কিন্তু ইয়া তাগড়া আর কী তেজ! মারলাম টেনে ছুট। সাধুও বারকয়েক পেছন থেকে হাঁক পাড়ল কে কে ঘুরে। তবে কুকুরটা ধরতে পারেনি এই রক্ষে। বাগান পেরিয়ে, নদীর চড়া ঘুরে গ্রামে ঢুকেছি।

দেবু গম্ভীর কণ্ঠে বলল,— ডিটেকটিভগিরি রিস্কি কাজ বইকি। সবে তো শুরু। এরপর কত খুনে গুন্ডার তাড়া খাবি। কানের পাশ দিয়ে গুলি ছুটবে। গল্পের গোয়েন্দাদের গায়ে অবশ্য গুলিটুলি লাগে না। সবসময় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যায়। তবে সত্যি গোয়েন্দার অত সৌভাগ্য হবে কিনা বলা শক্ত।

দেবুর রসিকতা মোটেই উপভোগ করে না শিব। নিজের গালে হাত বুলিয়ে বলে,— ওঃ ছড়ে গেছে গায়ে।

অন্য লোকটিকে তাহলে চিনতে পারিসনি?— দেবুর কণ্ঠে আর ঠাট্টার ছোঁয়া নেই।

— উঁহু। গায়েকালো রঙের আলোয়ান ছিল। মাঝারি হাইট। ভারী চেহারা।— এইটুকু বুঝতে পেরেছি।

দেবু ভুরু কুঁচকে ভেবে বলে, —ঘোষমশাইয়ের একটা গাঢ় নস্যি রঙের আলোয়ান আছে। অল্প আলোয় সেটা কালো দেখাতে পারে। হাইট গড়ন মোটামুটি মিলে যাচ্ছে। হয়তো ক্ষমাপতিবাবুই ফের এসেছিলেন চক্রান্তটা পাকা করতে। সাধুচরণকে ইদানীং গাঁয়ের ভিতর যখন তখন ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে। আমি লক্ষ করেছি।

আমি আর সাধুচরণের ঘরের বেশি কাছে ঘেঁষছি না। বাপরে, কুকুরটা ডেঞ্জারাস।— বলল শিব।

দেবু বলল,— দরকার নেই বেশি কাছে গিয়ে। সন্দেহ করলে সাবধান হয়ে যাবে। হয়তো পেছিয়ে দেবে প্ল্যানটা। তৈরি থাক। কিছু ঘটলেই সাধুচরণকে ক্যাঁক করে ধরব।

গোয়েন্দা মানিকজোড়কে অবশ্য বেশিদিন অপেক্ষায় থাকতে হয়নি।

দুটো দিন বাদে রাত আটটা নাগাদ। মাঘের শীতে গ্রাম তখন জড়সড়, নিঝুম। চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুম জড়ানো চোখে শিব পড়া করছিল। এবার খেতে যাবে। 'আগুন আগুন'—বহু কণ্ঠের চিৎকার হট্টগোল কানে আসতে শিবের ঝিমুনি কেটে গেল। সে দুই লাফে বেরুল পথে।

পুব পাড়ার আকাশটা লাল হয়ে গেছে। শিব দৌড়ল সেদিকে।

বাড়ি বাড়ি দরজা খুলে যাচ্ছে। নানান বয়সি ছেলে পুরুষ ধেয়ে চলেছে পুব পাড়ার দিকে। বাড়ি বাড়ি দাওয়ায় ছাদে দরজায় কৌতূহলী সন্ত্রস্ত মেয়েদের জটলা। সবার চোখ ওই রাঙা আকাশ পানে।

আগুন লেগেছে বিধু দাসের উঠোনের কোণে খড়ের গাদায়। লোকসান তেমন কিছু হবে না। কারণ খড়টা নতুন নয় পুরনো । কদিন আগে একটা ঘরের চালা নতুন করে ছেয়ে, পুরনো খড় ডাঁই করে রাখা হয়েছিল। তাতেই লেগেছে আগুন। ওই বাজে খড়ের জন্য মাথা ব্যথা নেই বিধু দাস বা পাড়ার কারও। ভয়টা, পাছে আগুন ছড়ায়। কাছাকাছি অনেক খড়ের ঘর।

আগুনকে সহজে বাগ মানানো যাচ্ছে না। কিছু খড় ভিজে ছিল ফলে ধোঁয়া উঠছে প্রচুর। খড়ের গাদায় নিশ্চয় পাটকাঠি ও কাঁচা বাঁশের টুকরো ছিল। ফাটছে সেগুলো ফটাস্ ফটাস্ শব্দে পটকার মতন। লোকে চমকে উঠছে।

জল ঢালা হচ্ছে, বাঁশ দিয়ে পেটানো হচ্ছে জ্বলন্ত খড়ের স্তূপ। তবে যেমন দস্তুর, ভিড়ে আসল কাজের লোকের চেয়ে হাঁক ডাকের লোকই বেশি।

শিব দেখল, দেবু হাজির। দেবু হঠাৎ বলল শিবকে,— সাধুচরণকে তো দেখছি না। চ বোস বাড়ি।

পুবপাড়াতেই ক্ষমাপতি ঘোষ এবং নরহরি বাসের বাড়ি। যাবার সময় দেবুরা দেখল ঘোষবাড়ির সামনে বাড়ির মেয়েরা ভিড় করে রয়েছে। ক্ষমাপতিবাবু ছাড়া অন্য পুরুষদের দেখা নেই। তারা বোধহয় অকুস্থলে। ক্ষমাপতিবাবুকে দেখা গেল মেয়েদের পেছনে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে।

নরহরি বোসের বাড়িতেও ওই একই দৃশ্য। পরিবারের মেয়েরা কিছু সদর দরজায়, কেউ কেউ ছাদে। সবারই উৎসুক চোখ অগ্নিকাণ্ডের দিকে। নরহরিবাবুর দেখা মিলল না। বাড়ির অন্য পুরুষরাও নেই।

মিনিট দুই বোসবাড়ির কাছে অপেক্ষা করে দেবু বলল,— এখানে লাভ নেই। চল সাধুচরণের ঘরে। আগুন লাগার সুযোগে কিছু হাতিয়ে নিয়ে যদি ও ঘরে ফেরে ধরব।

সাধুচরণের কুটিরে আলো নেই। চারপাশ নিস্তব্ধ। দূর হতে ভেসে আসছে অগ্নিকাণ্ড ঘিরে বহুজনের কলরব। দেবু ও শিব ঘোষ বাগানের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে সাধুচরণের কুটিরের ওপর নজর রাখে। বেশি কাছে ঘেঁষতে ভরসা হয় না। সাধুর কুকুরের ভয়ে। তবেতাদের মনে

হল কুকুরটা সেখানে নেই। পাড়ার বেশির ভাগ সারমেয়ই গিয়ে জুটেছে দাস বাড়ির কাছে অমন উত্তেজনার খোরাক পেয়ে। তবে মানুষের চেয়ে তাদের আগুনে ভয় বেশি। তাই মানুষের দঙ্গলের পেছনে থেকে ডাকছে প্রাণপণে। আবার ফাঁকে ফাঁকে পরস্পরকে দাঁত খিঁচোচ্ছে এবং দু-এক রাউন্ড লড়াইও করে নিচ্ছে।

সহসা এক ছায়ামূর্তির আবির্ভাব ঘটে সাধুচরণের কুটিরের কাছে। সাধুর ঘরে মিটমিটে আলো দেখা যায়। নিঃশব্দে পায়ে পায়ে গিয়ে দেবুরা উঁকি মারে ঘরে, ভেজানো দরজায়, সামান্য একটু ফাঁক দিয়ে।

ঘরে একটা কুপি জ্বলছে। সাধুচরণ মেঝেতে উবু হয়ে বসে। তার সামনে দুটো বড় বড় পেটমোটা থলি মাটিতে শোয়ানো। হাঁপাচ্ছে সাধু। হয়তো ওই ভারী থলে দুটো বয়ে আনার পরিশ্রমে।

ক্যাচ্। ভালোমতো দেখার চেষ্টায় শিব দরজার কবাট একটু ঠেলতেই সামান্য শব্দ হয়। চকিতে ঘাড় ফেরায় সাধু দরজার পানে। বলে— 'কে?'

দেবু শিবের কনুইয়ে টান মেরে ইঙ্গিত করে হাট করে খুলে দেয় কবাট দুটো। দাঁড়ায় দরজা আগলে।

সাধুচরণ দুজনকে দেখে ভীষণ অবাক হয়ে বলে,— তোমরা এখানে? কী চাই?

দেবু সোজা থলে দুটোর পানে আঙুল দেখিয়ে প্রশ্ন করে,— ও দুটোয় কী আছে?

সাধুচরণের চোখ ধক্‌ধক্ করে ওঠে, চাপা গর্জন ছাড়ে,— বেরোও। বেরিয়ে যাও। ডেঁপোমি হচ্ছে। এক ফোঁটা ছোঁড়া।

দেবু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলল,— বেশ যাচ্ছি। তবে কোথায় যাব জান? পুলিশে।

পুলিশে কেন?— সাধুচরণের কণ্ঠে আর্ত উদ্বেগ ফোটে।

পুলিশ এসেই বের করুক কী চোরাই মাল আছে থলে দুটোয়।

— দেবু এক পা পেছোয়।

দাঁড়াও।—সাধুচরণের স্বর খাদে নামে। সে খানিক গুম মেরে থেকে বলল,— উত্তম। দেখ, কী আছে এতে? কী ধন দৌলত।

সাধুচরণ একটা থলির মুখ ফাঁক করে টেনে যা বের করল দেখে শিব ও দেবু থ। তারা নিজেদের চোখকেই বুঝি বিশ্বাস করতে পারে না।

একটা প্রকাণ্ড লাউ।

বিনা বাক্যব্যয়ে সাধু দ্বিতীয় থলি থেকেও বের করে আনে অনুরূপ আকারের এক বিশাল লাউ। তার বিদ্রূপমাখা দৃষ্টি ফেরে দেবুদের মুখে। নীরবে তাকিয়ে থাকে।

একী? লাউ! কাদের বাড়ির?—শিবের বিস্মিত প্রশ্ন।

একটা ক্ষমাপতিবাবুর। আর একটা নরহরি বোসমশায়ের বাড়ির।—সাধুর জবাব।

—এই জন্যে এত কাণ্ড! ঘোষমশাইয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র? যাঃ!

শিবকে থামিয়ে দেয় সাধুচরণ,—শুধু ঘোষমশাই নয় নরহরি বোসও আছেন এই ষড়ে। তাঁদের কথাতেই আমি একাজ করেছি। চুরি বিদ্যে ছেড়ে দিয়েছিলেম। নেহাতই ওঁনাদের একান্ত অনুরোধ ফেলতে পারলেম না।

একজন অপরজনের বাড়ির লাউ চুরি করিয়েছেন বুঝি তোমায় দিয়ে?— দেবুর জিজ্ঞাসা।

—মোটেই লয়। যে যা নিজের বাড়ির লাউ সরাবার অর্ডারই দিয়েছিলেন আমায়। দুই কর্তাই জানেন পুরো ব্যাপার। দু দিন বাদে এই লাউ দুটো যেত লাভপুরের কম্পিটিশনে।

সাধুদা, একটু খুলে বল প্লিজ। কিস্‌সু মাথায় ঢুকছে না।

—শিবের কাতর অনুরোধ।

সাধুচরণ সামলে নিয়েছে তার হতচকিত ভাব। সে বলল,— বসো বলছি সব। তা একখান রহস্যই বটে। সময় নাই। এখুনি মাল পাচার করতে হবে। অল্প কথায় বলি—

সাধুচরণ যা বলল শুনে দেবু ও শিব হতবাক।

গ্রামের সবাই জানে পুবপাড়ার ঘোষ ও বোস পরিবারের মধ্যে আদায় কাঁচকলা সম্পর্ক। যা জানে না তা হল, দুই বাড়ির দুই বৃদ্ধ কর্তারা এই ঝগড়াঝাটিতে মোটে সায় নেই। তাঁরা ছেলেদের নিরস্ত রতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। ছেলে বৌ বৌমাদের দাপটে নিরীহ ক্ষমাপতি ও নরহরি পরস্পরকে এড়িয়ে চলেন বাইরে। ভান দেখান যেন তরও বুঝি ক্ষুব্ধ। কিন্তু ফঁক পেলেই দুজনে কথাবার্তা বলেন গোপনে। দুঃখ করেন। নিভৃত দবার আড্ডাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দুই বৃদ্ধ মর্মাহত। অথচ পুরনো দিনগুলি ফিরে পাবার উপয় খুঁজে পান না। ঝগড়া কমরা লক্ষণ নেই। বরং লাভপুরে কদিন বাদে কৃষি প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে দুই বাড়ির মন কষাকষি আরওবাড়বে হয়তো।য

প্রতি বছর লাভপুরে কৃষি প্রদর্শনীতে নানান ফুল ফল ও তরকারি ফলনের প্রতিযোগিতা হয়। আশপাশের চাষীরা যোগ দেয় তাতে। সেরা ফুল ফল তরকারির জন্য দেওয়া হয় মানপত্র পদক অর্থপুরস্কার। এই প্রতিযোগিতায় ফাস্ট সেকেণ্ড হওয়া রীতিমত গৌরবের ব্যাপার। স্বয়ং কৃষিমন্ত্রী ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আসেন পুরস্কার বিতরণ করতে।

এবার নরহরি বোসের এক ছেলে যোগাড় করে আনে স্পেশাল জাতের লাউয়ের বীচি। তাই থেকে চারা জন্মায়। খবরটা চলে যায় ঘোষবাড়িতে ক্ষমাপতিবাবুর ছেলের কাছে। দুই বাড়িতেই দুপক্ষের চর আছে দুই বাগাল ছেলে। তারা নিয়মিত উৎকোচ পেয়ে থাকে দু বাড়ির গোপন খবর সরবরাহের বিনিময়ে। ব্যাস, স্পেশাল সেই লাউয়ের বীচি, চর মারফও চুরি হয়ে আসে ঘোষ-বাড়িতে। তাই থেকে চারা তৈরি হয় সেখানেও।

এদিকে বোসবাড়িতে খবর যায় ঘোষেরাও এবার কম্পিটিশনের জন্য লাউ ফলাচ্ছে। চারা তুলেছে। তবে সে চারার বীচি যে কোত্থেকে এসেছে, খবরটা ফাঁস হয়নি।

অমনি বোসবাড়ি খোঁজ রাখে ঘোষেরা লাউগাছে কী কী সার দিচ্ছে। খবর আসে ওরা নাকি স্পেশাল স্যর দেবে লাউয়ের সাইজ বাড়াতে। বোসবাড়ির চর ঘোষেদের লাউ গাছে দেওয়া স্পেশাল সারের ভোজের খবর পৌঁছে দিতে থাকে নরহরিবাবুর ছেলেদের।

স্পেশাল বীচি এবং স্পেশাল সার। ফলে দুই বাড়ির লাউ গাছই হয় দারুণ তেজী। লাউও ধরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড। কে কাকে দেখে? গোপনে মাপা হয়, কার লাউ বেশি বড়। লাউ গাছ পাহারা দেয় দুপক্ষই, পাছে অন্যে তাদের গাছের ক্ষতি করে বা চুরি করে সবচেয়ে বড় লাউটা।

লাউ নিয়ে এই নতুন বিবাদের সূত্রপাত থামাতে চেয়েছিলেন দুই কর্তা। যথারীতি ব্যর্থ হন। তবে এ ব্যাপারে যে দু পক্ষের ছেলেরাই অসৎ আচরণ করেছে, কর্তারা তা জানতে পারেন

মাত্র কদিন আগে। অর্থাৎ ক্ষমাপতি জানলেন যে তাঁর ছেলে চুরি করেছে ওদের স্পেশাল লাউয়ের বীচি এবং নরহদ্দিরর গোচরে এল যে তার ছেলেরা লুকিয়ে জানছে ওদের স্পেশাল সারের ফর্মুলা। দুই কর্তাই পরস্পরের কাছে পুত্রদের জন্য ক্ষমা চাইতে গিয়ে বুঝলেন দুপক্ষের ছেলেরাই সমান দোষী।

দুই কর্তাই বেজায় চটে গেলেন। বুঝিয়ে শুনিয়ে রাগ দেখিয়ে অবাধ্য গোঁয়ার ছেলেদের শায়েস্তা করার সাধ্য নেই তাঁদের। তাই তাঁরা অন্য পন্থা ধরলেন। দুজনে যুক্তি করে সাধুচরণকে ভার দিয়েছেন দুই গাছের সব চাইতে বড় দুটো লাউ হাপিজ করার। যে দুটো রাখা হয়েছে কম্পিটিশনে পাঠাবার উদ্দেশ্যে।

দুই পরিবারের মধ্যে আর ঝগড়া না করাই মঙ্গল। যেই ফার্স্ট হবে, অন্য পার্টি তাকে ফের জব্দ করার ধান্দায় থাকবে। ফলে গণ্ডগোল গড়াবে। তার চেয়ে কারুর বরাতেই ফার্স্ট প্রাইজ না জোটা ভাল।

দেবু শিব মুখ চাওয়া চাওয়ি করে মাথা নাড়ল। দেবু বলল, — নাঃ, থানা পুলিশে দরকার নেই। আমরা বলব না কাউকে এ ব্যাপার।

বেশ বেশ। এই হচ্ছে উচিত বিবেচনা। —সাধুচরণ হাঁপ ছাড়ে খুশিতে : আরে বাপু, আমি হচ্চি সাধুচরণ। এ লাইনে পাঁচজনা মান্যি করে আমায়। রিটায়ার করেচি। তবু যে একাজে হাত দিলেম দশের মঙ্গলের জন্যেই। টাকার লোভে নয়। বোসদের গুন্ডা মেজ ছেলেটা আর ঘোষ বাড়ির খেঁকি কুকুরটার পাহারা এড়িয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যে এই দুই পেল্লাই লাউ সরানো যার তার কম্ম নয়। এ শর্মা ভিন্ন এ তল্লাটে আর কে পারবে? কর্তারা অবশ্য পান খেতে দিয়েছেন সামান্য। লাউ পিছু কুড়ি টাকা নগদ। আর লাউ দুটো ফাউ। তা একরকম ফ্রি-তেই করে দিলেম বলতে পার।

তা বটে।—বলল শিব : আগুন কি তুমিই লাগিয়েছিলে?

— হ। একটা গোলমাল পাকালে মাল হাতাতে সুবিধে।

লাউ দুটো নিয়ে করবে কী? খাবে বুঝি?—শিবের জিজ্ঞাসা।

—বাপ্‌রে, এ দুটো দিয়ে তো গোটা গাঁয়ে ভোজ লাগানো যায়। এ বস্তু এখুনি পাচার করতে হবে নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।—বলেই সাধুচরণ দরজার কাছে গিয়ে একটা তীক্ষ্ণ শিস্ দিল।

একটু বাদেই ঘরে ঢুকল বছর কুড়ির এক ছোকরা। তার পাকানো শরীর। মিশকালো রং। এমন নিঃসাড়ে ঢুকল যে প্রথমে টেরই পায়নি দেবুরা।

সাধুচরণ দ্রুত বলে গেল ছেলেটাকে,— গুটে, চটপট লাউ দুটো কেটে ফেল। তারপর থলেতে ভরে নিয়ে যা। এক টুকরো আমার মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে দিবি কাল। বলবি আমার গাছের লাউ পাঠিয়েছি। দুটুকরো তোর বরাদ্দ। বাকি অংশগুলো ফেলে দিবি নদীর ধারে।

গুটে নীরবে একটা বড় ছুরি বের করে খচ্‌খচ্ করে লাউ দুটো টুকরো টুকরো করে ফেলল। তারপর খণ্ডগুলো একটা থলিতে ভরে কাঁধে ফেলে উঠে মিলিয়ে গেল বাইরে অন্ধকারে।

সাধুচরণ বলল,— এবার যাও তোমরা। আমিও বেরুব। দেখি কী ঘটছে?

—আচ্ছা সাধুদা, সেদিন সন্ধ্যায় কে এসেছিল তোমার কাছে? যেদিন তোমার কুকুরটা আমায় তাড়া করেছিল?— শিব কৌতূহল চাপতে পারে না।

— ও তুমি পিছু লেগেছিলে? আমি ভাবলেম বুঝি পেয়ারা চোর। উনি ছিলেন বোসমশাই।

তিনজনে বাইরে এল। তখনো পুবপাড়ায় হইচই চলছে। আগুনের আভাটা যদিও আর নেই। সহসা শিব ও দেবুর খেয়াল হল যে সাধুচরণ উধাও হয়েছে। দুই বন্ধু চলল দাসবাড়ির উদ্দেশে।

দেবুরা ক্ষমাপতিবাবুর বাড়ির সামনে এসে দেখে মস্ত জটলা। ঘোষবাড়ির সবাই ভীষণ উত্তেজিত। রান্নাঘরের চাল থেকে কম্পিটিশনের জন্য রাখা লাউখানা চুরি আবিষ্কার হয়ে গেছে।

এ নির্ঘাৎ বোসেদের কীর্তি। ক্ষমাপতিবাবুর ছেলে দলবল জুটিয়ে তড়পাতে তড়পাতে চলল নরহরি বোসের বাড়ির দিকে। কিন্তু মাঝপথে তাদের সঙ্গে মোলাকাত হল বোসবাড়ির লোকজনের। তারাও আবিষ্কার করেছে যে তাদের কম্পিটিশনের লাউ উধাও এবং ঘোষদের চোর ঠাউরে আসছে হুঙ্কার দিতে দিতে।

পুরো ব্যাপার শুনে দু পার্টিই হতভম্ব। দু দলই অন্যজনের বাড়ি গিয়ে যাচাই করে দেখে এল ঘটনাটা সত্যি কিনা।

এবার দুপক্ষই গিয়ে বসল ঘোষবাড়ির আঙিনায়। দু দলই সন্দেহ প্রকাশ করল যে এ নিশ্চয়ই মথুরাপুরের সাহাদের অপকর্ম। সাহারা লাউ ফলনে এক্সপার্ট। গত বছর সাহাদের লাউ ফার্স্ট হয়েছিল লাভপুরের প্রতিযোগিতায়। পাছে এবার হেরে যায় তাই এই চক্রান্ত। ফুলডাঙা গ্রামের পুবপাড়ার ঘোষ ও বোসদের সঙ্গে মথুরাপুরের সাহাদের অনেক কালের রেষারেষি।

দুঃখের বিষয়, কম্পিটিশনে নামাবার মতো বড় লাউ আর আপাতত: নেই ঘোষ বা বোসবাড়ির গাছে। এই দুটি লাউয়ের আকার যাতে খুব বাড়ে তাই কাছাকাছি আকারের বড় লাউগুলি কেটে ফেলা হয়েছে প্রথামাফিক। এখন উপায়? সাহাদের লাউকে টেক্কা দেওয়ার মতন লাউ যে নেই ফুলডাঙার কারও গাছে। ঘোষ এবং বোসবাড়ির সঙ্গে যোগ দিয়ে গোটা গাঁয়ের লোক শ্রাদ্ধ করতে লাগল মথুরাপুরের সাহাদের।

ক্ষমাপতি ও নরহরিও ছিলেন জমায়েতে। পাশাপাশি তক্তপোশে বসে চুপচাপ শুনছিলেন সব। মাঝে মাঝে ঘাড় নাড়ছিলেন। অনেক চেঁচামেচির পর উত্তেজিত লোকগুলির কণ্ঠ কিঞ্চিৎ শ্রান্ত হতে ক্ষমাপতি মৃদু গম্ভীর গলায় বললেন,— নরহরি এবার তোমাদের ফুলকপি কেমন হয়েছে? কম্পিটিশনে দেওয়া যাবে?

হুঁ, তা ভালই হয়েছে। প্রাইজ পাবার মতনই। —জানালেন নরহরি।

—আমাদের বাঁধাকপির সাইজও হয়েছে খাসা। তা এবার তোমরা যদি ফুলকপি দাও, আর আমরা বাঁধাকপি পাঠাই কম্পিটিশনে? এ তল্লাটে এমন কপি আর কেউ ফলায় বলে তো জানি না। ফুলডাঙার কিছুটা প্রেস্টিজ বাঁচে। আগের বারও তো আমাদের বাঁধা আর তোমাদের ফুল ফার্স্ট প্রাইজ মেরেছিল। আসচেবার ফের লাউ নিয়ে ট্রাই করব। হয় তোমরা, না হয় আমরা, কেউ না কেউ ফুলডাঙার মুখ রক্ষা করব ঠিক। খুব জোরদার পাহারা বসাতে হবে। কী বল?

উচিত কথাই বলেচ।—নরহরি সায় দিলেন ক্ষমাপতির প্রস্তাবে। সঙ্গে সঙ্গে হইচই করে

সমর্থন জানাল গোটা জমায়েত। চা সহযোগে আর এক প্রস্থ মথুরাপুরের মুণ্ডপাত করে সভা ভঙ্গ হল গভীর রাতে।

দেবু শিবও উঠল তখন।

এবার আমাদের গোয়েন্দাগিরি সত্যি সাকসেস্‌ফুল।—যেতে যেতে শিবের গর্বভরে ঘোষণা।

হুঁ। তবে ভাই ফিজ মিলল না। অবিশ্যি দুই কর্তার থেকে কিছু আদায় করা যেত।— দেবু মিচকে হেসে বলে।

যাকগে।—শিবের আপসোস নেই।

এবার কিন্তু কদিন আমাদের ডিটেকটিভগিরিতে রেস্ট। পরীক্ষা আসছে। বড্ড সময় যায়।— দেবুর মন্তব্য।

তা বটে।—সায় দিল শিব।

[১৯৮৮, কিশোর ভারতী শারদীয়া]

যাত্রা বিভ্রাট

এক

শিবের মুখ দেখেই দেবু বুঝল যে গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে। দুপুর বেলা। ছুটির দিন। দোতলার চিলে কোঠায় নির্জনে একা তক্তপোশে শুয়ে গল্পের বই পড়ছিল দেবু। শিব নিঃশব্দে ঢুকল। বসল খাটের কোণায়। চুপচাপ। মুখ থমথমে। দেবু আড় চোখে দেখে নেয়। প্রতীক্ষায় থাকে। কখন শিব নিজেকে খোলসা করবে। ওই হাবভাব তার চেনা।

গল্প শুরুর আগে, দেবু ও শিবদের পরিচয়টা সামান্য দিয়ে রাখি। ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে চন্দনা গ্রাম। এই গ্রামেই বাস করে শিব আর দেবু। দু'জনেই সবে কলেজে উঠেছে। পরম বন্ধু দু'জনে। শিব দত্ত হাতে পায়ে ডানপিটে। নামকরা খেলোয়াড়। পড়াশুনায় মাঝারি। দেবু মজুমদার দারুণ ছাত্র। তবে নিরীহ গোবেচারি নয় মোটেই। যদিও বাইরে তাকে লোকে জানে ভারি ভালো মানুষ টাইপ। ওর দুষ্টুমির খবর রাখে শিবের মতন ঘনিষ্ঠ কয়েকজন মাত্র। বিপাকে পড়লেই শিব আসে দেবুর বুদ্ধি নিতে।

কয়েকদিন শিবের দেখা মেলেনি। ও এখন গ্রামের একমাত্র ক্লাব চন্দনা স্পোর্টিংয়ের যাত্রা নিয়ে ব্যস্ত। এ ব্যাপারে ওর মহা উৎসাহ। নিজে ছোটখাটো পার্ট করে। তবে খাটাখাটনি করে প্রচুর। প্রতি বছর চন্দনায় যাত্রা হয় লক্ষ্মীপূজা আর কালীপূজার মাঝে কোনো এক রাতে। এখনো মাস দুই বাকি। তবে রিহার্সাল শুরু হয়ে গেছে। দেবু অবশ্য যাত্রায় জড়ায় না নিজেকে। তবে দেখতে ভালোবাসে। রিহার্সালও দেখে মাঝে মাঝে। এবার হচ্ছে — 'কুরু পাণ্ডব'।

— কী পড়ছিস? — বিরক্ত স্বরে জানতে চায় শিব।

দুর্দান্ত একটা ডিটেকটিভ। — দেবু বই থেকে চোখ সরায় না।

রাখ তো! — ধমকায় শিব : এদিকে কী হচ্ছে খবর রাখিস?

কী ব্যাপার? — এবার দেবু বই মুড়ে উঠে বসে।

ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে শিব — এবার ক্লাবের যাত্রাটা বোধহয় ভণ্ডুল হবে।

— কেন?

— কেন আবার। ওই ঢোলকপতির জন্যে।

— ঢোলকপতি! ও — মানে গোলকপতি সাহা। দক্ষিণপাড়ার?

— হ্যাঁ। ওই লোকটা ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছে। আমাদের অ্যাদ্দিনের যাত্রা। মিলেমিশে করতাম সবাই। লোকটা আচ্ছা বদ।

— ঝগড়া? ক্লাবে! কীরকম?

— শিব বলল, — ঢোলকপতির কী মতলব জানিস। ও এবার আমাদের যাত্রার ডিরেকটর হতে চায়। সেক্রেটারি বেচুটা আর ক্লাবের অন্য বড়রা তাতে রাজি হয়নি। তাই রেগে গিয়ে ও আর একটা যাত্রা করাচ্ছে। গাঁয়ের অনেক লোককে ভাঙিয়ে নিচ্ছে লোভ দেখিয়ে।

গোলকপতি সাহা হবে ডিরেক্টর! — ভুরু কুঁচকে বলে দেবু : উনি কি আগে তেমন অভিনয়-টভিনয় করেছেন? কিংবা পরিচালনা?

আরে ধুস! উনি নির্দেশনা বা অভিনয়ের কচু জানেন। — শিব উত্তেজিত।

— তাহলে হঠাৎ এই শখ?

— চালিয়াতি। হঠাৎ পয়সা হয়েছে যে। প্রথমে খুব উৎসাহ দেখিয়েছিলেন যাত্রার ব্যাপারে। যাত্রা কমিটির মেম্বার করা হয়েছিল ওকে। মোটা টাকা চাঁদা দেবেন বলেছিলেন যাত্রার খরচ সামলাতে। কিছু দিন পরেই টের পাওয়া গেল যে শুধু মেম্বার হয়ে থাকাটা উদ্দেশ্য নয়। উনি চান সর্দারি। উড়ে এসে জুড়ে বসার মতলব।

শিবু রাগে গরগর করতে করতে বলে যায়, — জানিস আমার ছোটকাকা বলেছে যে, ওই গোলকপতি কাকার সঙ্গে পড়ত ইস্কুলে সব বিষয়ে অঘা ছিল। ক্লাস নাইনে দুবার ফেল্ করার পর ওকে ওর মামারবাড়ি বর্ধমানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মামার কাছে ঠিকেদারি কাজ শিখতে। ইদানীং ঠিকেদারি করে বেশ পয়সা করেছেন। গাঁয়ে তো আসেনি বহুকাল। এলেও দু-এক বছর বাদে বাদে বড়জোর দু-একদিনের জন্যে। এবার এসে বাড়িঘর সারাচ্ছেন। নাকি মাঝে মাঝে এসে থাকবেন। আসলে গাঁয়ে একটু মাতব্বরি করতে চায় পয়সার জোরে।

তা ওঁনাকে একটা পার্ট দিলেই তো হত। — বলল দেবু।

— তাই দিতে চেয়েছিল বেচুদা। নকুল বা সহদেব। অথবা পাণ্ডুরাজার রোল। তা নেবেন না। চাই আরও বড় পার্ট। বেচুদা রাজি হয়নি। ওই তো চেহারা। ঢোলকমার্কা ফিগার। ভুঁড়িওলা। বেঁটে ঢোলক কি সাধে বলে। আবার ফ্যাসফ্যাসে গলা। উনি যে সেটা বোঝেন না তা নয়। তাই এই নিয়ে আর চাপাচাপি করেননি। মাঝে মাঝে শুধু ফুট কাটতেন।

— এ জায়গাটা ঠিক হচ্ছে না। এ জায়গাটা অন্য ভাবে করে গন্ধর্ব অপেরা। উঃ কী জমে সিনটা! ক্লাবের বড়রা কেউ পাত্তা দিত না ওর কথায়। তখন রিহার্সালে আসা বন্ধ করলেন। ওর এক চামচাকে দিয়ে বলে পাঠালেন যে এবার ওকে ডিরেকশনের স্কোপ দেওয়া হোক। একটা নতুন দারুণ জিনিস করে দেখাবেন। কীসব একঘেয়ে মান্ধাতা আমলের অ্যাকটিং চালাচ্ছেন — এইসব।

বেচুদা সাফ জানিয়ে দিয়েছে মিত্তিরমশাই আমাদের পুরনো ডিরেকটর। পাঁচ গাঁয়ে ওঁর সুনাম আছে। ওঁর ডিরেকশনেই চন্দনা স্পোর্টিং দু'বার লাভপুরে যাত্রা কম্পিটিশনে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে। ওঁকে বাদ দিতে পারব না। গোলকপতি বরং থাকুক প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে।

তাতে রাজি নয় গোলকপতি। জানিয়ে দিয়েছে যে চন্দনা স্পোর্টিংয়ের যাত্রা ফান্ডে চাঁদা দেবেন না। এবং উনি এবার আলাদা যাত্রা করাবেন।

গোলকবাবু কেমন ডিরেকশন দেন? — দেবু জানতে চায়।

হোপলেস্! — শিব গর্জায়; একটু-আধটু যা দেখিয়েছেন তাতেই মাল ক্যাচ। কোনো সেন্স নেই অভিনয়ের। ভীম অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ সব করলেন এক ধাঁচে। সবাই যেন সর্বদা দাঁত খিঁচুচ্ছে আর লড়াইয়ের পাঁয়তারা কষছে।

— উনি কি নির্দেশনা দিয়েছেন আগে কোথাও?

— বললেন তো দিয়েছেন। বর্ধমানে একটা থিয়েটার করিয়েছিলেন। নাকি দুর্দান্ত হয়েছিল। মনে হয় ডাহা গুল। অমন ডিরেকশনে নির্ঘাৎ ঢিল খাবে পাবলিকের। তবে যাত্রা হয়তো দেখেছে অনেকে। কলকাতার বড় বড় পার্টির। তাদের নিয়ে খুব লম্বা-চওড়া বুকনি ঝাড়েন। তা দেখা আর নিজে করানো কি এক জিনিস?

দেবু শিশি থেকে হজমিগুলি বের করে একটা নিজের মুখে ফেলে আর একটা শিবুকে দিয়ে বলল, — ক্রেডিট নেওয়ার ইচ্ছে হয়েছে? বরং এক কাজ কর ভুজুং ভাজং দিয়ে কলকাতা থেকে একটা নামকরা যাত্রা পার্টি আনা ওর পয়সায়। আমরা দেখতে পাব। ওরও নাম হবে।

শিব বলল, — আরে আমরাও তো প্রথমে তাই ভেবেছিলুম। বুঝি আমাদের ডাউন করতে কোনো নামকরা প্রফেশনাল দল আনাবেন। কিন্তু সে গুড়ে বালি। একেবারে স্বয়ং নির্দেশক হওয়ার বাসনা। আর শুনছি পার্টও করবেন। বড় পার্ট।

দল ভাঙাবার কথা কি বলছিলি?—দেবু জানতে চায়।

— হ্যাঁ, কিছু গিয়ে জুটেছে ওর সাথে। যারা আমাদের পালায় বড় পার্ট পায় না। মানে শখ আছে কিন্তু সাধ্যি নেই।

— কে কে?

— এই যেমন হরলাল গড়াই। জগাইদা। টেকো দত্ত। লম্বু খোকা — এমনি কিছু। আরও খসবে মনে হয়। মিউজিক পার্টির দু একজনও ভাগবে টাকার লোভে।

— গোলকপতি কী পালা করাবে শুনেছিস?

— মহা শয়তান। আমরা তো ধরেছি কুরু-পাণ্ডব? নাকি ঢোলকপতি ওই পালাটাই নিজেই কিছুটা চেঞ্জ করে 'কুরুক্ষেত্রে' নাম দিয়ে করাবে বলেছে। অর্থাৎ একই ফিল্ডে চ্যালেঞ্জ। আর ওর দলের নাম দিয়েছে — নিউ চন্দনা ড্রামাটিক ক্লাব।

দেবু চোখ ছোট করে বলে — বটে! নিউ চন্দনা! আচ্ছা হরলালদা কেন ও দলে ভিড়ল? বুঝি ভীমের পার্ট পাবে?

— হ্যাঁ ঠিক তাই। ঢোলকপতি ওকে তাই আশ্বাস দিয়েছেন। আমাদের ক্লাবে তো ভীম জুটছিল না। অথচ চেহারাখানা রয়েছে মোষের মতন। বাজখাঁই গলা। বেচুদা আগেরবার নগেনদাকে দিয়ে ভীম করাল। তাই চটে আছে। অনেককে বলেওছিল হরলালদা — নগেনকে কি ভীম মানায়? বেচুর পার্শিয়ালিটি। এক ক্লাসে পড়ত যে।

দেবু হেসে ফেলে — কেন সেবার তো ওকেই প্রথমে ভীম দেওয়া হয়েছিল। রিহার্সেলেই কেঁচিয়ে দিল। অর্ধেক উচ্চারণ আটকে যায়। মনে আছে। কিছুতেই আর "চতুর" বলতে পারল না। মোশান এলেই বেরিয়ে যায় — "সচতুর দুর্যোধন"। তারপরই জিব কাটে। শেষে ওকে ঘটোৎকচ দেওয়া হল। তাও ডায়ালগ কত কমিয়ে।

শিবও হাসে — মনে আছেরে। অনেক বছর আগে। কী জানি পালা হয়েছিল। আমরা তখন ছোট। হরলালদা তখনো এত মোটা হয়নি। কজ্জল সেজেছিল। শ্বেতকেতু যেই বলেছে — কী জন্য এসেছে হেথায়? কজ্জল বলল — মনে ছিল আশা। রচিব কুটির এক ব্যতসী লতায়। নর্দমার তীরে। "নর্মদা আর বেরুল না। আমরা হেসে কুটিপাটি। সিন মার্ডার। মিত্তির মশাই অমন ঠান্ডা মানুষ। তিনি অবধি খেপে গিয়েছিলেন সেদিন।

দেবু নিশ্চিন্তভাবে বলল — হ্যাঁ : ওই ডিরেকশন। আর ওই সব ছিরির অ্যাকটর। পালা যা হবে বুঝছি। তোরা ঘাবড়াসনি। মাঝে মাঝে আমায় রিপোর্ট করে যাস, ওরা কী কচ্চে।

দুই

শিব ফের দেবুর কাছে এল দিন পাঁচেক বাদে। গরগর করছে রাগে, — তুই তো নিশ্চিন্ত। ওদিকে ঢোলক কি শুরু করেছে জানিস? এবার চন্দনা স্পোর্টিংয়ের যাত্রা নির্ঘাৎ ডাউন হবে। সবাই যাবে নিউ চন্দনার পালা দেখতে।

আহা হয়েছেটা কী ? — দেবু ঠান্ডা করে।

— প্রচুর পয়সা খরচ করছে ঢোলক সা। ভাড়া করবে ফাস-ক্লাস ড্রেস। বাইরের কিছু আর্টিস্টও ভাড়া করে আনবে। সব টপ আর্টিস্ট।

— কাদের ভাড়া করছে খবর পেলি?

— এখনও সব খবর পাইনি। তবে শুনছি, বিবেক আনবে গানে। জনা দুই আসল ফিমেল আর্টিস্ট। আমাদের মতো শুধু মেল — ফিমেল দিয়ে কাজ চালাবে না। এছাড়া ভালো পুরুষ অভিনেতাও আনবে। আর মিউজিক পার্টি হায়ার করছে মথুরাপুর থেকে। দুর্ধর্ষ একজন ফ্লুট আনাচ্ছে বাইরে থেকে। বোলপুরের তানসেন আলি।

— তুই এসব খবর পেলি কোত্থেকে?

— রামুর থেকে। রিহার্সালে ওদের চা সাপ্লাই করে। রামু আমার চেলা। অনেক ফল চুরির অভিযানে আমার সঙ্গে গেছে। ওর বাবার চায়ের দোকান। সেখান থেকে চা নিয়ে আসে রামু। ঘনঘন। তখন যতটা পারে শোনে। ওই লুকিয়ে বলে যাচ্ছে আমায়। তবে ও তো বেশিক্ষণ থাকে না রিহার্সালে। দোকানে ফিরতে হয়।

গোলক সা কী পার্ট নিয়েছেন? ডিরেকশন কি উনিই দিচ্ছেন? — জিজ্ঞেস করে দেবু।

শিব বলল, — সেদিকে মহা ঘুঘু। পার্ট নিয়েছেন যুধিষ্ঠিরের। আহামরি অভিনয় দরকার নেই। কোনোরকমে চালিয়ে দিলেই হল। তবে ইম্পর্টেন্ট ফিগার। আর নির্দেশনার জন্য ডেকে এনেছেন মথুরাপুরের অনঙ্গ ঘোষকে। মোটা টাকার চুক্তিতে। রোজ সন্ধেবেলা আসছেন। মথুরাপুর তো কাছেই। পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে লোক দিয়ে। তবে রামু বলছিল, নির্দেশক হিসেবে নাকি নাম থাকবে গোলকপতি সাহারই। অনঙ্গবাবু — সহনির্দেশক! অর্থাৎ ঢোলকপতির মানটা বাঁচবে। কাজও উদ্ধার হবে।

— অনঙ্গ ঘোষ রাজি হয়েছেন এই শর্তে?

— হয়েছেন। তাই তো শুনলাম। টাকার লোভে।

হুম্। গরিব শিল্পীকে ভাঙিয়ে এমনি কত বড়লোক যে নাম কেনে।

— রাগে থমথম করে দেবুর মুখ। বলে : পড়াশুনাতেও এমনই জোচ্চুরি চলে। জানিস তো আমরা স্কুলে যে ইতিহাসের বইটা পড়তাম, ওটা আদতে ওই বিখ্যাত প্রফেসরের লেখা নয়। তাঁর এক ছাত্র, খুব মেধাবী গরিব ছাত্র, সেই লিখে দিয়েছে, টাকার প্রয়োজনে। আর বাজারে চলছে ওই প্রফেসরের নামে। আমি খুব ভালো জায়গা থেকে শুনেছি কেসটা। টাকার জোরে কত অন্যায়ই না হয়।

দেবু খানিক গুম্ মেরে থেকে বলল — ওরা পালার ডেট্ ঠিক করে ফেলেছে?

শিব বলল — সেটা নাকি এখনও ঠিক হয়নি।

— তোদের রিহার্সাল চলছে?

— চলছে। তবে সবাই বেশ দমে গেছে।

— রিহার্সাল শেষ হয় কখন?

— সে তো রাত আটটা বেজে যায়। আমি অবশ্য অতক্ষণ থাকি না। আগেই চলে যাই বাড়ি। নইলে পড়ার ক্ষতি হবে। বাবার হুকুম। তবে শেষ কটা দিন ছাড় পাব।

হুম্। — দেবু কিছু ভেবে নিয়ে শিবের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল : ঘাবড়াসনি। দেখবি শেষে ওদের খিচিমিচি লেগে যাবে। ভালো গান, ভালো অভিনেতা আনলেও তাদের সঙ্গে লোকালদের মিশ খাবে না। বাইরের আর্টিস্টরা তো বড়জোর দু-একদিন এসে রিহার্সাল দেবে।

তবু নামে কাটে। বলল শিব।

— তা খানিক কাটে — তবে গোটা পালা অখাদ্য হলে কি আর দেখবে লোকে? অন্তত পাতে দেওয়ার মতো হতে হয়। হ্যাঁরে, হরলালদা কি ভীম করছে নিউ চন্দনায়?

— হ্যাঁ করছে ভীম। শুনলাম যে ওর ডায়ালগ প্রায় একদম ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। শুধু গদা আস্ফালন। আর থেকে থেকে যুদ্ধ।

মুচকি হেসে দেবু বলল — ঠিক আছে এখন যা। বেশি মাথা গরম করিসনি। খবরাখবর দিবি। আমাদের এতকালের ক্লাবকে ডাউন করা অত সহজ নয়।

তিন দিন বাদে শিব এসে ফেটে পড়ল দেবুর কাছে।

— ঢোলক সাহাটা একটা শয়তান। জানিস কী ঠিক করেছে। চন্দনা স্পোর্টিং যেদিন পালা করবে নিউ চন্দনাও সেদিন ডেট্ ফেলবে। মতলব, লোকে আমাদের পালা দেখবে না। সবাই নিউ চন্দনারটা দেখতে যাবে। ওকে আমি দেখাচ্ছি মজা।

দেবু জানে যে শিব রেগে গেলে ভয়ংকর। সে শঙ্কিত ভাবে জিজ্ঞেস করে — কেন কী করবি?

— সেটা এখনও ঠিক করিনি। তবে ছাড়ব না। ওদের পালা ভন্ডুল করবই। হয় ওদের প্যান্ডেলে আগুন লাগাব। নয় ওদের দর্শকদের মাঝে জ্যান্ত সাপ ছেড়ে দেব। কিংবা ঘোষদের খ্যাপা ষাঁড়টাকে এনে ঢুকিয়ে দেব ওদের আসরে। কিংবা —

বাপরে। চমকায় দেবু। এগুলোও সত্যি সত্যিই করে বসতে পারে। তাহলে থানা পুলিশ হয়ে যাবে ধরা পড়লে।

দেব ঠান্ডা করে — আরে দেখ না। শেষ পর্যন্ত কী হয়? যদি একই দিনে করে তাতেই বা কী? উল্টোটাও তো হতে পারে।

— উল্টো মানে?

মানে সেদিন ওরাই মোটে দর্শক পেল না। সব চলে এল তোদের পালা দেখতে। ওদের প্যাঁচে ওরাই কাবু। — দেবু মিটিমিটি হাসে। শিবের কথা শুনতে শুনতে একটা মতলব চকিতে তার মাথায় খেলে গেছে। কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে দেবু বলল : বেচুদা কী ভাবছে ডেট্ নিয়ে?

— বেচুদা খুব মুশকিলে পড়ে গেছে। অনেক জায়গায় বায়না দেওয়া হয়ে গেছে দিন জানিয়ে। তার চেয়েও বড় কথা দিন চেঞ্জ করতে প্রেস্টিজে লাগছে।

— ওরা বাইরের আর্টিস্ট কাকে কাকে আনছে খবর পেলি?

এখনও পাইনি। — বলেই সে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল : দেখ দেবু। ভুতোকে সাবধান করে দিস। ও যেন আমার সামনে না পড়ে।

কেন? ভুতো কী করল? — দেবু অবাক। ভুতো ওরফে ভূতনাথ ওদের বন্ধু। একই ক্লাসে পড়ে। এই গ্রামেরই ছেলে।

শিব বলল — ভুতোটা বিশ্বাসঘাতক। ও ঢোলকপতির ক্যাম্পে জয়েন করেছে। দু-দিন ধরে ওখানে যাচ্ছে।

— কেন হঠাৎ?

— নির্ঘাৎ বড় পার্টের লোভে। একবার নাকি বেচুদার কাছে গাঁইগুঁই করেছিল দিন দুই আগে — বড় পার্ট কি আমার ভাগ্যে জুটবে না কোনোদিন? বেচুদা অবশ্য ওকে একদম নিরাশ করেনি। বলেছিল যে এবার তো সব পার্ট বুকড্ হয়ে গেছে। আমি তো ভাবলাম তোকে বেশি বড় রোল দিলে নিবি না। এই যেমন শিব। গোটা সন্ধেটা নষ্ট করতে চায় না। লেখাপড়া আছে। তাই খুব ছোট পার্ট নেয়। আচ্ছা, দেখি চেষ্টা করে। তা ও বেটার আর তর সইল না। পরদিনই শত্রুপক্ষে ভিড়ল। ওকে সামনে পেলে আমি দু'ঘা কষিয়ে দেব বলে রাখচি।

— ভুতো কি নিউ চন্দনায় বড় রোল পেয়েছে?

— পেয়েছে। তবে এমন কিছু প্রোমোশন নয়। এখানে ছিল সাধারণ সৈনিক। ওখানে হচ্ছে সেনাপতি। তবে কেউকেটা গোছের কেউ নয়। নেহাতই ছোট মাপের। নামটি কী ভুলে গেছি। ওই ভুতোই নাকি প্ল্যানটা গোলক সাহাকে দিয়েছে, চন্দনার সঙ্গে একই দিনে পালা করতে।

দেবু চিন্তিত ভাবে চুপ করে থাকে। তারপর বলে — দেখ্, ওরা যদি বাইরের থেকে ভালো ভালো লোক আনায়, আমাদেরও কয়েকজনকে আনাতে হবে। নইলে টক্কর দেওয়া যাবে না। এই নিয়ে আমি বেচুদার সঙ্গে কথা বলব।

তিন

নিউ চন্দনা যে কাকে ভাড়া করে আনছে তা কয়েকদিনের মধ্যেই রটে গেল। গোলকপতি এবং তার সঙ্গীসাথীরা গর্বভরেই বলে বেড়ালেন নামগুলো।

বিবেক হচ্ছে কীর্ণাহারের সুধাকণ্ঠ গুরুদাস হাজরা। এই তল্লাটের সেরা গলা। ওঁর গানে শ্রোতা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। যেমন চড়ায় ওঠে, তেমনি খাদে নামে গলা। ভরাট নিটোল স্বর।

দ্রৌপদী করবেন, মিস মন্দাকিনী (TV)। একবার তিনি টি.ভি.তে কী একটা অভিনয় করেছেন। এছাড়া আসবেন ছায়ারানি (বেতার)।

নটসূর্য নবকুমার আসছেন কাটোয়া থেকে। ইনি রীতিমতো খ্যাতনামা এক বছর কলকাতার নামী দলে অভিনয় করেছেন। এছাড়া ফুলুটে আসছেন ওস্তাদ তানসেন আলি। বোলপুর থেকে।

বাকিরা অবশ্য তেমন নামী কেউ নয়।

নামগুলো প্রচার হতে হৈচৈ পড়ে গেল।

চন্দনা স্পোর্টিংয়ের কর্মকর্তারাও ছোটাছুটি শুরু করলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই জানা গেল, তাদের বাইরে থেকে ভাড়া করা নামী শিল্পীদের খবর। নামগুলো প্যামফ্লেটে ছাপিয়ে বিলি করে ফেললে চন্দনা স্পোর্টিং।

চন্দনা বিবেক হিসেবে আনছে নানুরের নিতাই সাধুখাঁকে। যিনি উপাধি পেয়েছেন সুরসাগর। গুরুদাসের দরের না হলেও সাধুখাঁমশাই বড় কম যান না।

আর একটা নাম দেখা গেল — যাত্রা সম্রাজ্ঞী বীণা গুপ্তা। ইনি কোন চরিত্রে অভিনয় করবেন তার উল্লেখ নেই।

ক্ল্যারিওনেট বাজাবেন। কেতু গ্রামের সুখ্যাত তারক মাল। নির্দেশনায় : শ্রীকেষ্ট মিত্র (কলাভারতী)। মিত্তিরমশাই যে এককালে কোনো এক নাট্যগোষ্ঠী কর্তৃক এই উপাধিটি পেয়েছিলেন তা গ্রামের বেশির ভাগ লোক কেন, তাঁর নিজের আত্মীয়রাই ভুলে গেছিল।

চন্দনা স্পোর্টিংয়ের স্থানীয় শিল্পীরা অবশ্য অনেকেই বেশ উঁচু দরের। মেল-ফিমেল বিবেকরানি ওরফে শ্রীযুক্ত বিবেক দাস। নগেন সরকার। এদের কি সোজা নামডাক।

শুধু চন্দনা নয় আশেপাশের গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ল উত্তেজনা। কার পালা ভালো হবে? চন্দনা না নিউ-চন্দনা? তবে একটা অসুবিধা দেখা দেয়। দুটো পালাই হচ্ছে একই দিনে। কালীপুজার দু'দিন আগে। চন্দনার পালা শুরু হচ্ছে রাত ন'টায়। আর নিউ-চন্দনার রাত আটটায়। ইচ্ছে করেই গোলকপতি একঘণ্টা আগে শুরু করছেন। যাতে বেশিরভাগ দর্শক তাদের আসরে টেনে নিতে পারেন। নিউ চন্দনার আসরে একবার জমে গেলে আর দর্শক উঠবে চন্দনা স্পোর্টিং কেমন করছে দেখতে? এছাড়াও কিছু প্যাঁচ খেলতে থাকে গোলকপতির ঠিকেদারি মগজে।

শিব একদিন দেবুকে জানিয়ে গেল মহা খাপ্পা হয়ে, — দেখ ভুতো কিন্তু বাড়াবাড়ি করছে। দিনভোর ওদের জন্য ছুটোছুটি করছে। দাঁড়া ওকে একদিন পাই সুবিধেমতো।

দেবু বলল — তা একটু কড়কে দিতে চাস দে। বেশি বাড়াবাড়ি করছে বটে। তবে যা করবি মুখে। গায়ে হাত তুলবিনে। ওতে তোদের বদনাম হবে। বলা যায় না থানা পুলিশও হয়ে যেতে পারে। গোলকপতি ঘোড়েল লোক। ওদের রিহার্সাল কেমন চলছে জানিস?

শিব ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল — হুঁ! যা ছিরির রিহার্সাল চলছে। নিজে দেখেই আয় না। রামু বলছিল যে অনঙ্গ ঘোষ নাকি প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছেন। বড়জোর দু একটা পার্ট উতরে যাবে। ওই বাইরের আর্টিস্টরাই যা ভরসা। গোলকপতি নাকি রিহার্সাল জমাতে প্রত্যেকদিন খুব টিফিন খাওয়াচ্ছে। আর ঘন ঘন চা। এমনকী রিহার্সাল দেখতে গেলে তাদেরও খাওয়ায়।

অ্যাঁ তাই নাকি? — দেবু উৎফুল্ল : তবে তো দেখতে যেতে হচ্ছে ওদের রিহার্সাল।

শিব কটমটিয়ে তাকাতে দেবু হেসে বলল — আহা চটছিস কেন? সব সরেজমিনে তদন্ত করা দরকার। নইলে কেস বুঝব কী করে? আমি দুদলেরই রিহার্সাল দেখব।

দু'দিন বাদে দেবু গুটিগুটি গিয়ে গোলকপতির বাড়ির বৈঠকখানায় নিউ চন্দনার রিহার্সালে হাজির হল। বসল এক কোণে।

দেবুকে দেখে হরলাল গিয়ে তাকে ঠাট্টার সুরে বলল, — কী ব্যাপার হে। তুমি এখানে?

দেবু হেসে বলল — আমি রিহার্সাল দেখতে ভালোবাসি। চন্দনার রিহার্সাল একদিন দেখেছি। আপনাদেরটাও দেখতে ইচ্ছে হল। কেন আপত্তি আছে?

না না আপত্তির কী? — হরলাল কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত : ভাবছি যে তোমার প্রিয় বন্ধু শিব না চটে যায়?

দেবু গম্ভীর ভাবে বলল — এতে শিবের চটার কোনো মানে হয় না।

— বেশ বেশ। দেখ দেখ।

এরপর থেকে দেবু মাঝে মাঝে, কোনও দিন চন্দনা স্পোর্টিংয়ের আবার কোনওদিন নিউ চন্দনার রিহার্সালে হাজির হতে লাগল। তবে ঘণ্টা খানেকের বেশি থাকত না কোথাও। চুপচাপ বসে থাকত দু'জায়গাতেই।

দেবু এই অঞ্চলের সেরা ছাত্র। ভালো বাড়ির ছেলে। সবাই ওর মতামতের মূল্য দেয়। নিউ চন্দনার নির্দেশক অনঙ্গবাবু দেবুকে বিলক্ষণ চিনতেন। একদিন তিনি দেবুকে একান্তে জিজ্ঞেস করলেন,

— দেবু কেমন বুঝছ?

কেন ভালোই তো হচ্ছে। — দেবুর সংক্ষিপ্ত জবাব।

— মানে, চন্দনার চেয়ে ভালো না খারাপ?

— প্রায় একই স্ট্যান্ডার্ড। তবে ওদের দু একটা পার্ট বেটার হচ্ছে। অবশ্য আপনারা তো বাইরে থেকে কয়েকজন ভালো আর্টিস্ট আনাচ্ছেন শুনেছি!

— তা আনাচ্ছি। তবে এদের সঙ্গে তারা কেমন খাপ খাবে বুঝচি না।

— তারা রিহার্সালে আসবেন।

— নবকুমার, বিবেক গুরুদাস, মন্দাকিনী, ছায়ারানি বলেছে যে রিহার্সালে আসতে পারবে না। তাদের সময় নেই। তবে অন্য হায়াররা কয়েকদিন রিহার্সালে আসবে বলেছে।

একই ধরনের প্রশ্ন বেচুদাও করেছিল দেবুকে চন্দনা স্পোর্টিংয়ের রিহার্সালে — কেমন হচ্ছে আমাদের? ওদের চেয়ে ভালো না খারাপ?

দেবু ভাসা ভাসা উত্তর দিয়ে এড়িয়ে গেছে।

অবশ্য রিহার্সাল নিয়ে গোলকপতির বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই। তার ধারণা ফাইনালে নিউ চন্দনা ঠিক মেরে বেরিয়ে যাবে। পালা যেমনই হোক, বেশি দর্শক টানতে পারলেই তিনি খুশি।

ইতিমধ্যে শিব একদিন ভুতোকে খুব শাসিয়ে দিল।

কিছুতেই ও ভুতোকে একলা নিরালায় পাচ্ছিল না। মরিয়া হয়ে একদিন গ্রামের পথে একা যেতে দেখে ডাক দিল — এই ভুতো শোন্।

ভুতো ঘাড় ফিরিয়ে দেখল কিন্তু থামল না। চেঁচিয়ে বলল — এখন নয় পরে।

শিব দৌড়ে গিয়ে ভুতোর পথ আগলে দাঁড়াল। ভুতোর পানে তীব্র চোখে চেয়ে সে বলল — ছি ছি এই করলি? ভাবতে পারিনি।

কেন কী করলাম? — ভুতো নির্বিকার ভাবে জবাব দেয়।

— কেন আবার। আমাদের এতদিনের ক্লাব ছেড়ে ওদের সঙ্গে ভিড়লি। লজ্জা করল না?

— আমি মোটেই ক্লাব ছাড়িনি। কেন অন্য দলে অভিনয় করা কি ক্লাবের বারণ?

— ওরা আমাদের দিনে পালা করছে কেন?

— সেটা ওদের খুশি। ইচ্ছে হলে তোরা দিন পাল্টা।

আমরা কেন পাল্টাব। আমরা আগে ডেট্ ঠিক করেছি।

— সেসব কর্তাদের ব্যাপার। আমি কর্তা নই। পার্ট পেয়েছি। করছি।

শুধু পার্ট? না আরও কিছুর লোভ দেখিয়েছে ঢোলকপতি?

— মোক্ষম অস্ত্রটি ছাড়ে শিব।

সে তুই যা খুশি আন্দাজ কর। — বলতে বলতে পাশ কাটিয়ে এগোয় ভুতো।

শিবের হাত তখন নিশপিশ করছে। নেহাতই দেবুর বারণ, তাই।

— ঠিক আছে। পরে বুঝবি ঠেলা।

ভুতো ভ্রূক্ষেপই করে না।

লম্বু খোকা দূর থেকে লক্ষ করছিল। শিবের সামনে যেতে তার সাহসে কুলোয়নি। ভুতো কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করল — শিব কী বলছিলরে?

— বলছিল। আমি কেন নিউ চন্দনায় পার্ট করছি?

— তুই কী বললি?

— বললাম। ভালো পার্ট পেয়েছি তাই করছি। বাইরে কোথাও অভিনয় করতে পাব না, এমন দাসখৎ লিখে দিয়েছি ক্লাবে?

এই ঘটনার পর নিউ চন্দনায় ভুতোর খাতির খুব বেড়ে গেল।

কয়েকদিন বাদে ভোরবেলায় দেবু গিয়ে ডাকল শিবকে ওর বাড়িতে। শিব বেরিয়ে আসতে ওকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলল, — রতিয়া তোর কথা শোনে?

— শোনে বইকি।

— বেশ তাহলে রতিয়াকে বলবি, আজ যেন আমার সঙ্গে দেখা করে সন্ধ্যের পর তালপুকুরে ঘাটে। আর বলে দিবি, আমি যা যা বলব তাহ করতে। করবে তো?

— আমি হুকুম দিলে আলবাৎ করবে। কিন্তু কি ব্যাপার?

দেবু বলল,—সেটা এখন সিক্রেট। পরে বলব সব। আপাতত রতিয়াকে চাই।

বায়েনদের ছেলে রতিয়া, দেবুদের থেকে কিছু ছোট। গরীবের ছেলে। তাই স্কুল শেষ না করেই রোজগারে নেমেছে। কাঠ মিস্ত্রির কাজ করে। ছেলেটা শিবের দারুণ ভক্ত। শিবের দুঃসাহসিক ডানপিটেমিতে রতিয়া পয়লা নম্বর চেলা।

শিব গুম মেরে থাকে তারপর বলে—জানিস ঢোলকপতি কি জঘন্য প্যাঁচ কষেছে? ওর লোক কাল চোঙা ফুঁকে, রটিয়েছে যে নিউ চন্দনার পালায় ছোটদের লজেন্স দেওয়া হবে। ফ্রি।

এসব কি? ঘুষ দিয়ে, দর্শক টানা?

দেবু বলল, — হুঁ বাজে ব্যাপার। যাহোক তোদেরও উল্টো প্যাঁচ কষতে হবে। তোরাও জানিয়ে দে যে চন্দনা স্পোর্টিংয়ের যাত্রায় ছোটদের টফি বিলোনো হবে বিনা পয়সায়। আরও ধর্, মেয়েদের ফ্রি পান। বেচুদাকে বুদ্ধিটা দেব আজ। তবে এখন নয়। এক্কেবারে পালার আগে রটাবি। নইলে বেশি আগে জানলে, ওরা ফের ঘুষ বাড়াবে।

সহসা দেবু শিবের আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল,

— হুঁ, তোকে দিয়েই চলতে পারে।

— কী ?

— কীর্ণাহার যেতে পারবি কাল? গুরুদাস হাজরার সঙ্গে একবার মোলাকাত করতে?

— গুরুদাস হাজরা! মানে নিউ চন্দনায় বিবেক হবে। হায়ার করেছে?

— হ্যাঁ তিনি। একটু মেক আপ করে যাবি। যাতে তোকে চিনতে না পারে। গুরুদাসকে কটা কথা বলে আসবি।

চার

গ্রামের সীমানায় ঘোষবাগানের গায়ে সাধুচরণের কুটির। জায়গাটা খুব নিরালা। একটা পুকুর ঘিরে কিছু আম লিচু নারকেল ইত্যাদির গাছ। সাধুচরণ এই বাগানের পাহারাদার। একা থাকে। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। একহারা লম্বা গড়ন। হাসি হাসি মুখ। স্ত্রী গত হয়েছে কয়েক বছর। একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে অনেককাল।

অল্প চাষের জমি আছে সাধুর। তার ফসলে পেট চলে যায়। আর সে গান বাজনা নিয়ে দিন কাটায়।

এখনকার সাধুর সঙ্গে বছর দশেক আগের সাধুর মিল নেই। এককালে সাধুচরণ ছিল নামজাদা চোর। জেলও খেটেছে কয়েকবার। তবে বেশি মেয়াদ খাটতে হয়নি কখনো। ধূর্ত সাধুকে তেমন কব্জা করতে পারেনি পুলিশ।

তো সাধু চুরি ছাড়ল কেন?

শোনা যায় যে, চোর বাপের নামে শ্বশুর বাড়িতে মেয়ের সম্মানহানি হচ্ছিল। তাই আদরের মেয়ের কান্নাকাটি অনুরোধে সাধু চুরি ছাড়ে।

শিব আর দেবুর সঙ্গে সাধুচরণের বেশ পরিচয় আছে। ঘোষবাগানের কুল আম মাঝে মাঝে ওদের খাওয়ায় সাধুচরণ। নানান গল্প বলে। নিজের বাসার সামনে বসে সাধু চাটাই বুনছিল একা। দেবু সামনে হাজির হতে হেসে বলল — কীগো অনেক দিন দেখা নেই?

দেবু কাছে বসে মৃদু কণ্ঠে বলে — সাধুকাকা একটা সমস্যায় পড়ে এলাম। তুমি যদি একটু সাহায্য কর? আর কাউকে তো ভরসা নেই?

কী ব্যাপার? — সাধুর চোখ তীক্ষ্ণ হয় : শুনি সমস্যাটা।

দেবু ধীরে ধীরে সংক্ষেপে বলে, যাত্রা নিয়ে চন্দনা গ্রামে গন্ডগোলের ইতিহাস। নবাগত গোলকপতির দম্ভ। নিউ চন্দনার সৃষ্টি। কী বিশ্রী রেষারেষিতে নষ্ট হতে চলেছে গাঁয়ের সদ্ভাব।

দেবুর কথা শেষ হতেই দপ্ করে জ্বলে ওঠে সাধু।

— কী! মিত্তির মশাইকে টেক্কা দিতে চায়। এত বড় আস্পর্ধা? মিত্তিরমশাইয়ের অ্যাকটিং আমি কত দেখেছি। আহা কী পার্ট! ওঁর সেই শাজাহান, চাণক্য, এখনও চোখে ভাসে, অমনটি আর দেখলাম না। ভারি সজ্জন মানুষ। ওঁর পরিচালনাও দেখেছি। কী শেখাবার কায়দা! অপূর্ব! আর ওই গোলকপতিকে আমি বিলক্ষণ জানি। একটি অকাল কুষ্মাণ্ড ছিল ছোকরা।

একটু গুম মেরে থেকে সাধু ফের ফুঁসে ওঠে, — পয়সার গরম হয়েছে তাই না? এখন রিটায়ার করেছি বটে, তবু যদি ইচ্ছে করি? দেব নাকি গোলকপতির বাড়িটা ফাঁক করে?

দেবু বলল — না না সাধুকাকা, তোমায় ওসব কাজ করতে হবে না। আমার একটা প্ল্যান আছে। সেটা কেমন হবে বুঝে দেখ।

দেবু তার পরিকল্পনাটি পেশ করে।

শুনে সাধু উচ্ছ্বসিত, — খাসা বুদ্ধি। তোমার দাদা মাথা আছে। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। এ কাজ তো আমার কাছে নস্যি। তবে কাজটা একা হবে না। গুটেকে সঙ্গে চাই। ঠিক আছে। ওকে আমি বুঝিয়ে দেব।

গুটে পাকা চোর। সিড়িঙ্গে চেহারা। চন্দনা গ্রামে বাস। গুটের একটা মহৎ গুণ, সে নিজের গাঁয়ে চুরি করে না। সাধুচরণের কাছেই তার চুরি বিদ্যায় হাতেখড়ি।

— গুটে আবার ঝামেলায় পড়বে নাতো?

— আরে না না। কেউ ওকে সন্দেহই করতে পারবে না। সাধুচরণের কাজ অত কাঁচা নয়। তুমি নির্ভয়ে থাক। শুধু জিনিসপত্রগুলোর খবরাখবর আমায় জানিয়ে দিক ঠিক সময়ে। ব্যস, কেল্লা ফতে।

দেবু বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফেরে।

পরের দিন। কীর্ণাহার। সকাল ন'টা নাগাদ।

— গুরুদাসবাবু আছেন?

দু'বার কর্কশ গলায় জোরালো ডাক শুনে গুরুদাস হাজরা সদর দরজা খুলে বাইরে মুখ বাড়ালেন। দেখলেন যে সামনে খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি মাস্তান টাইপের অপরিচিত যুবক। লম্বা শক্ত গড়ন। চোখে কালো গগলস্। ঝুলো মোটা গোঁফ। বাহারি ফাঁপানো চুল। গায়ে হলুদ স্পোর্টস গেঞ্জি ও চাপা নীলরঙা ফুল-প্যান্ট।

কী চাই? — অবাক হয়ে বলেন গুরুদাস।

আপনিই স্যার, সুধাকণ্ঠ গুরুদাস হাজরা? — যুবক প্রশ্ন করে।

— হ্যাঁ।

নোমোস্কার। — যুবক ডান হাতখানা একবার কপালে ঠেকায়। আপনার সঙ্গে একটা জরুরি দরকার আছে।

মধ্যবয়সি গুরুদাস সঙ্কুচিত ভাবে বাইরে আসেন। ভদ্রলোকের চেহারা ছোটখাটো। গৌড়বর্ণ। অতি নিরীহ মানুষ। পরনে ধুতি। গায়ে একটি উড়ুনি জড়ানো। খালি পা।

— আমি স্যার চন্দনা গ্রাম থেকে আসচি। লাভপুরের কাছে। ময়ূরাক্ষীর ধারে। আপনাকে স্যার আমাদের ক্লাবের যাত্রায় গান গাইতে হবে। আজ অ্যাডভান্স করে যাব। আপনার কী রেট বলুন?

— চন্দনা। ও! তা বাবা তোমাদের পালার দিনটি কবে?

— কালীপুজোর দুদিন আগে।

— অ্যাঁ! তোমাদের ক্লাবের নামটা কী?

— চন্দনা স্পোর্টিং ক্লাব।

— কিন্তু বাবা আমি যে ওই দিনেই তোমাদেরই গ্রামে আর একটা ক্লাব — কী জানি নাম, হ্যাঁ নিউ চন্দনা ড্রামা ক্লাব — তাদের যাত্রায় গাইব বলে বায়না নিয়ে ফেলেছি।

ওদেরটা ক্যানসেল করে দিন। — যুবক প্রায় হুকুম করে।

— না বাবা তা হয় না।

ওদের চেয়ে আমরা পঞ্চাশ টাকা বেশি দেব। — যুবক মুঠো পাকায়।

না বাবা পারব না। গুরুদাস হাজরার কথার নাম আছে। বায়না নিয়ে ফেললে সে যাবেই। টাকার লোভে কথা ফেরায় না। — বিনীত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে নিবেদন করলেন গুরুদাস। যদিও এই গুন্ডা টাইপের যুবকটির হাবভাবে তাঁর বুকের ভিতর গুরগুর করছে ভয়ে।

আপনি তাহলে আমাদের পালায় গান করবেন না? বেশ ধমকের সুরে বলে যুবক : ওই নিউ চন্দনা একটা বোগাস্ পার্টি। আচ্ছা, ঠিক আছে।

যুবক অ্যাবাউট টার্ন হয়ে গটগট করে চলে গেল। গুরুদাস হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু ব্যাপার কী? মনে তাঁর ভয় শিরশির করতে থাকে।

চন্দনায় ঘোষ বাগানের নির্জনে শিবের জন্য অপেক্ষা করছিল দেবু। শিব কালো চশমা আর গোঁফ খুলে ফেলে একগাল হেসে বলল, ও : সুধাকণ্ঠকে যা ঘাবড়ে দিয়েছি। একদম ফ্যাকাসে মেরে গিছল।

— হুম্। প্রথম ডোজটা দেওয়া রইল।

পাঁচ

দেখতে দেখতে যাত্রার দিন এসে গেল।

চন্দনা গ্রাম উত্তেজনায় থরথর।

বাইরের শিল্পীদের নিয়ে আসতে দুপক্ষেরই লোক বেরিয়ে পড়ল ভোরবেলা।

ভুতো আনতে গেল কীর্ণাহার থেকে বিবেক গুরুদাস হাজরাকে। এই দায়িত্বটা সে যেচেই নিয়েছে। বায়না করার সময় সে গোলকপতির জ্যাঠতুতো ভাই যদুপতির সঙ্গে গিয়েছিল গুরুদাসের কাছে। তাই গুরুদাস ভুতোকে চিনতে পারলেন।

বেরুবার মুখে গুরুদাস জিজ্ঞেস করলেন ভুতোকে, — আচ্ছা তোমাদের গ্রামে কি আর একটা পালা হচ্ছে আজ?

— হ্যাঁ। চন্দনা স্পোর্টিং ক্লাবও করছে।

— দু'দলে কি তেমন? মানে রেষারেষি আছে?

তা আছে। — স্বীকার করে ভুতো।

— কোনো গোলমালের সম্ভাবনা আছে নাকি?

হুঁ। — ভুতোকে কিঞ্চিৎ চিন্তিত দেখায় : ওরা হয়তো কিছু হ্যাঙ্গামা বাধাতে পারে। তা

আপনি ভাববেন না। ঠেকাবার ব্যবস্থা আমরা করব। ওরা গুন্ডামি করলে আমরাও ছেড়ে দেব না।

সুধাকণ্ঠ বললেন, — তোমাদের কথা দেবার পর একটি ছেলে এসেছিল তোমাদের গাঁয়ের ওই অন্য ক্লাবের। আমায় বায়না করতে। তোমাদের দিনেই তাদের পালা। কী রকম জানি রকমসকম। খুব জোরাজুরি করছিল। আমি গাইতে রাজি না হতে বেশ চটে গেল।

— হ্যাঁ। আমরা ভালো ভালো শিল্পী আনছি, এটাই ওদের বেশি রাগ। বিশেষত আপনার নাম রটেছে খুব। ভয় নেই কিছু। তবে একটু সাবধান হতে হবে।

সুধাকণ্ঠ গুরুদাস মনে মনে ভড়কে গেলেন। এখন আর না যাওয়ারও উপায় নেই। কিন্তু হ্যাঙ্গামার ভয় থাকলে কি প্রাণ খুলে গাওয়া যায়? এসব তাঁর পোষায় না।

বেচুদাকে চন্দনা স্পোর্টিংয়ের অনেকে পরামর্শ দিয়েছিল যে তোমাদের সময়টা পাল্টাও। হয় আগে শুরু কর অথবা একই সময়ে শুরু হোক। নইলে নিউ চন্দনা বেশিরভাগ দর্শক টেনে নেবে। বেচুদা কিন্তু গোঁ ধরে রইল। না। আমরা আগে স্থির করেছি সময়। ওদের ভয়ে পিছোব না। তাতে যা হয় হবে।

শিব জানে যে এই জেদটা বেচুদার মাথায় ঢুকিয়েছে দেবু। কিন্তু দেবু কেন এমন বোকামি করল? আশ্চর্য!

সন্ধে হতে না হতেই যাত্রার আসরে লোক জমতে শুরু করল। শুধু চন্দনা নয়, আশেপাশের গ্রাম থেকেও লোক আসছে। দর্শকের স্রোতটা নিউ চন্দনার দিকেই বেশি। অনেকে আবার ঠিক করেছে যে নিউ চন্দনার পালা খানিকক্ষণ দেখে না হয় যাওয়া যাবে চন্দনা স্পোর্টিংয়ের আসরে।

পুবপাড়ায় তাদের পুরনো জায়গায় বসছে চন্দনা স্পোর্টিংয়ের আসর। আর দক্ষিণ পাড়ায় নিউ চন্দনার।

নিউ চন্দনার পালা শুরু হবে রাত আটটায়।

আর আধঘণ্টাটাক বাকি। প্রথম দিককার সিনে যারা আছে তাদের সবারই সাজপোশাক মেকআপ রেডি। পরের দিকে যারা নামবে, তারা মুখে গায়ে রং মেখে, মানানসই চুল দাড়ি গোঁফ ইত্যাদি লাগিয়ে ফেলেছে। তবে পুরোদস্তুর ড্রেস তখনো চড়ায়নি। গেঞ্জি লুঙ্গি পাজামা ইত্যাদি পরে ঘোরাঘুরি করছে পরের দিকের সিনের শিল্পীরা।

ভুতোর কর্মদক্ষতায় গোলকপতি মুগ্ধ। ভুতো যেন একাই একশো। বিকেল থেকে সে চরকির মতো পাক খাচ্ছে। তার প্রথম আবির্ভাব পালার মাঝামাঝি সময়ে, তাই পুরো মেক আপ নেয়নি মুখে, রং মেখেছে শুধু। চুল গোঁফ লাগায়নি। সব দিকে তার নজর। মাইক সেটিংয়ে হাত লাগাচ্ছে। লাইট ঠিকঠাক করছে। মেকআপম্যানকে সাহায্য করছে। কারও কোমরবন্ধ এঁটে দিচ্ছে। কারোর জামার বোতাম আটকাচ্ছে। তার বিশেষ নজর বাইরের নামী শিল্পীদের যত্নের প্রতি। তাদের বারেবারে অনুরোধ করছে —

— চা খাবেন স্যার?

— এই যে সিগারেট।

— দিদি পান চাই?

ঢাল তরোয়াল গদা বর্শা তির ধনুক মুকুট দণ্ড ইত্যাদি অভিনয়ের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি ভুতো যত্ন করে গুছিয়ে রেখেছে পুরুষদের গ্রিনরুমে অর্থাৎ সাজঘরে। যখন যার যেটা দরকার পেয়ে যাবে এলেই। নইলে সব সময় হাতে বড় বড় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা অভিনেতার পক্ষে মুশকিল। ঠোক্কর খাবে। ভুলে কোথায় যে রাখবে? সিনে আবির্ভাবের সময় হয়তো খুঁজেই পাবে না।

মহাভারত অবলম্বনে পালা। জনে জনে রকমারি সাজ — পোশাক হাতিয়ার। ভুতো সবাইকে ডেকে ডেকে দেখিয়ে দেয়, — এই যে এখানে রইল সব। নিজের নিজেরটা চিনতে পারবেন তো?

গোলকপতি সমানে খবর আনাচ্ছেন যে পুবপাড়ায় চন্দনা স্পোর্টিংয়ের অবস্থাটা কী! খবর এল যে ওই আসরে মোটেই ভিড় হয়নি। নেহাতই টিমটিম করছে। শুনে গোলক সাহা আহ্লাদে আটখানা।

নিউ চন্দনার আসর কানায় কানায় ভরে গেছে। ছড়িয়ে পড়ছে দর্শকের ভিড়। বাচ্চারা গাদাগাদি করে বসেছে একেবারে সামনে। অনেকগুলো তক্তপোশ পেতে বানানো হয়েছে উঁচু মঞ্চ। মঞ্চ ঘিরে খুঁটি পুঁতে গণ্ডি। স্টেজের মাথার ওপর চাঁদোয়া। তিনপাশে খোলা মঞ্চ। একধারে সাজঘর। ওইদিক থেকে স্টেজে উঠে আসবে অভিনেতা অভিনেত্রীরা।

দড়ির গণ্ডির কাছাকাছি বসেছে রতিয়া, একপাল দশ থেকে বছর ষোলোর ছেলে নিয়ে। দেখেই বোঝা যায় যে ওই দলের সবকটি মহা বিচ্ছু। তারা সমানে নিজেদের ভিতর ঠেলাঠেলি মারামারি করছে থেকে থেকেই। লিডার রতিয়া মাঝে মাঝে এক একটা ছেলের মাথায় চাঁটি বা গাঁট্টা কষিয়ে তাদের ঠান্ডা রাখছে।

ঢং!

নিউ চন্দনার আসরে ফার্স্ট বেল পড়ল। ঠিক আটটায়।

আসরে ঢুকল কনসার্ট পার্টি। যন্ত্রগুলি আগে থেকেই রাখা ছিল মঞ্চে। যন্ত্রীরা বসে পড়ে যে যার বাজনা নিয়ে।

ঠুং ঠাং। প্যাঁ পোঁ। ঠং ঠং। ঠুক্ ঠাক্ — হারমোনিয়াম বাঁশি ফুলুট ক্ল্যারিওনেট তবলা পাখোয়াজ এস্রাজ ইত্যাদি হরেক বাদ্যযন্ত্রে সুর বাঁধা চলে।

পাঁচ মিনিট পর আবার — ঢং!

সেকেন্ড বেল পড়ে। অমনি ওস্তাদ তানসেন আলির ফুলুট অপূর্ব তান ধরে উচ্চরবে। দর্শক কথা ভুলে সচকিত হয়।

অমনি রতিয়ার দলের ভিতর গুজগুজ চলে। তারপরই চেঁচায় রতিয়া, — লজেন্স! লজেন্স!

তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে চিৎকার জুড়ে দেয় ওখানকার ছোটদের গোটা দল, — লজেন্স। লজেন্স। লজেন্স কই?

চমকে থমকে গেল সুর। তারপরই শুরু হয় হট্টগোল। লজেন্সের কথা মনে পড়ে যেতে আসরের অধিকাংশ বাকি ছোটরা রতিয়াদের সঙ্গে চিৎকার জুড়ে দেয়, — লজেন্স লজেন্স।

এই চোপ! আস্তে। — বড়রা ধমকায়।

চিৎকার কমে না!

দেখা গেল, কিছু বয়স্ক তরুণ যুবাও গলা মিলিয়ে হাঁক পাড়ছে লজেন্সের দাবিতে। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই রগড় করতে চেঁচায়।

লজেন্স প্রার্থী — এই দলে কিছু চন্দনা স্পোর্টিংয়ের সাপোর্টারকেও দেখা গেল। ঝঞ্ঝাট পাকানোর এমন মওকা কি তারা ছাড়ে!

মঞ্চে হাতজোড় করে এসে দাঁড়ায় গোলকপতি। মুকুটহীন যুধিষ্ঠিরের বেশে। ঘামতে ঘামতে কাতর কণ্ঠে আবেদন জানান,

— ছোট ভাইবোনেরা। লজেন্স নিশ্চয় পাবে। তবে —

তার বাকি কথাগুলি ডুবে যায় বহুকণ্ঠের অট্টরোলে, — ঢোলক ঢোলক। লজেন্স লজেন্স। রতিয়ার কাছ থেকে শুরু হয়ে স্লোগানগুলি ছড়িয়ে পড়ে।

নটসূর্য নবকুমার মেকআপ নিয়ে, ড্রেস পরে, সাজঘরের পিছনে একটা কাঠের চেয়ারে বসে চা খেতে খেতে সিগারেট টানছিলেন। তার কাছেই মাটিতে বসেছিল বছর চোদ্দোর একটি রোগা ময়লা ছেলে। হাফপ্যান্ট ও শার্ট পরা। ওর নাম পটল। নটসূর্যের পার্সোনাল অ্যাটেনডেন্ট। অর্থাৎ ব্যক্তিগত কাজের লোক। নবকুমার যেখানে যান পটল সঙ্গে যায় তাঁর সেবা করতে। নবঠাকুরের (এই নামেই তাকে ডাকে পটল) কাছে সর্বদা হাজির থাকে। হুকুম তামিল করে। সিনে ঢোকার আগে সে জুগিয়ে দেয় প্রয়োজনীয় জিনিস — হাতিয়ার। দেখে নেয়, ড্রেস ঠিক আছে কিনা। এমনকী কোন্ বইয়ে, কোন্ সিনে কী ডায়ালগ দিয়ে শুরু করবেন নটসূর্য তাও পটলের মুখস্থ। মঞ্চে প্রবেশের মুহূর্তে সে তা ধরিয়ে দেয় প্রখ্যাত অভিনেতাকে। আবার সিনশেষে সজোর করতালির মধ্যে নটসূর্য সবেগে মঞ্চ ছেড়ে এসে গ্রিনরুমে প্রবেশ করা মাত্র তাঁর হাত থেকে নিয়ে নেয় পটল — অস্ত্র ইত্যাদি ভারগুলি, তখন নটসূর্য চেয়ারে বসে গা এলিয়ে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেন।

নটসূর্য নবকুমারকে আনতে হলে পটলের খরচ বাবদ যাওয়া-আসার ভাড়া, খাওয়া, থাকার ব্যবস্থা ছাড়াও দৈনিক নগদ পাঁচ টাকা দিতে হয় উদ্যোক্তাদের। এটা চুক্তির অঙ্গ। পটলের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা সে ভবিষ্যতে যাত্রা করবে। নামকরা অ্যাক্টর হবে। নবঠাকুরের হাঁটাচলা বলার কায়দাগুলো সে তাই প্রাণপ্রণে রপ্ত করছে।

আসরে হট্টগোলের আওয়াজ শুনে পটল ও নবকুমার ঘাড় ঘুরিয়ে শোনে। যাই দেখে আসি। — বলে পটল উধাও হয়।

নবকুমার খুব একটা বিচলিত হন না। নানান জায়গায় যাত্রা করে করে এমন মাঝে মাঝে হট্টগোল তার গা সওয়া হয়ে গেছে। তবে কারণটা জানা দরকার। কারণ বেগতিক দেখলে গা ঢাকা দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। আবার সব শান্ত হলে ফিরে এসো।

এই যে আপনি এখানে — কোত্থেকে আবির্ভূত হয়ে বলল ভুতো।

হ্যাঁ ভাই। হইচই কীসের? — জানতে চান নবকুমার।

— লজেন্স হাসি মুখে জানায় ভুতো।

— মানে?

—মানে লজেন্স চাইছে বাচ্চারা।

—কেন?

— নিউ চন্দনা যে প্রমিস করেছিল বাচ্চাদের লজেন্স দেওয়া হবে আসরে। বিনি পয়সায়। তাই চাইছে এখন।

এ আবার কোন্‌দিশি ব্যাপার! — গজগজ করেন নটসূর্য।

ততক্ষণে আসরে এসে হাতজোড় করে বলছেন অনঙ্গ ঘোষ। গোলকপতি পালিয়েছেন নেমে।

— অবশ্যই লজেন্স দেওয়া হবে ছোটদের। সে ব্যবস্থা আমরা করেই রেখেছি। তবে ঠিক ছিল যে লজেন্স বিলানো হবে ইন্টারভেলে। থার্ড সিনের পর পনেরো মিনিট বিরতির সময়।

না না। এখনই চাই। লজেন্স। লবেঞ্চুস। — বহু কণ্ঠে দাবি ওঠে।

অগত্যা রাজি হন অনঙ্গবাবু, — বেশ তাই দেওয়া হবে। তোমরা বসো চুপ করে।

এরপর ঝাড়া আধঘণ্টা লাগল লজেন্স বিলোনোর হ্যাপা সামলাতে। ভুতোসহ চার পাঁচজন ভলান্টিয়ার কয়েকটা লজেন্স ভরা শিশি নিয়ে নেমে পড়ল আসরে, — এই বাচ্চারা হাত বাড়াও। উঠো না। বসে বসে। প্রত্যেকে একটা করে।

ছোটরা কলরব করে, — এদিকে এদিকে।

— ও দুটো নিয়েছে। হাত বাড়িয়েছিল। তবেরে নালশুটে?

— লেগে যায় ঝুটোপাটি লড়াই।

কেবল ছোটরা কেন, অনেক বড়রাও হাত বাড়ায় লজেন্সের আশায়। লজেন্সের শিশিগুলো খালি হতে ভলান্টিয়াররা রেহাই পায়।

শ্রীমান পটল লজেন্স চুষতে চুষতে ফিরল হাসি মুখে।

এই ঘটনায় শুধু নবকুমার বা গুরুদাস নয়, প্রায় সব শিল্পীরই মুড নষ্ট হয়ে গেল। গোমড়া মুখে বসে থাকে তারা।

বিব্রত নিউ চন্দনার কর্মকর্তারা শিল্পীদের কাছে মাপ চায়। বিশেষত ভুতো। সে জনে জনে বাইরের শিল্পীদের কাছে গিয়ে বলে, — ইস্ কী সব হ্যাংলার দল। আগে দিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যেত। ভাবতেই পারিনি, এমন কাণ্ড হবে।

আবার নতুন করে সুর বাঁধা হয় বাজনায়।

কনসার্ট বেজে ওঠে। জমে ওঠে আসর। দর্শকরা উদ্‌গ্রীব। খানিকক্ষণ কনসার্ট বেজে থামলেই থার্ড বেল পড়বে। শুরু হবে অভিনয়।

কিন্তু তার আগেই শোনা গেল চিৎকার। বহু কণ্ঠে! আগুন আগুন।

সচকিত দর্শকরা ঘাড় ফিরিয়ে দেখে যে খানিক দূরে লাল হয়ে উঠেছে গাঢ় কালো আকাশ। ধোঁয়া উঠছে প্রবল বেগে। ব্যস! হুলুস্থুল লেগে যায়।

প্রথমেই রতিয়ার দল চিৎকার ছাড়ল,—আগুন। দক্ষিণপাড়ায় আগুন লেগেছে। চল্‌চল।

রতিয়ার নেতৃত্বে বায়েন পাড়ার নানান বয়সি মানুষ হুড়মুড় করে বেরুতে লাগল। অন্য দর্শকদের মাথা ডিঙিয়ে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, হাত পা মাড়িয়ে।

অন্য আরেক কোণ থেকে আর্ত চিৎকার উঠল — আগুন আগুন। চল্ চল্। সে দলটাও ছুটল। ওরা চন্দনা স্পোর্টিংয়ের সাপোর্টার।

ব্যস! এই দুটো দলের পিছু পিছু বাকি পুরুষরাও দৌড়ল আগুন লক্ষ্য করে। ছোট ছেলেগুলোয় ছুটল হুজুগ দেখতে। মিনিট দশেকের মধ্যেই নিউ চন্দনার আসর প্রায় খালি হয়ে গেল। পড়ে থাকে শুধু মেয়েরা আর শিশুরা। তারা কান্না জুড়ে দিল। আর্তস্বরে ডাকাডাকি করে আত্মীয়স্বজনদের। অনেক বউ শিশু কোলে করে দৌড়ল নিজেদের বাড়ি অথবা কাছাকাছি পরিচিত কারও বাড়ি আশ্রয় নিতে। দক্ষিণ পাড়ার একধার থেকে তখন ভেসে আসছে তুমুল হট্টগোল। ওদিকে আকাশ ধোঁয়াটে রাঙা। পোড়া গন্ধ আর ছাই ভাসছে বাতাসে।

মঞ্চ ফাঁকা। বাজনদার সরে পড়েছে যে যার যন্ত্র নিয়ে।

ছয়

নিউ চন্দনার বেশিরভাগ স্থানীয় শিল্পী ও কর্মকর্তাদের বাড়ি চন্দনার দক্ষিণ পাড়ায়। গোলকপতি সমেত তারাও দৌড়ল আগুনের দিকে। কোথায় আগুন লেগেছে? আগুন কি ছড়াচ্ছে? যে যেমন অবস্থায় ছিল ছুটল উদ্‌ভ্রান্তের মতো।

— এই যে দাদা।

সাজঘর অর্থাৎ গ্রিনরুমের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন নবকুমার। ভুতোর সাড়া পেয়ে বললেন : — আগুন লেগেছে বুঝি?

— হ্যাঁ এই দক্ষিণ পাড়াতেই। কী করে যে লাগল কে জানে! হয়তো ডাকাতের কাজ!

— ডাকাত!

— হতে পারে। পাড়াগাঁয়ে অনেক সময় এমনি আগুন লাগিয়ে ওই দিকে লোক টেনে নিয়ে বাকি গ্রামে চুরি ডাকাতি হয়। তবে অ্যাকসিডেন্টও হতে পারে।

নবকুমার আর ঝুঁকি নেন না। পটলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি অন্ধকারে ডুব মারেন, নিরাপদে আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে।

পরনে পাট ভাঙা ধুতি চাদর। বিবেকের সাজে সুধাকণ্ঠ গুরুদাস মঞ্চের একধারে শুকনো মুখে তাকিয়েছিলেন আগুন রাঙা আকাশের পানে। ভুতোকে সামনে দেখে কম্পিতস্বরে বললেন,

— আগুন লেগেছে কোথাও?

আজ্ঞে হ্যাঁ। — জানায় ভুতো : কে জানে ওরাই লাগাল কিনা!

অ্যাঁ। — চমকে ওঠেন গুরুদাস : এধারেও হ্যাঙ্গামা হবে নাকি?

— হতে পারে। দেখি।

গুরুদাস দ্রুত পায়ে বেরিয়ে পড়েন অন্ধকার গ্রামের পথে।

বাইরের ফিমেল আর্টিস্টদের জন্যে স্পেশাল ব্যবস্থা। আলাদা সাজঘর। সেখানে উঁকি দেয় ভুতো। দুটি মহিলা শিল্পী ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে রয়েছে।

দিদি এখানে আপনারা? — ভুতো ডাকে।

কী হয়েছে ভাই? আগুন লেগেছে বুঝি? — মন্দাকিনী শুধায়।

— হ্যাঁ। কি করে যে লাগল? ডাকাতের কীর্তি নাকি কে জানে!

— অ্যাঁ! ডাকাত!

—হ্যাঁ। গাঁয়ে অনেক সময় এমনি আগুন লাগিয়ে, লোককে আগুনের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বাকি ফাঁকা গ্রামে চুরি ডাকাতি করে বদলোকে। তবে অ্যাকসিডেন্টও হতে পারে।

ডাকাত! ওরে বাবাগো! — হাউমাউ করে ওঠে যুবতীরা : এদিকে আসে যদি ডাকাত?

তা আসতে পারে। — গম্ভীর ভাবে জানায় ভুতো : দামি গয়নাগাটি পরে কত মেয়ে এসেছে পালা দেখতে।

ও বাবা! আমরা কোথা যাই? — হাপুস কান্নায় ভেঙে পড়ে দুই নারী।

কোনো অন্ধকারে লুকিয়ে পড়তে পারেন। ওই পথে গিয়ে কারও বাড়িতে যদি। দেখি আমি! — বলতে বলতে ভুতো অদৃশ্য।

ব্যস! ভুতোর দেখানো পথে দুটি মেয়ে ছুট দিল দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। মিস মন্দাকিনীর নিজের বাড়িতে একবার ডাকাত পড়ার সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা আছে। তাই তার আতঙ্কটাই বেশি।

ভুতো এবার পুরুষদের সাজঘরে উঁকি মারল। দরমার বড় ঘেরা টিনের চালার ঘরটি বেবাক ফাঁকা। কেউ নেই সেখানে। শুধু ছড়িয়ে আছে কিছু যাত্রার সাজপোশাক, অস্ত্রশস্ত্র। বাক্স-প্যাঁটরা, মেকআপের সরঞ্জাম ইত্যাদি। ভুতো ঘরের পিছনের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

একটু পরেই খানিক দূরে ঝোপের আড়ালে থেকে বেরিয়ে এল একজন। চাদর মুড়ি দেওয়া কোনও পুরুষ। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। দ্রুত পায়ে এসে ভুতোর পাশ কাটিয়ে ঢুকল সাজঘরে। ভুতো দরজায় দাঁড়িয়ে রইল।

মিনিট চারেক বাদে সেই রহস্যময় ব্যক্তি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মিলিয়ে গেল আঁধারে। ভুতো এবার ছুটল আগুন দেখতে।

আগুনটা লেগেছে গোলকপতি সাহার দুটো বাড়ি পরে সরকার বাড়ির উঠোনে রাখা খড়ের গাদায়। হু-হু করে জ্বলছে আগুন। যে কোনো মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়তে পারে আশপাশে।

হতভম্ব দর্শকদের মধ্য দিয়ে ছুটে এসে গুটেই প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়ল আগুন নেভাতে। সে কাছেই গোয়াল থেকে গরুগুলো খুলে বের করে দিল। তারপর বাঁশ দিয়ে ধপ্‌ধপ পিটিয়ে খড় সরিয়ে দিতে লাগল যাতে আগুন না ছড়ায়। চেঁচাতে লাগল — জল জল!

গুটের দেখাদেখি অনেকেই এগিয়ে যায় আগুন নেভাতে। বালতি বালতি জল ঢালা হয় আগুনে। ক্রমে আয়ত্তে আসেন অগ্নিদেব। ধিকিধিকি জ্বলছে বটে খড় তবে আর ছড়াবার ভয় নেই।

কিন্তু আগুন লাগল কী ভাবে? এই নিয়ে আলোচনায় মুখর হয় জনতা।

সরকারদের বৃদ্ধ মুনিষ গোয়ারের দেখভালো করে। লোকটি রাতকানা। আবার গাঁজা খায় সন্ধ্যে থেকে। নির্ঘাৎ তার গাঁজার জ্বলন্ত কলকে খড়ের গাদায় পড়ে গিয়ে এই দুর্ঘটনা। অথবা জ্বলন্ত কুপি থেকে। যা কম দেখে লোকটা। মুনিষটিকে পাওয়া গেল বহু খোঁজাখুঁজির পর। আগুন দেখে আর বিপুল হট্টগোল শুনে নেশা সহসা চটে যেতে ও ভাবে যে ডাকাত পড়েছে। ভয়ে লুকিয়ে ছিল পাশের বাড়িতে।

গুটে হিরো বনে গেল। লোকে তারিফ করে বলল, — ছোঁড়াটার বদনাম আছে বটে। তবে আজ একটা কাজের কাজ করেছে।

আগুন নিভেছে। এবার জনতা ফিরে চলে। কেউ পুবপাড়ায়। কেউ দক্ষিণ পাড়ায়। খানিক গিয়েই রতিয়া হল্লা তোলে, — চ চ এবার পুবপাড়ায়। ওরা টফি দেবে বলেছে। দক্ষিণপাড়ার লবেঞ্জুস তো পেয়ে গেছি।

রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ পুবপাড়ায় চন্দনা স্পোর্টিংয়ের আসরে কনসার্ট বেজে উঠল। খানিক বাদেই কনসার্ট বাজল নিউ চন্দনার আসরে।

মিনিট দশেক কনসার্ট বেজেই চন্দনার পালা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু নিউ চন্দনার অভিনয় শুরু হচ্ছে না কেন? আধঘণ্টার ওপর কনসার্ট শুনে লোকের কান ভালোপালা।

কিন্তু শুরু করবে কী ভাবে? নিউ চন্দনার তখন শিয়রে সংক্রান্তি। প্রথমত বেশ খানিকটা সময় নষ্ট হচ্ছে শিল্পীদের মেক আপ ঠিকঠাক করতে। ধোঁয়ার কালিতে, ঠেলাঠেলির ধাক্কায় বেশিরভাগ শিল্পীর মেকআপের বারোটা বেজে গেছে। মুখে, গায়ের রং গেছে চটে। নকল চুল দাড়ি গোঁফ খুলে গেছে অনেকের। তাই নতুন করে সাজতে হচ্ছে। একেবারে কেঁচে গণ্ডুষ।

এর ওপর নিউ চন্দনার আর এক বিপদ! সুধাকণ্ঠ গুরুদাস এবং মন্দাকিনী ও ছায়ারানীর হদিস মিলছে না।

গোছগাছ করে থতিয়ে বসে বেশ খানিক বাদে নিউ চন্দনার খেয়াল হয় যে ভাড়াটে বাইরের শিল্পীদের কয়েকজনের পাত্তা নেই। শুরু হয় ডাকাডাকি খোঁজাখুঁজি।

নটসূর্য নবকুমার কাছেই ছিলেন গা ঢাকা দিয়ে। ডাক শুনে বেরিয়ে এলেন পটল সমেত। ক্রমে আরও কয়েকজন এল। কিন্তু গুরুদাস মন্দাকিনী ও ছায়ারানি কই?

ভুতোর নেতৃত্বে সার্চ পার্টি বেরল। মন্দাকিনীদের ভুতো যে পথটা দেখিয়েছিল সেটা বাদ দিয়ে বহু ঘোরাঘুরি চিৎকারের পর অবশেষে তারা পৌঁছল ভুতোর নির্দেশিত পথে। ওই পথের ধারেই এক গোয়াল থেকে সাড়া মিলল মেয়েলি গলায়। দুটি মেয়ে লুকিয়ে ছিল ওই গোয়ালে। গরুগুলোর ফোঁসফোঁসানিতে এতক্ষণ কাঁটা হয়েছিল। তবু বেরুতে ভরসা পায়নি। কারণ ডাকাতের হাতে পড়ার চেয়ে গরুর গুঁতোও ভালো।

ভুতোদের পেয়ে মেয়ে দুটি আর এক দফা কেঁদে ভাসায়। তারা গোড়ায় বলল, আজ আর আসরেই নামবে না। প্রচুর সাধ্যসাধিতে মন গললেও বলে যে ভালো করে স্নান করে তবেই ফের মেকআপ নেবে। সত্যি বেচারিদের সারা গায়ে কাপড়ে গোবর ও চোনার বিকট গন্ধে ভুরভুর।

কিন্তু বিবেক সুধাকণ্ঠ কই?

তার খোঁজ মিলল আরও দুরে। একটা বাড়ির দাওয়ায় অন্ধকারে থামের আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন। টর্চের আলো পড়তে হাতজোড় করে কাতর স্বরে বলে ওঠেন, — বাবা আমি গায়ক মানুষ।

— আহা ভয় পাচ্ছেন কেন? আমরা নিউ চন্দনার লোক। সুধাকণ্ঠ বেরিয়ে আসেন।

সাত

নিউ চন্দনার পালা যখন ফের আরম্ভ হল তখন সেখানে দর্শক প্রায় অর্ধেক সাবাড় হয়ে গেছে। অপেক্ষা করে করে বিরক্ত হয়ে বহুলোক চলে গেছে পুবপাড়ার পালা দেখতে।

রতিয়া কিন্তু চন্দনা স্পোর্টিংয়ের আসর থেকে আবার টুক করে উঠে ফের এসে নিউ চন্দনায় জাঁকিয়ে বসেছে মঞ্চের সামনে। সঙ্গে গুটিকয় বাছা বাছা হাড়-বজ্জাত সাথী। দেবুও রয়েছে নিউ চন্দনার আসরে। পিছন দিকে ভিড়ের মাঝে।

সেকেন্ড সিনেই এক বিপত্তি।

ভীম দুর্যোধনের মধ্যে আস্ফালন শুরু হয়েছে গদা হাতে। হঠাৎ ভীমের গদার গায়ে কাপড়ের মোড়কটা খুলে গেল জায়গায় জায়গায়।

গদাটা তৈরি হয়েছিল লম্বা একখণ্ড হালকা গোল কাঠের ওপর পুরু করে খড় জড়িয়ে। সুতলি দিয়ে খড় বাঁধা ছিল। তার ওপর জড়ানো রঙিন কাপড়। কাপড়টা সেলাই করা ছিল যাতে খুলে না যায়।

ভীমবেশী হরলাল সবেগে সগর্জনে বারকয়েক গদা ঘোরাতেই কাপড়ের মোড়ক খুলতে লাগল। শেষমেশ কালো কাপড়ের লম্বা ফালিটা আলগা হয়ে ঝুলতে লাগল। ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ল ভিতরের খড়।

ব্যাপার দেখে ভীম ও দুর্যোধন দু'জনেই থ। মায় দর্শকরা অবধি। হরলাল বুদ্ধিতে কিঞ্চিৎ খাটো। তার হঠাৎ সন্দেহ হল, এটা নরাধম দুর্যোধনের চক্রান্ত। সে হুংকার ছেড়ে নিজের খড় বের হওয়া গদাটা কেড়ে নিয়ে, খপ্ করে দুর্যোধনের হাত থেকে তার গদাটা ফেলে দিয়ে দুর্যোধনকেই ঘা কতক কষিয়ে দিল তাই দিয়ে।

খেপে গিয়ে দুর্যোধন জাপটে ধরল ভীমকে। সে এক হুলস্থুল কাণ্ড।

অনঙ্গবাবু ছুটে এসে দুজনকে ধমকে ছাড়িয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন সাজঘরে। উল্লসিত দর্শকদের করতালিতে তখন আকাশ ফাটছে।

পরক্ষণেই আবার দুর্যোগ।

অর্জুনরূপী নটসূর্য নবকুমার তির লাগিয়ে গাণ্ডীবে টান দিতেই কট্ করে ছিলা গেল ছিঁড়ে। অর্জুন বেইজ্জত। নটসূর্য দৃশ্যটা কোনো রকমে ম্যানেজ করে গ্রিনরুমে ফিরে ফেটে পড়লেন রাগে, — ছি ছি পচা দড়ি দিয়ে ছিলা বানিয়েছেন। সিন মার্ডার।

গোলকপতি ভালো ঝাড়লেন ড্রেস মেকারদের ওপর। সবার মুখ চুন।

গাণ্ডীবে ফের শক্ত দড়ির ছিলা পরানো হল।

দুর্ভাগ্যের এখানেই শেষ নয়। আবার ছিলা ছিঁড়ল দ্রোণাচার্যের ধনুকের। সহদেবের ধনুকের বাঁশটাই মট্ করে ভেঙে গেল টান দিতে। একী ব্যাপার! ভৌতিক কাণ্ড নাকি?

দর্শক বেজায় মজা পেয়ে গেছে। যুদ্ধের সিন এলেই তারা চেঁচায়,

— আহা, টেনো না। ছিঁড়ে যাবে। ভেঙে যাবে!

অভিনেতারা এমন নার্ভাস হয়ে পড়ল যে তারা আর ধনুকে বাণ জুড়ে টানার চেষ্টাই করে না।

যুধিষ্ঠিরবেশী গোলকপতি তরবারির হাতল ধরতেই তার এমন তালু চুলকোতে লাগল যে তিনি সমানে পোশাকে হাত ঘসতে লাগলেন। যেন হাতে বিছুটি লেগেছে। তার সংলাপ গুলিয়ে গেল। সিন শেষে সাজঘরে গিয়ে ডান হাতের তালুতে তেল লাগিয়ে তবে কিছুটা স্বস্তি মেলে। গোলকপতি ভয়ে আর ওই তরবারি ছুঁলেন না। অন্য, এক সৈনিকেরটা ধার করলেন।

দ্রৌপদী মন্দাকিনীকে রতিয়ার দল সমানে টিপ্পুনি কাটে,

— শুনতে পাচ্ছি না। ঘুরেফিরে ঘুরেফিরে।

ফলে ঘাবড়ে গিয়ে দ্রৌপদী কেবলই মঞ্চে চক্কর খেতে থাকে। ডায়ালগ আরও শোনা যায় না। পার্টের দফারফা। সাজঘরে এসে রাখে দুঃখে কেঁদে ফেলে মন্দাকিনী।

গুরুদাসেরও নিস্তার নেই। সবে প্রথম গানটা ধরেছেন। ঠুক করে কী একটা বেশ জোরে এসে লাগল তাঁর গালে। চমকে বিবেক গান থামায়। অবশ্য তখুনি ধরে। কিন্তু তাল কেটে গেল।

মিসাইলটা একটি ছোলা ভাজা। রতিয়া দু আঙুলে লুকিয়ে ছুড়েছে।

দ্বিতীয় গানের সময় আর একটি ছোলা ভাজা আঘাত করল গুরুদাসের নাকে। আবার গান থামে ও তাল কাটে।

রতিয়া পরম বিরক্তিতে বিড়বিড় করে, — ধুত্তেরি। টিপ একদম গেছে। একটাও হাঁ — য়ে ঢোকাতে পারছি না।

সুধাকণ্ঠের গান মাথায় উঠল। উনি বুঝলেন যে কেউ কিছু ছোট্ট মতন ছুড়ছে তাক করে। ভয়ে আর তিনি কিছুতেই মঞ্চের সামনের দিকে আসেন না। গলাও খোলে না উৎকণ্ঠায়।

সমস্ত নামী শিল্পীদের মুড অফ্ হয়ে গেল। কোনো রকমে দায়সারা পার্ট বলে স্টেজ ছেড়ে পালিয়ে আসতে পারলে যেন বাঁচে তারা।

এটা কি যাত্রা হচ্ছে? বোগাস্! — দেবুর সজোর মন্তব্য শোনা যায় : স্রেফ সময় নষ্ট। যাই পুব পাড়ায় দেখিগে।

একদল দর্শকও দেবুর সঙ্গ ধরল পুব পাড়ার দিকে।

খানিক বাদেই 'দুত্তেরি' বলে উঠে পড়ল রতিয়া তার দলবলসহ,

— চ চ পুব পাড়ায় দেখিগে চ। রতিয়ার পিছু পিছু আরও কিছু লোক খসে পড়ল আসর থেকে। চলল পুব পাড়ায়।

এই ভাবে মাঝেমাঝেই কিছু কিছু দর্শক খসে পড়তে লাগল দক্ষিণ থেকে পুবে।

চন্দনা স্পোর্টিংয়ের যাত্রা ভাঙল রাত আড়াইটে নাগাদ। নিউ চন্দনার পালা ভাঙে আরও ঘণ্টাখানেক বাদে। তখন ওই আসরের হাল অতি করুণ। দক্ষিণ পাড়ার কিছু লোক এবং শিল্পীদের আত্মীয়-স্বজন ছাড়া সেখানে তখন বাইরের লোক প্রায়ই নেই। অনেকে আবার ফাঁকা শতরঞ্চি পেয়ে আরামে শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

পরদিন সন্ধ্যায়।

সাধুচরণ নিজের ঘরের সামনে একা বসে কীর্তন গাইছিল দোতারা বাজিয়ে। অন্ধকার ফুঁড়ে একটি লম্বা রোগা মূর্তি সড়াৎ করে তার পায়ে এসে পড়ল সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে।

চমকে তাকিয়ে সাধু বলল, — আরে গুটে, ওঠ ওঠ।

গুটে উঠে বসে হাতজোড় করে বলল, — উঃ গুরু! কাল কি খেলটাই দেখালে জবাব নেই। আহা কী সূক্ষ্ম কারুকাজ!

সাধুচরণ গুটের উচ্ছ্বাসে কোনো ভাবান্তর না দেখিয়ে বলল :

তোর কাজটিও উত্তম হয়েছে। ঠিক সময়ে আগুনটা লাগিয়েছিলি। তোকে সন্দেহ করেনি তো?

না গুরু। কেউ না। বরং সরকারবাবু আজ আমায় বকশিশ করছেন। — গুটে মিচকি হাসে। তারপর বলে : গুরু একটি নিবেদন আছে।

— কী?

— তোমার ওই বিদ্যে একটু দান কর আমায়। আহা কী ভাবে কেটে কমজোরী করে রাখলে অমন সরু দড়ির ছিলে আর মোটা কঞ্চির ধনু। দু'তিন টান সহ্য করেই পটাং। আমি লক্ষ করেছি। সবকটা স্রেফ এক টানেই যায়নি। কী মাপা কাজ! আর গদাটা উ: !

— সাধু খুশি মুখে বলে — অনেক দিন আগে শেখা বিদ্যে রে। রাজাবাজারের লালু ওস্তাদ নিজে হাতে ধরে শিখিয়েছিল। সেই যৌবনে। ব্লেড আর ছুরির কারিকুরি। তবে এ বিদ্যে তো তোকে আমি দিতে পারব না। ওসব পথ ছেড়ে দিয়েছি।

প্রায় একই সময়ে। দেবুর ঘরে এসে শিব বলল,— তুই ঠিকই বলেছিলি, ওদেরটা জমবে না। শুনলাম যে ওদেরটা যা তা হয়েছে। লোক উঠে চলে গেছে। আমাদেরটায় কিন্তু যা ভিড় হয়েছিল। দারুণ জমেছিল পালা। আমাদেরটা পরে করে ভালোই হয়েছে। নইলে আগুনের জন্যে ভেস্তে যেত মাঝপথে।

দেবু মিচকে হেসে শুধু বলল, — হুঁ হুঁ বলেছিলাম না। ডরো মৎ। সব ঠিক হো জায়েগা।

দেবুর হাবভাবে শিবের কেমন সন্দেহ হয় যে নিউ চন্দনার বিড়ম্বনার পিছনে হয়তো দেবুর হাত আছে। কথাটা সে তুলবে ভাবছে এমন সময় নিঃসাড়ে যে ঘরে ঢুকল তাকে দেখেই তার পিত্তি জ্বলে গেল। ভুতো।

ভুতো দেবুকে জাপটে ধরে হি হি করে হেসে বলে উঠল, ওঃ তোর বুদ্ধি আছে বটে। সবকটা প্যাঁচ এমন খেটে যাবে ভাবতেই পারিনি।

দেবু শিবের দিকে ফিরে বলল, — কীরে অমন স্ট্যাচু মেরে গেলি যে! ভুতোকে দেখে? তুই ঠিকই বলেছিলি, ওটা ঘরের শত্রু বিভীষণ। তবে কাদের জানিস? নিউ চন্দনার।

মানে? — শিব হতভম্ব।

— আরে ওর জন্যেই তো কাত হল নিউ চন্দনা।

কীরকম? — শিব থৈ পায় না।

— সে অনেক বৃত্তান্ত। পরে বলব সব। হ্যাঁরে ভুতো, গোলক সাহার খবর কী ?

ফায়ার হয়ে গেছে! জানায় ভুতো : এতগুলো টাকা গচ্চা গেল। বলছিল যে থানায় ডায়েরি করবে। অঘটনগুলো সব নাকি চন্দনা স্পোর্টিংয়ের ষড়যন্ত্র। অন্যরা ওকে বলে কয়ে ঠেকিয়েছে। প্রমাণ কী ? মাঝ থেকে আরও কেলেংকারি বাড়বে। ঢোলকপতি ঘোষণা করেছেন যে কালী পুজোর পরই তিনি এই গ্রাম ছাড়বেন। এখানে আর থাকবেন না। এ গাঁয়ের নাকি কিস্‌সু হবে না।

তা বটে! — গম্ভীর বদনে সায় দেয় দেবু।

তারপর তিন বন্ধুই হেসে গড়িয়ে পরে।

[১৯৯১, কিশোর ভারতী শারদীয়া]

দশক পূর্তি উপাখ্যান

এক

ফাল্গুনের সকাল। ন'টা নাগাদ।

দেবু দোতলায় নিজের ঘরে বসে একখানা গল্পের বই পড়ছে। মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে তাকাচ্ছে বাইরে। শিবের আসার কথা।

একটু বাদে এল শিব। হনহনিয়ে। এসেই বিনা বাক্যব্যয়ে দেবুর হজমিগুলির শিশি থেকে দুটো গুলি বের করে মুখে ফেলে বসল চেয়ারে। মুখ থমথমে।

কীরে? মিটিংয়ে কী হল? — জিজ্ঞেস করে দেবু।

ওই যা যা আগে আলোচনা হয়েছিল সবই হবে। বাড়তিও যোগ হয়েছে। বহুৎ ঝামেলা। কত আবদার। আরে জোগাড় করা কী অত সহজ! এখন হ্যাপা সামলাও। রাত আটটা অবধি মিটিং হয়েছে।

বলিস কী? বিকেল তিনটে থেকে আটটা! — দেবু অবাক :

টিফিন দিয়েছিল তো?

— তা দিয়েছিল। তবে কান ভালোপালা হয়ে গেছে। উঃ কী তক্কাতক্কি!

— তা আইটেম কী কী হল?

— ওই সাধারণ সভায় যা যা ঠিক হয়েছিল মোটামুটি সবই থাকল। গান, নাচ, আবৃত্তি, মূকাভিনয়। গরম গরম, দু তিনখানা বক্তৃতা। এইসব। আবার একটা আইটেম বেড়েছে।

— কী আইটেম?

— কবিতা লেখার প্রতিযোগিতা। গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে। উনিশ বছরের নিচেরা যোগ দিতে পারবে। আন্ডার নাইন্টিন এজ গ্রুপ। ওই বেটা নদীর কীর্তি।

— মানে?

— ননীগোপাল আবদার ধরল, একটা কবিতা লেখার প্রতিযোগিতা চাই। মধুরাপুর করেনি। অতএব এটা হবে একদম নতুন জিনিস। চন্দনার প্রেস্টিজ বাড়বে। আরে ওর মতলবটা যে কী তা কী আর কেউ বোঝেনি? আমরা অত বোকা?

— কী মতলব?

— কী আবার? ওই ননীটা যে একটু আধটু পদ্য লিখতে পারে। কলেজ ম্যাগাজিনে এবার ওর পদ্য বেরিয়েছে। তাই ভারি ডাট্। ভাবল, এই মওকায় ওর একটা এলেম দেখাবে।

— কীন্তু শুধু কবিতা কেন? — দেবু বলে : তবে তো গান আবৃত্তি অনেক কীছুরই কম্পিটিশন করতে হয়।

তাই হওয়া উচিত। — সায় দেয় শিব : কীন্তু তাহলে যে প্রোগ্রাম বিরাট হয়ে যাবে। অনুষ্ঠান তো একদিনের। সে সব কম্পিটিশনের কথা উঠেছিল। কীন্তু বাদ গেছে। শুধু ননীরটাই রয়ে গেল।

— কেন?

— কেন আবার? শিব ফুঁসে ওঠে : ননীগোপালের বাবা যে ক্লাবে মোটা চাঁদা দেন। আবার ভাইচ্ পেছিডেন্। ওর আবদার ফেলা যায়? বেচুদা বারকয়েক না-না করেও শেষে রাজি হল।

— ননীর বাবা কী বললেন?

— উনি চুপ করেছিলেন। তবে যেরকম ঘাড় নাড়ছিলেন, মনে হচ্ছিল, ছেলের কথাতেই ওঁর সাপোর্ট।

— এটা উচিত নয়।

ননী কী সোজা চিজ! — শিব মুখ ভেংচে বলে : ও নিজে মোটেই লিখবে না। ওর লেখা আমি দেখেছি, কেমন স্ট্যান্ডার্ড। কলেজ ম্যাগাজিনে যেটা দিয়েছিল ওটা মোটেই ওর নিজের লেখা নয়। নির্ঘাৎ ওর ছোটমামার লেখা। বর্ধমানে যিনি থাকেন।

— কী করে জানলি? — দেবু কৌতূহলী।

— কী করে? তবে শোন। ম্যাগাজিনে লেখা দেবার ক'দিন আগে আমি বর্ধমানে গেছি বুট কীনতে। স্টেশনে ননীর সঙ্গে দেখা। ওর হাতে একটা বই ছিল। হঠাৎ বইটা হাত ফসকে পড়ে যায় প্ল্যাটফর্মে। বইয়ের ভিতর থেকে কয়েকটা লেখা কাগজ ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। আমিও কুড়োচ্ছি। একটা লেখা কাগজ, মনে হল কবিতা। যেই পড়তে গেছি, ননী হাঁ হাঁ করে কেড়ে নিল। ওর নিজের হাতের লেখা নয়। আমি ততক্ষণে দুলাইন পড়ে ফেলেছি। পরে ম্যাগাজিনে ওর লেখা ছাপা হতে অবাক হয়ে দেখি, ওই দুলাইন রয়েছে কবিতাটায়। সন্দেহ হল। জানতাম যে ননীর এক মামা থাকে বর্ধমানে। কবি হিসেবে বেশ নাম করেছেন।

একটু দম নিয়ে শিব আবার বলতে থাকে, — একটু ডিটেকটিভগিরি করলাম। আমাদের ম্যাগাজিনের সহ সম্পাদক দীপঙ্করকে পটিয়ে পাণ্ডুলিপির ফাইলটা চেয়ে উল্টে দেখলাম ননীর কবিতাটার হাতের লেখা ননীর অরিজিনাল হস্তাক্ষরে। এরপর একদিন ননীর বাড়ি গিয়ে কথায় কথায় ওর মামা ওকে যে একখানা নিজের লেখা কবিতার বই প্রেজেন্ট করেছে সেটা দেখতে চাইলাম। ননী গর্ব ভরে বইটা দেখাল। দেখলাম ওর মামার হাতের লেখা। সেই যে স্টেশনে দুটো লাইন পড়ে ফেলেছিলাম, অবিকল সেই ধাঁচের হস্তাক্ষর।

এবার একদিন, — শিবের চোখের তারা উত্তেজনায় ঘুরতে থাকে : ঝপ্ করে ননীকে বললাম, ম্যাগাজিনে তোর কবিতাটা দারুণ। প্রথম লাইন দুটো যেন কী? ইঃ একদম ভুলে গেছি! বেটা আমতা আমতা করে যা বলল, মোটেই মিলল না। বল্ তুই। নিজের লেখা প্রথম ছাপা কবিতার প্রথম দু লাইন কেউ ভুলে যায়? তাও দিন দশেকের মধ্যে!

তাই বলছি, — শিব এবার দাঁড়ি টানে : এবারও ওর মামার কাছ থেকে লিখিয়ে নিয়ে কম্পিটিশনে ফার্স্ট প্রাইজ মারবে, এই তাল করেছে ননী। ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড — তিনটে প্রাইজ থাকছে।

হুম্! — দেবু ঠোঁট চাপে। মুখে রাগের আঁচ। বলে : কী বিষয়ে লিখতে হবে কবিতাটা?

— আমার গ্রাম। একটাই বিষয়।

— ক'লাইন?

— বারো থেকে চোদ্দো লাইন। ছোট কবিতা।

— কবের মধ্যে দিতে হবে?

— আজ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে। — জানায় শির।

— জাজ্ কে হবে? মানে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড বিচার করবেন কে?

— তাও ঠিক হয়েছে। লাভপুরের সত্যসাধন দাস কবিশেখর। উনি রাজি না হলে মগরা স্কুলের বাংলার টিচার কীরীটিবাবুকে বলা হবে। তিনিও কবি।

দেবু বলল, — গানে কী সব লোকাল আর্টিস্ট?

— হ্যাঁ, বেশিরভাগই তাই। ধারে কাছে যাদের পাওয়া যাবে। আমাদের ফান্ড তো বেশি নয়। তবে কলকাতা থেকে দু একজন নামকরা শিল্পী আনার চেষ্টা হবে। নইলে প্রেস্টিজ থাকে না। গতবছর মথুরাপুর কলকাতার একজন বেশ নামকরা রেডিও আর্টিস্ট এনেছিল।

— সভাপতি? প্রধান অতিথি? — জিজ্ঞেস করে দেবু।

— সভাপতি হবেন পঞ্চায়েত প্রধান। আর প্রধান অতিথি চাই কোনো নামী সাহিত্যিককে। মথুরাপুর একজন বেশ নামকরা সাহিত্যিক এনেছিল। গাঁয়ের মাতব্বরদের বলা হবে গাইয়ে আর সাহিত্যিক জোগাড়ে সাহায্য করতে।

গ্রামের কেউ চান্স পাবে না গানে? — দেবু জানতে চায়।

শিব বলে, — আলবাত পাবে। গাঁয়ের ক্লাবের ফাংশন। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা চান্স পাবে না, তা কী হয়? তবে গাঁয়ে একা গাইবার মতো তো শুধু বৈকুণ্ঠ ঠাকুর। আর সব কোরাস। হরিহরের মূকাভিনয় থাকবে। ও দারুণ দেখায়। অনেক দূরে দূরে ডাক পায়। হরিহর আমাদের গ্রামের গৌরব। মোট ঘণ্টা তিনেকের প্রোগ্রাম।

তোর কী ডিউটি? — দেবু জানতে চায়।

শিব বলল — যত খাটাখাটনি ছোটাছুটি এই শম্মার ঘাড়ে। প্যান্ডেল বাঁধা, স্টেজ তৈরি, আর্টিস্ট আনা, রিহার্সালের বন্দোবস্ত করা — কত কী।

— তাহলে তোর আর টিকী দেখা যাবে না একমাস, কী বলিস?

যাঃ। — শিব লজ্জা পায়, ঠিক দেখা পাবি। সব কেমন এগুচ্ছে রিপোর্ট করে যাব তোমাকে। তুই তো কমিটিতে এলি না কীছুতেই। বেচুদা দুঃখ করছিল।

দেবু বলল, — নারে ভাই, অত হইচই আমার পোষায় না। তবে দরকার পড়লে ডাকীস। যতটা পারি হেল্প করব। বলিস বেচুদাকে।

কীসের প্রোগ্রাম? কীসের অনুষ্ঠান? ব্যাপারটা খুলে বলা যাক।

বীরভূম জেলায় ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে চন্দনা গ্রাম। গ্রামের ক্লাব চন্দনা স্পোর্টিং এই বছর

তাদের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটা জব্বর অনুষ্ঠান করবে ঠিক করেছে। লোকে পঁচিশ বছর, পঞ্চাশ বছর, পঁচাত্তর বা একশো বছরে পা দিলে উৎসব করে। দশ বছরে পৌঁছে আবার কী উৎসব?

কারণটা মথুরাপুর। তাদের পাশের গ্রাম। দু-গ্রামে খুব রেষারেষি। গত বছর মথুরাপুর স্পোর্টিং তাদের দশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে মহা সমারোহে এক অনুষ্ঠান করে। তাইতে চন্দনারও জেদ চেপেছে যে দশক জয়ন্তী পালন করতে হবে। হইচই করে। মথুরাপুরকে ডাউন দেওয়া চাই।

চন্দনা স্পোর্টিংয়ের সেক্রেটারি বেচুদা গ্রামের লোকজনকে ডেকে বেশ বড় একটা সভা করে প্রস্তাব পেশ করেন। সবাই সমর্থন জানায়। একটা অনুষ্ঠান কমিটি হয়। তারাই আসল ব্যবস্থা করবে।

শিবকে নেওয়া হয়েছে ওই কমিটিতে। কিন্তু দেবু ঢোকেনি।

শিব দেবু পরম বন্ধু। দু'জনেই পড়ে কলেজে, সেকেন্ড ইয়ারে।

তেঁতুলতলায় একটা উঁচু শিকড়ে বসে গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে আকাশ পানে উদাস নয়নে চেয়ে বসেছিল বটকৃষ্ণ। বটকৃষ্ণ স্কুলে পড়ে ক্লাস টেন-এ।

দেবু গুটিগুটি তার কাছে গিয়ে ডাকল, —বট, একা বসে বসে কী ভাবছিস?

বট চমকে অপ্রতিভ হেসে বলল, — ও দেবুদা! এই বসে আছি।

দেবু তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে বলে — মনে হচ্ছে কবিতা ভাবছিস?

বট ভারি লাজুক হেসে ঘাড় নামিয়ে বলল, — হে তাই। ঠিকই বলেচ। একটা যেন কবিতা আসছে মনে। ঠিক ধরতে পারছি না। বুঝলে দেবুদা, কাব্য সরস্বতীর সাধনা যে কী কঠিন!

দেবু জানে বট ঘোর কবি। কত পত্রিকায় বট অজস্র কবিতা পাঠায়। দুঃখের বিষয় একটা কবিতাও এ পর্যন্ত কোথাও ছাপা হয়নি।

নাঃ ভুল বলা হল। বেরিয়েছে একটা। ওর যখন বারো বছর বয়স। ওর কাকার সম্পাদনায় বের করা হাতে লেখা পত্রিকায়। দুষ্টু জনে বলে, আদরের ভাইপোকে উৎসাহ দিতে রচনাটায় নিজে কিঞ্চিৎ কলম চালিয়ে বের করেছিলেন বটর কাকা।

ব্যস, ওতেই কাল হল। এরপর থেকে বটর কলমে অবিরাম কাব্য স্রোত উৎসারিত হচ্ছে।

দেবু বলল, — চন্দনার দশক পূর্তি কবিতা কম্পিটিশনের লেখা ভাবছিলি বুঝি?

বটকেষ্টর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, — ঠিক বলেছ দেবুদা। ভাবছি একটা কবিতা দেব প্রতিযোগিতায়।

দেবু বটর পাশে বসল। তারপর বলল, — দেখ বট, আমার মনে হয়, তোর লাকটা খারাপ যাচ্ছে। মানে পত্রিকায় লেখা ছাপার ব্যাপারে।

যা বলেছ দেবুদা। — বট দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

দেবু বলল, — আবার দেখবি দু একটা লেখা বেরুলে পত্রিকায়, কিংবা দু একটা প্রাইজ পেয়ে গেলেই ওই সব বাতিল লেখাগুলোই পাঠালে টপাটপ্ ছেপে দেবে সম্পাদকরা।

বট ভারি খুশি হয়ে বলল, — যা বলেছ দেবুদা। এমনই হয় শুনেছি বটে।

দেবু গলা নামিয়ে সহানুভূতির সুরে বলল, — এই কবিতা কম্পিটিশনে একটা প্রাইজ

পেলেই দেখবি তোর বরাত খুলে যাবে।

প্রাইজ কি আর পাব? — বট হতাশ।

কেন পাবি না? — বলল দেবু : ধর্, এমন লেখা দিলি, ফার্স্ট ক্লাস। যার প্রাইজ পাওয়ার খুব চান্স।

— বলচ?

দেবু গম্ভীরভাবে বলল, — দেখ সাফ কথা বলছি। তুই নিজে লিখলে চান্স কম। তোর দ্বারা আর কতটা উন্নতি হতে পারে? তোর মতো লেখা এখানে আরও পাঁচজন লেখে। খুব একটা পাকা হাতের লেখা চাই। বিচারকের নজর কাড়ার মতন।

দেবু কী বলতে চাইছে বুঝতে না পেরে বট হাঁ করে চেয়ে থাকে।

দেবু ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে বলে, — চেনাশোনা কবি কেউ আছে? বেশ পাকা হাত। তাকে দিয়ে লিখিয়ে জমা দিতে পারিস তোর নামে। দেখবি হয়তো কাজ হয়ে যাবে। তবে সে কবি যেন না ফাঁস করে দেয় ব্যাপারটা। তাহলেই কেলেঙ্কারি।

কই? সেরকম তো কেউ জানা নেই, — হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়ে বট।

দেবু ভুরু কুঁচবে ভেবে বলে, — আচ্ছা দেখি, আমি একবার ট্রাই করে। একটা সোর্স আছে আমার। যদি রাজি হয়!

ও দেবুদা প্লিজ। একটু দেখ না চেষ্টা করে। — বট দেবুর হাত চেপে ধরে।

ভোমলা ওরফে ভোম্বলকে পথে ধরল দেবু। ভোম্বল একাই ফিরছিল মাঠে ফুটবল খেলে। দেবু পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলে, — কীরে ভোমলা কবিতা দিচ্ছিস নাকি?

ভোম্বল আনমনে ছিল। অবাক হয়ে বলল, — কবিতা? কোথায়?

— কেন, ক্লাবের দশক পূর্তি কম্পিটিশনে।

ও ননীর প্যাঁচ। — ভোম্বলের কণ্ঠে চাপা ক্ষোভ।

দেবু বলল, — হ্যাঁ শুনলাম। ননীর উৎসাহেই কম্পিটিশন। ও নাকি দারুণ কবিতা লেখে।

ঘোড়ার ডিম লেখে! — ঝাঁজিয়ে ওঠে ভোম্বল : চর্চা রাখলে আমি কিছু খারাপ লিখতুম না। জানিস তেরো বছর বয়সে, ক্লাস সেভেনে যখন পড়ি, তখনই আমার কবিতা বেরিয়েছিল স্কুল ম্যাগাজিনে। ননীর তো অ্যাদ্দিনে একটা ছাপা হল।

— তা ঠিক। তুই বেশ লিখতিস। কেন যে ছাড়লি?

— এই ফুটবলের জন্য। এখন আর মুড আসে না।

— তা ভালোই হয়েছে। কবির অভাব নেই গ্রামে। কিন্তু কলেজ টিমে তোর মতো একটা দারুণ ফরোয়ার্ড তো পেয়েছি। তবে তুই চর্চা রাখলে ননীকে ছাড়াতিস। এটা ঠিক।

বলছিস? — ভোম্বলের মুখে খুশির ছাপ। বলল : ননীটার অ্যাইসা চাল হয়েছে যে সেদিন এমন ভাবে কথা বলল যেন আমি কবিতা-টবিতা কিস্সু বুঝি না। ও একাই বোঝে। এমন রাগ হচ্ছিল যে দিই এক চড়।

একখানা কবিতা লিখে জমা দিয়ে দে না। পুরনো চাল ভাতে বাড়ে। বলা যায় না ননীকে হয়তো টপকে যাবি। — দেবু উস্কোয়।

— নারে মুড আসবে না। সামনে দুটো ম্যাচ। হেভি প্র্যাকটিস চলছে। এর মাঝে কি কবিতা

বেরয়। সেদিন অবশ্য সত্যি ইচ্ছে হচ্ছিল, একখানা দারুণ কবিতা লিখে ওর থোতা মুখ ভোঁতা করে দিই।

দেবু মিচকে হেসে বলল, — তোর মুড না থাকলে অন্য উপায় আছে ননীকে ডাউন দেওয়ার।

— কী?

— আর কাউকে দিয়ে লেখা। তারপর নিজের নামে জমা দে কম্পিটিশনে। বেশ পাকা লেখা হওয়া চাই। তবে ব্যাপারটা যেন একদম গোপন থাকে।

ভোম্বল মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, — তা মন্দ বলিস নি। তবে ভাই, আমার যে তেমন কবি চেনা নেই। তোর কেউ আছে?

দেবু একটু ভেবে নিয়ে বলল, — আছে একজন। দেখব ট্রাই করি। তা আমার আনা কবিতা যদি তোর নামে প্রাইজ মেরে দেয়, খাওয়াবি তো?

ভোম্বল দেবুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, — আলবাত!

দেবু হেসে ফেলে বলল, — ঠিক আছে। দেখি কী করতে পারি। একদম বলিসনি কাউকে প্ল্যানটা।

দেবু পরদিন ধরল সিরাজুলকে। গোপনে।

— হ্যাঁরে সিরাজ, ক্লাবের উৎসবে কবিতা কম্পিটিশন হচ্ছে, তা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা নয় কেন? তাহলে তুই ঠিক একটা প্রাইজ পেতিস। স্কুলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনে তোর আবৃত্তি শুনে গতবার স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব প্রশংসা করে গেলেন।

সিরাজ শুকনো মুখে বলল, — কমিটির মেম্বারদের বললাম তো আবৃত্তি প্রতিযোগিতা করতে। রাজি হল না।

— তবে যে ননীর কথায় রাজী হল, কবিতার বেলায়?

— ননীর বাবা যে মোটা চাঁদা দেবেন জয়ন্তী উৎসবে। আর আমরা তো গরীব। আমাদের কথায় কান দেবে কেন?

দেবু বলল, —তুই তো একসময় কবিতা লিখতিস!

সিরাজ বলল, — লিখেছি বইকি। তিনবছর আগে অবধি প্রায়ই লিখেছি। সেই যে লাভপুর থেকে বেরুত ছোটদের পত্রিকা “ছোটদের লেখা”, তাতে আমার চার-পাঁচটা কবিতা ছাপা হয়েছিল।

তা একবার চেষ্টা করে দেখ না। একখানা ভালো কবিতা যদি লিখে ফেলতে পারিস! — দেবু উৎসাহ দেয় সিরাজকে।

সিরাজ ঘাড় নাড়ে, — এত তাড়াতাড়ি পারব না। অনেক দিন চর্চা নেই। বাজে লেখা হবে। ননী দেখলে খেপাবে।

ধর্, কাউকে দিয়ে যদি লিখিয়ে নিস। তারপর তুই ঘষামাজা করে প্রতিযোগিতায় জমা দিস। তাহলে? — কথাগুলো বলে দেবু মিটমিট করে তাকিয়ে থাকে সিরাজের দিকে।

তা মন্দ নয়! — আইডিয়াটা সিরাজের পছন্দ হয় : মোটামুটি একটা কিছু হাতে পেলে ঘষামাজা করে হয়তো দাঁড় করিয়ে দেব।

দেবু বলল, — তবে লেখাটা একটু পাকা হাতের হওয়া চাই। নইলে কত আর ঘষবি? আর ব্যাপারটা যেন একদম গোপন থাকে। জানাজানি হলে ওই ঘষামাজার কেউ দাম দেবে না। বলবে যে গোটাটাই অন্যের লেখা। স্রেফ জালিয়াতি কেস। এখানকার লোক হলে রিস্কি। বাইরে দূরে থাকে, গ্রামের লোকের সঙ্গে মোটে পরিচয় নেই, তেমন কাউকে দিয়ে লেখা।

সিরাজ বিমর্ষ ভাবে বলে, — আমার হাতে তেমন কবি কোথায়? তোমার জানা আছে কেউ?

দেবু ভুরু কুঁচকোয়। মাথা চুলকোয়। মুখ গম্ভীর। হাতড়াচ্ছে মনে মনে। শেষে বলে, — একজন কে মনে পড়ছে। মন্দ লেখে না। ঠিক আছে দেখব চেষ্টা করে।

— দেবুদা প্লিজ। একখানা মোটামুটি লিখিয়ে আনো, তারপর আমি দেখছি।

আচ্ছা আচ্ছা। — দেবু ভরসা দেয় : খবরদার প্ল্যানটা যেন কাউকে ফাঁস করিসনি।

এরপর দেবুকে দেখা গেল গ্রামের আরও কয়েকটি ছেলের সঙ্গে ফিসফাস করছে গোপনে। পাঠকরা আন্দাজ করতে পারেন যে বিষয়টা কী? সেই একই কবিতা প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গে।

শিবের দেখা মেলা সত্যি ভার হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে সে ঝড়ের মতো আসে দেবুর কাছে। হুড়হুড় করে রিপোর্ট করে চন্দনা ক্লাবের দশক পূর্তি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি কেমন হচ্ছে।

শিবের কত শত যে দায়িত্ব! সে সেক্রেটারি বেচুদার ডান হাত বলা যায়। গ্রামের একদল ছেলের সে লিডার। শিব নিজে তো বটেই ওই ছেলেরা ছোটাছুটি করছে নানান কাজে।

শিবের মুখে শোনা যায়, কত যে ঝামেলা পাকাচ্ছে।

গ্রামের ছেলে-মেয়েদের কোরাস গানের দলের আয়তন না কি কেবলই বাড়ছে। নতুন নতুন সংগীত প্রতিভা আবিষ্কারের কারণে নয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষে যারা মোটা চাঁদা দেবেন তাদের অনেকেই সোজাসুজি বা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাদের বাড়ির ছেলেমেয়ে কেউ না কেউ যেন স্টেজে উঠতে পায়।

শিব বলল, — কোরাসে এমন কয়েকটা কেস ঢুকেছে যাদের গলায় সুরের বালাই নেই। স্রেফ কাকের মতো রা। মহা মুশকিল। এদের গলা শুনে কোরাস গানের শিক্ষক বৈকুণ্ঠ মাস্টার মাঝে মাঝে ক্ষেপে আগুন হয়ে যান। একদিন কী কাণ্ড —

ক্লাবের ট্রেজারার মদন ঘোষের বারো চোদ্দো বছরের ছেলে বদন তার মায়ের নির্দেশে গুটিগুটি এসে বসে পড়েছিল গানের দলে, পিছনের দিকে। তাকে কিন্তু ডাকা হয়নি।

বৈকুণ্ঠ মাস্টার হারমোনিয়ামে সুর তুলে ইঙ্গিত করতেই ছেলের দল সমস্বরে গেয়ে উঠেছে, — হারে রেরে রেরে, আমায় ছেড়ে দে রে, দে রে —

দু লাইন গান হতে না হতেই মাস্টার হুংকার ছাড়লেন।

— স্টপ।

ব্যস্, গান বন্ধ।

— কে রে এমন বেসুরো চেঁচাচ্ছিস পেছনে?

গায়করা চুপ।

— কর্, সা কব্ দিকি।

বৈকুণ্ঠ মাস্টারের হুকুমে পেছনের ছেলেরা একে একে সা তান তোলে।

মদন ঘোষের বেটা বদন যেই সা গেয়েছে — উরি ব্বাপ! যেন ফাটা বাঁশির আওয়াজ ছাড়ল। মাস্টার কানে হাত দিয়ে আঁতকে উঠে বললেন, — ওফ্! তারপর গর্জন ছাড়লেন — তোকে তো আগে দেখিনি। কে ডেকেছে? চলবে না। গেট আউট।

বাইরে বেচুদা বদনকে প্রশ্ন করে জেনে নিলেন কে তাকে গানের দলে ঢুকে পড়তে বলেছে। অতঃপর বদনকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে বৈকুণ্ঠবাবুকে আড়ালে হাতজোড় করে অনুরোধ জানান, — দোহাই দাদা, যাহোক করে ম্যানেজ করে নিন। মদন ঘোষ বিগড়োলে ঢের অসুবিধে। মদনবাবুর স্ত্রী ভারি দজ্জাল। মদনবাবু খুব ভয় পায় স্ত্রীকে।

বৈকুণ্ঠমাস্টার মেজাজি লোক। কাউকে পরোয়া করেন না। কিছুতেই ওই হাঁড়িচাচাকে ঢোকাবেন না দলে। শেষমেশ বেচুদার মুখ চেয়েই রফা করলেন, — ঠিক আছে, বসে থাকুক দলে, পিছনের দিকে তবে গলা দিয়ে আওয়াজ বের করা চলবে না।

গানের দলে কেউ স্রেফ মুখ বুজে থাকলে পাবলিক হাসবে। সমাধানটা বেচুদাই দিল — শোন বদন, অন্যদের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে ঠোঁট নাড়বে শুধু। গানের কথা আওড়াবে মনে মনে। খবরদার আওয়াজ বের করবি না। মনে থাকে যেন।

উৎফুল্ল বদন তাতেই রাজি।

এমনি কত যে টুকরো টুকরো ঝামেলা। তবে বেচুদার মাথা খুব ঠান্ডা। ধৈর্য হারান না।

শিব শুনিয়ে গেল, — জানিস দেবু, গানে এখনও কোনও নামকরা আর্টিস্ট জোগাড় হয়নি। আশপাশ থেকে কয়েকজন গানের লোক পাওয়া গেছে। সিউড়ির একজন রেডিওতে গেয়েছে বটে। তবে মাত্র একবার। যুববাণীতে। গতবছর মথুরাপুর একজন বি গ্রেড রেডিও আর্টিস্ট এনেছিল। অন্তত ওর স্ট্যান্ডার্ডে একজন কাউকে না পেলে আমাদের প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যাবে।

কলকাতায় চেষ্টা করা হচ্ছে? — জিজ্ঞেস করে দেবু।

— বেচুদা বলেছে, হচ্ছে। কিন্তু নামী কেউ এদ্দুর আসতে চাইছে না। পাড়া গাঁ শুনেই পেছচ্ছে। আমরা তো টাকাকড়িও বেশি দিতে পারব না।

হুম! — দেবু চিন্তিত হয়। বলে : একবার ট্রাই করে দেখব নাকি?

করবি? তুই করলে ঠিক পেয়ে যাবি। — দেবুর ওপর শিবের অগাধ আস্থা।

কী কী গানের শিল্পী খোঁজা হচ্ছে? — জানতে চায় দেবু।

রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, অতুলপ্রসাদ — এই ধরনের। লোকসংগীতও চলবে।

দেবু বলল, — আমি কাল দু'তিন দিনের জন্য পিসির বাড়ি যাচ্ছি। চন্দননগরে। অনেক দিন ধরে যেতে লিখছে। এখন ফুরসৎ আছে। ঘুরে আসি।

— বেশিদিন থাকবি না তো?

— না না। দু'তিন দিন।

দেবু ফিরতেই শিব হাজির।

অনেক কিছু রিপোর্ট করল।

এই যেমন, — এখনও তেমন কোনো নামকরা গানের শিল্পী পাওয়া যায়নি।

গ্রামে অনুষ্ঠানের জোগাড়যন্ত্র রিহার্সাল ভালোই চলছে।

গদাই মণ্ডল ওর দুই মেয়ের একটি যৌথ নৃত্য দিতে পেড়াপীড়ি করছিল। বেচুদা রাজী হয়নি। তাই গদাইবাবু কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন।

তা দিল না কেন নাচ? — দেবু কৌতূহলী।

শিব বলল, — একদিন ডেমনেস্ট্রেশন দিয়েছিল। আমি দেখিনি। কী জানি রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে নেচেছিল দুজনে। যারা দেখেছে, বলছিল যেন দুই বোন গানের তালে তালে এক্কাদোক্কা খেলছিল।

দেবু হেসে ফেলে, — তবে না দিয়ে ভালোই করেছে। বদনাম হত।

দেবু ভোম্বলকে ডেকে বলল, — কাল দুপুরে আমার বাড়ি আয়। দোতলায় আমার ঘরে থাকব। টুক করে লুকিয়ে আসবি। যেন কেউ দেখে না ফেলে।

নির্জন খাঁ খাঁ দুপুর। গ্রামের পথে তখন লোকজন খুব কম। ভোম্বল তাক বুঝে সোজা চলে গেল দেবুর কাছে দোতলায়।

ভোম্বল যাওয়া মাত্র দেবু তার হাতে একপাতা লেখা ধরিয়ে দিয়ে বলল, — এই নে তোর কবিতা।

বাঃ। — ভোম্বল নেচে ওঠে ফুর্তিতে।

দেবু বলল, — শোন ভোমলা, লেখাটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে চটপট দুটো কপি করবি নিজের হাতে। নিচে নিজের নাম ঠিকানা লিখবি। তারিখ দিবি। তারপর আমার দেওয়া লেখাটা ছিঁড়ে ফেলে পুড়িয়ে দিবি। কবিতাটা মুখস্থ করে ফেলবি। এক কপি জমা দিবি কম্পিটিশনে। আর এক কপি নিজের কাছে রাখবি। সাবধান! নকলের ব্যাপারটা যেন কেউ টের না পায়।

দেবু সিরাজকে ধরল রাতের অন্ধকারে, ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটার নিচে। প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ে ফিরছিল সিরাজ। হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে কে একজনকে বেরিয়ে আসতে দেখে আঁতকে ওঠে। ভূত নাকি? সে চিৎকার দেওয়ার আগেই শোনে দেবুর চাপা গলা, — এই, তোকেই খুঁজছিলাম।

দেবু একখানা ভাঁজ করা কাগজ সিরাজের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, — পকেটে রেখে দে। তোর অর্ডারি কবিতা। বাড়ি গিয়ে কপি করবি। আমার লেখাটা পুড়িয়ে ফেলবি। ঘষেমেজে দুটো কপি করবি। এক কপি প্রতিযোগিতায় জমা দিবি। অন্যটা কাছে রাখবি। মুখস্থ করে ফেলবি কবিতাটা। কেউ না টের পায়।

দেবু ফের স্যাঁৎ করে মিলিয়ে যায় অন্ধকারে।

এরপর দেবুকে দেখা গেল আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে একান্ত গোপনে। তাদের প্রত্যেককেই সে লুকিয়ে সরবরাহ করে প্রতিযোগিতার অর্ডারি কবিতা। প্রতি জনকে সেই একই নির্দেশ দেয়।

শিব ক'দিন বাদে দেবুকে বলল, — উঃ গ্রামে যে অতগুলো নবীন কবি আছে কে জানত?

তুই কী করে জানলি? — পাল্টা প্রশ্ন করে দেবু।

— বেচুদা বলছিল, কবিতা কম্পিটিশনে মোট বত্রিশটা কবিতা জমা পড়েছে। একটা গ্রামে এতগুলো কবি, ভাবা যায়!

দেবু মুচকি হেসে বলল, — সব ছাইচাপা আগুন। ননীর মতো জাহির করে না। পত্রিকায় দিতেও সংকোচ। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনেকেই কাব্যচর্চা করে। কেউ কেউ হয়তো ভালোই লেখে। একটু উৎসাহ পেলেই প্রতিভা বেরিয়ে আসে।

বাধা দিয়ে বলে শিব, — তা বলে ক্যাংলা। দু পাতা রচনা লিখতে পারে না বাংলায়। সে অবধি কবিতা দিয়েছে!

অ্যাঁ, ক্যাংলা! — এবার দেবুও চমকায় : সত্যি কার প্রাণে যে কী শখ লুকোনো থাকে!

এবার প্রসঙ্গ ঘোরাতেই বুঝি দেবু প্রশ্ন করে, — হ্যাঁরে, প্রধান অতিথি আর নাম করা গায়ক মিলল?

শিব জিভ কেটে বলল, — এই যাঃ, আসল কথাটাই বলিনি। এটা বলতেই এসেছিলুম। হ্যাঁ, প্রধান অতিথি মিলেছে। কলকাতায় থাকেন। কালীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ফেমাস্ সাহিত্যিক।

হুঁ! কালীকিঙ্করের লেখা পড়েছি। কী করে পাকড়ালি? — দেবু কৌতূহলী।

— ননীর এক দূর সম্পর্কের কাকা আর কালীকিঙ্করের ছোট ভাই একই অফিসে চাকরি করেন। ননী নাকি লিখেছিল ওর সেই কাকাকে কালীকিঙ্করকে ধরতে তাঁর ভাইকে দিয়ে। ওই ভাবেই রাজি হয়েছেন কালীকিঙ্কর। অনেক ধরাধরির পর। কাকা মারফত কথাবার্তা হয়ে যাওয়ার পর ননী অবশ্য গিছল কলকাতায় বেচুদাকে নিয়ে ফাইনাল করতে। যাহোক এটা একটা উপকার করল ননী।

— সংগীত শিল্পীর কী হল?

শিব ম্লান মুখে বলে, — এখনও নামকরা কাউকে পাওয়া যায়নি। খোঁজ চলছে। একজন রাজি হয়েছিলেন কিন্তু যা মোটা টাকা চাইল। অত দেওয়ার সামর্থ্য নেই রে চন্দনার।

দেবু বলল, — আর কয়েক দিন দেখ। যদি তেমন কাউকে না পাওয়া যায় বলিস আমায়।

তিন দিন পর শিব ফুঁসতে ফুঁসতে এল। দেবুর কাছে পৌঁছে ফেটে পড়ল — উঃ ননীটা কী শয়তান!

কেন কী করল আবার? — দেবু জিজ্ঞেস করে।

— ও কী আবদার ধরেছে জানিস। ও সভাপতি প্রধান অতিথি দু'জনকে মাল দেওয়ার সময় স্টেজে উঠবে। অর্থাৎ রাণু বাদ।

মালা দেওয়ার সময় স্টেজে ওঠার মানে? — দেবু ধরতে পারে না।

— মানে, ঠিক হয়েছিল যে সভা আরম্ভে ওই দু'জনকে স্টেজে চন্দনের ফোঁটা আর মালা দিয়ে বরণ করবে একটি ছোট্ট মেয়ে। মস্ত একটা নকশা কাটা কাঁসার থালায় যাবে ফুলের মালা আর চন্দনের বাটি। বাচ্চা মেয়েটা তো ওই মস্ত থালা বইতে পারবে না। তাই ওই থালাটা বয়ে নিয়ে যাবে রাণু। সঙ্গে নিয়ে যাবে বাচ্চাটাকে। মালা চন্দন ধরিয়ে দেবে ওর হাতে। বরণ হয়ে গেলে বাচ্চাটিকে নিয়ে ফিরে আসবে। এই আর কী।

দেবু বলল, — রাণু মানে পারুল মাসির মেয়ে। নাইনে পড়ে?

— হ্যাঁ। সুন্দর দেখতে। স্মার্ট। চমৎকার মানাত। আর ননীটা থপথপে। হাত পায়ের ঠিক নেই বেমানান।

— বেচুদা পাল্টাতে রাজি হয়েছে?

— হয়েছে। বাধ্য হয়ে।

— বাধ্য হয়ে কেন?

শিব বলল, — বেচুদা প্রথমে না করে দিয়েছিল। পাজি ননীটা তখন তারকের কাছে বলেছে — সাহিত্যিক জুটিয়ে দিলুম কাকাকে লিখে, আর আমার এটুকু ফেভার করবেন না বেচুদা? ঠিক আছে। কালীকিঙ্কর মহা খুঁতখুঁতে খেয়ালি মানুষ। কলকাতার বাইরে মোটে যেতে চান না। নেহাত কাকার বন্ধুর খাতিরে রাজি হয়েছেন। এরপর যদি হঠাৎ ওঁর মত বদলায়, আসতে না চান, আমি আর কাকাকে রিকোয়েস্ট করব না।

বেচুদার কানে পৌঁছেছে কথাগুলো। ননী জানত, তারক ওকে ঠিক বলবে। শুনে বেচুদা ঘাবড়ে গেছে। যদি ননী চটে গিয়ে গোপনে বিগড়ে দেয় কালীকিঙ্করকে। তখন? আর তো কোনো নামকরা সাহিত্যিক পাওয়ার আশা নেই। তাই ননীকেই বলেছে, মালা চন্দন আর বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে স্টেজে উঠতে। রাণু বেচারি খুব দুঃখ পেয়েছে। ওর তো আর খুঁটির জোর নেই।

আমি বলেছিলাম বেচুদাকে, এই অন্যায়ের প্রতিবাদে কমিটি থেকে রিজাইন করব। কোনোও কাজ করব না। বেচুদা আমার হাত ধরে রিকোয়েস্ট করল — এখন এসব না করতে। বলল, পরে ননীর ব্যবস্থা হবে। ওর খুব বাড় বেড়েছে। আপাতত উতরে দে অনুষ্ঠানটা। নামকরা সাহিত্যিক না পেলে মথুরাপুরের কাছে আমাদের ইজ্জত থাকবে না।

শুনতে শুনতে দেবুর মুখ কঠিন হয়ে উঠল। সে বলল, বেচুদা ঠিক বলেছে। এখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া নয়। তুই এখন মাথা গরম করিসনি। ননীকে টাইট দেওয়া হবে ঠিক। হ্যাঁ, কাল আমি কলকাতা যাব দেখি কোনোও ভালো গায়ক জোগাড় হয় কিনা? আমার চিঠি বা টেলিগ্রাম পেলেই তুই কলকাতা চলে যাবি। ছোটমাসির কাছে উঠব। ঠিকানাটা লিখে নে।

পরদিন ভোরে দেবু কলকাতা গেল।

চারদিন বাদে তার টেলিগ্রাম এল শিবের কাছে — বেচুদাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা আয়। যত শীঘ্র সম্ভব।

দুই

হাওড়া স্টেশনে ট্রেন থেকে নামতেই শিব আর বেচুদা দেখল সামনে দেবু। দেবু হেসে বলল, — যাক্, ঠিকই আন্দাজ করেছি, এই ট্রেনেই আসবে।

কী ব্যাপার? কিছু ব্যবস্থা হল? — উদ্বিগ্ন বেচুদা প্রশ্ন করেন।

খুব চান্স। — ভরসা দেয় দেবু : তবে বেচুদা আপনাকে একটু অ্যাকটিং করতে হবে। ক্লাবের নাটকে তো পার্ট করেন। অসুবিধে কী?

— অ্যাঁ — অ্যাকটিং? কী অ্যাকটিং?

— সে আপনাকে বুঝিয়ে দেব। আমার ছোটমাসির বাড়িতে থাকবেন আজ। কাল যাব একজনের কাছে।

সকাল আটটা নাগাদ।

খ্যাতনামা সংগীত শিল্পী গোরাচাঁদ মল্লিক তাঁর বৈঠকখানায় নেমে এসে বসেছেন। জলযোগ হয়ে গেছে। এখন বৈঠকখানায় বসে তিনি খবরের কাগজ পড়েন। কেউ এলে কথাবার্তা হয়। এই ভাবে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে দোতলায় উঠে রেওয়াজে বসেন।

গোরাচাঁদ মাঝবয়সি। ফর্সা গোলগাল চেহারা। মানুষটি অমায়িক। রবীন্দ্রসংগীত, নজরুল, অতুলপ্রসাদের গান গেয়ে থাকেন। রেডিওতে অনেকদিন গাইছেন। সম্প্রতি টি.ভি.তেও গেয়েছেন।

খবরের কাগজে হেডিংয়ে চোখ বোলাচ্ছেন গোরাচাঁদ, এমন সময় দু'জন অচেনা লোক এসে হাজির হল দরজায়।

একজনের বয়স বছর পঁয়ত্রিশ হবে। পাতলা সুশ্রী মার্জিত চেহারা। পরনে পরিপাটি ধুতি পাঞ্জাবি। দ্বিতীয় জনের বয়স কম। বছর কুড়ির যুবক। ফুল প্যান্ট শার্ট পরা। বেশ স্মার্ট। চোখেমুখে বুদ্ধির ছাপ।

আগন্তুকরা মুখে বিনীত হাসি টেনে হাত জোড় করে নমস্কার জানায়। গোরাচাঁদ প্রতি নমস্কার করে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে থাকেন।

বয়স্ক লোকটি বলেন, — আজ্ঞে, আমরা এসেছি বীরভূম থেকে। আমার নাম বেচারাম ঘোষ। এর নাম দেবব্রত মজুমদার। আমরা থাকি ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে চন্দনা গ্রামে।

গোরাচাঁদ একটু অধীর ভাবে বললেন, — আচ্ছা আচ্ছা, কী ব্যাপার?

বেচারাম ওরফে বেচুদা বিগলিত ভাবে বললেন, — আপনার কাছে একটা আর্জি নিয়ে এসেছি। তবে আগেই বলে রাখি আমি আপনার সংগীতের একজন পরম ভক্ত।

দেবু টপ করে গিয়ে গোরাচাঁদের পায়ের ধুলো নিল এবং একগাল হেসে বলল, — আজ্ঞে আমিও।

বেশ বেশ। — একটু বিব্রত হন গোরাচাঁদ। আন্দাজ করেন অত ভনিতা যখন নির্ঘাৎ কোনোও প্রোগ্রামের জন্য এসেছে। কিন্তু বীরভূম জেলা? আর সেখানে ময়ূরাক্ষী বা কোথায়? বীরভূমে একবার মাত্র গেছেন শান্তিনিকেতনে এবং জয়দেব-কেন্দুলি দেখতে। বীরভূম সম্বন্ধে তাঁর এর বেশি জানা নেই। মনে হচ্ছে দূর পাড়া গাঁ। উঁহু অতদূর যাওয়া পোষাবে না। অবশ্য পারিশ্রমিক কী দিতে চায় শুনি।

গোরাচাঁদ বললেন, — বসুন।

বেচুদা ও দেবু গ্যাঁট হয়ে বসল সোফায়। গোরা মল্লিকের মুখোমুখি।

বেচুদা হাত কচলাতে কচলাতে লাজুক হাসি দিয়ে বললেন,

— আপনার কাছে আমন্ত্রণের অনুরোধ নিয়ে এসেছি।

গোরাচাঁদ কথা বলেন না। উনি সেটা বুঝেছেন। এরকম পার্টি তাঁর কাছে হরদম আসে। কেসটা গ্রহণযোগ্য কিনা বুঝে তবে মুখ খুলবেন।

বেচুদা তেমনি বিনীত ভাবে বলে চলেন, — আজ্ঞে আমি আপনাকে গান গাওয়ার জন্যে বলতে আসিনি। আমি এসেছি আপনাকে আমার গ্রামে মাছ ধরার আমন্ত্রণ জানাতে।

মাছ ধরা? — গোরাচাঁদের নির্বিকার মুখে নিমিষে প্রচণ্ড আগ্রহ ফোটে। তিনি খাড়া হয়ে বসেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, মাছ ধরা। ছিপ দিয়ে। — বেচুদা জানালেন।

তা মাছ ধরা, আমায় কেন? — গোরাচাঁদ তল পান না।

আজ্ঞে তাহলে হিস্ট্রিটা বলি। — জানালেন বেচুদা : চন্দনা গ্রাম খুব ছোট নয়, মাঝারি। ওই গাঁয়ে আমার কয়েক পুরুষের বাস। একসময় আমরা জমিদার ছিলাম ওই অঞ্চলের। এখন অবশ্য জমিদারি নেই। অল্প কিছু জমি, বাগান আর পুকুর রয়েছে। এখন বংশের সবাই প্রায় চাকরি বা ব্যবসা করে সংসার চালায়। গ্রামেও থাকে না। মাঝে মধ্যে আসে। শুধু আমি পার্মানেন্টলি থাকি। ওখানে মাস্টারি করি।

আমার ঠাকুর্দার আমল থেকে আমাদের বাড়িতে একটা প্রথা চালু হয়। এক বিচিত্র প্রথা।

আমার ঠাকুর্দার গান বাজনার খুব শখ ছিল। নিজে ভালো ক্লাসিকাল গাইতেন। আবার ওই ঠাকুর্দারই ছিল ভীষণ মাছ ধরার নেশা।

প্রতি বছর ঠাকুর্দা দু একজন নামকরা গাইয়ে বাজিয়েকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আসতেন দেশের বাড়ি চন্দনায়। আমন্ত্রিতদের শুধু ওস্তাদ হলে চলবে না। তাঁর মাছ ধরার শখ থাকা চাই।

ওস্তাদরা আসতেন। দু চারদিন থাকতেন। মনের সুখে মাছ ধরতেন আমাদের পুকুরগুলোয়। ভালো খাওয়া দাওয়া হত। রাতে খানিক গান বাজনা হত। শাল দোশালা উপহার পেতেন অতিথিরা। তারপর বিদায় নিতেন। ফি বছরই ঠাকুর্দা নতুন নতুন ওস্তাদ খুঁজে আনতেন এই উপলক্ষে।

ঠাকুর্দার পর বাবাও কিছুদিন এই প্রথা চালু রাখেন। কিন্তু তিনিও চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে যাওয়ার পর এই উৎসব বন্ধ হয়ে যায়।

আমার ইচ্ছে, প্রথাটি আবার চালু করি। অ্যাদ্দিন সুবিধে হয়নি। এই বছর থেকে আবার আরম্ভ করতে চাই। আমি আপনার গানের খুব ভক্ত। তাই আপনাকেই প্রথম নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে। যদি দয়া করে যান?

মাধ ধরার নামেই গোরাচাঁদের মনের ভিতর ছটপটানি শুরু হয়ে গেছে। মাছ ধরায় গোরাচাঁদের দারুণ নেশা। বছর চারেক এই রোগে ধরেছে। সময় বেশি পান না, তেমন পুকুরের সন্ধানও মেলে না বেশি। তবু সুযোগ পেলেই তিনি মাছ ধরতে ছোটেন। মাছ ধরার জন্য চার-পাঁচটি দামী ছিপ এবং নানান সরঞ্জামও মজুত আছে ঘরে।

দুঃখের বিষয় মাছ ধরার হাত তাঁর পাকেনি। ভাগ্যও বিশ্বাসঘাতকতা করছে। ফলে এ যাবৎ তাঁর ছিপে সবচেয়ে বড় যে মাছটি ধরা পড়েছে তার ওজন মাত্র সাতশ গ্রাম। লজ্জায় বলা যায় না লোককে।

গোরাচাঁদ জানেন যে আড়ালে লোকে ঠাট্টা-তামাশা করে তাঁর এই শখ নিয়ে। সারা দিন রোদে পুড়ে ঠায় ফাতনার দিকে নজর রেখে, লাল চোখে ঘর্মাক্ত দেহে যখন বাড়ি ফেরেন — গৃহিণী কখনো খালি থলিতে একবার উঁকি দিয়ে, কখনো বা শিকারের পুরস্কারস্বরূপ একটি ক্ষুদ্র চারাপোনা হাতড়ে তুলে কৃপা দৃষ্টি হানে।

গোরাচাঁদের ভারি শখ একটা মাছের মতো মাছ ছিপে গেঁথে তুলে, তাই নিয়ে ফোটো তোলাবেন। ফোটোটা বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখবেন বৈঠকখানায়।

এমন অফার। গোরাচাঁদ পা বাড়িয়েই ফেলেছেন। তবু একটু বাজিয়ে নেওয়া যাক। যতটা

সম্ভব নির্বিকার থেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন বেচুদাকে,

— আপনি তো গানবাজনার ভক্ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ। — বেচুদা ঘাড় নাড়েন : তবে আমি ক্লাসিকালের তেমন ভক্ত নই, আমি ভালোবাসি রবীন্দ্রসংগীত, নজরুল, অতুলপ্রসাদ।

— গাইতে পারেন?

— সামান্য।

— আপনার মাছ ধরার শখ আছে?

— আছে। তবে ঠাকুর্দার মতো পাকা হাত নয়।

— আপনার কেমন পুকুর? মাছ কেমন?

— ভালো স্যার। একখানা পুকুরের খুব নাম। বড় বড় মাছ। কত জজ ম্যাজিস্ট্রেট ওটায় মাছ ধরেছেন।

— ধরতে পেরেছেন?

— পেরেছেন বইকি। এই তো বছর চারেক আগে এস. ডি. ও. সাহেব ধরলেন চার কিলো রুই একটা।

শুনেই গোরাচাঁদের হৃৎপিণ্ড ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। কোনোরকমে গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললেন, — দেখুন ওই গান-টান কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। মাছ ধরার জন্যে যেতে পারি।

— না না, গান তো মুডের ব্যাপার। ইচ্ছে হলে গাইবেন। নইলে গাইবেন না। কেউ জোর করবে না। আপনার সঙ্গ পেলেই মস্ত সম্মান। যদি দু একটা গান শোনান ধন্য হব। আর আমার সাধ্যমতো কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দেব। দয়া করে গ্রহণ করবেন।

নাঃ, লোকটি নিতান্তই ভদ্র। এর মধ্যে সন্দেহজনক তো কিছু দেখছি না। ভাবেন গোরাচাঁদ। হঠাৎ খেয়াল হল। জিজ্ঞেস করলেন, — আমার যে মাছ ধরার শখ, জানলেন কী করে?

হেঃ হেঃ। — বেচুদা হাসেন : আমি স্যার রেডিও স্টেশনে গিয়ে খোঁজ করলাম। নামী গাইয়েদের মধ্যে কার মাছ ধরার শখ আছে? আপনার নামটা জেনে যেন স্বর্গ পেলাম হাতে।

— কতক্ষণ লাগে যেতে? কীভাবে যাব?

বেচুদা বললেন, — ভোরে স্টার্ট করে বিকেলের মধ্যে পৌঁছে যাব। সাঁইথিয়া অবধি ট্রেনে। তারপর মোটরে।

— কবে নিয়ে যেতে চান?

অর্থাৎ রাজি। আনন্দে বেচুদা প্রায় লাফিয়ে ওঠেন আর কী। বললেন, — আমার ইচ্ছে ১ বা ২রা মার্চ। আপনার কী সুবিধে হবে? ওইসময় মাছে টোপ খায় বেশি।

টেবিলে রাখা একটা ডায়েরির পাতা উল্টে দেখে গোরাচাঁদ বললেন, — ঠিক আছে, তাই হবে। ছিপ চার টোপ কী কী নিয়ে যাব?

— কোনো কিছু নেওয়ার দরকার নেই। ওখানে সব ব্যবস্থা থাকবে।

গোরাচাঁদ বললেন, — ছিপটা নেব। নিজের ছিপ না হলে ঠিক জুত হয় না।

বেচুদা বললেন, — আপনাকে এমন একজনের হেল্প দেব দেখবেন। ও অঞ্চলের সেরা মেছুরে। তার চারের টানে মাছ ছুটে এসে টোপ গেলে।

বাঃ!—গোরাচাঁদ উল্লসিত।

বেচুদা বললেন, — ১ মার্চ যাব। ২রা গোটা দিন মাছ ধরব। ৩রা ফিরবেন। আপনাকে আমরা কলকাতা থেকে নিয়ে যাব, পৌঁছে দেব।

দেবু এতক্ষণ চুপচাপ বসে তালমাফিক মাথা নাড়ছিল। সে বেচুদাকে ফিসফিস করে কী বলতেই, বেচুদা বললেন গোরাচাঁদকে,

— ও হ্যাঁ। আচ্ছা মল্লিকমশাই, আপনি একা যাবেন? সঙ্গে বন্ধু কাউকে নিয়ে যেতে পারেন। গল্পগুজব করতে পারেন। তবে ওই সংগীত শিল্পী এবং মেছুরে হওয়া চাই।

তা মন্দ নয়। — বললেন গোরাচাঁদ। হুম্ কাকে নিই! তিনি ভাবেন। গানে সমান হলেও মাছ ধরায় আমার চেয়ে কম হতে হবে। নইলে হয়তো বড় মাছ ধরার ক্রেডিট সেই মেরে দেবে। হ্যাঁ মিন্টুকে পেলে হয়।

মিন্টু উঠতি গাইয়ে। রবীন্দ্রসংগীত গায়। রেডিওতে চান্স পেয়েছে। মাছ ধরার শখ আছে। তবে মেছুরে হিসেবে নেহাত কাঁচা। মিন্টুর ধরা সব চেয়ে বড় মাছের ওজন একশো গ্রামের কম। নেশাটা সদ্য ধরেছে। ওর ধারণা গোরাদা ভারি ওস্তাদ মেছুরে। ও সুযোগ পেলেই গোরাচাঁদের সঙ্গ ধরে মাছ ধরতে।

গোরাচাঁদ তখুনি টেলিফোন করল মিন্টুকে।

— হ্যালো মিন্টু, আমি গোরাদা বলছি। শোন্, এক জায়গায় মাছ ধরতে যাবি? ফাসক্লাস পুকুর। প্রচুর বড় মাছ আছে। ওরা সব ব্যবস্থা করবে। বীরভূমে ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে। গ্রাম। চমৎকার জায়গা। থাকার ব্যবস্থা? জমিদারি বাড়িতে। ১ মার্চ ভোরে স্টার্ট। ৩রা ফিরব।

কী? তোর প্রোগ্রাম আছে? কোথায়? অ্যাঁ বজবজে, ভাবতী সংঘ? অ্যাডভান্স নিয়েছিস? নিস্‌নি। তবে ক্যানসেল করে দে। আমি জানি। গিছলাম একবার। খুব ভোগায়। ফেরার গাড়ি দেয় না। তাহলে ওই কথা রইল। ১ মার্চ।

টেলিফোন নামিয়ে খুশি মুখে গোরাচাঁদ বললেন, — যাক মিন্টুও যাবে। ভালোই হল। মিন্টু সাহা। রেডিওতে রবীন্দ্রসংগীত গাইছে বছর দুই। মাছ ধরার শখ আছে। যা চাইছেন।

গোরাচাঁদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফুটপাথেই এক পাক নেচে নিল দেবু, — ও বেচুদা, কেল্লা ফতে। একজনের জায়গায় দু'জন মিল গিয়া।

বেচুদা দেবুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, — সত্যি তোর বুদ্ধির জবাব নেই।

দেবু বলল, — আমি জানতাম। মেছুরেকে মাছের টোপ দিলে ঠিক গাঁথবে।

বেচুদা বলল, — কাল তাহলে ফিরছি?

দেবু বলল, — বিকেলে একজনকে ট্রাই করব। যদি লেগে যায়, কাল থাকতে হবে।

— কাকে আবার ট্রাই করবি?

সে এখন বলব না। — জানায় দেবু।

তিন

বিখ্যাত রহস্য-রোমাঞ্চ লেখক শশধর ধর খাটে শুয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে প্লট ভাবছিলেন। কাজের লোক মাধাই এসে বলল,

— বাবু দু'জন ছোকরাবাবু এয়েছেন আপনার কাছে।

বিরক্ত ভাবে উঠলেন শশধর বাবু। শশধরবাবু ছোটখাটো মানুষ। রোগা। বাটারফ্লাই গোঁফ। ময়লা রং। বয়স বছর চল্লিশ। ছটফটে। এমন নিরীহ চেহারার মানুষের কলম দিয়ে এমন দুর্ধর্ষ অ্যাডভেঞ্চার বেরোয় দেখলে বিশ্বাস হয় না।

বৈঠকখানায় বসেছিল দেবু আর শিব। শশধর ঘরে ঢুকতেই হুমড়ি খেয়ে পায়ে পড়ে প্রণাম করল।

শশধরবাবু বললেন, থাক থাক। কে তোমরা? কী দরকার?

দু'খানা অটোগ্রাফের খাতা এগিয়ে দিয়ে দেবু বলল, — আজ্ঞে অটোগ্রাফ। আমরা আপনার ভীষণ ভক্ত। আপনার সব বই পড়েছি। খুব ইচ্ছে ছিল, কলকাতায় এলে আপনাকে দর্শন করব। আপনার অটোগ্রাফ নেব।

এমন দুই ভক্তের সাক্ষাৎ পেয়ে শশধরের মনে বিরক্তি কেটে যায়। হেসে বলেন, — তোমরা কোত্থেকে এসেছ?

— আজ্ঞে বীরভূম। লাভপুরের কাছে ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে, আমাদের গ্রামের নাম চন্দনা। আসল নাম ফুলডাঙা-চন্দনা। আগে বলত ফুলডাঙা। এখন বদলে হয়ে গেছে চন্দনা।

বাঃ বেশ নাম। তোমরা কী কর? — অটোগ্রাফ দিয়ে খাতা দুটো ফিরিয়ে দিতে দিতে প্রশ্ন করেন শশধর।

— আজ্ঞে কলেজে পড়ি। সেকেন্ড ইয়ার।

দেবু উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে উঠল, — জানেন আমাদের গ্রামের কাছে একটা নীলকুঠি আছে। প্রায় দেড়শো বছরের পুরনো। বিরাট এলাকা জুড়ে ঠাসা জঙ্গল। তার মাঝে প্রকাণ্ড ভাঙাচোরা কুঠিবাড়ি। সাহেবদের তৈরি। এখন থাকে না কেউ। একটা মস্ত দিঘি আছে জঙ্গলে। কতকালের পুরনো সব গাছ। উঃ, দিনের বেলাতেই কুঠিবাড়ির জঙ্গলে ঢুকতে গা ছমছম করে। আমার খুব ইচ্ছে হয়, আপনাকে নিয়ে গিয়ে নীলকুঠিটা একবার দেখাই। কত যে গল্প আছে কুঠিবাড়ি নিয়ে। ভীষণ সব নাকি কাণ্ড হয়েছে ওখানে।

নীলকুঠি! দেড়শো বছরের পুরনো। ভাবেন শশধরবাবু। এমন জঙ্গলঘেরা পোড়ো তিনি কখনো স্বচক্ষে দেখেননি। যদিও গল্পে কয়েকবার বর্ণনা করেছেন। রহস্যের ফাঁদ পেতেছেন অমন বাড়িতে। একবার নিজের চোখে দেখে নিলে মন্দ হয় না। পুজো সংখ্যার উপন্যাসের জন্য খাসা একটা প্লট পেতে পারেন। ছেলেটা বাড়িয়ে বলছে না তো? তাই প্রশ্ন করেন, — ঠিক বলছ, অত পুরনো!

— আজ্ঞে হ্যাঁ। এই একটা ফোটো এনেছি আপনাকে দেখাব বলে।

দেবু ঝোলা থেকে একটা খাম বের করে। তার ভিতর থেকে একটা বিঘৎখানেক লম্বা চওড়া ফোটো বের করে দেয় শশধরবাবুর হাতে।

সত্যিই দেবুদার গ্রামের মাইল দুই দূরে একটা পুরনো নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ আছে। এখন জঙ্গল ঘেরা বিরাট এলাকা। একেবারে নির্জন। দিনে ঢুকলেও রাতে কেউ যায় না সেখানে। দেবুর এক আত্মীয় নীলকুঠির একটা ফোটোগ্রাফ তুলেছিল। তার কপি ছিল দেবুর বাড়িতে। দেবু সেটা সঙ্গে এনেছে।

ফোটোতে প্রাচীন জীর্ণ অট্টালিকার একাংশ দেখা যাচ্ছে। পিছনে পাশে ঘন গাছপালা। সত্যি রহস্যময়। বাড়িটা স্বচক্ষে একবার দেখার লোভে শশধরবাবু উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

তাঁর গল্পের ভিলেন ভিমরুল যদি আস্তানা গাড়ে ওই বাড়িতে কোনো দুষ্কর্মের উদ্দেশ্যে, সেখানে খুঁজতে খুঁজতে হাজির হবে তাঁর গোয়েন্দা রবি রায়। তারপর একটা মরণপণ লড়াই। আদর্শ জায়গা হতে পারে। শশধরবাবু খানিক আনমনা হয়ে গেলেন। একটা দারুণ প্লট বাড়িটা ঘিরে আবছাভাবে ভেসে যায় মাথায়। হুঁ, এখন শুধু জায়গাটা দেখে নিলেই জমে যাবে লেখাটা। তাঁর চটক ভাঙে দেবুর কথায়।

— ওই নীলকুঠিতে মাঝে মাঝে চোর ডাকাতেও আস্তানা গাড়ে।

তাই নাকি? — শশধর রোমাঞ্চিত।

— হ্যাঁ, এই তো বছর দুই আগে এক দল ডাকাত লুকিয়েছিল ওখানে। পুলিশ টের পেয়ে, জঙ্গল ঘিরে ফেলে ওদের ধরল। গুলিও চলেছিল। জানেন, খবরটা সাপ্লাই করে আমাদের গ্রামেরই একটা ছেলে।

বটে। কী ভাবে? — শশধর কৌতূহলী।

— আমরা তো মাঝে মাঝে ঢুকি ওই জঙ্গলে, দিনের বেলায়। অনেক ভালো ভালো ফলের গাছ আছে জঙ্গলে, — আম, জাম, সপেদা, কুল লিচু। সাহেবদের লাগানো বোধহয়। গাছে চড়ে ফল পাড়তে গিয়ে সেই ছেলেটা দেখে একটা অচেনা লোক ঢুকল কুঠিবাড়িতে। সন্দেহ হতে সে গিয়ে জানায় পুলিশকে।

জানেন একবার একটা বাঘ এসে লুকিয়েছিল কুঠিবাড়ির জঙ্গলে।

— এবার শিব মুখ খোলে।

বল কী! তারপর? — শশধরবাবু চমকান।

সে অনেক আগে। আমরা তখন ছোট। — দেবুর ঢঙেই বলে শিব জমিয়ে : একজন শিকারি এসে গুলি করে মারে বাঘটাকে, জঙ্গলে ঢুকে।

সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে শশধরবাবু বললেন, — ওখানে যাওয়ার রুটটা কী?

দেবু বলল, — বোলপুর বা সাঁইথিয়া অবধি ট্রেনে। তারপর বাস বা গাড়িতে। আবার আহমেদপুর থেকে ছোট ট্রেনও আছে। লাভপুর অবধি তাতে যাওয়া যায়। তারপর গাড়ি।

— ছোট ট্রেন?

— হ্যাঁ, ছোট লাইনের ট্রেন। ছোট গাড়ি আস্তে আস্তে চলে।

— ওঃ, বুঝেছি। ন্যারো গেজ।

ওই ট্রেনগুলো একটু স্পিড কমালে দিব্যি লাফিয়ে নামা যায়।

— দেবু জানায়।

চকিতে শশধরবাবুর মাথায় খেলে যায় — ভিমরুল ছোট ট্রেনে খুন বা ছিনতাই করে

লাফিয়ে নেমে উধাও হচ্ছে। লাইনের কাছে দাঁড় করানো মোটর সাইকেলে চেপে। ওঃ গ্র্যান্ড!

শশধরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, — ওখানে গেলে থাকব কোথায়?

— আপনি যাবেন? সত্যি? কী মজা। — দেবু গদগদ : সেসব আপনাকে ভাবতে হবে না। সব ব্যবস্থা আমরা করব। আপনাকে নিয়ে যাব। নীলকুঠি দেখাব। ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

না না, তোমরা অত হ্যাঙ্গামা করবে কেন? — শশধরবাবু মনে মনে নিশ্চিন্ত হলেও ভদ্রতা করে মৃদু আপত্তি তোলেন।

— আপনি আমাদের অতিথি হবেন, এ তো আমাদের পরম সৌভাগ্য। আশপাশের সব গাঁয়ে আপনার কত ভক্ত। একটা কাজ করি। আমাদের গাঁয়ের ক্লাবের সেক্রেটারি এখন কলকাতায় এসেছেন। ওঁকে গিয়ে ধরি। ক্লাবের তরফ থেকে আপনাকে নেমন্তন্ন করা হোক।

— উঃ আপনাকে স্বচক্ষে দেখলে ওখানকার ছোটরা যা খুশি হবে! হয়তো আপনাকে সংবর্ধনা দিয়ে ফেলবে।

না না ওসব নয়। — শশধর আপত্তি জানান : আমি যাব শুধু নীলকুঠি দেখতে।

দেবু বলল, — সে তো দেখবেনই গোটা দিন। তবে বিকেল তিনটে চারটের পর তো ওই জঙ্গলে থাকা যাবে না। অন্ধকার হয়ে যায়। সাপখোপ আছে। তখন আমাদের না হয় কিছু বলবেন।

বেশ বেশ সে তখন দেখা যাবে। — শশধরবাবু নিমরাজি হন।

শশধরকে আর এক দফা পেন্নাম ঠুকে দেবুরা বিদায় নেয়।

বেচুদা শুনে বললেন, — আবার সাহিত্যিক কী হবে?

দেবু বলল, — দু'জন থাকলে ক্ষতি কী? উনি দারুণ পপুলার লেখক। মথুরাপুর একজন এনেছিল। আমরা দু'জন আনব। প্রেস্টিজ বাড়বে।

পরদিন দেবুকে সঙ্গে নিয়ে বেচুদা এসে শশধরকে সাড়ম্বরে আমন্ত্রণ করে গেলেন চন্দনায়।

বিকেলে দেবু শিব বেড়াতে বেরল। বেচুদা গেলেন অন্য জায়গায়।

দেবুরা হাজির হল সাহিত্যিক কালীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি।

কালীকিঙ্কর প্রৌঢ় ব্যক্তি। দশাসই চেহারা। রং কালো। মোটা গোঁফ জোড়ায় মুখে কেমন রাগী রাগী ভাব। গোল সরু ফ্রেমের চশমা ঝুলে থাকে নাকের ডগায়। লুঙ্গি ও ফতুয়া পরে তিনি একখানা বই পড়ছিলেন বৈঠকখানায়। দেবু ও শিব দরজার কাছে দাঁড়াতে মুখ তুলে গম্ভীর গলায় বললেন, — কী চাই?

দেবুরা ঘরে ঢুকে তাঁকে প্রণাম করল। কালীকিঙ্করের মুখ প্রসন্ন হল না। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন।

দেবু হাত কচলাতে কচলাতে বলল, — আজ্ঞে আমরা চন্দনা গ্রাম থেকে আসছি। আপনার যেখানে যাওয়ার কথা। কলকাতায় এসেছিলাম। আপনি কেমন আছেন খবর নিতে এলুম।

চন্দনা? হুঁ। — কালীকিঙ্কর ব্যাজার মুখে বললেন : ওখানে আমার থাকার ব্যবস্থা ঠিকমতো হয়েছে তো?

দেবু হাসি মুখে বলল, —সে হয়েছে। ফাসক্লাস ব্যবস্থা। আপনি যেখানে থাকবেন, মস্ত বাড়ি। অনেক ঘর। মোটে চারজন থাকে। আর চারটে কুকুর। দুটো গরু। আর দু'জন কাজের লোক। কোনো অসুবিধা হবে না।

চারটে কুকুর? — কালীকিঙ্কর খাড়া হয়ে বসেন। চশমা ঠেলে দেন নাকের ওপর। ভুরুতে আরও জট পাকায়। তিক্ত কণ্ঠে বলেন, — সে বাড়িতে চারটে কুকুর আছে?

আজ্ঞে। — দেবু থতমত খেয়ে জানায়।

ব্যস্ ব্যস্, ওখানে আমি থাকব না। বলে দিও — কড়া গলায় জানালেন কালীকিঙ্কর।

— আজ্ঞে, ও কুকুরগুলো কামড়ায় না। শুধু কাছে কাছে ঘোরে। অচেনা লোককে একটু শুঁকে যায় বড়জোর।

না। কোনো কথা নয়। ওখানে আমি থাকব না। — দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করলেন কালীকিঙ্কর।

দেবু ভুল বলেনি। তবে 'ইতি গজ'র মতো একটু চেপে গেছে। মিত্তির বাড়িতে একজোড়া দেশি সারমেয় থাকে ঠিকই এবং তাদের দুটি ছানা। কিন্তু তারা বাড়ির ভিতর ঢোকে না। বাইরে উঠোনে থাকে।

দেবু বললে, — স্যার, তবে তো আপনার থাকার মতো আর একটা মাত্র বাড়ি আছে কিন্তু তাদেরও যে একটা কুকুর আছে।

তবে সে বাড়িতেও থাকব না। কুকুর আছে এমন বাড়িতে আমার ব্যবস্থা করা চলবে না। — কালীকিঙ্কর সাফ জানিয়ে দিলেন।

মুসকিল। আমাদের গাঁয়ে সব বাড়িতেই প্রায় কুকুর পোষে।

— দেবু মাথা চুলকোয়।

তবে ওখানে যাচ্ছি না। প্রোগ্রাম ক্যানসেলড। — কালীকিঙ্কর তেতে ওঠেন।

দেবু সহানুভূতির সুরে বলল, — বুঝেচি স্যার, আপনি কুকুর পছন্দ করেন না। আমার মামারও এমনই কেস হয়েছিল।

— তিনিও কি কুকুর দেখতে পারতেন না?

— কুকুর নয়। বাঁদর। মামা ভালো গান করেন। এক জায়গায় তাঁর গান গাইবার কথা। ফাংশনের দিন চারেক আগে জানতে পারলেন যে সেখানে পাল পাল বাঁদর ঘোরে। ব্যস মামা এক বুদ্ধি করে কাটিয়ে দিলেন। বাঁদরের কথা তো আর বলা যায় না।

কী বুদ্ধি? — আগ্রহে ঝুঁকে পড়েন কালীকিঙ্কর।

— একখানা টেলিগ্রাম ছাড়লেন সেখানে দু'দিন আগে আঙ্কল সিরিয়াস। ক্যানসেল মাই প্রোগ্রাম। সরি।

— পার্টি খোঁজ করেনি?

— করেছিল। মামা তাঁর বোনের বাড়ি লিলুয়ায় গিয়ে বসে রইলেন তিন দিন। বাড়িতে বলে গিছলেন, — বলবে অসুস্থ কাকাকে দেখতে বম্বে চলে গেছে।

হুম্। — বুদ্ধিটা কালীকিঙ্করের মনে ধরে।

কিন্তু আপনি না গেলে আমাদের প্রধান অতিথির কী হবে? — দেবু কাতরস্বরে বলে।

— সে আমি কী জানি? একে তো কোন্ ধ্যাড়ধ্যাড়ে গোবিন্দপুর। আবার কুকুরের দেশ। নেহাত গজা মানে আমার ছোটভাইয়ের জন্যে রাজি হয়েছিলুম। ফের ও রিকোয়েস্ট করতে এলে ধমকে দেব।

দেবু বলল, — আপনার প্রবলেম বুঝছি স্যার। তবে কুকুরের ভয়ের কথাটা বাইরে না

বেরুলেই ভালো। লোকে হাসাহাসি করবে। আপনি মানী লোক।

— রাইট। ঠিক বলেছ। তোমার বুদ্ধি আছে ছোকরা। ভাগ্যিস তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নইলে ওখানে গিয়ে খুব বিপদে পড়তুম।

দেবু হাতজোড় করে বলল, — সরল মনে কুকুরের কথাটা বলে ফেলেছি। স্যার এটা কাউকে বলবেন না। জানলে গাঁয়ের লোক আমাদের আস্ত রাখবে না।

না না। বলব না। — অভয় দিলেন কালীকিঙ্কর।

কালীকিঙ্করের বাড়ি থেকে বেরিয়ে শিব বলল, — তুই জানলি কী করে ওঁর কুকুরে এত ভয়?

দেবু বলল, — এই পাড়ার লোকের কাছে ওঁর সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতেই বেরিয়ে গেল। পথে কুকুর দেখলে সাত হাত দূর দিয়ে হাঁটেন। কুকুর আছে এমন বাড়িতে কক্ষনো যান না। একবার কুকুরে কামড়েছিল, ফলে চোদ্দোটা ইংজেকশন নিতে হয়। তারপর থেকে কুকুরে আতঙ্ক।

ফেরার সময় ট্রেনে দেবু বেচুদাকে বলল, — কালীকিঙ্কর যেতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

কেন? — বেচুদা অবাক।

— কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় গিছলাম কাল। এক বইয়ের দোকানে বলাবলি করছিল যে কালীকিঙ্করবাবুর কোনো আত্মীয়ের ভারি অসুখ। খুব ব্যস্ত আছেন।

খেয়েছে! — দেবু চিন্তিত।

ঘাবড়াচ্ছ কেন? — দেবু সাহস দেয় : শশধর ধরকে প্রধান অতিথি বানিয়ে দেব তাহলে। কিছু খারাপ হবে না।

ফাংশানের তিনদিন আগে বেচুদার নামে কালীকিঙ্করের টেলিগ্রাম এল, — আঙ্কল সিরিয়াস। নট গোয়িং চন্দনা। সরি।

বেচুদা টেলিগ্রামটা প্রথমে দেখালেন দেবুকে।

দেবু বলল, — যা ভেবেছি। আটকে গেছেন। আপনি আর ননীকে সাধাসাধি করবেন না। শশধর ধর তো থাকছেন।

টেলিগ্রাম দেখে ননী শুকনো মুখে বলল, — কাকাকে জানাই?

কোনো দরকার নেই। — বাধা দেন বেচুদা : বাড়িতে অসুবিধা। জোর করা উচিত নয়।

— কিন্তু প্রধান অতিথি?

— সে যাহোক ম্যানেজ করতে হবে।

১ মার্চ। দুপুর। একখানা মোটর এসে থামল চন্দনায়। নামলেন বিখ্যাত গায়ক দূরদর্শন এবং বেতার শিল্পী গোরাচাঁদ মল্লিক। তাঁর সঙ্গীও হেলাফেলার নয়। মিন্টু সাহা। রেডিও আর্টিস্ট।

ক্লাবের অভ্যর্থনা কমিটি এগিয়ে এল গাড়ির কাছে। কলকাতার দুই বিখ্যাত শিল্পীকে দেখে কমিটি মেম্বাররা অবাক হলেন। তাদের চেহারা চুল জামাকাপড় শিল্পীসুলভ শৌখিন বটে কিন্তু উভয়েরই হাতে ছিপ কেন?

বেচুদা আনতে গিয়েছিল গোরাচাঁদ ও মিন্টু সাহাকে। অন্যদের দায়সারা নমস্কার ঠুকে গোরাচাঁদ বললেন বেচুদাকে, — আজ কি বসা যাবে?

বেচুদা বললেন, — না স্যার। আজ বসতে বসতে বেলা পড়ে যাবে। চার ফেলে মাছ টানতে খানিক সময় লাগে। কাল সক্কালে বসব।

— বেশ। তবে পুকুরটা একবার দেখে নিই।

চলুন। — বেচুদা অতিথিদের নিয়ে এগোল। গ্রামের অন্যরা একটু ক্ষুণ্ণ হলেন আলাপ করতে না পেরে।

ঘণ্টাখানেক বাদে পৌঁছলেন শশধর। সংগীত শিল্পীদের নামিয়ে দিয়ে গাড়ি চলে গিছল ধরমশাইকে আনতে।

শশধর খুব মেজাজে আছেন। ছোট লাইনের ট্রেনে চড়ে দারুণ লেগেছে। অবশ্য লাভপুর অবধি যাননি। মাঝামাঝি নেমে মোটরে ওঠেন। নইলে দেরি হয়ে যেত চন্দনায় পৌঁছতে। দেবু ও শিব তাঁকে আনতে গিয়েছিল।

শশধরের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিশাল এক ছোটদের দঙ্গল তাঁর গাড়ি ঘিরে ফেলে। শশধরবাবু নামলেন তড়বড় করে। পরনে চাপা পাজামা ও রঙিন পাঞ্জাবি। কাঁধে ঝুলছে ক্যামেরা।

এমন ভক্ত সমাগমে শশধর অভ্যস্ত। সস্নেহ দৃষ্টি ছুড়ে দিলেন ছোটদের দিকে। চন্দনা স্পোর্টিংয়ের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করলেন। তারপর দেবুকে বললেন, — চলো নীলকুঠিটা একবার দেখে আসি। ফিরে এসে চা-টা খাব। তাঁর আর তর সইছে না।

দেবু শিবুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি হাঁটা দিলেন। গ্রাম ছাড়িয়ে, মাঠ পেরিয়ে, নীলকুঠির দিকে। দেখে চন্দনার লোক হাঁ। সাহিত্যিকরা খেয়ালি হয় বটে।

নীলকুঠির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে দেবুরা। দেখায় — ওই যে।

ধু ধু মাঠের মাঝে একখণ্ড জমাট অরণ্য। দেখে, শশধরবাবু মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বললেন, — এখন তো ঢোকা রিস্কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। — জানায় দেবু।

— তাহলে কাল সক্কালে ঢুকব। তোমরা আসবে তো সঙ্গে?

— ওই শিব যাবে। আমার একটা কাজ আছে। এই নীলকুঠি আর জঙ্গল শিবের দারুণ চেনা। ওর চেয়ে ভালো গাইড পাবেন না।

সকাল হতেই কলকাতার অতিথিরা দু'দিকে রওনা দিলেন।

সকাল ন'টা নাগাদ বেচুদাদের শ্যামপুকুরে ছিপ ফেলেছিলেন গোরাচাঁদ এবং মিন্টু সাহা। উপস্থিত ছিলেন ভোলানাথ সাধুখাঁ। গ্রামের তিনি সেরা মেছুরে। গোটা অঞ্চলে তাঁর নামডাক। আশ্চর্য সব চার এবং টোপ জানেন। বেশিরভাগই তাঁর নিজের আবিষ্কার। দীর্ঘদিনের সাধনায়। সে সব গোপন বিদ্যা কাউকে ফাঁস করেন না।

প্রৌঢ় ভোলানাথ রাশভারী মানুষ। পাকানো মোটা গোঁফ এবং এক মাথা ধবধবে চুল সমেত লম্বা দোহরা গড়ন। কথা বলেন খুব কম।

বেচুদার একান্ত অনুরোধে তিনি শ্যামপুকুরে চার ছড়িয়েছেন। গোরাচাঁদদের বঁড়শিতে টোপ লাগিয়ে দিচ্ছেন। তারপর খানিক দূরে বসে বসে গম্ভীরভাবে দেখছেন কলকাতার বাবুদের কেরামতি।

দেবুও রয়েছে সেখানে। অতিথিদের তদারকি করছে।

দু ঘণ্টা কাটল।

গোরাচাঁদের ছিপে একটিও মাছ উঠল না।

এদিকে মিন্টু সাহা একটা মাছ তুলে ফেলল। প্রায় আধ কিলো ওজন। আনন্দে মিন্টু দিশাহারা। এত বড় মাছ সে কখনো ধরেনি।

গোরাচাঁদের মুখ থমথমে।

ভোলানাথ হঠাৎ উঠে গটগট করে ফিরে চললেন পুকুর পাড় ছেড়ে। দেবু অমনি দৌড়ল ভোলাদার পিছু পিছু।

দেবু কাছে যেতেই ভোলানাথ গোঁফের ফাঁকে চাপা গর্জন ছাড়েন, — কোত্থেকে সব আনাড়ি জুটিয়ে এনেছিস? ফাতনা ডোবার কামাই নেই। টোপের ভোজ খাচ্ছে মাছগুলো। একটা টানও কি ঠিক মতো মারতে পারে না? আবার মাছ ধরার শখ আছে। আমি আর এই ছেলেখেলায় নেই। চললাম।

দেবু হাতজোড় করে তাঁর পথ আগলে বলল, — প্লিজ ভোলাদা, রাগ করবেন না। সত্যি এরা কিসসু জানে না। আসলে গাঁইয়ে মানুষ। এই একটা শখ খুব। তবে চর্চা নেই। কিন্তু একটাও মাছ না পেলে যে গোরা মল্লিকের মুড খারাপ হয়ে যাবে। হয়তো গাইবে না ভালো করে। তোমার নাম করে, বড় মুখ করে বলে নিয়ে এসেছি, ঠিক একটা বড়সড় মাছ ধরিয়ে দেব। সেই লোভেই এসেছে। প্রায় বিনা দক্ষিণায়। নইলে কি আর এত নামী গাইয়েকে এই অজ পাড়াগাঁয়ে আনা যেত? উনি ভালো করে না গাইলে গাঁয়ের সম্মান যাবে। মথুরাপুর হাসবে।

মথুরাপুর হাসবে? বটে। — ভোলানাথ কটমট করে তাকিয়ে থাকেন।

— হ্যাঁ ভোলাদা। আপনি একটু চেষ্টা করলে ঠিক পারবেন। এই কেজি খানেকের যদি একটা উঠে যায় গোরা মল্লিকের ছিপে। ব্যস্।

— ভোলানাথ খানিক গুম মেরে থেকে বললেন, — বেশ করব চেষ্টা। এখন ওদের ছিপ গুটিয়ে চলে যেতে বল। ঘণ্টা দুই বাদে এসে ফের বসবেন। ভোলানাথ হনহন করে চলে গেলেন নিজের বাড়ি।

দেবু গিয়ে গোরাচাঁদকে বলল, — আপনারা এখন চলুন। চান খাওয়া করবেন। ঘণ্টা দুই বাদে ফের এসে বসবেন। ভোলাদা আরও কড়া ডোজের চার আর টোপের ব্যবস্থা করবেন বলে গেছেন। দেখবেন তখন ঠিক মাছ উঠবে।

গোরাচাঁদ উঠলেন বটে, তবে আষাঢ়ে মেঘের মতন মুখ। কোনোও কথা নেই। দেখে প্রমাদ গোনে দেবু। মিন্টু সাহা কিন্তু বেজায় খোশমেজাজ। যেন রাজ্য জয় করে ফেলেছে। ওর মাছটা জিয়ানো রয়েছে পুকুরে। ঘাড়ের কাছে শক্ত সুতো বেঁধে, সুতোর অপর প্রান্ত খুঁটিতে বেঁধে মাছটাকে জলে ছেড়ে রেখেছে দেবু। পুকুরধারে জলে। কাল যাওয়ার সময় তুলে নিয়ে যাবে। এখন জল থেকে তুললে খানিক বাদেই মরে যাবে। কাল আর গোটা মাছ হাতে বাড়ি ফেরা হবে না। আগেই পচে যাবে মাছ। তাই এই ব্যবস্থা।

গোরা মল্লিক এবং মিন্টু সাহা ফের শ্যামপুকুরে ছিপ ফেলল দুপুর প্রায় দেড়টায়।

দেখা যাক শ্রীশশধর ধর ইতিমধ্যে কী করছেন? সকাল আটটায় শশধরবাবু নীলকুঠির জঙ্গলে ঢুকেছিলেন। সঙ্গে ছিল শিব এবং শিবের শাকরেদ রতিয়া। রতিয়ার হাতে একটা বড় ধারালো কাটারি। শিবের হাতে একটা লম্বা বাঁশের লাঠি।

জঙ্গলে ঢুকেই শশধরবাবু থ।

এ যেন আলাদা এক জগৎ। কী নির্জন ছমছমে পরিবেশ। প্রাচীন সুউচ্চ সব মহীরুহ আকাশ ঢেকে ডালপালা মেলেছে। মোটা মোটা লতা জড়িয়ে উঠছে গাছে। বড় বড় গাছের তলায় ঘন ঝোপঝাড়। বুনো গাছের সঙ্গে মিশে আছে কত ভালো ভালো ফলের গাছ। পোড়ো কুঠিবাড়ি ঘিরে অন্তত বিঘে দশকের জঙ্গল। এই জঙ্গল যা একসময় বাগান ছিল, ইটের পাঁচিলে ঘেরা। তবে এখন সে পাঁচিল ভেঙে গেছে বেশিরভাগ জায়গায়।

এখানে প্রাণীর অভাব নেই। কত রকম আওয়াজ কানে ভাসছে। পাখির কূজন। নানান কীটপতঙ্গের ডাক। গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায়, গাছের তলায় ঝোপের ভিতর কেবলই খসখস সরসর ধ্বনি। অদৃশ্য জীবের চলাফেরার শব্দ।

শিব জানাল যে সন্ধের পর এ জঙ্গলে কেউ ঢোকে না। ধারে কাছেও কেউ মাড়ায় না এ অঞ্চলের লোক। দিনের বেলাও কদাচিৎ কেউ কুঠিবাড়ির জঙ্গলে ঢোকে।

তবে আশেপাশের গ্রামের ডাকাবুকো ছেলেরা ভয় তুচ্ছ করে এবং বাড়ির লোকের নিষেধ অগ্রাহ্য করে মাঝে মাঝেই এই জঙ্গলে হানা দেয়, মুখরোচক ফলের লোভে।

সাহেবরা চলে গেছে প্রায় একশো বছর আগে। তারপর কয়েকবার হাত বদল হয়ে এই সম্পত্তির মালিক এখন রামপুরহাটের মুখুজ্যেরা। অনেক শরিকের ভাগ। ফলে কেউ এদিকে নজর দেয় না। দিনে দিনে তাই কুঠিবাড়িতে জঙ্গল বাড়ছে। জায়গাটা ভূতুড়ে হচ্ছে। পাহারাদার নেই তাই যে খুশি জঙ্গলে ঢোকে, গাছের ফল পাড়ে।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে শুঁড়ি পথ বেয়ে কুঠিবাড়ির দিকে এগিয়ে চলল তারা। সামনে চলেছে রতিরা। কাটারির কোপে পথ সাফ করতে করতে। উড়িয়ে দিচ্ছে কাঁটাগাছ, বিছুটির ডাল। তীক্ষ্ণ নজর রাখছে পথে সাপখোপ যদি পড়ে? মাঝে শশধরবাবু। পিছনে শিব। এমন জায়গায় সশস্ত্র সঙ্গী পেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করেন শশধরবাবু।

তারা কুঠিবাড়িতে পৌঁছয়। প্রকাণ্ড বাড়ি ছিল। দোতলা। ইট বের হওয়া চওড়া দেয়ালগুলো আজও খাড়া রয়েছে। তবে বেশিরভাগ ঘরের ছাদ ভেঙে পড়েছে। পাকা মেঝে ফেটে আগাছা ও ঘাস জন্মেছে। কোথাও ভাঙা ইটের স্তূপ।

শশধরবাবু রোমাঞ্চিত উত্তেজিত। উঃ এমনটা সত্যি তিনি কল্পনা করেননি। ক্যামেরা দিয়ে নানান অ্যাঙ্গেলের অনেকগুলো ফোটো নিলেন কুঠিবাড়ির। তুললেন জঙ্গলের ছবি। উঁকিঝুঁকি মারলেন অট্টালিকার ভিতরে। ভিতরে ঢুকতে মানা করে শিব। বিষাক্ত সাপ আর বিছের ডিপো এই বাড়ি।

কাঁধের ঝোলা থেকে বাঁধানো খাতা বের করে ঘন ঘন নোট নিচ্ছেন শশধরবাবু। কুঠিবাড়ি সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন শিবদের।

জঙ্গলের মাঝে মস্ত এক পুকুর। তার চারদিকে বাঁধানো ঘাট। কালচে সবুজ নিথর জল। গাছের ছায়া পড়েছে জলে। পুকুরের জলে কয়েক জায়গায় শালুক বন। গোল গোল পাতা ভাসছে। জলের ওপর মাথা তুলে আছে প্রচুর কুঁড়ি আর লাল পাঁপড়ি মেলা শালুক

ফুল। পুকুরের কিনারে বড় বড় ঘাস আর নানান শাকের ঝাড়। দিঘিরও ফোটো নিলেন শশধরবাবু।

বহু শুঁড়ি পথ জঙ্গল ভেদ করে গেছে নানান দিকে। ঘুরতে ঘুরতে মাঝে মাঝে জিরোচ্ছেন শশধরবাবু। জল খাচ্ছেন। গুমোট গরমের দিনে এমনি ঘুরতে ঘুরতে বেলা বারোটা নাগাদ বেদম হয়ে পড়লেন শশধর ধর। পা ছড়িয়ে বসলেন মাটিতে গাছে ঠেস দিয়ে।

এই সময় শিব দেবুর শেখানো প্ল্যানটা কাজে লাগাল। বলল শশধরবাবুকে — নীলকুঠির গল্প আমরা আর কী জানি? জানে বটে রহিমচাচা। কত গপ্পো যে ওঁর স্টকে আছে।

কে রহিমচাচা? — শশধর কৌতূহলী হন।

— আমাদের গাঁয়ে থাকেন। এই নীলকুঠির নাড়িনক্ষত্র জানেন। রহিমচাচার পূর্বপুরুষ ছিল নীলকুঠির কর্মচারী। শুনেছি, এই নীলকুঠিতে আছে চোরকুঠুরি, গুপ্তপথ। কত যে গুম খুন হয়েছে। গুপ্তধনও পাওয়া গেছে। সে সব গপ্পো রহিমচাচার মুখ থেকে শুনতে হয়। চাচা যা বর্ণনা দেয়, ওফ্। ভয়ংকর সব কাণ্ড ঘটেছে এখানে। আমি কিছু কিছু শুনেছি। তবে অত ডিটেলস্ জানি না।

বিষম আগ্রহে শশধর বললেন, — তোমাদের রহিমচাচার সঙ্গে দেখা করতে চাই। একটু ব্যবস্থা কর ভাই।

শিব বলল, — সেই সন্ধ্যার আগে তো চাচার সাথে দেখা হবে না। লাভপুরে যান চাকরি করতে। ফেরেন সন্ধ্যায়।

— তাহলে উনি গাঁয়ে ফিরলেই আমায় তার কাছে নিয়ে যাবে। অথবা তিনি যদি আমার কাছে আসেন।

শিব চিন্তিত ভাবে বলল, — চাচা ভারি মেজাজি মানুষ। সহজে নীলকুঠি নিয়ে মুখ খুলতে চান না। তবে একবার খুললে দারুণ।

দেখো ভাই চেষ্টা করে। — শশধর উদগ্রীব। এই দুর্দান্ত ব্যাকগ্রাউন্ডে রহিমচাচার কিছু গল্প নিজের মতো ঘষামাজা করে ভিমরুল বনাম রবি রায়ের কাণ্ডকারখানা বলে চালিয়ে দিলে কয়েকখানা রোমহর্ষক উপন্যাস নামিয়ে দেওয়া যাবে।

হঠাৎ শিব লাজুক হেসে বলল, — স্যার, একটা কথা বলব? মানে অনুরোধ।

কী? — শিবের এই সঙ্কুচিত ভাব দেখে অবাক হন শশধর। এই শক্ত সমর্থ সপ্রতিভ ডানপিটে ছেলেটিকে তাঁর বেশ লেগেছে।

শিব বলল, — আমাদের গাঁয়ে একটা সভা হবে আজ বিকেলে। আপনি যদি প্রধান অতিথি হন? বলতে পারেন, আপনার অনারেই এই সভা।

কী রকম? — শশধর জানতে চান।

মানে আমাদের ক্লাবের দশবছর পূর্তি উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠান হওয়ার কথা হচ্ছিল। আপনি এসেছেন দেখে ক্লাবের মেম্বাররা ঝটপট সেই সভা লাগিয়ে দিয়েছে। যাতে আপনাকে বক্তা হিসেবে পাওয়া যায়। এখানকার দশ গাঁয়ের লোক আপনার ভীষণ ভক্ত। তারা আপনাকে একটু দেখতে চায়, কথা শুনতে চায় আপনার। আমাকে বলেছে, ক্লাবের তরফ থেকে আপনাকে অনুরোধ জানাতে।

— না না এসব ঝামেলা কেন? আমি তো আগেই বলেছি যে শুধু নীলকুঠি দেখার প্রোগ্রাম। তোমার রহিমচাচার সঙ্গে কথাবার্তা হলেই আমার প্রোগ্রাম শেষ।

আজ্ঞে রহিমচাচার মুখ খোলাতেই তো আপনার মঞ্চে উঠে কিছু বলা দরকার। — জানায় শিব।

— কেন?

— কারণ? রহিমচাচার নাতি বাহাদুর আপনাকে দেখবে বলে, আপনার সাহিত্য জীবনের দুটো কথা শুনবে বলে কাল থেকে ছটফট করছে। ক্লাস নাইনে পড়ে। আপনার সাংঘাতিক ফ্যান। ভাবছি, বাহাদুরকে দিয়ে রিকোয়েস্ট করাব চাচাকে, নীলকুঠির গল্প বলতে। তাহলে আর চাচা না করতে পারবে না।

শশধরবাবু ভেবে দেখলেন, এখন আর নীলকুঠি দেখার কিছু নেই। এবার শুধু রহিমচাচার গল্প বাকি। তাহলেই সোনায় সোহাগা। যদি সভায় প্রধান অতিথি হলে রহিমচাচার গল্প শোনা নিশ্চিত হয়, আপত্তির কী? তিনি বললেন, — সভা কটায়?

— আজ্ঞে চারটেয়।

— কখন শেষ হবে?

— সন্ধের আগে।

— ফিরে এসে গল্প শোনা যাবে তো?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। চাচাকে আমরা বলে রাখব।

অলরাইট। বলে দিও প্রধান অতিথি হব। — জানালেন শশধর।

শিবের হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে ওঠে ফুর্তিতে। বলে, — এখন তবে ফেরা যাক। দুপুরে রেস্ট নেবেন। বিকেলে সভা।

হুঁ চল। — শশধরবাবু ফিরলেন সদলে।

শিব রহিমচাচা সম্বন্ধে একটু চেপে গেছে।

রহিমচাচার পূর্বপুরুষ নীলকুঠিতে কাজ করত, এটা ঠিক। তাঁর নাতি বাহাদুর, এটা ঠিক। বাহাদুর শশধরের পরম ভক্ত, এটাও ঠিক। তবে রহিমচাচা নীলকুঠি সম্বন্ধে মুখ খোলেন না সহজে, এটা ঠিক নয়। নীলকুঠি নিয়ে অজস্র গল্প ফাঁদা রহিমচাচার নেশা। একবার প্রসঙ্গটা তুললেই হল। রহিমচাচা গল্প শুরু করবেন। যা বলেন, তার বেশিরভাগটাই যে রং চড়ানো, এটা বোঝে গাঁয়ের লোক। তবে বলে দারুণ। রীতিমতো অ্যাকটিং করে। সে সব ভয়াবহ কাহিনি শুনলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়।

ভোলানাথ সাধুখাঁ এবার আর দূরে রইলেন না। গোরাচাঁদের পাশে বসে নির্দেশ দিয়ে চলেন, যখন বলব ঠিক তখন ছিপে টান মারবেন। আগে নয়। পরে নয়। যা যা বলব ঠিক তাই করবেন। বেশি জোরে হ্যাঁচকা নয় মাঝারি টান।

ভোলানাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গোরাচাঁদের ফাতনার ওপর রেখে অপেক্ষা করেন।

সহসা ভোলানাথ চাপা হুংকার দিলেন, — টানুন।

অমনি ছিপে টান দিলেন গোরাচাঁদ।

অমনি বঁড়শিতে গেঁথে একটা মস্ত মাছ লাফিয়ে ওঠে জলের ওপর। তারপর সে জলে ডুবে

ছুট দিল। সরসর করে হুইলের সুতো ছোটে। ভোলানাথ নির্দেশ দিতে থাকেন, — ছাড়ুন ছাড়ুন — এবার আস্তে। আস্তে। ব্যস ছাড়া বন্ধ — এবার টানুন। টানুন। আবার ছাড়ুন। টানুন। গুটোন গুটোন...।

এইভাবে ভোলানাথের হুকুম মতো সুতো ছাড়া-টানা-ছাড়া-টানা করতে করতে ক্রমে হুইলের সুতো গুটিয়ে গুটিয়ে মাছকে এনে ফেলা হল পুকুরের ধারে। দেখা গেল স্বল্পজলের স্বচ্ছতায় মস্ত একটা লালচে রুই মাছ। বঁড়শিবন্দি ক্লান্ত মাছটা ধীরে ধীরে সাঁতরাচ্ছে।

ভোলানাথ ঝপ্ করে জলে নেমে একটা হাত-জাল দিয়ে মাছটাকে ছেঁকে তুললেন। তারপর দু'বার ঝাঁকিয়ে হেঁকে বললেন প্রায় আড়াই কিলো। কী মশাই, গোটাটা বাড়ি নিয়ে যাবেন না, খাবেন কেটেকুটে ভেজে?

গোরাচাঁদ নিজের কীর্তিতে এমন স্তম্ভিত হয়ে গেছলেন যে তাঁর মুখে কিছুক্ষণ বাক্য সরে না।

কী বলুন? — তাড়া দেন ভোলানাথ। মাছ তখন ছটফট করছে জালে।

আজ্ঞে গোটা নেব। — গোরাচাঁদ থতমত খেয়ে জবাব দেন। ভোলানাথ চটপট বঁড়শি খুলে মাছটাকে ঘাড়ের কাছে শক্ত সুতো দিয়ে বেঁধে তাকে জলে ছেড়ে দেয়। ছোট মাপের সুতোটার অন্য প্রান্ত বাঁধা হয় পুকুর পাড়ে একটা গাছের গুঁড়িতে।

একটা ফোটো তুলতাম মাছ নিয়ে। — গোরাচাঁদ আবেদন জানান।

আজ নয় কাল। কাল যত খুশি ফোটো খিঁচবেন। ভোলানাথ দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করলেন : এই দেবু, কাল মাছটাকে জল থেকে তুলে দিস। আর তখন ফোটো তোলাস। ব্যস, আজ আর মাছ মারা নয়। আমার এই টোপ এক মৎস্যঘাতিনী। দিনে একটা মরবেই। বেশি মারা গুরুর নিষেধ। বলেই ভোলানাথ ঘরমুখো রওনা দিলেন। বোধহয় এই আনাড়িদের কবল থেকে নিস্তার পেতে।

গোরাচাঁদ মল্লিক জলের মধ্যে সঞ্চরমাণ নিজের বিস্ময়কর শিকারটির পানে অনেকক্ষণ মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থেকে দেবুকে ডেকে নিয়ে আড়ালে গেলেন। অতঃপর বললেন, — ভাই, ভোলাবাবুর এই চার আর টোপের ফর্মুলাটা আমায় জোগাড় করে দিতে পারবে? ওঃ ওয়ানডারফুল।

দেবু ইতস্তত করে বলল, — পেতে পারেন, তবে আগে আপনাকে গান গেয়ে ভোলাদাকে ভেজাতে হবে। উনি গান পাগল। বিশেষত রবীন্দ্রসংগীত আর নজরুলের গান।

আজ একটা সভা হবে গ্রামে। আমাদের ক্লাবের দশবছর পূর্তি উৎসব। ভোলাদা যাবেন সভায়। চলুন, সেখানে গান শোনাবেন আপনারা দুজনেই। গান শুনে খুশি হলে ভোলাদার থেকে ফর্মুলা পাওয়া অসম্ভব হবে না।

গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি বললেন, — মিন্টুকে কিন্তু এই ফর্মুলার কথা বলার দরকার নেই।

কিন্তু উনি গাইবেন তো? — দেবুর প্রশ্ন।

— আলবাত গাইবে। আমি বললে গাইতেই হবে। তাছাড়া ও জীবনে কখনো হাফকিলো মাছ ধরেছে? গুরুদক্ষিণা দেবে না ভোলাবাবুকে? সভা কটায়? বেচুবাবু ওখানে থাকবেন কি?

— বেচুদা থাকবেন বইকি। গ্রামের প্রায় সবাই থাকবে। বিকেল চারটেয় সভা। চলুন চা-টা খেয়ে নিয়ে যাবেন।

চলো। দেখি তোমাদের ভোলাদাকে ভিজতে পারি কিনা?

— গোরাচাঁদ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

চন্দনা ক্লাবের দশক পূর্তি অনুষ্ঠান ঠিক সময়েই শুরু হয়েছিল। প্রধান অতিথি শশধর ধর পাঁচ মিনিট আগেই উপস্থিত হয়েছিলেন।

সভাপতি ও প্রধান অতিথি বরণের সময় ছোট্ট ফুটফুটে একটি মেয়েকে নিয়ে থালায় মালা চন্দন হাতে মঞ্চে উঠেছিল রানু। ননীর ওপর চটেছিল বেচুদা। কালীকিঙ্কর আসেননি। সুতরাং ননীও বাদ।

গোরাচাঁদ ও মিন্টু সাহার সভায় হাজির হতে আধঘণ্টাটাক লেট হল। তাতে কী? চটাপট হাততালির মাঝে তাঁরা মঞ্চে আসন নিলেন। বেচুদা সগৌরবে ঘোষণা করলেন কলকাতার এই দুই প্রখ্যাত শিল্পীর পরিচয়।

একটির পর একটি প্রোগ্রাম চলে।

এলো কবিতা কম্পিটিশনের প্রাইজ দেওয়ার পালা।

বেচুদা একখানা সিল বন্ধ খাম নিয়ে মঞ্চে উঠে ঘোষণা করলেন, আমাদের বিচারক কবিশেখর সত্যসাধন রেজাল্ট পাঠিয়েছেন। সকলের সামনে তা খোলা হবে। উনি প্রশংসা করে জানিয়েছেন যে সাত-আটটি কবিতা বেশ উঁচু মানের ছিল। তাদের মধ্য থেকে তিনটি স্থান নির্ণয় করা হয়েছে।

বেচুদা খাম খুললেন।

ইতিমধ্যে হাসি হাসি মুখে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ননী। সে জানে, তার ফার্স্ট প্রাইজ বাঁধা।

বেচুদা কবিশেখরের লেখা দেখে ঘোষণা করলেন : প্রথম : সিরাজুল শেখ। দ্বিতীয় : ভোম্বল দাস। তৃতীয় : বটকৃষ্ণ হাজরা।

হই হই উঠল সভায়। হাততালি ও উল্লাসধ্বনি।

ননীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল।

সভা ভঙ্গের পর শিব রহিমচাচাকে হাজির করে দিল শশধর ধরের কাছে। আর দেবু গোপনে গোরাচাঁদকে দিয়ে এল ভোলাদার চার ও টোপের স্পেশাল ফর্মুলা। অবশ্য যে ফর্মুলার জোরে ভোলাদা দশ মিনিটের মধ্যে গোরাচাঁদের বঁড়শিতে মাছ খাইয়েছিলেন, সেটা দেওয়া হয়নি। অনেক হেরফের করা আছে। তবে তাই কলকাতার আনাড়িদের পক্ষে যথেষ্ট।

সে রাতেই শিব ধরল দেবুকে, — বটকেষ্ট কবিতায় থার্ড! ইম্‌পসিবল। আমি জানি না ওর দৌড়? তুই লিখে দিয়েছিস? ও তোর বাড়ি গিছল লুকিয়ে। কবিতা জমা দেওয়ার দুদিনে আগে। তোর বোন আমায় বলেছে। কেন?

দেবু মিচকে হেসে বলল, — দূর আমি কি কবিতা লিখি? সেই কবে ছেড়ে দিয়েছি। পরখ করে দেখলাম, কার এলেম বেশি? ননীর মামার, না কামিনীদার? তা কামিনীদা ননীর মামাকে তো একদম আউট করে দিলেন।

— কে কামিনীদা?

— চন্দননগরে থাকেন। আমার পিসতুতো দাদার বন্ধু। একেবারে স্বভাব কবি। দিনে পাঁচ-ছ'খানা যে কোনোও সাবজেক্টে ফাসক্লাস পদ্য নামিয়ে দেওয়া ওঁর কাছে নস্যি।

তার মানে কী, সিরাজ ভোমলা বটর কবিতা তোর কামিনীদার লেখা? — শিব জানতে চায়।

আজ্ঞে হ্যাঁ। ননীর মামা থাকতে পারে। আমাদের কি কেউ নেই? — মুচকি হেসে জানায় দেবু।

পরদিন সকালে কলকাতার অতিথিরা বিদায় নিলেন। তিনজনই একসঙ্গে মোটরে যাবেন বোলপুর। সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতা। বেচুদা সঙ্গে যাচ্ছে।

যাওয়ার আগে শশধর ধর ফুর্তিতে দেদার অটোগ্রাফ বিলোলেন। রহিমচাচার গল্পে তাঁর তিনখানা নোট বই ভর্তি হয়ে গেছে।

গোরাচাঁদ ও মিন্টু সাহা ছিপ হাতে, গোটা গোটা মাছ থলিতে ভরে সগৌরবে মোটরে উঠলেন। মিন্টু সাহার ক্যামেরায় ভরা রিলে ধরা আছে জলজ্যান্ত শিকার নিয়ে তাদের দু'জনের ফোটো।

চন্দনা ক্লাবের দশকপূর্তি অনুষ্ঠান চমৎকার উতরেছে। গ্রামের সবাই খুশি। শুধু দু-চারজন বাদে।

[১৯৯১, কিশোর ভারতী শারদীয়া]

ফ্যাসাদ

এক

বৈশাখের দুপুর। অশ্বত্থ গাছের গোড়া ঘিরে বাঁধানো প্রিয় বেদিটিতে বসেগাছে ঠেস দিয়ে একটা গল্পের বই পড়ছিল দেবু। মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিল চারপাশে। শিব এখনো এল না যে? তিনটে নাগাদ আসবে বলেছিল। ঝাঁ ঝাঁ রোদ। গ্রামের পথ এখন জনহীন। আজকেই একটা কিছু ঠিক করা চাই। ফাইনাল। বৃথা সময় বয়ে যাচ্ছে।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে দিন পনেরো আগে। দেবু শিব দুজনেই পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষার খাটুনি আর কয়েকমাস নাগাড়ে পড়াশুনার একঘেয়েমি কাটাতে সপ্তাহখানেক তারা স্রেফ ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। তারপরই শুরু হয়েছে অস্থিরতা। দুজনে ছটফট করছে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছেয়। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? তাই নিয়ে আর কিছুতেই মতে মিলছে না দুজনের।

শিবের ইচ্ছে কলকাতা। বছর তিনেক আগে শিব একবার কলকাতা গিয়েছিল চার দিনের জন্য। ওই ক'টা দিনে ওই বিরাট শহরের কতটুকুই বা দেখা হয়েছে? বীরভূম জেলার ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে তাদের গ্রাম। মাঝেসাঝে দু চারটে উত্তেজনার স্বাদ মিললেও জীবন এখানে প্রায় নিস্তরঙ্গ। খবরের কাগজে প্রতিদিনই কলকাতা সম্বন্ধে কত্ত খবর থাকে। কত আকর্ষণের রসদ! শিবের এক মামা থাকেন কলকাতায়। দুই বন্ধু অনায়াসে সেখানে কাটাতে পারে কিছু দিন। মামাতো ভাই শিবেরই বয়সি। সেই তাদের ঘুরিয়ে দেখাবে।

কিন্তু দেবুর লক্ষ্য আরও দূরে। কাশী অর্থাৎ বারণসী। তাদের বেড়ানোর সুযোগ হয় কদাচিৎ। যদি বেরোতেই হয় দূরে যাই। লম্বা পাড়ি। বাংলার বাইরে পা দেওয়ার স্বাদ। ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখতে দেখতে যাব কেমন বদলে যাচ্ছে প্রকৃতির রূপ, মানুষজনের ধরনধারণ, চেহারা। কলকাতা তো পরেও দেখা যাবে অনায়াসে। আর কাশীর সঙ্গে কলকাতার তুলনা হয়? ধুর ধুর। কলকাতা কাশীর কাছে বয়সে স্রেফ শিশু। মাত্র শতিনেক বছরের কলকাতা। আর কাশীর বয়স অন্তত কয়েক হাজার। দেবু কখনো যায়নি কাশী। তবে গল্প শুনেছে সেখানকার। দেবুর এক দাদু বাস করেন কাশীতে। এখানে এসেছিলেন গতবছর। তাঁর মুখে শুনেছে কাশীর বর্ণনা। মুগ্ধ হয়েছে।

বিচিত্র সে নগর। অতি প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। শিবকে রাজি করাতেই হবে। কাশীর বিখ্যাত কুলপিমালাই,কচুরি আর পেঁড়ার টোপেই ঘায়েল হবে পেটুক শিব। এখন যত তাড়াতাড়ি বেরোনো যায়।

বেড়াতে যে যাবে তারা সে আভাস দু'জনেই দিয়ে রেখেছে বাড়িতে। তাদের বাড়িও অরাজি নয়। এখন শুধু গন্তব্যস্থানটির ঘোষণার অপেক্ষা।

দেখা গেল শিব আসছে।

শিব এসে দেবুর পাশে বসল। তার সদা হাসিহাসি মুখ কেমন গোমড়া। কিছু একটা ঘটেছে। দেবু আড়চোখে নজর রেখে পকেট থেকে হজমিগুলির শিশি বের করে শিবের দিকে এগিয়ে দিল। শিব যথারীতি কয়েকটা হজমিগুলি নিয়ে ফেলল মুখে, কিন্তু তার থমথমে ভাবটা কাটল না। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বিড় বিড় করল— আমার কিস্‌সু হবে না। হোপলেস।

দেবু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

শিব ফের বলে চলে,— আমি একটা অলস। ঘরকুনো। ভিতু। ও! ভাব দেখি, কী বিশাল এই জগৎ। আর কী বিচিত্র!

দেবু বলল, — হুম্।

— কিন্তু তার কতটুকু আমি দেখেছি? এই ভারতবর্ষের? এমনকী আমাদের আশপাশের মানুষজন প্রকৃতি। নাঃ আমিও বেরব। কেউ আটকাতে পারবে না আমায়।

দেবু বলল,—কী ব্যাপার?

শিব খানিক গুম মেরে থেকে বলল,— সকালে লাভপুরে গিছলাম একটা জিনিস কিনতে। ওখানে বলাই দাসকে দেখে এলাম।

—বলাই দাস? মানে যে যুবকটি সাইকেলে ভারত পর্যটন করছে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ সেই।

বলাই দাস সম্পর্কে বসুমতী পত্রিকায় একটুকরো খবর বেরিয়েছিল। দেবু তা পড়েছে। সে মহা আগ্রহে জিজ্ঞেস করল, — কেমন দেখলি? ওর মুখে শুনলি কিছু? ইস্ লাভপুরে এসেছে জানলে আমিও যেতাম।

শিব বলল,— লাভপুর স্পোর্টিংক্লাবের ছেলেরা ওকে সংবর্ধনা দিচ্ছিল। পাতলা ছোটখাটো চেহারা, নেহাতই সাধারণ দেখতে। আমাদের চেয়ে বছর চারপাঁচ মাত্র বড় হবে। দেখলে ভাবাই যায় না ওর ভেতরে এমন দুঃসাহস। কয়েকটা অভিজ্ঞতা যা বলল দুর্দান্ত। ছমাস ধরে অর্ধেক ইন্ডিয়া চষে ফেলেছে একা একা সাইকেলে চেপে। ভারতবর্ষ শেষ করে নাকি বিদেশে পাড়ি দেবে এমনই সাইকেলে। লাভপুরের ছেলেরা ওকে কিছু চাঁদা তুলে দিল পথ খরচা হিসেবে।

—বলাই দাস কী করে? মানে পড়ে টড়ে না? অ্যাদ্দিন ধরে যে ঘুরছে?

— বি.এ. পাশ করে বেরিয়ে পড়েছে। বলল, ভ্রমণের নেশা সাঙ্গ হলে তখন ঠিক করবে। হ্যাঁ, আমিও বেরিয়ে পড়ব। পরীক্ষার পর মাত্র মাস দুই হাতে, তাই সই। যদ্দুর ঘুরে আসা যায়। একটা শক্তপোক্ত সাইকেল চাই কেবল।

একাই যাবি?—জানতে চায় দেবু।

হুঁ তাই।— তারপর একটুক্ষণ ভেবে বলল : অবশ্য তুই যদি সঙ্গে আসিস বেশ হয়।

একটু থেমে হেসে ফের বলল, —লোকে আমাদের মানিক জোড় বলে। জোড় ভেঙে একা বেরুলে ঠিক জমবে না। তুই ভেবে দেখ্। আমি কিন্তু রেডি হচ্ছি।

কদ্দুর যাবি?— জিজ্ঞেস করে দেবু।

বেরিয়ে তো পড়ি। দুর্গাপুর অবধি গিয়ে জিটি রোড ধরে যাব উত্তর ভারতে। রেজাল্ট বেরোনোর আগে অবধি যতটা ঘোরা যায়।

পরদিন বিকেলে দেবুর কাছে এসে ফুঁসে উঠল শিবু,— হোপলেস। এ জাতের কিস্‌সু হবে না। সাধে কি কবি বলেছেন— রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করনি।

শিবের গনগনে মুখের দিকে চেয়ে দেবু বলল, — হয়েছেটা কী?

— জানিস যতরকমে পারে ব্যাগড়া দিচ্ছে বাড়িতে।

কী রকম? — জানতে চায় দেবু। অবিশ্যি শিবের বাড়িতে কী ঘটছে অনেকখানি তার জানা। কারণ আজ সকালেই শিবের ছোটকাকা এসে দেখা করেছিল দেবুর সঙ্গে।

শিবু বলল,—প্রথমে বলছে বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে তারপর বেরুতে। কারণ নাকি বলাইদাস বি.এ. দিয়ে তবে বেরিয়েছে।

তা বটে সায় দেয় দেবু— বেশ, তখনই নাহয় বেরুনো যাবে।

মোটেই নয়।— হুংকার দিল শিব : আমি বলে দিয়েছি এখনই বেরব। কারণ মুড এসে গেছে। অতদিন অপেক্ষা করতে পারব না। যখন বুঝল আমায় রোখা যাবে না। তখন অন্য প্যাঁচ কষেছে। বলছে, সাইকেল দেবে না। বাড়িতে দু দুখানা সাইকেল— একটা বাবার, একটা ছোটকাকার। দুজনেই স্রেফ না বলে দিয়েছে। নতুন সাইকেল কিনে দেবে না। মা ঠাকুমাকে কত জপালাম একটা সাইকেল কেনার পয়সা ধার দিতে। বড় হয়ে চাকরি করে শোধ করে দেব। কেউ রাজি নয়।

দেবু মাথা চুলকে বলল,—তা বটে, সাইকেল ছাড়া সাইকেলে ভ্রমণ—

তোর বাড়িতে কী বলছে?—জিজ্ঞেস করে শিব।

দেবু বলল,— আমি তো বাড়িতে এ বিষয়ে এখনও কিছু বলিনি। তোর লাইন ক্লিয়ার হলে তখন জানাব আমি তো আর একা যাচ্ছি না, তুই গেলে সঙ্গে যাব।

না, না যাব আমরা। ঠিক যাব। পেছনোর প্রশ্নই না।—বিষম ভুরু কুঁচকে দিগন্তে বিলীন মেঠো পথের পানে তাকিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করল শিব : সাইকেল না জোটে আমরা তবে হেঁটেই বেরব। কত বিখ্যাত পায়ে হেঁটে সারা পৃথিবী প্রায় ঘুরেছেন। তাতে ক্লেশ আরও বেশি। বাড়িতে তাই জানিয়ে দিয়েছি।

—হেঁটে!

দেবুর কথায় অপ্রসন্নতার সুর বাজতে শিব রেগে গিয়ে বলল, — কেন পায়ে হেঁটে যেতে তোর আপত্তি আছে?

— না। মানে একটু সময় বেশি লাগবে। তাই ভাবছিস ততটা ঘোরা যাবে না একচোটে।

—তা হোক।

—পায়ে হেঁটে তোর টার্গেট কদ্দুর?

—কেন আগেরই মতো। এখান থেকে বাস রাস্তা ধরে লাভপুর কীর্ণাহার নানুর বোলপুর ইসলামপুর পানাগড় হয়ে দুর্গাপুর। দুর্গাপুর থেকে জি.টি রোড যতদূর যাওয়া যায়। পারি তো দিল্লি অবধি।

একটু ভেবে নিয়ে দেবু বলল, — আমি বলি আমরা বরং প্রথমে সোজা কলকাতা যাই। কলকাতায় দুদিন ঘুরে দেখব। মানে পায়ে হেঁটে। তারপর ঠিক করা যাবে কোন্ দিকে যাওয়া যায়।

— কলকাতা?

কলকাতার নামে শিবের মনটা একটু নরম হয়। নয়, এক ঢিলে দুই পাখি বধ। সে সম্মতি জানায়— তাই হবে। কবে বেরুনো যায় বল?

দেবু বলল,— হুট করে তো আর বেরুনো যাবে না! জোগাড়যন্ত্র চাই। একটা কাজ কর। স্কুল আর গ্রামের লাইব্রেরি থেকে পর্যটকদের স্মৃতিকথা যা পাওয়া যায় সব পড়ে ফেলি। সঙ্গে কী কী নেওয়া উচিত। কী ভাবে চলা উচিত তার একটা আইডিয়াও পাওয়া যাবে।

বইটই পড়া শিবের ধাতে নেই। গল্পের বই যা মাঝে সাঝে পড়ে সবই রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। সে হাতেপায়ে ডানপিটে এবং নামকরা খেলোয়াড়। দেবু ভালো ছাত্র, বইয়ের পোকা। তাই শিব বল,— ওসব তুই পড়ে নে। তবে তাড়াতাড়ি। চটপট বেরুতে হবে।

পর্যটকদের স্মৃতিকথা পড়ে চারদিন কাটিয়ে দিয়েছে দেবু। শিব নাগাড়ে তাড়া লাগাচ্ছে, — ব্যস, ব্যস, ঢের হয়েছে, এবার লিস্ট করে ফেল কী কী নিতে হবে—

পঞ্চমদিনে লিস্ট করল দেবু।

ছুরি, দড়ি, টিনের থালা গেলাস, কিছু জামাকাপড়, ওয়াটার বটল্ ইত্যাদি নানান খুঁটিনাটি। লিস্টটায় একবার চোখ বুলিয়ে শিব বলল, — এসব একদিনেই জোগাড় হয়ে যাবে। কিন্তু বিছানা?

—মশারি তোশক ঘাড়ে করে হাঁটব কী ভাবে? স্রেফ হাভ্যারস্যাকে যতটুকু আঁটে। ফু দিয়ে ফোলানো রবারের বালিশ নেব। আর একটা পাতলা চাদর, মুড়ি দিয়ে শোব মশার হাত থেকে রক্ষা পেতে। যেখানে রাতে থাকব, একটা শতরঞ্চি বা মাদুর জোগাড় করে নেব পেতে শুতে। ভালো হোটেলে তো আর থাকা চলবে না বেশি। গাঁয়েগঞ্জে কোনো বারান্দায় বা বড়জোড় কোনো ঘরের মেঝেতে শুতে হবে। আজ থেকে দুটো জিনিস প্র্যাকটিস করতে হবে— রোজ কয়েক মাইল হন্টন এবং বিনা মশারিতে শতরঞ্চি পেতে রবারের বালিশ মাথায় দিয়ে শোয়া। কদিন অভ্যেস করে না নিলে বেরিয়ে খুব অসুবিধা হবে। পুরু সোলের ভালো কেডস্ জুতো চাই, নতুন একজোড়া। আছে?

উঁহু।— শিব মাথা নাড়ে : সে ম্যানেজ হয়ে যাবে। আচ্ছা টাকাকড়ি কি নেব সঙ্গে?

— বেশি নয়। প্রত্যেকে মাত্র কুড়ি টাকা। দু'তিন দিনের খরচ। বেশি পয়সা সঙ্গে থাকলে চোর-ছ্যাঁচড়ের পাল্লায় পড়ার রিস্ক। আমাদের মতন পর্যটকরা নামমাত্র টাকা সঙ্গে রাখে। পথে যেখানে থাকব সেখানকার লোকের দয়ায় ফ্রি থাকা খাওয়া। আর যদি কিছু নগদ সাহায্য মেলে এই ভরসা। বলাই দাসের কথা যা শুনলি ওই টেক্‌নিক। যাত্রার অভিজ্ঞতা নিয়ে বক্তৃতা করব। তাতে লোকে খুশি হয়ে হয়তো সাহায্য করবে।

শিব ইতস্তত করে বলে,— বলাই দাস তো অনেক ঘুরেছে। বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা। তাই সবাই শুনল। মাত্র ক'দিন হেঁটে আমরা আর কী এমন বলতে পারব?

সে ঠিক হয়ে যাবে— আশ্বাস দেয় দেবু : আপাতত কাল থেকে প্র্যাকটিস শুরু করে দে।

—কদিন প্র্যাকটিস?

—যদ্দিন না ব্যাপারগুলো সড়গড় হয়। মানে মশারি ছাড়া ঘুম এবং একনাগাড়ে হাঁটা।

দুই

মানিকজোড়ের এই আসন্ন পর্যটনের খবরটা হু হু করে ছড়িয়ে পড়ল।

শুনে কেউ বলল,—শাব্বাশ।

কেউ বলল, —ছেলে দুটোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। স্রেফ পাগলামি। ওদের বারণ কর।

মানিকজোড়ের বাড়ির তরফে ওদের আটকাতে কিন্তু তেমন কোনো চেষ্টা হল না। একেবারে যে হয়নি তা নয়। তবে এ চেষ্টায় কাজ হবে না বুঝি দুই বাড়ির লোকই হাল ছেড়ে দিল। শিব গোঁয়ার বলে বিখ্যাত। আর দেবু পড়াশুনোয় হীরের টুকরো হলে কী হবে বেজায় জেদি এবং কম ডানপিটে নয়। তাছাড়া শিব যখন যাচ্ছে দেবু তার সঙ্গ ছাড়বে না অবশ্যই। তবে কীভাবে পর্যটন করা উচিত এবং পথে কী কী করা উচিত নয় সে সম্বন্ধে দুই বাড়ির অভিভাবকদের অবিরল উপদেশের ঠেলায় দুই বন্ধু অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

দুদিন বাদে শিব হাত মুখ চুলকোতে চুলকোতে দেবুর কাছে হাজির। কাতর কণ্ঠে বলল— লিস্টের সব জিনিস জোগাড় হয়ে যাবে, নো প্রবলেম। কিন্তু ভাই, মশারি ছাড়া শুয়ে যে হাত মুখ ফুলে গেছে মশার কামড়ে। উঃ এই গরমে কি সারা গা মুড়ি দিয়ে ঘুমনো যায়। যেটুকু বেরিয়ে থাকে মশায় দাগড়া দাগড়া করে দিয়েছে। গোটা রাত প্রায় ঘুমুতে পারিনি দু দিন। তোর কী অবস্থা?

দেবু করুণ মুখে বলল,— আমার অবস্থাও কাহিল। এত চট করে কি আর অভ্যেস হয়! কী করবি? এখন বেরুবি, না কয়েক বছরে কষ্টটা একটু একটু করে ধাতস্থ হলে তখন বেরুনো যাবে। বাড়িতে তো বলছিলই আর একটা পাশ দিয়ে তবে যেতে। অভ্যেস হয়ে গেলে আর সমস্যা নেই। দেখিস না কত লোক খোলা রোয়াকে বা ফুটপাথে দিব্যি মশারি ছাড়া নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়।

শিব আঁতকে উঠল, — তা হয় না। এখন আর পেছোবার উপায় নেই।— জানিস ময়ূরাক্ষী স্পোর্টিং ক্লাব আমাদের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। খুব নাকি ধুমধাম করবে। এখন না বললে বেইজ্জত হয়ে যাব।

দেবু চমকে বলল,— অ্যাঁ সংবর্ধনা! খেয়েচে! যাক, তবে কদিন অভ্যেস করে নেওয়া যাক।

শিব বলল,— ছোটকাকা বলছিল একটা ছিপ সঙ্গে নিতে।

—ছিপ! কেন?

—মানে বলছিল যে লোকের বাড়ি বাড়ি চেয়েচিন্তে খাবি। মাছটাছ তো জুটবে না। নিজেই তাই ধরে নিবি ছিপে। আসলে ঠাট্টা করছিল, আমি একটু মাছের ভক্ত কিনা।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়।— জানায় দেবু।

— না, না। ছিপ হাতে হাঁটব কী? লোকে মেছুরে ভাববে। হাসবে। তাছাড়া ছিপ ফেলে বসলে আমার আর জ্ঞান থাকে না। গোটা দিন বরবাদ হয়ে যাবে।

চারদিন বাদে শিব উত্তেজিত ভাবে এসে দেবুকে বলল,—আর দেরি নয়। আমরা কালই রওনা হব।

কেন? এত তাড়াহুড়ো কীসের?— অবাক হয় দেবু?

—কারণ মথুরাপুর গ্রামের কয়েকজন ছেলেও নাকি আমাদের মতন পর্যটনে বেরুবে বলে মতলব করছে। ওদের আগেই আমাদের রওনা হতে হবে।

দেবু চিন্তিতভাবে বলল,— কাল? জোগাড়যন্ত্র আছে। তাছাড়া ময়ূরাক্ষী ক্লাবকে নোটিশ দিতে হবে। — পরশু স্টার্ট করা যেতে পারে।

বেশ তাই। আমি বলে দিচ্ছি ক্লাবে— শিব চলে যায়।

বিকেল প্রায় তিনটে বাজে।

মানিকজোড়ের পর্যটনে বেরনো উপলক্ষে চন্দনা গ্রামের ময়ূরাক্ষী স্পোর্টিং মহতী জনসভার আয়োজন করেছে। চন্দনা গ্রামের প্রায় সমস্ত বাসিন্দা হাজির। আশপাশের গ্রামের কিছু লোকও জুটেছে সভায়। স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীশশাঙ্ক পাল সভাপতি। এবং চন্দনা গ্রামের সুবোধ মণ্ডল ওরফে সিধু খুড়ো প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছেন।

খেলার মাঠে দুখানা তক্তাপোশ গায়ে গায়ে পেতে তৈরি হয়েছে মঞ্চ। তার ওপর পাশাপাশি চেয়ারে বসে সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং দুই ভবিষ্যৎ পর্যটক। শিব আর দেবুবসে আছে একেবারে পর্যটকের বেশে। পরনে সার্ট, ফুলপ্যান্ট, জুতো,মোজা মায় হ্যাভারস্যাক। দুটিও পাশে রাখা। সভার শেষেই অবশ্য তাদের যাত্রা শুরু হচ্ছে না। আসচে কাল ভোরে রওনা হবে। তবু ক্লাবের অনুরোধে পর্যটকের সাজেই তাদের হাজির হতে হয়েছে। এতগুলি কৌতূহলী দৃষ্টির সমুখে বসে অস্বস্তিতে ঘামছে তারা।

প্রথমে মাল্যদান পর্ব সাঙ্গ হল। তারপর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তারস্বরে গাইল— 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে/ লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার...'

ক্লাবের সেক্রেটারি বেচুদা উঠে এরপর শ্রীমান শিব দত্ত ও দেবু মজুমদারের দারুণ প্রশংসা করলেন বাছা বাছা বাক্য প্রয়োগে—'ওরা গ্রামের গৌরব। বাংলার গৌরব। ভারতের গৌরব দুঃসাহসী দুর্জয়' ইত্যাদি। প্রার্থনা জানালেন 'ওদের যাত্রা শুভ হোক'।

ক্লাবের তরফ থেকে পর্যটকদের একখানা করে চমৎকার ডায়রি উপহার দেওয়া হল, যাত্রা পথের বিবরণ লিখতে।

পটাপট হাততালি পড়ল। সঙ্কোচে মানিকজোড় আর মাথা তুলতে পারে না।

এবার সভাপতির পালা। পঞ্চায়েত প্রধান শশাঙ্ক পাল বক্তৃতায় বেশ পোক্ত। তিনি ভিন গাঁয়ের মানুষ। শিব বা দেবুকে মোটেই চেনেন না। তাদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে পারেননি তাড়াহুড়োয়। তাতে অবশ্য দমলেন না। বহুকাল আগে ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য দেশ ভ্রমণের উপকারিতার বিষয়ে যে রচনাটি মুখস্থ করেছিলেন সেটাই মনে মনে ঝালিয়ে নিয়ে হাতমুখ

নেড়ে বলে গেলেন আধঘণ্টার ওপর। প্রধান মহাশয়ের স্টকে এমনই কিছু রচনা কণ্ঠস্থ আছে। নানা উপলক্ষে সভায় ভাষণ দিতে বিলক্ষণ কাজে লাগে।

প্রধান, ভাষণের শেষ পর্বে টেনে আনলেন নিজের কথা— দেশ ভ্রমণ আমিও কম করিনি। একবার লছমনঝোলা থেকে কেদার তীর্থ গিয়েছিলাম পায়ে হেঁটে। আর পঞ্চায়েতের কাজে এই যে গাঁয়ে গাঁয়ে এত ঘোরাঘুরি করি তাকেও পর্যটন বলা যায় বইকি। ডাক্তার সাইকেল বেশি চড়তে নিষেধ করেছে। তাই পায়ে হেঁটেই ঘুরি। এ খুব ভালো এক্সারসাইজ। স্বাস্থ্যকর। চন্দনার এই দুই বীরকিশোর পায়ে হেঁটে ভ্রমণের যে সংকল্প নিয়েছে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে তাতে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ভাষণ সমাপ্ত। হাততালিও পড়ল কিছু। সভাপতি তবু নড়েন না। ইদিকসেদিক নজর করেন। শেষে বলে ফেললেন— ফোটোগ্রাফার কই?

আজ্ঞে, এখনও এসে পৌঁছয়নি। লাভপুরের বিউটি স্টুডিও থেকে লোক আসার কথা। — কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুতভাবে জানালেন বেচুদা। সভাপতি ব্যাজার মুখে আসন নিলেন।

এবার উঠলেন প্রধান অতিথি। খানিক ঠেলেঠুলে দাঁড় করানো হল তাঁকে। বৃদ্ধ সুবোধ মণ্ডলের ধবধবে চুল দাড়ি সৌম্যকান্তি। লাজুক হেসে তিনি বললেন,—আমাকে আবার কেন যে এসব করা? ছেলেরা বলল, আমি অনেক ঘুরেছি, তাই। তা বটে অনেক দেশ আমি ভ্রমণ করেছিলাম ভারতের কত জায়গায়। ঘোরা আমার নেশা। এখন আর পারি না। শরীরে কুলোয় না। ট্রেনে বাসে পায়ে হেঁটে অনেক ঘুরেছি। প্রথম যে-বার গাঁ ছেড়ে বাইরে দূরে যাই, তখন এদেরই বয়স।

তিনি আঙুল তুলে রহস্যময় হেসে দেখালেন শিব আর দেবুকে,— কেন জান?

কেন কেন? —শ্রোতাদের তরফ থেকে উদ্‌গ্রীব প্রশ্ন।

মিটিমিটি হেসে মণ্ডলমশাই জানালেন, —পালিয়েছিলাম বাড়ি থেকে। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল মেরে। খানিকটা লজ্জা আর বেশিটা বাপের পিটুনির ভয়ে। রেজাল্ট জেনেই বাড়ি এসে যা দু-চার টাকা জমানো ছিল তাই নিয়ে সটকালাম এখান থেকে হাওড়া স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেনে চাপলাম যেদিকে দুচোখ যায়। বিনা টিকিটে। ট্রেনের টিকিট কাটলে যে খাওয়ার পয়সা থাকে না। পাটনার কাছাকাছি পৌঁছাতে চেকার ধরল। ঘাড় ধরে নামিয়ে দিল ট্রেন থেকে। দমলাম না। হাতের কাছে যা কাজ পাই করি। দু পয়সা কামিয়ে নিয়ে ফের বেরই পথে। ট্রেনে বাসে বা হেঁটে চলি। ট্রেনে অবশ্য টিকিট কাটতাম না। তবে বাস কনডাক্‌টাররা বেশ কড়া! বেশি দূর যেতে না যেতে ঠিক ধরে ফেলত। দু ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিত। তাই পারতপক্ষে বাসে ফাঁকি দিতে সাহস হত না। এইভাবে কানপুর দিল্লি হয়ে পৌঁছালাম আগ্রা। পথে কত কী অদ্ভুত ঘটনা। লক্ষ্ণৌর কাছে এক ভূতুড়ে সরাইখানায় রাত কাটাতে গিয়ে যা মারাত্মক অভিজ্ঞতা—

সিধুখুড়ো সেই ভৌতিক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন শ্রোতারা রুদ্ধশ্বাসে শোনে।

আগ্রায় গিয়েই ব্যস্।— সিধুখুড়ো ফের মিটিমিটি হাসেন : সেখানে আমার এক কাকা থাকতেন। রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে তাঁর নজরে পড়ে গেলাম। দেখেই সন্দেহ করলেন বাড়ি থেকে ভেগেছি। নিয়ে গিয়ে আটক করলেন তাঁর বাসায়। টেলিগ্রাম পাঠালেন আমার গ্রামের

বাড়িতে। বাবা এসে পাকড়ে নিয়ে গেলেন কদিন বাদে। ব্যস, আমার প্রথম বারের দেশ ভ্রমণ খতম। লাভের মধ্যে হিন্দিটা রপ্ত হয়ে গেল।

হি হি হো হো— রব উঠল সভায়। অল্পবয়সিরা বেজায় খুশি। তবে কিছু বয়স্ক ভুরু কুঁচকোলেন : সিধুখুড়োর জ্ঞানগম্যি আর হবে না। কী দরকার ছিল এসব বৃত্তান্তে? এই সবে পরীক্ষা হল। অনেক ছেলেই ফেল মারবে। তারপর ছোঁড়াগুলো সিধুখুড়োর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে ঝামেলার একশেষ!

সিধুখুড়ো দাড়িতে হাত বুলতে বুলতে হেসে বললেন, — সেই যে নেশা ধরে গেল তারপর বারবার গ্রাম ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছি। তবে আর লুকিয়ে পালাইনি। বাড়ির লোকদেরও সঙ্গে নিয়েছি কয়েকবার। এই যে আমাদের দেবু শিব যাচ্ছে সবাইকে বলেকয়ে এ অতি সাধু উদ্যোগ। হেঁটে যাচ্ছে। এও খুব ভালো। বিনাটিকিটে ট্রেনে চাপার রিস্ক নেই। আশীর্বাদ করি ওদের ভ্রমণ নিরাপদ হোক।

সিধুখুড়োর ভাষণের সমাপ্তিতে তুমুল করতালি বাজল। সভা শেষ। লোকজন উঠে পড়ল। যাওয়ার আগে সভাপতি ফের খোঁজ নিলেন,—ফোটোগ্রাফার এসেছে?

কুণ্ঠিত বেচুদা হাত কচলায়,—না। এত করে বলে এলুম। গ্রামে একটা ক্যামেরা আছে কিন্তু ফিল্ম নেই।

গজগজ করতে করতে বিদায় নিলেন পঞ্চায়েত প্রধান।

তিন

সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ার কথা। শিব ভোরে উঠে চটপট তৈরি হয়ে নিজের বাড়ির লোকের কাছে বিদায় নিয়ে দেবুর বাড়িতে পৌঁছে থ। গ্রামের গাদা ছেলে জড়ো হয়েছে দেবুদের বাড়ির আশেপাশে। একটুবাদে দেবু বেরিয়ে এল তৈরি হয়ে। চারধারের ব্যাপার দেখে মন্তব্য করল, —বেচুদার কাণ্ড।

লাভপুরে যাওয়ার রাস্তার দুধারে ছেলেদের সার করে দাঁড় করিয়ে দিল বেচুদা। তাদের মধ্য দিয়ে মানিকজোড় হাঁটতে শুরু করতেই—অ্যাটেন্‌সন।

বেচুদার গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে স্যালুট জানাল ময়ূরাক্ষী স্পোর্টিং। অমনি ঘোর রবে বাজতে শুরু করল একটি ঢাক এবং একখানা কাঁসি। বীরু ঢাকির ছেলে ছিরু বাজাচ্ছে ঢাক। আর তার বন্ধু কানুর হাতে কাঁসি।

এই ছিরু বাজনা থামা। ধমক লাগায় দেবু।

ছিরু একগাল হেসে বলল,— আহা তোমরা এমন কীর্তি করতে চলেছ আর বিদায়বেলায় একটু বাজনা বাদ্যি হবে না?

কী কীর্তি শুনি। — বলল দেবু।

—জানি গো, তোমরা পায়ে হেঁটে বিলাত যাচ্ছ, ধন্যি সাহস বটে!

বেচুদা প্লিজ ওদের থামতে বলুন,—অনুনয় জানায় দেবু।

বেচুদা উদার হাসলেন,— হোক্ না একটু পাবলিসিটি। আশপাশের গাঁয়ের লোক জানুক।

ক্ষিপ্ত শিব তেড়ে গেল,— ছিরু তোর ঢাক ফাঁসিয়ে দেব।

ছিরু ঢাক আঁকড়ে হাউমাউ করে খানিক তফাতে গিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে লাফিয়ে লাফিয়ে বাজাতে লাগল। সঙ্গে চলে কানুর সঙ্গত। — ট্যাং ট্যাং ট্যাং।

শিব দেবু আর কথা না বাড়িয়ে হনহনিয়ে এগোয়।

বেশ কিছুটা জোর কদমে গিয়ে শিব পিছন ফিরে চমকে বলল, —এইরে! ভোলা সঙ্গে আসচে।

ভোলা শিবদের বাড়ির কুকুর। ইয়া তাগড়া মেটে রঙের মদ্দা কুকুর। শিবের বেজায় ন্যাওটা। কোন ফাঁকে সঙ্গ ধরেছে।

দুজনে দাঁড়ায়। শিব ধমকাতে লাগল, — এই ভোলা, পালা বলছি।

ভোলা যায় না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে। শিব ভোলাকে তাড়াতে ঢিল ছোড়ে। ভোলা কিছু দূরে সরে গিয়ে ঝোপের আড়ালে লুকোয়। শিবরা ফের হাঁটা দিল। যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল যে ভোলা ঠিক সঙ্গে আসছে।

আচ্ছা জ্বালা! কদ্দূর যাবে আমাদের সাথে? বিব্রত শিব মাঝে মাঝেই থেমে ভোলাকে তাড়া দেয়। ভোলা নাছোড়বান্দা। লুকিয়ে পড়ে। ফের পিছু ধরে। যেন খেলা পেয়েছে।

ভাবিত দেবু বলে,—কীরে শিব, আর এগুবি না এখন ফিরে যাবি গ্রামে? সঙ্গে কুকুর থাকলে কোথাও আশ্রয় জোটানো মুশকিল।

—না না ফেরাফিরি নেই।— আপত্তি জানায় শিব : অচেনা জায়গায় পৌঁছলে ও ঠিক ফিরবে। এ পথ ওর চেনা কিনা তাই চলেছে সঙ্গে।

একা বাড়ি ফিরতে বাধ্য হলে তোর শোকে যদি খাওয়া বন্ধ করে, সুইসাইড করে?— দেবুর দুর্ভাবনা যায় না।

—না তেমন কিছু করবে না। তবে মন খারাপ করে থাকবে যদ্দিন না আমি ফিরি।—ভোলার ব্যাপারে শিব যেন কিঞ্চিৎ বিচলিত, তবে সে মন শক্ত করে। শুধু ভোলা কেন, বাড়িতে মা ঠাকমা বাবা কাকা ভাইবোনরাও কি আর কম দুশ্চিন্তায় থাকবে তার জন্যে। উপায় কী?

চলতে চলতে দেবু জিজ্ঞেস করে,— লিস্ট মতো সব নিয়েছিস?

হ্যাঁ। এক্সট্রাও কিছু জুটেছে।—জানায় শিব।

—কী রকম?

—মা দিয়েছে একডজন পোস্টকার্ড। ঠাম্মা দিয়েছে, এক শিশি আচার আর গন্ডা দশেক নারকেল নাড়ু। বাবা একটা গীতা দিয়েছিলেন, ইচ্ছে করেই ফেলে এসেছি। আর কাকাটা ফের একটা ছিপ গছাবার তালে ছিল নিইনি।

নারকেল নাড়ু! বাঃ দে বের কর।—দেবু হাত বাড়ায়। কিছুক্ষণের ভিতর দুজনে অর্ধেকের বেশি নাড়ু সাফ করে দেয়।

খানিক চলার পর একটা গ্রাম পড়ল। গ্রামের বুক চিরে পথ ধরে এগোয় দুজনে। হঠাৎ পিছনে অনেক কুকুরের গর্জনে ফিরে দেখে চারপাঁচটা কুকুর পথ আগলে চেঁচাচ্ছে। ভোলা এগুতে পারছে না, তবে পিছু হটারও লক্ষণ নেই। তার গায়ের লোম খাড়া। ভয়ঙ্কর গর্জাচ্ছে।

এই, তোর ভোলা মরেছে।— দেবু ঢিল খোঁজে।

শিব বাধা দিল,— এই সুযোগ। চ এগিয়ে। ওই নেড়িগুলোর সাধ্যি কি ভোলার গায়ে হাত দেয়। এই ঝগড়ার ফাঁকে আমরা পালাই। নইলে ওর সঙ্গ ছাড়ানো মুশকিল হবে।

অনেকটা দূরে গিয়ে শিবরা দেখল ভিন গাঁয়ের আরও কুকুর ছুটে আসছে ভোলাকে লক্ষ্য করে। সেই শত্রুব্যূহ ভেদ করে আর এগুবার সাধ্য নেই ভোলার। শিবদের অনুসরণ করার চেয়ে ভোলা এখন নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত। দাঁত খিঁচিয়ে শত্রুদের ভয় দেখিয়ে তফাতে রাখছে এবং ক্রমেই পেছোচ্ছে। পথের বাঁক ঘুরতে ভোলা চোখের আড়াল হয়।

শিবের কল্পনায় ভাসে হয়তো ভোলা ওই শত্রু এলাকার বাইরে দাঁড়িয়ে করুণ চোখে অপেক্ষায় থাকবে কখন শিব ফেরে। শেষে হতাশ হয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে যাবে। মনটা শিবের বিষণ্ণ হয়ে যায়। ভোলাকে সঙ্গে নিলে বেশ হত। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বইয়ে তো পড়েছে, বিমলকুমার তাদের প্রিয় কুকুর বাঘাকে সঙ্গে নিয়ে কত দেশ বিদেশে অ্যাডভেঞ্চার করে বেরিয়েছে।

লাভপুরে চা-টা খেয়ে দুজনে ফের চলল পিচ রাস্তা ধরে। রোদের তেজ খুব। ঘামছে তারা। পথের ধারে একটা পুকুরে চান করে নিল। দেবু বলল— বেড়াবার সিজনটা ঠিক হয়নি। শীতকালই আইডিয়াল।

দুপুরে সেদিন ভাত জুটল না। পথের ধারে এক গ্রাম্য চায়ের দোকানে পাঁউরুটি ও ভীষণ ঝাল আলুরদম খেয়ে খিদে মেটানো হল। গাছের ছায়ায় খানিক জিরিয়ে নিয়ে ফের হন্টন। রোদের ঝাঁজে চলার গতি শ্লথ হয়। বিকেল হতে না হতেই দুজনে বেদম হয়ে পড়ে। ঠিক হয় সামনের গ্রামেই থামবে, রাতে আশ্রয় নেবে।

গ্রামে একটু ঢুকে দেবুরা দেখল এক কুটিরসংলগ্ন উঁচু দাওয়ায় একটি বৃদ্ধ পা ঝুলিয়ে বসে বিড়ি খাচ্ছেন। বৃদ্ধের মুখখানা শুকনো হর্তুকির মতন। চাউনিতে রাগী রাগী ভাব।

শিব দেবু বৃদ্ধের সামনে গিয়ে নমস্কার করে বলল,— আজ্ঞে আমরা দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছি, এখানে কি—

দেশ ভ্রমণ? কোত্থেকে আসা হচ্ছে?— শিবের কথা থামিয়ে দিয়ে খটখটে গলায় প্রশ্ন করেন বৃদ্ধ।

আজ্ঞে চন্দনা গ্রাম। লাভপুরের কাছে। — বলল শিব।

—ও তাহলে টাইম আছে। লাস্ট বাস যাবে সন্ধে সাড়ে ছটায়।

—আজ্ঞে, আমরা পায়ে হেঁটে বেরিয়েছি। বাসে চড়ি না।

বৃদ্ধ আকাশের পানে তাকিয়ে নিয়ে বললেন,— হেঁটে কি ফিরতে পারবে? রাত হয়ে যাবে না?

—আজ্ঞে আমরা আজ ফিরব না গ্রামে। মানে এখন ফিরব না কিছুদিন। হেঁটে হেঁটে নানান দেশ দেখার ইচ্ছে। তাই ভাবছিলাম, আজ রাতে এই গ্রামে যদি আশ্রয় মেলে? এখানে কি কোনো ক্লাব আছে?

বৃদ্ধের কপালে কটা বাড়তি ভাঁজ পড়ে। দৃষ্টি খর হয়। শিবদের আপাদমস্তক বারকয়েক চোখ বুলিয়ে নিয়ে অর্থপূর্ণভাবে উচ্চারণ করলেন, — বটে।

ফের কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণের পর প্রশ্ন করলেন,— কী করা হয় শুনি?

আমরা এ বছর উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছি।— জানায় দেবু।

হুঁ। তা'লে ফেল মারার আশঙ্কাতেই আগেভাগে সটকেছ বাড়ি থেকে।—ঠোঁটে ব্যাঁকা হাসি নিয়ে বৃদ্ধের মন্তব্য।

নিজের পাস ফেল সম্বন্ধে সংশয় থাকলেও দেবুকে ওই পর্যায়ে ফেলছে দেখে, শিব দেবুকে দেখিয়ে বলল, — জানেন ও ক্লাসের ফার্স্ট বয়।

বটে! মার্কশিট আছে?—বৃদ্ধের কণ্ঠে চ্যালেঞ্জ।

দেবু দেখল ব্যাপার ঘোরালো হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে আরও লোক এসে জুটেছে। শুনছে কথাবার্তা। সে নরম সুরে বুঝিয়ে বলল,— আজ্ঞে আপনি ভুল করছেন। আমরা পালাচ্ছি না। বলেকয়েই বেরিয়েছি। এই দেখুন সার্টিফিকেট। আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের। আমাদের হেডমাস্টারের। এতে আমাদের পরিচয় আর ভ্রমণের কথা লেখা আছে। তাছাড়া ফোটোসহ আইডেন্টিটি কার্ড রয়েছে আমাদের। লাভপুর থানার দারোগার সই আর সিল দেওয়া।

দেবু ব্যাগ থেকে সবকটি পরিচয়পত্র বের করে বৃদ্ধের হাতে দেয়। চারপাশের অন্যরাও খুঁটিয়ে দেখে সেগুলি।

গ্রামের একজন মন্তব্য করে,— ব্রজখুড়ো, এদের কেসটা সত্যিই মনে হচ্ছে।

হুঁ তাই ঠেকছে বটে।—ব্রজখুড়ো ওরফে সেই রাগী বৃদ্ধ বিড়বিড় করেন : তবে শুধু মুখের কথায় আমরা বিশ্বাস করি নে। আমার নাতি বদনও মাধ্যমিক ফেল করে বাড়ি থেকে লম্বা দিয়েছিল, মনে আছে। তিন মাস পরে তার খোঁজ পেলাম। সে বেটাও বলে বেড়াত দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছি।

তোমাদের এখানে আগমনের উদ্দেশ্য? —মাতব্বর গোছের একজন জিজ্ঞেস করেন দেবুকে।

আজ্ঞে রাতের মতন একটু আশ্রয়।— জবাব দেয় দেবু। যে কোনো একটা ঘর পেলেই হবে।

আর খাওয়া দাওয়া?—জানতে চাইলেন প্রৌঢ়।

সঙ্গে চিঁড়ে আছে। — জানাল দেবু।

পাকামি হচ্ছে।— প্রৌঢ় চটে ওঠেন : এই গুটে এদের দুজনকে রাতে আমার বাড়িতে নিয়ে যাবি। যাহোক মুঠো ডালভাতের ব্যবস্থা করা যাবে। আর আমার বাড়িতে থাকবে।

ব্রজখুড়ো গজগজ করেন,— এদের গার্জেনদের বলিহারি! এই কচি ছেলে দুটোকে একা একা ছাড়ল কি আক্কেলে? হ্যাঁরে, কানু রায়ের ছোট মেয়ের বিয়ে দিয়েছে ময়ূরাক্ষীর তীরে চন্দনা গাঁয়ে সরকার বাড়িতে।

কী নাম? — জিজ্ঞেস করে দেবু।

—রানু।

ওঃ, রানুদিকে খুব চিনি।— বলল শিব।

ব্রজখুড়ো বললেন,— কানু রায়কে বলিস এই গোঁয়ার গোবিন্দ দুটোকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বাড়িতে ফেরত পাঠা, নইলে কোথায় বেঘোরে মরবে। আমার বদনকে যখন পাওয়া গেল, পেটের অসুখে ভুগে ভুগে এক্কেবারে কাঠি।

ব্রজখুড়োর নির্দেশে সে রাতে কানু রায় এসেছিল দেবুদের বোঝাতে। নবীন পর্যটকরা কান দেয়নি।

পরদিন ভোরে শিব দেবু সেই গ্রাম ছাড়ল। খানিক গিয়ে দেবু বলল,— এই যাঃ, আমার সার্টিফিকেট দুটো, হেডমাস্টার আর প্রধানের, ব্রজখুড়ো নিয়েছিলেন, ফেরত দেননি।

শিব বলল,— বাদ দে, আর ফেরত আনতে হবে না। ফের ব্রজখুড়োর পাল্লায় পড়লে আমাদের যাত্রাই ভন্ডুল হয়ে যাবে। আমার কপি দুটো তো আছে। একই তো সার্টিফিকেট। ওতে দুজনেরই নাম রয়েছে। ওতেই কাজ হয়ে যাবে।

দেবু বলল,— আর একটা ভুল হয়ে গেছে। ওই গ্রামের গণ্যমান্য কাউকে দিয়ে আমার নোট বইয়ে লিখিয়ে নিতে হত। আমরা এই গ্রামে এসেছি তার প্রমাণ। এরপর থেকে খেয়াল রাখবি এটা।

চার

দুজনে কীর্ণাহার পৌঁছল সকাল দশটা নাগাদ। হাঁটতে খাসা লাগছে। দুধারে দিগন্তবিস্তৃত চাষের খেত। তখনো চাষের মরশুম তেমন শুরু হয়নি। শুধু যেখানে সেচের সুবিধে তেমনি অল্প কিছু জায়গায় ধান ফলেছে। এবড়ো-খেবড়ো পাঁশুটে রঙের মাঠের মাঝে কোথাও কোথাও সবুজের ছোপ। লম্বা লম্বা পায়ে বকেরা তীক্ষ্ণ নজর ফেলে ঘুরছে খেতের পাশে, কেউ বা আলের ওপর এক ঠ্যাং তুলে যেন ধ্যানমগ্ন।

যেতে যেতে ছোট গ্রাম পড়েছে কয়েকটি। থামেনি তারা। কোথাও গাছের ছায়ায় বসে একটু জিরিয়ে নিয়েছে।

কীর্ণাহার ছোট গঞ্জশহর। দোকানপাট অনেক। খিদে পেয়েছিল তাই দেবুরা এখানে কিঞ্চিৎ চা-টা খেয়ে নেবে ভাবল। একটা সস্তা দরের খাবারের দোকানে ঢুকল তারা।

দোকানের ভিতরে এবং বাইরে চার পাঁচটি কাঠের বেঞ্চি পাতা। দোকানের বাইরে বেঞ্চে বসল দুজনে। সেখানে তখন আরও পাঁচ ছয় খদ্দের। দোকানের শো-কেসে সাজানো রয়েছে জেলিপি জিভেগজা মন্ডা ইত্যাদি। আবার চা মুড়িরও ব্যবস্থা আছে।

শিবের লোভী দৃষ্টি মিষ্টিগুলোর ওপর ঘুরছে দেখে দেবু বলল,—খাওয়া একটু কমে সারতে হবেরে। টুপিটা না কিনলে চলছে না।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল শিব।

বৈশাখের চড়া রোদে দুপুরে অন্তত যে মাথায় টুপি থাকলে আরাম লাগে এই সত্যটি বেরনোর সময় তাদের খেয়াল হয়নি। তাই কীর্ণ হারে একটা করে কাপড়ের কাউন্টিক্যাপ জাতীয় টুপি কিনে নেবে ঠিক করেছে। অতএব প্রত্যেকের জন্য এক ঠোঙা মুড়ি এবং চারটে জিলিপি অর্ডার হল।

শিবদের সাজগোজ, পিঠে হ্যাভারস্যাক, চালচলন অন্য খদ্দেরদের কৌতূহল জাগিয়েছিল। একজন থাকতে না পেরে প্রশ্ন করল,— আপনারা আসছেন কোত্থেকে?

সুযোগটা খুঁজছিল দেবু। সে চটপট বলে গেল নিজেদের পরিচয় এবং দেশ ভ্রমণের কথা।

প্রশ্ন হয়,— অ্যাঁ! পায়ে হেঁটে! কদ্দুর যাবে ভাই? দিল্লি অবধি ইচ্ছে আছে।—উত্তর দেয় দেবু : মাস খানেকে যতদূর যেতে পারি।

দেবু কলকাতার কথা তুলল না বলে শিব অবাক হয়। বুঝল দূরত্বটা বাড়িয়ে দিয়ে ভ্রমণের মর্যাদা বাড়ানোর কায়দা। দোকানি এবং অন্য খরিদ্দারগুলি তখন গল্প জুড়ল। বিষয়— কে কতদূর পায়ে হেঁটে ঘুরেছে।

দেবুর ইচ্ছে ছিল এঁদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে কিছু পথ খরচ জোগাড় করে। কিন্তু বুঝল সে আশা নেই। সে জিজ্ঞেস করল,— এখানে কোনো ক্লাব আছে ছেলেদের?

—ক্লাব! আছে বইকি। পুজোটুজো করে।

—কোথায়?

দোকানের সবাই মাথা নাড়ল,— ঠিকানা আবার কিছু আছে নাকি? বাজারের কাছে বসে ছেলেগুলো আড্ডা দেয় দেখেছি।

দেবুরা কিঞ্চিৎ নিরাশ হয়ে পথে বেরল। দেবু বলল,— ক্লাব-টাবের খোঁজ করে দরকার নেই। টুপিটা কিনে হাঁটা দিই।

দুজনে এদিক সেদিক দেখতে দেখতে চলেছে। 'এই যে ভায়া'— ডাক শুনে তারা ফিরে দেখল একটি মাঝবয়সি লোক তাদের ডাকছে। লোকটি মাঝারি লম্বা। রোগা। শ্যামবর্ণ। পরনে আধময়লা ধুতি হাফহাতা শার্ট। পায়ে রবারের চটি। এই লোকটিকে তারা খাবার দোকানে দেখেছিল। চুপচাপ বসেছিল পিছনে।

লোকটি হাসি হাসি মুখে বলল,— তোমরা ভাই থাকছ আজ এখানে?

দেবু বলল,— নাঃ। ফের হাঁটব।

দুপুরের খাওয়া দাওয়া? —জানতে চায় লোকটি।

—এই বারোটা একটা নাগাদ থামবে কোথায়ও, সেখানেই খেয়ে নেব যাহোক।

—এত লম্বা ট্যুরে, যথেষ্ট টাকাকড়ি নিয়ে বেরুতে হয়েছে, না?

টাকাকড়ি সামান্যই নিয়েছি।— জানায় দেবু ঃ দু-তিন দিনের খাওয়া খরচ, ব্যস।

তাহলে চলবে কী উপায়ে?—লোকটি অবাক!

পথে যেখানে সম্ভব অন্যদের অতিথি হব।— বোঝায় দেবু : তাঁরা যা দেবেন খাব, যেখানে রাত কাটাতে শুতে দেবেন, শোব। মানে ফ্রিতে যতটা জোটে। অনেক টাকাকড়ি নিয়ে আরামে দেশ দেখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। দেখলেন না কত সস্তায় টিফিন সারলাম। পকেট প্রায় খালি যে।

তা বটে তা বটে।— লোকটি ঘাড় নাড়ে : এ একটা নতুন অভিজ্ঞতা বটে। কিন্তু এমন চেয়েচিন্তে ভিক্ষে করে কি আর বেশি দূর যাওয়া যাবে?

হয়ে যাবে।—আশ্বাস দেয় দেবু : লোকে ঠিক সাহায্য করবে দরকারমতো। তাছাড়া শুধুমাত্র ভিক্ষে কেন, পথে কত ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা হচ্ছে, সেই সব শুনিয়ে বক্তৃতা দিয়ে লোককে আনন্দ দেব। এইভাবে আমাদের ঋণ খানিকটা শোধ হবে। কত বিখ্যাত পর্যটক এইভাবে সারা দুনিয়া ঘুরেছেন।

বটে বটে, তেমন অভিজ্ঞতা কিছু হয়েছে নাকি?— লোকটির চোখ চকচক করে।

তা হয়েছে!— গতকাল ব্রজখুড়োর খপ্পরে পড়ার ঘটনা রসিয়ে বলে দেবু। শুনে লোকটির কী হাসি।

হাসির পর্ব শেষ হলে লোকটি বলল,—পথে যেতে যেতে কিছু কাজকম্ম করে ন্যায্য উপায়ে কিছু পথখরচা রোজগারে তোমাদের আপত্তি আছে নাকি?

দেবু বলল,—বিন্দুমাত্র নেই। তবে বেশিদিন কোথাও আটকে থাকতে চাই না।

লোকটি মুখ কুঁচকে একটু ভেবে বলল,— ঠিক আছে, এসো আমার সঙ্গে। দেখি সেরকম কিছু ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। হ্যাঁ, ভাই আমার পরিচয়টা দিই। অধমের নাম গৌড়হরি দে।

শিব দেবুও নমস্কার করে নিজেদের নাম বলল।

এক জায়গায় গৌড়হরি থমকে গিয়ে বলল,— তোমরা এখানে একটু অপেক্ষা কর, আসচি আমি।

সে সামনে একতলা বাড়িতে ঢুকে গেল। প্রায় মিনিট পনেরো কেটে যায়। পথে দাঁড়িয়ে দেবুরা ভাবে, কী ব্যাপার?

গৌড়হরি বেরিয়ে এল। কাছে এসেই দেবু শিবের হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে খুশির সুরে বলল,— তোমাদের কিঞ্চিৎ সুবিধের ব্যবস্থা করে ফেলেছি। বেশ বুঝেশুনে দরদস্তুর করবে। চানা দাসু মহা কিপটে।

হতভম্ব শিবুদের নিয়ে সে ঢুকল যে বাড়ি থেকে সে এখুনি বেরিয়ে এসেছে।

ঢুকেই একখানা বড় ঘর। সেখানে দেয়াল ঘেঁষে চৌকিতে বসে এক ভদ্রলোক। পরনে তাঁর হাতাওলা গেঞ্জি ও ধুতি। স্থূলকায়। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। হাঁড়িপানা মুখখানায় একজোড়া মোটা পাকানো গোঁফ। তার সামনে একটা খোলা খেড়োর খাতা। মনে হয় লোকটি হিসেব কষছিলেন।

ঘরে অনেকগুলি পুরনো কাঠের চেয়ার। একধারে কাচের পাল্লা দেওয়া আলমারিতে বিস্তর খাতাপত্তর ক্যাশমেমো। মেঝেতে কয়েকটা বড় বড় ঢাকা দেওয়া ঝুড়ি এবং পিচবোর্ডের বাক্স। গোটা ঘরে কেমন জানি তেল মেশানো ভাজা মশলার বিটকেল গন্ধ ভাসছে। চৌকিতে বসা লোকটি লালচে চোখে দেবুদের একপ্রস্থ দেখে নিয়ে চেয়ার দেখিয়ে বললেন—বসুন।

দেবু শিব বসল সামনে। গৌড়হরি পাশে দাঁড়িয়ে বলে উঠল লোকটিকে দেখিয়ে,— ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত কুড়মুড় চানাচুর কোম্পানির মালিক শ্রীদাসরথি দাস। আর এই দুজনের কথা তো বলেছি। বিখ্যাত পর্যটক।

শিবদের মনে পড়ল, এই দাসরথি দাসকে তারা দেখেছিল খাবার দোকানে। তারা চা মুড়ি শেষ করার আগেই ইনি উঠে যান।

দু পক্ষে নমস্কার বিনিময় হল। দাসমশাই গোঁফ চোমড়াতে চোমড়াতে হিসেবের খাতার ওপর চোখ রেখে কিছু ভাবছেন। দেবুদের মাথাতেই আসছে না তাদের এখানে হাজির করার কারণ।

অবশেষে দাসরথি কথা বললেন গম্ভীর চালে,— আপনারা যাচ্ছেন পায়ে হেঁটে?

হুঁ।— সায় দেয় দেবু।

— কোন্ পথে?

—নানুর বোলপুর পানাগড় হয়ে দিল্লি অবধি। অবশ্য কলকাতাও ঘুরে যেতে পারি।

উত্তম। আমার একটি প্রস্তাব আছে।— জানালেন দাসমশাই : পথে যেতে যেতে আপনারা

যদি কুড়মুড় চানাচুরের কিছু পাবলিসিটি দেন তাহলে কোম্পানি আপনাদের কিছু পারিশ্রমিক দিতে প্রস্তুত।

কী রকম?— শিবের প্রশ্ন।

কোনো খাটুনির ব্যাপার নয়। শুধু আপনাদের ব্যাগের গায়ে কুড়মুড়ের বিজ্ঞাপনের একখানা করে হ্যান্ডবিল সেঁটে দেব। আর শ'দুই হ্যান্ডবিল দেব, পথে যেতে যেতে জায়গা মতো বিলোবেন। এর বদলে আপনারা পাবেন প্রত্যেকে দশ প্যাকেট স্পেশাল সাইজ কুড়মুড়।

না না।—দেবু মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গৌড়হরি আরও বেগে ঘাড় নেড়ে বলে উঠল,— কী বলছেন দাসমশাই। এটা কি একটা ন্যায্য লেনদেন হল? অতগুলো চানাচুরের প্যাকেট নিয়ে ওরা করবেটা কী? দু প্যাকেট কুড়মুড় খেলেই তো কাত, আর হাঁটতে হবে না। আপনি নগদে আসুন।

দাসরথি খাপ্পা হয়ে ধমকালেন,—তুমি চুপ কর গৌড়হরি। সবাই তোমার মতো পেটরোগা নয়। ঠিকআছে, পাঁচ টাকা নগদ আর পাঁচ প্যাকেট কুড়মুড় দিতে পারি।

দেবু উঠে দাঁড়াল,— মাপ করবেন, আমরা এসব পারব না।

গৌড়হরি খপ্ করে দেবুর জামা খিমচে ধরে বলল, আহা উত্তেজিত নয়। দরাদরি ব্যবসার দস্তুর। দাসমশাই নগদটা দশ করুন। বুঝচেন, কী দারুণ প্রচার হবে কুড়মুড়ের। একবারে কলকাতা দিল্লি অবধি। আপনার ফ্যাক্টরিতে তখন তিনজনের বদলে পনেরোজন ওয়ার্কার নিয়ে সামলাতে পারবেন না।

মাপ করবেন, আমাদের দ্বারা এসব হবে না। চ শিব। শিবকে নিয়ে দেবু সবেগে বেরিয়ে পড়ল কুড়মুড়ের আপিস থেকে।

হনহন করে চলেছে দুজনে। পিছন থেকে গৌড়হরির ডাক শোনা গেল,— আরে ভাই রসো রসো।

দেবু ফিরে দাঁড়িয়ে চটে বলল,— এরকম ঝামেলা জোটাবার মানে?

ঝামেলা! ঝামেলা কেন?—গৌড়হরি অবাক। তোমাদের উপকার করতে চাইলাম। তোমাদের দেশ ভ্রমণে বাধা পড়ছে না অথচ কিছু রোজগার হয়ে যেত।

শিব বলল,— হ্যাঁ, আর লোকে ভাবত আমার চুড়মুড়ের সেলস্ম্যান।

গৌড়হরি বলল,— আহা বিজ্ঞাপন দেনেওয়ালাদের থেকে কিছু খরচ তুলে নিয়ে সৎকাজে লাগালে দোষের কী? বিজ্ঞাপনের টাকায় কত আচ্ছা আচ্ছা ফাংশান হয়, ম্যাচ খেলা হয়। তাতে কি লোক খারাপ বলে? তাছাড়া কুড়মুড়ের হ্যান্ডবিল সেঁটে বেশি দূর যাবেন কেন? খানিক দুর গিয়ে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে দিলে কে জানছে। আর হ্যান্ডবিল রইল ব্যাগে। চায়ের জল গরম করবে।

দেবু ফের ঘাড় নাড়ে,— নাঃ দরকার নেই।

গৌড়হরি হতাশভাবে বলল,— এই জন্যেই বলে বাঙালিদের ব্যবসা বুদ্ধি নেই। তা যাকগে, বাদ দাও কুড়মুড়। তোমরা তো এখন নানুরের দিকে যাবে। ওই পথে আমার গ্রাম নিশাপুর। মাইল চারেক দুরে। আমার বাড়িতে আজ দুপুরে তোমাদের নেমন্তন্ন। আমি বাবা তোমাদের সঙ্গে হাঁটতে পারব না। আমি চলে যাচ্ছি বাসে। তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করব

বাস রাস্তার ধারে। গরিবের ঘরে দুমুঠো যা পারি খাওয়াব। ব্রজখুড়োর গপ্পো শুনে ভারি আনন্দ পেয়েছি। তারই ঋণ শোধ বলতে পার।

গৌড়হরি বিদায় নিল। টুপি কিনে শিব দেবু রওনা দেয় নানুরের দিকে।

শিব বলল,— কুড়মুড়ের অফারটা অ্যাক্‌সেপ্ট করলে মন্দ হত না। বেশ চানাচুর খেতে খেতে যাওয়া যেত। ওঃ গৌড়হরির প্যাঁচখানা দারুণ।

দেবু মিচকে হেসে বলল,—শুনলি তো কুড়মুড়ের গুণ। পথে পৈটিক গোলযোগ ঘটলে তখন কী অবস্থা হত?

পথের ধারে এক পুকুরে দেবুরা স্নান করে নিল।

একটি লোক মাঠ থেকে এসে রাস্তায় উঠল। শিব জিজ্ঞেস করে তাকে,— দাদা নিশাপুর আর কতদূর?

ওই সামনের গাঁ।— উত্তর হয় : নিশাপুরে যাবেন? কার বাড়ি?

—গৌড়হরি দে।

— কেন?

—ওঁর বাড়িতে আজ দুপুরে আমাদের নেমন্তন্ন।

লোকটি ভুরু কুঁচকে বলে,—আপনারা কোত্থেকে আসছেন?

দেবু সংক্ষেপে নিজেদের পরিচয় দেয়।

লোকটি ব্যাঁকা হেসে বলল,— নেমন্তন্ন! বটে বটে। গৌড়হরির নিজের খাওয়া জোটে না, আবার নেমন্তন্ন করে লোক খাওয়াবে! তা খাওয়া-খরচ কী রকম নেবে বলেছে কিছু?

খাওয়া খরচ কেন?—দেবু অবাক।

লোকটি তেমনি সুরে বলল,—আপনারা ছেলেমানুষ, তাই সাবধান করে দিচ্ছি। গৌড়হরি মানুষ সুবিধের নয়। লোক ঠকিয়ে খায়। ওই যে ও আসছে ইদিকে।

লোকটি অর্থপূর্ণভাবে একবার দৃষ্টি হেনে মেঠো পথ ধরে চলে গেল নিশাপুরের দিকে।

দেবু চাপা স্বরে বলল,— এই জন্যেই গৌড়হরি আমাদের টাকাপয়সার খোঁজ নিচ্ছিল। কি যাবি ওর বাড়ি? ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি।

গৌড়হরি ততক্ষণে কাছে এসে পড়েছে। হাসি মুখে ডেকে বলল,— তোমাদের যে দেরি হল ভাই। বাঃ স্নান সেরে নিয়েছ। চল চল।

দেবু ইতস্তত করে বলল, এখন থামব না। ভাবছি আরও এগোই।

গৌড়হরির চাউনি তীক্ষ্ণ হয়। গম্ভীর সুরে বলে,— ও, আমার বাড়ি যেতে বুঝি আপত্তি? বুঝেছি, রামপদ লাগিয়েছে আমার নামে। কী বলেছে? আমি ঠক জোচ্চোর, তাই না?

দেবু শিব নীরব।

গৌড়হরি হেসে উঠে বলল,— নেহাৎ মিথ্যে বলেনি। হ্যাঁ অভাবের সংসার চালাতে অনেক কুকর্ম আমায় করতে হয় ঠিকই। যাদের অনেক সম্পদ, সুযোগ পেলে তাদের ঠকিয়ে দুপয়সা কামাই। তবে তোমাদের ভয় নেই। তোমাদের আছেটা কী যে হাতাব। তাছাড়া তোমাদের আমার ভালো লেগেছে। আমারও পাপপুণ্য বিচার আছে ভাই। কি যাবে আমার বাড়ি?

· হ্যাঁ যাব।— শিব এবার জোর গলায় বলল, দেবুও সমর্থনে ঘাড় নাড়ে।

গৌড়হরির বাড়ির চৌহদ্দি বেশ বড়। তবে খড়ে ছাওয়া মাটির ঘরগুলির জীর্ণ দশা দেখে বোঝা যায় গৃহস্বামী খুবই অভাবী। দাওয়ায় চাটাই পেতে বসল তারা।

দুটি পাঁচ-ছয় বছরের ছেলে এবং একটি বছর দশেকের মেয়ে এসে কাছে দাঁড়াতে গৌড়হরি জানাল,— আমার ছেলে মেয়ে। ওদের কাছে তোমাদের গল্প বলেছি। কী দুঃসাহস, খালি হাতে ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছে পায়ে হেঁটে। দেখছ না কেমন থ হয়ে দেখছে তোমাদের। হাঃ হাঃ—

একটু একটু করে আরও অনেক ছোট ছেলেমেয়ে এসে জুটল গৌড়হরির উঠোনে। তাদের বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টি দুই পর্যটকের ওপর নিবদ্ধ। দু চারটি বয়স্কলোকও উঁকি দিয়ে গেল, তবে ঢুকল না। গৌড়হরিও তাদের আহ্বান জানাল না।

ক্ষীণকায়া স্নিগ্ধদর্শন কপাল অবধি ঘোমটাটানা গৌড়হরির স্ত্রী খাবার পরিবেশন করলেন। ভাত, ডাল,আলু ভাজা, শাক ভাজা, কচুর তরকারি, পুঁটি মাছের ঝোল, টক— এমনি সাদাসিদে আয়োজন, তবে চমৎকার স্বাদ রান্নার। শিবরা খেয়ে ভারি তৃপ্তি পেল।

খাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে রওনা হবার পালা। দেবু গৌড়হরির ছেলেমেয়েদের হাতে একটি টাকা দিতে গেল মিষ্টি খেতে। হাঁ হাঁ করে উঠল গৌড়হরি— তোমরা কেন? আমারই বরং অতিথি ভোজন করিয়ে দক্ষিণা দেওয়া উচিত। এই নাও ভাই কটা মুড়ির মোয়া। তোমাদের বউদির উপহার। আমাদের সাধ্যি তো বুঝচ।

তারপর অল্প ইতস্তত করে দেবুর হাতে একটা চিরকুট গুঁজে দিয়ে গৌড়হরি বলল, —ঠিকানাটা রাখ ভাই। বর্ধমান শহরে আমার এক পরিচিতের। একটু দুর্নাম আছে বটে তার। গুন্ডামির কেসে একবার জেল খেটেছে। তবে মনটা দরাজ। দাপটও আছে। আমার ফ্রেন্ড শুনলে ঠিক সাহায্য করবে। বিদেশ ভুঁইয়ে কাকে কখন প্রয়োজন হয়।

পিচ রাস্তায় পাশাপাশি নীরবে চলতে চলতে দেবু বলে,— বাইরে থেকে শুনে সবসময় মানুষ ঠিক চেনা যায় না, তাই নারে? কে বলবে, গৌড়হরিবাবুর মনটা এমন— শিব সমর্থনে ঘাড় দোলায়।

পাঁচ

দেবুরা ভেবেছিল নানুর ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে যাবে। কিন্তু তা সম্ভব হল না। গৌড়হরির বাড়িতে গুরুভোজন এবং বেরুতে বেরুতে দেরি হল। পথে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় দাঁড়াতে হল রাস্তার ধারে এক বাড়ির দাওয়ায়। আবার আকাশে মেঘ ঘনাচ্ছে দেখে তারা সামনের গ্রামে ঢুকল রাতের আশ্রয়ের সন্ধানে।

গ্রামের ভিতরের এক জায়গায় আড্ডা হচ্ছে। বছর পঞ্চাশ বয়সি ফতুয়া ও ধুতি পরা ছোটখাটো ফর্সা এক ভদ্রলোক হাতমুখ এবং ছাতা নেড়ে কিছু বলছেন উচ্চৈঃস্বরে। দেবু শিব গুটিগুটি কাছে হাজির হতে গোটা জমায়েত জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল তাদের পানে।

দেবুরা নমস্কার করে নিজের পরিচয় আর আগমনের উদ্দেশ্য বলল। বক্তৃতাবাজ ভদ্রলোক গ্রামের এক যুবককে প্রশ্ন করলেন, —আসরফ এরা কোত্থেকে আসছে?

ভদ্রলোক তার কথা ঠিক বুঝতে পারেননি ভেবে দেবু ফের জানাল— আজ্ঞে আমরা আসছি লাভপুরের কাছে চন্দনা গ্রাম থেকে।

অ্যাঁ, ভাগলপুর! এখানে কেন— ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ বিস্মিত।

দেবু শুনে হকচকিয়ে গিয়ে কী বলবে ভাবতে ভাবতে আসরফ বেশ জোরে চেঁচিয়ে বলল, —ভাগলপুর নয় ঘোষদা, লাভপুর। লাভপুরের কাছে চন্দনাগ্রাম। এরা পায়ে হেঁটে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছে। আজ রাতে এখানে আশ্রয় চায়।

ঘাড় কাত করে আসরফের কথা শুনে ঘোষদা বললেন,— অ্যাঁ পায়ে হেঁটে! কদ্দুর যাবে?

দেবু বুঝে গিছল যে ঘোষদা কানে খাটো তাইসে গলা চড়িয়ে জানাল,— আজ্ঞে দিল্লি।

—দিল্লি—! বাঃ বাঃ। দারুণ এমনি ছেলেই তো চাই দেশে। এই বয়সে কী সাহস! কী উৎসাহ! —উৎসাহিত ঘোষদা দেবুদের সাথে হ্যান্ডসেক করে, পিঠ চাপড়ে জানতে চাইলেন : কী কর? মানে স্টুডেন্ট?

সপ্তমস্বরে দেবু জবাব দিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ। উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছি এই বছর।

বেশ বেশ।—ঘোষদা বললেন ঃ এখানে আশ্রয় মিলবে বৈকি। আলবাত মিলবে। এ আমাদের কর্তব্য। আমাদের সবুজ সংঘের পক্ষ থেকে তোমাদের যতটা সম্ভব সাহায্য করা হবে। এই মুখুজ্যেমশাই হচ্ছেন সবুজ সংঘের ট্রেজারার। আর এই আসরফ হচ্ছে মধ্যমণি। সবচেয়ে উৎসাহী মেম্বার। আমিও আছি—

আসরফ যোগ করে দিল—উনি শ্রীমদন ঘোষ আমাদের ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট।

ঘোষদা বললেন— আসরফ ব্যবস্থা করে ফেল। দেখ যেন কোনো ত্রুটি না হয়। হয়তো এরা একদিন বিখ্যাত হবে। ভ্রমণকাহিনি লিখবে। তখন আমাদের হলুদভাঙা আর সবুজ সংঘ সম্পর্কে যেন দুটো ভালো কথা থাকে।

ঘোষদার লেকচার থামতে চায় না। আসরফ দেবুদের মৃদু ঠেলা দিয়ে বলল—চলুন আমার সঙ্গে। রেস্ট নেবেন আমাদের ক্লাব ঘরে।

সবুজ সংঘের ক্লাব ঘরটি পাকা। উঁচু বারান্দায় দেবু শিব বসল। দেখতে দেখতে সামনে বাচ্চাদের ভিড় জমে গেল। অনেক যুবক ও বয়স্কলোক এসে আলাপ করে গেল দেবুদের সঙ্গে। চা-বিস্কুট এল। এমন খাতির যত্নে দুই পর্যটকের মন হয়ে উঠল প্রফুল্ল, একটু গর্বও হল। সব জায়গায় যদি এমন ব্যবহার পাওয়া যায় ভ্রমণটা মন্দ হবে না। ওদের বসিয়ে রেখে আসরফ উধাও হয়েছিল। সন্ধ্যা নামল। ছোটদের ভিড় সরলেও বড়দের আসার কমতি নেই। বকে বকে মুখ ব্যথা হয়ে গেল দেবুদের। শেষে বাধ্য হয়ে তারা ঘুমের ভান করে শুয়ে চোখ বোজে।

আসরফ ফিরল ঘণ্টাখানেক বাদে। দেবু শিবকে বলল,—তোমাদের রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করে এলেম।

তারপর কিঞ্চিৎ কাঁচুমাচু ভাবে জানাল,— দু'জনকে দু'জায়গায় খেতে হবে কিন্তু। মানে তোমাদের কে আতিথ্য করবে তাই নিয়ে গ্রামে কম্পিটিশন লেগে গেছে। রীতিমতো রেষারেষি। মানে প্রেস্টিজের ব্যাপার আর কী। অনেক বোঝানোর পর আজ এই ব্যবস্থা সাব্যস্ত হয়েছে। তোমাদের খুব অসুবিধে হবে কি?

নাঃ। অসুবিধের কী আছে।— জানায় পর্যটকরা।

ঘোষদা এলেন তড়তড়িয়ে,—আসরফ খবর কী? এদের এখনও খেতে নিয়ে যাওনি?

ব্যবস্থা হচ্ছে।— জানায় আসরফ। ঠিক সময়ে ডাকতে আসবে।

এ্যাঁ,ব্যস্ত হচ্ছে কেন? —ঘোষদা উদ্বিগ্ন।

আজ্ঞে, ব্যস্ত নয় ব্যবস্থা হচ্ছে খাবার।— গলা চড়িয়ে জানাল আসরফ।

উত্তম উত্তম। তোমায় যখন ভার দিয়েছি আমি নিশ্চিন্ত। এইরে! আচ্ছা ভাই এখন আমি যাচ্ছি। কাল আবার দেখা হবে। বুঝলে কিনা বাড়িতে কুটুম এসেছে। তাই আলুপেঁয়াজ কিনতে দিয়েছিল। স্রেফ ভুলে গেছলাম এতক্ষণ। দেখি দাসুর দোকান খোলা আছে কিনা? নইলে কেলেঙ্কারি।— ঘোষদার দ্রুত প্রস্থান।

একটি ছেলে এসে দাঁড়াল সামনে। আসরফ বলল, মুখুজ্যে বাড়ি থেকে ডাক এসেছে। কে যাবেন?

শিব উঠল।

খেতে বসে শিবের চক্ষু স্থির।

প্রকাণ্ড এক কাঁসার থালার মাঝে মিহি চালের ভাতের ঢিবি। এবং থালা ঘিরে নানান আকারের বাটি ও প্লেট সাজানো। শিব গুণে দেখল—আটটা। ডাল তরকারি মাছ টক মিষ্টি কী নেই! শিব কাতর ভাবে জানাল,— এত না, কমিয়ে দিন। কাল আবার আমাদের অনেক পথ চলতে হবে। ভোরেই বেরুব। এত খেলে কি আর?

গৃহস্বামী সস্নেহে বললেন,— এ আর এমন কি? ইয়াংম্যান। তোমার বয়েসে আমি এর দ্বিগুণ খেতুম।

শিব তবু—মাথা নাড়ে। মুখুজ্যেমশাই বললেন,— বেশ যা পার খাও। অন্তত প্রত্যেকটি আইটেম একবার টেস্ট করে দেখ।

শিবের খাওয়া মাঝামাঝি এগিয়েছে। হঠাৎ এক ছোকরা হন্তদন্ত হয়ে এসে মুখুজ্যেমশাইকে খানিক দূরে নিয়ে গিয়ে কী জানি বলল ফিসফিসিয়ে। অমনি মুখুজ্যে দৌড়ে গেলেন দরজায় দাঁড়ানো তাঁর গিন্নির কাছে। আবার ফিসফাস। এবং মুখুজ্যে গৃহিণীর অন্তর্ধান।

মিনিট দশেক বাদে মুখুজ্যে গিন্নি দুটি বেগুন ভাজা এনে ঢেলে দিলেন শিবের পাতে। শিব আঁতকে ওঠে—এ কী আবার কেন? ভাজা তো দিয়েছেন।

মুখুজ্যেমশাই হেসে বললেন,— একটু চাখ। বুঝলে কিনা, এক্ষুণি জানলেম বাঁড়ুজ্যে বাড়িতে তোমার বন্ধুকে আটটা আইটেম সার্ভ করেছে। আমার খবর ছিল ওরা সাতটা পদ বানাবে। তা বাঁড়ুজ্যেদের কাছে হেরে যাব তা কি হয় ভাই? হেঃ হেঃ—

ফেলে ছড়িয়ে প্রাণপণে আহার শেষ করল শিব। মনে ভয় আবার কী খবর আসে।

হাঁসফাস করতে করতে ক্লাব ঘরে পৌঁছে শিব দেখল দেবু বারান্দায় শুয়ে, কাছে বসে আসরফ। শিব সটান গড়িয়ে পড়ল পাশে।

দেবু বলল,— কেমন খেলি?

শিব শুধু বলল, — বাপস্।

দেবু বলল,—আমার খাওয়া শেষ, তখন বলে কিনা আরও দুটো পদ খেয়ে যেতে হবে, রান্না হচ্ছে। জোর করে পালিয়ে এসেছি।

আসরফ কাঁচুমাচু ভাবে বলল,—শোবেন কোথায়? অনেক বাড়ি থেকেই আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছে।

দেবু হাত জোড় করে,—দাদা আর কোথাও নয়। এই ক্লাব ঘরে শোব আমরা।

আসরফ মাথা চুলকে বলল,— সেই ভালো। নইলে এই নিয়ে একটা কাজিয়া না বেধে যায়। বুঝছেন না প্রেস্টিজের ব্যাপার। তাছাড়া দু'জনকে আলাদা আলাদা শুতে হবে।

সকালে শিবরা তোড়জোড় করছে বেরুনোর। ঘোষদা হাজির হয়ে বললেন,—না ভাই, এখন তো তোমাদের যাওয়া হবে না। অসম্ভব। সবুজ সংঘের পক্ষ থেকে তোমাদের একটা সংবর্ধনা দেবে। আসরফ ব্যবস্থা করছে।

শিবের অনুরোধে কানই দিলেন না ঘোষদা,— এক বেলা বেশি থাকলে কী এমন ক্ষতি! আমাদের মেম্বাররা, গাঁয়ের ছেলেরা তোমাদের দেখে উদ্বুদ্ধ হবে, একটু ত্যাগ স্বীকার করবে না?

অগত্যা সকালের যাত্রা পণ্ড হল।

বেশ ভিড় হল সংবর্ধনা সভায়। শুরু হতে দশটা বাজল। প্রোগ্রাম— সবুজ সংঘের পক্ষ থেকে তরুণ পর্যটকদের প্রশংসায় মুখর চারটি দীপ্ত ভাষণ। ফাঁকে ফাঁকে তিনটি গান। পর্যটকদের আহ্বান জানানো হল কিছু বলতে। নিমরাজি দেবু উঠল। শ্রোতাদের দাবি, —অভিজ্ঞতা শুনতে চাই।

দেবু বলল, গৌড়হরির কথা।

শ্রোতারা সন্তুষ্ট নয়, রোমাঞ্চকর কিছু বলুন। কারণ এর আগে ঘোষদা জানিয়েছেন যে এরা ভয়ংকর সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসেছে।

দেবু বাধ্য হয়ে সিধু খুড়োর মুখে শোনা ভূতুড়ে সরাইখানায় রাত্রিবাসের অভিজ্ঞতাটা নিজেদের নামে চালালো। তবে ঘটনাস্থল পালটে দিয়ে হল এই পথেই এক পরিত্যক্ত ভূতুড়ে বাড়ি। এবার শ্রোতারা ভারিখুশি।

সভা শেষ হতে দুপুর বারোটা বাজল। অতএব ভাত খেয়ে যেতে হবে। নেমন্তন্নর নামে শিবদের আতঙ্ক। আসরফ বলল,— বুঝিয়ে বলছি, খাওয়াটা যাতে লাইট হয়। তবে ভাই দুবাড়িতে দুজনকে আলাদা খেতে হবে। সবাই চাইছে। প্রেস্টিজের ব্যাপার।

দেড়টা নাগাদ শিব দেবু রওনা হওয়ার জন্য তৈরি হয়। ঘোষদা বললেন,— আকাশে মেঘ জমেছে, আজ বরং থেকে যাও।

শিবরা মরিয়া। তারা পালাবেই। দুজনে জোর কদমে পা চালাল বড় রাস্তা ধরে। পিছু পিছু অনুসরণ করল সবুজ সংঘের জনা কুড়ি সভ্য। তারা বিখ্যাত দুই পর্যটকদের মাইলখানেক এগিয়ে দেবে সম্মান জানাতে।

অতি অস্বস্তিকর অবস্থা। পাশ দিয়ে বাস যায়। যাত্রীরা মুখ বাড়িয়ে হাঁ করে দেখে। পথের লোক দাঁড়িয়ে যায় মজা দেখতে। দেবুদের একান্ত অনুরোধে অবশেষে বিদায়ী মিছিল থামল। 'জয়হিন্দ, বন্দেমাতরম, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, বাঙালী পর্যটক যুগযুগ জিও'— ইত্যাদি ধ্বনি দিয়ে মিছিল ফিরে চলল হলুদডাঙায়।

দেবুরা খানিক যেতে যেতে লক্ষ করল একটি বছর চোদ্দোর ছেলে তাদের পিছু পিছু

আসছে। তার পরনে হাফপ্যান্ট হাফসার্ট। খালি পা। মিষ্টি মুখখানা। দেবুদের চলার তালে হাঁটছে।

হঠাৎ দেবু ফিরে জিজ্ঞেস করল, — এই ছেলে কোথায় যাচ্ছ?

ছেলেটি থমকে গিয়ে ইতঃস্তত করে বলল— তোমাদের সাথে।

—সেকী ! কদ্দুর যাবে?

—দিল্লি।

—এ্যাঁ, সে যে ঢের দূর জান?

ছেলেটা ধবধবে সাদা দাঁতে ঝিলিক দেখিয়ে নিঃশব্দে হাসল।

ছেলেটার কি তাদের মতন দেশ ভ্রমণের নেশা চেপেছে?

তোমার বাড়িতে জানে?— জিজ্ঞেস করে দেবু।

ছেলেটা চুপ। অর্থাৎ জানে না। ও লুকিয়ে আসছে! সর্বনাশ!

তোমার নাম কী?—জানতে চায় শিব।

উত্তর হল,— বঙ্কু।

—কোথায় বাড়ি?

হুই গাঁ।— ছেলেটা হলুদডাঙা দেখায়।

দেবু বোঝায়,—যাও যাও, বাড়ি ফিরে যাও। এই বয়সে কি দিল্লি যাওয়া যায়। না বলে এসেছ কেন? বাড়িতে ভাববে।

শিব দেখল ভাল কথায় কাজ হবে না। সে চড় তুলে তাড়া করে,— পালা বলছি।

বঙ্কু এক দৌড়ে অনেকখানি পিছিয়ে ফের অপেক্ষা করে।

ধুত্তেরি। আচ্ছা আপদ। ওর মাথায় ছিট আছে নাকি? বিরক্ত দেবু শিব ফের এগোতে লাগল। বঙ্কুও যথারীতি তাদের অনুসরণ করছে বেশ তফাতে থেকে।

দেবু থেমে বলল,— ছেলেটাকে বেশি দূর নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। কোনো অ্যাকসিডেন্ট হলে আমাদের দায়ী করবে। না বলে পালিয়ে এসেছে। বাড়ির লোক যদিপুলিশে খবর দেয়? একে বরং কায়দা করে গ্রামে ফিরিয়ে দিয়ে আসি। অযথা দেরি হয়ে যাচ্ছে। কী করা?

দেবু বঙ্কুকে বলল,— আমরা হলুদডাঙায় ফিরব। একটা জিনিস ফেলে এসেছি।

বঙ্কু ঠিক মতলব বুঝে ফেলেছে। সে মাঠের ভিতর নেমে গিয়ে ব্যাপার দেখে। এবার আর তাদের পিছু নেয় না।

শিব রেখে বলল,— বেটা আস্ত শয়তান। ঠিক আছে চ এগোই। ও একটু কাছে আসুক। ছুটে গিয়ে ধরে ফেলে তখন নিয়ে যাব ওর বাড়িতে।

দেবু শিব নানুরের পথে রওনা দেয়। বঙ্কু ফের পিছু ধরে।

এক সাইকেলচালক ঊর্ধ্বশ্বাসে আসছিল পিছন থেকে। দেবু, শিব বা বঙ্কু নজর করেনি। সে বঙ্কুর ঘাড়ের কাছে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে নেমেই সাইকেল মাটিতে ফেলে এক লাফে গিয়ে ধরে ফেলে বঙ্কুর হাত। সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার ছাড়ে,— হতভাগা কোথায় যাচ্ছিস?

দেবু সাইকেলে আগন্তুক যুবককে বলল, — একে চেনেন?

চিনি বইকি। আমার গুণধর ভাইপো।— উত্তর হয়।

দেবু বলল,— ও আমাদের সঙ্গ ধরেছিল দেশ ভ্রমণে যাবে বলে, কিছুতেই ফেরাতে পারছিলাম না।

যুবক এক হাতে বঙ্কুর হাত অন্য হাতে তার কান পাকড়ে গর্জন ছাড়ে,—দেশ ভ্রমণ না হাতি। বেটা রাগ করে বাড়ি থেকে পালাচ্ছিল।

—কেন?

কেন আবার, বেটা বজ্জাতের ধাড়ি। সকালে এক শিশি কুলের আচার খেয়ে নিয়েছে লুকিয়ে। তাই বউদি মানে ওর মা দু চারটে চড়চাপড় মেরেছিল। সেই রাগ। দুপুরে খাবার সময় খেয়াল হয়েছে বঙ্কা নেই। বাড়িতে হুলুস্থুল পড়ে গেছে। আমি সাইকেলে খুঁজতে বেরিয়ে দেখলাম ভাগ্যিস—। চ বাড়ি। — কাকা বঙ্কুকে তার সাইকেলের সামনের রডে চড়াল জোর করে।

কাঁদ কাঁদ বঙ্কুর মুখ দেখে মায়া হল দেবুর। বলল,—ওকে বাড়িতে মারধর করবেন না। এখন একে ফেরত নিয়ে গেলে আমরা উদ্ধার হই।

কাকা ভাইপোসমেত জোর প্যাডল মারল হলুদডাঙার উদ্দেশে।

ছয়

বঙ্কুর কবল থেকে নিস্তার পাওয়ার পর আধঘণ্টা কেটেছে। খোশমেজাজে হাঁটছে শিব ও দেবু। মনে বাজছে হলুদডাঙার অভ্যর্থনার রেশ সহসা—ক্রিং ক্রিং। পিছনে সাইকেলের ঘণ্টির আওয়াজ। বেজেই চলেছে।

দেবুরা ফিরে দেখল দুটি ছেলে আসছে সাইকেলে। অবাক ব্যাপার, এরা তো চেনা ছেলে! তাদের কাছের গ্রাম মথুরাপুরের বাসিন্দা নন্তু আর সন্তু। ওরাও দেবুদের মতন এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে, তবে অন্য স্কুল থেকে।

দুই সাইকেল আরোহী কাছে আসতে দেবুরা থ। ওদের প্রত্যেকের সাইকেলের সামনে ঝুলছে একখানা করে ছোট টিনের বোর্ড, লাল রং করা। তাতে সবুজ রঙের বড় বড় হরফে লেখা— ভূপর্যটক। এবং নিচে ওদের ভালো নাম।

সন্তু নন্তুর সাইকেলের মাঝের রডে এবং ক্যারিয়ারে আটকানো পেট মোটা ব্যাগ। চন্দনার চিরকেলে প্রতিদ্বন্দ্বী এই মথুরাপুরের দেশ ভ্রমণের সঙ্কল্প চাড়া দিচ্ছে জেনেই দেবুরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রাম ছাড়ে। তবু মথুরাপুরকে রোখা যায়নি। ওরাও বেরিয়েছে। তবে সাইকেলে।

চন্দনা গ্রামের অভিযাত্রীদের পাশ কাটাবার সময় মথুরাপুরের গতি কমে। নন্তু ঘাড় ফিরিয়ে বলল,— আরে শিব দেবু তোমরা? কোথায় যাচ্ছ?

তারপর নিজেই উত্তর দেয়,— ও বুঝেছি। তা মাত্র এইটুকু এসেছ অ্যাদ্দিনে! আমরা তো ভাবলাম তোমরা বোধহয় দিল্লি পৌঁছে গেছ। চটপট পা চালাও ভাই, নাহয় দৌড়ও মাঝে মাঝে। আচ্ছা ফির মিলেঙ্গা।

শিবদের মনে জ্বালা ধরাতেই মথুরাপুরের দল হাত নেড়ে ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে এগিয়ে যায় এবং বেসুরো গলায় গান জোড়ে— চল চল চল। ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল...

গুম হয়ে যাওয়া দেবু বা শিবের মুখে অনেকক্ষণ কোন কথা ফুটল না। আগের ফুর্তি উবে গেছে। শিব ফোঁস করল,— হুঃ ভূপর্যটক। প্রচারের বহর দেখলি প্ল্যাকার্ড লাগিয়েছে।

আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া পাশুটে মেঘ ক্রমে একজায়গায় জড়ো হতে থাকে। মেঘের রং গাঢ় কালো হচ্ছে। সূর্যের আলো ম্লান। থমথমে আকাশ। মাঝে মাঝে ঝিলিক দিচ্ছে বিদ্যুৎ। বাজের গুড়গুড়ুনি ক্রমে এগিয়ে আসছে কাছে। দেবু বলল,— ঝড় জল আসবে। আর এগুবি? না থামবি পাশের গ্রামে?

নাঃ, এখন থামা নয়। যতক্ষণ পারি এগোই। নামুক বৃষ্টি, তখন যেখানে পারি ঢুকে পড়ব। ঢের সময় নষ্ট হয়েছে।— জোরে জবাব দেয় শিব। বোঝা গেল মথুরাপুর পার্টি ওর মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে। রোখ চেপে গেছে ওর।

মিনিট কুড়ি বাদে বৃষ্টি নামল। কাছে কোনো গ্রাম নেই। দুধারে মাঠ। দেবুরা রাস্তার পাশে একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় আশ্রয় নিল।

ছাঁটের তোড় বাড়ে। পাতার আচ্ছাদনে আর জল আটকায় না। ক্রমেই ভিজে যাচ্ছে তারা। এই সঙ্গে ঘন ঘন চোখ ধাঁধানো বিজলির ঝলক এবং পিলে চমকানো বজ্রগর্জন।

মাঠের ভিতরে শ খানেক হাত দূরে একটা ছোট্ট চালাঘর দেখা যাচ্ছিল। দেবু বলল,— চল্, এক ছুটে ওখানে যাই। এখানে থাকা অসম্ভব।

দুজনে মারল দৌড়।

চালাটার নিচে পৌঁছে গা মুখ মুছে একটু ধাতস্থ হয়ে চারপাশ দেখে তারা, এটা ঘর নয়। তিন দিকে মাটির দেওয়াল। এক দিক খোলা। মাথায় খড়ের ছাউনি। কোন উদ্দেশ্যে তৈরি এটা?

চারধার নজর করে দেবু সভয়ে বলল,— ওরে শিব এ জায়গাটা যে শ্মশান! ওই দেখ। পোড়া কাঠ। হাড়গোড় ভাঙা কলসি ছড়িয়ে পড়ে আছে।

ছাউনির খানিক পিছনে একটা ইটের দেওয়াল, মানুষের বুক সমান উঁচু, হাত দশেক লম্বা। তারই গায়ে চিতা জ্বালানোর চিহ্ন স্পষ্ট। আরও একটু দূরে উঁচু পাড় দেখে ঠাহর হয় ওখানে কোনো পুকুর আছে। পুকুরের ওপাড়ে একটা বড় গাছের মাথা দেখা যাচ্ছে। ধারে কাছে কোনো বাড়ি বা বসতি দেখা গেল না। এই ছাউনির নিচে বোধহয় শববাহকরা বিশ্রাম নেয়। মেঝেতে পোড়া বিড়ির টুকরো। খালি সিগারেটের প্যাকেট, মাটির খুরি ইত্যাদি ছড়ানো। একটা জীর্ণ ছাতা ঝুলছে চালায়, কেউ ফেলে গেছে হয়তো।

বৃষ্টি কমবার লক্ষণ নেই। সমান ধারায় চলছে। দেখতে দেখতে দিনের আলো মুছে আসে। বৃষ্টি যখন ধরল তখন ঘোর অন্ধকার নেমেছে। শ্মশানের দিক থেকে নানারকম আওয়াজ আসে—'খড়মড় খসখস'। শিয়াল কুকুরের তর্জন গর্জন।

দেবু শিব যথেষ্ট সাহসী। তবু এই নিরালা প্রান্তরে শ্মশানের এত কাছে তাদের গা ছমছম করে। সারা রাত কি কাটাতে হবে এখানে? তাদের সঙ্গে টর্চ আছে। টর্চ জ্বেলে মাঠ পেরিয়ে রাস্তা ধরে কাছের কোনো গ্রামে হাজির হওয়া যায়। কিন্তু এমন অসময়ে অচেনা গ্রামে ঢুকলে কী অভ্যর্থনা জুটবে কে জানে? চোর ডাকাত ভেবে আচমকা তির বা বন্দুক ছুড়ে বসে যদি গ্রামের লোক?

টিপটিপ বৃষ্টি চলছে। শ্মশান ঘিরে অপার্থিব আওয়াজ বাড়ে। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ, যেন অশরীরীর দীর্ঘশ্বাস। শিব আর থাকতে পারে না। বলে,— চ এখানে আর নয়। এই ভূতের আস্তানায় সারা রাত ইম্‌পসিবল্‌। কাছে কোনও গ্রামে যাই।

দেবুও সায় দেয় তার প্রস্তাবে।

ছাউনিতে ফেলে যাওয়া ছাতাটা খুলল দেবু। কাপড়ে অজস্র ফুটো, কয়েকটা শিক ভাঙা। তবু বৃষ্টির হাত থেকে যতটুকু মাথা বাঁচে, তাই খোলার নিচে ঘেঁষাঘেষি করে দুজনে বেরিয়ে পড়ল ছাউনি থেকে। শিবের হাতে টর্চ। মাটিতে আলো ফেলে ধীরে ধীরে এগোয় তারা।

অল্প যেতেই তাদের নজরে এল দূরে কয়েকটি আলোর বিন্দু। ছায়া ছায়া মূর্তি কয়েকজনের। এদিকেই আসছে। কারা? ডাকাত নাকি?

—বল হরি, হরিবোল। বল হরি—

হাঁকটা কানে আসতেই শিবরা হাঁফ ছাড়ল। শবদাহের দল। ওরা কাছে আসুক। ওদের থেকে জেনে নেবে কাছে কোন গ্রামে আশ্রয় পাওয়া যাবে? মাথায় ছাতা মুড়ি দিয়ে দুজনে অপেক্ষা করে।

শববাহকের দল এগিয়ে আসে। হ্যাজাক ও লণ্ঠনের আলোয় তাদের চেহারাগুলি স্পষ্ট হয়। ওদের কেউ টর্চ ফেলল ছাউনি লক্ষ্য করে। আলোর রশ্মি ততদূর পৌঁছল না, তবে দেবুদের গায়ে সেই আলোর ক্ষীণ আভা স্পর্শ করে।

সঙ্গে সঙ্গে থমকে যায় আগুয়ান দলটি। উত্তেজিত চেঁচামেচির আওয়াজ। তারপরই দলটা পেছুতে থাকে। কী ব্যাপার?

'অ্যাঁ-ই-ই'—পিছনে খোনা গলায় কাঁপা সুরে ডাক শুনে ভীষণ চমকে ফিরে তাকায় দেবু শিব। দেখে, পুকুরের উঁচু পাড়ে আবির্ভূত হয়েছে এক দীর্ঘ মূর্তি, যেন জমাট আঁধারে গড়া।

বাপ্‌রে।— শিব জড়িয়ে ধরে দেবুকে।

দেবুও ভয় পেয়েছিল। তবে তার মাথা ঠান্ডা। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল,— কে?

পাল্টা প্রশ্ন হল—কেউ তোরা?

সঙ্গে সঙ্গে টর্চের আলো পড়ল তাদের গায়ে। তারপরই উঁচু পাড় থেকে সেই মূর্তি লম্বা লম্বা পা ফেলে নেমে এসে দাঁড়াল তাদের সামনে।

শিব টর্চ ফেলল। দেখল, অদ্ভুত চেহারার এক পুরুষ। রং মিশকালো। পাকানো দীর্ঘ শীর্ণ দেহ। ঝাঁকড়া চুল। পরনে কেবল মালকোঁচা মারা খাটো গামছা। আগন্তুক ফের টর্চ ফেলে দেবুদের দেখে নিয়ে কর্কশ স্বরে বলল,— কে তোমরা? কী কচ্চ এখানে?

দেবু বলল,— আমরা দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছি। হঠাৎ জল আসাতে এই ছাউনিতে আশ্রয় নিয়েছিলুম। এখন ভাবছিলুম চলে যাই। ওই যে দলটা আসছে মরা পোড়াতে, ওদের অপেক্ষায় ছিলাম। ভাবলাম, জিজ্ঞেস করেনি কাছে কোন্‌ গ্রামে আশ্রয় পাওয়া যাবে এখন। তা ওরা কেন চলে যাচ্ছে বুঝছি না?

পালাবে না?—রেগে বলল লোকটি : তোমাদের দানো পিশাচ ভেবেছে কিছু। আমি হারু ডোম, শ্মশানে বাস করি, আমারই কাঁপুনি লেগে গিছল দেখে। ওদের দোষ কী? ছাতাখানা অমন মেলেছ কেন? দূর থেকে ঠাহর হচ্ছে কিম্ভূত মাথাগুলো কোনো জীব বটে।

বলতে বলতে সে খপ্ করে ছাতাটা কেড়ে নিয়ে ধমকাল,— হেই আমার ছাতা বটেক। বাগালে কেমনে?

ছাউনিতে ছিল।— জানায় দেবু : ভাবলাম ব্যবহারযোগ্য নয় ভেবে কেউ ফেলে গেছে।

হ ভুলে ফেলে গেছলেম। খানিক সারিয়ে নিলে দিব্যি চলবে।— হারু সযত্নে ছাতাটি বগলদাবা করে। তারপর দূরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় থমকে যাওয়া শববাহকদের দল লক্ষ করে বিকট এক হাঁক ছাড়ে,— হুই-ই, কোন্ গাঁ বটে-এ?

হারুর গলা বোধহয় ওই দলের চেনা। তাই সেদিক থেকেও চিৎকার আসে,—নন্দপুর বটে-এ! কে হারু-উ?

হ-অ। আসেন গো।—হারু ডাক দেয়।

হারুর সাড়ায়ভরসা পেয়ে নন্দপুরের দল পৌঁছল শ্মশানে। তারা এসেই খোঁজ নিল, —ইখানে কী যেন একটা দেখলেম?

হো হো করে হেসে ওঠে হারু। ছাউনির পাশে দেবু ও শিবকে দেখিয়ে বলল,— ওই খোকাবাবুদের কাণ্ড মশায়। ছাতা মাথায় এমনই খাড়া ছিল আঁধারে যে আপুনারা ঘাবড়ে গেছেন।

হাসতে হাসতে সে দেবুদের পরিচয় বলল এবং এখানে আগমনের কারণ জানাল। কিন্তু সে নিজেও যে ঘাবড়েছিল সেকথা বেমালুম চেপে গেল।

এই হয়রানির জন্য দায়ী ছেলেদুটোকে কটমট করে দেখে নিয়ে এবং আর এক দফা তাদের পরিচয় যাচাই করে নন্দপুরের দল শবদাহের তোড়জোড় শুরু করে হারুর সাহায্যে। অপ্রস্তুত শিব দেবু ফের ছাউনিতে গিয়ে বসে এক কোণে। কাছাকাছি কোথায় যে আশ্রয় মিলবে, সে বিষয়ে এদেরকে আর প্রশ্ন করতে ভরসা হয় না তাদের।

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ঝিমুতে ঝিমুতে কখন দেবুরা ঘুমিয়ে পড়েছিল শ্রান্তিতে। ভোরে যখন ঘুম ভাঙল শ্মশান ভোঁ ভাঁ। নন্দপুরের দল বা হারু কারোর পাত্তা নেই। শিব দেবুর ঘাড় কোমর টনটন করছে। পুকুরের ওপাড়ে হারুর ঘরে গিয়ে একটু জল-টল খাব? নাঃ থাক। এই বিশ্রী জায়গায় আর এক মুহূর্ত নয়। তৎক্ষণাৎ তারা রওনা দিল পিচ রাস্তার দিকে।

পথের ধারে প্রথম যে চায়ের দোকান পেল, সেখানে গরম চা মুড়ি পেঁয়াজি খেয়ে অনেকটা তাজা বোধ করল। তাদের কানে এল কয়েকজন খদ্দেরের উত্তেজিত আলোচনা ও হাসাহাসি। বিষয়— গত রাতে নন্দপুরের এক মড়া পোড়ানো পার্টি নাকি ফলস্ ভূত দেখে এমনই ভয় পেয়েছিল যে মৃতদেহ ফেলেই পালাচ্ছিল। হারু ডোম তাদের ভরসা দিয়ে অনেক কষ্টে ডেকে আনে।

শিব ফিসফিসিয়ে বলল দেবুকে,— নির্ঘাৎ হারুর রটনা।

সাত

দেবু আর শিব ঘণ্টা দেড়েক পথ চলল ধীর গতিতে। গত রাতের ভোগান্তির ফলে ক্লান্ত দেহ। রাস্তার ধারে এক গ্রামের কিনারে একটা পুকুর দেখে শিব বলল,— এখানে একটু জিরিয়ে নিই। খিদেও পেয়েছে।

দেবু রাজি হয়।

মস্ত পুকুরটি। চমৎকার টলটলে জল। বাঁধানো ঘাট। জলের ধার ঘেঁষে দুটো বিরাট বিরাট আম গাছ আর একটা তেঁতুল গাছ। গাছগুলির অনেক ডাল ঝুঁকে পড়েছে জলের ওপরে। ডালপালার সবুজ প্রতিবিম্ব থিরথিরিয়ে কাঁপছে জলের বুকে। পিছনে উঁচু পাড়ে একসারি লম্বা লম্বা তালগাছ প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে।

গাছের ছায়ায় ঘাটের চাতালে বসল দুজনে।

দেবুর ব্যাগ থেকে বেরুল একখানা হাফ পাউন্ড পাউরুটি। শিবের ব্যাগ থেকে বেরল ছটা চাঁপা কলা। দেবু ব্যাগ হাতড়ে একটা ঠোঙা বের করে খুশি হয়ে বলল,— আরে দুটো মোয়া রয়েছে। গৌড়হরি বউদির উপহার, বাঃ।

শিবের নজর বারবার যাচ্ছিল জলের দিকে। সে বলে ফেলল,— একটা ডুব দিয়েনি। ফাসক্লাস জল বেশ ফ্রেস হয়ে খাওয়া যাবে। শ্মশানের নোংরা এখনও চিটচিট করছে গায়ে।

খাদ্যবস্তু ব্যাগে পুরে রেখে হাফপ্যান্ট পরে দুজনে নামল জলে।

আঃ ঠান্ডা জলে শরীর জুড়িয়ে গেল। দুই বন্ধু মহা ফুর্তিতে জল তোলপাড় করে সাঁতরাতে থাকে। পুকুর গভীর বেশ। তারা সাঁতরে অনেকখানি চলে যায়। ফের ঘাটে এসে খানিক জিরোয়। আবার ঝাঁপায়ে জলে।

ধপ্। শব্দটা শুনে একধারে তাকায় শিব। তারা তখন মাঝ পুকুরে। আবার ধপ্। কিছু পড়ল আমগাছের ওপর থেকে জলের ধারে। এ যে কয়েকটা জামা প্যান্ট। গাছের ডালে নড়াচড়া। কয়েকটা হনুমান যেন বসে আছে গাছে।

আমাদের ব্যাগ কই?—চমকে বলে দেবু।

সত্যি তো ঘাটে রাখা দুটো ব্যাগই উধাও। হাঁসফাঁস করতে করতে দুজনে ঘাটে পৌঁছায়। নাঃ, কাছাকাছি কোথাও নেই তাদের ব্যাগ। শুধু স্নানের আগে ছাড়া জামা প্যান্টগুলি পড়ে আছে। তারা ছুটে যায় গাছ থেকে পড়া জামা-কাপড়গুলির কাছে। হুঁ, তাদের জিনিস। কাছেইপড়ে আছে। পাউরুটির মোড়ক কাগজটা ছেঁড়া অবস্থায়। ওপরে তাকিয়ে দেখে চারপাঁচটা ল্যাজ ঝোলা হনুমান, তাদেরই হ্যাভারস্যাক দুটো নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। হাতড়াচ্ছে ব্যাগ। জিনিস বের করে ছুড়ে ছুড়ে ফেলছে। কেউ কেউ খাচ্ছে কিছু। তাদেরই খাবারগুলি বুঝি?

মাথায় বজ্রাঘাত হয় দেবুদের। তারা চিৎকার করে ধমকাতে থাকে হনুমানগুলোকে। ফলে হনুমানগুলো আরও উঁচুতে উঠে গেল প্রায় চোখের আড়ালে। গাছ থেকে টুপটাপ পড়তে থাকে। দেবুদের জিনিসপত্র। কোনোটা বা মাঝ পথে আটকে যায়—গাছের ডালে। নিশ্চয়ই ওরা খাদ্যবস্তুর সন্ধানে হাতরাচ্ছে ব্যাগ। ওরা ঠিক উঁচু থেকে নজর করেছিল যে দেবুদের ব্যাগ থেকে বেরুল রুটি কলা। তারপর নিঃসাড়ে কখন নেমে এসে চুরি করে উঠে গেছে গাছে।

হায় হায়, সর্বনাশ হল। দেবু শিব পাগলের মতন চেঁচায়, ঢিল ছোড়ে হনুমানদের ভয় দেখাতে। হনুগুলি এডাল ওডাল লাফিয়ে বেড়ায়।

ঝপ্ ঝপ্। দেবুদের আচরণে তিতিবিরক্ত হনুমানরা ব্যাগ দুটোই ছুঁড়ে ফেলল নিচে। দেবুর ব্যাগ পড়ল জলে। শিবেরটা জলের ধারে। দেবু শিব ফের জলে নামল তাদের জলে ভাসা জিনিস উদ্ধার করতে।

ইতিমধ্যে চেঁচামেচিতে কাছের গ্রামের কিছু লোক এসেছে ছুটে। তারা ব্যাপার দেখে চমৎকৃত। মহা উৎসাহে তারাও হনুমানদের ঢেলাতে লেগে যায়। বেগতিক দেখে হনুর দল গাছ থেকে নেমে ল্যাজ তুলে লম্বা লম্বা লাফে মাঠ পেরিয়ে ছুটল দূরে এক গ্রামের উদ্দেশে। দেবু শিব তখন প্রাণপণে তাদের হারানো সম্পত্তি খুঁজছে। গ্রামের ছেলের দল তাদের সাহায্যে লেগে যায়।

হনুগুলো বড্ড জ্বালাচ্ছে।—মন্তব্য করে গ্রামের লোক।

ঘণ্টাখানেক খোঁজাখুঁজিতে দেবুরা তাদের সব জিনিসই প্রায় উদ্ধার করতে পারল। তবে একটা ব্যাপারে খুব ক্ষতি হল। তাদের পরিচয়পত্রগুলির একটিও আর অক্ষত নেই। হেডমাস্টার এবং পঞ্চায়েত প্রধানের সার্টিফিকেটের কপি দেবু আগেই খুইয়েছিল ব্রজখুড়োর গ্রামে। একই সার্টিফিকেটের কপি শিবেরও ছিল। তার মধ্যে শুধু প্রধানের পরিচয়পত্রটি মিলল, দলা পাকানো মোচড়ানো অবস্থায়। থানার দারোগার সই ও স্ট্যাম্প দেওয়া ফোটোসহ আইডেন্টিটি কার্ড দুটির ভিতর শিবেরটার পাত্তাই পাওয়া গেল না। আর দেবুরটা জলে পড়ায় ভিজে বিকৃত। রোদে শুকিয়েও ফোটোর রূপ বিশেষ ফিরল না, লেখাগুলিও আবছা হয়ে রইল। ভাগ্যি মানিব্যাগটা জলে পড়েনি।

এই আকস্মিক বিপর্যয়ে দুই পর্যটক যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল। পেট জ্বলছে খিদেয়। কাছে এক দোকানে মুড়ি ও আলুর চপ খেয়ে উঠে পড়ল তারা। খানিক বিশ্রাম নিলে ভালো হত। শিবের ডান পায়ের গোছ মচকেছে হনুমানের পিছনে ছোটাছুটি করার সময় হোঁচট খেয়ে। ব্যথা করছে পা। কিন্তু এখানে গ্রামের লোক তাদের নিয়ে যা ঠাট্টা তামাশা জুড়েছে, তাই এখন সরে পড়লে বাঁচে।

একটু বাদেই শিব বেশ খোঁড়াতে লাগল। দেবু বলল,— এখান থেকে বরং বোলপুর শহর অবধি বাসে যাই। ওখানে গিয়ে কোনো ডাক্তারকে দেখাব তোর চোট। এভাবে হাঁটা ঠিক নয়।

বাসে?— বিরক্ত ভাবে বলল শিব আমরা হেঁটে যাচ্ছি। বাসে চড়লে নিয়মভঙ্গ হয় না?

—তা বটে, তবে বিশেষ কারণে নিয়মভঙ্গ দোষের নয়। কে জানে ভেঙেটেঙেছে কিনা।

উঁহু—শিব মাথা নাড়ে : এমন কিছু লাগেনি। জলপটি দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

পথের ধারে ডোবার জলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে লাগানো হল শিবের পায়ে চোটের জায়গায়। খানিক বাদে শিব জানাল—ব্যথা মনে হচ্ছে কমেছে। এবার হাঁটতে পারব।

কিন্তু মাইল দুই হাঁটার পর শিবের পায়ে ফের ব্যথা চাগিয়ে উঠল। মুখে যন্ত্রণার ছাপ। খোঁড়াচ্ছে। দেবু দৃঢ়স্বরে বলল, — তোর রেস্ট দরকার, এবার থামব।

তখন সবে দুপুর দুটো। আরও ঘন্টা দুই দিব্যি চলা যেত। শিবের সত্যি খুব কষ্ট হচ্ছিল, তাই আর মুখে আপত্তি জোগাল না।

প্রথমেই যে গ্রামের দেখা পাওয়া গেল সেটা বাস রাস্তা থেকে আধ মাইলটাক ভিতরে। মেঠো পথ চলে গেছে গ্রামের দিকে। মনে হল গ্রামটা বড়। কয়েকটা দোতলা কোটা বাড়ির মাথা দেখা যাচ্ছিল গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে।

গ্রামে ঢুকতেই বিপত্তি। চারপাঁচটা নেড়িকুত্তা মহা-চিৎকার জুড়ল অচেনা লোক দেখে। এক বাড়ির দাওয়ায় বসে তাস খেলছিল পাঁচ ছয়জন শিবদের বয়সি ছেলে। তারা খেলা থামিয়ে তাকিয়ে রইল দেবুদের দিকে। দেবু শিব কাছে গিয়ে নমস্কার করল। দেবু যথারীতি জানাল নিজেদের পরিচয় এবং শেষে যোগ করল,— আজ আরও খানিক এগোনো যেত কিন্তু আমার

ফ্রেন্ডের পা মচকেছে, ব্যথা করছে। তাই রেস্ট চাই। আজ রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল ফের রওনা দেওয়ার ইচ্ছে আমাদের।

ছেলেগুলি সব শুনে নিজেদের মধ্যে চাওয়াচাউয়ি করল। তাদের হাবভাবে দেবুদের সম্পর্কে কোনো আগ্রহ ফুটল না। বরং কেমন বাঁকা চোখে নজর করছে আগন্তুকদের দেবু অনুরোধ করল,— একটু বসতে পারি কোথাও?

হ্যাঁ এসো। —অল্প দূরে উঁচু ভিতের পাকা ঘরের সামনে বারান্দা দেখিয়ে নির্দেশ হল : বসো ওখানে।

পিঠের ব্যাগ নামিয়ে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বারান্দায় বসল দেবু আর শিব। গ্রামের ছেলেরা কিছু তফাতে দাঁড়িয়ে ফিসফাস করছে। কানে এল একজনের কথা—জগুদাকে খবর দে।

শিব নিচু গলায় বলল দেবুকে, —এদের রকমসকম দেখছিস কেমন জানি?

দেবু নীরবে মাথা ঝাঁকায়।

এই গ্রামের নাম কী?— দেবু জিজ্ঞেস করে গ্রামের ছেলেদের।

কেন নাম জানো না?— উত্তর হয়।

—না প্রথম আসছি যে।

—ও! ঠেকাপুর।— জানায় একজন।

মিনিট পনেরো বাদে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটল। হনহন করে এলেন। মাঝবয়সি। শ্যামবর্ণ। দশাসই গড়ন। পরনে খাটো ধুতি, হাফশার্ট ও চপ্পল। ভারিক্কি রাগী রাগী মুখে—পুরুষ্ট গোঁফ। ঠেকাপুরের দর্শকদের ভিতর গুঞ্জন উঠল,— জগুদা জগুদা।

জগুদা শিব-দেবুকে এক নজর দেখেই বাজখাঁই কণ্ঠে আওয়াজ ছাড়লেন,—আরে এগুলো চ্যাংড়া ছোঁড়া!

হ্যাঁ, মানে ভাবলুম যদি কী জানি,— জগুদার এক শাকরেদ তোতলায়।

হুম্।— জগুদা কটমটিয়ে দেখেন দুই পর্যটককে। অতঃপর গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করেন, কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

দেবু ফের তাদের নামধাম আগমনের কারণ জানাল।

প্রমাণ?— জগুদার হুঙ্কার।

—প্রমাণ ছিল। পঞ্চায়েত প্রধান আর হেডমাস্টারের সার্টিফিকেট। আইডেন্টিটি কার্ড। কিন্তু সবপ্রায় নষ্ট করে দিয়েছে হনুমানে।

হনুমান!— জগুদার ঝোঁপড়া ভুরু জট পাকায়।

আজ্ঞে হ্যাঁ, মানে হয়েছিল কী,—হনুমানের হাতে তাদের ব্যাগ চুরি ও হেনস্তার কাহিনি শোনায় দেবু।

ঠেকাপুরের শ্রোতাদের কারও মুখে অবিশ্বাস কারও মুখে মুচকি হাসি। বালবাচ্চারা হিহি করে হেসে উঠল।

এই চোপ।— জগুদা বাচ্চাদের ধমকে থামিয়ে বললেন ; অর্থাৎ, প্রমাণ কিছু নেই।

হ্যাঁ আছে, এই যে— দেবু তার জলে ভেজা বিকৃত আইডেন্টিটি কার্ড এবং প্রধানের কুঁচকানো পরিচয়পত্রটি বের করে দেয়।

জগুদা প্রথমে আইডেন্টিটি কার্ডের ফোটোর সঙ্গে দেবুর মুখের মিল খোঁজার চেষ্টা করেন।

জগুদা বিরক্তভাবে মাথা নাড়লেন। মিল পছন্দসই হয়েছে বলে মালুম হল না। এরপর পঞ্চায়েত প্রধানের পরিচয়পত্রটি মেলে ধরলেন। অনেকক্ষণ তাঁর চোখ আটকে রইল কাগজটায়।

হুম্! মনে হয় সার্টিফিকেটখানা জগুদা পড়তে পেরেছেন। তিনি দুখানা প্রমাণই নিজের পকেটে পুরে বললেন,— ঠিক আছে খবর নিচ্ছি। পরে দেখা যাবে। থাক এখানে। তবে গ্রামে ঘোরাঘুরি চলবে না মোটে।

—বলেই গট গট করে চলে গেলেন।

হতভম্ব দেবু শিব ফের গিয়ে বসল বারান্দায়।

শিবের মুখ রাগে টকটকে। সে চাপা কণ্ঠে ফুঁসে ওঠে, — কী ভেবেছে আমাদের, চোর জোচ্চোর? চ এখান থেকে।

গোঁয়ার শিব চটে হ্যাঙ্গামা না বাধায়! দেবু তাড়াতাড়ি সামাল দেয় তাকে,— না না এভাবে যাওয়া ঠিক হবে না। ওরা কিছু ভুল বুঝেছে। ও ঠিক হয়ে যাবে। উৎপাত তো আর করছে না।

শিব তবু গজগজ করে।

বারান্দায় একটা চাটাই রেখে গিছল গ্রামের কেউ। সেটা পেতে শুয়ে পড়ে শিব। ওর পায়ে ব্যথার জায়গা ফুলেছে। মাঝে মাঝে হাত বুলোচ্ছে সেখানে।

শিব মন্তব্য করল, — আজ রাতেও বোধহয় খাওয়া জুটবে না।

দেখি।— দেবু একজনকে ডেকে বলল : দাদা এখানে ভাতের হোটেল আছে? মানে আমাদের রাতে খাওয়ার জন্যে।

আধঘন্টাটাক বাদে একজন গুড়সহযোগে দু থালা মুড়ি নামিয়ে রেখে গেল তাদের সামনে।

যাব্বাবা। আজ মুড়ি খেয়েই কাটল,—শিবের তিক্ত মন্তব্য। উপায় কী, ওই গুড় মুড়িই কিছুটা গিলল দুজনে।

রাতে চাটাই পেতে ঘরে শুল দুজনে। ঘুম আর আসে না।

ধুত্তেরি চ, বারান্দায় বসি।— শিব উঠে পড়ে।

বারান্দায় পা দেওয়া মাত্র তীব্র টর্চের আলো পড়ল তাদের গায়ে। 'কী ব্যাপার?' রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন ভেসে আসে সামনের মাঠ থেকে। গ্রামের ছেলেরাই কেউ টর্চ ফেলেছে এবং প্রশ্ন করছে।

গরমে ঘুম আসছে না।—দেবু জানায়।

অপরপক্ষ আর উচ্চবাক্য করে না। তবে আবছা চাঁদের আলোয় বোঝা যায় ওদের সবারই নজর বারান্দায় দেবুদের ওপর। বসে ছিল দলটা। উঠে দাঁড়িয়েছে।

খানিক বাইরে বসে দেবুরা আবার ঘরে গিয়ে শোয়। শিব তার পায়ে জলপট্টি লাগায় একবার।

ফিরে ব্যথা কেমন?—উদ্বিগ্ন দেবুর প্রশ্ন।

রয়েছে।— সংক্ষিপ্ত জবাব। শিব শক্ত ধাতের ছেলে। নিজের কষ্ট মুখ ফুটে বেশি বলতে নারাজ।

ঘুম উবে গেছে দুই বন্ধুর। দুশ্চিন্তা পাক খায় মগজে। কী এদের মতলব? দেবু উঠে জানালায় উঁকি দেয়। দেখে, বাইরে পাহারা যথারীতি। একদল নতুন ছেলে এল।

সকালে দেবু আর শিবের ঘুম ভাঙল একটু বেলায়। চড়া রোদ ঢুকছে তখন জানলা দিয়ে। বাইরে জগুদার হাঁকডাক। ওঁনার কথার শব্দেই তাদের ঘুম ভেঙেছে।

এই যে উঠেছ। ভেরি সরি ভাই, ভেরি সরি। তোমাদের কথাই কারেক্ট। তোমরা খাঁটি পর্যটক। ভুল নেই। তোমাদের যাত্রা শুভ হোক।—বাজখাঁই গলায় কথাগুলি আওড়াতে আওড়াতে জগুদা ঘরে ঢুকে ধপাধপ্ দুই পর্যটকের পিঠ চাপড়ে দিলেন প্রবল উচ্ছ্বাসে।

ভ্যাবাচাকা দেবু শিবের মুখে কোনো কথা জোগায় না।

জগুদা বলে চলেন,— কী করব ভাই, সতর্ক থাকতেই হয়, যা দিনকাল। এই তো কাপাসডাঙায় ডাকাতি হল চারদিন আগে। তার আগের দিন এক বাউল এসে সারাদিন কাটায় ওখানে। ব্যস্, পরদিন ডাকাত পড়ল গাঁয়ে। পুলিশ বলেছে, ও বেটা মেকি বোষ্টম। আসলে ডাকাতের চর। গাঁয়ের সুলুকসন্ধান নিতে এসেছিল। তাই অচেনা লোক গাঁয়ে এলেই সাবধান হই।

আমরা আসল না নকল যাচাই করলেন কীভাবে?— গম্ভীরভাবে জানতে চায় দেবু।

— হেঃ হেঃ, জগু ঘোষের সেসব বুদ্ধি খুব খেলে। সাধে আর আমায় ডিফেন্স-পার্টির লিডার করেছে! গতকাল বিকেলেই একজনকে বাসে করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেম বোলপুর থানায়। বোলপুর থানা থেকে অমনি লাভপুর থানায় খবর নিল। জানা গেল, তোমাদের কথাই ঠিক। ব্যস সন্দেহের নিরসন।

তা খবরটা কাল দিলেন না কেন?—শিব তেতে বলে।

—আরে আমিই তো জানলাম একটু আগে। হারামজাদা লখা ছোঁড়া মানে যাকে পাঠিয়েছিলাম থানায়, ও-ই ফিরেছে আজ সকালে। বলছে যে লাস্ট বাস মিস্ করেছিল তাই ফিরতে পারেনি। তবে বাপু আমার ধারণা, ও বেটা সিনেমা দেখার লোভে ইচ্ছে করেই থেকে গিছল। ওর কাকা থাকে বোলপুরে, তাই থাকার ভাবনা নেই। তা আমারই কি কম ভোগান্তি হল, আর ডিফেন্স পার্টির ছেলেগুলোর। গোটা রাত সজাগ থাকতে হয়েছে। ঘুমের দফা গয়া।

জগুদা পার্টির বিনিদ্র রজনী যাপনের সংবাদে শিব ও দেবুর মনের জ্বালাটা কিঞ্চিৎ কমে। দেবু বলল,— তাহলে এবার আমরা বিদায় নিতে পারি?

—অবশ্যই অবশ্যই। তবে যদি তাড়া না থাকে আজ দিনটা থেকে যেতে পার এখানে। ঘুরে ফিরে দেখ গ্রাম।

থাক, ঢের আদিখ্যেতা হয়েছে। বাইরে অবিশ্যি রাগ চেপে বলল দেবু,—নাঃ, আমরা এখুনি যাত্রা শুরু করব।

—আহা একটু চা-টা খেয়ে যাও। নইলে পরে বদনাম করবে যে গাঁয়ের। ওরে বোঁদে ঠাকুরের দোকানে গিয়ে বল ফ্রেশ নোনতা মিষ্টি যা আছে দিয়ে যেতে। সব চারটে করে।

আর চা—।

আট

ঠেকাপুর থেকে মাইল দুই যেতে যেতেই শিব খোঁড়াতে শুরু করল। দেবু বোঝে ওর খুবলাগছে পায়ে। কিন্তু যা জেদি, ছেলে, কিছুতেই হার মানবে না।

দেবু বলল,—নাঃ, এভাবে তোর হাঁটা একদম উচিত হচ্ছে না। ওষুধপত্র পড়ছে না,ডাক্তার দেখানো হচ্ছে না। বোলপুর পৌঁছতে আরও তিন চার মাইল বাকি। তাছাড়া আর এক কারণে আমাদের জার্নি হয়তো এবার ক্যানসেল করতে হবে।

— কেন?

—আমাদের পরিচয়পত্র কই? যে দুটি রয়েছে তাদের যা দশা, অচেনা জায়গায় ঠেকাপুরের মতন মুশকিলে পড়ব বারবার। কেবল মুখের কথায় কি আর লোকে বিশ্বাস করবে?

শিব নীরবে হাঁটে। মনে হল তার দেশভ্রমণের উৎসাহ বিলক্ষণ দমে গেছে।

রাস্তার ধারে গ্রাম। কিছু দোকানপাট। অল্পকিছু লোকের ঘোরাঘুরি। দেবু শিব খানিক বিশ্রাম নিতে বসল একটা ফাঁকা রোয়াকে। একজন কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল,— কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

দেবু জানায় তাদের পরিচয় এবং পর্যটনের উদ্দেশ্য। লিভ তখন ভিজে ন্যাকড়া জড়াচ্ছিল, তার আহত পায়ের গোছে। সেদিকে তাকিয়ে লোকটি বলল,— পায়ে কী হয়েছে?

মচকে গেছে ওর পা। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে।—জানাল দেবু।

—হ্যাঁ, হন্টন পার্টির ঠ্যাং জখম! ব্যস, তবে তো ভ্রমণ বরবাদ। আর এক পর্যটক পার্টিও তো ব্রেকডাউন হয়ে পড়ে আছে।

—আর এক পার্টি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ সাইকেল পার্টি। ভূপর্যটক। দুজন ছোকরা। ওদের সাইকেল ভেঙে গেছে। চোটও লেগেছে। আমাদের গাঁয়ের ক্লাব ঘরে রয়েছে গত পরশু থেকে। ওই লাভপুরের কাছ থেকেই এসেছে।

—কোথায় তারা?

এসো। কাছেই।— লোকটি দেবুদের সঙ্গে নিয়ে যায়।

ক্লাব ঘরের বারান্দায় শতরঞ্চিতে শুয়েছিল নন্তু। সন্তু কাছে বসে একখানা খবরের কাগজের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। দেয়ালে ঠেসান দেওয়া দুখানা সাইকেল। মুখ তুলে দেবু আর শিবকে দেখে সন্তু চমকে উঠল,— আরে তোমরা!

হুঁ যা ভেবেছি। মথুরাপুর। কী হয়েছে?— বলল দেবু।

—অ্যাকসিডেন্ট। গত পরশু বিকেলে একপাল গরু যাচ্ছিল রাস্তার ধার ঘেঁষে। জোরে জোরে বেল দিচ্ছি। হঠাৎ একটা গরু শিং বাগিয়ে আমাদের এমনি তাড়া করল! প্রাণপণে ছোটালাম বাইক। আকাশে মেঘ। ভালোমতো দেখতে পাচ্ছিলাম না রাস্তার খানাখন্দ। আচমকা এক গর্তে পড়ে ছিটকে পড়লাম। প্রথমে নন্তু। তার ঘাড়ে আমি।

নন্তুর সাইকেলের সামনের চাকার রিম বেঁকে বারোটা বেজে গেছে। শিক-ও ভেঙেছে কয়েকটা। ওর কোমরে আর পায়ে খুব লেগেছে। আমার সাইকেলের তেমন কিছু হয়নি। তবে আমার ডান হাতের কনুইয়ে বেশ চোট লেগেছে।

নন্তু মিনমিন করল,— আসলে ওই লাল ভূপর্যটক মার্কা প্ল্যাকার্ডটাই দায়ী। যা রং, তখনি বলেছিলুম গরু মোষে খেপে যাবে দেখে।

সন্তু মাথা নাড়াল। ভাবখানা যেন সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তারপর সেই গরু?— শিব জের টানে।

— সে হঠাৎ আমাদের হুড়মুড়িয়ে পতন দেখে ঘাবড়ে গিয়ে সমান স্পিডে পিট্টান দিল পিছন ফিরে। তা তোমাদের খবর কী?

ভালো নয়। — দেবু বলে : শিবের পা গর্তে পড়ে মচকেছে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে।

হুঁ। দুপার্টিরই দেখছি অযাত্রা।—ব্যাজার মুখে মন্তব্য করে সন্তু।

দেবু জিজ্ঞেস করল,— লেগেছে যে ওষুধ দিয়েছ কিছু?

সন্তু বলল,— এখানে পাশ করা ডাক্তার নেই। তবে এই গাঁয়ের এক ভদ্রলোক শখের হোমিওপ্যাথি করেন, তিনি ওষুধ দিয়েছেন। কাজও হয়েছে। আমার কনুইয়ের ব্যথা কমেছে। ফোলাও আজ ঢের কম। হাত প্রায় সোজা করতে পারছি। নন্তুর কেসও বেটার।

দেবু বলল,— সেই হোমিওপ্যাথি ভদ্রলোককে পাওয়া যাবে? মানে শিবের জন্যে।

কেন পাওয়া যাবে না? কাছেই থাকেন। আমি ডেকে আনছি। খুব ভালো লোক।— সন্তু উঠে পড়ল।

শখের হোমিওপ্যাথ ঘোষালমশাই টাক মাথা, পাকা ঝুলো গোঁফসমেত সৌমদর্শন ব্যক্তি। দেবুর পায়ে মচকানো জায়গা পরীক্ষা করে বললেন,— জলপটি দিয়ে ঠিক করেছ। ওষুধ দিচ্ছি, ব্যথা কমে যাবে।

এই গ্রামের মানুষগুলি ভালো। আদরযত্নের ক্রুটি নেই। দুর্ঘটনায় আটকে পড়া ভিনদেশি চারটি অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় তরুণের প্রতি তাদের খুবই সহানুভূতি। দুপুরে ও রাতে দুই বাড়িতে নেমন্তন্ন খেল শিব আর দেবু। মথুরাপুরের আহারের ব্যবস্থা ছিল অন্য বাড়িতে। চা-টারও জোগান এসেছে বারকয়েক। ক্লাব ঘরে চারজনে শোওয়া গেল অনায়াসে।

রাতে সন্তু বলল, — আচ্ছা দেবু, তোমাদের বিদায়সভায় সভাপতি কে ছিল? শশাঙ্ক পাল, তাই না?

হ্যাঁ। —জানায় দেবু।

—আমাদের বিদায়সভাতেও ওকে সভাপতি করা হয়েছিল। মনে হচ্ছে ওই লোকটিই অলুক্ষণে। তাই দু কদম যেতে না যেতেই দু পার্টি ফেঁসে গেলাম।

ঠিক ঠিক। কারেক্ট।— অন্য তিন পর্যটক একবাক্যে সায় দেয় সন্তুর এই সুচিন্তিত অভিমতে।

রাতে ঘুম হল খাসা। ভোরে উঠে দেবু জিজ্ঞেস করল শিবকে,— তোর পা কেমন?

ব্যথা বেশ কমে গেছে। খুশি মনে জানায় শিব।

সন্তু নন্তু তাদের জিনিস গোছগাছ করছে দেখে দেবু তাদের জিজ্ঞেস করল,—চললে কোথা? তোমাদের প্ল্যান কী?

সোজা বাড়ি। — জবাব দেয় সন্তু : এবার আমরা জার্নি ক্যানসেল করলাম। অবশ্য ফের

ট্রাই করব পরে। তবে বেরুবার আগে ওই অপয়া শশাঙ্ক পালের আর নো দর্শন। নেভার। তোমাদের কী প্ল্যান?

দেবু উৎসাহভরে বলল,— আমরা ভাই ফিরছি না আপাতত। শিবের পা আজ অনেকটা ভালো। হাঁটতে পারবে। তাই এগোব। তবে নেহাতই বেকায়দায় পড়লে তখন ভ্রমণ বাতিল করা ছাড়া উপায় কী। দেখা যাক আর কদ্দূর যেতে পারি।

দেবুর কথায় শিব বেজায় অবাক হয়। এতক্ষণ ওই সমানে আপত্তি তুলছিল তার হাঁটায়। উসকোচ্ছিল এযাত্রা দেশভ্রমণ বন্ধ করতে। এখন যে হঠাৎ উল্টো সুর গাইছে!

তোমরা কবে স্টার্ট করবে এখান থেকে?—জিজ্ঞেস করে সন্তু।

আজই।— জানায় দেবু : তোমাদের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ব। তবে দু দলের উলটো পথে যাত্রা। মিছিমিছি দেরি করে লাভ কী?

সন্তু নন্তুকে লাভপুরের দিকের বাসে তুলে দিল দেবুরা। দুই সাইকেলসমেত সওয়াররা চড়ল বাসের ছাদে। মথুরাপুর পার্টি শুকনো মুখে হাত নেড়ে বিদায় নিল। তখন ধীরেসুস্থে বোলপুরের দিকে রওনা দিল দেবু আর শিব।

শিব মনে মনে ভাবে, দেবুর মতিগতি বোঝা দায়। আজকের দিনটা এখানে রেস্ট নিলে কী এমন ক্ষতি ছিল। আমার পায়ের পক্ষে উপকার হত। কিন্তু নিজের শারীরিক কষ্ট বা অসুবিধার কথা সে কিছুতেই জানাতে রাজি নয়।

আধমাইলটাক গিয়ে থামল দেবু।

কী হল, দাঁড়ালি যে?— শিব বলে।

দেবু বলল,— এটা বাস স্টপেজ। বোলপুরের বাস থামবে এখানে।

—মানে!

—অর্থাৎ এখান থেকে আমরা বোলপুরের বাসে উঠব।

— সেকী!

—হ্যাঁ। নয়তো কি হাঁটবি নাকি ওই পা নিয়ে। শেষে চিরকালের মতো পা-টা তোর জখম হয়ে যাক।

বোলপুরে কেন?— শিব ভ্যাবাচাকা।

কারণ, বোলপুরে গিয়ে আমরা কলকাতার ট্রেন ধরব। অতঃপর তোর মামার বাড়িতে গিয়ে কাটাব যে কদিন খুশি। তোর পা-ও দেখানো হবে ভালো ডাক্তারকে।

তাহলে এই পথটুকু হাঁটলাম কেন? ওই গ্রামের পাশেই তো বাস স্টপেজ ছিল।— শিব থই পায় না।

হেঃ হেঃ।—বিজ্ঞের হাসি দিল দেবু : সাইকেল পার্টিকে ডাউন দিতে হবে না? দু দলেরই এবার দেশ ভ্রমণ ভেস্তে গেল বটে, তবে মথুরাপুর পার্টি থেকে আমরা বেশি এসেছি। এ একেবারে খাঁটি সত। ওরাও স্বচক্ষে দেখেছে। তা দূরত্ব যাই হোক না কেন? অতএব এ যাত্রায় আমাদেরই জিত।

[১৯৯৩, কিশোর ভারতী শারদীয়া]

হাবুর বিপদ

স্কুলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হাবু ভাবল, থাক ফিরে যাই। গরমকাল। মর্নিং স্কুল হচ্ছে। আর কয়েক মিনিট পরে সাতটা বাজবে। ঘণ্টা পড়বে স্কুল আরম্ভের। একতলা স্কুল বাড়িটির ঘরে ঘরে ছেলেদের কলরব। উঠানে কিছু ছেলে খেলছে। হাবুর মনে ভেসে ওঠে সুধীরবাবু, ভারিক্কি চেহারা। গম্ভীর মুখ, মোটা চশমার কোণের আড়ালে বড় বড় দুটি চোখের তীক্ষ্ণ চাহনি। হাবু জানে স্যার তাকে পছন্দ করেন। কিন্তু তা হলে ক্লাসের কাজে অবহেলা ক্ষমা করার লোক নন তিনি।

যদি স্কুল না যায়? সময় কাটাবার জায়গার অবশ্য অভাব নেই। দত্তদের আমবাগানে ঢুকলেই খাসা সময় কেটে যাবে। কিন্তু ক্লাস কামাই করলে কাল বাবার কাছ থেকে চিঠি আনতে হবে, অনুপস্থিত হওয়ার কারণ দর্শিয়ে। তখন? বাবাকে কী কৈফিয়ত দেবে? বই হাতে স্কুলে বেরিয়ে গিয়েছিল কোন চুলোয়? অতঃপর অবধারিত মারাত্মক পরিণতির কথা ভেবে হাবু শিউরে ওঠে। ভীষণ রাগ হতে থাকে ভজার ওপর। ওর পাল্লায় পড়েই এই গন্ডগোল। হাবু তো প্রথমে রাজি হয়নি। ভজাটা কিছুতেই ছাড়ল না। এখন?

বাবা না সুধীরবাবু? না না, বাবা কিছুতেই নয়। যদি বরাতে দুর্ভোগ থাকে স্যারের হাতেই হোক। হাডু স্কুলে ঢুকে পড়ে।

উঁহু, আজ লাস্ট বেঞ্চ নয়। ওটার ওপর স্যারেদের চিরকাল কড়া নজর। মাঝামাঝি বসা যাক। ভাগ্যে থাকলে পাঁচ-ছজনের ভিড়ে মিশে হয়তো এ যাত্রায় পার পেয়ে যেতে পারে। থার্ড বেঞ্চের এককোণে তিনকড়ির পাশে হাবু বসে পড়ল।

পর পর তিনটে ক্লাস কেটে গেল। এবার আসবেন সুধীরবাবু। বাংলা রচনার ক্লাস। তারপর টিফিন। হাবু বাইরে যতটা সম্ভব শান্ত থাকবার চেষ্টা করছে। বুকের মধ্যে কিন্তু তার হাপর পড়ছে।

সুধীরবাবু ধীর পদক্ষেপে ক্লাসে ঢুকলেন। দশাসই মানুষটির পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। কাঁধে পাট করা সাদা চাদর। ছাত্ররা তাঁকে ভয়-ভক্তি দুটোই করে। ছাত্রদের উন্নতির জন্য তিনি প্রচুর খাটেন, তবে বড্ড কড়া মাস্টার।

চেয়ারে বসে সুধীরবাবু প্রশ্ন করলেন, 'গতবারে কী রচনা লিখতে দিয়েছিলাম জান?'

—'বাংলাদেশে বর্ষাকাল।'

—'ও হ্যাঁ। সবাই লিখে এনেছ?

—'হ্যাঁ স্যার!' ক্লাসসুদ্ধ ছেলেদের ঘাড় হেলে।

—'বেশ কয়েকটা শোনা যাক।'

ছেলেরা যে যার রচনা খাতা বের করে ওপরে রাখে।

এটাই সুধীরবাবুর মেথড। কয়েকজনকে বেছে বেছে পড়তে বলেন। অন্যদের বলেন মন দিয়ে শুনবে। অন্যের লেখা শুনলে নিজের লেখার মান সম্বন্ধে একটা ধারণা হবে। আমি তো সবার খাতা বাড়ি নিয়ে গিয়ে শুধরে দেব। কিন্তু প্রত্যেকের লেখা তো প্রত্যেকে পড়তে পারবে না। অন্তত ক্লাসে কয়েকখানা রচনা শোনা যাক। কে কেমন লিখেছে কিছুটা জানো।

—'প্রফুল্ল পড়ো।' সুধীরবাবু আদেশ দিলেন।

প্রফুল্ল খাতা খুলে 'বাংলাদেশে বর্ষাকাল' পড়তে আরম্ভ করে। পাতা দুই শোনার পর হঠাৎ ধমকে ওঠেন, 'থামো'। আমি রচনা লিখতে বলেছি। বই থেকে কপি করতে বলিনি।'

—'কেন স্যার?' প্রফুল্ল আমতা আমতা করে।

—'আবার কেন। দে-সরকারের বই থেকে হুবহু টুকে এনেছ। এ চলবে না। কাল নতুন করে লিখে এনে দেবে। আর কষ্ট করে আরও দু-একখানা বই উল্টিও। মনে থাকবে?'

এবার তার লক্ষ্য লাস্টবেঞ্চ।

—'নিতাই?'

নিতাই নামকরা ফাঁকিবাজ। প্রথমটা ভান করল যেন শুনতেই পায়নি।

—'নিতাই?'

—'আমাকে বলছেন স্যার?'

—'হ্যাঁ, ক্লাসে আর কটা নিতাই আছে? পড়?'

নিতাই মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।-'কী হল?'

—'আজ্ঞে লিখতে পারিনি।'

—'কেন?'

—'আজ্ঞে সময় পাইনি, মায়ের অসুখ।'

—'ও তোমায় বুঝি মায়ের সেবা করতে হয়েছে। দুই দিদি কী করছিল?'

—'আজ্ঞে বারবার ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা করতে হয়েছে কি না। বাবার মোটে সময় নেই তাই।'

—'কী হয়েছে তোমার মায়ের?'

—'জ্বর, সর্দি, কাশি।'

—'এখন কেমন আছেন?'

—'জ্বর ছেড়েছে। আজ ভাত খেয়েছেন।'

—'মিথ্যেবাদী!' সুধীরবাবুর গর্জনে সারা ক্লাস কেঁপে ওঠে। 'গতকাল তোমার মাকে দেখেছি গোঁসাইবাড়িতে কীর্তন শুনছেন। দাঁড়িয়ে থাকো ওই কোণে, টিফিনেও বেরুবে না।

দাঁড়িয়ে থাকবে। কালকেই তোমার রচনা চাই। এই নিয়ে পর পর দুদিন হল। এরপর যদি রচনা আনতে ভুলে যাও তাহলে তোমার কপালে দুঃখ আছে। মনে থাকবে?'

—'মনে থাকবে', সুধীরবাবুর একটি মুদ্রাদোষ। মনে থাকুক না থাকুক তিনি সবাইকে বলে যান-'মনে থাকবে?'

—'প্রশান্ত!'

ফার্স্ট বয় প্রশান্ত খাতা বাগিয়ে বুক ফুলিয়ে উঠে দাঁড়ায়?

বেশ দীর্ঘ রচনা, সুন্দর গুছিয়ে লেখা। বর্ষার বর্ণনায় কয়েকটা তালমাফিক কবিতার উদ্ধৃতি হয়েছে। সুধীরবাবু মন দিয়ে শোনেন।

তবে ছেলেরা লক্ষ করে স্যারের কপালের মাঝখানে একটি ভাঁজ অর্থাৎ তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট নন। ওই ভাঁজ তার চিহ্ন।

প্রশান্তর পাঠ শেষ হয়, সুধীরবাবু বলেন, 'ভালো হয়েছে, তবে আরেকটু মৌলিক হওয়া উচিত। শুধু রচনা বইগুলোর ওপর নির্ভর করবে কেন? চাই নিজস্ব ভাব, ভাষা। নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা। তবেই রচনার প্রকৃত সাহিত্যিক মূল্য আসবে। মনে থাকবে?'

প্রশান্ত একটু ক্ষুণ্ণ মনে বসে পড়ে।

সুধীরবাবুর সন্ধানী দৃষ্টি ঘুরছে, 'হাবুলচন্দ্র!'

হাবু নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

'হাবুল!'

হাবু এবার উঠে দাঁড়ায়। উঃ, কী ভাগ্য তার!

—'পড়ো তোমার রচনা।'

হাবু হাইবেঞ্চে রাখা বইখাতাগুলোর ওপর থেকে একটা খাতা তুলে নিল। পাতা খুলে ওর সামনে মেলে ধরে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল।

—'কী আরম্ভ করো। বড্ড সময় নিচ্ছ।' সুধীরবাবু তাড়া দেন।

—'হ্যাঁ স্যার।' হাবু পড়তে শুরু করে—

—'আষাঢ়-শ্রাবণ এই দুই মাসকে বাংলাদেশে বর্ষাকাল বলে। এই দুই মাসে প্রচুর বৃষ্টি পড়ে তাই এই ঋতুর নাম বর্ষা। বর্ষার আগে গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড গরম পড়ে। তখন মাঠ-ঘাট শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়। ডোবা, পুকুরের জল যায় মরে। সূর্যের তাপে মানুষ-জন, পশুপাখি, গাছপালা সবই হাঁসফাঁস করতে থাকে। মাঝে মাঝে ঝড়-বৃষ্টি হয় বটে, তবে বৃষ্টি দু-এক পশলা, ঝড়ের দাপটটাই হয় বেশি। জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি আকাশে কালো মেঘ জমতে শুরু করে। আষাঢ় মাসে নামে অঝোর বৃষ্টিধারা। বর্ষা এসে সব-কিছু ভিজিয়ে দেয়। প্রকৃতি স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।'

হাবু প্রথম দিকটায় ঠেকে ঠেকে আস্তে আস্তে পড়ছিল। ক্রমে তার পড়ার গতি বাড়ে, বেশ ঝরঝর করে বলে চলে।

'বর্ষা নামে বাংলাদেশের সব জায়গায়। শহরে, গ্রামে, জঙ্গলে পাহাড়ে। শহরে বর্ষা কোনো দিন দেখিনি, তবে গ্রামে থাকি কিনা, তাই প্রতি বছরই বর্ষাকালে গ্রামের অবস্থা কেমন হয় বেশ জানি। দেখতে দেখতে মজে যাওয়া পুকুর, ডোবা, খাল, বিল জলে ভরে ওঠে। রাস্তাঘাট

হয় কাদা প্যাচপ্যাচে। চলতে ফিরতে তখন ভারি অসুবিধা। কাগজে পড়েছি শহরের রাস্তাঘাট ভালো, কাদা হয় না। কিন্তু সেখানেও রাস্তায় জল জমে। কাগজে ছবি দেখেছি, কলকাতার কোথাও কোথাও এক কোমর জল দাঁড়িয়েছে। লোকে নৌকা চালাচ্ছে।'

—'অ্যাই তিনকড়ি, মুখ নামাও।' সুধীরবাবু ধমকে ওঠেন।

তিনকড়ি হাঁ করে হাবুর খাতার পানে চেয়ে ছিল। তৎক্ষণাৎ ঘাড় নামায়। হাবু চমকে পড়া বন্ধ করে।

—'হুঁ। তারপর।' সুধীরবাবু চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসেন। হাবু আরম্ভ করতে একটু দেরি করে। খাতার ওপর চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকে।

—'কী হল?' নিশ্চয় নিজের হাতের লেখা নিজেই পড়তে পারছে না। নাঃ, বকে বকেও হাতের লেখার উন্নতি করা গেল না ছেলেটার। সুধীরবাবু ভাবেন।

হাবু আবার পড়ে—

—'তবে বর্ষাকালে চাষিদের ভারি ফুর্তি। বৃষ্টি ভালো হলে চাষ ভালো হবে। অনেক ফসল উঠবে ঘরে। যে বছর বৃষ্টি কম হয় সেবার তাদের মাথায় হাত। বাগদিপাড়ার রাম অনাবৃষ্টির বছর আমাদের গোলা থেকে ধান নিয়ে যায়। নইলে যে তার ছেলে বউ না খেতে পেয়ে মরবে। বেশি বৃষ্টির আবার বিপদ আছে, নদীতে বন্যা হয়। আগের বছর আমাদের গাঁয়ের পাশে খরস্রোতা নদীতে বান ডাকল। দুপাশে মাঠ ভেসে গেল। কত শস্যখেত ডুবে নষ্ট হল। গাঁয়ের মধ্যেও জল ঢুকে এসেছিল। ছোট ছোট অনেক মাটির ঘর পড়ে গেল। মাঝরাত্রে বান এসেছিল। ভাগ্যিস দুলু মাঝি হাঁক দিয়ে ডেকে সবাইকে সাবধান করে দিল, নইলে অনেকে ভেসে যেত। আমাদের বাড়িতে অনেক পরিবার এসে আশ্রয় নিয়েছিল সে রাতে।...

সুধীরবাবু মন দিয়ে শোনেন। খাসা লিখছে। বই-টইয়ের ধার ধারেনি। সব নিজের অভিজ্ঞতা, ভাষাটিও সুন্দর—ছেলেটা চর্চা রাখলে বড় হয়ে নির্ঘাত সাহিত্যিক হবে।

ফার্স্ট বয় প্রশান্ত পাশের ছেলেকে কনুই দিয়ে মৃদু গোঁতা মারল, 'শুনছিস? স্রেফ আবোল তাবোল। পয়েন্ট কই?' সে ফিসফিসিয়ে বলে।

—'তিনকড়ে—!' তিনকড়ি আবার ঊর্ধ্বগ্রীবা বিস্ফারিত নয়নে হাবুর মুখের দিকে চেয়েছিল। স্যারের ধমক শুনে মাথা নোয়ায়।

হাবু পড়ে যায়। বর্ষাকালে তার গ্রামের জীবনের নানা বিচিত্র কাহিনি—

বর্ষায় নাকি অসুখ-বিসুখ খুব বাড়ে। বিশেষত পেটের অসুখ আর সর্দিজ্বর। ডাক্তারবাবুরা নাকি নাওয়াখাওয়ার সময় পান না তখন। গাছে গাছে সবুজ পাতা বেরোয়। কখনও সখনও সারারাত টিপটিপ করে বৃষ্টি হয়। আর ব্যাংগুলো পাল্লা দিয়ে হেঁড়ে গলায় গান জোড়ে। ভারি মজা লাগে। জলে গর্ত বুজে যাওয়ায় মাঝে মাঝে ঘরের দাওয়ায় সাপ উঠে আসে। প্রত্যেক বছরই গ্রামের দু-একজনকে সাপে কামড়ায়।

'ভোরবেলা চাষিরা লাঙল কাঁধে হেট হেট করে গোরু তাড়িয়ে খেতে যায়। দুপুরেও মাঠে থাকে। তাদের ঘরের লোক ভাত নিয়ে যায় দুপুরে খাবার জন্যে।'

আরও অনেক কিছু লিখেছে সে। মাঝে মাঝে পাতা উলটিয়ে বলে চলে—

বর্ষাকালে গ্রামে তাদের কী সব পালাপার্বণ ব্রত হয়। ওই সময় স্কুলে নাকি ছাত্র কম আসে।

তাদের খেতে কাজ করতে হয়, তাই ছুটি নেয়। হাবুর কাজ করার দরকার নেই। তাই রোজ স্কুলে আসতে বাধ্য হয়। এমনি কত—

হাবুর রচনা শেষ হল। সুধীরবাবু স্মিতমুখে বলেন, 'বেশ হয়েছে, নিজের দেখা জিনিস লিখেছ। খুব ভালোভাবে আর একটু গুছিয়ে লেখা দরকার।'

তিনি ঘড়ি দেখলেন ক্লাস শেষ করতে আর পনেরো মিনিট বাকি। এবার সামনের সপ্তাহের রচনার বিষয় দিয়ে দেবেন আর এ সপ্তাহের খাতাগুলো নিয়ে নেবেন সংশোধনের জন্য। 'হরিপদ, খাতা নাও।'

মনিটর হরিপদ প্রত্যেকের কাছে গিয়ে রচনা খাতা সংগ্রহ করতে লেগে যায়। সুধীরবাবু ভাবেন আসছে বারে কী রচনা দেওয়া যায়। ঠিক আছে, দুর্গাপুজো। দুর্গাপুজোর পৌরাণিক আখ্যানটা বলে দেবেন ক্লাসে।

—'স্যার, হাবু খাতা দিচ্ছে না।'

হরিপদর ডাকে সুধীরবাবু অবাক হন। 'কেন?'

—'তা জানি না। বলছে কালকে দেবে।'

—'হাবুল!'

হাবু উঠে দাঁড়ায়।

—'খাতা দিচ্ছ না কেন?'

হাবুর মুখে কথা নেই।

—'কী উত্তর দাও?'

—'আজ্ঞে, কাল ভালো করে লিখে দেব।'

—'দেখি খাতাটা।' সুধীরবাবু রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করলেন।

হরিপদ হাবুর রচনা খাতার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াতেই তিনকড়ি টপ করে ওপরের খাতাখানা তাঁর হাতে তুলে দেয়। হরিপদর সে খাতা স্যারের হাতে সমর্পণ করে।

খাতার মলাটে চোখ বুলিয়েই তাঁর কাছে রহস্য পরিষ্কার হয়—গোটা গোটা করে লেখা 'বীজগণিত খাতা'।

ও, এইজন্যে এত ধানাই পানাই! কাল ভালো করে লিখে এনে দেব। নাঃ, ছেলেটা অতি অগোছলা! তিনি পই পই করে সব্বাইকে বলে দিয়েছেন একটা আলাদা রচনা খাতা করতে। যা-তা খাতায় লিখবে না। দু সপ্তাহে একটা বাংলা রচনার ক্লাস, তিনি সমস্ত খাতা বাড়ি নিয়ে যান। ভালো করে সংশোধন করে তিন-চার দিন পরে খাতা ফেরত দেন। এবার অবশ্য ফেরত দিতে আরও তিনদিন বেশি দেরি হয়েছিল। শ্রীমান ইতিমধ্যে হোমটাস্ক লিখে বসে আছে। তাড়াতাড়ি লিখেছ খুব ভালো কথা। কিন্তু তা বলে অঙ্ক খাতায় লিখবে? কোনো আলগা কাগজে বা রাফখাতায় লিখতে পারত। তারপর আসল খাতা ফেরত পেলে তাতে টুকে নিত। আর হতে পারে হাবুল রচনা খাতাটি হারিয়ে বসে আছে। ফলে হাতের কাছে যা পেয়েছে তাতেই লিখেছে। ছি ছি একী নোংরামি, আজ তিনি আচ্ছা করে ধুচুনি দেবেন হাবুলকে। ছেলেখেলা পেয়েছে? সুধীরবাবু খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে হাবুকে বকুনি দেওয়ার জন্য মনে মনে কড়া কড়া বাক্য ভাঁজতে থাকেন।

অ্যাঁ এ কী! খাতা শেষ! কিন্তু রচনা কই?

—'হরিপদ, তুমি ভুল খাতা দিয়েছ, এতে রচনা নেই।'

—'অ্যাই, ঠিক খাতা দে। যেটায় লিখেছিস।' হরিপদ হাবুকে তাড়া লাগান।

তিনকড়ি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'না স্যার। ওই খাতা দেখেই পড়েছে।'

হ্যাঁ, তাই তো! নীল মলাটে রবিঠাকুরের ছবি ছাপা। তিনি পড়বার সময় লক্ষ করেছিলেন। সুধীরবাবু আর একবার পাতাগুলো সব উল্টে দেখেন, নেই!

ব্যাপার কী? ম্যাজিক নাকি? তিনি কী রকম ঘাবড়ে যান। তিনি শুনলেন, ক্লাসের ছেলেরা শুনল—অত বড় লেখাটা পড়ল।

—'হাবু, এই খাতা দেখেই পড়েছ?'

—'হ্যাঁ', হাবু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

—'তবে লেখা কই?'

হাবু নীরব নিস্পন্দ। 'কী? উত্তর দাও।' হাবু চুপ।

তবে কি সম্ভাবনাটা বিদ্যুতের মতো তাঁর মস্তিষ্কে উদয় হয়। কিন্তু এ যে অবিশ্বাস্য!

—'তবে কি মানে, তুমি কি লেখনি? বানিয়ে বানিয়ে বললে?'

—'হ্যাঁ স্যার।' ক্ষীণ কণ্ঠে হাবুর উত্তর আসে।

সুধীরবাবু হতভম্ব। তাঁর কুড়ি বছরের মাস্টারি জীবনে এ সমস্যা একেবারে অভিনব। শোনেননি কখনও।

প্রথমেই তাঁর কান গরম হয়ে উঠল রাগে। কী আস্পর্ধা? বেমালুম ঠকাল আমাকে। বেয়াদপ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় চিন্তাটা মাথায় আসে।

চশমার পুরু কাচের ভিতর থেকে সুধীরবাবুর বড় বড় চোখ দুটোর স্থির দৃষ্টি হাবুর ওপর নিবদ্ধ। শুধু হাবু নয়, গোটা ক্লাস কাঠ হয়ে আছে ভয়ে। হাবুর ভবিষ্যৎ ভেবে সবাই আতঙ্কিত। হাবু মনে মনে জপছে—হে ভগবান। যা হয় ইস্কুলে, বাবার কানে যেন না পৌঁছায়। হে ভগবান দয়া করো।

তখন সুধীরবাবুর মাথায় ঘুরছে—অদ্ভুত কাণ্ড! অতখানি রচনা স্রেফ বানিয়ে বলে গেল। আর এমন সুন্দর করে আশ্চর্য! সত্যি বলতে কী তাঁর ইচ্ছে করছে নেমে গিয়ে ছেলেটার পিঠ চাপড়ে বলেন, 'শাবাশ!'

না, অতটা বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না। ক্লাসের ডিসিপ্লিন রাখা তাহলে শক্ত হয়ে পড়বে। হয়তো এর পর থেকে প্রত্যেক ছেলে না লিখে বানিয়ে বলবার চেষ্টা করবে হাবুর দেখাদেখি। অবশ্য আর কারও ক্ষমতা নেই অমন বানায়। এমনকী ফার্স্ট বয় প্রফুল্লরও সাধ্য নেই।

থমথমে মুখ, গুরুগম্ভীর স্বরে সুধীরবাবু বললেন, 'কী, লেখনি কেন? দুসপ্তাহের মধ্যে সময় হল না!'

—'আজ্ঞে, ভেবেছিলাম কাল সন্ধেবেলা লিখে ফেলব।' হাবু মিনমিন করে, 'কিন্তু গোপালপুরের মেলায় গিয়েছিলাম বিকেলে। ফিরতে রাত হয়ে গেল। এসে দেখি খেতে দিচ্ছে। খেয়ে পড়া বাবার বারণ, তাই—'

—'হুম! তা সোজাসুজি স্বীকার করলে পারতে—'

—'ভেবেছিলাম করব।'

—'ও! তারপর বুঝি বুদ্ধি গজাল?'

—'না স্যার!' হাবুর কণ্ঠে কান্নার আভাস।

'বেশ, মনে থাকে যেন। কাল আমার রচনা চাই। ঠিক যা যা বললে সব পরিষ্কার করে লিখে আনবে। মনে থাকবে? খাসা বলেছ।'

[শারদীয় ১৩৭৮]
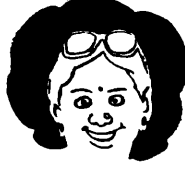
রায়বাড়ির ঘড়ি

কলকাতা ভবানীপুরে রায়বাড়ির ব্যাপার-স্যাপার হচ্ছে এলাহি। সাবেক কালের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি। বাড়িতে থাকেন তিন কর্তা। তাঁদের তিন গিন্নী। তাঁদের গুটি পাঁচ-ছয় ছেলেমেয়ে। গাদাগাদা পুষ্যি আত্মীয়স্বজন এবং এক পাল চাকর-ঝি। লোকজনের আনাগোনায় রায়বাড়ি সর্বদা সরগরম। বাড়ির বাসিন্দারা সবাই সবাইকে ভালো করে চেনেই না। কে আসছে, কে যাচ্ছে, কে তার খোঁজ রাখে।

বড়, মেজ, ছোট— তিন রায়-কর্তাই খুব ব্যস্ত মানুষ। বড় রায় ডাক্তার। তা ছাড়া তিনি পাঁচ-সাতটি স্পোর্টিং ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি প্রভৃতি নানা পদ অলংকৃত করে আছেন। ফলে রোগী দেখার পর বাকি সময়টুকু তিনি ওই ক্লাবগুলিকে নিয়েই বিব্রত থাকেন।

মেজ রায় কোম্পানির ডিরেক্টর। কোম্পানির লাভ-লোকসান ছাড়া তাঁর মগজে অন্য চিন্তা ঢোকার সুযোগ খুব কম।

ছোট রায় কলেজে পড়ান। বাকি সময় করেন সমাজসেবা। দলবল জুটিয়ে হই-হই করে, আজ বন্যাত্রাণ, কাল বস্তি উন্নয়ন, পরশু মেলায় ভলান্টিয়ারি করে বেঁড়াচ্ছেন। সংসারের ঝক্কি পোয়ানোর সময় কই?

যা হোক, রায়বাড়ির চাকা দিব্যি গড়িয়ে চলেছে। তিন রায়গিন্নি বেজায় চৌখস। কর্তাদের ভরসা তাঁরা করেন না। আর আছেন ভুবনবাবু। বুড়োকর্তা অর্থাৎ বর্তমান রায়দের বাবার আমলে তিনি ছিলেন জমিদারির নায়েব। এখন জমিদারি নেই। ভুবনবাবু কলকাতায় থেকে রায়দের যাবতীয় বৈষয়িক ধকল সামলান।

রায়কর্তারা কিন্তু মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়েন। ছোটখাটো বিষয়ে জোরালো মতামত প্রকাশ করে বাড়িতে নিজেদের মান রক্ষার চেষ্টা করেন। প্রত্যেক কর্তারই ধারণা, তাঁর অন্য দুই ভাই ঘোষ অপদার্থ, সংসারের দিকে মোটে হুঁশ নেই। ভাগ্যিস তিনি একটু-আধটু নজর দেন এদিকে, নইলে সব গোল্লায় যেত। অবশ্য গিন্নিরা কর্তাদের সাংসারিক বুদ্ধি নিয়ে আড়ালে হাসাহাসি করেন, আর ভুবনবাবু তো কর্তাদের পাত্তাই দেন না।

শনিবার দুপুর, বেলা প্রায় তিনটে বাজে। রায়বাড়ি নিঝুম। বোঝা যায়, বাড়ির লোকজন ঘুমুচ্ছে বা গড়াচ্ছে। একটা মোটর গাড়ি থামল বাড়ির উঠোনে। বড় রায় ঢুকলেন সদর দরজা

দিয়ে। বাইরের ফটকের মতো সদর দরজা সর্বদা হাট করে খোলা থাকে। দারোয়ান একজন আঠে বটে, কিন্তু সে নিজের কুঠুরিতে বসে খানা পাকায় বা ভজন গায়। মাঝে-মাঝে গোরু ছাগল ঢুকে পড়লে তাড়ায়। মানুষের আসা-যাওয়া নিয়ে মাথা ঘামায় না।

বড় রায়ের মিটিং ছিল ক্লাবে। কম মেম্বার উপস্থিত হওয়ায় মিটিং হয়নি, ভেস্তে গেছে। তাই অগত্যা অসময়ে বাড়ি ফিরেছেন।

সদর দরজা দিয়ে ঢুকে বাঁপাশে বৈঠকখানা ঘর। ঘরে আছে কয়েকটা পুরনো চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চি ইত্যাদি আসবাব। দরজা থেকে সোজা চোখে পড়ে দেওয়ালে ঝোলানো একটা মস্ত ঘড়ি। তার পেন্ডুলামটি দিবারাত্রি টকটক করে দুলছে। একটু কম পরিচিত আগন্তুককে এই ঘরে বসানো হয়।

রায়বাবু বৈঠকখানার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একবার ভিতরে উঁকি মারলেন।

ফাঁকা ঘর, কেবল একটি লোক পিছন ফিরে মুখ উঁচু করে দেওয়ালঘড়িটা দেখছে। লোকটির গায়ে ময়লা শার্ট ও ধুতি। ছোটখাটো চেহারা।

রায় থামলেন। 'এই, কে তুমি?'

লোকটি ঘাড় ফেরাল। বোকা-বোকা মুখে কাঁচুমাচু হাসি। 'এজ্ঞে ঘড়িটা দেখছি।'

'কেন, ঘড়ির কী হল?'

'এজ্ঞে, মানে টাইমটা ঠিক—'

'ও, তুমি কি ঘড়ির দোকান থেকে এসেছ?'

'এজ্ঞে।' লোকটি হাত কচলাতে-কচলাতে মাথা নাড়ল।

'কে খবর দিল?'

'এজ্ঞে বাবু।'

'কোন্ বাবু।'

লোকটি বেশ নার্ভাস হয়ে পড়ে। 'তা জানি না স্যার, মালিক জানে। আমি কর্মচারী। দূর থেকে দেখেছি বাবুকে। ফর্সা লম্বা। মুখ দেখিনি।'

তিন রায়ই ফর্সা এবং লম্বা। ঠিক কোন্ জন, তা বোঝা গেল না।

বড় রায় বললেন, 'কী বলেছে? অয়েলিং করতে? টাইম ঠিক দিচ্ছে না?'

'হ্যাঁ, বাবু।'

'বাস্ আর কিছু নয়?' রায় রেগে ওঠেন।

'মানে আমি তো ঠিক জানি না, মালিক জানো।' লোকটি বেজায় ঘাবড়ে যায়।

বড় রায় জোরে জোরে চিন্তা করেন। "নিশ্চয় কানুর কীর্তি। ও সেদিন বলছিল ঘড়িটা দেড় মিনিট স্লো যাচ্ছে, অয়েলিং করা দরকার, দোকানে খবর দিতে হবে, হুম্।'

কানু হচ্ছে মেজ রায়ের ডাক-নাম।

বড় রায় লোকটিকে বললেন, 'এ-ঘড়ির বয়স কত জান? ফর্টি ইয়ারস। চল্লিশ বছর। ওয়াচম্যান অ্যান্ড গ্র্যান্ডসন্স-এর তৈরি। খাঁটি বিলিতি জিনিস। আজও এক্কেবারে করেক্ট টাইম দেয়। মাত্র দু-এক মিনিট এদিক ওদিক হয় দৈবাৎ। ওটা সমস্যাই নয়। কিন্তু বাজনাটা খারাপ হয়ে গেছে। সেকথা বলেছে কি? প্রত্যেক ঘণ্টায় বিউটিফুল বাজনা বাজত। যেন জল-তরঙ্গের

শব্দ। শুধু টাইম ঠিক করে দিলেই বুঝি হয়ে গেল? কানের মাথা খেয়েছে সব। ওহে, তোমার মালিককে বলবে বাজনাটা ঠিক করে দিতে। মনে থাকবে?':

'এজ্ঞে স্যার।'

বড় রায় গটগট করে ভিতরে চলে গেলেন।

ঘড়ির দোকানের লোকটি একটা ভারী কাঠের টেবিলে জাপটে ধরে তুলে পা পা করে ঘড়ির নিচে আনছে। তখুনি মস্‌মস করে হেঁটে বৈঠকখানার সামনে থমকে দাঁড়ালেন মেজ রায়। পরনে তাঁর সুটবুট, হাতে জ্বলন্ত চুরুট।

চমকে গিয়ে লোকটি ধড়াম করে টেবিলটা মেঝেয় নামাল।

শনিবার হাফ-ডে হলেও মেজ রায় পুরো অফিস করেন। কিন্তু আজ হঠাৎ অফিস পাড়ায় লোডশেডিং হতে গরমে টিকতে না পেরে তিনি পালিয়ে এসেছেন। অফিসের গাড়ি তাঁকে গেটের বাইরে নামিয়ে দিয়ে গেছে। মেজাজ তেতেই ছিল। কড়া গলায় প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাল্লো, কে তুমি? কী করছ এখানে? টেবিলটা এত জোরে ফেললে কেন?'

লোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এজ্ঞে ঘড়িটা পাড়ব, তাই টেবিল আনছিলাম।—'

'কেন পাড়বে? হোয়াই?'

'ঘড়িটা ঠিক করতে হবে কিনা, তাই দোকানে নিয়ে যাব। আমি ঘড়ির দোকান থেকে আসছি।'

'অলরাইট, টাইমটা ভালো করে অ্যাডজাস্ট করবে, বড় স্লো যাচ্ছে।'

লোকটি ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ স্যার। আর বাজনাটাও ঠিক করতে হবে।'

'বাজনা?' ভুরু কোঁচকালেন মেজ রায়।

লোকটি তাড়াতাড়ি বলল, 'বাবু বলে গেলেন।'

হুঁ, বড়দা বলে গেছে। বড়দার গাড়ি দেখলাম বাইরে। মনে মনে ভাবলেন মেজো রায়। বড়দার কেবল ওই বাজনা নিয়ে যত মাথাব্যথা। হোপলেস।

মেজ রায় গম্ভীর গলায় বললেন, 'বুঝলে হে, ঘড়ির আসল ডিউটি হচ্ছে ঠিক সময় দেওয়া। টাইম ফার্স্ট, মিউজিক নেক্‌স্ট। মাইন্ড দ্যাট।'

লোকটি হাত কচলাতে কচলাতে জানাল, 'হ্যাঁ স্যার।'

দোকানের লোকটির বিবেচনায় সন্তুষ্ট হয়ে চুরুটে লম্বা টান দিয়ে মেজো রায় বাড়ির ভিতর পা বাড়ালেন।

ঘড়িতে সুবিধেমতো হাত পাওয়া যাচ্ছে না। বেশ উঁচুতে ঝোলানো। কীভাবে কায়দা করে নামানো যায় ভাবছে লোকটি। এমন সময় চটির ফটর-ফটর আওয়াজ। দরজার গোড়ায় ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত ছোট রায়ের আবির্ভাব হল।

ছোট রায় কলেজ থেকে ফিরছেন। বিকেলে শিক্ষা প্রসার সমিতির মিটিং আছে পাড়ায়, তাই চলে এসেছেন। একজন লোককে টেবিলে চড়ে দু হাতে তুলে ঘড়িটা ধরে বিচিত্র ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'কী করছ হে? ঘড়িতে দম দিচ্ছ নাকি?'

থতমত খেয়ে লোকটি বলল, 'এজ্ঞে না।'

'তবে?'

'ঘড়িটা দোকানে নিয়ে যাব, তাই নামাচ্ছি।'

'দোকানে কেন?'

'মেরামত করতে হবে। আমি ঘড়ির দোকানের লোক।'

'কে সারাতে বলেছে?' ছোট রায় জানতে চাইলেন।

'এজ্ঞে, বাবু।'

ছোট রায় বুঝলেন, তাঁর দুই দাদার কেউ। জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?'

লোকটি ঘাড় কাত করে জানাল, হ্যাঁ।

"তা ঘড়ি কীভাবে নামাবে তার কিছু উপায় বলেছেন বাবু?"

লোকটি এপাশ-ওপাশ মাথা দোলাল। অর্থাৎ না।

ছোট রায়ের ঠোঁটে একটু বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। হুঁ, দাদাদের কাণ্ডই এইরকম। স্রেফ অর্ডার দিয়েই খালাস। বেচারা কেমন মুশকিলে পড়েছে।

তিনি লোকটিকে বললেন, "ওভাবে হবে না। একটা মই চাই। কিন্তু মইটা যে রেখেছে কোথায় কে জানে। তা যাকগে, এক কাজ করো। ওই টুলটা আনো। রাখো টেবিলের ওপর।"

লোকটি সরু নড়বড়ে টুলখানা এনে টেবিলের ওপর রাখল।

'ওঠো, ওঠো, ভয় নেই।' রায় দোকানের লোকটিকে উৎসাহ দিলেন, 'আমি ধরছি।'

'এজ্ঞে আপুনি বাবু?' লোকটি ইতস্তত করে।

'তাতে লজ্জা কী? চড়ে পড়ো টুলে।"

ছোট রায় হাতেকলমে সমাজসেবী। এই সামান্য কাজের জন্য বাড়ির চাকরবাকরদের ডাকাডাকি করার মানে হয় না। তিনি কোঁচা সামলে শক্ত মুঠোয় টুলের পায়া চেপে ধরলেন।

ঘড়ি সমেত লোকটি মাটিতে নামল। রীতিমতো ভারী ঘড়ি। দু হাত আঁকড়ে বগলদাবা করে রাখতে হয়েছে। রায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কদ্দুর যাবে?'

'এজ্ঞে ধর্মতলা।'

'যাবে কীসে?'

'টেরামে।'

'আরে দুর, ট্রামে এই ঘড়ি নিয়ে উঠতেই পারবে না, যা ভিড়।'

'তবে হেঁটে যাই।'

' না না। এতখানি পথ হাঁটবে কী! বরং রিকশায় যাও। এই নাও—' রায় একখানা নোট লোকটির হাতে গুঁজে দিলেন, 'ভাড়া।'

কৃতার্থ মুখে পেন্নাম জানিয়ে লোকটি ঘড়ি বগলে গুটগুট করে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। ছোট রায়ও চটি ফটর-ফটর করতে-করতে দোতলায় উঠলেন।

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ। দোতলায় বারান্দায় তিন রায়-কর্তা চেয়ারে পাশাপাশি বসেছেন, হাতে চায়ের কাপ।

বড় রায় প্রথমে কথা পাড়লেন।

'কানু, তুই ঘড়ির দোকানে খবর দিয়েছিস, ভেরি গুড। কিন্তু শুধু অয়েলিং আর টাইমের কথা বলেছিস কেন? বাজনাটার কথাও তো বলতে হয়। ভাগ্যিস দোকানের লোকটার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল, নইলে ঘণ্টাটা আর মেরামতই না।'

মেজ রায় অবাক হয়ে বললেন, 'আমি? আমি আবার ঘড়ির দোকানে গেলাম কখন? আমি তো ভাবলাম তুমি কিংবা বলাই খবর দিয়েছ।'

বলাই অর্থাৎ ছোট রায় সরবে বলে উঠলেন, 'না না, আমি নই। আমি তো ভাবলাম তোমরা কেউ বুঝি ঘড়িটা সারাতে পাঠাচ্ছ।'

বড় রায় হতভম্বের মতো বললেন, 'সে কী, লোকটা যে বলল এই বাড়ির বাবু গিয়েছিল খবর দিতে, ফর্সা লম্বা।'

চায়ের কাপ খট্ করে সামনের টেবিলে নামিয়ে রেখে তিনি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন, 'লোকটা চলে গেছে ঘড়ি নিয়ে?'

'হ্যাঁ গেছে। আমি দেখেছি।' জানালেন ছোট রায়।

ধপাস্। বড় রায় ফের চেয়ার নিলেন। 'দোকানের ঠিকানাটা বলেছে কি?' করুণ কণ্ঠে তিনি জানতে চাইলেন।

'উহুঁ।' হতাশ ছোট রায়ের জবাব। 'ও শুধু বলল, ধর্মতলা।'

তিন কর্তাই চুপ। গম্ভীর বদন, উদাস নয়ন। তাঁরা তিনজনের কেউই নয়। ভুবনবাবু বেঁটেখাটো শুকনো এবং কৃষ্ণকায় ব্যক্তি। এ-বাড়ির আর কাউকে তো বাবু বলে ভুল করার কারণ নেই। তবে?

একটা বিচ্ছিরি আশঙ্কা তিনজনের মনেই চকিতে উদয় হয়। চোর নয় তো? বেটা তিন কর্তার নাকের ডগা দিয়ে ঘড়ি হাতিয়ে চম্পট দিল নাকি?

বড় রায় দু চুমুকে চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুই ভাই। যে যার ঘরের উদ্দেশে রওনা দিলেন। চটপট পোশাক পরে বেরিয়ে পড়তে হবে। একটু পরেই আবিষ্কার হবে, ঘড়ি নেই। তারপর শুরু হবে হইচই। সুতরাং আগেই সরে পড়া উচিত।

রায়বাড়ির বৈঠকখানার দেওয়াল-ঘড়ি আর কোনোদিন ফিরে আসেনি। ঘড়ির রহস্যময় অন্তর্ধান নিয়ে প্রচুর জল্পনাকল্পনা খোঁজখবর হয়েছিল। কিন্তু কিছু হদিশ মেলেনি। রায়কর্তাদের কানেও অনেক ঘড়ির কথাটা তুলেছিল। কিন্তু, এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তাঁরা মোটে গা-ই করলেন না।

[আনন্দমেলা এপ্রিল, ১৯৭৭]

কার অধিকারে?

বাস চলছিল গড়িয়ে গড়িয়ে, থেমে থেমে। চৌমাথা থেকে বাজর অবধি পথে বেজায় ভিড়। তাছাড়া প্যাসেঞ্জারও ওঠেনি তেমন; অনেক সিট খালি। হয়তো আরও লোক তোলার আশায় বাস আস্তে আস্তে ধরছিল। কন্ডাক্টার ক্রমাগত চিৎকার করছে—'দুর্গাপুর, ইলেমবাজার, পানাগড়, দুর্গাপুর—চলে আসুন।'

আমি বসেছিলাম ড্রাইভারের ঠিক পিছনে, চকচকে পিতলের রডগুলোর গায়ে কোণের সিটটায়। ওখান থেকে ড্রাইভারের হাবভাব বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। ড্রাইভারের বাঁপাশের সিটে একজন মাত্র যাত্রী। তার পায়ের কাছে মস্ত উঁচু এক লুঙ্গির গাঁটরি। লোকটি বৃদ্ধ। পরনে ধুতি ও শার্ট, নাকের ডগায় গোল ফ্রেম চশমা, রোগা চেহারা, মাথায় কদমছাঁট পাকা চুল। সে বাসের ঝাঁকুনির তালে তালে টলটলায়মান লুঙ্গির মনুমেন্টটিকে কোনোরকমে আঁকড়ে ধরে সামলাচ্ছিল।

ঘন ঘন থামছে গাড়ি, আবার বিনা নোটিশে গোঁত্তা মেরে এগোচ্ছে। ফলে লোকটি গাঁটরি সামলাতে কিঞ্চিৎ বেগ পাচ্ছিল বোধহয়। হঠাৎ সে বলল—'বাজারের পথটা পেরোতে আর কতক্ষণ লাগবে হে?'

সঙ্গে সঙ্গে—ঘ্যাঁচ! ব্রেক কষল বাস। যুবক ড্রাইভার আধখাওয়া বিড়িটা জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে গাঁটরির মালিকের মুখোমুখি ঘুরে বসে কড়া গলায় বলল—'কী মশাই, ভদ্রতা জানেন না? আমায় "হে" বললেন যে, অ্যাঁ! কোন অধিকারে? কী রাইট আপনার?'

আচমকা ড্রাইভারের এই রুদ্রমূর্তি দেখে লোকটি থতমত হয়ে গেল। কাঁচামাচুভাবে ক্ষীণ হেসে বলল, 'এঁহে তা অধিকার একটু আছে তো—'

ড্রাইভারের তর্জনে বৃদ্ধের বাকি কথা আর শেষই হল না।

—'বটে? আবার অধিকার ফলানো হচ্ছে? বলতে চান বয়সে বড়? তবে আর কী, এক্কেবারে মাথা কিনে নিয়েছেন। যা খুশি তাই বলা যাবে।'

—'না, মানে আমি—' বৃদ্ধ মিনমিন করে কী বলতে যেতেই এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিল ড্রাইভার।

—'থাক থাক আর ন্যাকা সাজবেন না। হে-টে আবার কোনদিশি ডাক? যত্তসব অভদ্র।

আমাদের বুঝি প্রেস্টিজ-টেস্টিজ নেই? বলি, কোট-প্যান্ট পরা বাবু হলে এমন হে-টে বেরুত মুখ দিয়ে?' তার গজর গজর আর থামে না। বেচারা বৃদ্ধ ঘাবড়ে গিয়ে চুপ। সে বিমর্ষভাবে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল। বুঝলাম, ড্রাইভারটির আত্মসম্মান খুব প্রখর এবং হে সম্বোধনে বিশেষ আপত্তি আছে।

ড্রাইভারের বকুনি অবশ্য বেশিক্ষণ চলার সুযোগ হল না। অন্য যাত্রী হৈ হৈ করে উঠল—'ও দাদা, এবার স্টার্ট দিন, লেট হয়ে যাচ্ছে। চলতে চলতে লেকচার হোক'...ইত্যাদি।

তাড়া খেয়ে বাস ছাড়ল। বার কয়েক নিজের মনে বকবক করে ড্রাইভার অ্যাকসিডেন্ট বাঁচাতে মন দিল।

জানলা দিয়ে দেখতে দেখতে যাচ্ছি। দুপাশে উদার মাঠ, দিগন্ত বিস্তৃত ক্ষেত। গোছা গোছা হলুদ শিষভরা ধানগাছের ডগাগুলো হাওয়ায় ঢেউ খেলছে। মাঝে মাঝে আলের পথ বেয়ে হন হন করে চলেছে কর্তা, তার ঘাড়ে রংচঙে টিনের বাক্স। চার-পাঁচ হাত পিছনে চলেছে ঘোমটা ঢাকা স্ত্রী; কাঁখে ছেলে। অনেকটা পিছিয়ে পড়ছে, আবার দৌড়ে গিয়ে ধরছে স্বামীকে। মাথায় তরিতরকারি নিয়ে যাচ্ছে হাটুরে। রাখাল ছেলেরা দূর থেকে মুখ ভেঙাচ্ছে বাসের প্যাসেঞ্জারদের। রাস্তার ধারে বড় ছোট পুকুর। ঘাটে কাপড় কাচছে বউ-ঝিরা। ছোট ছেলেরা সাঁতার কাটছে আর তোলপাড় করছে জল। কোথাও জলের ধারে ছিপ হাতে ধ্যানমগ্ন একটি লোক, অন্য পারে একই ভঙ্গিতে এক বক। কখনো শাঁ করে উড়ে যাচ্ছে লম্বা লেজওলা ফিঙে। দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ লক্ষ করলাম, ড্রাইভার ও গাঁটরির মালিক সেই বৃদ্ধের মধ্যে নীচুস্বরে কী জানি কথাবার্তা হচ্ছে।

অবাক হয়ে দেখি, প্রায়ই বাস থামলে ড্রাইভার নিজে থেকেই ঘাড় বাড়িয়ে দেয় বৃদ্ধের দিকে। চাপা স্বরে কথা হয়। বৃদ্ধের কথায় ড্রাইভার ঘনঘন মাথা দোলায়, হাসে। বাঃ, ড্রাইভারের রাগ দেখছি পড়ে গেছে। বোধহয় বৃদ্ধের ওপর একটু বেশি মেজাজ দেখানো হয়ে গেছে ভেবে সে এখন লজ্জিত। তাই আলাপ-টালাপ করে কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়।

এক স্টপেজে ড্রাইভারের কোনো চেনা লোক তাকে একটি সিগারেট অফার করল। দেখলাম, ড্রাইভার একটু বিব্রতভাবে চোখ টিপে তাকে ইশারা করল—না। ফের সে বৃদ্ধের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল।

এমনি চলল পানাগড় অবধি।

পানাগড়ে বাস থামতে বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াল, নামবে বলে। পাশের দরজা খুলে তড়াক করে লাফিয়ে নামল ড্রাইভার। ছুটে গিয়ে হাজির হল বাসের সিঁড়ির মুখে। নিজেই টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে আনল লুঙ্গির গাঁটরি।—'রিকশা, অ্যাই রিকশা!' হাঁক পাড়ল সজোরে। বাসের ছোকরা হেলপারকে ডাক দিল—'ওরে কেষ্টা, রিকশায় তুলে দে মালটা।' তারপর সে একছুটে ঢুকল সামনের মিষ্টির দোকানে।

বৃদ্ধ ও মাল সাইকেল-রিকশায় উঠল। হন্তদন্ত হয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল ড্রাইভার। হাতে একটা হাঁড়ি, খুব সম্ভব মিষ্টি আছে তাতে। বৃদ্ধের কোলে গুঁজে দিল হাঁড়িটা। টুকরো টুকরো কথা এল কানে—'বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্যে। না না, তাতে কী, এই সামান্য'—হাত কচলাতে কচলাতে সে টুক করে একটা পেন্নামও ঠুকে দিল বৃদ্ধকে।

রীতিমতো আশ্চর্য হলাম। ড্রাইভারটির রাগ ও প্রায়শ্চিত্ত দুই-ই দেখছি বাড়াবাড়ি ধরনের। রিকশা ছেড়ে দিতে ও ফিরে এল। মাথা নেড়ে সমানে বিড়বিড় করছে : 'আরে ছি ছি। আরে ছি ছি—কী কাণ্ড!'

বেজায় কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলাম—'কী ব্যাপার মশাই?'

সে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আর বলবেন না স্যার, কেলেঙ্কারি!!'

—'কেন? কে উনি?'

ড্রাইভার চোখ বড় বড় করে বলল, 'মামাশ্বশুর!'

বললাম, 'সে কী, মামাশ্বশুরকে চিনতে পারেননি!'

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'কী করে চিনব বলুন, একটিবার মাত্র দেখেছি। সেই বিয়ের সময়। বছর খানেক আগে ওই হট্টগোলের মাঝে কত রকমের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, সবাইকে কি মনে আছে ছাই। হঠাৎ সন্দেহ হল কেমন চেনা-চেনা ঠেকছে। আর কী সব বলছিল, অধিকার টধিকার আছে, ভাবলাম একটু খোঁজ নিই তো। ব্যস, বেশিয়ে গেল—কুটুম্ব। একেবারে সাক্ষাৎ গুরুজন। পানাগড়ে কাপড়ের দোকান আছে! বউ ছেলেবেলায় কয়েকবার এসেছে এনাদের বাড়ি। ইস, বউয়ের কানে যদি ঘটনাটা যায়?'

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে ড্রাইভার বলল—'ওনার ব্যাভারটাও কিন্তু উচিত হয়নি, যাই বলুন। উঠেই পরিচয় দে, না ঘাপটি মেরে মজা দেখছেন। বললেন, বাবাজি আমায় চিনতে পার কিনা পরখ করছিলুম।'

আমার দিকে কাতর চোখে চেয়ে সে বলল—'এক কেজি স্পেশাল রাজভোগ দিলাম। পড়বে না রাগটা? বউয়ের কাছে আর বোধহয় কথাটা তুলবেন না। কী বলেন দাদা?'

আমি ভরসা দিলাম, 'কিছু ঘাবড়াবেন না। আমার তো মনে হল উনি মোটেই চটেননি। বেশ হেসে কথা-টথা বলছিলেন দেখলাম।'

—'ও ড্রাইভার দাদা। ছাড়ুন ছাড়ুন। লেট হয়ে যাচ্ছে—' বাসের যাত্রীরা চিৎকার শুরু করল। কন্ডাক্টরও ঘণ্টি মারছে ঘনঘন। ড্রাইভার আমার কাছে আরও একটু সান্ত্বনা পাওয়ার আশায় ছিল। তাড়া খেয়ে মহা বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে ঘ্যাঁচ করে একসেলারেটার চাপল। ঝাঁকুনি খেয়ে এগোল বাস।

[শারদীয় ১৩৮৭]

বুলামাসির বাড়িতে

বুলামাসিকে দেখে অন্তু মুগ্ধ হয়ে গেল। কী সুন্দর দেখতে! কী সুন্দর কথা! বুলা মাসি অন্তুকে বার বার বলে গেলেন, একদিন তাঁদের বাড়ি যেতে। — "তোমায় এই এতটুকু দেখেছি। কত বড় হয়ে গেছ। কলেজে পড়ছ! অন্তুর অবশ্য বুলামাসিকে মনে নেই, তবে মার মুখে তাঁর অনেক কথা শুনেছে।

বুলামাসি মায়ের দূর সম্পর্কের বোন হন। এতদিন দিল্লিতে ছিলেন। মাত্র মাসখানেক হল বুলামেসো কলকাতায় চাকরি নিয়ে এসেছেন।

বুলামাসি চলে যেতে অন্তুর মা আর এক প্রস্থ তাঁর গুণপনা শোনাতে লাগলেন।

বুলামাসি নাকি বিয়ের আগে কবিতা লিখতেন, নাচতে পারতেন, সেতারও শিখেছিলেন। এখনও একটু আধটু রেওয়াজ করেন। বিশ্বম্ভরবাবু অর্থাৎ বুলামেসো ভারি গোপ্পে লোক। দু বছর আগে একবার কলকাতায় এসেছিলেন তখন অন্তুর মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সেবার ওরা এসেছিলেন অন্তুদের বাড়ি। অন্তু অবশ্য সেদিন বাড়ি ছিল না।

কান ভরে বুলামাসির গুণকীর্তন শুনতে শুনতে অন্তু ভাবল বুলামাসির জন্য কিছু একটা করতে হবে। ঠিক আছে গোলাম হোসেনের জলসায় ওঁকে নেমন্তন্ন করবে।

অন্তুর পাড়ায় আসছে রবিবার বিখ্যাত সেতার বাজিয়ে ওস্তাদ গোলাম হোসেন সেতার বাজাবেন চৌধুরি বাড়িতে। ঘরোয়া আসর। শুধু বাছাবাছা লোকেদের নেমন্তন্ন করা হচ্ছে। ওস্তাদজি কদাচিৎ কলকাতায় আসেন। এবার মাত্র দুদিন থাকবেন কলকাতায়। তাই বাজনা প্রেমিক সকলেই ওই আসরে নেমন্তন্ন পাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে আছে।

অন্তুর সঙ্গে চৌধুরী গিন্নি বাণীদির বেজায় খাতির। আসরের ব্যবস্থাপনার কাজে ক'দিন ধরে সে খুব খাটাখাটি করছে। তাই অন্তু দু-চারজনকে তার ইচ্ছেমতো জলসা শুনতে নেমন্তন্ন করতে পারে বইকি।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অন্তু মাকে বলল, "বুলামাসির কাছ থেকে উলের ডিজাইন বইটা আনবে না?"

মা বললেন, "আনব তো। সময় পাচ্ছি কই? তুই এনে দে না?" "আচ্ছা দেখি। আজ যাব ওই পাড়ায় একটা কাজ আছে," অন্তু জানাল।

বুলামাসি অন্তুকে দেখে হই হই করে উঠলেন — "আরে কী ভাগ্যি। ওগো অন্তু এসেছে। বস বস।"

ফরসা, মোটাসোটা, দাঁতে পাইপ কামড়ানো বিশ্বম্ভরবাবু হাসিমুখে ড্রইং রুমে ঢুকলেন।

"আরে থাক থাক প্রণাম নয়। তোমরা মডার্ন ছেলে। তারপর বাড়ি খুঁজতে অসুবিধা হয়নি তো?" মেসো জাঁকিয়ে বসলেন।

অন্তু একটু ইতস্ততঃ করে বলল, "মাকে একটা ডিজাইন বই দেবেন বলেছিলেন?"

"ও তাই বুঝি মশায়ের আগমন ঘটল? বেশ দিচ্ছি বই, এখুনি ভাগো।" বুলামাসি তেড়ে ওঠেন।

"না না তা কেন? অমনিই আসব প্ল্যান করেছিলাম, মা কাজটা চাপিয়ে দিল।"

অন্তুর বেশ লাগছে। বাড়ি থেকে সে ইচ্ছে করেই চা খেয়ে বেরোয়নি। জানে এখানে নিশ্চয় পাবে। গোলাম হোসেনের কথাটা পাড়বে একদম শেষে। ঠিক ওঠার মুখে চমক দেবে।

"পিংকু পিংকু", বুলামাসি সজোরে ডাকতে থাকেন।

পিংকুর নাম শুনেছে অন্তু। বুলামাসির চার বছরের ছেলে।

একটু পরে দরজার গোড়ায় ছোট্ট এক মূর্তি আবির্ভূত হল। তার মাথায় কোঁকড়া চুল। মুখখানা বেশ মিষ্টি। কিছু একটা চুষছে। কারণ গাল আর ঠোঁট নড়ছে। তার এক হাতে একটা রবারের বল, অন্য হাতে প্যান্টটা আঁকড়ানো। গোল গোল চোখে পিংকু আগন্তুককে লক্ষ করতে লাগল।

"পিংকু এখানে এসো। তোমার অন্তুদা।" বুলা মাসি ডাকল।

পিংকু নড়ল না।

অন্তু নিজেই উঠে গিয়ে পিংকুর গাল টিপে আদর করে তাকে কোলে তুলে নিল। অমনি পিংকু, "আঁ আঁ" করে বিকট চিৎকার দিয়ে হাত পা ছুড়তে শুরু করল।

ঘাবড়ে গিয়ে অন্তু তাকে মেঝেতে নামিয়ে দিল।

"ছিঃ অমন করে না, অন্তুদা আদর করছে।" বুলামাসি অনুযোগ করেন। নিজের অপ্রস্তুতি ভাবটা সামলাতে অন্তু পিংকুকে জিজ্ঞাসা করল — "তোমার ভালো নাম কী?"

পিংকু জড়িয়ে জড়িয়ে কী জানি একটা বলল।

বুলামাসি বুঝিয়ে দিলেন, "দিব্যেন্দুপ্রকাশ মুখার্জি। কেমন নাম? সুন্দর না? ওর কাকা রেখেছে।"

বুলামাসি পিংকুকে বলল, "অন্তুদাকে তোমার ছবির খাতা দেখাবে না? যাও নিয়ে এসো।"

পিংকু মায়ের কথায় কান না দিয়ে ডান মুঠোর তর্জনীটি মুখে পুরে অন্তুর দিকে তাকিয়ে রইল।

বুলামাসি নিজেই উঠে গিয়ে খাতাগুলো নিয়ে এসে অন্তুর কোলে ফেলে দিল। তিনটে গাবদা গাবদা খাতা। অন্তু পিংকুর দিক থেকে চোখ সরিয়ে খাতার পাতায় মন দিল।

স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার থাকলে অন্তু ঠিক বলত — এগুলো স্রেফ কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং। কিন্তু আপাতত প্রাণপণে ছবিগুলির মর্ম উদ্ধারের চেষ্টা করতে লাগল। অবশ্য চেষ্টা করেও লাভ হত না যদি না বুলামাসি প্রত্যেকটি ছবির ব্যাখ্যা করে দিতেন। বুলামাসি

বলতে লাগলেন — "এটা হরিণ। এটা মানুষ। এটা হাতি —"।

কতগুলো খোঁচা খোঁচা দাগ আর ফুটকি দেখিয়ে বললেন, "এটা শজারু। কি ব্রাইট রং দিয়েছে, না? জান অন্তু ওর চোখ খুব শার্প। চিড়িয়াখানা দেখে এসে দু-দিনে এই খাতাটা শেষ করে ফেলল।"

অন্তু মাথা নেড়ে সমানে বলে চলল, "বাঃ চমৎকার। সুন্দর। বিউটিফুল।"

আরও দুটো খাতা অন্তুকে খুঁটিয়ে দেখতে হল। দুনিয়ার হেন জিনিস নেই বোধহয় যার দিকে শ্রীমান পিংকুর চোখ পড়েনি।

পিংকু তখন ঘরময় দাপিয়ে ফুটবল খেলছে। সে শুধু একবার চেয়ারের পিছনে উঠে অন্তুর প্যান্টের ওপর আধখানা পা রেখে তার ঘাড়ের পাশ দিয়ে ডিঙি মেরে নিজের শিল্পকীর্তি দর্শন করেছিল। অন্তু আলতো ভাবে প্যান্টটা ঝেড়ে ফেলল।

একবার দুম করে বলটা লাগল অন্তুর পিঠে। চমকে অন্তু হাত থেকে খাতাখানা ফেলে দিল। বুলামাসি বললেন, "পিংকু বারান্দায় খেল গিয়ে। অন্তুদাকে দেখতে দাও।" পিংকু মায়ের কথা গ্রাহ্যই করল না। ফলে বাকি ছবিগুলো দেখবার সময় অন্তু আড় চোখে ছুটন্ত বলটার ওপর নজর রাখল।

ছবির পর্ব শেষ হল। অন্তু ঘড়ি দেখল চল্লিশ মিনিট কাবার। চায়ের অভাবে গলাটা শুকিয়ে আসছে। কোনো আশাও তো দেখছে না।

মেসো বোধহয় ছবির তেমন সমঝদার নন। এতক্ষণ তিনি চুপচাপ হাসি হাসি মুখে পাইপ টানছিলেন। বুলামাসি থামতে তিনি মুখ খুললেন।

"বুঝলে অন্তু ওকে ট্রেনিং দিলে দারুণ ফুটবলার হবে। কী কিকের জোর! ন্যাচরাল ট্যালেন্ট। দেখবে? পিংকু কিক কর তো!"

মেসো রবারের বলটা পিংকুর দিকে গড়িয়ে দিলেন।

পিংকু মিস কিক করল। বল আলমারির তলায় ঢুকে গেল।

মেসো হামাগুড়ি দিয়ে বল বের করে আনলেন। এবং সেটা পিংকুর পায়ের গোড়ায় ধরলেন।

পিংকু সজোরে লাথি কষাল।

বল দেওয়ালে লেগে রিবাউন্ড করে মেসোর নাকে লাগল তারপর একটা ফুলদানি উল্টে দিল। "উঃ" — মেসো নাকে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "দেঁখচ কী কিক্! হবে না, বাপকা বেটা। পিংকু আর নয় অনেক খেলেচ। এবার রেস্ট।"

— "না।"

"লক্ষ্মীছেলে কাল একটা চকলেট দেব।"

চকলেটের লোভে পিংকু খেলা বন্ধ করল। মেসো বলটা আলমারির মাথায় রেখে দিলেন।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে অন্তু বলল, "আপনি বুঝি ভালো ফুটবল খেলতেন?"

"হুঁ। কলেজটিমে রাইট ব্যাক। আচ্ছা তুমি কোথায় খেল?"

অন্তু মাথা চুলকে বলল, "এই পাড়ার ক্লাবে।"

মেসো হতাশ ভাবে মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ ওখানে চলবে না।

"ডিজাইন বইটা দেবেন নাকি বুলামাসি?" অন্তু জিজ্ঞেস করল।

"দেব দেব। তুমি কি এখুনি উঠবে! বস চা খেয়ে যাও।"

অন্তু আরাম করে বসল। বুলামাসি চা বানাতে রান্নাঘরে গেলেন। একটু বাদে বুলামাসি চা নিয়ে এলেন। সঙ্গে প্লেটে দুটি বিস্কুট।

চা খেতে খেতে অন্তু বলল, "বুলামাসি আপনি এখনও সেতার বাজান?"

"কই আর সময় পাই। হাঁ পিংকু অন্তুদাকে তোমার ব্রতচারী নাচ দেখাবে না? দেখ কী সুন্দর তুলেছে নাচটা, মাত্র একবার দেখে। ওর চমৎকার তালজ্ঞান!"

পিংকু তখন রেলগাড়ির এঞ্জিন হয়ে ঘরময় ছুটছে।

তাকে নাচে উৎসাহ দিতে বুলামাসি নিজেই শাড়ি কোমরে জড়িয়ে, মুঠো পাকিয়ে শরীর ঝাঁকিয়ে শুরু করলেন,

"চল্ কোদাল চালাই

ভুলে মানের বালাই"...

পিংকু থমকে দাঁড়িয়ে মায়ের নাচ দেখতে লাগল। যেন মায়ের নকল করতেই একবার পা ঠুকল। বুলামাসি ভীষণ উৎসাহ দিলেন — "এই তো বেশ হচ্ছে। কর কর।"

"কু-উ-উ" — পিংকু আবার এঞ্জিন হয়ে গেল।

বুলামাসি ঘেমেটেমে বসে পড়লেন। বললেন, "নাঃ আজ ওর মুড নেই। সেদিন মিসেস ব্যানার্জির সামনে কী সুন্দর দেখাল!"

পিংকু হঠাৎ চ্যাঁ করে উঠল, "ম্যা খিদে পেয়েছে।"

অন্তু অমনি লাফিয়ে উঠল — "ইস্, রাত হয়ে গেল। আমি যাই।"

"আরে বস না একটু। মোটে আটটা বাজে। তোমায় একটা মজার জিনিস দেখাব। লক্ষ্মীর মা পিংকুকে খেতে দাও।" বুলামাসি অন্য ঘরে গেলেন। অন্তুকে আবার বসতে হল।

"কী মজা?" বিশ্বম্ভরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে অন্তু জানতে চাইল। কিন্তু তিনি শুধু ঠোঁটে রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে নাকে হাত বুলতে বুলতে পাইপ টানতে লাগলেন।

বুলমাসি ফিরে এলেন। এক হাতে ডিজাইনের বই অন্য হাতে একটা বাক্স। বললেন, 'জান অন্তু পিংকু মজার মজার ছড়া শিখেছে — বাংলা, হিন্দি, ইংরিজি। ভারি লাজুক কিনা বাইরের লোকের সামনে তাই বলতে চায় না। সব টেপ করে রেখেছি। ওগো চালাও না রেকর্ডারটা।"

আরও মিনিট কুড়ি অন্তুকে বসে বসে পিংকুর কণ্ঠস্বর শুনতে হল। প্রত্যেক কবিতার শেষে তাকে বলতে হল — "বাঃ বাঃ চমৎকার।"

তবে একটা কবিতাও ওর কানে ঢোকেনি। গলাটা ফের শুকিয়ে গেছে। পেট খিদেয় চোঁ চোঁ করছে। আশা করে অল্প খেয়ে এসেছিল। মাত্র দুটি বিস্কুটে পোষাবে কেন?

রেকর্ড শোনা শেষ হওয়া মাত্র অন্তু তড়াক করে উঠে দরজার দিকে এগোতে লাগল। বুলামাসি বললেন, "আসবে কিন্তু মাঝে মাঝে।"

বুলামেসো বললেন, "হাঁ সময় পেলেই চলে এসো। বেশ আড্ডা দেওয়া যাবে।"

অন্তু দরজার বাইরে পা দিয়েছে বুলামাসি বললেন, "অন্তু তোমাদের পাড়ায় নাকি গোলাম হোসেন বাজাচ্ছেন রোববার? রমাদি বলছিল। কোনো দিন আসরে বসে ওঁর বাজনা শুনিনি। একটু ব্যবস্থা করে দাও না ভাই।"

অন্তু উদাস ভাবে বলল, "দেখি, চেষ্টা করে।"

[১৯৮১ পক্ষীরাজ শারদীয়া]

চার্বাক-হিংটিং সংবাদ

এক

বিকেল পাঁচটা।

তিনতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় নেমে অভিজিৎ দত্ত দেখলেন, একতলা থেকে এক্সপেরিমেন্টাল লেবরেটরির প্রজেক্ট অফিসার দীপক বোস উঠে আসছেন।

'কোথায়'? অভিজিৎ দত্ত জিজ্ঞেস করলেন।

'ডিরেক্টর ডেকেছেন', বললেন দীপক।

'আমাকেও। ব্যাপারটা কী? এমন ছুটির পরে?'

'ঠিক বুঝছি না। অনেকেই ডাক পেয়েছে। কীছু একটা ঘটেছে। সিরিয়াস কীছু।'

ডিরেক্টরের ঘরের সুইং ডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন দু-জন। মস্ত ঘর। অর্ধবৃত্তাকার টেবিলের পিছনে বসে গম্ভীরবদন ডিরেক্টর। সামনে দু-সারি চেয়ারের অধিকাংশই ভর্তি। প্রায় জনা দশ পুরুষ ও মহিলা উদ্বিগ্ন মুখে কর্তার মুখ চেয়ে অপেক্ষা করছেন। অভিজিৎ ও দীপক ঢুকতেই সকলের চোখ তাদের দিকে ফিরল। হাতঘড়ি দেখলেন ডিরেক্টর। ভুরু একটু কুঁচকে গেল। চার মিনিট লেট। উনি সময় মেনে চলতে ভালোবাসেন। যাহোক এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করলেন না। সোজা হয়ে বসলেন। অমনি গোটা ঘর নড়েচড়ে উঠল।

ইনস্টিটিউট অফ সাইবারনেটিকস্-এর প্রধান তাঁর কাঁচা পাকা ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়িতে হাত বুলতে বুলতে একটু অন্যমনস্কভাবে বলতে শুরু করলেন —'আপনাদের ডেকেছি। হ্যাঁ, একটা কারণ আছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত। এটা আমাদের মধ্যেই থাকুক। কথাটা বাইরে চাউর হয় আমি চাই না। কারণ — কারণটা আপনারা শুনলেই বুঝতে পারবেন। একটা কেলেংকারি। আমাদের মতো নামী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এটাকে আর কীই বা বলা যায়। লোকে জানলে আমাদের স্রেফ বুদ্ধু বলবে —'

ডিরেক্টরের এই এক স্বভাব। বিষয়টা যত জরুরি হবে, ওনার ভূমিকাও হবে তত-দীর্ঘ। দীপক বোস আর থাকতে পারলেন না। বলে ফেললেন, 'স্যার কী হয়েছে? একটু সংক্ষেপে যদি —'

চশমার পিছন থেকে মহামান্য ডিরেক্টরের চোখ দুটি ভর্ৎসনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল দীপক বোসের দিকে। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ডিরেক্টর, 'সংক্ষেপেই বলছি। আমার বেশি কথার সময়

নেই। তুমি কী জান, গতকাল রাতে চার্বাকের সঙ্গে হিংটিং-এর কথাবার্তা হয়েছে?'

'আজ্ঞে না।' হতাশ ভাবে মাথা নাড়লেন দীপক বোস।

এখানকার অনেকেই ডিরেক্টরের ছাত্র। তাই তিনি তাঁদের তুমি করেই বলেন।

'কে চার্বাক? আর হিংটিং কে?' কম্পিউটার সেকশনের সুজাতা সোম আমতা আমতা করেন।

'জান না?' বেশ অবাক হলেন ডিরেক্টর, 'ও তুমি তো মাত্র ছমাস হল জয়েন করেছ।'

ডিরেক্টর সবার মুখের ওপর চোখ বোলালেন। তাঁর মনে হল কেউ কিছু মাথা মুন্ডু ধরতে পারছে না। — 'অলরাইট, তাহলে বুঝিয়েই বলি। ব্যাপারটা একটু গোপনেই হয়েছিল। তবু আমি আশা করেছিলাম, এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ এক্সপেরিমেন্টের বিষয় কারো কারো হয়তো জানা থাকবে।

'হ্যাঁ, তিন বছর আগে আমাদের ইনস্টিটিউটের ডক্টর সিংহা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটা এক্সপেরিমেন্টে হাত দেন। উদ্দেশ্য ছিল, যন্ত্রের যুক্তিতর্ক করার ক্ষমতা কতটা আছে পরীক্ষা করা।'

'মনে পড়েছে,' ইলেকট্রনিক মডেলিং ডিপার্টমেন্টের প্রধান, মোটা ফ্রেমের চশমা পরা — ডক্টর ব্যানার্জি উৎসাহিত কণ্ঠে জানালেন, 'দুটো অটোমেশন তৈরি হয়। স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটার যন্ত্র দুটি শব্দের সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারবে। তারা শব্দ গ্রহণ করতে পারবে। শব্দ দিয়ে তৈরি বাক্যের মানে ধরতে পারবে। এবং শব্দের সাহায্যে উত্তর দেবে। দুটি ফিলসফার মেশিন। বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলবে। তাই না? বানানোর সময় আমি মাঝে মাঝে ওখানে দেখতে গেছি, তবে নাম দুটো শুনে ঠিক মনে করতে পারছিলাম না —'

'নাম দুটো ডক্টর সিংহার দেওয়া', জানালেন ডিরেক্টর 'ডক্টর সিংহা ফিলসফি এবং লজিকের ভক্ত। তাই তিনি চেয়েছিলেন, দুই মেশিনের মধ্যে যুক্তি তর্কটা দর্শন এবং ন্যায়শাস্ত্র নিয়ে হোক। চার্বাকের মধ্যে দেওয়া হয়েছিল প্রাচীন ভারতের যত ফিলসফি এবং লজিকের জ্ঞান। আর হিংটিং-এর মধ্যে দেওয়া হয়েছিল আধুনিক পৃথিবীর ফিলসফি এবং লজিকের ধ্যান ধারণা।'

'স্যার চার্বাক নামটার মানে বুঝলাম। প্রাচীন ভারতের একজন বিখ্যাত দার্শনিক। কিন্তু হিংটিং কেন?' সুজাতা সোম অবাক হয়ে বলেন।

'জানি না', ডিরেক্টর বিরক্ত, 'বললাম তো নাম দুটো সিংহার দেওয়া, আমার নয়। যাকগে নামে কি এসে যায়? ফিলসফি এবং লজিকের কয়েকজন নাম করা প্রফেসর সিংহাকে এই প্রোগ্রামিংয়ে সাহায্য করেছিলেন। পাক্কা দু'বছর লেগেছিল মেশিন দুটো বানাতে।'

'কিন্তু এক্সপেরিমেন্টটা তো ফেল্ করেছিল।' ডক্টর ব্যানার্জি উৎসাহিত হয়ে জানালেন। তিনি বোঝাতে চান ওই গবেষণা সম্বন্ধে অনেক খবরই তিনি রাখেন।

'মোটেই না', ধমকে উঠলেন ডিরেক্টর, 'বলা উচিত এক্সপেরিমেন্ট কমপ্লিট হয়নি। আর সফল না হলেই বা কী? চেষ্টাটাই বড় কথা। হ্যাঁ, বছর খানেক আগে যন্ত্রদুটো বানানো শেষ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাত্র কয়েকবার কথাবার্তা বলেই দুই যন্ত্রই নীরব হয়ে যায়। এরপরেই ডক্টর সিংহা চলে যান বিদেশে। চার্বাক আর হিংটিংকে ঠিক ওই অবস্থাতেই রেখে দেওয়া হয়।'

'কোথায়?' সুজাতা সোম জানতে চাইলেন।

'একতলায় পুব দিকের কোণে একটা ঘরে। তালা-বন্ধ থাকত। দিন দশ আগে সিংহা আমায় জানান যে তিনি দেশে ফিরেছেন এবং এক্সপেরিমেন্টটা নিয়ে ফের একবার লাগতে চান। সিংহা এখন অন্য ইনস্টিটিউটে জয়েন করেছেন। তাই দিনের বেলা সময় পাবেন না। সন্ধের সময় কাজ করতে আসবেন। যে কোনো দিন কাজ শুরু করবেন।

'ডঃ সিংহার টেলিফোন পাওয়া মাত্র আমি ঠিক করি, আমাদের পিওন হারু ওই ঘরে ডিউটিতে থাকবে — বিকেল পাঁচটা থেকে রাত দশটা অবধি। কারণ বিলডিং-এর ওই অংশ বিকেল পাঁচটার পর একদম ফাঁকা হয়ে যায়। সিংহা এলে হারু দরকার মতো তাঁকে সাহায্য করতে পারবে। তিনি চলে গেলে দরজায় তালা দিয়ে ও নিজের কোয়ার্টার্সে চলে যাবে।'

একটু থেমে ডিরেক্টর ফের শুরু করেন, 'হুঁ, দু-দিন হল ডক্টর সিংহা কাজ আরম্ভ করেছেন। কাল রাত প্রায় নটার সময় সিংহা আমায় টেলিফোন করেন। এই ইনস্টিটিউট থেকে। ভীষণ উত্তেজিত ভাবে বলেন — 'এক্ষুণি চলে আসুন। একটা ব্যাপার হয়েছে।'

'কেন কেন?' সমবেত প্রশ্ন হয়।

'কারণটা ডক্টর সিংহা খোলসা করে কিছুতেই বললেন না ফোনে। কারণটা আমিও এখন বলব না। আপনারা নিজেরাই দেখেশুনে বুঝতে পারবেন।'

ডিরেকটর চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। গটগট করে হেঁটে এগোলেন। অন্যরা চললেন তাঁর পিছু পিছু।

একতলার কোণে একটা ঘরের সামনে থামলেন ডিরেক্টর। ঘরের দরজা বন্ধ। বোঝা যায় ভিতরে আলো জ্বলছে। দরজায় সজোরে টোকা দিলেন ডিরেকটর।

দরজা খুলল হারু। স্বয়ং ডিরেক্টর এবং এতজনকে এক সঙ্গে দেখে হারু বেশ থতমত খেল। নমস্কার করে তাড়াতাড়ি দরজার কবাট মেলে ধরল। ডিরেক্টর সদলবলে ঘরে ঢুকলেন। হারু বাইরে পালাল। ডিরেক্টর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ঠান্ডা এয়ারকন্ডিশনড ঘর। দুটো মেশিন হাত চারেক তফাতে মুখোমুখি বসানো। তাদের দেখতে খানিকটা রেফ্রিজারেটরের মতো। তবে তাঁদের গায়ে লাগানো অনেকগুলো বৈদ্যুতিক তার এবং কিছু অদ্ভুত দেখতে যন্ত্রপাতি। এছাড়া ঘরে রয়েছে একটা মস্ত স্টিলের আলমারি। গোটা তিন চেয়ার। একধারে একটা টেবিল। তার ওপর তেল কালি মাখা কিছু নাট বল্টু, লোহার পাত ইত্যাদি।

'কোনটা হিংটিং ছট?' সুজাতা সোম জানতে চাইলেন।

'হিংটিং ছট নয়, শুধু হিংটিং', শুধরে দিলেন ডিরেক্টর, 'ওই যে।' ডানদিকের মেশিনটাকে আঙুল তুলে দেখালেন তিনি।

'তাহলে ইনি হচ্ছেন চার্বাক।' সুজাতা সোম দ্বিতীয় যন্ত্রের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'এদের কিন্তু একটা করে মুন্ডু আর দুটো করে হাত বানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। বেশ দেখতে হত।'

'আর মিস্টার চার্বাকের মাথায় একখানা জট।' ডিরেক্টরের কান বাঁচিয়ে মন্তব্য ছাড়েন অভিজিৎ।

ডিরেক্টর দুই যন্ত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত তুললেন। সবাই চুপ করলেন। ডিরেক্টর বলতে শুরু করেন — 'ডঃ সিংহার ফোন পেয়ে তখুনি আমায় ছুটে আসতে হল এখানে। বোঝো ঠ্যালা। এসে দেখি ঘরের বাইরে বারান্দায় বেগে পায়চারি করছেন সিংহা আর দূরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হারু।

'সিংহা বললেন, মেশিন দুটো আজ চালু করে ফেলেছি। ওদের স্বরযন্ত্রে কিছু খুঁত ছিল। তারপরই এই কাণ্ড। চলুন ভিতরে? সত্যি ব্যাপার দেখে আমিও থ।'

ওঃ আবার সেই ধানাই পানাই। দীপক বোস অধৈর্য ভাবে বলে উঠলেন, 'স্যার ব্যাপারটা কী? একটু পরিষ্কার করে যদি' —

'নিজেরাই শুনে বোঝো।' ডিরেক্টর হাত বাড়িয়ে খট করে একটা সুইচ টিপলেন।

সেকেন্ড পাঁচেক মিহি চিঁইই শব্দ। তারপরই শোনা গেল যন্ত্রের কণ্ঠস্বর — ক্যানক্যানে, তীক্ষ্ণ।

সবাই স্তম্ভিত হয়ে শুনতে থাকে —

চার্বাক, 'এবার সুন্দরবাগানের ডিফেন্সকে সেরা বলা যায়। স্টপার সিং, রাও আর মজুমদার তিন জনেই টপ ফর্মে। লিংকম্যান জর্জের বয়স কিছু বেশি হলেও এখনও দারুণ। বিশেষত ভেজা মাঠে।'

হিংটিং, 'কিন্তু গোলকীপার? খেলার খবর লিখছে — গোলকিপারই সুন্দরবাগান ডিফেন্সের দুর্বলতম স্থান। এক নম্বর গোলকিপার গোস্বামী আহত। দ্বিতীয় গোলরক্ষক শিকদার বড্ড ছটফটে। বাজে ভুল করে। গত বছরের রেকর্ডই তার সাক্ষী। সেদিক থেকে মেডন-স্পোর্টিং-এর গোল প্রায় দুর্ভেদ্য বলা যায়। আর তার ফরোয়ার্ড লাইন সম্বন্ধে খেলাধুলা পত্রিকা বলেছে' — (বাকি কথাগুলো বোঝা গেল না। এত হড়বড়িয়ে বলল।)

চার্বাক, 'ফরোয়ার্ড সুন্দরবাগানেরও চমৎকার। মাঠ ময়দান পত্রিকার মতে — সুন্দরবাগানের ফরোয়ার্ডরা সবাই তরুণ। প্রচুর দম রাখে। এবং কুশলী। বয়স্ক নামী খেলোয়াড়দের চেয়ে এদের ওপর ঢের বেশি ভরসা।'

হিংটিং, 'খেলার খবর লিখেছে, ওদের একস্‌পিরিয়েন্স নেই। বড় খেলায় নার্ভ রাখতে পারবে না।'

চার্বাক, 'ভুল খবর। সুন্দরবাগানের কোচের মতে —'

দুই মেশিন চিৎকার করে চলল। একজন থামলেই অন্য জন শুরু করে। দুজনেরই স্বর প্রায় একরকম। কার গলা দিয়ে যে কখন আওয়াজ বেরুচ্ছে চট করে বোঝা যায় না। আবার এত তাড়াতাড়ি কথা হচ্ছে যে টুকরো টুকরো ভাবে বোঝা গেলেও তাদের অনেক কথাই ধরা যাচ্ছিল না।'

সুজাতা সোম দুহাতে কান চেপে আর্তনাদ করে উঠলেন, 'স্যার বন্ধ করুন। বন্ধ করুন। প্লিজ উঃ।'

খট্। ডিরেক্টর সুইচ অফ্ করলেন।

খানিকক্ষণ কেউ কোনও কথা বলতে পারল না কান মাথা ভোঁ ভোঁ করছে।

'স্যার, এ-ত মনে হচ্ছে ফুটবল, ওরা ফুটবল নিয়ে তর্ক করছে, 'দীপক বোস বসলেন।

'হ্যাঁ তাই', জবাব দিলেন ডিরেকটর।

'বাপরে কী আওয়াজ। কানে তালা লেগে যায়।'

'মাত্র দেড় মিনিটেই তোমাদের এই অবস্থা। আর কাল আমায় আধঘণ্টা ধরে এই যন্ত্রণা সইতে হয়েছে। মানে শুনিয়ে ছেড়েছেন ডক্টর সিংহা।' ক্ষুব্ধ ডিরেক্টর জানালেন।

'মনে হল চার্বাক সুন্দরবাগানের আর হিংটিং মেডন স্পোর্টিংয়ের সাপোর্টার', বললেন দীপক।

'করেক্ট', ডিরেক্টর মাথা নাড়েন, 'আরও মন দিয়ে শুনলে বুঝতে ওদের তর্কের বিষয় হচ্ছে — এ বছর কলকাতায় ফার্স্ট-ডিভিশন ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়ন হবে কোন টিম। চার্বাকের মতে সুন্দরবাগান। আর হিংটিং বলছে মেডন স্পোর্টিং। দুই মেশিনই প্রাণপণে যুক্তি দেখাচ্ছে। দু-টিমের প্লেয়ারদের নাম, তাদের সম্বন্ধে নানা পত্রপত্রিকায় মতামত হুড়হুড় করে বলে যাচ্ছে। খানিকটা তো নমুনা শুনলে। আমার যে কাল কী হাল হয়েছিল।'

'কী করে এমন হল?' ভারি অবাক হলেন সুজাতা সোম।

'নিশ্চয়ই কেউ ওদের ফুটবলের বিষয়ে খবর জুগিয়েছে', অভিজিৎ দত্তর মন্তব্য।

'ঠিক বলেছ', বললেন ডিরেক্টর।

'মেশিন তর্ক করছে, তাহলে তো এক্সপেরিমেন্ট সাকসেস্‌ফুল,' সুজাতা সোম উৎফুল্ল, 'ডক্টর সিংহা তবে অত ঘাবড়েছিলেন কেন?'

'কারণ ডক্টর সিংহা হলফ করে বললেন যে তিনি বা তাঁর পরিচিত কেউ ফুটবল নিয়ে কোনও প্রোগ্রামিং মেশিনকে দেননি। তবে কে? সেই রহস্যটাই উদ্ধার করতে পারছি না —'

একটু চুপ করে থেকে ডিরেক্টর বললেন, 'ডক্টর সিংহা খুব চটেছেন। তাঁর ধারণা আমাদের ইনস্টিটিউটের কেউ এই কর্মটি করেছে, লুকিয়ে ওঁর পিছনে লাগার মতলবে।'

খুক খুক করে হেসে ওঠেন সুজাতা হোম। ডিরেক্টর ভুরু কুঁচকে তাকাতেই মুখে আঁচল চাপা দিলেন।

'আচ্ছা ডক্টর ব্যানার্জি', বললেন ডিরেক্টর, 'আপনি তো মাঝে মাঝে এখানে আসতেন?'

'না, না। আমি ফুটবলের কিছু জানি না।' ব্যস্ত হয়ে জানালেন ডঃ ব্যানার্জি।

'জানি। জানি। আমি বলতে চাইছি, আপনি কিছু লক্ষ করেছিলেন কি? কাউকে সন্দেহ? ডক্টর সিংহার সঙ্গে কারোর কোনো গোলমাল?'

'ডক্টর সিংহার সঙ্গে? নাঃ সেরকম কিছু...কই?' ডঃ ব্যানার্জি ভেবে পান না, 'তবে প্রফেসরদের মধ্যে কখনো কখনো বেশ তর্ক হত।'

'হুঁ, তা আমিও দেখেছি। একদিন প্রফেসর রাও আর চট্টরাজের মধ্যে খুব লেগে গিয়েছিল। লজিকের কী একটা প্রবলেমের উত্তর নিয়ে। হিংটিংকে প্রোগ্রাম দেওয়ার সময়। ডক্টর সিংহা রাওকে সাপোর্ট করলেন। তাতে চট্টরাজ রেগেমেগে চলে গেলেন। কিন্তু নাঃ, চট্টরাজ খেলাটেলার খবর রাখেন না। আমি চিনি ওনাকে। আচ্ছা আমাদের ইনস্টিটিউটের কারো সঙ্গে ডক্টর সিংহার কি কখনো —?'

ডক্টর ব্যানার্জি ঢোক গিলে বললেন, 'ইলেকট্রনিকস্-এর রামচন্দ্রনের সঙ্গে ডক্টর সিংহার একদিন একটু খিটিমিটি লেগেছিল। মেশিনের একটা ডিজাইন নিয়ে' —

'রামচন্দন? উঁহু। ও বাংলা পড়তেই পারে না। বাংলা খেলার পত্রিকা থেকে খবর জোগাবে কি করে? মুশকিল হল। ওইটা যে কার কীর্তি!'

ডিরেকটর প্রশ্নটা ছুড়ে দেন শ্রোতাদের। তারা মাথা চুলকোয়। এ ওর মুখের দিকে তাকায়। উত্তর মেলে না।

পিছনে একটা গুঞ্জন ওঠে। ডিরেকটর বললেন, 'স্পিক আউট। কিছু বলার থাকলে বলে ফেল। লিভ নো স্টোন আনটার্নড। সিংহা তো আমাদের সকলের ওপরে বিশ্রী কটাক্ষপাত করে গেলেন। লোকটির বড় দম্ভ। হতে পারে ব্রিলিয়ান্ট। ওর অনেক শত্তুর। আউট অফ ম্যালিস' —

দীপক ফিসফিস করে অভিজিৎকে বললেন, 'ওঁকেও বাদ দেওয়া যায় না। প্রফেশনাল জেলাসি —'

সুজাতা মুখ খুললেন, 'তা এ ঘরে যে কেউ ঢুকতে পারে। ওই তালা অনেক চাবি দিয়েই খোলা যায়। উফ্ মেশিন দুটো কী চেঁচায়! অসহ্য। আবার থেকে থেকে দুটোই বলে — ঘোড়ার ডিম। আহা কী ভাষার ছিরি!'

সদ্য পাশ করা এঞ্জিনিয়ার তপন রায় চমকে উঠলেন 'অ্যাঁ কী বললেন? স্যার মেশিনের ইলেকট্রনিক ইয়ার তো সব সময়ই কাজ করছিল?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়। কিন্তু তাতে কী?' বললেন ডিরেক্টর।

তপন রায় বললেন, 'স্যার হারু খুব জোরে জোরে রিডিং পড়ে, আমি শুনেছি। আর ও কেবল বলে — ঘোড়ার ডিম। মানে একটা মুদ্রাদোষ!'

অমনি অনেকে সমস্বরে বলে উঠলেন, 'হারু! হারু'!

ডিরেক্টর খানিকক্ষণ হতভম্ব, তারপর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনিও হাঁক পাড়লেন — 'হারু! হারু!' হুড়-মুড় করে হারু ঘরে ঢুকল।

'আচ্ছা হারু তুমি এই ঘরে বসে কিছু পড়তে?' বললেন ডিরেক্টর।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একা একা বসে থাকতাম...'

'কী পড়তে? খেলার পত্রিকা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সব ফুটবলের লেখাগুলো বুঝি?'

ভয়ে ভয়ে ঘাড় নেড়ে হারু সম্মতি জানায়।

'ঠিক আছে তুমি যাও।'

হারুকে বিদায় দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন ডিরেক্টর — 'যাক বাবা এতক্ষণে বোঝা গেল।'

কম্পিউটারে সেকশনের আলি সাহেব কানে কিঞ্চিৎ খাটো এবং পিছনে ছিলেন। তিনি শেষের ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারেননি। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, — 'হারু কী করেছে?'

'বুঝলে না', ডিরেক্টর গলা চড়ান, 'হারু মহানন্দে একলা ঘরে মেশিনের কাছে বসে আট-দশ দিন ধরে কলকাতার ফুটবল সম্পর্কে জ্ঞানচর্চা করেছে। জোরে জোরে গুচ্ছের খেলার পত্রিকা পড়ে। মেশিনগুলোর স্বরনিক্ষেপ যন্ত্র কাজ করছিল না বটে। কিন্তু তাদের ইলেকট্রনিক-ইয়ারে কোনো গন্ডগোল হয়নি। চার্বাক আর হিংটিং কান খাড়া করে অর্থাৎ তাদের শব্দ গ্রাহক মাইক্রোফোনের সাহায্যে কলকাতার ফুটবল সম্বন্ধে গাদা গাদা তথ্য গ্রহণ করেছে। এবং তার

ফলেই এই কাণ্ড। এই অদ্ভুত তর্কযুদ্ধ —'

হাসির অট্টরোলে ডিরেক্টরের গলা ডুবে যায়।

হাসি একটু কমতেই দীপক বোস উত্তেজিত ভাবে বললেন, 'স্যার আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। ফিলসফি নিয়ে না পারুক মেশিনরা নিজে থেকে মানুষের মতো ফুটবল নিয়ে তর্ক করছে — এতে কি প্রমাণ হয় না মেশিন মানুষের মতো ভাবনা চিন্তা করতে পারে? অন্তত প্রায় মানুষের মতো বলা যায়।'

'ও তোমার বুঝি তাই মনে হচ্ছে? কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার তা মনে হয় না', ডিরেক্টর মুঠো পাকিয়ে দৃঢ়স্বরে বললেন, 'কারণ এবারের খেলা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা ভাবনা করার ক্ষমতা থাকলে, যে কেউ বলবে, সুন্দরবাগান বা মেডনস্পোর্টিং নয়, এই বছর ফুটবল লিগ জিতবে ইয়াংবেংগল! খেলা দেখতে মাঠে গেলে তুমিও তাই বলতে।'

[১৯৮১ সন্দেশ শারদীয়া]

ঘেঁচুমামার কল্পতরু

ঘেঁচুমামার চিঠিটা পেয়ে নাড়ু বেশ ঘাবড়ে গেল। ঘেঁচুমামা লিখেছেন—

'স্নেহের নাড়ু,

কেমন আছিস? ভালোভাবে বি. এ. পাশ করেছিস জেনে খুশি হলাম। ডিসেম্বরে বড়দিনের ছুটিতে কলকাতায় আড্ডা না দিয়ে বরং এখানে কদিন ঘুরে যা। এ যুগের এক আশ্চর্যতম আবিষ্কারকে স্বচক্ষে দেখতে চাস তো দেরি না করে চলে আয়।

ইতি তোর
ঘেঁচুমামা

পু: এখানে মুরগি বেজায় সস্তা।

ঘেঁচুমামা হচ্ছেন নাড়ুর ছোটমামা। ঘোর বদরাগী ও খামখেয়ালি ঘেঁচুমামাকে আত্মীয়স্বজন যথাসাধ্য এড়িয়ে চলে। ঘেঁচুমামার এই খাপছাড়া স্বভাবের জন্য দায়ী তার একটি নেশা—গবেষণা।

ঘেঁচুমামা উদ্ভিদবিজ্ঞানী। তাঁর কলকাতার বাড়ির একফালি জমিতে ও টবে তিনি নানান ফুলফলের গাছ লাগাতেন। নিত্য নতুন গবেষণা চালাতেন।

বাড়িতে লোকজন বেড়াতে আসা তিনি মোটে পছন্দ করতেন না। সঙ্গে ছোট ছেলে-মেয়ে আনা তো রীতিমতো নিষিদ্ধ ছিল। তারা নাকি ঘেঁচুমামার রিসার্চ স্টেশনে (অর্থাৎ বাগানে) ঢুকে পড়ত। ফুল-ফল ছিঁড়ত। এরপর মাথা ঠান্ডা রেখে ভদ্রতা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত।

এই গাছপালা নিয়ে রিসার্চের নেশা তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। নাড়ু শুনেছে, মাত্র বারো বছর বয়সে গ্রামের বাড়িতে বুনো মানকচুর কুটকুটুনি দূর করা নিয়ে ঘেঁচুমামা একটা এক্সপেরিমেন্ট করেন। সেই কচুর একটা বন্ধু মেধোকে দেন। বলেন, একদম কুটকুটে নয়, খেয়ে দেখিস। ওই কচু ভাতে খেয়ে মেধোর বাড়ির সবার গলা ধরে একাক্কার। ঘেঁচুমামার বাবার কাছে নালিশ করা হয়। পিটুনি খাওয়ার ভয়ে ঘেঁচুমামা পালিয়ে গিয়ে হাওড়ায় তাঁর মাসির বাড়িতে সাতদিন লুকিয়ে ছিলেন। তখনই মেধোর পিসিমা খেপে গিয়ে তাঁর নামকরণ করেন—বেচু পালটে ঘেঁচু; অতঃপর তাঁর এই ডাকনামটাই চালু হয়ে গেল।

ঘেঁচুমামার মাথা ছিল খুব সাফ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলো ভালোভাবে উতরে গিয়ে

তিনি কলকাতার একটা কলেজে অধ্যাপনা নিলেন। তবে গবেষণার নেশা কমল না, বরং বেড়েই চলল।

একবার তিনি কালীঘাটে নাডুদের বাড়িতে পাঁচ-ছটা কাঁচালঙ্কা পাঠান। সঙ্গে চিরকুটে লেখেন—সাবধান। লঙ্কাগুলো সাধারণ লঙ্কা থেকে একশো গুণ বেশি ঝাল। তাই পড়ে নাডুর বাড়ির সবাই খুব হাসাহাসি করল। তার থেকে মাত্র একটি লঙ্কা মাছের ঝোলে পড়েছিল। ব্যস, সেই ঝোলমাখা ভাত এক গরাসের বেশি কেউ মুখে তুলতে পারেনি। বাপ রে, কী আগুন ঝাল!

'উদ্ভিদ সমাচার'-এ ঘেঁচুমামা মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখতেন। সেইসব নিতান্ত মৌলিক গবেষণামূলক রচনার আবির্ভাবে বিজ্ঞানীমহলে দারুণ হইচই পড়ে যেত। বিদ্রূপ সমালোচনাই হত বেশি। ঠাট্টা-বিদ্রুপ কানে আসত। শেষটায় ঘেঁচুমামা সকলের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় তুলেই দিয়েছিলেন। প্রবন্ধও আর লিখতেন না। এর কিছুদিন বাদে তিনি কলেজ ছাড়লেন। তারপর কলকাতাও।

কলেজে একঘেয়ে পাঠ্যপুস্তক পড়ানো। ঘেঁচুমামার নিতান্ত অপছন্দ ছিল। বরং তিনি ছাত্রদের উদ্ভিদবিজ্ঞানের নানা জটিল রহস্যের সুলুকসন্ধান দিয়ে তাদের মনে জ্ঞানপিপাসা জাগাবার চেষ্টা করতেন। ফলে পরীক্ষার কোর্স শেষ হত না এবং ফি বছরই এই নিয়ে অভিযোগ উঠত। তাছাড়া সহকর্মীদের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে অষ্টপ্রহর তর্কযুদ্ধ লেগেই থাকত। বিরক্ত হয়ে ঘেঁচুমামা কলেজের কাজে ইস্তফা দিয়ে পুরোপরি গবেষণায় মন দিলেন।

কিন্তু কলকাতায় থেকে শান্তিতে গবেষণা করা তাঁর বেশিদিন পোষাল না। কারণ পাড়ার লোকের সঙ্গে বেজায় খটাখটি লেগে গেল।

ঘেঁচুমামা তাঁর গাছপালার স্বাস্থ্যবিধির খাতিরে সকাল-সন্ধ্যা তাদের রাগ-রাগিণী শোনাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাগানে গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজত। দৈনিক ভোরে ও সন্ধ্যায় কটা একই রেকর্ড শুনতে শুনতে পাশের বাড়ির লোকদের কান তো ঝালাপালা। এদিকে প্রতিবেশী-বাড়িতে দুপুরবেলা রেডিওতে সজোরে আধুনিক বা ফিল্মি গান চালানো বরদাস্ত করতে পারতেন না ঘেঁচুমামা। ওতে নাকি তাঁর গাছেরা চমকে যায়। তাদের শান্তি নষ্ট হয়। ফলে ঝগড়া বাধল এবং ঘেঁচুমামার বাগানে অদৃশ্য হস্তে ইট-পাটকেল, ডিমের খোলা, তরকারির খোসা ইত্যাদি নিক্ষিপ্ত হতে থাকল।

তখন 'দুত্তোর' বলে ঘেঁচুমামা কলকাতা ছাড়লেন। বিহারের দুমকায় নিরিবিলিতে অনেকখানি জায়গা-ঘেরা একটা বাড়ি নিয়ে শহরের বিষাক্ত পরিবেশ থেকে দূরে তিনি নিশ্চিন্তে গবেষণায় মন দিলেন।

এসব হল বছর পাঁচেক আগেকার কথা। এরপর ঘেঁচুমামার খবর পাওয়া যেত কদাচিৎ। তবে মাঝে-মধ্যে তিনি নাডুকে এক-আধটা উটকো চিঠি ছাড়তেন। চিরকালই তিনি ভাগনে নাডুকে কিঞ্চিৎ লাই দিয়ে এসেছেন। বোধকরি নাডু তাঁর যুগান্তকারী বক্তব্যগুলো ধৈর্য ধরে শুনত বলে। নাডু কিছু বুঝত না ছাই। স্রেফ কিছু প্রাপ্তির আশায় ঘণ্টাখানেক কষ্ট করে চোখ বড় বড় করে শোনা এবং তালমাফিক মাথা নেড়ে সায় দেওয়ার পরে মামার কাছে ফুচকা আলুকাবলি মায় সিনেমার পয়সার জন্য আবেদন করলেও মঞ্জুর হয়ে যেত।

আপাতত চিঠিটা পেয়ে কী করা যায় ভাবতে থাকে নাড়ু। যাওয়াই যাক। নাড়ু মাকে ধরল। চিঠির কথাটা গেল চেপে। বলল, 'ঘেঁচুমামার কাছ থেকে কদিন ঘুরে আসি। অনেকদিন দেখিনি। দুমকা জায়গাটা শুনেছি খাসা।'

মা নাড়ুর বাবাকে বলে অনুমতি আদায় করে দিলেন।

নাড়ুকে দেখে ঘেঁচুমামা খুশি হয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'এলি তাহলে। বেশ বেশ। এখন খা দা, ফুর্তি কর।'

চারটে দিন কাটল। ঘেঁচুমামার সংসারে মাত্র দুটি প্রাণী। ঘেঁচুমামা এবং তাঁর পুরোনো কাজের লোক গঙ্গারাম। ঘেঁচুমামা দিব্যি গল্পগুজব করেন। নাড়ুকে নিয়ে বেড়িয়ে এলেন পাহাড়ে, মাঠে, নদীর ধারে। কিন্তু সেই আশ্চর্যতম আবিষ্কারের কথাটা আর তোলেন না। নাড়ু ছটফট করছে। শেষে বলেই ফেলল, 'মামা, তোমার সেই আবিষ্কারটা?'

—'হবে হবে। তাড়া কীসের? আচ্ছা বেশ কাল দেখাব,' বললেন ঘেঁচুমামা। পরের দিন বিকেলে চা খেতে খেতে ঘেঁচুমামা রহস্যময় আলাপ শুরু করলেন। 'আচ্ছা নাড়ু, তোর নিশ্চয় বাগান করতে ভালো লাগে?'

কোনোদিন বাগান করার উৎসাহ না হলেও মামাকে খুশি করতে নাড়ু তক্ষুনি সায় দিল, 'হ্যাঁ লাগে।'

—'তোদের বাড়িতে তো একটুখানি জমি। বেশি গাছ লাগাবার উপায় নেই।'

—'হুঁ।'

—'সত্যি ভারি মুশকিল।'

—'কলকাতা শহরে কটা বাড়িতে আর অনেক গাছ লাগাবার জায়গা আছে?' ঘেঁচুমামার ভাবনার মানে বোঝে না নাড়ু।

—'আচ্ছা, তোর আম খেতে ভালো লাগে?' জানতে চাইলেন ঘেঁচুমামা।

—'ভীষণ।' নানুর তৎক্ষণাৎ জবাব।

—'কিন্তু এখন আমি পাবি কোথায়? কোল্ড-স্টোরোজে রাখা বাসি আম নয়। টাটকা, ফ্রেশ। চাইলেও পাবি না।' হতাশভাবে মাথা নাড়েন ঘেঁচুমামা।

নাড়ু বলল, 'তা চাইব কেন? এখন বুঝি আমের সময়? ও তো গ্রীষ্মের ফল।'

—'অর্থাৎ তোকে সেই গ্রীষ্মকাল অবধি হাপিতোশ করে বসে থাকতে হবে। কী সব বেআক্কেলে বন্দোবস্ত বল দেখি?'

নাড়ু বলল, 'বাঃ, তাই তো নিয়ম।'

—'নিয়মটা পাল্টাতে হবে,' ঘেঁচুমামা দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করলেন, 'শোনা যায় পুরাকালে মুনি-ঋষিরা তপস্যার বলে কল্পতরু নামে একরকম গাছ তৈরি করতেন। সেই গাছের কাছে যখন যা প্রার্থনা করা যেত তখনই নাকি তাই পাওয়া যেত। তা কলিযুগে সেরকম তপস্যার জোর আর নেই। কল্পতরুও তাই আর মেলে না। তবে হ্যাঁ, এখন হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের কিছুটা ইচ্ছাপূরণ করা চলে। আর এই বিজ্ঞান সাধনার হিম্মতেই আধুনিক যুগ লাভ করবে ব্যাচারাম চাটুজ্যের আশ্চর্যতম আবিষ্কার— কলির কল্পতরু দ্য ওয়ান্ডার।'

—'সে আবার কী?' নাড়ুর প্রশ্ন।

—'আয় আমার সঙ্গে।' উঠলেন ঘেঁচুমামা।

ঘেঁচুমামা নাড়ুকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে ঢুকলেন। প্রায় বিঘে দুই জমিতে নানা ফল-ফুলের গাছ। উঁচু পাঁচিল ঘেরা। এই এলাকায় ঘোরা ঘেঁচুমামার অপছন্দ জেনে এতদিন বাগানে পা দেয়নি নাড়ু।

বাগানের একধারে অনেকটা জায়গা তারের জাল দিয়ে ঘেরা। ভিতরে পাশাপাশি তিনটে গাছ। তারে ঘেরা অংশটায় ঢোকার জন্য কাঠের ফ্রেমে জাল আটকানো দরজা। দরজায় তালা দেওয়া। চাবি দিয়ে তালা খুলে ঘেঁচুমামা ভিতরে ঢুকলেন—পিছনে পিছনে নাড়ু।

থামলেন ঘেঁচুমামা। গাছ-তিনটের দিকে আঙুল দেখিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'এই। এই এরা হচ্ছে কল্পতরু। এদের কাছে কড়া পাকের সন্দেশ বা টেস্ট-ক্রিকেটের সিজন টিকিট আবদার করলে অবিশ্যি পাবি না। তবে ইচ্ছেমতো নানান ফল যখন-তখন খেতে পাবি। দেখ। ভালো করে দেখ—'

দেখতে দেখতে নাড়ু থ। এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। এগুলো আবার কী গাছ? একটা গাছেই এক-একটা ডাল এক-একরকম। তাতে আলাদা রকম পাতা—ফল।

প্রথম গাছটা প্রায় দেড়মানুষ উঁচু। তাতে ফলছে হরেক রকম লেবু। কোনো ডালে কমলা। কোনোটায় বাতাবি। কোনোটায় মোসাম্বি। কোনো ডালে বা পাতিলেবু।

পরের গাছটা অনেক বেঁটে। তাতে ফলেছে টমাটো। নানা জাতের লঙ্কা। আবার কয়েকটা বেগুনও ঝুলছে।

তৃতীয় গাছটা প্রথম গাছটা থেকে উঁচু। সেটার গুড়ি থেকে বেরিয়েছে আম, আমড়া এবং কী এক অচেনা গাছের ডাল। ফল ধরেছে ডালে ডালে।

নাড়ুর মাথাটা কেমন ঘুরে গেল।

ঘেঁচুমামা বললেন, 'ঘাবড়ে গেছিস? লজ্জা কী? আমার কল্পতরু প্রথমে দেখলে অনেক বীরপুরুষেরই চক্কর লাগবে।'

'কী করে বানালেন।' নাড়ু গোল গোল চোখ করে জানতে চাইল।

'প্লাস্টিক সার্জারির কায়দা,' বললেন ঘেঁচুমামা, 'নানান গাছের দেহ-কোষ জোড়া দিয়ে তৈরি হয়েছে এক-একটা যৌগিক বৃক্ষ—মানে এই কল্পতরু। ব্যাপারটা জটিল। এত চট করে তোর মাথায় ঢুকবে না। তাছাড়া যাকে-তাকে বলে ফেলবি। এখনি সব ফাঁস হয়ে যাবে। আগে পেটেন্ট নিই। তারপর এই বিষয়ে একখানা বই লিখব সোজা ভাষায়। তখন পড়ে নিস। মোটকথা এখন থেকে আর আলাদা আলাদা গাছ লাগাবার ঝামেলা থাকবে না। প্রত্যেকটি গাছের জন্যে আলাদা আলাদা জমি, আলাদা তদবিরের দরকার নেই। বি. আর. চাটুজ্যের ফর্মুলা—১০১ অ্যাপ্লাই করে যে যার পছন্দমতো হরেক রকম ফল একই গাছে ফলাতে পারবি। জমি বাঁচবে। সময় বাঁচবে। তাছাড়া ফলনের সময়গুলোও ইচ্ছেমতো পালটে দেব। গ্রীষ্মে আম তো এমনিই পাই। তখন বাজার থেকে আম কিনে খাওয়া যায়। আমার কল্পতরু ফলাবে শীতকালে আম। ওই দেখ।'

তৃতীয় গাছটার দিকে আঙুল দেখালেন ঘেঁচুমামা। 'আর এই লেবুগাছটা দেখছিস? সব

শীতে ফলবে। কমলা না হয় শীতের ফল। মোসাম্বি, বাতাবি শীতে ফলাতে পারবি? আর-একটা কল্পতরু লাগিয়েছি, সব কটা লেবু গ্রীষ্মে ফলবে। তখন গরমকালে কমলা পাবি এক্কেবারে টাটকা গাছপাকা। আবার কিছু-কিছু ফল বারবার খেতে পাবি। সাধারণত বছরে হয়তো একবার ফলে আমার কল্পতরুতে ফলবে বছরে দুবার, তিনবার।

'তা বলে কি বাপু একই গাছে যা ইচ্ছে একসঙ্গে চাইলে পাবি? তা হয় না। মোটামুটি মিল আছে এমন সব গাছের মিশ্রণে এক-একটা কল্পতরু তৈরি সম্ভব। এই যেমন আপাতত তিনটে বানিয়েছি। কল্পতরু নাম্বার—ওয়ান, টু অ্যান্ড থ্রি। আরও কত কল্পতরু আবিষ্কার হবে। শুধু ফলের নয়, ফুলের, সবজির। যে-সব উদ্ভিদের মধ্যে এখনও মিশ খাওয়াতে পারিনি, পরে হয়তো পারব। আমি না পারলে তুই পারবি।'

—'আমি!' নাড়ু আঁতকে ওঠে।

—'হ্যাঁ। মানে তুই না হলেও অন্য কেউ। মানে যারা এই লাইনে রিসার্চ করবে আর আমাকে গুরুদেব বলে পেন্নাম ঠুকবে। হুঁ, এইবার দেখিয়ে দেব উদ্ভিদবিজ্ঞানের রথী-মহারথীদের ব্যাচারাম চাটুজ্যের দৌড় কদ্দুর। বুঝলি?'

ফুর্তির চোটে নাড়ুর কাঁধে ফটাস করে এক চাপড় কষিয়ে ঘেঁচুমামা বললেন, 'চ, এখন একটু বেড়িয়ে আসি। তাহলে রাতে খিদেটা বেশ চাগবে।'

রাতে খেতে বসে ঘেঁচুমামা দুহাত ছড়িয়ে ঘোষণা করলেন, নাড়ু, আজ তোর জীবনে এক মহৎ দিন। জেনে রাখ, তুই হচ্ছিস প্রথম মানব যে আমার কল্পতরু ফল টেস্ট করার সৌভাগ্য অর্জন করবে। এ গ্রেট গ্রেট অনার। তোর নাম ইতিহাসে লেখা হয়ে থাকবে। গঙ্গারাম—'

অমনি গঙ্গারাম খাবার টেবিলে এনে সাজিয়ে রাখতে লাগল, রুটি মাংস টমাটো-স্যালাড, পুডিং এবং অনেক রকম ফল।

নাড়ু একখানা মুরগির ঠ্যাং তুলে কামড় দিতেই ঘেঁচুমামা বাধা দিলেন, ও-সব তো রোজই গিলছিস, আগে স্যালাড খা। টমাটোটা চাখ। কল্পতরু প্রোডাক্ট।'

টমাটো খেতে নাড়ুর ভালো লাগে না তাই এড়িয়ে যাচ্ছিল। নেহাত মামার কথায় বাধ্য হয়ে এক টুকরো মুখে পুরেই সে আর্তনাদ করে উঠল।

—'কী হল?' ঘেঁচুমামা ব্যস্ত হয়ে বললেন।

—'উরিব্বাস, কী ঝাল!'

— 'ঝাল!' ঘেঁচুমামা অবাক। 'গঙ্গারাম কী ব্যাপার! স্যালাডে এত ঝাল কেন?'

— 'আমি তো বাবু মাত্তর আধখানা লঙ্কা কুঁচিয়ে দিইচি। ঝাল হবে কেন?' গঙ্গারাম ভেবে পায় না।

— 'মামা, এ নিশ্চয়ই তোমার সেই স্পেশাল ব্র্যান্ড। সেই একশো গুণ ঝাল লঙ্কা,' নাড়ু বাতলায়।

— 'না না, সে লঙ্কা দিই নাই। সে লঙ্কা আলাদা করা আছে।' গঙ্গারাম প্রতিবাদ জানায়।

'নিশ্চয়ই ভুল করে মিশিয়ে দিয়েছে', ঘেঁচুমামা হুংকার ছাড়েন, 'দিন-দিন তোমার ভীমরতি হচ্ছে। ঠিক আছে নাড়ু, তুই বরং আমটা টেস্ট কর। মিষ্টি আম। জিভের জ্বলুনি কমবে।'

এক চাকলা আম মুখে দিয়েই নাড়ু মুখ ভেটকাল — 'এঃ, কী বিশ্রী খেতে।'

— 'সে কী! ভালো জাতের ল্যাংড়া।'

ঘেঁচুমামা নিজে এক চাকলা আম তুলে কামড় দিয়ে নাড়ুর মতোই মুখ করলেন।

— 'কেমন যেন আমড়ার টেস্ট, তাই না?'

— 'এ কোথাকার ল্যাংড়া?' বলল নাড়ু।

— 'আমড়া?' হুম।' ঘেঁচুমামা গম্ভীর।

কিছু ছাড়ানো কমলালেবু ছিল প্লেটে। তাই থেকে এক কোয়া মুখে ফেলেই থু-থু করে উঠল নাড়ু। — 'ইশ, কী টক!'

— 'টক!'

— 'হ্যাঁ, যেন পাতিলেবুর মতন।'

— 'দেখি।' ঘেঁচুমামা নিজে এক কোয়া কমলা খেয়েই থু করে ফেলে দিলেন। বললেন, 'এই কমলা তো টক হওয়ার নয়। আমার বাগানে আগেও ফলিয়েছি। চমৎকার মিষ্টি। কী ব্যাপার?' ঘেঁচুমামা থই পান না।

নাড়ুর মাথায় একটা আইডিয়া এল। সে এক টুকরো পাতিলেবু তুলে চুষে বলল, 'বাঃ, এতে যে কমলালেবুর টেস্ট।' তারপর সে একটা কাঁচালঙ্কা তুলে সাবধানে দাঁতে কেটে বলল, 'এ কেমন টমাটোর মতো। দেখো খেয়ে।'

ঘেঁচুমামা লেবু ও লঙ্কা চোখ মাথা ঝাঁকালেন। 'হুঁ ঠিক।'

— 'আমার কী মনে হচ্ছে জানো?' বলল নাড়ু।

— 'কী?'

— 'মানে, স্বাদগুলো বোধহয় ওলটপালট হয়ে গেছে।'

— 'হুঁ, তাই। কিন্তু আমার এতদিনকার সাধনা? ওঃ সব গেল। ভেবেছিলাম কালই চিঠি ছাড়ব। ডেকে পাঠাব কয়েকজন সায়ান্টিস্ট আর কাগজের রিপোর্টারকে। দেখাব আমার আবিষ্কার। তাদের টেস্ট করাব আমার কল্পতরু প্রোডাক্ট। সব যে গুবলেট হয়ে গেল। ওফ!'

— 'তাতে কী, এও তো দারুণ আবিষ্কার। নতুন রকম টেস্ট। বলা যায় নতুন ফল আবিষ্কার।' নাড়ু সান্ত্বনা দেয়।

— 'না না, ওসব নতুন ফতুন বোঝে না লোকে। সবাই তো আর তোর মতন নয়। জানিস, একবার একটা নতুন সবজি বানিয়েছিলাম। আলু আর বেগুন মিশিয়ে। ভাবলাম, লোকে আলু-বেগুন ভাতে খেতে ভালোবাসে। তা এই একটাতেই কাজ চলবে। কষ্ট করে আর আলাদা আলাদা সেদ্ধ করে মাখতে হবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চলল না। আমার আলুবেগুন কোনো বেটার মুখে রুচল না। গঙ্গারামটা অবধি রিফিউজ করল। নাঃ, আবার আমায় নতুন করে ভাবতে হবে। রিসার্চ করতে হবে! স্বাদগুলো যেন ঠিকঠাক থাকে।'

ঘেঁচুমামা হাঁড়িপানা মুখ করে উঠে গেলেন।

এরপর ঘেঁচুমামার ওখানে আর জমল না। ঘেঁচুমামার গল্পগুজব বন্ধ। সারাদিন তিনি ল্যাবরেটরিতে বা বাগানে কাটান। নিজের মনে পায়চারি করেন। বিড়বিড় করে বকেন। খাবার টেবিলে একসঙ্গে বসলেও আনমনা। দুদিন একা-একা এদিক-সেদিক ঘুরে কাটিয়ে নাড়ু বাড়ি ফিরে গেল।

প্রায় আড়াই বছর বাদে ঘেঁচুমামার চিঠি পেল নাড়ু। লিখেছেন — 'তোর সব কটা চিঠিই পেয়েছি। উত্তর দেওয়ার সময় পাইনি। এক্সপেরিমেন্ট চলছে। দুটো নতুন কল্পতরু লাগিয়েছি। তাদের প্রথম ফলনটায় সামান্য গন্ডগোল হয়ে গেছে। কমলার টেস্ট বাতাবিলেবুর মতো আর টমাটোগুলো কেমন বেগুন-বেগুন খেতে হয়েছিল। কিন্তু এবার লঙ্কাগুলোয় এক্কেবারে খাঁটি লঙ্কার ঝাল। আর আমে আমড়ার স্বাদও অনেকখানি কমেছে। উপায় ভেবে ফেলেছি। খুঁতগুলো শুধরে ফেলব। আশা করছি শিগগিরি সিওর সাকসেস। তারপর গ্র্যান্ড সেলিব্রেশন। এক্সপেরিমেন্ট সফল হলেই খবর দেব। পত্রপাঠ চলে আসিস।'

এরপর বহুদিন কেটে গেছে। ঘেঁচুমামার কাছ থেকে নাড়ু কিন্তু আর কোনো চিঠি পায়নি।

— 'সেই যে গুন্ডা, ছক্কু খুন হয়ে গেছে। আপনি জ্বরে পড়লেন — সেই রাতে।'

— 'কে মারল?' বটুকবাবু অবাক ভাবে বললেন।

— 'কে জানে। ছুরি মেরেছিল। নালার ভিতর পড়েছিল মুখ থুবড়ে। সকালে আবিষ্কার হল। পুলিশ এসে নিয়ে গেল বডি। এক্কেবারে ডেড। পাড়ায় খুব হইচই। কে মেরেছে ধরা পড়েনি। ওই আর কী! আর কোনো গুন্ডার কীর্তি। বেটারা এইভাবেই মরে। উঃ, বাঁচলুম মশাই! আপদ গেছে!'

— 'ছক্কু লোকটা আস্ত শয়তান। আমার পাঁচ টাকা কেড়ে নিয়েছিল ও মাসে। লোকটাকে কবে জানি দেখলাম? খুব শিগগিরি।' বটুকবাবু ভাবতে চেষ্টা করেন।

নাঃ, মনে পড়ছে না। রগের কাছে টিপটিপ করে ওঠে।

যাকগে। যত্ত সব গুন্ডা বদমাইশ। মরেছে ঠিক হয়েছে। বটুকবাবু ছক্কুর চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন।

দিন চারেক বাদে কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে বাঁধাইয়ের কাজ করতে গিয়ে নতুন কেনা ছুরিটার খোঁজ পেলেন না বটুকবাবু। ঘরে তন্নতন্ন করে খুঁজলেন। নেই। দপ্তরির কাছে খোঁজ করলেন। সেখানেও নেই।

দপ্তরি বলল, 'হ্যাঁ, সেদিন একখানা নতুন ছুরি এনেছিলেন বটে, কিন্তু এখানে তো ফেলে যাননি।'

ইস, অমন খাসা ছুরিখানা হারাল বুঝি? দপ্তরির দোকান থেকে বেরিয়ে আর কোথাও গিয়েছিলাম কি? কোথায় যে ফেললাম?

বটুকবাবু কিছুতেই তা মনে করতে পারলেন না।

[১৯৮৩ জানুয়ারি-১২, আনন্দমেলা]

বেটুদার ফেয়ারওয়েল

নভেম্বর মাসের শেষাশেষি।

বেটুদা বুধবার অফিস থেকে ফিরলেন। প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে লুঙ্গি পরে, হাত মুখ ধুয়ে, চা, জলখাবার খেলেন। তারপর শোয়ার ঘরের খাটের নীচ থেকে খবরের কাগজে জড়ানো ক্রিকেট বুট দুটো টেনে বের করলেন।

এখনও বলতে আসেনি কেউ, তবে কানে এসেছে সামনের রোববার খেলা। বলবে ঠিকই। যদি খেলতেই হয় — সিজন-এর প্রথম ম্যাচ — একটু ফিটফাট হয়ে মাঠে নামা উচিত।

মিনিট পনেরো বাদে বেটুদার স্ত্রী মিনু বউদি শোয়ার ঘরে ঢুকে দেখলেন, মেঝেতে উবু হয়ে বসে বেটুদা। তাঁর বাঁ হাতে একখানা ক্রিকেট বুট। ডান হাতে ভেজা ন্যাকড়া। সামনের বাটিতে চকখড়ি গোলা। একমনে বুটে রং লাগাচ্ছেন।

বউদি থমকে দাঁড়ালেন। বললেন — 'কী ব্যাপার?'

বেটুদা একটু থতমত খেয়ে মুখ তুলে বোকা বোকা হেসে বললেন, 'না মানে বড্ড ময়লা হয়েছিল।'

— 'বুঝেচি। এ বছরও আবার। গেল বছর না শপথ করলে, আর নয় এই শেষ।'

— 'না না এখানে আসেনি কেউ ইনফর্ম করতে। আমি কোনো কথাই দিইনি।'

— 'দেওয়ার জন্যে তো তৈরি হয়ে বসে আছ। ডাকলেই ছুটবে। ঠিক আছে, আমিও দেখে নেব' — দুম দুম করে মেঝে কাঁপিয়ে বউদি সরবে বেরিয়ে গেলেন।

মনটা খিঁচড়ে গেল বেটুদার। ডান পায়ের বুটের ভোঁতা নাকটা সবে মাত্র কলি ফিরিয়ে ধবধবে হয়েছে। 'ধুত্তেরি' — বুট দুটো ছুড়ে দিলেন খাটের তলায়। খড়ি-গোলা জল দিলেন ফেলে। তারপর বারান্দায় গিয়ে গুম হয়ে বসে রইলেন চেয়ারে।

মিনু বউদির দোষ নেই। এর আগে পর পর দু-বছর প্রতিজ্ঞা করেও বেটুদা কথা রাখেননি। এটা থার্ড ইয়ার। দু-দুবছর সিজন শেষে বেটুদা বাড়িতে ঘোষণা করেছেন — ব্যস আর নয়। এবার রিটায়ার করব। কিন্তু ফের পরের শীতে খেলতে নেমেছেন।

বেটুদা ক্রিকেট পাগল। ক্রিকেট খেলতে ডাকলে আর থাকতে পারেন না। তেমন উঁচু দরের খেলোয়াড় হতে পারেননি। নিজের স্কুল এবং কলেজের হয়ে খেলেছিলেন ক্রিকেট।

কিছুদিন ময়দানে ঘোরাফেরা করেছিলেন বড়ো টিমে খেলবার আশায়। সুবিধে হয়নি। একটা ফার্স্ট ডিভিশন ক্লাবে খেলেছিলেন বটে দুবছর। তবে সিজন-এর অর্ধেকই বসিয়ে রাখত। সে এক যন্ত্রণা। অতঃপর উচ্চাশা ত্যাগ করে সাউথ-ক্যালকাটায় নিজের পাড়ার ক্লাব ইয়াং বেঙ্গল স্পোর্টিংয়েই বরাবর খেলে আসছেন। ইয়ং-বেঙ্গল খেলে সেকেন্ড ডিভিশনে।

বড় প্লেয়ার হতে না পারার জন্য বেটুদার দুঃখ নেই। ক্রিকেট খেলেই তাঁর আনন্দ। কিন্তু না, এবার একটা ফাইনাল ডিসিশন নিতেই হবে।

বেটু দার বয়স চৌত্রিশ বছর। সেটা ব্যাপারই নয়। বডি পারফেক্টলি ফিট। গত বছরেও বেশ ভালো ফর্মে খেলেছেন। আসল ঝঞ্ঝাট বেধেছে সংসার নিয়ে। বাড়িতে তিনি একা পুরুষ। আর আছে — স্ত্রী, মা এবং চার বছরের ছেলে বিল্টু। বিয়ে হয়েছে সাত বছর। প্রথম প্রথম মিনু বউদি বেটুদার এই ক্রিকেট প্রীতি মেনে নিলেও ক্রমেই বেঁকে বসেছেন। কারণ ক্রিকেট সিজন পড়লেই ডিসেম্বর থেকে মার্চ-এপ্রিল অবধি বেটুদাকে ছুটির দিনে কোনো কাজে পাওয়া যায় না।

বেটুদার ক্রিকেট নিয়ে বাড়িতে অভিযোগ সবারই। মিনু বউদি বলেন — 'শীত বসন্তই হচ্ছে বেড়াবার টাইম। শ্যামবাজার, মানিকতলা, সল্টলেক, বজবজ, সুখচর, বদ্যিবাটি ধারে ধারে আমাদের কত আত্মীয় বন্ধুবান্ধব। কোথাও আমার যাওয়া হয় না। কি না মশায়ের ব্যাট-বল খেলা আছে। নেহাত ওরা যদি কেউ নিয়ে যায় দয়া করে। এই ভিড়ের বাসে ট্রেনে কি আমি একা একা ছেলে নিয়ে যাওয়া আসা করতে পারি!

'গত বছর ডিসেম্বরে তোমার মামাতো ভাই শিবুর বিয়ে হল। দিন ফেলল রোববার। যাতে আত্মীয়রা সবাই সকাল সকাল আসতে পারে। আর তুমি কি না খেলা সেরে আমাদের নিয়ে হাজির হলে সন্ধে ছটায়। লজ্জার এক শেষ! আমোদটাই মাটি হল।

'শীতকালে ছুটির দিনে মার্কেট গিয়ে একটু দেখে শুনে কেনাকাটা করার উপায় নেই। কে নিয়ে যাবে?'

বিল্টুর অভিযোগ — গত শীতে বাবলু খুব চিড়িয়াখানা দেখেছে। গোটা দিন ধরে। ওর বাবা মা নিয়ে গেছিল। আর আমায় কেউ নিয়ে যাচ্ছে না। বাবাকে এত করে ধরলাম, কিছুতেই নিয়ে গেল না। বলল, পরের শীতে ঠিক নিয়ে যাব।

পর পর দুবছর ধরে মা বলছেন — জয়দেব কেঁদুলির মেলা দেখতে যাব পৌষ সংক্রান্তিতে। সংক্রান্তির দিন অজয় নদীতে স্নান ভারি পুণ্য কাজ। কী চমৎকার বাউল গান হয় মেলায়। বোলপুরে উঠব রাজুদার বাড়িতে। ওরা বারবার লিখছে আসতে। ওরাই দেখবার ঘোরবার সব ব্যবস্থা করে দেবে। বক্রেশ্বরে গরম জলের কুণ্ডে চান করব। আমার বাতের ব্যথার উপকার হবে। তুই শুধু আমায় পৌঁছে দিয়ে আয় — পরের হপ্তায় নিয়ে আসবি।

কিন্তু ওই সময় ক্রিকেটের ফুল-সিজন। ছুটির দিনে ম্যাচ। অন্যদিন সকালে জোর নেট প্র্যাকটিস। সময় কই? বেটুদা তাই এড়িয়ে গেছেন — 'এবার নয় পরের বছর।'

মা আক্ষেপ করেন, 'আর আমার যাওয়া হয়েছে।'

বেটুদা মানেন যে তিনজনের অভিযোগই খাঁটি। আত্মীয়স্বজন, শ্বশুরবাড়ির লোক, দূরের

বন্ধুবান্ধব বিরক্ত। ডিসেম্বর টু মার্চ-এপ্রিল বেটুদার পাত্তা পাওয়া যায় না ছুটির দিনে এলে — নিজে যাওয়া তো দূরে থাক। মনকে শক্ত করলেন বেটুদা। বুট জোড়া দিয়ে দেব তপনকে। ছেলেটা খাসা ব্যাট করে। ফিউচার আছে। বুট কিনতে পারে না। ফুটো কেডস পরে খেলে। তবে কাউন্টি-ক্যাপটা রেখে দেব। হয়তো একদিন বিল্টু পরে মাঠে নামবে। বিল্টুকে নিজে হাতে ধরে খেলা শেখাব — এমনি কত কী ভাবনা আসে? হঠাৎ হাঁক শোনা গেল — 'বেটুদা! ও বেটুদা! বেটুদা আছেন?' শার্টটা গায়ে গলিয়ে নিয়ে বেটুদা সদর দরজা খুলে বললেন, 'ও হাবুল?'

হাবুল তড়বড়িয়ে বলল, 'বেটুদা রোববার খেলা। বান্ধব সংঘের সঙ্গে। মন্টুদা বলে পাঠাল। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ। বান্ধবের গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে নটায়। আপনি ঠিক যাবেন।'

বেটুদা গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়লেন, 'না রে পারব না। বলে দিস।'

'না না, খেলতেই হবে। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ বলে লাইটলি নেবেন না, মন্টুদা বলেছে। পরের হপ্তা থেকে লিগ ম্যাচ শুরু। আর ম্যাচ প্র্যাকটিসের সুযোগ নেই। তাছাড়া বান্ধব গতবার আমাদের হারিয়েছিল। এবার বদলা চাই।' হাবুল বোঝায়।

গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে আবার মাথা দোলায় বেটুদা, 'না রে, লিগ, ফ্রেন্ডলি কোনো ম্যাচই আর খেলব না। মন্টুকে বলে দিস, আমি রিটায়ার করছি।'

হাবুল থ হয়ে খানিক চেয়ে থেকে বলল, 'সেকী! কেন?'

— 'অসুবিধা হচ্ছে। বাড়িতে কাজ থাকে ছুটির দিনে।'

— 'কী কাজ?' হাবুলের বাড়িতে গাদা লোক। সে দেখে, বাবা কাকারা ছুটির দিনে বাইরে থাকলেই বাড়ির মেয়েরা খুশি। কারণ ঘরে থাকলেই বারবার চা এবং নানান ফরমাশ।

কী কী কাজের জন্য অসুবিধা তার লিস্ট দিতে যাচ্ছিলেন বেটুদা, হঠাৎ খেয়াল হল স্ত্রী হয়তো পাশের ঘরে কান খাড়া করে আছে। তাই সামলে নিয়ে বললেন, 'সে অনেক কাজ। আমি একা। মন্টুকে বলে দিস।'

হাবুল চলে গেল। দশ মিনিটের মধ্যে এল ক্যাপ্টেন মন্টু স্বয়ং — 'বেটুদা, কী ব্যাপার? খেলবেন না কেন?' বেটুদা বললেন, 'ভাই, রিটায়ার করলাম। অনেকদিন তো খেলছি।'

— 'তবে যে দুদিন নেট প্র্যাকটিস করলেন?'

বেটুদা লুকিয়ে দুদিন নেট প্র্যাকটিস করেছেন অন্যের কেডস ধার করে। বাড়িতে জানে না। চট করে ঘরের দিকে একটা সন্ত্রস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেটুদা বললেন, 'ও এমনি। বডি ফিট রাখতে। এবার নতুনদের চান্স করে দিই। সিনিয়াররা সরে দাঁড়াই।'

মন্টু কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত স্বরে বলল, 'নতুনরা নিজের জোরে চান্স পেতে হয় পাবে। আপনি ক্লাবের কথাটা একটু ভাবুন। আচ্ছা হাবুল বলছিল, আপনার বাড়ির কাজে কী সব অসুবিধা হচ্ছে?'

— হ্যাঁ। কাজটাজ আছে। গোটা ক্রিকেট সিজনে ছুটির দিনগুলো বরবাদ হয়ে যায়।'

— 'কী কাজ?'

— 'সে অনেক। তোমরা বুঝবে না।'

মন্টু সত্যিই বোঝে না, সে এখনও বিয়ে-থা করেনি। ঝাড়া হাত পা। চাকরি বাদে বাকি

সময়টুকু খেলা নিয়েই মেতে থাকে। মন্টু বোঝায়, 'কেসটা আর একবার কনসিডার করুন বেটুদা।'

বেটুদা মাথা নাড়েন — 'নাঃ।'

হতাশ হয়ে চলে যায় মন্টু। পাছে ফের কেউ অনুরোধ জানাতে আসে, সেই ভয়ে বেটুদা বাজারের থলি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

বাজার সেরে ফেরার পথে গলির মোড়ে বেটুদাকে ধরলেন শ্যামানন্দবাবু। শ্যামানন্দবাবু ওরফে শ্যামবাবু ইয়াং বেঙ্গলের ক্রিকেট সেক্রেটারি। নিজের বাড়ির বাইরে ব্লকে তিনি ওৎ পেতে বসেছিলেন।

শ্যামবাবু মানুষটি ছোটখাটো শুকনো চেহারা। অন্য সময় ধুতি পাঞ্জাবি পরলেও ম্যাচের দিন মাঠে গেলে ক্রিকেটের মর্যাদা রাখতে ধারণ করেন ঢলঢলে ফুলপ্যান্ট, শার্ট, একটা ছাইরঙা কোট এবং পায়ে কালো বুট জুতো। সব কটি জিনিসই আদ্যিকালের। ভদ্রলোক হাতে-কলমে ক্রিকেট কদ্দুর খেলেছেন বলা মুশকিল। তবে ক্রিকেট জগতের সমস্ত খবর তাঁর কণ্ঠস্থ। তারই জোরে ক্লাবের ক্রিকেট সেক্রেটারির পোস্টটা প্রায় একচেটিয়া করে রেখেছেন। শ্যামবাবু বললেন, 'এই যে বেটু কী শুনছি, তুমি নাকি খেলা ছেড়ে দিচ্ছ?'

— 'আজ্ঞে হ্যাঁ। অনেকদিন তো দেখলাম।'

— 'তোমার বয়স কত হে?' শ্যামবাবু চোখ পাকান।

— 'আজ্ঞে চৌত্রিশ পুরেছি।'

— 'ওনলি থার্টিফোর। জ্যাক হবস-এর নাম শুনেছ? ইংল্যান্ডের ফেমাস ক্রিকেটার। হবস কদ্দিন অবধি টেস্ট খেলেছিলেন জান? আটচল্লিশ। আপ টু ফর্টিএইট ইয়ারস।'

বেটুদা মাথা চুলকান।

শ্যামাপদবাবু বললেন, 'মন্টু কী সব বলছিল। তোমার নাকি বাড়ির কাজে ডিফিকাল্টি হচ্চে?'

— 'আজ্ঞে হ্যাঁ। গোটা সিজন, একটাও ছুটির দিনে সময় দিতে পারি না। বাড়িতে কত কাজ থাকে।'

'তাই নিয়ম,' দার্শনিক ভাবে ঘোষণা করলেন শ্যামবাবু 'দশের কাজ করলে ঘরের কাজে একটু টান পড়েই। এই আমাকেই দেখো না। ক্রিকেট সেক্রেটারি, দুগ্গা পুজো আর রবীন্দ্রজয়ন্তী কমিটির মেম্বার — এত সব সামলাতে গিয়ে ঘরের কাজে কি আর অবহেলা হয় না? খুব হয়। উপায় কী? পাবলিক ডিমান্ড।'

বেটুদা ভাবলেন, শ্যামবাবুর বিপুলকায়া গৃহিণী সংসার সামলাতে একাই যথেষ্ট। চাকরি ছাড়া শ্যামবাবুর সংসারে আর কী কাজ? তবে মুখে বললেন, 'তা বটে। কিন্তু —'

— 'আর একবার দেখো ভেবে। এ সেকেন্ড থট।'

— 'আজ্ঞে মাপ করবেন। আমি স্থির করে ফেলেছি।' বেটুদা দৃঢ়চিত্ত।

বেটুদা বৃহস্পতিবার অফিস গেলেন। বাড়ি ফিরলেন। পাড়ায় ঢুকে ডাইনে বাঁয়ে তাকালেন না। চা-টা খেয়ে খবরের কাগজখানা নিয়ে বসলেন। সকালে সময় পাননি ভালো করে পড়ার। প্রথম পৃষ্ঠাটা সবে শুরু করেছেন, বাইরে ডাক শোনা গেল — 'বেটুদা আছেন?'

মন্টুর গলা। গম্ভীর মুখে বেটুদা দরজা খুললেন।

মন্টু ভজা এবং আরও দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে।

মন্টু বলল, 'বেটুদা, আমাদের কেসটা কিছু ভাবলেন?'

বেটুদা ঘাড় নাড়লেন, 'বলেছি তো ভাই, আর খেলব না।'

— 'তাই হবে', হাতের চেটো উল্টে হতাশ ভাবে বলল মন্টু, 'কিন্তু এই রোববার আপনাকে খেলতেই হবে। মানে ওটা হবে আপনার ফেয়ারওয়েল ম্যাচ। আমরা অ্যারেঞ্জ করছি।'

— 'না না, ওসব কী দরকার?' বেটুদা আপত্তি তোলেন।

— 'কে বলল দরকার নেই? আলবত দরকার আছে,' ভজা উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আপনি অ্যাদ্দিন সার্ভিস দিলেন আর ক্লাব আপনার জন্যে এটুকু করবে না? আমরা সেক্রেটারি শ্যামবাবুর সঙ্গে কথা বলেছি। উনি খুব এনকারেজ করেছেন। এই একটু সামান্য ঘটা। আমাদের সাধ্যমতো।'

মন্টু বলল, 'বান্ধবকে জানিয়ে দিয়েছি অকেশনটা। লাঞ্চটা যেন স্পেশাল দেয়। এবার ওদের লাঞ্চ দেওয়ার কথা। বাকি অ্যারেঞ্জমেন্ট আমাদের।'

বেটুদা অভিভূত হয়ে বললেন, 'বেশ তাই হবে। তোমরা বলছ যখন?'

মন্টুর দল ব্যস্ত হয়ে চলে গেল। বেটুদা ক্রিকেট বুট জোড়া টেনে বের করে সযত্নে খড়ি লাগাতে বসলেন। শুক্র শনি নেটে যাবেন। একটু তৈরি হয়ে নামা ভালো। হাজার হোক ফেয়ারওয়েল ম্যাচ। যা তা খেললে মান থাকবে না। গলা তুলে স্ত্রীর উদ্দেশে জানালেন, 'বলে গেল রবিবার খেলতেই হবে। সেদিন আমার ফেয়ারওয়েল ম্যাচ। ব্যস, দি এন্ড।'

ওপক্ষ থেকে কোনো সাড়াশব্দ এল না।

বেটুদা পাড়ায় বিশেষ ব্যক্তি হয়ে উঠলেন। শুক্র শনি পাড়ায় বেরতেই নানান সম্ভাষণ জোটে

— 'বেটুদা আপনি নাকি রিটায়ার করছেন? সত্যি এখনো কিন্তু ফার্স্টক্লাস ফর্মে ছিলেন।'

'কী হে বেটু, এবারল নাকি খেলা ছাড়ছ? তা অনেক দিন চালালে বটে। ক্রেডিট আছে।'

পাড়ার গদাইদা আর বেটুদা সমবয়সি। একই সঙ্গে ক্রিকেট শুরু করেছিলেন। কিন্তু গদাইদা খেলা ছেড়েছেন পাঁচ বছর আগে।

দেখা হতেই গদাইদা বললেন, 'কনগ্রাচুলেশন বেটু। এ ওয়াইজ ডিসিশন। ঠিক সময় খেলা ছাড়া একটা মস্ত জাজমেন্ট। এই আমাকেই দেখো। এক্কেবারে কারেক্ট সময় রিটায়ার করেছি।'

ঘোড়ার ডিম করেছিস। মনে মনে ভাবলেন বেটুদা। ভুঁড়ি হয়ে গিছল। দৌড়তে পারতিস না। টিমে চান্স না পেয়ে বাধ্য হয়ে ছেড়েছিস। বেটার ভারি হিংসে। দেখা হলেই ফুট কাটত — 'কীরে বেটু আর কদ্দিন চালাবি, শিং ভেঙে বাছুরের দলে?' এখন খুব খুশি। যাহোক মুখে একটু হাসি টেনে বেটুদা বললেন, 'মন্টুরা ছাড়ছিল না। কিন্তু বড্ড অসুবিধা হচ্ছে। বাড়িতে আমি একা। কত কাজ। ছুটির দিনগুলো নষ্ট হয়।'

— 'কারেক্ট। আমরা এখন ফ্যামিলিম্যান। আমিও তো ঠিক এইজন্যেই ছাড়লুম।'

বেটুদা ভাবলেন, ফের গুল। বাড়িতে তুই কুটোটি নাড়িস না। স্রেফ খেয়ে ঘুমিয়ে দিন দিন মুটোচ্ছিস।

রবিবার। লেক মাঠে বান্ধব সংঘের গ্রাউন্ড। সকাল নটার মধ্যে দুইপক্ষই মাঠে হাজির। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে নটায় ম্যাচ শুরু হবে। দুদলই তিন ঘণ্টা করে ব্যাট করার সুযোগ পাবে। মাঝখানে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাঞ্চ ব্রেক। অবশ্য তিন ঘণ্টা ব্যাট করার আগেই কোনো দল অল ডাউন হয়ে গেলে অন্য দল ব্যাট করতে নামবে। ঠিক হয়েছে যাদের মোট রান বেশি হবে তারাই জিতবে।

মাঠে বেশ ভিড়। প্রচুর দর্শক। বেটুদার পাড়ার অনেকে এসেছে, বান্ধব সংঘেরও অনেক সভ্য। দুই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ইত্যাদির পদের কিছু গণমান্য ব্যক্তি উপস্থিত। শামিয়ানা খাটানো হয়েছে। তার নীচে সারি সারি ভাড়া-করা চেয়ার পাতা। একটা টেবিলও রয়েছে। তার ওপর একটা ঝকঝকে পিতলের ফুলদানি। এইখানেই খেলার পর ইয়াং বেঙ্গলের পক্ষ থেকে ফেয়ারওয়েল জানানো হবে বেটুদাকে। দু-চারটে বক্তৃতা হবে। একটা প্রেজেনটেশনও নাকি দেওয়া হবে। ভজা খুব খাটছে। সে নিজে তেমন খেলে-টেলে না। কিন্তু ইয়াং বেঙ্গলের সবচেয়ে উৎসাহী সভ্য। একটা হুজুগ পেলেই মেতে ওঠে।

ধোপদুরস্ত সাদা শার্টপ্যান্ট, ধবধবে বুট, নেভি-ব্লু-ব্লেজার কোটে দারুণ স্মার্ট লাগছিল বেটুদাকে। ইয়াং বেঙ্গলের অন্য প্লেয়াররাও আজ যথাসাধ্য ফিটফাট। শ্যামবাবুর জুতোয় তিন বছর বাদে পালিশ পড়েছে। বান্ধব সংঘের কয়েকজন হ্যান্ডশেক করে গেল বেটুদার সঙ্গে।

বান্ধবের ক্যাপ্টেন অভয় দত্ত বলল, 'বেটুদা আমি ছবছর খেলছি আপনার এগেনস্টে। এরপর মিস করব আপনাকে।'

বান্ধবের ক্রিকেট সেক্রেটারি শিবদাস মুখুজ্যে বললেন, 'বেটুবাবু, ম্যাচ খেলা ছাড়ছেন বলে মাঠ ছাড়বেন না। বাচ্চাদের কোচিং-এর ভার নিন। আমি বলি খেলার চেয়েও সেটা বড় কাজ।'

বেটুদা হাসি হাসি মুখে সবার হাতে হাত মেলাচ্ছেন। সবার কথা শুনছেন।

আম্পায়ার দুজন মাঠে নামল, তারপর দুদলের দুই ক্যাপ্টেন। টস্ হল। বান্ধব টসে জিতে ব্যাটিং নিল। ইয়াং বেঙ্গলের ফিল্ডিং।

বোলিংয়ে বেটুদার বিশেষ সুনাম নেই। মোটামুটি অফস্পিন করতে পারেন। তবে লেংথ থাকে না, তাই দু-চার ওভারের বেশি বোলিং জোটে না। আজ কিন্তু বেটুদাকে দিয়ে অনেকক্ষণ বলা করানো হল — ফেয়াকওয়েলের অনারে। আট ওভারে বল করে একটা উইকেটও পেলেন। বেটুদাকে বল করতে ডাক দিতেই দর্শক হাততালি দিল। তার বলে একজন ক্যাচ আউট হতেই এমন হাততালি পড়ল যে বেটুদা নিজেই লজ্জা পেয়ে গেলেন।

লাঞ্চ অবধি বান্ধব করল আট উইকেটে একশো বাহান্ন রান।

লাঞ্চের সময় বেটুদাকে মাঝখানে রেখে দুদলের প্লেয়াররা খেতে বসল। স্পেশাল গেস্ট হিসেবে বেটুদাকে জোর করে একটার বদলে দুটো কমলালেবু গছালেন বান্ধবের প্রেসিডেন্ট।

লাঞ্চের পর ইয়াং বেঙ্গল ব্যাট করতে নামল। পনেরো মিনিট বাদে তাদের প্রথম উইকেট পড়ল বারো রানে। এবার বেটুদার পালা।

পায়ে প্যাড, বাঁ বগলে ব্যাট, ডান হাতের মুঠোয় ধরা জোড়া ব্যাটিং গ্লাভস, মাথায় গাঢ় লাল কাউন্টি ক্যাপ। একটু সামনে ঝুঁকে ভারিক্কি চালে হেঁটে বেটুদা মাঠে ঢুকতেই প্রবল

হাততালি। বান্ধব সংঘের খেলোয়াড়রাও হাততালি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল বেটুদাকে।

বেটুদার মনটা হালকা। দুদিন ধরে নিজের খেলায় প্রশংসা শুনতে শুনতে মনে বেশ আত্মবিশ্বাস। ইচ্ছে কয়েকটা ভালো স্ট্রোক দেখাই। একটা বড় স্কোর করতে পারলে চমৎকার হয়। মনে রাখবে লোকে। না পারলেই বা কী? ডন ব্র্যাডম্যান তাঁর জীবনের শেষ টেস্ট ইনিংসে কত করেছিলেন? শূন্য। তাতে কি ব্র্যাডম্যানের খ্যাতি কিছু কমেছে? শুধু কি সেই স্কোরটাই মনে রেখেছে লোকে? তাঁর আগের খেলা ভুলে গেছে?

সতর্কভাবে গার্ড নিলেন বেটুদা। বল করছে বাদল সাহা। বেশ জোরে বল করে। বাদল ইচ্ছে করেই বলের পেসটা একটু কমাল। ওভারের বাকি তিনটে বল করল অফস্ট্যাম্পের খানিক বাইরে। যাতে বেটুদা চোখ সেট করার সুযোগ পান। একটা ভদ্র গোছের রান পান বিদায় দিনে। বাদলের তৃতীয় বলে বেটুদা খাস একখানা স্কোয়ার কাট মারলেন। সোজা চার। খুব হাততালি পড়ল।

দেখতে দেখতে বেটুদার স্কোর এগিয়ে চলে। বেটুদার স্কোর কুড়ি না পেরনো অবধি বান্ধবের প্লেয়াররা তাঁকে আউট করার মোটেই চেষ্টা করেনি। বরং নেহাত সাদামাটা বলই দিয়েছে। কিন্তু তারপর তারা শঙ্কিত হল। এ ব্যাপার চললে যে বান্ধব হারবে। হোক একজিবিশন ম্যাচ তা বলে ইয়াং বেঙ্গলের কাছে হারা চলবে না। প্রেস্টিজ যাবে। বেটুদাকে ফেরত পাঠানো দরকার। তারা যথাসাধ্য চেষ্টা শুরু করে।

কিন্তু তখন বেটুদাকে রোখে কার সাধ্যি। জড়তা কেটে গেছে। ওইটাই বেটুদার দুর্বলতা — প্রথমদিকে বড্ড নার্ভাস থাকেন। ফলে প্রায়ই টপ করে আউট হয়ে যান। এখন হাত খুলে মারছেন। সামান্য লুজ বল পেলেই পিটুনি। একখানা ছয়ও হাঁকালেন।

উল্লাসে ফেটে পড়ছে দর্শকরা। হাততালির ঝড় বইছে। বান্ধবের প্লেয়াররাও তারিফ জানাতে বাধ্য হয় বেটুদাকে। পঞ্চাশে পৌঁছে বেটুদা একটা চান্স দিলেন। তাঁর ব্যাট ছুঁয়ে বল বুক সমান উঁচু হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল ফার্স্ট এবং সেকেন্ডে স্লিপের মধ্যে দিয়ে — বেশ জোরে। ফার্স্ট স্লিপ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ক্যাচটা রাখতে পারল না হাতে। বেটুদা তাতে বিন্দুমাত্র ঘাবড়ালেন না। যথারীতি খেলে চললেন। ইতিমধ্যে তিনবার পার্টনার বদলেছেন বেটুদা। অর্থাৎ ইয়াং বেঙ্গলের আরও তিনটে উইকেট পড়েছে। তবে বেটুদা অবিচল।

ইয়াং বেঙ্গলের পঞ্চম উইকেট পড়ল। এবার বেটুদা আউট — এল. বি. ডবলু। স্কোর বোর্ড দেখাল, লাস্ট ব্যাটসম্যান — ৭৮। মোট রান তখন একশো সাঁইতিরিশ। আরও প্রায় চল্লিশ মিনিট সময় রয়েছে হাতে। অর্থাৎ ম্যাচ ইয়াং বেঙ্গলের হাতের মুঠোয়।

বেটুদা দৃপ্ত ভঙ্গিতে ফিরে চললেন। তিনি উইকেট থেকে বাউন্ডারি লাইনে পৌঁছনো অবধি বেজে চলে করতালি। টুপিতে হাত রেখে বেটুদা এই অভিনন্দনের উত্তর জানান। মাঠের বাইরে আসতেই আরও একদফা করমর্দন ও অভিনন্দন। প্যাড-ট্যাড খুলে রেখে বেটুদা চেয়ারে বসে হাসি হাসি মুখে খেলা দেখতে লাগলেন। আর মাত্র দু ওভারে ষোলো রান তুলে ফেলে ইয়াং বেঙ্গল ম্যাচ জিতে গেল।

খেলা শেষ হওয়ার পর আধঘণ্টা কেটে গেছে। বেটুদা বসে বসে গল্প করছেন। হঠাৎ খেয়াল হল, তাঁর কাছাকাছি ইয়াং বেঙ্গলের কেউ নেই। পাশে যারা রয়েছে সবাই বান্ধব

সংঘের লোক। তিনি এদিক-ওদিক চেয়ে দেখেন, কিছু দূরে মন্টু, হাতটাত নেড়ে ওরা খুব কথা বলছে।

বেটুদা ভাবলেন, নিশ্চয়ই আমার বিদায় সভা নিয়ে আলোচনা চলছে। আর দেরি না করে লাগিয়ে দিক। সভার পর চা-টা আছে। কতক্ষণ বক্তৃতা চলবে কে জানে? খিদে পেয়ে গেছে।

মিনিট পাঁচ বাদে মন্টু এসে ডাকল, 'বেটুদা একবার আসবেন। এই দিকে। একটু দরকার।'

বেটুদাকে নিয়ে মন্টু ইয়াং বেঙ্গলের সেই জটলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অমনি সবাই তাদের ঘিরে ধরল। মন্টু ঘুরে দাঁড়িয়ে অতি বিনীতভাবে বলল, 'বেটুদা আমাদের একটা রিকোয়েস্ট মানে দাবিও বলতে পারেন, আপনার এখন রিটায়ার করা চলবে না।'

— 'মানে!' বেটুদা থ।

— 'মানে এবার আমাদের লিগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার খুব চান্স। আপনি না খেললে হবে না।'

— 'তোমরা যদ্দিন না চ্যাম্পিয়ান হবে তদ্দিন আমায় খেলে যেতে হবে? বলছ কী!' বেটুদা উত্তেজিত।

— 'না না তা বলছি না, কেবল এই সিজনটা। আর একটা বছর। প্লিজ।'

শ্যামবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'রাইট। বী রিজনেবল বেটুদা তোমার আর কী বা বয়স — ওনলি থার্টিফোর। মনে রেখো গ্রেট জ্যাক হবস —'

— 'না না তা হয় না। লোকে কী ভাববে? অ্যানাউন্স করে ফেলেছি। ফেয়ারওয়েল ম্যাচ অবধি হয়ে গেল।'

বেটুদার আর্তনাদকে থামিয়ে দিলেন শ্যামবাবু, 'কিস্‌সু ভাববে না। আমরা আবার অ্যানাউন্স করে দিচ্ছি — তোমার রিটায়ারমেন্ট পোস্টপোন্ড। সামনের বছর ফের তোমার ফেয়ারওয়েল ম্যাচ হবে। প্রেজেনটেশনটা তো রইলই। ইতিহাসে এমন ঢের হয়েছে।'

— 'লোকে যে হাসবে', বেটুদা খুঁত খুঁত করেন।

— 'তা বটে', বেটুদাকে ক্ষীণ সমর্থন জানায় গদাইদা। এই একমাত্র সমর্থন পেলেন বেটুদা।

ভজা আস্তিন গুটিয়ে বলল, 'কোন বাপের বেটা হাসবে শুনি? দাঁত ছটকে দেব না। হাসবে নয় বেটুদা, কাঁদবে। আপনি এই সিজনে খেলেছেন শুনলে ওই বান্ধবের চোখেই জল এসে যাবে। ভাবছিল আপনি না খেললে ওদের খুব মওকা। নির্ঘাত চ্যাম্পিয়নশিপটা মেরে দেবে।'

— 'তা বটে।' গতিক বুঝে তৎক্ষণাৎ মত পাল্টালেন গদাইদা।

— 'তাছাড়া আমার যে আরও অনেক অসুবিধে। বাড়িতে কত কাজ। গোটা সিজন কিচ্ছু করতে পারি না।' বেটুদা প্রাণপণে বোঝান।

— 'দশের কাজ করলে ঘরের কাজে একটু টান পড়ে। আচ্ছা শুনি কী কাজ? তারপর না হয় ঠিক করা যাবে,' বললেন শ্যামবাবু।

— 'হ্যাঁ হ্যাঁ' — সবাই সায় দেয়।

বেটুদা মন্টুর দিকে তাকিয়ে রেগে বললেন, 'গোটা ক্রিকেট সিজন তোমাদের বউদির কোথাও বেড়ানো হয় না। মার্কেটিং হয় না। বজবজ সুখচর বদ্যিবাটি — কত জায়গায় তার যাওয়ার সাধ। ছুটির দিন মানেই আমার খেলা। কে নিয়ে যাবে?'

— 'আমরা' উত্তর দিল ভজা, 'ননপ্লেয়িং মেম্বাররা পালা করে ডিউটি দেব। বউদিকে সব

জায়গায় ঘুরিয়ে আনব। বজবজ বদ্যিবাটি কী ? দিল্লি বম্বে হলেও কুছপরোয়া নেই।'

— 'নেক্সট?' শ্যামবাবুর গলা।

— 'বিল্টুকে চিড়িয়াখানা দেখাব বলেছি এই শীতে। সারাদিন কাটাবে। তার কী হবে?'

— 'যাবে আলবাত যাবে। এই হাবুল এটা তোর ডিউটি। আসছে রোববারই প্রোগ্রাম কর। তোর ভাইপো দুটিকেও সঙ্গে নিবি। বিল্টুর ফ্রেন্ড!' সমাধান দিল ভজা।

শ্যামবাবু বললেন — 'নেক্সট।'

— 'আর তোমাদের মাসিমা মানে আমার মাকে বোলপুর নিয়ে যাবে কে? জয়দেবের মেলা দেখবেন। দিয়ে আসতে এবং নিয়ে আসতে হবে।'

— 'আমি', নিজের বুকে টোকা মেরে জানাল ভজা, 'বোলপুরের কাছেই শান্তিনিকেতনে আমার এক দাদা থাকে। ওসব রুট আমার চেনা।'

বেটুদার মুখে আর কথা সরে না।

— 'ব্যস প্রবলেম সলভড।' শ্যামবাবুর মন্তব্য।

— 'না না মন্টু,' আগে আমার বাড়ি থেকে পারমিশন নিয়ে এসো। তোমাদের বউদিকে রাজি করাও। তবে ফাইনাল কথা দেব।' বেটুদা শেষ চেষ্টা করেন।

— 'ভজা মন্টু কুইক', তাড়া দিলেন শ্যামবাবু, 'চট করে একটা ট্যাক্সি ধরে চলে যা। তোরা ফিরে এলেই টি পার্টি শুরু হবে।'

আধঘণ্টার মধ্যেই মন্টুরা ফিরে এল। মুখে একগাল হাসি। অর্থাৎ বেটুদার ফেয়ারওয়েল এ বছর হচ্ছে না।

[শারদীয় ১৩৯০]
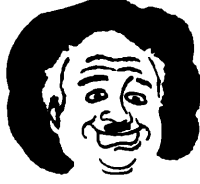
শোধবোধ

অমল মহা ভাবনায় পড়ল।

কাল ইংরিজি গ্রামার ক্লাস। শুধু ক্লাসই নয়—উইকলি পরীক্ষা নেবেন বলেছেন স্যার। আজ সন্ধেবেলা মাস্টারমশাই যখন পড়াতে আসবেন, গ্রামার পড়ানোর জন্য সে বই দেবে কী করে? বইয়ের কী হল তার কৈফিয়তই বা কী দেবে? অন্য ছেলেকে পড়ার বই দেওয়া পছন্দ করেন না বাবা। তারপর আবার না বলে দিয়েছে। এবং ঠিক সময়ে ফেরত না পাওয়ায় পড়া তৈরি করতে পারেনি যদি শোনেন? পরিণতিটা মারাত্মক হতে পারে। ভাবতেই অমলের বুক শুকিয়ে যায়।

সোম আর শুক্রবার ফিফ্‌থ পিরিয়ডে ইংরিজি গ্রামার ক্লাস। গত সোমবার বিকেলে স্কুল থেকে বেরুনোর মুখে মিহির বলেছিল, 'অমল, তোর ইংরিজি গ্রামার বইটা দিবি, আজ? কাল ঠিক ফেরত দেব।'

—'কেন, তোরটা কী হল?' অমল জানতে চায়।

একটু আমতা আমতা করে বলেছিল মিহির, 'আমারটা কোথায় যে রেখেছি, খুঁজে পাচ্ছি না। আজকের পড়াটা তোর বই থেকে একবার দেখে নেব।'

মাত্র একদিনের জন্যে চাইছে, তাই সে বইটা দিয়েছিল মিহিরকে। মনে মনে আশা ছিল, এই সূত্র ধরে মিহিরের সঙ্গে তার ভাব জমবে। মিহিরের সঙ্গে ভাব জমাতে তার খুব ইচ্ছে।

মিহিরের রং শ্যামলা। রোগা ছোটখাটো চেহারা। চুলের ছিরি নেই—বেড়ে বেড়ে ঘাড় অবধি লম্বা হলে তখন দেয় কদমছাঁট। বেশির ভাগ দিন আধময়লা জামার রঙে পাজামা বা প্যান্ট পরে স্কুলে আসে। পায়ে রবারের চটি। তবে মুখখানি সুন্দর। ঝকঝকে চোখ দুটো। মজার মজার কথা বলে। কথাবার্তায় ভারি বুদ্ধির ছাপ।

লেখাপড়ায় খুব ভালো। কেবল পড়ার বই নয়, মিহির বাইরের বইও বেশ পড়ে। সেটা ওর কথা শুনে বোঝা যায়। কিন্তু ছেলেটি একটু অদ্ভুত ধরনের। কখনো খুব হাসিখুশি, আবার কোনো কোনো দিন চুপচাপ গম্ভীর। কারোর সঙ্গে বেশি মিশতে চায় না। কেমন যেন ওপর ওপর আলাপ রাখে।

শুধু অন্তরঙ্গ হওয়ার লোভেই নয়, বই দেওয়ার পিছনে একটা অন্য কারণও ছিল।

মাসখানেক আগে একদিন অমল দেখে মিহির টিফিনের সময় ক্লাসে বসে কী একটা বই পড়ছে। উঁকি মেরে দেখি, বইটার নাম রবিনহুড।

মিহির মুখ তুলে বলে, 'পড়েছিস এটা? কুলদারঞ্জন রায়ের বই। দারুণ গল্প।'

—'না। তোর হয়ে গেছে?'

—'আর দুপাতা বাকি।'

—'দে-না আমায় পড়তে।'

মিহির ইতস্তত করে বলে, 'আমার বই নয়। পাড়ার লাইব্রেরির বই। আর কাউকে দেওয়া বারণ। আচ্ছা নে। কাল ঠিক ফেরত দিস।'

কথার খেলাপ করেনি অমল, বিকেলে না খেলে পড়ে শেষ করে পরদিনই ফেরত দিয়েছিল বইখানা। খানিকটা তারই প্রতিদানে গ্রামার বইটা মিহিরকে না দিয়ে পারেনি। কিন্তু তার জন্যে এমন মুশকিলে পড়বে কে জানত?

সোমবার সে দিয়েছিল গ্রামার বইটা। মঙ্গলবার মিহির বলল, 'এই যাঃ, ভুলে গেছি আনতে।'

বুধবারেও ওই এক কথা, 'এই যাঃ, আজও ভুলে গেছি। কাল ঠিক এনে দেব।'

বৃহস্পতিবার মিহির স্কুলেই এল না।

কী করবে? অমল ভেবে কোনো কূলকিনারা পায় না। কী হল তার বইয়ের?

মিহির কি তার বইটা হারিয়ে ফেলেছে, তাই আনছে না!' আর-একটা সম্ভাবনাও তার মনে জাগে। মিহির তার বইখানা পুরনো বইয়ের দোকানে বিক্রি করে দেয় নি তো? মাস দুই আগে সে কালীঘাটে উজ্জ্বলা সিনেমায় মর্নিং শো-এ টারজান দেখতে গিয়েছিল। উজ্জ্বলার কাছেই কতগুলো পুরনো বইয়ের দোকান। পুরনো বই কেনাবেচা করে। হঠাৎ সে দেখে সেইরকম একটা দোকানে মিহির পিছনে দাঁড়াতেই শোনে দোকানি বলছে, 'দু টাকার বেশি দিতে পারবে না।'

—'কী রে, কী করছিস?'

অমলের গলা পেয়ে মিহির চমকে উঠেছিল। ঘাড় নেড়ে বলেছিল, 'কিছু না।' বলতে বলতেই সে সরে এসেছিল দোকান থেকে। তার হাতে একখানা বই ছিল। চট করে সেটা ঢুকিয়ে নিয়েছিল কাঁধের ব্যাগে। এক নজর দেখেই অমলের মনে হয়েছিল ওটা পড়ার বই। মিহির বোধহয় বইখানা বিক্রি করতে চেষ্টা করছিল? মিহির আর দাঁড়ায়নি। 'চলি। একটা কাজ আছে',বলে ব্যস্তভাবে বিদায় নিয়েছিল।

সেই ঘটনাটা মনে পড়তে অমল ভাবল, 'মিহিরের কি লুকিয়ে পুরনো বইয়ের দোকানে বই বিক্রির অভ্যেস আছে? অমলের পাড়ায় একজনের এই অভ্যেস আছে। দেবুকে কেউ তার বই দিতে চায় না। গল্পের বই বা পড়ার বই পড়তে চেয়ে এনে স্রেফ বেচে দেয় পুরনো বইয়ের দোকানে। সেই পয়সায় সিনেমা দেখে, রেস্টুরেন্টে খায়। বই ফেরত চাইলে বলে—'হারিয়ে গেছে।' ভয়ে ওকে কেউ আর বই দিতে চায় না।

অনেক লেখাপড়ায় ভালো ছেলেরও নাকি এই বদ অভ্যাস থাকে। ছোটকাকা বলছিল যে ওদের মেডিক্যাল কলেজে থার্ড ইয়ারের একজন স্টুডেন্টের এই স্বভাব। অথচ তার রেজাল্ট খুব ভালো।

বইটা যদি মিহিরের কাছ থেকে উদ্ধার করতে না পারি? ভাবলেই অমলের দিশাহারা

লাগে। নিজে পয়সা জমিয়ে একটা নতুন বই কেনা যাবে না? যদি বা যায়, ততদিন কী করবে? মাস্টারমশাই তো আজই জিজ্ঞেস করবেন—ইংরেজি গ্রামার বই কোথায়? অতঃপর বরাতে জবাবদিহি এবং লাঞ্ছনা।

মিহিরের বাড়ি সে চেনে না। রবি থাকে মিহিরের পাড়ায়। মিহির কেন ক্লাসে আসেনি রবি বলতে পারল না। এক পাড়ায় থাকে বটে কিন্তু মিহিরের সঙ্গে তার তেমন ভাব নেই।

রবিকে ধরে অমল, 'ছুটির পর তোর সঙ্গে যাব। মিহিরের বাড়িটা আমায় দেখিয়ে দিস। আমার একটা বই নিয়েছে। খুব দরকার। ফেরত আনব।'

অমলদের স্কুলটা হাজরা রোড এবং ল্যান্সডাউন রোডের মোড়ের কাছে। অমলের বাড়ি স্কুলের দক্ষিণে, রবির সঙ্গে সে চলল স্কুল থেকে উত্তর দিকে। কিছু দূর গিয়ে তারা ল্যান্সডাউন রোড ছেড়ে বাঁদিকে একটা ছোট রাস্তায় ঢুকল। তারপর খানিক এঁকেবেঁকে চলে এক জায়গায় থেমে রবি বলল, 'ওই বাড়িটা। একতলা। হলুদ দরজা।'

রবি চলে গেল। অমল মিহিরের বাড়িটা দেখতে দেখতে এগোল। ছোট একতলা বাড়ি। খুব পুরনো। দেয়ালের পলেস্তারা খসে ইট বেরিয়ে পড়েছে। জানলা দরজার রংচটা। জানলাগুলোর কোনো কোনো পাল্লা ভাঙা। পাশেই একটা বস্তি। সামনে দিয়ে গেছে নোংরা জলের ড্রেন। দুর্গন্ধ উঠেছে। ইস, এ কী বাড়ি!

বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে অমল জোরে জোরে ডাক দিল, 'মিহির। মিহির আছে?'

—'কে?' এক বিবাহিতা ভদ্রমহিলা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। মহিলার পরনে মলিন শাড়ি। তাঁর মুখের সঙ্গে মিহিরের মুখের খুব মিল। হয়তো মিহিরের মা।

—'মিহির আছে।' মহিলা জবাব দেন।

—'একটু ডেকে দিন-না।'

—'ওর জ্বর হয়েছে,' মৃদুস্বরে বললেন মহিলা।

—'কিন্তু আমার যে একটা বই নিয়েছে ও। খুব দরকার। আজই চাই।' কাতর কণ্ঠে বলে অমল।

—'তোমার নাম কী?'

—'অমল। অমল রায়। আমি ওর সঙ্গে পড়ি।'

একটুক্ষণ চুপ করে চেয়ে থেকে কোনো কথা না বলে মহিলা ভিতরে ঢুকে গেলেন।

অনিশ্চিত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে অমল। সত্যি ডেকে দেবেন তো? না ওর নাম শুনে মিহির দেখাই করবে না! তাহলে ওর মাকে নালিশ করবে। অমল একটু মুখচোরা ধরনের, কিন্তু আজ বেকায়দায় পড়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

নিঃশব্দে মিহির এসে দরজায় দাঁড়াল। আস্তে আস্তে বলল, 'ভেরি সরি অমল।' তার গায়ে চাদর জড়ানো। শুকনো মুখ।

—'এই নে'—মিহির অমলের গ্রামার বইখানা এগিয়ে দেয়।

ছোঁ মেরে বইটা টেনে নিয়ে অমল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। যাক বাবা!

—'জ্বর হয়ে গেল,' মিহির কাঁচুমাচুভাবে হাসে। 'কাল ঠিক কারো হাতে পাঠিয়ে দিতাম।'

বই ফেরত পেয়ে অমলের মনটা বেজায় হাল্কা। দেরি হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরেই খেলতে ছুটবে। 'আচ্ছা চলি', বলেই সে হাঁটা দিল।

মিহির আরও দুদিন স্কুল কামাই করল। এরপর থেকে অমল মিহিরকে একটু এড়িয়ে চলতে লাগল। মিহির সম্বন্ধে ওইরকম খারাপ সন্দেহ করার জন্য তার মনে লজ্জা জমেছে। তাছাড়া ভয়, ফের যদি ও বই চায়। মিহির অবশ্য বই নিয়ে কোনো কথাই তুলল না।

প্রায় দু সপ্তাহ বাদে। বুধবারে। সকাল দশটা নাগাদ অমল স্কুলের কাছাকাছি পৌঁছেছে। খানিক দূরে মিহর তখন স্কুলে ঢুকছে। গেটের পাশে দাঁড়িয়েছিল ওদের ক্লাসের জগবন্ধু। জগবন্ধু ভালো ফুটবল প্লেয়ার। ডানপিটে। তবে পড়াশুনায় সুবিধের নয়। কোনোরকমে পাস করে যায়।

জগবন্ধু মিহিরকে আটকাল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'কীরে বই এনেছিল?'

মিহির থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

—'দে।' জগবন্ধু হাত বাড়ায়।

—'এখন নয়। টিফিনের পর। প্লিজ।'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক।' মিহির ঘাড় নাড়ে।

স্কুল শুরুর ঘণ্টা পড়ল। অমলের ক্লাসঘর দোতলায়। জগবন্ধু তাড়াতাড়ি ক্লাসে চলল।

অমলের মনে কৌতূহল। মিহির আবার কী বই নিয়েছে? ঠিক সময়ে ফেরত দেয়নি মনে হচ্ছে। ক্লাসে জগবন্ধু বসে অন্য বেঞ্চে। তাই তখনই তাকে জিজ্ঞেস করা গেল না ব্যাপারটা। পরে অমল ভুলে গেল। বিষয়টা মনে পড়ল ফের টিফিনের সময়।

টিফিনের ঘণ্টা পড়লে ক্লাসে বসে ব্যাগ থেকে টিফিন বাক্স বার করল, টিফিন খেয়ে অমল একতলায় নামল। পাঁচিল ঘেরা মস্ত কমপাউন্ড। ছেলেরা হইচই করে খেলছে—লাট্টু, গুলি, এক্কাদোক্কা। মার্চের শেষাশেষি, তাই কিছু ছেলে ফটুবলও শুরু করে দিয়েছে রবারের বলে। গেটের বাইরে ফুচকা, চিনেবাদাম, আলুকাবলি, পেয়ারা ইত্যাদি নানা মুখরোচক খাবারের পসরা ঘিরে ছেলেদের ভিড়। হঠাৎ অমল দেখল, বারান্দার এক কোণে মেঝেতে উবু হয়ে বসে—মিহির কী জানি লিখছে।

গুটিগুটি এগিয়ে অমল উঁকি মারল। সামনে খোলা ইংরিজি গ্রামার, তাই থেকে মোটা একখানা খাতায় টুকছে মিহির।

পিছনে কেউ টের পেয়ে মাথা ঘোরাল মিহির। অমলকে দেখেই বসে ঝপ করে বন্ধ করে দিল বইটা।

—'কীরে, কপি করছিস?' একটু হেসে বলল অমল।

—'হুঁ।' মিহিরের মুখ থমথমে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল অন্যদিকে।

মিহিরের বিরক্ত ভাব দেখে অমল সরে গেল। মনে মনে সে বেশ আহত। কপি করা দেখে ফেলেছি বলে কী এমন দোষ করেছি?

স্কুলের পর অমল জগবন্ধুর সঙ্গ ধরল। যেতে যেতে বলল, 'তোর কী বই নিয়েছিল মিহির?'

—'ইংরিজি গ্রামার বই। দেখ-না, সোমবার বলল, তোর ইংরিজি গ্রামার বইখানা একদিনের জন্যে দিবি? ফেরত দেব। আমার বইটা পাচ্ছি না খুঁজে। আজকের পড়াটা একবার দেখে নিতাম। তা দিলাম। নেহাত ওর খাতা দেখে মাঝে মাঝে অঙ্কের হোমটাস্ক টুকে নিই, তাই। তা গতকাল আনল না বইটা। আচ্ছাসে কড়কে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, কাল না পেলে মজা দেখাব। তা ভয়ে আজ ঠিক এনেছে।'

অমল বলল, 'মিহির বোধহয় ওর নিজের ইংরিজি গ্রামারটা হারিয়ে ফেলেছে। টিফিনের সময় দেখলাম, তোর বই থেকে খাতায় টুকছে। আমার কাছ থেকেও নিয়েছিল ইংরিজি গ্রামার বই। একদিনের বদলে তিনদিন রেখে দিয়েছিল। শেষে ওর বাড়ি গিয়ে নিয়ে এসেছি। নিশ্চয় আমারটা থেকেও কপি করেছে, তাই দেরি করছিল।'

বিজয় যাচ্ছিল তাদের পাশে পাশে। বিজয় লেখাপড়ায় ভালো। মিহিরের সঙ্গে পড়াশুনায় তার রেষারেষি। তবে এইট থেকে নাইনে উঠতে সে মিহিরের কাছে হেরে গেছে। কারণ ফোর্থ হয়েছে। বিজয় ঝাঁজের সঙ্গে বলে উঠল, 'মিহির মোটেই ওর ইংরিজি গ্রামার হারায়নি। আসলে ও বইটা কেনেইনি। আমি তো ওর পাশে বসি। বছরের গোড়া থেকে দেখছি, একদিনও ইংরিজি গ্রামার বই আনেনি। হয়তো বই কেনার পয়সা সিনেমা-টিনেমা দেখে উড়িয়েছে। এখন এর-ওর কাছ থেকে নিয়ে টুকে কাজ চালাবার ধান্দায়। নিজের বাড়িতে অমনি বানিয়ে বলবে—খুঁজে পাচ্ছি না। হারিয়ে ফেলেছি। বিজয়ের কথা শোনামাত্র অমলের মনে হয়—তাই হবে। মিহির বই কেনেইনি। তবে সত্যি কি ও বই কেনার টাকা খরচা করে ফেলেছে? না কেনার পয়সা জোটে নি? তার মনে ভেসে ওঠে মিহিরের বাড়ি। সেই দীন দরিদ্র আবাস। ওর মায়ের ম্লান রূপ।

অমল মাথা নামিয়ে চলে যায়।

দুদিন বাদে। শুক্রবার। ছুটির পর অমল স্কুল থেকে বেরিয়েই মিহিরকে ধরল। সোজা জিজ্ঞেস করল, 'তোর ইংরিজি গ্রামার বই থেকে টোকা শেষ হয়ে গেছে?'

মিহির থতমত খেয়ে মাথা নাড়ল।

—'আর কতখানি বাকি?'

—'আরও প্রায় চার পাতা। মানে টার্মিনাল পরীক্ষায় যদ্দুর হবে।' মিহির হতাশভাবে বলে।

—'একদিনের মধ্যে ওটা কপি করতে পারবি?'

—'হ্যাঁ'।

—'মানে আজ যদি দিই কাল ঠিক ফেরত দিবি বইটা?' বলতে বলতে অমল তার ব্যাগ থেকে গ্রামর বইখানা বের করে।

মিহিরের চোখ চকচক করে ওঠে। মুখ দিয়ে তার কথা বেরয় না।

—'নে'। মিহিরের হাতে বইটা গুঁজে দিয়ে অমল উল্টো দিকে রওনা দিল।

—'শোন।'

মিহিরের ডাকে অমল ফিরে দাঁড়ায়।

—'চাঁদের পাহাড় পড়েছিস? বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা।'

—'নাঃ'।

—'দারুণ অ্যাডভেঞ্চার। পড়ে দিস।' মিহির তার ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে এগিয়ে দিল।

—'তোর পড়া হয়ে গেছে?'

—'না। টিফিনে পড়েছি আজ বাইশ পাতা। উঃ একসেলেন্ট। লাইব্রেরির বই। কাল ফেরত দিস ভাই। উঁহু, একদিনে শেষ করতে পারবি না বোধহয়। ঠিক আছে, সোমবার আনিস।'

মিহিরের মুখে লাজুক মিষ্টি হাসি। যেন ভাবে বোঝাতে চায়—একটুও কি শোধবোধ হল না?

[শারদীয় ১৩৯০]

ছানা

বোলপুর-দুর্গাপুর লাইনের বাস। চলেছে দুর্গাপুরের দিকে।

বাসে ভিড় বেশ। ছাদের অর্ধেকটা প্রায় ভর্তি। খোলের ভিতরে বসার আসন একটিও খালি নেই। অনেক প্যাসেঞ্জার দাঁড়িয়ে। ধরে দাঁড়াবার লম্বা হাতল দুটো পাশাপাশি মুঠোয় হাউসফুল। গায়ে গায়ে ঠেসে দুই লাইনে পিঠোপিঠি খাড়া যাত্রীদল। সিটের কোনা খামচে দাঁড়াবার উপায়গুলিও প্রায় বুক্‌ড।

শরতের শুরু। সকাল দশটা নাগাদ। রোদ দিব্যি চড়া।

বড় মোট-ঘাট সঙ্গে থাকলে যাত্রীদের ব্যবস্থা বাসের ছাদে। তখন তারা আর পাশের দরজা দিয়ে বাসের পেটে সেঁধুবার চেষ্টাই করে না। পেছনের সিঁড়ি বেয়ে সোজা উঠে যায়। উপরের টানে ও নীচের ঠেলায় মানুষসমেত হরেকরকম মাল পাচার হয় বাসের মাথায়।

বাস এগোয়। ভিড় ও গরম বাড়ে। যাত্রীদের অস্বস্তি ও মেজাজ চড়ে।

এক নিরীহদর্শন ধুতি ও শার্ট গায়ে বছর চল্লিশের অফিসযাত্রী আপত্তি তোলেন — 'ও মশাই, পা-টা সরান। আমার চটির ওপর আপনার জুতো।'

— 'সরি, নো উপায়! ভিড়ের বাসে অমনি হয়।' — কানঢাকা হাপ বাবরিচুলো, ঝুলো গোঁফ, পরনে নীলচে চোঙা প্যান্ট, লাল হলুদ ডোরা কাটা স্পোর্টস গেঞ্জি এবং ছুঁচলো কালো জুতোর মালিক মাস্তান টাইপ যুবকটি উত্তর দেয়।

মনে দপ করে ওঠা আঁচ সবটা বাইরে প্রকাশে তেমন ভরসা হয় না। তবু অভিযোগকারী ক্ষুব্ধস্বরে জানালেন, 'ভিড় বলে কি যা খুশি করবেন? মাথায় পা রাখবেন?'

— 'আপনার মাথাটা ওখানে থাকলে তাই রাখতে হত', নিস্পৃহ জবাব যুবকের। 'আর আপনার ছাতাটা যে দুবার আমার পাঁজরে খোঁচা মারল? নেহাত ভিড় বলে বলিনি কিছু। তা সরাচ্ছি পা। কিন্তু যদি আপনার ছাতা ফের গায়ে ঠেকে, ওটাকে ছুড়ে ফেলে দেব বাইরে।'

ছত্রধারী আর কথা বাড়াননি বেশি লোকসানের ভয়ে। বরং ছাতাটা একটু আঁকড়ে টেনে নেন কাছে। মাস্তান টাইপ ইঞ্চিখানেক জুতো সরায় কৃপাবশে।

পানাগড় এল। এখানে বাস মিনিট দশেক জিরোয়।

প্যাসেঞ্জারদের কিছু ওঠানামা হয়। বসার জায়গা খালি থাকে না। তবে হাত-পা মেলে

দাঁড়াবার কিঞ্চিৎ সুবিধে মিলল।

একজন লোক বাসের সামনের দরজার কাছে হাজির হল মাথায় একটা টিন বয়ে। সে নামাল টিনটা। ধপ করে মাটিতে রাখল। শব্দে মালুম হল ভিতরে ভারী কিছু রয়েছে।

লোকটি মাঝবয়সি। জোয়ান। পরনে হাতওলা গেঞ্জি ও খাটো ধুতি। কাঁধের গামছা দিয়ে সে মুখের ঘাম মুছতে থাকে।

টিনটা কেরোসিনের। চকচকে গা। টিনের দুপাশে দুটো লোহার শিকের হাতল ঝালাই করে লাগানো। টিনের মাথায় একখণ্ড ঈষৎ হলদেটে মোটা কাপড় টান করে পাতা।

বাসের কন্ডাক্টার টিনটা ভালো মতন দেখে নিয়ে বলল — 'ছানা?'

— 'হ্যাঁ।' লোকটি ঘাড় নাড়ে।

— 'মালের ভাড়া লাগবে।' কন্ডাক্টারের ঘোষণা।

ছানাওলা অনুনয়ের দৃষ্টি হানে কন্ডাক্টারের মন ভেজাবার আশায়। যদি ভাড়াটা কমে বা মাপ হয়। তবে সে মুখে কোনো কথা বলে না।

কন্ডাক্টার কিন্তু তার দিকে আর ভ্রূক্ষেপ না করে বিড়ি ধরায়।

ছানাওলা এবার দুহাতে টিনের দুই হাতল পাকড়ে টেনে টিনটা তুলল সামনের দরজার পাদানিতে। অনুরোধ জানায় প্যাসেঞ্জারদের — 'দাদা একটু সরে। দরজাটা ছেড়ে দিন।'

— 'এখানে মাল কেন? ছাদে যাও।' আপত্তি ওঠে।

— 'এই একটু বাদেই নেবে যাব।' ছানাওলা সাফাই গায়।

— 'ছানা ছলকাবে।' আরেক যাত্রী সন্ত্রস্ত।

— 'না স্যার। ঠাসা মাল।' ছানাওলা অভয় দেয়।

ছানাওলা টিনটা টেনেটুনে নিয়ে গিয়ে রাখল ড্রাইভারের পেছনে কাঠের পার্টিশানের গায়ে। নিজে দাঁড়ায় পাশে।

ছানাওলার ভাগ্য ভালো। হঠাৎ কাছে এক সিটেবসা যাত্রী জানলা দিয়ে একটা বাসকে আসতে দেখে — 'আরে এক্সপ্রেস এসে গেছে' — বলেই তড়াক করে উঠে দুদ্দাড় করে নেমে গেল বাস থেকে। ছানাওলা তার শূন্য সিট দখল করল।

বারকয়েক জোরে জোরে হর্ন মেরে বাস ছাড়ল।

শেষ সময়ে দু-তিনজন যাত্রী উঠল। তারা অবশ্য বসতে পেল না। তাদের একজন দাঁড়াল ছানাওলার ঠিক সামনে। ফলে ছানার টিন মালিকের একটু চোখের আড়াল হয়ে গেল।

পরের স্টপেজে বাসে উঠলেন এক বৃদ্ধ।

বৃদ্ধ নেহাতই বেঁটে ও ক্ষীণকায়। তার গায়ে ঢোলাহাতা আধময়লা পাঞ্জাবি ও ধুতি। পায়ে চপ্পল। শুকনো নারকেলের মতন মুখখানা। আদ্যিকালের গোল ফ্রেমের চশমাটা নাকের ডগায় ঝুলছে। তাঁর হাতে একটা বড়সড় পুঁটলি। বাইরে থেকে দেখে মনে হল পুঁটলিতে পেয়ারা জাতীয় কোনো ফল রয়েছে।

বৃদ্ধ বাসে উঠে মুশকিলে পড়লেন।

প্রথমে তিনি উঁকি মেরে মেরে খোঁজ নিলেন — 'একটু বসার জায়গা হবে?'

সিটে বসা প্যাসেঞ্জার সবারই অন্যমনস্ক ভাব। কেউ যেন শুনতেই পেল না সেই আবেদন।

বৃদ্ধ বুঝলেন যে বসার আশা নেই।

দাঁড়িয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে বেশ অসুবিধে। এক হাতে ভারী পুঁটলিটা। খাটো মানুষটির পক্ষে রোগা অপর হাতে রড আঁকড়ে সোজা হয়ে থাকা বিলক্ষণ কঠিন কাজ। রড ভালো মতো নাগালই পাচ্ছেন না।

লোকাল বাস ঘন ঘন থামছে চলছে। হঠাৎ ঘ্যাঁচ — ব্রেক। আবার হ্যাঁচকা মেরে এগোয়। ফের থামে। এই অনবরত ঝাঁকুনির মধ্যে শক্ত মুঠোয় কিছু না ধরে খাড়া থাকা একমাত্র কন্ডাক্টারদের পক্ষেই সম্ভব। প্যাসেঞ্জার হলে টাল খাবেই।

বৃদ্ধ বারকয়েক রড ফসকে অন্য প্যাসেঞ্জারদের গায়ে গোত্তা খেলেন।

বিরক্তিসূচক মন্তব্য শোনা যায় — 'আঃ দাদু সোজা হয়ে দাঁড়ান।'

— 'ওঃ পুঁটলি সামলে।'

বৃদ্ধ অসহায় চোখে তাকান। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল ড্রাইভারের পেছনে পার্টিশানের গায়ে একটি নিরাপদ আশ্রয়।

যেখানে ছানার টিন রাখা হয়েছে তার এক পাশে প্যাসেঞ্জারদের সিটের দিকে পার্টিশানে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একজন যাত্রী। তিনি বোধহয় টিনটির পরিচয় জানেন। বলেছে বটে, ঠাসা মাল, ছলকাবে না। তবু ভরসা কী? তাই লোকটি টিন থেকে একটু তফাতেই রয়েছেন।

টিনের অপর পাশে, ড্রাইভারের সিটে যাওয়ার পথের দিকে, পার্টিশানে সামান্য একটু জায়গা খালি। বৃদ্ধটি গুটিগুটি গিয়ে সেই বিঘতখানেক ফাঁকা পার্টিশানে কোমর ঠেস দিয়ে হাঁপ ছাড়লেন।

ব্যাপারটা পুরোপুরি আরামদায়ক নয় যদিও। বাসের ঝাঁকুনিতে কখনো কখনো বৃদ্ধের হাঁটুর কাছে টিনের ধারটা ঘসা খাচ্ছে। তবু অন্যদের কটু মন্তব্য শুনতে হবে না, এই বাঁচোয়া।

পায়ের কাছে একটা কেরোসিনের টিন। ঝাঁকুনিতেও নটনড়নচড়ন। বৃদ্ধের নজর মাঝে মাঝেই টিনটার ওপর যায়।

ওপরে মোটামুটি পরিষ্কার একটি টানটান ন্যাকড়া পাতা। তারপর নীচে টিনটা মাথাওলা না মাথাকাটা বোঝার উপায় নেই। বৃদ্ধ একবার তাঁর হাতের পুঁটুলিটা টিনের ওপর কাপড়ে রাখতে গিয়েও রাখলেন না। তাঁর মাথায় অন্য এক ইচ্ছের উদয় হল।

বৃদ্ধ নীচু হয়ে টিনের পাশটায় টিপেটুপে ঠেলে দেখলেন। মনে হল, ভেতরের বস্তুটি বেশ জমাট ওজনদার। তরল হালকা কিছু নয়।

বৃদ্ধ মন স্থির করে ফেললেন। ভিড়ের বাসে উপরের শক্তপোক্ত মালের ওপর বসা কিছু অপরাধ নয়। সুতরাং তিনি টিনে পাতা কাপড়ের ওপর জুত করে চেপে বসে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পশ্চাদ্ভাগ ভুস করে ঢুকে গেল টিনের ভেতর ছানা ভেদ করে অনেকখানি, একেবারে খাপে খাপে আটকে গেলেন টিনে।

— 'অ্যাঁক!'

বৃদ্ধের গলা থেকে আর্তনাদটা বেরুনোমাত্র অন্য প্যাসেঞ্জারদের চোখ পড়ল তাঁর ওপর। পরক্ষণেই হই হই কাণ্ড।

ছানাওলা সামনের লোকটির আড়াল কাটিয়ে গলা বাড়িয়েই লাফিয়ে উঠল — 'হায় হায়,

সর্বনাশ হয়ে গেল।'

— 'চোপ।' বহুকণ্ঠ একসঙ্গে ধমকে ওঠে।

— 'ওঠানোর সময় খেয়াল ছিল না?'

— 'এই কন্ডাক্টার, এখানে ছানা রাখতে দিয়েছ কেন?'

ছানাওলা ও কন্ডাক্টারের মুখ চুন।

ফাঁদে পড়া বৃদ্ধ তখন মরিয়া হয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন টিন থেকে। কিন্তু পারছেন না।

তাঁর কোমর অবধি টিনে আটকা। পা দুটো লগবগ করে ঝুলছে। হাতের পুঁটুলিটা অবশ্য ছাড়েননি। অন্য হাতের চাড়ে টিন থেকে ওঠার বৃথা চেষ্টা চালাচ্ছেন বারবার। তাতে যেন আরও সেঁটে বসে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে প্রায় খসে পড়া চশমাটা নাকের ওপর ঠেলে তুলে দিচ্ছেন। কাতর চোখে চাইছেন সবার পানে বুঝি বা সাহায্যের আশায়। টিনের গা বেয়ে উপচে পড়া ঘন ছানা গড়িয়ে নামছে।

দু-তিনজন প্যাসেঞ্জার বৃদ্ধের হাত ও কাঁধ ধরে টান দিলেন তবে কাজ হল না। টিনসুদ্ধ বৃদ্ধ একটু সরলেন মাত্র।

— 'দেখি দেখি মোসাই সরুন। সব এলেম বোঝা গেছে। এই সামান্য প্রবলেম' — এগিয়ে আসে সেই চোঙা প্যান্ট, ডোরা গেঞ্জি, ছুঁচোল জুতোধারী মস্তান টাইপ যুবক। সে ইতিমধ্যে একটা সিটে বসতে পেয়েছিল। বসে বসে দেখছিল কেসটা। এবার নিজের হিম্মত দেখাতে এল।

চোঙাপ্যান্ট গম্ভীরভাবে টিনের একধারে ডান পা চাপিয়ে বৃদ্ধের দু বগলের ভেতর দিয়ে দু হাত গলিয়ে মারল এক হাঁচকা টান।

ব্যস, টিনমুক্ত হয়ে উঠে এলেন বৃদ্ধ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন বিপর্যয়।

টিনের কানায় ভর দেওয়া উদ্ধারকর্তার জুতো গেল হড়কে। ফলে তার পাটা ডেবে গেল টিনের ভেতর ছানায়।

বৃদ্ধ উদ্ধারের আনন্দরোল জাগতে-না-জাগতেই প্রায় বিষম খেয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় গোটা বাস। সব্বাই থ।

মুখ ভেটকে সন্তর্পণে পা-খানা টিন থেকে বের করে আনে যুবক। ডান পা হাঁটু অবধি ছানায় মাখামাখি। প্যান্টের ফাঁকে, জুতোর খাঁজে ঢুকেছে ছানা। নীল প্যান্ট ও কালো জুতোয় ছোপ ছোপ ধবধবে ছানা লেগে দারুণ খোলতাই হয়েছে। এমনকী সেই ছানায় ডোবা বৃদ্ধ অবধি নিজের দুর্দশা ভুলে হাঁ করে চেয়ে থাকেন। কাঁচা ছানার গন্ধে ভুরভুর করছে বাস।

যুবক ছানামাখা পা-খানা যথাসম্ভব দূরে রাখে নিজের বাকি দেহ থেকে। অন্য প্যাসেঞ্জাররাও যতটা পারে তফাতে সরে যায়। ওই পায়ের ছোঁয়া বাঁচিয়ে।

— 'এঃ হে' — ছানাওয়ালার গলা দিয়ে জোর আক্ষেপটা তার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই বেরিয়ে যায়।

মাস্তানটি আওয়াজ লক্ষ্য করে ঘাড় ঘুরিয়ে ছানাওলাকে দেখেই গর্জে ওঠে — 'স্যাট আপ।'

ছানাওলা অমনি মুখ নীচু করে চুপ।

তার পাশের যাত্রীটি সহানুভূতির সুরে চাপা গলায় বলল, 'ইস কী হয়ে গেল!'

ছানাওয়ালা ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নীচুস্বরে বিড়বিড় করে, 'আরও যে কী আছে হায় বরাতে?'

হট্টগোল শুরু হতেই বাস থেমে গিছল। ড্রাইভার ফিরে বসে মন দিয়ে দেখছিল ব্যাপারখানা। এবার সে জিজ্ঞেস করল, 'ছানা নামবে কোথায়?'

উত্তর হল — 'মুচিপাড়া।'

বাস স্টার্ট দিল এবং ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। বোধহয় চটপট মুচিপাড়া পৌঁছনোর তাগিদে। ওই আপদটাকে যত তাড়াতাড়ি বিদেয় করা যায়।

ছানামাখা যুবক দু পা ফাঁক করে রড আঁকড়ে সেইখানে খাড়া দাঁড়িয়ে। জানলার পাশে নিজের ফেলে আসা সিটের দিকে বারকতক চাইল বটে কিন্তু ফিরে গেল না। কারণ বোধহয় ভেবে দেখল যে তাহলে পায়ে পায়ে ঠেকিয়ে বসতে হবে। ফলে অন্য পায়ের প্যান্টটারও দফারফা নিশ্চিত।

ফাঁকা সিটটা আর এক যাত্রী তখন সসংকোচে দখল নিল।

ছানার টিনে আটকা পড়া বৃদ্ধ এতক্ষণ পার্টিশানের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়েছিলেন। কী কারণে, বোধহয় কতদুর এলেন দেখার উদ্দেশ্যে উল্টোমুখো হওয়ার চেষ্টা করতেই অন্য প্যাসেঞ্জাররা হাঁ হাঁ করে উঠল — 'একদম পেছনে ফিরবেন না দাদু। ঘুরে যান। ঘুরে যান।'

বৃদ্ধ ঘাবড়ে গিয়ে তক্ষুনি আগের ভঙ্গিতে বহাল হলেন।

প্যাসেঞ্জারদের আপত্তি করার বিলক্ষণ কারণ ছিল। বৃদ্ধের পেছন দিকে ধুতি ও পাঞ্জাবির অনেকখানি পিঠের আধাআধি থেকে প্রায় হাঁটু অবধি ছানা লেপা। সুতরাং তার পিছনদিকের স্পর্শ বিপজ্জনক বইকি।

— 'খুক খুক' — চাপা হাসির আওয়াজ যেন?

ছানামাখা-পা যুবক ফিরে দেখল লেডিজ সিটে বসা দুই তরুণী তারই পানে চেয়ে মুখে আঁচল দিয়ে ফুলে ফুলে উঠছে। মাস্তানটির ক্রুদ্ধ দৃষ্টি পড়তেই তারা গোটা মুখ কাপড়ে ঢেকে ফেলে।

যুবক ঘাড় ফেরাল। মেয়ে দুটিকে কিছু বলল না। তবে আশেপাশের পুরুষ প্যাসেঞ্জারদের মুখে কটমটিয়ে নজর বোলায় একবার। ভাবখানা যেন — লেডিজদের ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু বেটাছেলে কেউ দাঁত বের করুক, বুঝবে ঠেলা।

পুরুষরা অবশ্য কেউ তেমন আস্পর্ধা দেখাল না। বেশিরভাগেরই বিমূঢ় ভাব তখনও কাটেনি। মজা উপভোগের মতন মনের অবস্থা নয়।

কিছুক্ষণ বাদে ফের সেই সন্দেহজনক খুক খুক শব্দ।

এবার যুবক আর ঘাড় ফেরায় না মেয়ে দুটির পানে। তবে সে আর এক প্রস্থ কড়া চোখে জরিপ করে নেয় পুরুষ যাত্রীদের হাবভাব।

ড্রাইভারের পাশে তিন সিটের ডগায় যে ভদ্রলোক বসেছিলেন, তিনি ছানামাখা-পা যুবককে জিজ্ঞেস করলেন ডেকে, 'কদ্দুর যাবেন?'

উত্তর হয় — 'স্টেশন।'

— 'আমার জায়গায় বসুন ভাই, অসুবিধে হবে না। আমি একটু পরেই নেমে যাব।' ভদ্রলোক উঠে পড়লেন।

প্রস্তাবটি যুবকের মনে ধরল। সে দুপায়ের মধ্যে ফাঁক রেখে ডান পা টেনে টেনে গিয়ে বসল ওই সিটে। বাঁ পা মুড়ে ছানামাখা ঠ্যাংখানা ছড়িয়ে দিল। অতঃপর গম্ভীর বদনে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল সিধে।

সিটের অন্য দুই যাত্রী পিছিয়ে গেল যতটা সম্ভব। আর ড্রাইভার ছানার গন্ধে একবার নাক কুঁচকালো বটে তবে আপত্তি জানাল না।

মুচিপাড়া এসে পড়ল।

নামল ছানার টিন। ছানায় পড়া সেই বৃদ্ধও নামলেন সেখানে। অতি সাবধানে। সবার গা বাঁচিয়ে।

— 'ছানাটা নষ্ট হয়ে গেল তো?' লেডিজ সিটের জানলা দিয়ে একটা বউ সমবেদনা জানাল।

— 'নাঃ, নষ্ট হবে কেন? তবে পোয়া তিনেক মাল লোকসান হল।' ছানাওলা জবাব দেয়।

— 'ও ছানা দিয়ে কী হবে?' বউটি কৌতূহলী।

উত্তর এল — 'রসগোল্লা।'

— 'অ্যাঁ সে কী!'

— 'আজ্ঞে হ্যাঁ। গরম রসে পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে।' একগাল হেসে জানায় ছানাওলা।

[১৯৮৮ সন্দেশ, শারদীয়া]

বন্দি ডাবু

তপনবাবুর স্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, 'সর্বনাশ হয়েছে। ডাবু' — তপনবাবু চমকে ফিরে বললেন। 'অ্যাঁ, কী খেয়েছে?'

— 'না, না, খায়নি কিছু' গিন্নি মাথা নাড়েন, 'ডাবু আটকে পড়েছে কাকাবাবুর ঘরে।'

— 'কী করে?' তপনবাবু ভুরু কোঁচকান।

গিন্নি বললেন, 'একটু আগে দেখলাম যে কাকাবাবু বেরিয়ে গেলেন দরজায় তালা দিয়ে। এখন ওঁর শোবার ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখি, ডাবু ওই ঘরের ভিতরে। মেঝেতে বসে কী জানি খাচ্ছে। আমি নজর করছি দেখে, চট করে হাতটা কোলে লুকোল।'

— 'হুম', তপনবাবু মাথা ঝাঁকান, 'কী খাচ্ছে দেখতে পেলে?'

— 'না। তা সে যাই হোক। ও এখন বেরুবে কী করে? যদি বুঝতে পারে আটকে পড়েছে, দরজা বন্ধ, বেরুতে পারবে না, বাড়িতে আর কেউ নেই, ভীষণ ভয় পেয়ে যাবে। কী কাণ্ড যে হবে? ওঃ!' ডাবুর মায়ের চোখে প্রায় জল এসে যায়।

— 'আমাদের দিক থেকে ভিতরের দরজাটা?' জিজ্ঞেস করেন তপনবাবু।

— 'ছিটকিনি দেওয়া, ওপাশ থেকে। আমি ঠেলে দেখেছি।' গিন্নি জানালেন।

— 'হুম।' তপনবাবু মাথা ঝাঁকালেন। তারপর অভয় দিলেন, 'আরে অত ভাববার কী আছে? কাকাবাবু, এখনি এসে পড়বেন?'

— 'এখুনি? হ্যাঁ, তুমি খুব জান। একা হয়ে এখন তো উনি উড়ছেন। কাল কখন বাড়ি ফিরেছেন জান? রাত আটটায়। আজ যদি অমনি ফেরেন? এই এখন সাড়ে পাঁচটা থেকে আড়াই ঘণ্টা। ডাবু ও বাড়িতে একা আটকে থাকলে? উঃ!'

ডাবুর দিদি, ছয় বছরের বিনি এই ঘরেই ছিল। এতক্ষণ মা-বাবার কথা গিলছিল। সে গালে হাত দিয়ে চোখ বড় বড় করে বলে উঠল, 'ওমা কী হবে গো?'

'কিস্‌সু হবে না' তপনবাবু ধমকে উঠলেন বিনিকে। তারপর স্ত্রীকে বললেন, 'আহা অত উতলা হচ্ছ কেন? সব দিন কি আর দেরি করবেন? পাড়ায় একটু খুঁজে দেখো। দত্তবাড়ি কিংবা বসুমশায়ের কাছে। পেয়ে যাবে। চাবি এনে, তালাটা খুলে শ্রীমানকে খালাস করে দাও। সমস্যা মিটে যাবে।'

তপনবাবুর স্ত্রী রাগী চোখে একবার তাকালেন স্বামীর দিকে। বোধহয় ইচ্ছে ছিল যে তপনবাবুই উঠে খুঁজে আনুক কাকাবাবুকে। কিন্তু আড্ডা এবং বন্ধুকে ছেড়ে কর্তার ওঠার লক্ষণ নেই দেখে ভারি বিরক্ত হয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'বেশ, আমি যাচ্ছি। তুমি একটু নজর রেখো ডাবুকে।'

তপনবাবু গিন্নিকে বললেন, 'দেখো, আবার কাকাবাবুর সঙ্গে রাগারাগি কোরো না। ওঁর কী দোষ? ডাবুটা মহা বিচ্ছু। উনি হয়তো জানতেই পারেননি যে ডাবু ওদিকে ঢুকেছে। কিংবা ভেবেছেন, বেরিয়ে গেছে। ডাবুটার জ্বালায় দেখছি ভিতরের দরজাটা বন্ধ রাখতে হবে।'

স্ত্রী দুপদাপ করে চলে যেতেই তপনবাবু বন্ধুকে বললেন, 'বসো হে, আসছি এক্ষুনি।' তিনি ঘর থেকে বাইরে গেলেন।

অনাথবাবু হাঁ হয়ে শুনছিলেন সব। তিনি প্রায়ই গল্পগুজব করতে আসেন তপনবাবুর কাছে। তপনবাবুর দুটি সন্তান। বড়টি মেয়ে বিনি। ছোট ছেলে ডাবুর বয়স বছর তিনেক।

কাকাবাবু মানুষটি তপনবাবুর বাড়িওলা। বয়স বছর পঁচাত্তর। তাঁর বাড়িটা একতলা। মোট চারটে শোবার ঘর। সামনের অংশে বাড়ির আধখানায় থাকেন কাকাবাবু ওরফে অমল মিত্র এবং তাঁর স্ত্রী। পিছনের বাকি অংশটা ভাড়া নিয়েছেন তপনবাবু। দুই পরিবারের বাইরে যাওয়া-আসার পথ ভিন্ন ভিন্ন। অমলবাবুদের পথ সামনে একটা দরজা দিয়ে। আর ভাড়াটেদের পথ পিছনের দরজা দিয়ে।

মিনিটখানেক বাদেই ফিরে এলেন তপনবাবু। ধপ করে চেয়ারে বসে, কাপের চায়ে শেষ চুমুক মেরে বিড়বিড় করলেন, 'যত্ত ঝঞ্ঝাট।' তারপর তিনি মেয়েকে বললেন, 'যা তো বিনি, আড়াল থেকে চোখ রাখ ডাবুর ওপর। বেশি কথাটথা বলিসনি। বেশ নিজের মনেই আছে।'

বিনি চলে যেতেই অনাথবাবু বললেন, 'কী ব্যাপার?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে তপনবাবু বললেন — 'আর বল কেন, আমার পুত্রটি একটি আস্ত বাঁদর। কাকাবাবুর অংশ আর আমাদের দিকটার মাঝে একটা দরজা আছে। বেশিরভাগ সময় খোলাই থাকে সেটা। মানে ভেজানো থাকে। ওই পথে গিয়ে বুড়োবুড়ির খোঁজখবর নিই মাঝে মাঝে। ওঁরাও ডাকেন দরকারে। দুজনেই ভারি ভালো মানুষ। তা আমার শ্রীমানটি যখন-তখন টুক করে ওই দরজা ঠেলে খুলে ওধারে সেঁধোয়। কাকাবাবু কাকিমা অর্থাৎ কিনা ডাবুর দাদু দিদার কাছ থেকে নানান মুখরোচক খাদ্য জোটে যে। আর ওঁদের বাড়িময় ঘুরঘুর করে এটাসেটা ঘাঁটে মনের আনন্দে। বারণ করি। শোনে না।'

— 'আসলে কাকাবাবুরা ডাবুকে খুব ভালোবাসেন। কাকাবাবু এমনিতে খুব গুছোনে মানুষ। ঘর টিপটাপ রাখেন। কিন্তু ওই ডাবুকে কিছু বলেন না। কতদিন বলেছি, অত লাই দেবেন না। এখন বোঝ ঠ্যালা।'

— 'আরে হয়েছেটা কী, তাই বলো'? অনাথবাবু তাড়া দেন।

ফোঁস করে ফের একটা নিশ্বাস ফেলে তপনবাবু জানালেন, কাকিমা দিন সাতেকের জন্য ভাইয়ের বাড়ি গেছেন। কাকাবাবু একা রয়েছেন। বৃদ্ধের শরীর এখনও দিব্যি শক্ত। সকাল বিকেল বেড়ান। তবে চোখের দৃষ্টিটা খারাপ হয়ে গেছে। বেশ কম দেখেন। ডাবু কখন যে ওদিকে ঢুকেছিল, আছে না বেরিয়ে গেছে খেয়াল করেননি। বাইরের দরজায় তালা দিয়ে

বেড়াতে বেরিয়ে গেছেন। আবার মাঝের দরজাটাও ছিটকিনি দিয়ে গেছেন। হয়তো ডাবুর ভয়েই। অর্থাৎ শ্রীমান ডাবু এখন ওপাশটায় বন্দি।'

— 'অ্যাঁ, ছেলেটা করছে কী?'

— 'দেখলাম দিব্যি আছে। কাকাবাবুর ঘরের নীচু তাক থেকে টান মেরে ফলের টুকরিটা মেঝেতে ফেলেছে। একটা সিঙ্গাপুরি কলা ছাড়িয়ে বসে খাচ্ছে এবং আরও দুটো আস্ত সিঙ্গাপুরি কলা খোসা ছাড়ানোর অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে।'

— 'অ্যাঁ!' ডাবুর কীর্তি শুনে অনাথবাবু থ।

তপনবাবু বলে চলেন, 'দেখলাম, দুটো আপেল মেঝেতে গড়াচ্ছে। আর একগোছা আঙুর। কলার সাধ মিটে গেলে বোধহয় ওগুলো চাখবে। আমায় দেখে কলাসুদ্ধু হাতটা পেটের কাছে আড়াল করে মিচকে হাসল। ভেবেছে, দাদু কোথাও গেছে। এখুনি আসবে। এই ফাঁকে যা পারি সাবড়ে নিই। টের পায়নি যে আটকে পড়েছে। দাদু যে কখন ফিরবে ঠিক নেই। যদি তা বুঝতে পারে তাহলেই ঝকমারি। কুরুক্ষেত্র করবে। যাকগে, কাকাবাবু কাছেই আছেন। এই এসে পড়বেন।'

মিনিট দশেক কেটেছে।

তপনবাবু মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখছেন বাইরে, কাকাবাবু ফিরলেন কিনা। বিনি দৌড়ে এসে জানাল, 'বাবা, ডাবু চানাচুর খাচ্ছে।'

— 'চানাচুর! পেল কোত্থেকে?' তপনবাবু অবাক।

বিনি বলল, 'নীচের তাকে ছিল শিশিতে। ডাবু কলাটা আধখানা খেয়ে ফেলে দিল। তারপর কটা আঙুর খেল। তারপর চানাচুরের শিশিটা নামিয়ে উপুড় করে সবটা দাদুর বিছানায় ঢেলেছে। একমুঠো খাচ্ছিল। আমি চাইলাম। দিল না।'

বোঝা গেল, এই ভাগ না দেওয়ার কারণেই ভায়ের ওপর বিনি বেজায় চটেছে। তাই চটপট নালিশ করতে এসেছে।

তপনবাবু বিনিকে বললেন, 'আচ্ছা তুই যা! দেখ কী করে। তবে বলিসনি কিছু।'

বিনি চলে যেতেই তপনবাবু হতাশ সুরে বললেন, 'ডোবাল।'

তারপরেই তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন, 'ওঘরে চানাচুর এল কী করে? কাকাবাবুর ভাজাভুজি খাওয়া বারণ। কাকিমা ওসব বাজারের খাবার মোটে ঢুকতে দেন না। বুঝেছি।'

'কী?' অনাথবাবুর কৌতূহল বাড়ে। কেসটা বেশ জমেছে।

তপনবাবু নিজের মনেই বকে যান, 'তাই কাকাবাবু আমাদের সাথে খেতে চাইলেন না। কাকিমাকে চলে যেতে বললাম, আপনি একা থাকবেন। বরং আমাদের কাছে খান কটা দিন। তা উনি বললেন, কোনো অসুবিধে হবে না। মোক্ষদা রান্না করবে। দুপুরে আমায় খেতে দেবে। রাতে খাই শুধু দুধ আর হাত-রুটি গুড় দিয়ে। রুটি তো মোক্ষদা বানিয়ে রেখে যাবে। দুধটা শুধু গরম করে নেব। ব্যস, মিটে গেল। টিফিনটা নিজেই বানাব। পাঁউরুটি, টোস্ট, মাখন, জেলি, কলা। কোনো ব্যাপারই নয়। তোমাদের কাকিমা অবশ্য মোক্ষদাকে বলে গেছেন আমার সকালের টিফিনটা বানিয়ে দিতে। আমি না করে দিয়েছি। দুবেলা দুকাপ চা বানিয়ে দিক। ব্যস যথেষ্ট।'

— 'মোক্ষদা কে?' জিজ্ঞেস করেন অনাথবাবু। 'ওঁদের কাজের মেয়ে। পুরনো লোক।'

— 'হ্যাঁ, তারপর?' কাকাবাবুটির সম্বন্ধে অনাথবাবুর আগ্রহ বাড়ছে।

— 'তারপর আর কী। বৃদ্ধ বেশ একটা গর্বের হাসি দিয়ে বলেছিলেন — 'বুঝলে হে, তোমাদের কাকিমা আমায় যতটা অক্ষম ভাবে ততটা আমি নই। সাত বছরে একা কাটিয়েছি চাকরির প্রথমে। নিজে রান্না করে খেয়েছি। কারও ওপর নির্ভর করতে আমি ভালোবাসি না।'

— 'এখন বুঝছি, ওসব ভান। আসল মতলবটা অন্য।'

— 'কী মতলব?' প্রশ্ন করেন অনাথবাবু। যদিও খানিকটা আঁচ করেছেন।

— 'কী আবার! এই ফাঁকে কটা দিন খুশিমতো পেটপুজো করবেন। চানাচুর এনেছেন। অন্য সময়ে ফল আসে শুধু কলা। এখন আপেল আঙুরও চালাচ্ছেন। আরও কী কী এনে খাচ্ছেন কে জানে? বোধহয় হরদম মুখ চালাবার লোভে খাবারগুলো নিজের শোবার ঘরেই রেখেছেন। যাই একবার দেখে আসি শ্রীমান কী করছেন? সবটা চানাচুর শেষ করে যদি? ডোবাবে।'

তপনবাবুর সঙ্গে অনাথবাবুও চললেন।

কাকাবাবুর শোবার ঘরে একটিমাত্র জানলা। মস্ত বড়। দক্ষিণ দিকে। জানলার গায়ে সিমেন্টের লাল-রঙা চওড়া বেদি। ওই বেদিতে পা ছড়িয়ে বসেছিল ডাবু। হাঁ করে কেবলই ঝোল টানছে জোরে জোরে।

তপনবাবু দেখেই বললেন, 'এই রে, ঝাল লেগেছে। বিনি, যা তো এক গেলাস জল নিয়ে আয় চট করে। আর এক টুকরো পাটালি।'

ঢকঢক করে জল খেয়ে, পাটালি গুড়ের টুকরোটো মুখে ফেলে চুষতে চুষতে শ্যামল রং, একমাথা কোঁকড়া চুল, শুধু ইজের পরা, গাব্দা-গোব্দা ডাবু, চোখে খুশির ঝিলিক হেনে, কচি ভুট্টার দানার মতো দাঁতের সারি মেলে একগাল হাসল।

তপনবাবু ডাবুকে বললেন, 'মুড়ি খাবে?'

— 'হেঁ।' ডাবু মাথা দোলায়। সে মুড়ি খেতে খুব ভালোবাসে।

তপনবাবু বিনিকে বললেন, 'যা তো মা, এক বাটি মুড়ি নিয়ে আয়।'

বিনি গিয়ে মুড়ি আনল। গরাদের ফাঁক দিয়ে দেওয়া হল বাটিটা। অমনি ডাবু দুহাতে দুমুঠো মুড়ি তুলে, বাঁ মুঠোটা মুখে পুরল। যতটা মুড়ি মুখে ঢুকল, তার চেয়ে বেশি ছড়াল বাইরে।

ডাবু কচ কচ করে মুড়ি চিবুচ্ছে। এমন সময় দেখা গেল যে তপনবাবুর স্ত্রী হনহন করে আসছেন। তপনবাবু বিনিকে, 'তুই এখানে থাক' বলে তাড়াতাড়ি জানলা ছেড়ে এগিয়ে গেলেন গেটের দিকে। অনাথবাবুও তাঁর পিছু নিলেন।

ডাবুর মা থমথমে মুখে বললেন, 'পাড়ায় কোথাও নেই। সব বাড়িতে খুঁজেছি। কী হবে?'

— 'আহা অত ঘাবড়াচ্ছ কেন?' তপনবাবু স্ত্রীর দুশ্চিন্তা উড়িয়ে দিলেন, 'তুমি বরং একবার রতনপল্লি আর অবনপল্লিটা ঘুরে এসো। রিকশা নিয়ে যাও। নাড়ুবাবু, ডাক্তারবাবু —এমনি তিন-চারটে বাড়িতে খোঁজ নাও। ঠিক পেয়ে যাবে। এদের বাড়িতেই যান কাকাবাবু। আর হ্যাঁ, ভকতের দোকানটা একবার নজর কোরো। যদি কিছু কিনতে ঢোকেন।'

— 'ডাবু কী করছে?' উৎকণ্ঠিত স্ত্রীর প্রশ্ন।

— 'খাসা আছে। মুড়ি খাচ্ছে।' তপনবাবু জানালেন।

ডাবুর মা একটা সাইকেল-রিকশা চেপে হুস করে চলে গেলেন।

অনাথবাবু বললেন, 'দেখো তপন, তুমি ডাবুর কাছে এখন থেকো না। আমি আর বিনি থাকছি। ভুলিয়ে রাখব। তোমায় দেখে যদি বায়না ধরে? বেরুতে চায়?'

— 'তা ঠিক।' সায় দেন ডাবুর বাবা।

জানলার পাশ দিয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে তপনবাবু আড় চোখে দেখলেন, ডাবু আয়েশ করে মুড়ি খাচ্ছে জানলায় বসে। ভুলু কুকুরটা জুটেছে বাইরে। ওপরের দিকে তাকিয়ে সে মুড়ির লোভে ঘনঘন লেজ নাড়ছে। বিনিও রয়েছে। বাবাকে ডাবু ভ্রূক্ষেপই করল না।

অনাথবাবু অবিশ্যি থেমে গেলেন জানলার পাশে। ডাবুকে বললেন, 'বাঘ দেখেচ?'

— 'হুঁ। ছারকাছে।' ডাবু মাথা দোলায়।

— 'একটা বাঘের গপ্পো শুনবে?'

— 'হুঁ।' ডাবুর চোখ বিস্ফারিত হয়।

অনাথবাবু হাত মুখ নেড়ে একটা বাঘের গল্প শুরু করলেন। বিনিও ঘেঁষে আসে গল্প শুনতে।

ডাবু হাঁ করে শোনে। মাঝে মাঝে এক খাবলা মুড়ি গালে পোরে। ভুলু কুকুরও জানলার নীচে মুখ তুলে রয়েছে। গল্পের লোভে নয়, মুড়ির লোভে। গল্প চলছে। হঠাৎ ডাবু 'আঁ আঁ' করে ডাক ছেড়ে, জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে একটা পা বাড়িয়ে বেরুতে চেষ্টা করে।

অনাথবাবু চমকে উঠলেন, 'কী হল?'

— 'পেনছিল। ওই যে।' ডাবু বাইরে নীচে দেখায়। অনাথবাবু দেখলেন যে জানলার ধার দিয়ে গেটের দিকে যাওয়া কাঁকর বিছানো পথে এক আঙুলটাক মাত্র লম্বা একটি পেনসিল পড়ে আছে। কার কে জানে? বিনি তাড়াতাড়ি পেনসিলটা তুলে ভাইয়ের হাতে দিল। ডাবু পেনসিলটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে পরম যত্নে তার ইজেরের পকেটে রাখে। ফের গল্পে মন দেয়।

মিনিট দশেকের একটা গল্প শেষ করে অনাথবাবু একটু হাঁপিয়ে গেলেন। ডাবুকে বললেন, 'তুমি মুড়ি খাও। আমি ঘুরে আসছি। আবার গল্প বলব। কেমন?'

ডাবু ঘাড় নেড়ে উদারভাবে অনুমতি দেয়।

তপনবাবুর বৈঠকখানায় ঢুকে অনাথবাবু দেখলেন যে, বন্ধুটি মেঝেতে থেবড়ে বসে। তার সামনে মাটিতে কয়েক গোছা চাবি এবং হাতুড়ি ছেনি ইত্যাদি কিছু যন্ত্রপাতি।

অনাথবাবুকে দেখে তপনবাবু জিজ্ঞেস করলেন — 'ডাবু?'

— 'দিব্যি আছেন খোস মেজাজে।'

— হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানি। ব্যস্ত হওয়ার কারণ নেই। মিছিমিছি সবাই' —

বন্ধুকে থামিয়ে দিয়ে অনাথবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'এই চাবিগুলো কেন?'

— 'মানে দেখছিলাম চেষ্টা করে যদি তালাটা খোলা যায়?'

—'বাড়ির ওধারে দিয়ে গেছলে বুঝি সামনের তালাটা খুলতে?'

— 'হুঁ। খুলল না।'

— 'হাতুড়ি ছেনি — এগুলো?'

— 'ভাবছিলাম, তেমন বুঝলে তালাটা ভাঙব কিনা? কিংবা ভেতরের ছিটকিনিটা?'

অনাথবাবু বুঝলেন যে বন্ধুটি বাইরে ভারি নিশ্চিন্ত ভাব দেখালেও মনে মনে নিজেও বেশ ভড়কেছে।

অনাথবাবু বসলেন। জল খেলেন। দুটো কথাবার্তা বলে ফের ডাবুর কাছে গেলেন মিনিট পনেরো বাদে।

ডাবু তখনও দুহাতে মুড়ি খাচ্ছে। ছড়াচ্ছে। এবং মাঝে মাঝে এক মুঠো ভুলোকে ছুড়ে দিয়ে বলছে — 'নে খা।'

বিনি বাগানে একটা ইটের ওপর বসে গালে হাত দিয়ে হাঁ করে দেখছে ভাইয়ের কীর্তিকলাপ।

অনাথবাবুকে দেখেই ডাবু বলল, 'জ্যেঠু গপ্পো।'

— 'হ্যাঁ', অনাথবাবু এরার শুরু করলেন হাতির গল্প।

গল্পের মাঝে অনাথবাবু লক্ষ করলেন যে বাড়ির সামনে বেশ লোক জমছে। বোধহয় ডাবুর মায়ের কল্যাণে খবরটা রটেছে পাড়ায়। ওই ভিড়ের বেশিরভাগই নানাবয়সি মহিলা। কিছু কুচোকাঁচাও রয়েছে। ওরা সবাই উদ্‌বিগ্ন ভাবে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। বাড়িওলা অমলবাবুর নামে কিছু সজোর বিরূপ মন্তব্যও কানে আসে ওই ভিড় থেকে। কয়েকজন অতি উৎসাহীকে সরেজমিনে তদন্তের ইচ্ছায় গেট খুলে ডাবুর জানলার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে অনাথবাবু হাত নেড়ে তাদের বারণ করলেন। তারা একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে পিছিয়ে গেল।

সহসা কলরব ওঠে। তপনবাবুর স্ত্রী রিকশায় চড়ে হাজির হলেন স্বয়ং বাড়িওলা সমেত।

কাকাবাবু প্রায় ছুটে গিয়ে সদর দরজার তালা খুলে ঢুকলেন বাড়ির ভিতর, পিছু পিছু ডাবুর মা।

নিজের শোবার ঘরে পা দিয়েই পরিপাটি ঘরখানার দুর্দশা দেখে অমলবাবু থ।

তপনবাবুর স্ত্রী বললেন, 'কাকাবাবু, আমি ঘর পরিষ্কার করে দিচ্ছি। আগে এটাই সরাই।'

তিনি এবার, 'তবে রে শয়তান' বলে ছেলের পিঠে একটা ছোট্ট কিল মেরে তাকে জাপটে তুলে নিলেন বুকে।

ডাবু অমনি খপ করে জানলার একটা গরাদ আঁকড়ে ধরে কাঁদ কাঁদ সুরে চেঁচাতে লাগল, 'আমি এখন যাব না। হাতির গপ্পো শেষ হয়নি।'

'বটে! আবার ঢং হচ্ছে?' ঝাঁজিয়ে উঠে ডাবুকে আর এক ঘা বসাতে মায়ের হাত উঠতেই অনাথবাবু বাধা দিলেন — 'আহা মারবেন না। সত্যি গপ্পোটা যে শেষ হয়নি। ডাবু চলো। তোমাদের ঘরে গিয়ে বাকিটা শুনব।'

আশ্বাস পেয়ে ডাবু গরাদ ছেড়ে দেয়।

[১৯৯২, সন্দেশ, শারদীয়া]

খ্যাপা

উল্টোদিক থেকে হঠাৎ মধুর কণ্ঠে গানের আওয়াজ ভেসে আসতেই বাপি ভাবল — যাঃ, এবার খ্যাপার দফারফা। ঠিক আছে। ব্যাটা বড্ড জ্বালাচ্ছিল।

খ্যাপাও ওই গান শুনে থমকে গেল কয়েক পলক। খানিক বুঝি সে হতচকিত। তারপর ফের গলা ছেড়ে এগুতে লাগল বটে। কিন্তু আগের সেই দাপট আর নেই। যেন কোনোরকমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কেবলই নজর তার সামনের দিকে। অজানা প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্দেশে।

ওরা মুখোমুখি হওয়ার আগে স্থান কাল পাত্র'র হদিশ একটু জানিয়ে রাখি।

সকাল আটটা নাগাদ। চলেছে লোকাল ট্রেনটা রামপুরহাট টু হাওড়া। চলছে থামছে, চলছে থামছে। ট্রেনটায় ডেইলি প্যাসেঞ্জাররা যায়, তাই ভিড় হয় বেশ। বহু লোক এই ট্রেনে বর্ধমান কলকাতায় অফিস-কাছারি করতে যায়, ফেরে সন্ধ্যার ট্রেনে।

লোকাল ট্রেনে প্যাসেঞ্জারের ভিড় থাকলে তাদের ল্যাজে ল্যাজে আরও অনেক কিছু জোটে। সেটাই রীতি। এই যেমন — রকমারি হকার, ভিখিরি, গায়কের দল। গেরস্থালির প্রয়োজনীয় আর মানুষের শখের হাজারো টুকিটাকি জিনিস, নানান রকম খাবারদাবার, অসুখের দাওয়াই ইত্যাদি পসরা নিয়ে খদ্দের টানতে উচ্চৈঃস্বরে হেঁকে হেঁকে হকাররা ক্রমাগত আনাগোনা করে এক কামরা থেকে অন্য কামরায়।

ভিখিরিদের বৈচিত্র্যও কম নয়। গাইয়েরা পয়সা চায় বটে, কিন্তু তাদের ভিখিরি বলা উচিত নয়। কারণ, রীতিমতো গান গেয়ে গলা ফাটিয়ে মেহনত করে তারা রোজগার করে। হরেক রকম গান শোনা যায় এই ট্রেনে — বাউল, শ্যামা সঙ্গীত, কীর্তন। বাজার মাত করা আধুনিক বাংলা গানও চলে।

ট্রেনের গান বাপির বেশ লাগে। হকারদের কর্কশ চিৎকার যাত্রীদের হট্টগোল আর তর্কের মাঝে মিঠে গলায় গান শুনলে মনে একটু আরাম হয়। সত্যি এক এক জনের গলা এত ভালো। বাপির দুঃখ হয় যে এরা হয়তো কোনো দিনই কোনো আসরে গান গাইবার সুযোগ পাবে না, বাইরে এদের নাম ছড়াবে না। এইরকম অবিশ্রান্ত ট্রেনে গেয়ে গেয়েই একদিন এদের গলা নষ্ট হয়ে যাবে।

তবে সবার গান শুনে যে মেজাজ শরিফ হয়ে যায় তা নয়। এই যেমন খ্যাপা। বাপি এই

ট্রেনে চাপে কদাচিৎ। আগে সে কখনো খ্যাপার সাক্ষাৎ পায়নি।

বর্ধমান প্রায় এসে পড়েছে। উসখুস করছিল বাপি। আজ একটাও গান শোনা হল না। হঠাৎ সে চমকে ওঠে। বরং বলা উচিত আঁতকে ওঠে। কারণ তার একটু পেছনে বিকট গলায় তারস্বরে কেউ গেয়ে উঠল — দোষ কারও নয় গো মা —। সঙ্গে সঙ্গে খপাখপ খপাখপ শব্দ।

ঘাড় ঘুরিয়ে বাপি দেখে, পেছনে দু সারি সিটের মাঝে দাঁড়িয়ে গাইছে এক বিচিত্র মূর্তি। বেঁটে নাদুসনুদুস চেহারা। বয়স বছর তিরিশ হবে। পরনে পুরনো ছেঁড়া ফুলপ্যান্ট, নিচের দিকে বিঘতখানেক গোটানো। ময়লা একখানা শার্ট কাঁধে ফেলা। অতএব খালি গা। শ্যাম বর্ণ। তাতে সারা গায়ে ধুলো ময়লার গাঢ় প্রলেপ। গোল মুখখানায় কয়েক দিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গোঁফ নেই। মাথায় কদমছাঁট চুল।

লোকটি গদগদ মুখে হলদেটে এবড়োখেবড়ো দন্তসারি বের করে ঊর্ধ্বমুখে ঘাড় নেড়ে নেড়ে গাইছে, আর দু হাতে দুটো মাটির খুরি ঠুকে ঠুকে তাল দিচ্ছে — খপাখপ্ খপাখপ্।

শ্যামা সঙ্গীত। কথাগুলিও দিব্যি। কিন্তু বাপরে কী গলা! বেসুরো হেঁড়ে ভাঙা ভাঙা। শুনলে ভক্তির উদয়ের বদলে ভক্তি চটে যায়। কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে গানের দাপটে। বাপির গান শোনার মেজাজটাই গেল খিঁচড়ে।

ভুরু কুঁচকে ঘাড় ঘুরিয়ে বিরক্ত বাপি মাঝে মাঝে গায়কটিকে দেখতে লাগল।

গায়কের অবশ্য ওসবে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে এক পা আধ পা করে এগুচ্ছে আর ভাব ঢেলে ঢেলে প্রাণপণে গলা খেলাচ্ছে, — দোষ কারও নয় গো মা — ।

নাঃ কাউকে দোষ দিচ্ছে না বাপি। দোষ তার বরাতের। নইলে অ্যাদ্দিন বাদে এই ট্রেনে চড়ে এমন বিটকেল বউনি হবে কেন?

দেখা গেল, ওই ট্রেনের নিয়মিত প্যাসেঞ্জাররা এবং হকাররা এই গায়ককে বিলক্ষণ চেনে। এক ঝালমুড়িওলা গায়কটির পাশ কাটাতে কাটাতে কনুইয়ের মৃদু গোঁত্তা সহযোগে ওকে ধমকে দিয়ে গেল, — অ্যাই খ্যাপা, পথ ছাড়।

বাপির সামনের দুই যাত্রী দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন ছিলেন এতক্ষণ। গানের গুঁতোয় তাঁদের কথায় ছেদ পড়তে লাগল বারবার। মহা খাপ্পা হয়ে তাঁদের একজন বলে উঠলেন, — উঃ খ্যাপাটা আচ্ছা জ্বালালে। গাঁজা খেয়ে খেয়ে তো গলার বারোটা বাজিয়েছে।

অপর লোকটি মন্তব্য করলেন, — ওর গলায় আবার ন'টা দশটা বাজল কবে? যদ্দিন শুনছি এই এক ফর্ম। এক দিন ওকে অ্যাডভাইস দিয়েছিলাম — গানটা ছেড়ে অন্য লাইন ধর না বাপু। গাড়িতে একটু স্বস্তিতে যাই। তা সেয়ানাটা বলল কিনা — মায়ের নাম নিই, সেটাই তো আসল। গলার দোষটা কি বড় হল স্যার? মায়ের নাম না নিয়ে আমি যে থাকতে পারি না।

বুঝুন ঠ্যালা। আহা কি আমার ভক্তরে! আসলে ব্যাটা কুঁড়ের হদ্দ। অন্য কাজে উৎসাহ নেই। দেখুন না, কেউ শুনছে ওর গান? কেউ না।

বিরক্তিতে দুজনেই মুখ ভেটকে কথা বন্ধ করে বসে রইলেন।

খ্যাপা গাইতে গাইতে এগোচ্ছে কচ্ছপের গতিতে। গানের ফাঁকে ফাঁকেই খুরি পাতছে দু'ধারে — যাত্রীদের কাছে দক্ষিণার আশায়। কিন্তু সুবিধা হচ্ছে না মোটেই। ওর গানে কারও মন ভিজছে বলে মালুম হচ্ছে না।

খ্যাপা বাপির সামনে খুরি পাততেই বাপি আনমনা হওয়ার ভান করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। নেহাতই কৃপাবশে কয়েকজন অবশ্য পয়সা ঠেকাচ্ছে খ্যাপাকে, তবে তা যৎসামান্য। এমন সময় কানে আসে অন্য গানের আওয়াজ। সঙ্গে খোল করতাল বাজছে। ওরা এগিয়ে আসছে, খ্যাপা যেদিকে যাচ্ছিল সেই দিক থেকে।

বাপি বসেছিল কামরার মাঝামাঝি জায়গায়। এই ট্রেনে চলন্ত অবস্থায় এক কামরা থেকে অন্য কামরায় যাওয়া যায়। যাতায়াতের যোগ আছে কামরাগুলোর মধ্যে। এই কামরায় ঢোকার সরু প্যাসেজের দিকে উৎসুক নজর রাখে বাপি।

এক এক করে ঢুকল তারা। পুরো একটা দল। দেখে গোটা কামরা চমৎকৃত। প্রথমে একজন পুরুষ। তিনিই মূল গায়েন। সুন্দর তাঁর চেহারাটি। মাঝবয়সি। গৌরবর্ণ। নধর দিব্যকান্তি। নাকের ওপর কপাল ছুঁয়ে রসকলি কাটা। পরনে সাদা পাঞ্জাবি ও চওড়া কালো পেড়ে ধুতি। মিহি করে কোঁচানো ধুতির কোঁচাটি ঝুলছে সামনে। কাঁধে ফেলা পাট করা উড়নি। ঘন কালো ঘাড় ছোঁয়া মাথার চুল সযত্নে আঁচড়ানো। ভদ্রলোকের গলা থেকে ঝোলানো কোলের কাছে একটি শ্রীখোল।

ভদ্রলোকের ঠিক পেছনে এলেন এক মহিলা। তিনি সুশ্রী গৌরবর্ণা। সিঁথিতে সিঁদুর। টিকলো নাকের ওপর চন্দনের রসকলি টানা। মাথায় আধা-ঘোমটা। ধরন গিন্নিবান্নি গোছের। পরনে লাল পাড় সাদা খোলের শাড়ি। ফরসা সুগোল হাতে শাঁখা আর কয়েক গাছি কাচের চুড়ি। হাসি হাসি মুখখানি। মহিলার গলায় ঝুলছে হারমোনিয়াম।

ভদ্রমহিলার পিছু পিছু এল ছোট ছোট দুটি ফুটফুটে ছেলেমেয়ে।

ছেলেটির বয়স বছর দশেক। হাতে তার খঞ্জনি। মেয়েটি বছর সাত-আটের। তার এক হাতের মুঠোয় ঘুঙুর। ছেলেটির পরনে ধুতি ও হলুদ রঙা শার্ট। মেয়েটি সাদা ফ্রক পরা। দলের সবারই পোশাক ফরসা ধোপদুরস্ত। সবার পায়েই চটি।

ভাবে বিভোর হয়ে ভদ্রলোক গাইছিলেন কীর্তন। 'ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম-ও-রে।' আর তালে তালে চাঁটি মারছিলেন খোলে।

মহিলা গানের সঙ্গে হারমোনিয়ামের সুর মেলাচ্ছিলেন।

ঝমাঝম্ খঞ্জনি বাজিয়ে আর ঝুম্‌ঝুম্ ঘুঙুর ঝাঁকিয়ে সঙ্গত করছিল ছেলেমেয়ে দুটি। চমৎকার কনসার্ট। বোঝা যায়, স্বামী স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে এরা গোটা একটি পরিবার।

ভদ্রলোকের গলাটি খাসা। শুনলেই মন মজে। তাঁর গানের সঙ্গে মাঝে মাঝে ধুয়ো ধরছিল দলের অপর তিনজন — সুরেলা কণ্ঠে।

প্যাসেঞ্জাররা নড়েচড়ে বসে। আগ্রহ ভরে শুনতে থাকে এদের গান। দেখতেও থাকে এই নয়ন মনোহর দৃশ্য।

বাচ্চা ছেলেটি খঞ্জনি বাজানোর ফাঁকে ফাঁকে তার হাতে ঝোলানো একটা ছোট থলির মুখ খুলে এগিয়ে ধরছিল প্যাসেঞ্জারদের সামনে। তাতে টুপটাপ পয়সাও পড়ছিল কম নয়।

কীর্তন পার্টি এই কামরায় প্রবেশ করার পরেই খ্যাপার গলা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে থেমে গিয়ে হাঁ করে দেখছিল নতুন দলটাকে।

গাইতে গাইতে কীর্তনের দল যেই না খ্যাপার মুখোমুখি হয়েছে, অমনি খ্যাপা অ্যাবাউট

টার্ন। সে গান ভুলে খুরিসুদ্ধু দু'হাত তুলে গৌরাঙ্গ নৃত্য শুরু করে দিল কীর্তনের সঙ্গে, এবং চলল দলটার সামনে সামনে নেচে নেচে। আর তাল মাফিক সে 'হরি হরি' রব ছাড়তে লাগল।

ব্যস্, জমে গেল ব্যাপারটা। গান বাজনা তো হচ্ছিলই চমৎকার, ওর সাথে ভজ গৌরাঙ্গ নাচটুকুরই যেন খামতি ছিল। সেই অভাবটুকু মিটে যেতে দর্শক কাম শ্রোতারা ভারি খুশি।

বাপি নজর করল যে খ্যাপার আসল ট্যালেন্ট কিন্তু নাচে। বৃথাই ও অ্যাদ্দিন গান গেয়ে এনার্জি নষ্ট করেছে। দারুণ নাচে বটে খ্যাপা। আহা কী ভাব! কী ভঙ্গি! প্যাসেজের মধ্যে ওইটুকু জায়গায় সে দুলে দুলে নাচছে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে।

বাপি খ্যাপার চোখে চোখ রেখে বলল, — ফাসক্লাস। আচ্ছা নাচছিস!

খ্যাপা নাচতে নাচতে একগাল হাসল উৎসাহ পেয়ে।

কিন্তু সমস্যা একটা দেখা দিল। ঘোরতর সমস্যা।

নাচের ফাঁকে ফাঁকেই খ্যাপা খুরি বাড়িয়ে ধরছে প্যাসেঞ্জারদের সামনে — অর্থাৎ পয়সা দাও।

যাত্রীরা অনেকেই এদের গানে এবং নাচে খুশি হয়ে পয়সা বের করছে। খ্যাপা দলটার গোড়ায়। কেউ কেউ অতশত না ভেবে খ্যাপার খুরিতেই পয়সা ফেলে দিতে লাগল। কেউ কেউ আবার পয়সা হাতে দোনামনা করতে থাকে, পয়সাটা ঠিক কার ভাগে লাগবে এই চিন্তায়। কারণ খ্যাপা তো ঠিক এই পার্টির মেম্বার নয়। দু'একজনকে এত চিন্তা ভাবনার সুযোগ না দিয়ে খ্যাপা টুক করে তাদের হাত থেকে পয়সাটি টেনে নেয়। প্যান্টের পকেটে পয়সা চালান করে দিয়ে খ্যাপা ফের নাচে।

কীর্তন পার্টির বাচ্চা ছেলেটি আসছে অনেক পেছনে। সে এসে যখন হাতের থলি ফাঁক করে যাত্রীদের সামনে, খুব কম পয়সাই তার ভাগ্যে জোটে। কারণ ইতিমধ্যে বেশিরভাগ লোকই তো আগেভাগে খ্যাপাকে দান করে ফেলেছে। সুতরাং তারা আর দুবার দেবে কেন?

কীর্তন পার্টির সবাই খ্যাপার এই কাণ্ড দেখে চটছে, কিন্তু কী যে করবে ভেবে পাচ্ছে না।

খ্যাপা খুরি পাততে পেছন থেকে ছোট ছেলেটি একবার একটু জোরেই বলে উঠল, — অ্যাই কী হচ্ছে?

খ্যাপা কেয়ারই করল না।

কীর্তন পার্টি পড়ল মহা মুশকিলে। এ যে লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায়। গান থামালে পয়সা বন্ধ। আবার গান চালালে খ্যাপাই বেশিরভাগটা টেনে নিচ্ছে খুরি পেতে। এই নিয়ে এখন একটা রাগারাগি করলে লোকে ভাববে কী? অমন ভক্ত গাইয়ে দলের নাম খারাপ হয়ে যাবে যে।

তাই গান চলল বটে তবে আগের সেই মুড আর রইল না।

খ্যাপার নাচে কিন্তু ভাটা পড়ে না। পয়সাও সে কামাচ্ছে মন্দ নয়।

বাপি সিট ছেড়ে উঠল বাথরুমে যাওয়ার ছুতোয়। খ্যাপার পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে ওর কানের গোড়ায় ফিসফিসিয়ে বলে গেল, — লেগে থাক্। এই পার্টিতে ঢুকে পড়।

খ্যাপা নাচের পোজেই দাঁত বের করে মাথা নেড়ে সায় দিল বাপির প্রস্তাবে।

বর্ধমান স্টেশন ইয়ার্ডে ট্রেন ঢুকল। বহু যাত্রী নড়াচড়া, হাঁকাহাঁকি, মালপত্র টানাটানি শুরু

করে দিল। কীর্তন পার্টি এবার গান বন্ধ করে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ফলে তখন খ্যাপার নাচও বন্ধ হল।

স্টেশনে গাড়ি থামাতে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন পার্টিও নেমে গেল বর্ধমানে।

বাপি বর্ধমান শহরে যাবে। তাই সেও নামল ট্রেন থেকে।

হঠাৎ তার নজরে পড়ল যে খ্যাপা প্ল্যাটফর্মের এক কোণে কীর্তন দলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কীর্তনিয়া ভদ্রলোকের সঙ্গে খ্যাপার কী কথাবার্তা হচ্ছে। বিষম কৌতূহলে বাপি তখুনি প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে না বেরিয়ে যথাসম্ভব ধীরে ধীরে ওদের কাছে গিয়ে নিজেকে লুকিয়ে ওদের দিকে পিঠ ফিরে দাঁড়ায়। কান খাড়া করে ওদের কথা শোনার চেষ্টা করে এবং আড়চোখে নজর রাখে ওদের ওপর।

আগে ওদের মধ্যে কদ্দুর কী কথাবার্তা হয়েছে জানে না বাপি। এখন যেটুকু কানে আসে, কীর্তন গাইয়ে লোকটি বলছে, — তাই হবে বাপু। তোমার নাচ মন্দ নয়। এখন একটু চা-টা খেয়ে এস'খন। আমরা ওই বেঞ্চিতে বসছি। চল্লিশ মিনিট বাদে রামপুরহাটের দিকে ফিরতি লোকালটা ধরব।

খ্যাপা দু'হাত কচলাতে কচলাতে বিগলিত বদনে বলল, হ্যাঁ স্যার, আসচি ঘুরে। আজ্ঞে আমার রেটটা একটু বাড়াতেন যদি।

না না ওর বেশি দিলে আমাদের পড়তা পোষাবে না। আমরা তো চারজন বটি। — কীর্তনিয়া আপত্তি জানাল।

ঠিক আছে, তাই দেবেন স্যার। — বলল খ্যাপা ঃ দেখবে কেমন কালেকশান করি। খুশি হলে পরে না-হয় কিছু উপরি বকশিশ করবেন।

এবার মহিলা বলে ওঠে সন্দেহের সুরে, — হাঁ বাবা, শেষে সব পয়সাকড়ি নিয়ে সটকে পড়বে নাতো? তেমন চেনাজানা তো নেই।

ছি ছি মা, কী যে বলেন! — খ্যাপার কণ্ঠে তীব্র ক্ষোভ : গান গেয়ে ভিক্ষে করি বলে খ্যাপা ঠকবাজ, এমন অপবাদ কেউ দিক দেখি! একটি পয়সাও যদি ফাঁকি দিই আমার যেন সব্বোনাশ হয়!

ঠিক আছে, ঠিক আছে! — গাইয়ে ভদ্রলোক খ্যাপাকে শান্ত করে : দেখি আরও দু'চার দিন, তারপর না হয় তোমায় দলে পার্মানেন্ট করে নেব। যাও এখন ঘুরে এসো। আমরা একটু জিরোই বসে।

কীর্তন পার্টি বেঞ্চির দিকে এগলো। খ্যাপা গেল চা-টায়ের উদ্দেশে। বাপিও রওনা দিল প্ল্যাটফর্ম থেকে।

খ্যাপা ওই কীর্তন দলে ভিড়তে পেরেছিল কিনা, সে খবরটা বাপির আর জানার সুযোগ হয়নি। আর সে দেখাই পায়নি — খ্যাপার, না সেই কীর্তন পার্টির।

[১৯৯৮, কিশোর ভারতী শারদীয়া]

মেজকর্তার সাপ শিকার

সাপ সাপ। মাথার ওপর তাকিয়ে চিৎকার দিয়ে ছিটকে সরে গেল ডুলু।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য ছেলেরা লাফ দিয়ে, দৌড়ে, যে যেদিকে পারল পালাল খানিক তফাতে। তারপর ডুলুর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল ছাদের দিকে। দেখল, বারান্দার ছাদে একটা কাঠের বরগার খাঁজে লম্বালম্বি ভাবে শুয়ে আছে মস্ত এক সাপ। যেখানে তারা খেলছিল ঠিক তাদের মাথার ওপরে। উঃ খুব বেঁচে গেছি।

বিশাল চৌধুরীবাড়ির এক অংশে দোতলায় টানা চওড়া লোহার গ্রিলের রেলিং দেওয়া বারান্দায় ছয়জন খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই মিলে রবারের বলে ফুটবল খেলছিল মহা আনন্দে। বয়স তাদের বারো থেকে ষোলোর মধ্যে। এই বারান্দার লাগোয়া তিনখানা বড় বড় ঘরই আপাতত তালা বন্ধ। ঘরগুলোর বাসিন্দারা কেউই এখন থাকে না গ্রামে, এই দেশের বাড়িতে স্থায়ীভাবে। তারা বাইরে থাকে শহরে। তারা কেউ পড়ছে, কেউ বা চাকরি করছে। মাঝেমাঝে তারা দেশে আসে। এই নিরালা বারান্দাটা তাই বাড়ির ছোট ছেলেদের নির্বিঘ্নে খেলার জায়গা। স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি চলছে। সকালের পড়াশোনার পাট চুকিয়ে বাড়ির কজন ছোট ছোট ছেলে অন্য দিনের মতো বারান্দায় মেতেছিল খেলায়। হঠাৎ এই বিপত্তি।

ছেলেগুলো ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে থাকে। দেখে সাপটাকে। খেলা মাথায় ওঠে। ওর নিচে কি খেলা যায়? কখন ওটা ধপ্ করে খসে পড়বে ঘাড়ে। সাপটা বিষাক্ত না নির্বিষ কে জানে? তবে যা আকার, দেখে বুক গুরগুর করে। সাপটাকে তাড়ানো যায় কীভাবে?

ছেলেরা চিৎকার করে, হাততালি দেয়। সাপ নির্বিকার নট নড়নচড়ন। যেন আরামে ঘুমুচ্ছে লম্বা হয়ে।

সাপ-টাপ দেখা চৌধুরীবাড়ির ছেলে-বুড়োর অভ্যেস আছে। দেড়শো বছরের বেশি প্রাচীন গাছপালা ঘেরা চৌধুরীবাড়িতে কত গর্ত, কত ফাটল। তাতে কত সাপ বিছে ইঁদুর ছুঁচো ইত্যাদি প্রাণীর বাস। বাড়ির ঘুলঘুলিগুলোয় ঘর বেঁধেছে অজস্র পায়রা। সাপেরা মানুষদের পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে। তবে দৈবাৎ কখনো-সখনো সাপে মানুষে মুখোমুখি হলে, যদি সেটা বিষহীন সাপ হয়, তাকে লাঠি ঠুকে আওয়াজ করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বাড়ির ভিতরে বিষাক্ত সাপ ঘোরাঘুরি করলে তাকে মারতে বাধ্য হয় লোকে।

খুদু ঢিল তুলল।

খবরদার। — খুদুর হাত চেপে ধরে ডুলু, — ঢিল লেগে রেগে গিয়ে যদি লাফ মেরে মেঝেয় পড়ে তাড়া করে, মরব যে। দেখচিস কী সাইজ! ওর সঙ্গে ছুটে পারবি?

নাঃ, এটার কপালে মৃত্যু আছে। — সিনিয়ার-মোস্ট বুলু দার্শনিক ভাবে মন্তব্য করে, — নইলে এত ডিসটার্ব করছি তাও পালাচ্ছে না কেন? আমাদের খেলাটা মাটি করল ব্যাটা।

ওটা কি বিষাক্ত সাপ? — সব চাইতে কনিষ্ঠ বুধু সভয়ে প্রশ্ন তোলে।

বুলু বলল, — তাই হবে। নইলে এত সাহস! আমাদের কেয়ারই করছে না।

খুদু বলল, — তবে তো এটাকে মারা উচিত।

ডুলু বলল, — তাহলে কালী সর্দারকে খবর দিই। বল্লম নিয়ে আসুক। কালী সাপ মারায় ওস্তাদ। অ্যাই বুধু যা তো — কালী সর্দারকে ডেকে নিয়ে আয়।

বুধু হুকুম পেয়ে দৌড়ল। কালী সর্দার চৌধুরীবাড়ির পাইক। এ সময়টা কাছারি বাড়িতে থাকে।

খুদু ডুলুদের চেঁচামেচিতে ইতিমধ্যে আরও কিছু ছোট ছেলেমেয়ে এসে জুটেছে বারান্দায়। ফলে বারান্দায় কলরব বাড়ছে। আশপাশ থেকে কাকিমা জেঠিমার মতো কয়েকজন বড়দের গলাও সাড়া দিচ্ছে, — কী ব্যাপার? কী হয়েছে রে?

বুধু ছুটতে ছুটতে এসে রিপোর্ট করল, — কালী সর্দার নেই, হাটে গেছে। ফিরতে দেরি হবে।

এখন কী হবে? ভারি চিন্তায় পড়ে ছেলেরা।

বুলু বলল, — চ মেজকাকাকে ডেকে আনি। বন্দুক নিয়ে এসে সাপ মেরে দেবেন।

খুদু আমতা আমতা করে, — বাবা? বাবা কি পারবেন?

— কেন, না পারার কি আছে? ওই তো সাপ দেখা যাচ্ছে। এক গুলিতেই ঘায়েল হয়ে যাবে।

— না, মানে বাবাকে তো কখনো দেখিনি শিকার করতে।

সে হয়তো অনেক দিন শিকার করেননি। কিন্তু গল্প তো করেন কত শিকারের। বাঘ মেরেছেন, বুনো শুয়োর মেরেছেন, উড়ন্ত হাঁস মেরেছেন — কত জঙ্গলে ঘুরেছেন শিকার করতে। এ তো ঘুমন্ত সাপ। স্রেফ হাতের নাগালে। কোনও ব্যাপারই নয়। বন্দুকটা আমায় দিলে কাকাকে আর করতে হয় না। আমিই খতম করে দিতাম। — গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করে বুলু। ছোটদের দলে একমাত্র বন্দুক চালাতে জানে। তার ছোটকাকার কাছে শিখেছে।

— তবে চ, বাবাকে ডেকে আনি।

খুদু বুলু ডুলু চলল মেজকর্তাকে ডাকতে। অন্যরা রইল পাহারায়।

সাপ মারার জন্য মেজকর্তার শরণ নেওয়ার। কারণ আছে। চৌধুরীবাড়িতে খুদু বুধুর বাবা অর্থাৎ মেজকর্তাই আপাতত একমাত্র বন্দুকধারী এবং সাপটা দর্শন দিয়েছে মেজকর্তার মহলে। সুতরাং মেজকর্তাকেই ডাকতে হয়।

চৌধুরীবাড়িতে দুটো বন্দুক আছে। একটা মেজকর্তার। দ্বিতীয়টার মালিক ছোটকর্তা অর্থাৎ খুদু বুধু বুলুদের ছোটকাকা। কিন্তু ছোটকাকা এখন উপস্থিত নেই এই বাড়িতে — মেদিনীপুর

শহরে গেছেন একটা কাজে।

ছেলেরা ছোটকাকাকে মাঝেমধ্যে দেখেছে তোড়জোড় করে শিকারে বেরোতে। কিন্তু মেজকর্তাকে ছোটরা কস্মিনকালেও বন্দুক দিয়ে শিকার করতে বা শিকারে বেরতে দেখেনি। বছরে কয়েকবার ছাদে উঠে তিনি বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করেন — ব্যস্।

গোপন রহস্যটা হল, যৌবনে পাঁচজনের পাল্লায় পড়ে বন্দুক ছোড়া শিখেছিলেন মেজকর্তা, তবে দু-চারটে ছোটখাটো শিকার করার পরেই তাঁর শিকারের শখ মিটে যায়। বন্দুক একটা কিনেছিলেন বটে লোক দেখাতে। কয়েকবার শিকারপার্টির সঙ্গে ঘুরেছেনও বনে। কিন্তু স্বয়ং বন্দুক চালাতে মোটেই ভরসা পেতেন না। গুলি ছুড়ে হিংস্র জন্তু শিকারের নামে রীতিমতো নার্ভাস লাগে তাঁর। তবে সেটা বাইরে প্রকাশ করতে চান না। বরং বানিয়ে বানিয়ে বয়সকালে শিকার করার রোমহর্ষক সব গল্প ছাড়েন সুযোগ পেলেই।

একতলায় বৈঠকখানা ঘরে ফরাস পাতা তক্তপোশে বসে মেজকর্তা নিবিষ্ট চিত্তে দাবা খেলছিলেন গ্রামের এক সমবয়সি জগন্নাথবাবুর সাথে।

খুদু বুলু ডুলু এসে তাঁদের কাছে দাঁড়াল মিনিট চার-পাঁচ বাদে জগন্নাথবাবুই প্রথম খেয়াল করলেন ছেলেদের। জিজ্ঞেস করলেন — কী চাই?

বুলুরা ইশারায় মেজকর্তাকে দেখায়। জগন্নাথবাবু মেজকর্তাকে বললেন, — চৌধুরীমশাই দেখুন কী বলচে ছেলেরা।

বড়কর্তা ঘুঁটির ওপর চোখ রেখেই বললেন, হুঁ কী?

খুদু উত্তেজিত স্বরে জানাল, — বাবা, একটা সাপ বেরিয়েছে আমাদের দোতলায়। বন্দুকটা নিয়ে চলুন না, মেরে দেবেন।

সাপ! — দাবা বোর্ড থেকে নজর না সরিয়েই মেজকর্তা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, — বন্দুক কী হবে? লাঠি দিয়ে মার।

— লাঠি গায়ে লাগবে না। বারান্দার ছাদে কাঠের বরগায় শুয়ে আছে। বিরাট সাপ।

এবার মেজকর্তা মুখ তুললেন। প্রশ্ন করলেন, কী সাপ?

— তা জানি না। এই অ্যাত্তো বড়। অ্যাত্তো মোটা।

— কী রঙের?

বুলু বলল, — কালচে?

খুদু বলল, — না হলদেটে।

মেজকর্তা ভুরু তুলে খানিক চিন্তা করে বললেন, — কালী সর্দারকে ডাক। ও বল্লম দিয়ে গেঁথে ফেলবে।

— কালী সর্দার নেই। হাটে গেছে।

— তবে নবকে বল্।

— ছোটকাকা নেই। মেদিনীপুর শহরে গেছেন।

দোতলায় সাপ উঠল কী করে? মেজকর্তার প্রশ্ন।

বুলু বলল, — বোধহয় গাছ দিয়ে। আমগাছের ডাল লেগে আছে বারান্দায়।

হয়তো সিঁড়ি দিয়ে। — খুদুর অভিমত।

উঁহু। মানুষের মতো সাপ সিঁড়ি দিয়ে ওঠে না। — মেজকর্তা ধমকে ওঠেন।

— তোরা ওখানে কী করছিলি?

— ওখানে খেলি যে রোজ।

মেজকর্তা নীরবে গোঁজ মেরে থাকেন।

জগন্নাথবাবু হাঁ করে সব শুনছিলেন। এবার ছেলেদের হয়েই ওকালতি করেন, — চৌধুরীমশাই সাপটা মেরে দিয়ে আসুন না। ছেলেগুলো ভয় পাচ্ছে। তাছাড়া পরে কোনো ঘরে না ঢুকে পড়ে। বিষাক্ত সাপ হলে তো বিপদ।

হুম্। — ফোস্ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মেজকর্তা হতাশ কণ্ঠে বলেন, — ঠিক আছে, যাচ্ছি। একটা মোক্ষম চাল এসেছিল মাথায়। যত উটকো ঝামেলা। বেশ। বন্দুকটা নিয়ে আয় আমার ঘর থেকে। আর টোটা। কিন্তু টোটা তো আলমারিতে আছে, তালা বন্ধ। ঠিক আছে, বন্দুকটা নিয়ে হরশংকরকে বলল, গুলি ভরে দিতে। আর একটা এক্সট্রা গুলি দিতে।

হরশংকরবাবু চৌধুরীদের জমিদারিতে চাকরি করেন। চৌধুরীবাড়ির একতলায় একটা ঘরে একা থাকেন। তিনি আবার চৌধুরীদের বন্দুকগুলোরও দেখভাল করেন। প্রতি মাসে বন্দুকদুটো দুই কর্তার থেকে চেয়ে নিয়ে নিজের ঘরে বসে সেগুলো সযত্নে পরিষ্কার করেন, তেল দেন, কলকব্জা পরীক্ষা করেন। দু এক রাউন্ড গুলিও ছোড়েন বন্দুক চালু রাখতে। তাঁর কাছে কয়েকটা গুলি গচ্ছিত রাখা হয় হঠাৎ প্রয়োজনে পাওয়ার জন্য। ছেলেরা তাঁর নাম দিয়েছে gun বাবু।

হরশংকরবাবু নিজের ঘরে তক্তপোশে শুয়ে একখানা চটি ডিটেকটিভ বই পড়ছিলেন গোগ্রাসে। খুদু ডুলু বুলু মেজকর্তার বন্দুক নিয়ে হাজির হতে ভুরু কুঁচকে বললেন, — কী ব্যাপার?

খুদু বলল, — বাবা বন্দুক দিয়ে সাপ মারবেন। একটা টোটা ভরে দিতে বললেন। আর একটা এক্সট্রা গুলি নিতে বলেছেন।

সাপ? তবে তো ছররা। — বলে বই মুড়ে রেখে উঠে চাবি দিয়ে নিজের তোরঙ্গ খুললেন 'গান' বাবু।

টোটা ভরা বন্দুক পেয়ে মেজকর্তা উঠলেন বটে। তবে নেহাতই অনিচ্ছায়। জগন্নাথবাবুকে বললেন, — বোর্ড যেমন আছে থাক। ফিরে এসে বাকি চাল দেব। চা বলে দিচ্ছি। খান। এই যাব আর আসব।

সদর্পে সাপ মারতে চলেছেন মেজকর্তা। হাতে বন্দুক, গায়ে ফতুয়া, ধুতির কোঁচা লুটোচ্ছে মাটিতে, চটি ফটর ফটর, পিছনে খুদুরা তিন মূর্তি।

দোতলায় ওঠার সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছবার আগে দেখা হয়ে গেল সেজকর্তার সঙ্গে। বেঞ্চিতে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন, — কী ব্যাপার মেজদা, বন্দুক হাতে চললে কোথা?

মেজকর্তা জবাব দিলেন, — সাপ মারতে। দোতলায় একটা সাপ বেরিয়েছে।

— কী সাপ?

— তা বলতে পারছে না। বলছে বিরাট।

— দোতলায় উঠল কী করে?

— বলছে গাছ বেয়ে।

ও! — উদ্বিগ্ন ভাবে মাথা ঝাঁকান সেজকর্তা।

মেজকর্তা কিন্তু না এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, — ননী, সেই যে একবার দোতলায় একটা সাপ উঠেছিল মস্ত বড়। উঃ কী কাণ্ড তাই নিয়ে। তুই তখন কলেজে থার্ড ইয়ারে। এমনি গরমের ছুটির সময়। মনে আছে?

সেজবাবু বললেন, — হুঁ। কিন্তু সেটা তো ঢোঁড়া ছিল। বিষ নেই।

— আরে তা তো আগে বুঝিনি। তোর মেজ বউ তখন নতুন বউ। দ্যাখে যে দোতলায় বারান্দা দিয়ে সড়সড় করে চলেছে প্রকাণ্ড সাপ। দেখেই তার হয়ে গেছে। সাপ সাপ — বলে চিৎকার দিতে দিতে পালিয়েছে উল্টোদিকে। সব ছুটে এল চারদিক থেকে লাঠি-সোটা নিয়ে। বড়কাকা বন্দুক নিয়ে হাজির। এসে দেখি সাপ বেপাত্তা। তুইও এসেছিলি মনে আছে?

হুঁ। — সায় দেন সেজকর্তা।

ছেলেরা উসখুস করে। খুদু মৃদস্বরে ডাকে — বাবা, যাবে না?

মেজকর্তা ছেলের কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে তেড়ে গল্প চালালেন।

— ওঃ, মনে আছে তারপর কী হই হই। ঘরে না বারান্দায় কোথায় যে ঢুকেছে সাপটা। ভয়ে কেউ আর ঘরে ঢুকতে পারে না। ঝাড়া দুটি ঘণ্টা তন্নতন্ন করে খোঁজার পর শেষে বেরুল বারান্দায় একটা বস্তার পিছন থেকে। খোঁচা খেয়েই টেনে দৌড় যা মারল। সোজা রেলিং গলে নিচে লাফ মারল জবা গাছের ওপর। তারপর হাওয়া। এক ঘা লাঠিও কেউ কষাতে পারেনি। হোক ঢোঁড়া। সাইজ কী ছিল! যেন বাচ্চা অজগর।

কাকু চল। দেরি হয়ে যাচ্ছে। — বুলু তাড়া দেয়।

হ্যাঁ হ্যাঁ যাও। দেরি কোরো না। — সেজকর্তা খবরের কাগজ হাতে ওঠার ভঙ্গি করেন। মেজদার বকবকানি বোধহয় আর তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না। অগত্যা মেজকর্তা ফের রওনা দিলেন সাপের উদ্দেশে।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেই মেজকর্তা দেখা পেলেন খুদুর জ্যাঠামশাই অর্থাৎ বুলুর বাবার।

চৌধুরীবাড়িতে একজনের অংশ থেকে অন্য জনের অংশে যেতে হলে টানা টানা বারান্দা পেরতে হয়। এই অংশটা জ্যাঠামশায়ের। জ্যাঠা বারান্দার কোণে চেয়ারে বসে সামনে টেবিলে খাতা রেখে কিছু হিসেব লিখছিলেন। মেজকর্তাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, — বন্দুক নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস রবি?

মেজকর্তা দাঁড়িয়ে পড়ে গম্ভীরভাবে জানালেন, — আমার দোতলার বারান্দায় একটা সাপ বেরিয়েছে। ছেলেরা ধরল। তাই যাচ্ছি মারতে।

সাপ? — বড়কর্তা কিঞ্চিৎ শঙ্কিত দৃষ্টিতে ছোট ভাইয়ের হাতে বন্দুকটা দেখতে দেখতে বললেন, — তা লাঠি দিয়ে মারলেই হয়। বন্দুক কী দরকার?

মেজকর্তা বললেন, — লাঠি চলবে না। মাথার ওপর ছাদের বরগায় উঠেছে।

— কী সাপ?

— বলতে পারছে না। বলছে বিরাট।

— সাবধানে গুলি ছুড়িস।

— হ্যাঁ হ্যাঁ সে আর বলতে। বিষাক্ত হলে মারব। নইলে তাড়িয়ে দেব।

প্রসঙ্গ শেষ। এরপরও কিন্তু মেজকর্তার সেখান থেকে নড়বার মতলব দেখা গেল না। বন্দুকটা মেঝেতে নামিয়ে লাঠির মতন পাকড়ে ধরে তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে জানালেন, — দাদা মনে আছে সাপের কী উৎপাত হয়েছিল সেবার বন্যার সময়? ওঃ! নবর বয়স তখন বারো-চোদ্দো হবে।

বড়কর্তা মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দেন, — হুম্।

মেজকর্তা পরম উৎসাহে চালিয়ে যান, — মনে আছে, গ্রামে বন্যার জল ঢুকে গেছল সেবার। তখন থেকে শুরু। জল তো সরে গেল দুদিন বাদে — আরও দিন পনেরো সাপের উপদ্রবে কী ভীষণ আতঙ্ক। গাঁয়ের সব বাড়িতে সাপ আর সাপ। যেখানে সেখানে।

বড়কর্তা বললেন, — হবেই তো। কত সাপ ভেসে এসেছিল জলে। সাপের গর্ত সব ভরে গিছ্‌ল জলে। তখন ওরা শুকনো ডাঙা খুঁজবে। উঁচু জায়গায় উঠবে।

তা বটে। — মেজকর্তা যোগ দেন, — মনে আছে কত গাছের ডালে ডালে সাপ ঝুলছে। কী ভয়ানক দৃশ্য! গোখরো কেউটের মতো বাঘা বাঘা সাপ ফণা ধরে গজরাচ্ছে ডালে ডালে। আমাদের এই বাড়িতেই একতলা দোতলা মিলিয়ে অন্তত বিশ-পঁচিশটা বিষধর সাপ মারা হয়েছিল।

বড়কর্তা মাথা নাড়েন, — বিশ-পঁচিশ নয়। তবে সাত-আটটা মারা হয়েছিল।

ওই হল আর কী। — মেজকর্তা চাপা দেন, — অনেকগুলোকে তো মারাই গেল না। দেখা দিয়ে কোথায় যে সেঁধুল।

খুদুরা প্রথমে খানিক আগ্রহ নিয়ে শুনছিল বন্যার সময় সাপের গল্প। গল্প আর না থামার লক্ষণে তারা এবার চঞ্চল হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে একজন কাজের লোক এক কাপ গরম চা এনে বড়কর্তার সামনে টেবিলে রাখল। বড়কর্তা জিজ্ঞেস করলেন ভাইকে, — চা খাবি?

— চা? তা খেলে হয়। এখন একবার খাই চা। ছেলেগুলো হঠাৎ ডাকতে চলে এলাম। দাও চটপট।

ছেলেরা দেখল সর্বনাশ। এ যে জমিয়ে বসলেন। খুদু মৃদু কণ্ঠে বলে, — বাবা, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

দাঁড়া বাপু। — মেজকর্তা খিঁচিয়ে উঠলেন। — এখন একবার চা না খেলে আমার মাথা ধরে। আর শরীর ফিট না থাকলে নিশানা ঠিক হয় না। চট করে চা-টা খেয়ে যাচ্ছি।

বুলু বলে বসল, — আমিও মারতে পারি। বন্দুকটা পেলে।

নো। — শুনেই ধমকে উঠলেন মেজবাবু। — অভিজ্ঞতা চাই, প্র্যাকটিস চাই, টিপ চাই। নইলে ভেরি রিস্কি।

বড়কর্তা অর্থাৎ বুলুর বাবাও চোখ পাকালেন, — বেশি পাকামি হচ্চে? খবরদার বন্দুক চালাবি না। শেষে মানুষ খুন করে জেলে যাবি।

বুলু মিইয়ে যায় জোড়াদাবড়ানিতে।

মেজকর্তা ধীরেসুস্থে চা-য়ে চুমুক দেন। সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার সাপের গল্প চলে। আবার খুদু তাড়া দেয়, — বাবা চল।

— আঃ! অত ব্যস্ত কীসের? নজর রাখতে বলেছিস তো? পালাবে কোথা? যাচ্ছি, যাচ্ছি।

ঝাড়া পনেরো মিনিট তরিবৎ করে চা পানে কাটিয়ে মেজকর্তা উঠলেন অবশেষে। বড়কর্তা সাবধান করে দেন আবার, — দেখে শুনে ফায়ার করিস কিন্তু।

যেখানে সাপের দর্শন মিলেছিল সেই বারান্দায় তখন ছোটদের ভিড় আরও বেড়েছে। শুধু ছোটরা নয়, কয়েকজন বউ-ঝিও হাজির। সবাই উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলছে — কারও কথাই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

মেজকর্তা গটগট করে বন্দুক ঘাড়ে করে এসে বারান্দার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হুংকার দিলেন — কই সাপ?

বুধু এবং আরও কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে এক যোগে চেঁচিয়ে উঠল, — সাপ নেই। পালিয়েছে।

পালিয়েছে? ইস্। একটু আগে ডাকবি তো। গেল কোথায়? — মেজকর্তা বুঝি বেজায় নিরাশ।

বুধু দেখায়, — ওই ছাদের কাঠ দিয়ে গিয়ে ওই বাঁশটা রয়েছে কোণে, ওটা বেয়ে নেমে ছুটে গিয়ে বারান্দার রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে গলে মারল লাফ আম গাছের ডালে। তাপ্পর গাছ দিয়ে মাটিতে নেমে পালাল।

বুধুদা ওকে একটা ইঁট মারল যে ছাদে। তাপ্পরেই পালাল। — একটি ছোট মেয়ে ফাঁস করে দেয়।

কী! ইঁট মেরেছিলি? যদি তেড়ে এসে ছোবল দিত? কাণ্ডজ্ঞান নেই। — মেজকর্তা ধমকে উঠলেন।

বুধু কাঁচুমাচু। কিন্তু বড়বউঠান বুধুর হয়ে ঝেঁজে উঠলেন, — ছোবলাবে কী? ঢোঁড়া সাপ ভয়ে ওটা নিজেই আধমরা। কী দৌড়টা দিল!

— অ্যাঁ ঢোঁড়া! ধুস। মিছিমিছি সময় নষ্ট করালি। যাই।

মেজকর্তা নিশ্চিন্ত মনে হেলে-দুলে ফিরে চললেন বন্দুক কাঁধে। ফের দাবায় বসতে।

[২০০০, কিশোর ভারতী, শারদীয়া]

চোর নিয়ে রেষারেষি

মফস্‌সল লাইনের এক নগণ্য রেল-স্টেশন। স্টেশনের গায়ে রাখালচন্দ্র ফৌজদারের ছোট্ট চায়ের দোকান — তৃপ্তি কেবিন। এই স্টেশনে লোকাল ট্রেন থামে শুধু। যাত্রীদের ওঠানামাও কম।

বেলা তখন এগারোটা। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে থামার ট্রেন নেই। তৃপ্তি কেবিন প্রায় ফাঁকা। মাত্র তিনজন যুবক এক কোণে বেঞ্চিতে বসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে আড্ডা দিচ্ছে।

রাখাল ফৌজদারের বয়স সত্তর ছুঁয়েছে। একদা রাখালবাবুর পূর্বপুরুষরা এই অঞ্চলের বেশ বড় জমিদার ছিলেন। এখন অবশ্য তাঁদের অবস্থা একেবারে পড়ে গেছে। বিশাল ফৌজদার বাড়ির দশাও আজ জীর্ণ। এই বংশের বেশিরভাগ পরিবার এখন কায়ক্লেশে সংসার চালান। এই যেমন রাখাল ফৌজদার স্টেশনের কাছে চায়ের দোকান দিয়েছেন।

একজন মাঝবয়সি লোক কুণ্ঠিতভাবে দোকানে ঢুকে বেঞ্চিতে বসে নিচু গলায় বলল, এক কাপ চা।

রাখালচন্দ্র অর্ডার পেয়ে বিন্দুমাত্র উৎসাহ না দেখিয়ে একটু কড়া গলায় বললেন, তারাপদ, এবার কিন্তু তোমায় কিছু শোধ দিতে হবে। অনেক বাড়ি পড়ে গেছে। এ সপ্তাহেই চাই।

নতুন খদ্দের তারাপদ কাঁচুমাচুভাবে বলল, হ্যাঁ-হ্যাঁ সব মিটিয়ে দেব। একটু অসুবিধায় আছি তাই। যত শিগগিরি পারি —

রাখালবাবু গোমড়া মুখে বললেন, 'শুধু নিজের অসুবিধেটুকু দেখলেই হবে? আমারটা দেখছ কই? আমার সংসার চলে কী করে এত পাওনা বাকি থাকলে?

তারাপদ হতাশ কণ্ঠে বলে, বেশ দেব তাই, যতটা পারি।

রাখালচন্দ্র গম্ভীর মুখে চা বানাচ্ছেন। তারাপদ হঠাৎ বলে ওঠে, রাখালকাকা তোমাদের বংশের একটা ইন্টারেস্টিং গল্প বলো না। অনেক দিন শুনিনি। দারুণ লাগে। আমার তাড়া নেই। একটু বসে যাই। তারাপদর মতলবটা অন্য খদ্দেররা ভালোই বুঝল। রাখালচন্দ্রর কীর্তিকাহিনি শোনাতে পারলে রাখালকাকা বেজায় খুশি হন। তারাপদর ধার শোধের বোঝাটা হয়তো এ যাত্রা অনেক লাঘব হয়ে যাবে।

রাখালবাবুর মুখে হাসি ফোটে। বলেন, শুনতে চাও? তা শোনার মতোই বটে। ফৌজদার কর্তাদের মেজাজ-মর্জি ছিল বিচিত্র। কত কী যে ঘটত অদ্ভুত ব্যাপার। বেশ, সেই চোর নিয়ে

রেষারেষির কেসটা বলি। দুই কর্তার কাণ্ড। আমার ঠাকুর্দার আমলের বৃদ্ধ নায়েবমশায়ের মুখে শোনা।

রাখালবাবু ফৌজদার বংশের গল্প বলার উদ্যোগ নিতেই দোকানে আড্ডারত তিন বন্ধু মুচকি হেসে চোখাচোখি করেছিল। রাখালকাকার এই ধরনের বেশিরভাগ গল্পই তাদের বহুবার শোনা। তবে — চোর নিয়ে কেস শুনে তারা কান পাতে। গল্পটা নতুন মনে হচ্ছে।

রাখাল ফৌজদার শুরু করেন, বুঝলে হে, একবার ফৌজদার বাড়িতে এক চোর ধরা পড়ে। নেহাতই ছিঁচকে চোর। নিতেও পারেনি কিছু, তার আগেই বেচারা ধরা পড়ে গেল।

আমাদের ফৌজদার বাড়ি তো দেখেছ। মহলের পর মহল। বড়কর্তা মানে আমার সাক্ষাৎ ঠাকুর্দা এবং মেজকর্তা অর্থাৎ ঠাকুর্দার মেজভাই — এঁদের দুই মহলের মাঝে এক ফালি বাঁধানো উঠোন। একটা অচেনা লোক সেই মাঝখানের উঠোনে দাঁড়িয়ে ইতিউতি চাইছে দেখে বাড়ির কারও সন্দেহ হয়। হাঁক পাড়ে — ওখানে কে? কী কচ্চ?

শুনেই লোকটা তড়বড়িয়ে আধাছুট দিল। ব্যস — চোর-চোর চিৎকার। নানা ঘর থেকে লোক বেরিয়ে তার পিছু নিল এবং বাড়ির বাইরে যাওয়ার আগেই সে ধরা পড়ে গেল। কিছু উত্তম-মধ্যম খেয়ে লোকটা কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলল — সে মোটেই চোর নয়। এই বাড়িতে একজন কাজ করে, তার কুটুম, তারই খোঁজে এসেছিল। লোকটার বাড়ি নাকি মাইল দুই দূরের এক গাঁয়ে।

কে কুটুম? অচেনা লোকটা ঠিক নাম বলতে পারে না। ভুলভাল বলে। ওই নামে একজন ছিল বটে তখন ফৌজদার বাড়িতে, কিন্তু দেখা যায় সে মোটেই লোকটার কুটুম নয়। বাড়ির লোকের সন্দেহ বাড়ে। কর্তাদের কাছে খবর চলে যায়। খবর যায় থানায়।

তখন দুপুরবেলা। কর্তারা দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন, হয়তো দারোগাও তাই। দুই কর্তা — বড় আর মেজ এবং দারোগাবাবু রেডি হয়ে একতলায় পৌঁছলেন প্রায় একই সময়ে। বেশ কিছুক্ষণ বাদে।

উঠোনে বসলেন তিনজন। চোরকে হাজির করা হল তাঁদের সামনে।

অভিযুক্তকে দেখেই দারোগা হুংকার দিলেন, এ তো বংশী।

— কে বংশী? প্রশ্ন হয়।

— ব্যাটা দাগি চোর। অনেকবার জেল খেটেছে। মাঝবয়সি বংশী হাঁউমাউ করে উঠল, না-না চুরি করতে আসিনি সার। একজনকে খুঁজতে ঢুকে পড়েছিলুম।

যারা বংশীকে পাকড়াও করেছে তাদের সঙ্গে খানিক কথাবার্তা বলে দারোগাবাবু সঙ্গের দুই সেপাইকে বংশীকে দেখিয়ে হুকুম দিলেন, এই আদমিকো থানায় লে যাও।

কনস্টেবলরা বংশীকে নিয়ে চলে গেল থানায়।

এরপর দারোগা কর্তাদের বললেন, আপনারা কেউ একবার থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি করে দেবেন। আমি সেই বুঝে কেস তৈরি করব। চুরির চেষ্টা। নিজেরা না গেলেও চলবে। বাড়ির আর কাউকে পাঠাবেন।

বড়কর্তা গম্ভীরভাবে বললেন, এ কিন্তু আমার চোর। আমার মহলে ঢুকেছিল। সেই বুঝে

কেস লিখবেন।

কিন্তু সবাই যে বলছে ঢোকেনি তখনও। — দারোগাবাবু দোনামনা করেন।

— ওই একই ব্যাপার। ঢোকার মতলবে তো ছিল আমার মহলে। সুতরাং এ চোর আমার।

মেজকর্তা এবার সমান গম্ভীরভাবে বললেন, উঁহু দাদা, ঠিক বলছ না। লোকটা আমার বাড়িতেই ঢোকার মতলবে ছিল। ওইদিকেই উঁকি মারছিল, দেখেছে লোকে। সুতরাং এ লোকটা আমার চোর। আমার মহলেই ঢুকছিল — দারোগাবাবু, সেইভাবেই সাজাবেন কেস। ডায়েরি করতে লোক পাঠাচ্ছি থানায়।

বড়কর্তা থমথমে মুখে বললেন, বঙ্কু এটা তুই ঠিক বলছিস না। ওই বংশী-চোর আমার মহলের ভিতরেই উঁকি মারছিল। ওর মতলবটা পরিষ্কার। এ আমার চোর। এর বিরুদ্ধে যা করার আমিই করব।

মেজকর্তা দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বললেন, না দাদা তোমার ধারণা ঠিক নয়। এ চোর আমার। তুমি আর এ নিয়ে মাথা ঘামিও না।

বড়কর্তা আরও জোরের সঙ্গে বললেন, বঙ্কু ইউ আর রং। এ চোর আমার।

দারোগা দেখলেন যে মহা মুশকিল। দুই কর্তাই মান্যগণ্য ব্যক্তি। কাউকে চটানো চলে না। তিনি ভেবে নিয়ে বললেন, ঠিক আছে, আমি কেস লিখব, ওই দাগি চোর ফৌজদার বাড়িতে লুকিয়ে ঢুকেছিল। নির্ঘাত চুরির উদ্দেশ্যে। এরপর উকিলের জেরায় 'বংশী নিজেই বলুক কোন বাড়িতে সে ঢোকার ধান্দায় ছিল। যে বাড়ির কথা বলবে, তিনিই হবেন এই চোরের দাবিদার। সেটা ফয়সালা হবে কোর্টে। এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই।

এরপর বড়-মেজ দুতরফ থেকেই চা এবং প্রচুর টা এল দারোগাবাবুর জন্য। দারোগা পরিতৃপ্তি সহকার সব উদরস্থ করে বিদায় নিলেন।

বড়কর্তা-মেজকর্তা দুজনেই লোক পাঠিয়ে বংশীর নামে থানায় ডায়েরি করলেন।

রাখাল ফৌজদার গল্প থামিয়ে বললেন, কি তারাপদ আর এক কাপ চা হবে নাকি? খাও-খাও পয়সা লাগবে না। এটা আমিই খাওয়াচ্ছি। গজা, তারাপদদাকে এক কাপ চা করে দে।

গজা তৃপ্তি কেবিন-এর ছোকরা কাজের লোক।

— হ্যাঁ, বংশীকে দু-একদিন বাদেই কোর্টে হাজির করা হল। হাকিম দেখলেন, বংশী লোকটি দাগি চোর বটে, তবে এ-যাত্রা নিতে পারেনি কিছু। পুলিশও বংশীকে আটকে রাখতে আগ্রহ দেখাল না। ফলে বংশী সহজেই জামিন পেয়ে গেল।

পরে কেস উঠলে, সাক্ষী-সাবুদ, উকিলের জেরায় ঠিক হবে বংশী সাজা পাবে কি না।

বুঝলে যে, খেল শুরু হল এরপরে।

বংশীর বাড়িতে দুদিন বাদেই বড়কর্তার দূত গেল। গোড়াতেই সে বংশীর হাতে একখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে সাফসাফ জানাল — দেখ একটা শর্ত আছে। মামলায় বলবি, তুই বড়কর্তার মহলে চুরি করতে ঢুকেছিলি। যদিও কিছু হাতাতে পারিসনি।

বংশী টাকাটা পকেটে ভরে কাঁচুমাচুভাবে বলল, আজ্ঞে ঢুকিনি তো ভিতরে।

— ওই একই হল। বেশ, তবে বলিস, বড়কর্তার মহলে চুরির মতলবে গিছলি।

বংশী কাতরভাবে বলে, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এমন স্বীকার করলে যে আমার জেল হয়ে যাবে।

— তা হোক জেল। কিছু তো নিসনি। কদিন আর খাটবি? সে বড়কর্তা পুষিয়ে দেবেন। জেল খাটা তোর কাছে কিছু নতুন নয়।

বড়কর্তার লোক চলে যাওয়ার পরদিনই বংশীর কাছে এল মেজকর্তার লোক। সেও বংশীর হাতে দশ টাকা দিয়ে বলল, শোন জেরার সময় বলবি যে মেজকর্তার মহলে চুরি করতে ঢুকেছিলি।

— আজ্ঞে ঢুকিনি তো।

— বেশ, বলবি, মেজকর্তার বাড়িতে ঢোকার ধান্দায় গিছলি — মানে চুরি করতে।

— অ্যাঁ, হাকিমের সামনে এমন কবুল করলে যে নির্ঘাত আমার জেল হয়ে যাবে। বংশী আপত্তি জানায়।

— তা হোক, ক'দিন আর খাটবি? জেলখাটা তো তোর কাছে জলভাত। সে হেনস্তাটুকু মেজকর্তা পুষিয়ে দেবেন। তোর সংসারে যাতে অভাব না হয় দেখবেন কর্তা। তোকে শুধু স্বীকার করতে হবে যে মেজকর্তার মহল ছিল তোর টার্গেট।

— বুঝলে, এরপর থেকে বংশীর কাছে বড়কর্তা-মেজকর্তা দুজনেরই এজেন্ট মাঝেমাঝেই যেতে শুরু করল। প্রতিবার তারা কিছু ঘুষ দেয় বংশীকে আর বড়কর্তার দূত বলে, বংশী তুই বড়কর্তার মহলে চুরির মতলবে গিছলি বলবি ঠিক। আর মেজকর্তার লোক তাকে বলে আসে — মনে আছে তো কী বলবি? মেজকর্তার মহলে চুরির ধান্দায় ছিলি। নড়চড় না হয়।

বংশীই আসল লোক। তার কবুল করার ওপর নির্ভর করছে চোর কার। বড়কর্তার না মেজকর্তার?

এইদিকে বংশী খাসা আছে। দুপক্ষর কাছ থেকেই ঘুষ নেয় আর দুপক্ষকেই কথা দেয় — কিসসু ভাববেন না, আপনার কথামতোই বলব আদালতে।

বংশীর হাতে বিনা পরিশ্রমে দিব্যি দু-পয়সা আসছে। তাকে আর রাত-বিরেতে বিষয়কর্মে বেরুতে হয় না।

বড় এবং মেজকর্তা অবশ্য খবর পাচ্ছেন যে অন্য পক্ষের লোকও বংশীর কাছে যাচ্ছে। ওকে দলে টানার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই নিয়ে উভয়েই বেশ উদ্বেগে আছেন।

মাস তিনেক বাদে বংশীর কেস উঠল কোর্টে। কেসের দিনকয়েক আগে বড়-মেজ দুই কর্তার লোক আলাদা-আলাদাভাবে রীতিমতো শাসিয়ে এল বংশীকে — মনে থাকে যেন যা কথা দিয়েছিস, সেই মতো বলবি হাকিমের সামনে। খবরদার তঞ্চকতা করবিনে। তা হলে কপালে দুঃখ আছে। দু-পক্ষরই ভীষণ টেনশন। তারপর কী হল জানো?

— কী? দোকানের সব কটি খদ্দের তখন উদগ্রীব।

— কেসের আগের দিন বংশী হাওয়া। পালাল গ্রাম ছেড়ে। স্রেফ বেপাত্তা হয়ে গেল। কোর্টে হাজিরই হল না।

সেকী। তারাপদ চমকায়, জামিনের আসামি পালালে সমন জারি হবে যে। পুলিশ ধরে আনবে।

রাখালবাবু বললেন, সমন জারি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পুলিশ মানে সেই দারোগা বংশীকে ধরার কোনো চেষ্টাই করলেন না। মুখে অবশ্য তড়পাতেন, ধরব ঠিক। যাবে কোথা?

— তা এইভাবে আরও মাস চারেক কেটে গেল। এরপর বড়কর্তার নায়েবমশাই কর্তাকে একদিন বোঝালেন, হুজুর, বংশী লোকটা বেজায় গোলমেলে। মতি স্থির নেই। শেষমেশ আদালতে কার পক্ষে যে ঝুঁকবে কে জানে? ওর খুব শিক্ষা হয়েছে। এত দিন গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। নিতে তো পারেনি কিছু। গরিব মানুষ। মানে গরিব চোর। ওকে এবার মাপ করে দিন। কেস তুলে নিন হুজুর।

বড়কর্তা গরগর করেন রাগে, হতভাগাটা তাহলে আমাদের কথা দিল কেন, আমার চোর হবে? আবার টাকাও খেয়েচে আমার।

— এসব লোকের কি লাজলজ্জা আছে হুজুর! টাকার লোভে সব পারে। শুনছি ও মেজকর্তাকেও এমনি কথা দিয়েছিল। মেজকর্তার টাকাও খেয়েছে। এই তুচ্ছ বাজে চোরটাকে নিয়ে ভাইয়ে-ভাইয়ে বেশিদিন বিবাদ কি আপনাদের মতো মানী বংশে মানায়। কেস তুলে নিলে লোকে বরং ধন্য-ধন্য করবে — আহা কর্তার কী দয়ার শরীর! একটু চিন্তা করে দেখুন হুজুর।

নায়েবের কথায় বড়কর্তা একটু নরম হলেন। — হুম, বলেচ যথার্থ। তবে বঙ্কু কি রাজি হবে কেস তুলে নিতে? ও না তুললে কিন্তু আমি তুলব না।

— দেখি হুজুর চেষ্টা করে। বড়কর্তার নায়েব খুব খুশি।

এবার মেজকর্তার নায়েব, মেজকর্তার কাছে একইভাবে যুক্তি দিয়ে নিবেদন পেশ করলেন, বংশীকে এ-যাত্রা মাপ করে দিতে এবং কেস তুলে নিতে।

মেজকর্তা ভেবেচিন্তে বললেন, বেশ দাদা যদি রাজি হয় আমার আপত্তি নেই।

তখন দুই কর্তার তরফ থেকে আদালতে আর্জি পেশ করা হল বংশীর বিরুদ্ধে কেস তুলে নেওয়ার জন্য। সে দরখাস্ত মঞ্জুর হল।

— জানো, দুই নায়েবকে এই বুদ্ধি জুগিয়েছিলেন কে? স্বয়ং দারোগাবাবু। তার আগে দারোগার কাছে গিয়ে বংশী গোপনে কেঁদে পড়েছিল — হুজুর আমায় বাঁচান। ফলে দারোগার ওই পরামর্শ দুই নায়েবকে।

ওঃ, বংশী তো আচ্ছা সেয়ানা। তারাপদ মন্তব্য করে।

— বংশীর বুদ্ধির খবর আরও আছে হে। মুচকি হেসে জানালেন রাখাল ফৌজদার।

— কেস তো ডিসমিস হয়ে গেল। বংশী গ্রামে ফিরেছে বটে। তবে স্বস্তিতে নেই মোটে। দুই কর্তার সঙ্গে সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কর্তারা নির্ঘাত দারুণ চটেছেন। নিজেদের মধ্যে রেষারেষি ভুললেও বংশীর ওপর রাগ কি যাবে? ওঁদের যা মেজাজ। কর্তাদের টাকার জোর আছে, দুর্দান্ত সব লেঠেল-পাইক আছে। তাক বুঝে হয়তো কোনো দিন বংশীকে প্রচণ্ড ঠেঙাবে। হয়তো বা তার প্রাণটাই যাবে। বংশী তাই ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে বাড়ি আসে মাঝে মাঝে। বাড়ি থেকে বেরোয় কদাচিৎ। আবার চুপিসারে পালায় গ্রাম ছেড়ে বহু দূরে। সেসব জায়গায় চুরি করার সুবিধে হয় না। তাই সংসার তার অচল হওয়ার জোগাড়। দুশ্চিন্তায় বংশী মাথার চুল ছেঁড়ে। এর চেয়ে কিছু দিন জেল খেটে আসা ভালো ছিল। এরপর বংশী কী করল

জানো? একদিন সে চুপি-চুপি ফৌজদার বাড়িতে ঢুকে সটান আছড়ে পড়ল বড়কর্তার পায়ে — হুজুর আমায় মাপ করে দিন, ঘাট হয়েছে।

বড়কর্তা খুব একজোট তর্জনগর্জন, গালমন্দ করলেন।

বংশী মাথা পেতে সব মেনে নিয়ে করুণ মুখে জানাল, ভয়ে হুজুর ভয়ে, আপনার নির্দেশ মানতে পারিনি। তাহলে কি আর মেজবাবু আমায় আস্ত রাখতেন?

আর-এক দফা রাগ দেখিয়ে বড়কর্তা ঠান্ডা হলেন। তারপর বংশীকে কিছু দক্ষিণাও দিয়ে ফেললেন।

আর-একদিন বংশী লুকিয়ে হাজির হল মেজকর্তার কাছে। মেজকর্তার পায়ে ধরে একই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করল — দোহাই হুজুর আমায় মাপ করে দিন। বড়কর্তার ভয়ে আপনার কথা রাখতে পারিনি। নিরুপায় হয়ে কথার খেলাপ করিচি। গরিবের সংকটটা একবার বোঝেন হুজুর।

বড়কর্তার মতনই মেজকর্তা প্রথমে প্রচণ্ড রাগ দেখিয়ে শেষে নরম হলেন। ক্ষমাঘেন্না করে দিলেন বংশী-চোরকে। শুধু তাই নয়, বংশী ইনিয়ে-বিনিয়ে জানাল, ইদানীং তার কী হাল হয়েছে। কর্তাদের ভয়ে পালিয়ে বেড়ায়। রোজগার নেই। বউ-বাচ্চাদের খাবার জোটাতে পারছে না।

শুনে মেজকর্তা গলে গিয়ে একখানা নোট বের করে বংশীকে ছুড়ে দিয়ে বললেন, ঠিক হয়েছে হতচ্ছাড়া। নে — খবরদার, এ বাড়িতে আর কখখনো কুমতলবে ঢুকবিনে।

[২০০৩, কিশোর ভারতী শারদীয়া]
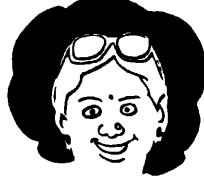
ডাবু জমা উদ্ধার রহস্য

ডাবুর কেসটা এক দারুণ চমক। অভিনব। ঘটনাটা লেখার আগে পশ্চাৎপট পৌষ মেলার কথা কিছু জানিয়ে রাখি।

সেদিন দুপুর থেকেই স্রোতের মতো লোক আসছে মেলায়। দলে দলে সদলবলে। বিকেলের মধ্যেই মেলা থইথই করতে লাগল মানুষের ভিড়ে।

সেদিন আট পৌষ। বীরভূম জেলায় শান্তিনিকেতনে বসেছে পৌষ মেলা। সাত পৌষে শুরু হয়ে তিন-চারদিন চলে মেলা। আট সন্ধ্যা সাতটায় মেলা গ্রাউন্ডে বাজি পোড়ানো হয়। ঘণ্টাখানেক ধরে চলে বিচিত্র বাজির প্রদর্শনী। শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলার এক বড় আকর্ষণ।

মেলা দেখতে শান্তিনিকেতন এবং লাগোয়া জায়গাগুলির প্রায় প্রতি বাড়িতেই হাজির হয়েছে গেস্ট। তবে যারা মাত্র একদিন আসে তারা সাধারণত আট পৌষটাই বেছে নেয়। কেনাকাটা করে। সার্কাস ম্যাজিক ইত্যাদি দেখে। চড়ে নাগরদোলা। মিষ্টির দোকান আর রেস্টুরেন্টগুলোয় রসনার স্বাদ মেটায়। এর সঙ্গে আছে দারুণ বাজির রোশনাই। এরপর কেউ কেউ ঘরে ফেরে। কেউ বা যাত্রা দেখে, যাত্রার প্যান্ডেলের নিচে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে বাড়ি ফেরে পরদিন ভোরে।

বাজি পোড়ানোর আর ঘণ্টাখানেক বাকি।

মেলার ভিতর অনেক সমান্তরাল চওড়া পথ রাখা হয়। পথের দু-ধারে দোকানের সারি। কতরকম জিনিসের দোকান। গাদাগাদি করে জনস্রোত বয়ে চলে ওইসব পথ বেয়ে। দু-ধারায় উলটো মুখে। দু-পাশের দোকানপাট দেখতে দেখতে। কখনও দাঁড়িয়ে পড়ে কিছু লোক। দরদাম কেনাকাটা চলে দোকানে দোকানে।

কখনও কখনও দুটো জনস্রোত ধাক্কা খায় মুখোমুখি। কতজন যে তখন ছিটকে পড়ে। যারা একসঙ্গে ঘোরে, তারা তাই পরস্পরের হাত ধরে, খুট ধরে এগোয়। কেউ ফস্কে গেলেই বিপদ। হয়তো হারিয়েই যাবে ভিড়ে। তখন তাকে নজর করে খুঁজে বের করা খুব কঠিন কাজ। চেঁচিয়ে ডাকলেও শুনতে পাওয়া ভার। অসংখ্য মানুষের কলরব এবং দোকানগুলোয় যা মাইকের গর্জন। বাচ্চা ছেলে, সব বয়সি মেয়ে এবং বৃদ্ধরাই হারায় বেশি। ছোট মেয়েরা ঘাবড়ে গিয়ে কান্না জোড়ে।

কোনো সহৃদয় দোকানি বা মেলায় ঘোরা লোক এমন সঙ্গীহারা অসহায় কারোর দেখা পেলে তাকে মেলা ভলন্টিয়ার্স অফিসে জমা দিয়ে আসে। সেটাই সবচেয়ে নিরাপদ সমাধান। মেলা অফিস থেকে বারবার মাইকে ঘোষণা করা হয় জমা পড়া মানুষটির বিবরণ। যদি ঘোষণা শুনে তার নিজের লোক মেলা অফিস থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় তাকে।

আর এক দল আসে ভলন্টিয়ার্স অফিসে যাদের আপনজন চেনাশোনা কেউ হারিয়ে গেছে মেলার ভিড়ে, তাদের খোঁজে। কেউ কি জমা দিয়েছে তাদের? নিখোঁজ মানুষটির নামধাম বিবরণ বলে মাইকে ঘোষণা করা হয় বারবার। যদি সেই ঘোষণা শুনে তার নিজের লোক খোঁজ নিতে আসে মেলা অফিসে।

আট পৌষ বিকেল থেকেই তাই মেলা ভলান্টিয়ার্স অফিসে কাজের চাপ প্রচণ্ড। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামতে না নামতেই হিমশিম খাচ্ছে ডিউটিরত আটজন স্টুডেন্ট ভলন্টিয়ার এবং তাদের টিচার-ইন-চার্জ নন্দবাবু।

সংস্কৃতের অধ্যাপক নন্দবাবু অতি নিরীহ মানুষ। আজই সন্ধ্যায় তাঁর ডিউটি ছিল না মোটেই। ভাগ্যচক্রে এই দায়িত্ব পড়েছে তাঁর ঘাড়ে। এই সময় সাধারণত ডিউটি দেন ইতিহাসের শঙ্করবাবু। তিনি একাজের উপযুক্ত জাঁদরেল ব্যক্তি। কিন্তু সেদিন দুপুর থেকে হঠাৎ তাঁর জ্বর হওয়ায় নন্দবাবুর ঘাড়ে এই দায়িত্ব বর্তেছে।

সবাই এড়িয়ে গেছেন নানান ছুতোয়। অবশেষে ভালোমানুষ নন্দবাবুকে রাজি করানো হয়েছে। মেলা কমিটির কর্মকর্তাদের অনুরোধ তিনি ফেরাতে পারেননি। তাঁকে বোঝানো হয়েছে যে মশাই কিস্‌সু ঘাবড়াবেন না। স্টুডেন্ট ভলান্টিয়াররাই সব সামলে দেবে। ওরা এক্সপার্ট। আপনার ডিউটি শুধু হারানো প্রাপ্তির নামটাম লেখা। ভলান্টিয়ার ছাত্রছাত্রীদের কিছু নির্দেশ দেওয়া। ওদের চা ও টিফিনের জন্য স্লিপ কাটা।

স্টুডেন্ট ভলান্টিয়ারদের মধ্যে ছয়জন ছেলে আর দুজন মেয়ে। ওরা সবাই কলেজে পড়ে। অজয় আর নক্ষত্র এদের মধ্যে সিনিয়র। বলা যায় তারাই লিডার।

প্রশস্ত ভলান্টিয়ার অফিসের ছাউনিতে মাঝামাঝি জায়গায় একখানা টেবিলের পিছনে চেয়ারে বসে উদ্বিগ্ন বদন নন্দবাবু। পাশের দিকে আরও তিনটে চেয়ার, দুটো তক্তপোশ ও একখানা বেঞ্চি। আর একটা টেবিলের ওপর মাইক্রোফোন যন্ত্র। টেবিলের পিছনে চেয়ারে বসে হারানো প্রাপ্তি ঘোষণাকারী। সাধারণত মেয়েরাই করে এই ডিউটি।

ভলান্টিয়ারদের অবস্থান থেকে তিন-চার হাত দূরে দড়ির বেড়া। বেড়ার ওপাশে উৎকণ্ঠিত জনতার ভিড়। সন্ধে নামার পর থেকে ভিড়টা বেড়েই চলেছে।

বহু কণ্ঠের কাতর আবেদন ধ্বনিত হয় স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্দেশে।

— ও দাদা, আমার কেসটা আবার বলুন মাইকে।

— ও মশাই, আমার মেয়েটা হারিয়ে গেছে। এই এতটুকুন। ভিড়ের ধাক্কায় কোথায় যে? কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠ।

অজয় ও নক্ষত্র সমানে নির্দেশ দিচ্ছে — একসঙ্গে নয়। একসঙ্গে নয়। এক-এক করে বলুন।

নার্ভাস বা উত্তেজিত হলে নন্দবাবুর মুখ দিয়ে ইংরেজি ও বাঙাল ভাষা বেরোয়। তিনি

বিড়বিড় করছেন কেবলই, মাইগড। খাইসে। প্যান্ডামনিয়াম। ওফ...। ভয়ে-ভয়ে দেখছেন অফিসের বেড়ার বাইরে উপচে পড়া ভিড়। আর ছাত্রদের ডাকছেন, দেখহে কী বলছে?

একখানা মোটা খাতা খুলে নন্দবাবু ক্রমাগত লিখে চলেছেন হারানো প্রাপ্তির কেস। তাদের নামধাম বর্ণনা ইত্যাদি। একজনের কেস শেষ করেই বলছেন, নেক্সট। এরই ফাঁকে-ফাঁকে কাগজে স্লিপ লিখে এগিয়ে দিচ্ছেন মাইকে বাগিয়ে বসা মেয়ে ভলান্টিয়ারটির হাতে ঘোষণার জন্য।

মেয়েটি মহা উৎসাহে ঘোষণা করে চলেছে, একটি বাচ্চা মেয়ে পাওয়া গেছে। রং ফরসা। পরনে হালকা নীল ফ্রক। মাথায় লাল রিবন। বয়স চার-পাঁচ। নাম বলছে বুড়ি। ইত্যাদি।

আবার ঘোষণা হয় — নতুনগ্রামের অনাথনাথ ফৌজদার। আপনি যেখানেই থাকুন এখুনি মেলা ভলান্টিয়ার্স অফিসে চলে আসুন। আপনার বন্ধুরা আপনার জন্য এখানে অপেক্ষা করছে।

শুধু বাংলায় নয় হিন্দি ও ইংরেজিতেও ঘোষণা হচ্ছে মাঝে-মাঝে। কারণ হারানো প্রাপ্তির কেউ-কেউ মোটেই বাংলা বোঝে না। হারানো প্রাপ্তির মধ্যে প্রাপ্তির সংখ্যা ঢের কম। জমা কেসগুলো সামাল দেওয়া রীতিমতো কঠিন ব্যাপার। জমাপড়া বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো কেউ নাগাড়ে কেঁদে চলেছে। কেউ থেকে-থেকে ফুঁপিয়ে উঠছে। তক্তপোশে আর বেঞ্চিতে বসেছে তারা।

অজয় নজর করে ডাবু নামে জমা পড়া বাচ্চা ছেলেটা দিব্যি স্মার্ট। সে মোটেই কান্নাকাটি করছে না। আধঘণ্টা আগে ধুতি শার্ট শাল গায়ে এক ভদ্রলোক এসে এই বছর চারেকের ছেলেটিকে জমা দিয়ে গেছেন। ও নাকি মেলায় একা দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। বাবা-মার থেকে ছটকে গেছে ভিড়ে। নাম বলছে ডাবু। ভালো নাম বিপিন। বাড়ি ঘোষপাড়া। বাবা-মা-দিদির সঙ্গে এসেছিল। ব্যস আর কিছু বলতে পারছে না।

ভদ্রলোক যখন ছেলেটিকে আনেন তখন বাচ্চাটা ফোঁৎ-ফোঁৎ করে অল্প ফোঁপাচ্ছিল। তারপর বেশ সামলে গেছে। জ্যাবড্যাব করে দেখছে চারপাশে।

ছেলেটির পরনে সাদা শার্টের ওপর ফুলহাতা হলুদ সোয়েটার, হাফ-প্যান্ট, জুতো মোজা। অজয় ডাবুর থেকে আরও কিছু খবর বের করার আশায় প্রশ্ন করেছিল, ডাবু তোমার বাবার নাম কী জানো?

ডাবু ঘাড় কাত করে খানিক ভেবে বলে, — খোকা।

— অ্যাঁ। খোকা।

— হুঁ। জ্যেঠু, ঠাম্মা তাই বলে ডাকে।

— আরে দুর ওটা ডাক নাম। বাইরের লোক কী বলে ডাকে তোমার বাবাকে?

ডাবু চটপট জবাব দেয়, মন্টুদা। তিনুকাকা নাড়ুকাকারা ওই নামে ডাকে। ওরা অন্য বাড়ির লোক।

— ধুস। ওটাও ডাকনাম। মন্টু কারও ভালো নাম হয় নাকি? অজয় হাল ছেড়ে দেয়।

এরপর মাইকে কয়েকবার ঘোষণা করা হয়েছে, একটি বছর চারেকের ছেলে পাওয়া গেছে। মেলা ভলান্টিয়ার্স অফিসে জমা আছে। ডাকনাম ডাবু। ভালোনাম বিপিন। বাড়ি ঘোষপাড়া গ্রাম। পরনে সাদা শার্ট...। মাতৃভাষা বাংলা। বাবার ডাক নাম বলছে মন্টু।

কিন্তু এখনও কেউ আসেনি ডাবুর খোঁজে।

জমাপড়া কয়েকজন বউ-ঝি বসেছে একটু দূরে তক্তপোশে। ডাবু বসেছে অন্য তক্তপোশটায়। তার পাশেই তিনটি বেওয়ারিশ বাচ্চা। তাদের দুজন ছেলে, একটি মেয়ে। তাদের বয়স বছর চার-ছয়ের মধ্যে। অর্থাৎ ডাবুর বয়সি। ভলান্টিয়াররা তাদের ঠান্ডা রাখতে এটা-ওটা খাওয়াচ্ছে নিজেদের গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে। মেয়েটি তো কিছু মুখেই তুলল না। হাপুস নয়নে কেঁদে-কেঁদে অবশেষে শুয়ে ঘুমিয়েই পড়ল। অন্য দুটি বাচ্চা কিছু চিনে বাদাম ভাজা খেল বটে কিন্তু তাদের কান্না পুরো থামানো যাচ্ছে না।

ডাবু জমা পড়ার পর মিনিট পনেরো চুপচাপ থেকে অন্য প্রাপ্তিদের আঙুল দেখিয়ে জিগ্যেস করেছিল, ওরা কাঁদছে কেন?

— ওরা তোমার মতো হারিয়ে গেছে কি না, তাই ভয়ে কাঁদছে। বোঝায় নক্ষত্র।

শোনা মাত্র ডাবু চোখ মুখ কুঁচকে মুখ ভেটকেছিল। অর্থাৎ কান্নার আভাস। অজয় ব্যস্ত হয়, কেঁদো না, কেঁদো না। কোনো ভয় নেই। বাবা ঠিক এসে নিয়ে যাবে। এই নাও খাও — সে এক ঠোঙা চিনেবাদাম ভাজা ডাবুর সামনে রাখে।

ব্যস, এরপর থেকে ডাবু আর গোলমাল করেনি। পুটপুট করে বাদাম ভেঙে মুখে পুরছে তার গোলগোল চোখে দেখছে অন্যদের ব্যাপার-স্যাপার। মাইকে ঘোষণা দেখে সে ভারি অবাক। একবার বলল, — ওটায় কথা বললে কী জোর শব্দ হয়?

নক্ষত্র বোঝাল, ওটার নাম মাইক্রোফোন। একটা যন্ত্র। ওর সামনে শব্দ করলে আওয়াজের জোর খুব বেড়ে যায়। মজার যন্ত্র। তাই না?

— আমি একবার বলব? ডাবু আবদার করে।

— এখন নয়। ভিড় কমুক। তোমার বাবা আসুক।

অমনি ডাবু খুনখুন করে আওয়াজ ছাড়ে, বাবা এখনও আসছে না কেন?

অজয় তড়িঘড়ি বলে, — আহা কান্না কেন? বেশ তো ছিলে লক্ষ্মী হয়ে। বাবা তোমার আসবে ঠিক। ভিড় ঠেলে আসতে দেরি হচ্ছে। এই নাও — সে একটা লজেন্স দিতেই ডাবু টপ করে সেটা মুখে ফেলে শান্ত হয়ে যায়।

কোনো জমা পড়া কেস উদ্ধার হলেই নন্দবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মন্তব্য করছেন, যাক একটা আপদ চুকল।

বাজি শুরুর আর প্রায় আধঘণ্টা বাকি। গমগম করছে মেলা। ভলান্টিয়ার্স অফিসের ওপর বাড়ছে চাপ। নক্ষত্র জানাল, এখন আর কী দেখছেন? বাজির পর যা অবস্থা হয়। সাংঘাতিক ঝামেলা। তখন এত লোক হারায়। শুনে নন্দবাবুর মুখের যা করুণ অবস্থা।

একটি বছর কুড়ির যুবক কেবলই অনুনয় বিনয় করছিল, আমারটা আর একবার অ্যানাউন্স করুন সার।

নন্দবাবু হঠাৎ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন, ওকে থামাও তো। ধাড়ি ছেলে। বাস সুদ্ধু লোককে হারিয়ে এখন সমানে ফ্যাচর-ফ্যাচর করছে।

ধমক খেয়ে যুবকটি চুপ।

যুবকটি এসেছে বর্ধমান থেকে একখানা বাস ভাড়া করে পঞ্চাশজন মিলে। এ কেমন ভাবে জানি দলছুট হয়ে গেছে। দলের কাউকে খুঁজে না পেয়ে এখানে ধর্না দিয়েছে বাসের সঙ্গীদের

কে দিতে। নির্ঘাত এ দলের লোকদের লুকিয়ে ঢুকেছিল কোনো দোকানে ভালোমন্দ খেতে অথবা ম্যাজিক-ট্যাজিক কিছু দেখতে। ফলে সঙ্গীরা ওকে ফেলে রেখে ঘুরছে।

অজয় বলে যুবককে, — আপনাদের বাস কখন ছাড়বে?

— কাল ভোরে।

— কোথায় বাস আছে জানেন?

— আজ্ঞে হ্যাঁ।

— তবে আর ভাবনা কী? বাজি অবধি ওয়েট করুন। দেখুন দলের লোকেরা আসে কি না? এখন আমরা বিজি। বাজির পর ফের আপনার কেসটা অ্যানাউন্স করব। না পেলে আর কী হবে? রাতে গিয়ে বাসে শুয়ে থাকবেন।

— তবে যাই এখন। যুবক শুকনো মুখে জানায়, পার্টির লোক খোঁজ করলে বলবেন রাতে যাত্রার আসরে থাকব।

লাল শাড়ি পরা আধঘোমটা টানা একটি বউ উঁকি মারে ভিড়ের ফাঁক দিয়ে। তারপর মহা উৎফুল্ল কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে, ও ডাবু সোনা, তুই এখানে। বাঁচালি বাপ।

চকিতে ডাবু বউটির দিকে মুখ ফিরিয়ে একগাল হাসল।

— চেনেন একে। ডাবুকে দেখিয়ে নক্ষত্র প্রশ্ন করে বউটিকে।

— হ্যাঁ গো। আমার ছেলে বটে। জানায় বউটি।

— এঁকে চেনো? এবার বউটিকে দেখিয়ে ডাবুকে জিজ্ঞেস করে অজয়। লজেন্স চুষতে চুষতে ঘাড় নাড়ে ডাবু। অর্থাৎ হাঁ।

— কে হয়?

— মা।

— ও হারাল কীভাবে? ছেলের মাকে প্রশ্ন করে অজয়।

— কী জানি? কী করে যে ছিটকে গেল। যা ভিড়। তারপর কত খুঁজছি।

— এতক্ষণ কী করেছিলেন? কতবার ডাকলাম মাইকে ওর নাম করে। রেগে বলে নক্ষত্র।

শুনতে পাইনি বাবা। বউটি থতমত খায়, যা আওয়াজ চতুর্দিকে। একজন বলল, — মেলা আপিসে খোঁজ কর। তাই এলেম।

— আপনি একা কেন? ওর বাবা কোথায়? অজয়ের প্রশ্ন।

— ছেলে খুঁজছে।

— এই সেরেছে। অজয় আঁতকায়, এখন ছেলে নিয়ে আপনি হারাবেন। তারপর ছেলের বাবা আসবেন আপনাদের খোঁজে। আপনি থাকুন। এখানে, মাইকে আপনার স্বামীকে ডাকছি। এসে নিয়ে যাক আপনাদের। নইলে ফের ঝনঝাট হবে।

বউটি ব্যস্ত হয়ে বললেন, না বাবা হারাব না। তিনি হুই মোড়ে পুতুলের দোকানের সামনে থাকবেন বলেছেন। আমায় মেলা আপিসে দেখতে পাঠালেন। বলতে-বলতে ছেলেকে কোলে তুলে নেয় ডাবুর মা।

ডাবু মায়ের কোলে উঠেই বলল, কিনেচ?

বলল, হাঁ বাবা। চল-চল বড্ড দেরি হয়ে গেল। এখুনি বাজি শুরু হবে।

অজয় দোনামনা করছিল, ডাবু আর তার মাকে এই ভিড়ে ছাড়া উচিত হবে কি না? কিন্তু নন্দবাবুর আর তর সইল না। ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতে পারলে বাঁচেন। এতক্ষণ তিনি চুপচাপ শুনছিলেন কেসটা। তিনি খাতা কলম বাগিয়ে বললেন বউটিকে, — একটু দাঁড়ান। আপনার নামধাম লিখে নিই। হ্যাঁ বলুন আপনার নাম?

— আজ্ঞে শ্রীমতী বকুলবালা ঘোষ।

— ছেলের ভালো নাম?

— বিপিনচন্দ্র ঘোষ।

— স্বামীর নাম?

বউটি অমনি জিভ কাটে। — বলতে লারব বাবা। উচ্চারণে মানা।

— নিবাস? মানে গ্রাম? বাড়ি কোথায়?

— আজ্ঞে সুপুর।

— অ্যাঁ সুপুর। বলে অজয়, তবে যে ছেলে বলল বাড়ি ঘোষপাড়া।

— ওটা পাড়ার নাম। সুপুর গাঁয়ে।

নন্দবাবু খাতাখাতা এগিয়ে দিয়ে বললেন, এইখানে একটা সই দিতে হবে। নাম লিখতে পারেন? নইলে টিপছাপ দিন।

— লিখতে পারি বইকী। গর্ব ভরে জানায় ডাবুর মা, কেলাস সেভেন পাশ বটি।

ডাবুর মা আঁকাবাঁকা অক্ষরে দস্তখত করেন। তারপর বলেন, বড্ড উবগার করলেন আপনারা। বলেই বউটি ছেলে কোলে পা চালাল ভিড়ের মাঝে।

— আপদটা চুকল। মন্তব্য করে ডাবুর নামের পাশে লাল কালির ঢেরা দিলেন নন্দবাবু।

অজয় ঘাড় উঁচিয়ে দেখছিল কিছু। হঠাৎ সে নক্ষত্রের হাত ধরে টেনে বলে, আয় তো।

— কোথায়?

— আঃ আয় না!

সামনের ভিড় ভেদ করে খানিক গিয়েই থমকে যায় অজয়। জায়গাটা পুলিশ ক্যাম্পের পাশে। সেখানে আলো কম। নক্ষত্র দেখল যে কিছু দূরে সেই ডাবু, ডাবুর মা, এক ভদ্রলোক এবং বছর আটেকের একটি মেয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ডাবু ভদ্রলোকের দিকে হাত উঁচিয়ে চেঁচাচ্ছে, ও বাবা দাও না। ও বাবা এবার দাও —

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, — এখন নয়। বাজির পরে। এখন হারিয়ে ফেলবি।

— না হারাব না। ডাবুর আবদারের গলা আরও ওঠে।

অজয় সহসা দ্রুত পায়ে সটান ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে ডাবুকে দেখিয়ে প্রশ্ন করে, আপনার ছেলে?

— হ্যাঁ। ভদ্রলোক মাথা ঝাঁকান।

— অ্যাঁ? আপনিই তো মশাই এই ছেলেকে মেলা অফিসে জমা দিয়ে গিছলেন। হারানো অচেনা ছেলে বলে।

ভদ্রলোক চমকে গিয়ে অজয়ের দিকে চেয়ে থাকেন ভূত দেখার মতো আড়ষ্ট হয়ে। তাঁর মুখ দিয়ে কথা সরে না। নক্ষত্রও এবার চিনতে পারে। হুঁ, সেইই বটে! আশ্চর্য!

— কী ব্যাপার? ধমকে ওঠে অজয়।

— কী করব ভাই, বাধ্য হয়ে। ধরা পড়ে গিয়ে ভদ্রলোক বেজায় কাঁচুমাচু। — মানে?

— ক'টা কেনাকাটি ছিল। বাজির আগে সারতে হবে, পরে ভিড় আরও বাড়ে। কিন্তু এই ছেলেকে নিয়ে তো পণ্ড হওয়ার উপক্রম। হাঁটানো দায়। পায়ে পিষে মরবে। কোলে নিয়ে কাঁহাতক চলা যায় ভিড় ঠেলে। আরেক হাতে ধরা রয়েছে মেয়েটা। একটুক্ষণ নামিয়েছি জিরোতে। অমনি ছিটকে হারিয়ে যাচ্ছিল আর কী! যা ছটফটে। খুব মুশকিলে পড়েছিলেম। তখন ভাবলাম, মেলা অফিসে রেখে আসি। নিরাপদে থাকবে যাহোক। কেনাকাটি সেরে ফেলি তার মধ্যে। আসল কারণটা বললে কী আর রাখতে দিত অফিসে? তাই —

— কেন ওর মা? মা ছেলেকে কোলে নিতে পারতেন?

— হুঁ। ওর মা। নিজেকে সামলাতেই হিমশিম। আবার ছেলে কোলে?

ডাবুর বাবা ঠোঁট বেঁকান।

— হ্যাঁ, বাবা যা ভিড়। ডাবুর মা সাফাই গায়।

— ও। অজয়ের ভাব দেখে মনে হয় তার রাগ বিশেষ কমেনি। ওরই পয়সায় বাদাম আর লজেন্স খেয়েছে যে শ্রীমান ডাবু। নক্ষত্র নীরবে দাঁত বের করে হাসছে।

অজয় কড়া গলায় বলে, তা গ্রামের নামটা চেপে গিছলেন কেন জমা দেওয়ার সময়?

ডাবুর বাবা আরও লজ্জিত ভাবে বলেন, ওই সাতপাঁচ ভেবে। নানুরের লোক তো কম আসেনি মেলায়। দু-একজনের সঙ্গে দেখাও হয়েছে। ঘোষপাড়ার লোকও এসেছে। তাদের কেউ যদি দেখতে যায়, নানুরের কে হারাল? কার ছেলে? আমার নাম বলে দেবে ডাবুকে দেখে। মাইকে আমার নাম ধরে তখন ডাকাডাকি হবে। তাই না হয় না শোনার ভান করলাম। কিন্তু গ্রামের চেনা কেউ মেলায় দেখলে ঠিক টেনে নিয়ে যাবে মেলা অফিসে। কেনাকাটি শেষ না হতেই। প্ল্যানটাই আমার ভেস্তে যাবে। এই ভয়ে আর কী —

— বাঃ। বেশ আঁটঘাট বেঁধেই করেছেন। অজয়ের কণ্ঠে শ্লেষ।

ডাবুর বাবা চুপ। মাথা নত।

অজয় ছাড়ে না তখনও। ফের খোঁচায় গম্ভীর গলায়, শুধু নিজের ঝামেলাটার কথাই ভাবলেন। অতটুকু ছেলে, অচেনা জায়গায় একা রেখে এলেন অতক্ষণ! কাঁদছিল যে ভয়ে। বেশ আক্কেল আপনার?

— কাঁদছিল বুঝি? ভারি কুণ্ঠিত যেন ডাবুর বাবা।

ভদ্রলোককে অজয় আরও দুটো কড়া কথা শোনানোর আগেই ডাবু ফস করে বলে বসল, ভয়ে কাঁদব কেন? বাবা যে বলে দিল কাঁদবি মাঝে-মাঝে।

— কেন? অজয় ও নক্ষত্র থ।

ফ্যাক করে হেসে ডাবু জবাব দেয়, বাবা বলেছিল কাঁদবি। নইলে মেলা আপিসে বিশ্বাস করবে না তুই হারিয়ে গেচিস। কথা মতো থাকলে একটা রবারের বল কিনে দেব। ও বাবা, দাও না বলটা।

আচ্ছা সেয়ানা। — বলতে বলতে নক্ষত্রর হাত ধরে টান মেরে অজয় হনহনিয়ে পা চালাল ভলান্টিয়ার্স অফিসের দিকে।

[২০০৪ কিশোর ভারতী শারদীয়া]

পরিবর্তন

নব অস্থির হয়ে উঠল। উপায় কিছু একটা করতেই হবে। নইলে এমন সুযোগ কি আর আসবে? হয়তো আর আসবে না আর সারা জীবনে। এ আপশোস তার কখনও যাবে না। অথচ কোনো উপায়ই যে খুঁজে পাচ্ছে না নব। কী করা?

তপনকুমার। নামটা শুনলেই শিহরন জাগে নবর মনে। যাত্রা জগতের অদ্বিতীয় অভিনেতা নটসম্রাট তপনকুমারের অভিনয় প্রতিভার কত গল্প শুনেছে নব। কিন্তু নবর চাক্ষুষ দেখা হয়নি তপনকুমারের অভিনয়। সেই তপনকুমার অভিনয় করতে আসছে এত কাছে। মাত্র মাইলপাঁচেক দূরে পাটুলি গ্রামে। তপনকুমার যে দলে যাত্রা করে সেই রয়াল অপেরা খুব নামী-দামি দল। এমন গাঁয়ে-গঞ্জে সে দল কদাচিৎ আসে। নেহাতই ভাগ্যক্রমে তা সম্ভব হচ্ছে।

কাঁথি শহরে যাত্রা করে রয়াল অপেরা যাবে দুর্গাপুরে। পথে পড়ে পাটুলি গ্রাম, বাসরাস্তার কাছেই। পাটুলির এক মাতব্বর ব্যক্তির সঙ্গে জানাশোনা আছে রয়াল অপেরার মালিকের। দুর্গাপুরের ডেট একদিন পিছিয়ে দিয়ে রয়াল অপেরা শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছে পাটুলির অনুরোধে। আশেপাশে গ্রামে-গঞ্জে সে-বার্তা রটে গেছে। নবর গ্রাম পঁচেত থেকেই কতজন তো যাবে সে-রাতে তপনকুমারের অ্যাকটিং দেখতে। আর নবর যাওয়া হবে না?

নব ব্যক্তিটি কে? কেনই বা তার যাওয়া আটকাচ্ছে তপনকুমারের অভিনয় দেখতে? নবকুমার দাস ওরফে নবর কয়েক পুরুষের বাস পঁচেত গ্রামে। নবর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। নব গরিব মানুষ। চেহারা খুবই সাধারণ। কষ্টেসৃষ্টে জীবনযাত্রা। বিঘেসাতেক চাষের জমি আছে নবর। ওই জমিতে চাষ করে তার পরিবারের সারা বছরের খরচ মেটে না। বড়জোর ছ-সাত মাস চলে। পরিবার বলতে নবর স্ত্রী আছে, বছর বারোর একটি ছেলে আছে, আর আছে বৃদ্ধা মা। তাই সংসারের অভাব মেটাতে অন্য রোজগারের ধান্দা করতে হয় নবকে। এই অন্য ধান্দার সূত্রেই নবর খ্যাতি বা কুখ্যাতি। কারণ পঁচেত ও আশপাশের গাঁয়ের লোকেরা জানে যে, নব অতি দক্ষ চোর। বলা যায় চুরি করা নবর বংশের ধারা।

তবে নব অতি সেয়ানা। তাকে ধরা কঠিন কাজ। গ্রামে চুরি নব কম করেনি। কিন্তু সেসব চুরি যে নব করেছে তার জোরদার প্রমাণ মিলেছে মাত্র দুবার। এরজন্য নবকে স্বল্পমেয়াদের জেলও খাটতে হয়েছে। থানার মতে নব-চোরের হাতের কাজ দেখলেই ধরা যায়। সিঁধ কাটায়

আর ছিটকিনি-খিল খোলায় অমন পাকা হাত কমই আছে এ-তল্লাটে। ভাগ্যি লোকটা পুরোপুরি চোর বনে যায়নি। শুধু অভাবে চুরি করে। এসব কথা কানে আসে নবর। শুনে সে বেশ গর্বই অনুভব করে। হুঁ-হুঁ অনেক যত্নে শেখা বিদ্যে, হাতুড়ে নই।

নব যাত্রাপাগল। নিজে কয়েকবার নেমেছে বটে গাঁয়ের পালায়, কিন্তু অভিনয়ে বিশেষ জুত করতে পারেনি। তার বেশি শখ যাত্রা দেখায়। কাছাকাছি শুধু নয়, দূর-দূরান্তরেও সে ছোটে যাত্রা দেখতে। ঠায় বসে দেখে পালা। যেন গিলে খায় প্রতিটি পার্ট, প্রতিটি সিন।

তা পাটুলি গ্রামে তপনকুমার আসছে খবরটা শোনা অবধি নবর মনে শান্তি নেই। বছরে এই সময়টা যে বড়ই খারাপ। চাষের ধান এখনও ওঠেনি ঘরে। সংসারে হাঁড়ি চড়াতে হিমশিম খাচ্ছে। তাই এমনি টানাটানির সময় নব সুযোগ পেলেই চুরি করে।

এ-বছরটায় যেন অভাব বেশি। নবর হাতে দুটো টাকাও নগদ নেই। এদিকে তপনকুমারকে দেখতে-শুনতে সবচেয়ে কম দামের টিকিটেরও দাম করেছে পনেরো টাকা মাথা পিছু। হোক শেষ সারির দর্শক তবু ওই পনেরো টাকা নগদ জোটাবে কীভাবে, নব ভেবেই পাচ্ছে না।

আর মাত্র আটদিন বাদে তপনকুমার অর্থাৎ রয়াল অপেরার আবির্ভাব হবে পাটুলিতে। খবরটা যে নবর কানে এল বড় দেরিতে। দোষ তার নয়। রয়াল অপেরাই মাত্র দশ দিন আগে জানিয়েছে পাটুলিতে যে দুর্গাপুর রাজি হয়েছে ওদের প্রোগ্রাম একদিন পিছোতে। অতএব তারা পাটুলিতে পালা করে যেতে পারবে।

এই দিন আষ্টেকের মধ্যে পঁচেত গ্রামে চুরি করা বেজায় বিপদজনক। এইসময় দু-দুটো বিয়ে লেগেছে গাঁয়ে। আর একটা বউভাত। বিয়ে বাড়িগুলোয় বাইরের জ্ঞাতিগুষ্টি এসে জুটেছে প্রচুর। দিনে-রাতে যখন-তখন লোক যাচ্ছে উৎসব বাড়িগুলোয়, কেউ বা বেরুচ্ছে। আবার সন্ধে থেকে বেশি রাত অবধি গ্রামে পুরোদমে চলছে পুজোর যাত্রার রিহার্সাল।

এর ওপর আর এক ঝামেলা। প্রকৃতি বিরূপ। ফুটফুটে জ্যোৎস্না চলছে। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে গাঁয়ের পথঘাট-বাড়িঘর-উঠোন — খোলা জায়গা যত আছে। গাছের নিচে-নিচে ছায়াও তেমন গাঢ় নয়।

তপনকুমারের অভিনয় দেখার জন্য টাকা জোগাড়ের নানান ফন্দি ঘোরে নবর মাথায়। অন্তত পনেরো টাকা নগদ জোগাড় করা চাই।

পাটুলিতে যাত্রা দেখতে গেলে হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। নবর সাইকেলটা আপাতত অচল। সামনের চাকার পুরোনো টায়ার-টিউব দুই ফেটে গেছে।

ঘণ্টা তিন-চার পালা দেখলে বার দু-তিন চা না খেলে কি চলে? তাও না হয় ম্যানেজ করব কারও ঘাড় ভেঙে। কিন্তু টিকিটের দামটা যে চাই-ই।

আজ গোটা দিন ঘুরে এক পয়সাও ধার জোগাড় করতে পারেনি নব। আগের ধারই যে শোধ হয়নি।

হ্যাঁ, ধার দিতে পারে বটে একজন। নবর খুব কাছের মানুষ। কিন্তু সেও দেবে না যাত্রা দেখতে টিকিটের টাকা। অন্য কোনও মিথ্যে কথা বলে চাইলেও ঠিক ধরে ফেলবে আসল উদ্দেশ্য। সে হচ্ছে নবর স্ত্রী বকুল।

বকুলের কিছু জমানো টাকা আছে, জানে নব। মুড়ি ভেজে, চিঁড়ে কুটে, মোয়া বানিয়ে, নানান মেহনত করে সারা বছরই কিছু-কিছু রোজগার করে বকুল। বিয়ের পর থেকেই করছে।

সেই টাকা জমিয়ে লুকিয়ে রাখে বকুল। কোথায় রাখে কখনও বলেনি নবকে। তবে তক্কে-তক্কে থেকে নব বুঝেছে যে বকুল জমানো অর্থের কিছু রাখে নিজেদের বাড়িতে আর কিছু পাড়ার দত্ত গিন্নির কাছে।

বাড়িতে কোথায় রাখে বকুল জানাতে চায়নি নবকে। তবে নব ঘাঘু চোর। তার চোখ কান ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। সে দেখে ফেলেছে যে বাড়িতে গুদাম ঘরে ঘুঁটের বস্তার ভিতর একটা বড় কৌটোয় জমানো টাকাপয়সা রাখে বকুল। তা রাখুক। মনে-মনে হেসেছে নব। বউ ভাবে নব টের পায়নি তার গুপ্ত ভাণ্ডারটি কোথায়? তবে এযাবত মায়া করে নব কখনও হাত দেয়নি স্ত্রীর সযত্নে লুকনো অর্থে।

ওই জমানো টাকা থেকে যে বকুল মাঝেসাঝে খরচ করেনি, তা নয়। সংসার খুব ঠেকায় পড়লে সে বের করেছে। এই যেমন গত বছর ছেলের অসুখের সময় নবর হাতে কিছুই প্রায় নেই। তখন বকুল তার জমানো ভাণ্ডার থেকে টাকা দিয়েছিল ওষুধ কিনতে। গত বছর পুজোয় বকুল শখ করে একখানা শার্ট কিনে দিয়েছিল নবকে। কিন্তু স্বামীর ফুর্তির জন্য সে একটি পয়সাও বের করবে না।

নব যে অভাবে পড়লেই চুরি করে বকুলের তাতে ঘোর আপত্তি। বছর দুই ধরে সে এই নিয়ে অনুযোগ জানাচ্ছে।

— এবার চুরি করা ছাড়ো। ছেলে বড় হচ্ছে। ওর ক্লাসের ছেলেরা ঝগড়াঝাঁটি হলেই ওকে চোর বোপ তুলে খ্যাপায়। এ-গাঁয়ে বা আশেপাশে কোথাও চুরি হলে আমাকে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে শুনতে হয় তোমার নামে। যেন যেখানে যত চুরি হয় সবই তোমার কীর্তি। আমায় ঠেস দিয়ে কথা শোনায় তোমায় নিয়ে,.এই কারণে। ভারি লজ্জা করে।

— তা কী করব? জমির ফসলের আয়ে কি চলে সারা বছর? বাধ্য হয়ে করি।

— কেন মজুর খাটতে তো পারো ওই সময়ে। যাদের জমি কম তারা তো অভাবের সময় মজুর খেটে দিন চালায়।

— আরে ছি-ছি, বংশের একটা প্রেস্টিজ নেই। আমাদের বংশে কেউ কখনও পরের জমিতে মুনিশ খেটেছে?

একদিন বকুল বলেছিল, বেশ। তবেঁ সাইকেল সারানোর কাজ করে তো দু-পয়সা আয় করতে পারো। তুমি এত ভালো সাইকেল মেরামতির কাজ জানো। সবাই কত সুখ্যাতি করে।

তা ঠিক বলেছে বকুল। সাইকেল মেরামতির কাজটা সত্যি ভালো জানে নব। শখ করে শিখেছে। ছেলেবেলা থেকেই তার খুব ঝোঁক সাইকেলের কলকব্জা ঘাঁটাঘাঁটিতে। বাবার সাইকেলটার ছোটখাটো সারাই সে নিজেই করত ঘরে বসে — সাইকেলে তেল দেওয়া, লিক সারানো, টায়ার-টিউব-বল-বেয়ারিং পালটানো — এমনি সব কাজ। এগরা বাজারে গেলে মদন পাত্রর সাইকেল মেরামতির দোকানে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত। মন দিয়ে লক্ষ করত সাইকেল সারানো। নজর করত সাইকেলের যন্ত্রপাতির খুঁটিনাটি। শখ করে বিনা মজুরিতে কত দিন মদনকাকার দোকানে সে হাত লাগিয়েছে সাইকেল মেরামতির কাজে।

গাঁয়ের লোক জানে নবর এই হাতযশ। তারা অনেকেই ছোটখাটো সাইকেল মেরামতি, টায়ার-টিউব পালটানো, টিউবের লিক সারানো ইত্যাদি করিয়ে নিয়ে যায় নবর কাছে এসে। অবশ্যই মানায়।

কিন্তু ও ব্যবসায় মন নেই নবর। বড্ড একঘেয়ে লাগবে মনে হয় কাজটা নিয়ে বেশিক্ষণ পড়ে থাকলে দিনের-পর-দিন। তার চেয়ে চুরি করায় রোমাঞ্চ কত!

স্ত্রীর প্রস্তাবটা এড়ানোর ফিকিরে নব যুক্তি ফেঁদেছিল, সাইকেল সারানোর ব্যবসা তো করতেই পারি কিন্তু তাতে যে মূলধন লাগবে শুরু করতে। সাইকেলের কিছু পার্টস মজুত রাখতে হবে, ক'টা যন্ত্রপাতিও কিনতে হবে। আমার যা যন্ত্রপাতি আছে সব পুরোনো ভোঁতা।

কত লাগবে? — জিগ্যেস করেছিল বকুল।

— তা অন্তত হাজার খানেক।

— বেশ। ও টাকা দেব আমি।

শুনে তাক লেগে গিয়েছিল নবর। বটে, অনেক জমিয়েছে তো বকুল। দেখি ভেবে — বলে তখন পাশ কাটিয়ে গেছে।

এরপর যতবারই বকুল নবকে সাইকেল সারানোর ব্যবসা শুরু করানোর চেষ্টা করেছে নানা ছুতোয় নব এড়িয়ে গেছে।

তপনকুমারের অ্যাকটিং দেখার আগ্রহে নব ভেবে দেখল যে তার একটিমাত্র পথই আছে। স্ত্রীর গচ্ছিত ধন থেকে কিছু সরাতে হবে। এছাড়া উপায় নেই।

বিকেলে ছেলে খেলতে বেরিয়েছে। স্ত্রী গেছে পাড়ায় একজনের বাড়ি। নব দেখল, এই সুযোগ। সে গুটিগুটি গিয়ে গুদাম ঘরের দরজা খুলল।

ছোট্ট ঘরখানা। মাটির দেওয়াল, পাকা মেঝে, মাথায় টিনের চাল। কাঠের দরজার নিচে খানিক অংশ ভাঙা। ঘরটায় আলো খুব কম। জানলা নেই। ছোট একটা জাফরি বসানো ফোকর আছে শুধু। ঘুঁটে-কয়লা, গাদা শিশি-বোতল-কৌটো ইত্যাদি কত যে দরকারি অ-দরকারি আস্ত ভাঙা জিনিসে ঘর প্রায় ঠাসা। চোখ একটু সয়ে যেতে নব নজর করল মেঝেতে রাখা ঘুঁটের বস্তাটা। সে বস্তার আধখোলা মুখটা চওড়া করে। নির্ঘাত ঘুঁটের তলাতেই চাপা আছে বকুলের জমানো টাকার প্লাস্টিকের বড় কৌটোখানা।

একরাশ ঘুঁটের ভিতর হাত ঢুকিয়ে কৌটোটা খোঁজার আগেই সাংঘাতিক আঁতকে ওঠে নব। বিরাট এক সাপ লাফিয়ে বেরোয় বস্তার ভিতর থেকে। নবর গা-ঘেঁষে গিয়ে সাপটা ঢোকে ঘরে রাশিকৃত জিনিসপত্রের ভিতরে। সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ শোনা যায়।

ঠিকরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে নব। বাপ্‌রে খুব বেঁচেছি। সাপ পাহারা দেয় গো স্ত্রীর লুকনো ধন! কী সর্বনাশ! সে থরথর করে কাঁপছে ভয়ে। গুদামের দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনি দিয়ে সে দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে ঢুকে বসে পড়ে বিছানায়। তখনও তার কাঁপুনি থামেনি।

অনেক চিন্তাভাবনা করে নব। তপনকুমার কি দেখা হবে না? শেষে নিরুপায় হয়ে একটা উপায় বের করে।

কাঁচুমাচু ভাবে স্ত্রীর কাছে গিয়ে নব বলল, দ্যাখো, ভেবে দেখলাম তুমি যা বলেছিলে সেটা করাই উচিত কাজ হবে। চুরি ছেড়ে দেব আমি। অভাব মেটাতে সাইকেল মেরামতির ব্যবসা করব।

— বটে। অ্যাদ্দিনে হল সুমতি।

— মূলধন দেবে তো?

— দেব। যা বলেছি দেব। কোথায় করবে?

— ভাবছি বাসস্ট্যান্ডের কাছে বট গাছটার নিচে বসব। এখান থেকে বেশি দূরে নয়। মাইলখানেক। দুটো চায়ের দোকান আর একটা সাইকেল-স্ট্যান্ড আছে ওখানে। খদ্দের জুটে যাবে। কী বলো?

— হুঁ। ওইখানটা মন্দ নয়।

— মাথার ওপর চট টাঙিয়ে পলিথিন পেতে একটা ছাউনি করে নেব। দিনের শেষে দোকান গুটিয়ে মালপত্তর সব রেখে যাব কাছাকাছি বন্ধুলোক জগন্নাথের বাড়িতে।

— মাগনায় বা ধার-বাকিতে বেশি কাজ করবে না কিন্তু।

— আরে না-না। বাড়িতে এসে ধরে, তাই করে দিইছি এতকাল ফ্রি-তে। তখন তো আর ব্যবসায় নামিনি।

— বেশ। কাল দেব তোমায় টাকা।

অর্থাৎ নবর সামনে বকুল তার গোপন ভাণ্ডারটির হদিশ দিতে চায় না।

একটু অপেক্ষা করে নব কিঞ্চিৎ গম্ভীরভাবে বলল, দ্যাখো, তুমি যা বলেছিলে তাই মেনে নিচ্ছি। তবে আমার একটা শর্ত আছে।

কী শর্ত? — বকুল ভুরু কোঁচকায়।

— আসছে শনিবার তপনকুমার যাত্রা করতে আসছে পাটুলিতে। এমন সুযোগ আর পাব না। হাতে আমার একদম পয়সা নেই। টিকিটের দামটা তোমায় দিতে হবে।

বকুল জানে তার স্বামীর যাত্রা দেখার নেশা। তাই বুঝি ও রাজি হয়েছে ঠেকায় পড়ে। যাকগে, কাজ উদ্ধার হলেই হল।

কত? — জানতে চায় বকুল।

একটু হিসেব কষে নব জানায়, চল্লিশ।

বকুল বোঝে, অনেক বাড়িয়ে বলছে নব। তবে সে দর কষাকষি করে না।

— বেশ, দেব কাল।

পরদিন যাত্রা এবং সাইকেলের টাকা পকেটস্থ করে নব আস্তে আস্তে বলে, তোমার পয়সার কৌটো পাহারা দিতে সাপটা রেখেচ বটে। তবে ছেলে কি জানে? যদি কোনোদিন হাত ঢোকায় ওই ঘুঁটের বস্তায় কি কাণ্ড হতে পারে ভেবে দেখেচ?

সাপ! বস্তা! হতভম্ব ভাব কাটিয়ে নিমেষে ব্যাপার বুঝে ফেলে বুদ্ধিমতী বকুল। ঘুঁটের বস্তার মুখটা বেশ ফাঁক দেখে তার একটা খটকা লেগেছিল বটে। আর সাপ? একটা মস্ত ঢ্যামনা সাপ ওই ঘরে ঢোকে মাঝে-মাঝে সে দেখেছে। ওই ঘরে ক'টা ব্যাঙ দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে। সাপটা ব্যাঙ ধরতে ঢোকে গুদামে। ঢ্যামনা নির্বিষ সাপ। বরং ইঁদুর-ব্যাঙ খেয়ে উপকারই করে গেরস্তর। তাই এ-নিয়ে দুশ্চিন্তা করেনি বকুল। স্বামী নব নির্ঘাত জেনে ফেলেছে যে ঘুঁটের বস্তার ভিতর লুকোনো থাকে তার পয়সা জমানো কৌটো। ও বস্তা ফাঁক করেছিল কৌটোর খোঁজে।

বকুল গম্ভীরভাবে বলল, ও সাপ আমার পোষা। শেখানো আছে। আমার কৌটোয় হাত না দিলে কাটবে না। আচ্ছা বেশ, ছেলেকে সাবধান করে দেব।

এমন বিদ্যে শিখলে কোথা? — নবর প্রচণ্ড কৌতূহল।

মুচকি হেসে জানায় বকুল, বাপের বাড়িতে। আমার এক দূর সম্পর্কের কাকা সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। ভারি স্নেহ করতেন আমায়। তিনিই আশীর্বাদ করে কিছু বিদ্যে আর মন্তর দান করেছেন আমায়, বিপদে-আপদে রক্ষে পেতে।

শুনে নব থ। গাঁয়ের আর পাঁচটা বউয়ের মতো সাদামাটা দেখতে বকুল। তার এমন ক্ষ্যামতা!

স্ত্রী বকুল আর এক প্রস্থ মনে করিয়ে দেয়, যা কথা দিয়েছ রেখো কিন্তু। নইলে ঘোর অমঙ্গল হবে তোমার নিজের। তোমার সংসারের।

— হাঁ-হাঁ, রাখব বই কী। নব দাসের কথার নড়চড় হয় না। তাড়াতাড়ি আশ্বাস দেয় নব।

বছরখানেক কেটে গেছে।

নবর সাইকেল মেরামতির দোকান দিব্যি চলছে।

প্রথমে তো গাঁয়ের লোক ব্যাপার দেখে তাজ্জব। গোড়ায় অবশ্য ভেবেছিল লোকে, স্রেফ খেয়াল। টিকবে না।

মাস দুই বাদে থানার ছোটদারোগা একদিন জিপ হাঁকিয়ে এসে স্বচক্ষে দেখে গেলেন নবর সাইকেল মেরামতির কারবার। হঠাৎ এই সুমতি যে! অবাক হন দারোগা। তারপর উৎসাহ দেন, বেশ-বেশ। সৎপথে রোজগার করো। সাইকেলের কাজ যখন এত ভালো জানো, চুরি-চামারির ঝঞ্ঝাটে যাও কেন বাপু?

নবর সাইকেল সারানোর ব্যবসা বাড়ছে ক্রমেই। একলা হাতে সামলাতে পারছিল না বলে হেল্পার রেখেছে একটি ছোকরাকে। তাকে কাজ শেখাচ্ছে। চাষের মাসে নব অনেকটা সময় গরহাজির থাকাকালে ওই ছেলেটাই সামলে দিয়েছে মোটামুটি। কাজ যেমন বাড়ছে, নব ভেবেছে যে কয়েকমাস বাদে গঞ্জে এগরা বাজারে ছোট একটা পাকাপাকি দোকানঘর ভাড়া নিলে হয়। ওখানে ব্যবসার সুযোগ ঢের বেশি। হেল্পার আর একজন বাড়াবে।

নবর এই পরিবর্তনে সবাই খুশি।

নবর ছেলে-বউ খুশি। বদনাম ঘুচেছে। সংসারের অভাব-অনটন অনেক কমেছে।

গ্রামের লোক খুশি। নব চুরি ছাড়ার ফলে অনেক স্বস্তি মিলেছে গাঁয়ে।

নবও খুশি।

তবে কখনও-সখনও নবর মনটা ছটফটিয়ে ওঠে। হাত নিশপিশ করে। একটু আপশোস জাগে মনে। বাপের কাছে শেখা, চাঁদু ওস্তাদের কাছে শেখা, কত কিল-চড়-বকুনি হজম করে শেখা মহাবিদ্যার কেরামতি সে যে আর দেখাতে পারবে না। সে নিজেও চর্চা করতে-করতে চুরিবিদ্যার কিছু কৌশল আবিষ্কার করেছিল। সেগুলোও হারিয়ে যাবে।

মাঝেমাঝে কোনো ঘরের মজবুত দেওয়াল বা আঁটোসাঁটো ছিটকিনি-খিল-তালা-নব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নজর করে। ঘরটা বন্ধ থাকলে কী কায়দায় ওইসব বাধা টপকে চুরি করতে ঘরে ঢোকা যায় তার উপায় ভাঁজে মনে-মনে।

ব্যস, ওই পর্যন্ত। এতেই তার সুখ। এর বেশি আর এগোতে পারে না নব। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঘুঁটের বস্তা, অ্যাত্তবড় সাপ আর বকুলের সতর্ক বার্তা, 'সংসারে অমঙ্গল হবে!' ছেলেকে যে ও বড্ড ভালোবাসে।

যেমন ইচ্ছা সাজো

এগারো ক্লাসের পানু আর তার ক্লাসের বন্ধুরা সবাই বেজায় ভাবিত। কারণ — 'ভারতমাতা বিদ্যামন্দির'-এর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উৎসব সমাগত। পানু অবশ্য দৌড়ঝাঁপ মোটেই করে না। তবুও এই উৎসবে একটি পুরস্কার তার প্রায় বাঁধা। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে যে 'Go as you like it' বা 'যেমন ইচ্ছা সাজো' প্রতিযোগিতা হয় তাতে পানু গত দুবছরের চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু এবার তাকে এত বিষম বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আর সেই নিয়েই তার আর তার সঙ্গীদের এত ভাবনা।

ব্যাপারটা হল দশ ক্লাসের দীপঙ্কর হঠাৎ কোথা থেকে এক থিয়েটারি মামার আমদানি করেছে। এই মামা নাকি তাকে এমন মেক-আপ দেবে, আর চলনে-বলনে এইসা এলেমদার করে দেবে যে পানুকে এবার আর পাত্তা করতে হচ্ছে না। মাতুল-নির্ণীত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় দীপঙ্কর যত ফুলছে, মাতুলহীন অসহায় পানু আর তার দলবল ততই দমে যাচ্ছে। অনেক ভেবেও পানু একটা উপায় খুঁজে পাচ্ছে না — একটা চমকপ্রদ সাজ, যার সাফল্য নিশ্চিত।

যাকগে, কালের গতি তো আর রোধ করা যায় না। পানুদের দুশ্চিন্তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে নির্ধারিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিনও এসে পড়ল। এই অনুষ্ঠানে বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতিত্ব করতে রাজি করানো হয়েছে।

হেডমাস্টার মশাই-এর বিশেষ অনুরোধে রাজি হয়ে তিনি বললেন — 'ওইদিন আমায় আর একটা জায়গায় যেতে হবে। তা ওখান থেকে ফিরে এসেই আমি যাব। না না, কারোর নিতে আসার দরকার নেই। হয়তো অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে। আমি নিজেই খুব যেতে পারব। 'ভারতমাতা বিদ্যামন্দির' তো — খুব চিনি।'

হেডমাস্টার মশাই বলে এসেছেন, এই সন্ধ্যা ছটা নাগাদ গেলেই চলবে।

প্রতিযোগিতার দিন। সারাদিন ধরে স্কুলের সামনের মাঠে মহোৎসাহে দৌড়ঝাঁপের প্রতিযোগিতা চলছে। ক্রমশ বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এল। প্রতিযোগিতার পাটও শেষ হয়েছে। এবার পুরস্কারের পালা। ইতিমধ্যে সভাপতি মহাশয়ও এসে গেছেন। আবালবৃদ্ধ জনসাধারণ অবাক বিস্ময়ে এই প্রথিতযশা সাহিত্যিককে লক্ষ করেছে। শ্বেতশুভ্র শ্মশ্রু-কেশ,

চোখে প্যাঁসনে আর গলায় এক পাক দিয়ে জড়ানো একটা মটকার চাদর, খবরের কাগজের ছবির কৃপায় এই মূর্তি তাদের বিশেষ পরিচিত। স্বল্পবাক কিন্তু বয়সের তুলনায় সতেজ চলাফেরা। অবশ্য চলাফেরা তিনি করছেন না, মঞ্চের উপর চেয়ারে বসে মৃদু মৃদু হাসি মুখে সমস্ত কিছু লক্ষ করছেন।

মাইকে ঘোষণা করা হল — এবার 'Go as you like it' আরম্ভ হবে। দর্শকদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। ভিড়ের মধ্যে এতক্ষণ অনেকগুলি চানাচুরওলা, আইসক্রিমওলা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ দেখা গেল এদের মধ্যে অনেকেই নকল। মঞ্চের সামনে চানাচুরওয়ালাদের ভিড় জমে গেল।

— চাই চানাচুর, সল্টেড বাদাম, এক আনা দুআনা। নে—বেন?

— চাই আইস...ক্রি...ম, কুলপি-মালাই—

কেউ কেউ আবার সভাপতিকে চানাচুর বেচার চেষ্টা করতে লাগল। সভাপতি এক আনার চিনাবাদাম কিনে ফেললেন, তারপর স্থানীয় জমিদার প্রধান বক্তার বাচ্চা ছেলেকে দিয়ে দিলেন।

ক্লাস নাইনের তারাপদ পাগল বেশে বেজায় হুল্লোড় লাগিয়ে দিল। অবশ্য ছোট ছোট ছেলেগুলো ঢিলটিল ছুড়ে তারাপদকে সত্যি সত্যি ক্ষেপিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে কসুর করছিল না।

এমন সময়ে বিহারী দারোয়ানবেশী দীপঙ্কর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল। লম্বা-চওড়া দীপঙ্করকে মানিয়েছে খাসা। মাথায় পাগড়ি, গায়ে লাল ফতুয়া, মালকোঁচামারা ধুতি, পায়ে শুঁড়তোলা নাগরা। আর সবচেয়ে দর্শনীয় তার গোঁফ আর গালপাট্টা। ইয়া মোটা আর কালো একজোড়া পাকানো গোঁফ ইঞ্চিখানেক চওড়া গালপাট্টার সঙ্গে কোলাকুলি করছে। কপালে সযত্নে অঙ্কিত এক তিলক, হাতে এক পাঁচহাত তেল-চকচকে বাঁশের লাঠি। সদ্য মুলুক থেকে আসা এক সাক্ষাৎ ভোজপুরী।

সার্থক তার থিয়েটারি মামার তালিম। ইস্কুলের আসল দারোয়ানদের নিষ্প্রভ করে দিয়ে দারোয়ান দীপঙ্কর মসমস করে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল। তারপর লাঠি ঠুকে চোস্ত হিন্দিতে কুচোকাঁচাদের ধমকাতে আরম্ভ করল...

— 'এও বালবাচ্ছালোক, ভিড় মৎ করো! একদম বাহার যাও!' বলেই, 'খবরদার' বলে এমন এক হাঁক পাড়ল যে দুই তিন ক্লাসের ছেলেগুলো তো ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। প্রধান বক্তার ছোট ছেলেটা বাদাম ফেলে বাবাকে জড়িয়ে ধরল।

সবাই দীপঙ্করকে দেখে চমৎকৃত। হেডমাস্টার মশাই খুব খুশি খুশি ভাব করে সভাপতির কাছে বলতে লাগলেন — 'হেঁ হেঁ কেমন লাগছে? মানে ছেলেপুলেদের ব্যাপার। তা সেজেছে বেশ। কী বলেন?'

সভাপতি মশাই বিষয়টা খুব উপভোগ করছেন বলে মনে হল। এরপর ভোজপুরী যখন তাঁর সামনে এসে 'রাম রাম বাবুজি' বলে মস্ত এক সেলাম ঠুকল তখন তার দাড়ি গোঁফের ফাঁকে ফুটে ওঠা হাসি কারুরই চোখ এড়াল না।

দীপঙ্কর এরপর চরম দারোয়ানি দেখাতে আরম্ভ করল। লাঠি ঠুকে, হিন্দি বাংলা বকুনি

ঝেড়ে সে চানাচুরওয়ালাদের ভিড় একদম সাফ করে ফেলল। কেবল পাগল তারাপদর কাছে একটু বেকায়দায় পড়েছিল। তারাপদ থুতুটুতু ছিটিয়ে, চেঁচিয়েমেচিয়ে এমন কাণ্ড করল যে ভোজপুরি 'আরে শিয়ারাম শিয়ারাম, একদম সত্যনাশ কর দিয়া' বলে সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করল। মোট কথা দীপঙ্করের সাফল্যে মাস্টার ছাত্র সবাই মুখরিত হয়ে উঠল।

কিন্তু একাদশ ক্লাসের ছেলেদের মনে সুখ নেই। ছি ছি, পানুটা এমনভাবে ডোবাল! মাঠে এল না পর্যন্ত! বাড়িতে খোঁজ করতে গিয়ে জানা গেল, সে দুপুর থেকে বেরিয়ে গেছে। ঘরে তার ছোটকাকা রেগে আগুন হয়ে বসে আছে। পানু নাকি চটি আর চাদর নিয়ে পালিয়েছে। বাবুর নবাবি করা হচ্ছে, ফিরে এলে এর ফল ছোটকাকা হাতেনাতে বোঝাবে।

প্রায় সন্ধ্যা সাতটা বাজে। এমন সময় মঞ্চের কাছেই একটা গাড়ি এসে থামল। যিনি গাড়ি থেকে নামলেন তাঁকে দেখে তো পুরো জনতা স্তম্ভিত। সভাপতির মূর্তিমান যমজ ভাই! সেই দাড়ি, সেই চুল, সেই চাদর — বুঝিবা ইনি একটু বয়স্ক। মাঠসুদ্ধ লোকের চোখ ছানাবড়া। পাগল তারাপদও তার পাগলামি স্রেফ ভুলে গেল।

যাঁকে নিয়ে এই ব্যাপার তিনি কিন্তু অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে মঞ্চের দিকে এগিয়ে এসে হেডমাস্টার মশাইকে বললেন — 'দেখুন ঠিক সময়ে এসে পড়েছি। তা আপনাদের প্রতিযোগিতা সব শেষ তো? বেশ বেশ।'

হেডমাস্টার মশাই খানিকক্ষণ হাঁ করে দ্বিতীয় সভাপতির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপরেই চমকে মঞ্চাসীন প্রথম সভাপতির দিকে তাকালেন।

ততক্ষণে প্রথম জন চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন। ক্রমাগত হাত কচলাতে কচলাতে বলতে লাগলেন — 'স্যার স্যার আমি পানু। সভাপতি সেজেছিলাম। মানে Go as you like it-এর জন্যে...'

ব্যাপারটা অনুধাবন করেই ভয়ানক চটে গিয়ে হেডমাস্টার মশাই ঘটনাস্থলেই পানুকে উত্তমমধ্যম দেবেন কি না স্থির করছেন, এমন সময় আসল সভাপতি সাহিত্যিক মশাইয়ের চোখ পানুর ওপর পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ তিনি স্রেফ ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে তাঁর জীবন্ত প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপরেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হো হো করে হেসে উঠলেন।

ক্রমশ হেডমাস্টার মশাই, হেডপণ্ডিত মশাই, প্রধান বক্তা, ছাত্ররা, চানাচুরওয়ালা, পাগল সবাই হি হি হো হো করে অট্টহাসি জুড়ে দিল। কেবল ভোজপুরি দীপঙ্কর এই রসিকতায় যোগদান করল না।

খানিক পরে হাসির বেগে পানুর বিপদের মুখ কেটে যাওয়ার পর হেডমাস্টার মশাই হুকুম করলেন — 'ওহে, মঞ্চের নীচে আমাদের পুরোনো সভাপতিকে একখানা চেয়ার দেওয়া হোক!'

সভার কাজ আরম্ভ হয়েছে এমন সময় হেডমাস্টার মশাই হঠাৎ সভাপতি সাহিত্যিককে জিজ্ঞেস করলেন — 'আচ্ছা, আপনি সাতটার সময় এসে ঠিক সময়ে এসেছি বললেন কেন? আমার মনে হচ্ছে আপনি যেন ছটায় আসবেন বলেছিলেন।'

পানুই তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়ে উঠল — 'স্যার, অপরাধ নেবেন না। আমিই ওনাকে পরে

গিয়ে বলেছিলাম যে আপনি সাতটায় আসতে বলেছেন। ভেবেছিলাম ওই সময়টুকু আমিই সভাপতির হয়ে কাজ চালিয়ে দেব।'

হেডস্যার আর একবার পানুকে উত্তমমধ্যম দেওয়ার কথা চিন্তা করতে গিয়ে তার দাড়ির দিকে চেয়েই হেসে ফেললেন আর আড়চোখে আসল জনের দাড়ির সঙ্গে একবার মিলিয়ে নিলেন।

সে বছরও যে পানুই 'যেমন ইচ্ছা সাজো'র প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল তা আর বলাই বাহুল্য।

[অজ্ঞাত]

নাড়ুবাবুর পেন উদ্ধার

নাড়ুবাবু যখন সেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরলেন তখন তাঁর ব্রহ্মতালু অবধি জ্বলছে — রাগে, দুঃখে, হতাশায়! ওঃ, এক সপ্তাহের মধ্যে দু-দুটো পেন পকেটমার হয়ে গেল! প্রথমটা না হয় বাজে ছিল কিন্তু এবারেরটা একটা দামি শেফার্স। আর শুধু কি তাই? ওই সবুজ শেফার্সটা তিনি তাঁর প্রথম প্রকাশিত লেখার জন্য প্রাপ্ত মূল্যের টাকায় কিনেছিলেন। বড্ড পয়া পেন ছিল।

নাড়ুবাবু একজন উঠতি লেখক। ওই শেফার্সটা না পেলে তাঁর লেখার হাতই আসতে চায় না। এ তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন। পেনটা খুললেই, প্লট চরিত্র ভাষা সব হুড়হুড় করে বেরিয়ে আসতে থাকে। অন্য পেন নিয়ে চেষ্টা করে দেখেছেন — স্রেফ সময় নষ্ট। এক কলম লেখা এগোয়নি।

আর আজ কি না সেই পেনটা গেল! নাড়ুবাবু আর ভাবতে পারেন না।

অফিস টাইমে বাসে পেন সামলাই বা কী করে? এদিকে আবার পেন নিয়ে না গেলেও চলে না। ওঃ, যা ভিড়! বিশেষত যাওয়ার সময়। আসার সময় না হয় কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে ঘুরে ভিড়টা কমে গেলে বাসে চাপেন। কিন্তু যাওয়ার সময় তো আর এক ঘণ্টা আগে বাড়ি থেকে বেরোনো যায় না। তাহলে যে খাওয়াই হবে না।

আর বাসে উঠে কোনোরকমে রড আঁকড়ে ঝুলে থাকাই দায়। তার মধ্যে কি আর কে তার পকেটের ভার দয়া করে লাঘব করছেন, তার খেয়াল রাখা যায়? তিনিই তো কত সময় পয়সা বার করতে গিয়ে ভুল করে নিজের ভেবে অন্যের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফেলেছেন। অসম্ভব ব্যাপার।

তা পেন না হয় আবার হবে কিন্তু ওইটি না ফিরে পেলে যে তাঁর সাহিত্যিকজীবনের ইতি।

রাত্রে খাওয়ার পর ছাদে উঠে ক্রমাগত পায়চারি করছেন। মাথাটা ঠান্ডা না হয়ে উত্তরোত্তর গরমই হয়ে উঠছে। প্রায় স্ফুটনাঙ্কে যখন পৌঁছেছে হঠাৎ সেই সময় বুদ্ধিটা বিদ্যুতের মতো খেলে গেল। দেখা যাক কী হয়। মরিয়া হয়ে উঠেছেন নাড়ুবাবু। হ্যাঁ, ওইভাবেই চেষ্টা চালাবেন। যাক কিছু পয়সা আর পরিশ্রম।

পরদিন নাড়ুবাবু সময়মতোই অফিসে হাজির হলেন। আর গিয়েই সাতদিনের ছুটির

দরখাস্ত দিলেন ঝেড়ে — 'আঙ্কেল সিরিয়াস।' অফিসের লোকদের বলে এলেন, কাকা এই আছেন কি নেই। ডাক্তার বদ্যি তাঁকে একাই সব সামলাতে হচ্ছে। কবে আবার জয়েন করতে পারবেন, ঠিক কিছুই বলতে পারছেন না।

পরদিন থেকে নাড়ুবাবু তাঁর অভূতপূর্ব অভিযান আরম্ভ করলেন।

অফিসের সময়মতো খেলেন। তারপর পান চিবোতে চিবোতে বাসস্টপে গিয়ে দাঁড়ালেন। হুড়মুড় করে বাস এসে পড়ল। বাসের গায়ে লোক বাদুড়ঝোলা ঝুলছে। সঙ্গে সঙ্গে বাসের মধ্যকার এবং উঠতি যাত্রীদের মধ্যে প্রচণ্ড গোলমাল লেগে গেল। একপক্ষ উঠতে দেবেন না, অন্যপক্ষও অপ্রতিরোধ্য। নাড়ুবাবু বহুদিনের অর্জিত দক্ষতার গুণে ওরই মধ্যে টুক করে সেঁদিয়ে পড়েছেন। কেউ উঠলেন, কেউ পারলেন না। কেউ-বা নেমেছেন, কিন্তু ধুতির কোঁচাকে বাস ছেড়ে নামানো যাচ্ছে না। হই-হই রই-রই কাণ্ড। তালেগোলে বাস দিল ছেড়ে।

এ লাইনে একমাত্র...নং হল অফিস পাড়ায় যাওয়ার বাস। আর এ সময় তাই সবকটাতেই থাকে ভয়ানক ভিড়। এর মধ্যে কি নিজেকে বাদে অন্যকিছু সামলানো চলে।

নাড়ুবাবু উঠে জুৎ করে দাঁড়ালেন — রডটা দুহাতে আঁকড়ে ধরলেন। তারপর সজোরে গলা চড়ালেন — 'দেখবেন মশাইরা, পকেট সামলান। অসাবধান হয়েছেন কি পকেট থেকে পেন হাওয়া হয়ে যাবে। আমার মশাই, গতকালই একটা নতুন পেন চলে গেল।'

দু-একটা সহানুভূতিসূচক গলা পাওয়া গেল।

— 'যা বলেছেন। আমারও একটা গেছে আগের মাসে।'

— 'আরে এ লাইনটা পেন চুরির জন্য বিখ্যাত।'

একটি দাদু গোছের বৃদ্ধের চাঁচাছোলা গলা শোনা গেল — 'একখানা মোটে বাস। আর বাসও বাড়ায় না। আমাদের গভর্মেন্ট যা হয়েছে। বেশ, তবে পকেট মারা গেলে গভর্মেন্ট আমাদের ক্ষতিপূরণ দিক। কেন দেওয়া হবে না বলুন?'

নাড়ুবাবুকে আর বেশি কিছু বলতে হল না। বাসসুদ্ধ সবাই তাদের স্বচক্ষে দেখা বা বিশ্বস্তসূত্রে শোনা নানারকম চমকপ্রদ পকেটমারার কাহিনি পরস্পরকে শোনাতে আরম্ভ করে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে পেনটেনগুলোর প্রতি সাবধান হয়ে উঠল।

নাড়ুবাবুর অফিস অনেকটা পথ। কিন্তু তিনি মাঝামাঝি গিয়েই নেমে পড়লেন। গড়ের মাঠে এক চক্কর ঘুরে নিয়ে আবার একটা ফিরতি বাসে উঠলেন এবং উঠেই হাঁক ছাড়লেন — 'মশাইরা, পেন সামলে, আমার কালই একটা গিয়েছে। শুনলাম এ লাইনে পেন হাতাবার কয়েকজন নামকরা ওস্তাদ যাতায়াত করছে।'

ব্যস, আগেকার মতোই সারা বাস পকেটমারার আলোচনায় গরম হয়ে ওঠে। যে যার পকেটে হাত দিয়ে জিনিস-টিনিস সব আছে কিনা দেখে নেয়। নাড়ুবাবু বাড়ির কাছে এসে নেমে পড়লেন।

এইরকম বার কয়েক যাতায়াত করে ঘরে ফিরে শুয়ে পড়লেন। তা মেহনত তো কম হয়নি। মা এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কীরে নাড়ু, এখনই ফিরলি?'

— 'হ্যাঁ মা, তাড়াতাড়ি ছুটি পেয়ে গেলাম। এরকম এখন কয়েকদিন পাব।'

— 'তা বেশ।' বলে মা চলে গেলেন, আর নাড়ুবাবুও পাশ ফিরে এক লম্বা ঘুম মারলেন।

এটাই আপাতত নাড়ুবাবুর দৈনন্দিন কর্মধারা হয়ে দাঁড়াল। চারদিন ধরে তাঁর ওই রুটিন চলছে। সকালে অফিস টাইমে বাসে ঘোরা আর উঠেই সকলকে পকেটমার সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া।

নাড়ুবাবুকে এখন বাসের লোক বেশ চিনে গেছে।

— 'এই যে দাদা, এসে গেছেন?'

— 'আরে দাদাকে দেখেই পকেটের কথা মনে পড়ে গেল। দেখি আবার সব ঠিকঠাক আছে কি না।'

নাড়ুবাবুও সাবধান করেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, পকেটের জিনিসপত্তর সব সামলে। খুব খারাপ রাস্তা মশাই।'

ছেলেছোকরা টিপ্পনী কাটে, 'কী দাদা, কাজের ফাঁকে পরোপকার করে একটু পুণ্য সঞ্চয় করছেন নাকি?'

— 'আরে জানিস না, দাদা হলেন পকেটমার নিবারণী সংঘের একজন জাঁদরেল মেম্বার।'

নাড়ুবাবু রাগেন না, হাসেন।

কোনো নতুন যাত্রী জানতে চায়, 'কী ব্যাপার বলুন তো? পকেটমার হয়েছে নাকি?'

নাড়ুবাবু তৎক্ষণাৎ বিস্তারিত করে বোঝান — 'খুব সামলে চলবেন। এই সময় এই রুটের বাসে পকেটের জিনিসপত্তর একেবারে অস্থাবর। বিশেষ করে পেন। এই দেখছেন আছে, পাঁচ মিনিট পরেই দেখবেন হাওয়া।'

আর তিনি বাসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাসসুদ্ধ লোকের নানান পকেটমারের গল্প মনে পড়ে যায়। কারো কারো পকেটমারার গল্পের স্টক ফুরিয়ে যাওয়ায় চুরি ডাকাতি রাহাজানির গল্পে বাস মুখর হয়ে ওঠে।

নাড়ুবাবু হৃষ্টচিত্তে সব লক্ষ করেন।

এইরকম কয়েকবার যাতায়াত করে বাড়ি ফিরে আসেন। আর এসেই টেনে ঘুম।

সেদিন পঞ্চম দিন। নাড়ুবাবু অফিসের দিকে থেকে যাত্রী বাসটা থেকে গড়ের মাঠের কাছে প্রথম ট্রিপটা দিয়ে নামলেন। একটু হাওয়া খেয়ে আবার একটা উল্টোদিকের বাস ধরবেন। তারপর আবার অফিসের দিকে।...এইরকম চলবে, বেশ কিছু পয়সা বেরিয়ে যাচ্ছে। তা যাক, তিনি ছাড়ছেন না।

গড়ের মাঠে গাছের ছায়ায় ঘুরছেন। একজন পেন্টালুন আর হাওয়াই শার্ট পরা মাঝবয়সি লোক একইসঙ্গে বাস থেকে নেমে গুটি গুটি তাঁর পিছনে পিছনে আসছিল। হঠাৎ কাছে এসে ডাকল, 'ও, মশাই, ইদিকে একবার আসবেন — একটা কথা ছিল।'

নাড়ুবাবু আড়চোখে চেয়ে বললেন, 'বলুন।'

— 'চলুন-না ওই ফাঁকা গাছটার নীচে। তাড়া আছে?'

— 'নাঃ, তাড়া তেমন নেই, চলুন।'

গাছতলায় এসেই লোকটি তেড়িয়া হয়ে উঠল : 'আচ্ছা মশাই, কদিন ধরে দেখছি আপনি ওই সময়টাতে বাসে চড়ে কেবল ইদিক-উদিক করেন। উঠেই কেবল পকেটমারের গল্প ফাঁদেন। বলি, ব্যাপারখানা কী? আপনার আর কিছু কাজকর্ম নেই নাকি?'

নাড়ুবাবু বললেন, 'মানে, আমার পেনটা সেদিন গেল কিনা। তাই অন্যদের একটু সাবধান করে দিচ্ছি। আর কিছু নয়।'

— 'ওঃ, খুব যে দেখছি অন্যের ভালোমন্দের চিন্তা। তা পেনটা ফিরে পেলে কী করবেন?'

— 'আজ্ঞে, কাল থেকেই আবার অফিস যাব। তবে না পাওয়া পর্যন্ত অফিসমুখো হচ্ছি না। আমার পয়া পেন মশাই।'

— 'বটে।' লোকটি গম্ভীর হয়ে যায়। 'কবে হারিয়েছিল?'

— 'সোমবার সকাল দশটা নাগাদ।'

— 'অ', ইতিমধ্যে লোকটি তার দুহাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এই দুহাতই বার করে এনে নাড়ুবাবুর সামনে দুই মুঠো খুলল। দু মুঠোয় নানান রঙের হরেক রকমের এক গাদা পেন।

— 'দেখুন কোনটা আপনার? সব কটাই নিয়ে এসেছি।'

নাড়ুবাবু তৎক্ষণাৎ তাঁর সবুজ শেফার্সটিকে চিনে ফেলেছেন, আর টপ করে তুলে নিয়েছেন লোকটির প্রসারিত মুঠো থেকে। পরম আদরে হাত বোলাতে থাকেন তাঁর হারানিধির গায়ে।

'ব্যস, মিলেছে তো? তাহলে আর কাল থেকে ঝুট ঝামেলা করবেন না। ওঃ ভারি তো একটা পেন গিয়েছিল। আজ পাঁচদিন ধরে কী কাণ্ডটাই-না আরম্ভ করেছেন।'

নাড়ুবাবু বোঝাতে চেষ্টা করেন, 'ভারি পয়া পেন মশাই। এটা ছাড়া আমার লেখাই বেরোয় না।'

— 'আর আমার হালটা কী হয়েছে ভাবুন তো?' লোকটি ক্ষুব্ধস্বরে বলে ওঠে, 'আজ পাঁচদিন ধরে স্রেফ হাত গুটিয়ে বসে আছি। আপনার জ্বালায় সব কাজকর্ম প্রায় বন্ধ। আমার আবার এই বাস রুটে সকালের অফিস টাইমে মাত্র এক ঘণ্টা ডিউটি। ব্যস, তারপরেই অন্য লোকের পালা। আর আমি বাকি সকালটা বিলকুল বেকার। তা রোজগারপাতি না থাকলে সংসারটা চালাই কী করে বলতে পারেন?'

নাড়ুবাবু অপ্রস্তুতের মতো মাথা চুলকান। — 'আজ্ঞে তা ঠিক চিন্তা করিনি। মানে...'

— 'ঠিক আছে। পেন তো পেয়ে গেছেন। কাল থেকে বাসে উঠে ওইসব বাজে বকবেন না তো?'

— 'মোটেই না। কী দরকার আমার মুখব্যথা করে। স্রেফ অফিস যাব আর আসব।' নাড়ুবাবু অম্লানবদনে উত্তর দেন।

— 'হ্যাঁ, মানে, ওই পুলিশ-টুলিশে দেওয়ার মতলব নেই তো?'

— 'আরে না না।' নাড়ুবাবু শশব্যস্ত হয়ে ওঠেন — 'আবার পেনটা খোয়াই! আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

— 'তাহলে কথা দিচ্ছেন। মনে রাখবেন কিন্তু। প্রমিস।'

— 'বিলক্ষণ বিলক্ষণ, চলুন-না একটা পান খাওয়া যাক।' পেন ফিরে পাওয়ার আনন্দে নাড়ুবাবু গদগদ।

— 'সরি, আজ একদম সময় নেই। একটু কাজ আছে। নমস্কার।' লোকটি ততক্ষণে হন হন করে বাসস্টপের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে।

পরদিন থেকে নাড়ুবাবু অফিস যেতে আরম্ভ করলেন, এবং সবুজ শেফার্সটি বুক পকেটে নিয়েই।

প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেছে। নাড়ুবাবু লেখায় বেশ নাম করে ফেলেছেন। আর এখনও সেই সবুজ শেফার্সটিতেই তিনি লিখে থাকেন।

বাসে সেই লোকটির সঙ্গে তাঁর বার কয়েক দেখা হয়েছে। চোখাচোখি হতেই তিনি পরিচিতের মতন তার মুখের দিকে চেয়ে দাঁত বার করেছেন। লোকটি কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

[অজ্ঞাত]

ছোটকার পাহারা

'কেন? মেয়েরা যাবে না কেন?' ছোটকা ঝাঁজিয়ে উঠলেন। রামুকাকা বললেন, 'মানে প্রসেশনের সময় যা ভিড় ধাক্কাধাক্কি হয়, মেয়েদের নিয়ে যাওয়া ঠিক সেফ নয়।'

ছোটকা বাঁকা হেসে বললেন, 'হোপলেস। দেখ রামুদা, সেই আগের যুগ আর নেই। মেয়েরা এখন ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কী-না করছে? কোথায়-না যাচ্ছে? চৌধুরীবাড়ির মেয়েরা এখন সবাই প্রায় মডার্ন। এরা এখন শহরে থাকে। ট্রামে বাসে চলাফেরা করে। সিনেমা থিয়েটার যায়, মার্কেটিং করে। আর গাঁয়ের ভিড়ে সামান্য ঘেঁষাঘেঁষিতে এরা কি মুচ্ছো যাবে? যত ভুয়ো প্রেস্টিজ। বরং শহরের চাইতে গাঁয়ের লোক মহিলাদের অনেক বেশি সম্মান দেয়। এই প্রসেশনে হই চই করে যেতে ওদের কি সাধ হয় না? যাদের ইচ্ছে আছে চলুক-না আমাদের সঙ্গে।'

এখন উপলক্ষটা বলি।

চৌধুরীবাড়িতে রাসপূর্ণিমায় প্রতি বছর ঘটা করে পুজো হয়। সেইসঙ্গে চৌধুরীবাড়ির সামনের মাঠে ছোটখাটো মেলা বসে। চৌধুরীরা একদা এই অঞ্চলের জমিদার ছিল। অতি প্রাচীন বিশাল চৌধুরীবাড়ি। তাদের রাসপূর্ণিমার উৎসব আর মেলার বয়সও শখানেক বছর হল। এখন আর চৌধুরীদের জমিদারি নেই। তবে এখনও নামডাক আছে যথেষ্ট। দেশের বাড়িতে থাকেন কেবল কয়েকজন, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। তবে বছরে একবার রাস উৎসবে এই দেশের বাড়িতে জমায়েত হয় চৌধুরীবংশের অনেকে।

তিন দিনের উৎসব। রোজই একবার চৌধুরীবাড়ির চৌহদ্দির ভিতরে মন্দির থেকে বিগ্রহদের মহাসমারোহে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয় বাড়ির বাইরে মাঠে শ দুই গজ দূরে রাসমঞ্চে। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ পুজোটুজোর পর ফের শোভাযাত্রা করে ঠাকুররা ফেরেন তাঁদের আগের দেবালয়ে।

আজ পুজোর প্রথম দিন। রাত নেমে গেছে। বাড়ির মন্দিরে আরতি চলছে। একটু বাদেই ঠাকুর নিয়ে শোভাযাত্রা বেরোবে। মন্দির থেকে কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ ভেসে আসছে। মন্দিরের সামনে পাঁচিলঘেরা শান বাঁধানো প্রকাণ্ড চত্বরে লোক গিসগিস করছে। চৌধুরীবাড়ির নানা বয়সি পুরুষদের বেশির ভাগই এই শোভাযাত্রার সঙ্গে যায়। ঠাকুর রাসমঞ্চে পৌঁছে

গেলে তারা ফিরে আসে। বাড়ির মেয়েরা চত্বরের ধারে উঁচু বারান্দায় দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রা বেরিয়ে যাওয়া দেখে। সঙ্গে যায় না।

ছোটকা অর্থাৎ খুদু বুধু মণি টিয়াদের ছোটকাকা দূর দেশে থাকেন। এক নামী কোম্পানির জাঁদরেল অফিসার। অনেক বছর বাদে এসেছেন রাসে। শোভাযাত্রার ঠিক আগে ফেউ তুলেছেন — বাড়ির মেয়েদেরও শোভাযাত্রায় যেতে বাধা কীসের?

কমবয়সি বউ-ঝিদের মুখ দেখে বোঝা গেল যে, শোভাযাত্রার সঙ্গে যেতে তারা উৎসুক।

রামুকাকা কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন সুরে বললেন, 'উঁহু, রিস্কি। মেলায় কতরকম লোক আসে' —

তাঁর কথায় থাবড়া দিয়ে ছোটকা তর্জন করলেন, 'অলরাইট। আমরা ছেলেরা মেয়েদের গার্ড দিয়ে নিয়ে যাব। আমরা দুপাশে, মেয়েরা মাঝখানে হাঁটবে। নজর রাখব যাতে ভিড় মেয়েদের ঘাড়ে না পড়ে।'

এই বলতেই খুদু বুধু বুলু ভুলু ইত্যাদি কমবয়সি ছেলেরা কাঁউমাউ করে আপত্তি জানাল — 'আমি পারব না। আমায় একদম সামনে থাকতে হবে ভলেন্টিয়ার নিয়ে। নইলে প্রসেশন এগোবে না।'

— 'আমার বাজি পোড়ানোর ডিউটি আছে,' জানাল খুদু।

— 'আমারও তাই,' ভুলু সুর মেলায়।

অর্থাৎ বোঝা গেল যে ছোকরারা কেউ এ দায়িত্ব পালনে রাজি নয়।

এতক্ষণে জ্যাঠামশাই মুখ খুললেন। মন্দিরের সামনে বারান্দায় এই আলোচনা হচ্ছিল। রাশভারী জ্যাঠামশাই একখানা চেয়ারে বসে গড়গড়ার নলে টান দিতে দিতে সব শুনছিলেন। এবার বললেন, 'মেয়েরা প্রসেশনে যেতে চায় যাক। তবে বাপু অত দামি গয়না পরে যাওয়া চলবে না। মণিমুক্তো বসানো গলায় সোনার হার, কানে সোনার দুল, খোঁপায় রুপোর কাঁটা — এসব খুলে রেখে তারপর যায় যাক।'

— 'কেন?' ছোটকা অবাক।

রামুকাকা জ্যাঠার কথাটা লুফে নিয়ে বললেন, 'আরে এই ব্যাপারটাই তো বলতে চাইছিলুম। তা না রেন্টুটা চেঁচামেচি করে থামিয়ে দিল। শোন, রেন্টু, আজকাল আর সেদিন নেই। মেলায় বেশি চুরি ছিনতাই হচ্ছে। গতবারই এই গাঁয়ের এক বউয়ের হার নিয়ে নিচ্ছিল ভিড়ের মধ্যে। ভাগ্যিস লোকটা ধরা পড়ে। আচ্ছা করে পিটুনির পর তাকে পুলিশে দেয় পাবলিক। এছাড়াও দুটো পকেটমার কেস হয়েছে। তারা কিন্তু ধরা পড়েনি। সেইজন্যেই তো বলছি, এই ভিড়ে মেয়েদের যাওয়া রিস্কি। মানে এত গয়নাগাঁটি পরে।'

'আরে দূর দূর,' ছোটকা রামুকাকার ভাবনা স্রেফ নস্যাৎ করে দিলেন — 'এই ধ্যাড়ধ্যাড়েপুরে গেঁয়ো মেলায় আসে তো বড়জোর কিছু লোকাল পাতি চোরছ্যাঁচোড়। দারোয়ান ভীম সিং তো প্রসেশনের সঙ্গে যায়। ও চলুক মেয়েদের পাশে পাশে গার্ড দিয়ে। ওর বন্দুক আর গোঁফ দেখলেই এসব বদলোক কেউ ধারেকাছে আসবে না। আর আমরা যে যার নিজেদের ফ্যামিলির ওপর নজর রাখব, তাহলেই হবে।'

— 'ওঃ ভীম সিং!' কচিমামা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, 'ওর কী হাল হয়েছে দেখেছ? বয়সের ভারে ঝুঁকে গেছে। ওই পেল্লাই গোঁফটুকুই যা সম্বল। বন্দুকটা কাঁধে তুলে রাসমঞ্চ অবধি

যেতেই ওর দম বেরিয়ে যায়। ওদের গার্ড! আজকাল চোখেও ভালো দেখে না। নার্ভাস হয়ে গুলি চালালে চোর-ডাকাতের বদলে ভালো লোককেই না মেরে দেয়। ওর বন্দুকে তাই এখন গুলি ভরা থাকে না। পকেটে দুটো টোটা রাখে।'

রামুকাকা ফোড়ন কাটলেন, 'নেহাত পুরোনো লোক, নইলে কবে ছুটি দিয়ে দিতাম। ভয় হয় ভিড়ে। কোনো দুষ্টুলোক ওর হাত থেকে বন্দুকটাই না ছেনতাই করে। ভাবছি, সামনের বছর থেকে প্রসেশনের সময় ওকে একটা নকল বন্দুক দেব।'

— 'ও!' ছোটকা একটু থমকে গিয়ে বললেন, 'তা বড়দা যেমন বলছে, মেয়েরা যদি কিছু গয়না কমিয়ে যায় মন্দ কী?' তিনি বাড়ির বউ-ঝিদের মুখে একবার চোখ বোলালেন।

কিন্তু মেয়েদের হাবেভাবে গয়নার ভার লাঘব করে শোভাযাত্রায় যাওয়ার বাসনা মোটেই ফুটল না। এ কটা দিন তারা একটু ভালোমতন সাজগোজ করে। লোকজনকে দেখায়।

মেয়েদের মনের গতি বুঝে ছোটকা দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'ঠিক হ্যায়, আমি নিজে নিয়ে যাব গার্ড দিয়ে। গয়না খোলার দরকার নেই। ওয়েট। আসছি এক্ষুনি।' ছোটকা গটগট করে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। একটু বাদেই ফিরলেন। তাঁর ডান হাতের মুঠোয় খোলা রিভলবার। গর্বিত হেসে রিভলবার উঁচিয়ে বললেন, 'লুক হিয়ার। এইটে দেখলে এখানকার কোনো ব্যাটা চোরছ্যাঁচোড় দশ হাতের ভেতরে ঘেঁষবে না। চলো' —

কিন্তু মেয়েদের তবু নড়বার লক্ষণ নেই। বড়কর্তার হুকুম ভাঙার সাহস হচ্ছে না তাদের। জ্যাঠামশাই গম্ভীর বদনে ভুড়ুক ভুড়ুক করে গড়গড়া টেনে যাচ্ছেন।

ছোটকা এবার চটে গেলেন — 'হোপলেস। যতসব ভিতুর দল। ঠিক আছে, মিনতি তুমি চলো। বড়দা, মিনতিকে নিয়ে গেলে তোমার আপত্তি আছে? মানে গয়না-টয়না না খুলে।' জ্যাঠামশাই নিস্পৃহভাবে জানালেন, 'নো। এটা তোমার পার্সোনাল রিস্ক।'

ছোটকার স্ত্রী মিনতি ওরফে মিনুকাকিমা কাঁচুমাচু ভাবে হাসছেন। ঠিক ভরসা হচ্ছে না যেতে। আবার অমন দাপুটে স্বামীর কথাও ঠেলতে পারছেন না।

— 'পিস্তলটা কি লোডেড?' কচিমামা ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করেন।

'আলবাৎ লোডেড। একি তোমাদের ভীম সিং পেয়েচ?' সদর্পে জবাব দেন ছোটকা, 'কারো বেচাল দেখলেই ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।'

এই সময় তুমুল হট্টগোলের মধ্যে পূজারিরা বেরিয়ে পড়ল মন্দির থেকে বিগ্রহ নিয়ে। ঢাকঢোল কাঁসি ঝাঁঝর শিঙা ইত্যাদি বাজনা-বাদ্যির বীর বিক্রমে কানে তালা লাগার জোগাড় হল। চৌধুরীবাড়ির পুরুষরা তড়িঘড়ি বারান্দা থেকে চত্বরে নেমে গেল শোভাযাত্রায় যোগ দিতে।' 'এসো এসো' — ছোটকাও মিনুকাকিমাকে তাড়া দিয়ে নিয়ে তাদের সঙ্গ ধরলেন। যাওয়ার সময় অন্যদের শুনিয়েই স্ত্রীকে বললেন, 'আরও দুটো গয়না চাপিয়ে এলে পারতে। দেখোই-না সেভ করতে পারি কিনা?'

শোভাযাত্রায় প্রথমে কিছু বাজনা-বাদ্যি হ্যাজাকবাতি, তারপর পুরোহিতদের কোলে চেপে দামি দামি বসন-ভূষণে সজ্জিত কয়েকটি বিগ্রহ, তার পিছনে আবার একদল বাজনদার, এরপর চৌধুরীবাড়ির লোকেরা, তার পিছনে গ্রামের কিছু গণ্যমান্য লোক।

বাজনা বাজতে বাজতে শোভাযাত্রা ফটক দিয়ে বেরোতেই বাইরে জমা মেলার বিশাল ভিড়টা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল তাদের ওপর।

পা পা করে শোভাযাত্রা এগোয় অতি ধীরে। দুমদাম পটকা ফাটছে অজস্র। তুবড়ি আর রংমশালের রোশনাই মাঝে মাঝে ঝকমকিয়ে উঠছে। হুস হুস করে আকাশ ভেদ করে ছুটে যাচ্ছে জ্বলন্ত হাউই। আর হাজার হাজার লোকের কী বিপুল কলরব। মূল শোভাযাত্রার গায়ে গায়ে দুপাশে হাঁটছে অগুনতি মানুষ।

ছোটকা মিনু কাকিমাকে নিয়ে চলেছেন — বাঁ হাতে স্ত্রীকে কাঁধের কাছে বেড় দিয়ে ধরে আছেন, আর তাঁর ডান হাতে রিভলবার। দুপাশের ভিড় মাঝে মাঝেই ধাক্কা মারছে শোভাযাত্রাকে। ভলান্টিয়াররা সামলাচ্ছে বটে, তবে ঠেলা খেলেই ছোটকা রিভলবার শূন্যে উঁচিয়ে হুংকার ছাড়ছেন — 'অ্যাই খবরদার। হটো হটো' — সঙ্গে সঙ্গে চালাচ্ছেন ডান হাতের কনুয়ের গুঁতো। চৌধুরীবাবুর হাতে সেই ভয়ংকর অস্ত্র দেখে, তাঁর গায়ে হামলে পড়া মানুষগুলো সভয়ে সরে যাচ্ছে তফাতে। ছোটকার তীক্ষ্ণ নজর পাহারা দিচ্ছে স্ত্রীর গয়নাগুলি।

ঘণ্টাখানেক বাদে চৌধুরীবাড়ির লোকেরা ফিরল ঘর্মাক্ত কলেবরে। অবশ্য কমবয়সি ছেলেগুলো বেশিরভাগই ফেরেনি। মেলার হুজুগ ছেড়ে তারা কি সহজে বাড়ি ঢোকে? ছোটকাও ফিরেছেন কাকিমাসহ।

বৈঠকখানায় সবার মাঝে স্ত্রীকে নিয়ে পা দিয়েই ছোটকা নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘোষণা করলেন, 'ওয়েল, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, অনুগ্রহ করে মিলিয়ে নিন কিছু খোয়াটোয়া গেছে কিনা?'

সবার চোখ পলকে মিনুকাকিমার গায়ের গয়নাগুলো জরিপ করে নেয়। নাঃ, সবই ঠিক আছে।

ছোটকা বিজয়ীর হাসি দিয়ে বললেন, 'দেখলে? এই তো দিব্যি ঘুরে এলাম। হলটা কী? যত বাজে ভয় তোমাদের।'

ছোটকা এবার বুঝি একখানা জব্বর লেকচার ঝাড়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন, এমন সময় তেরো বছরের ভাইঝি উমা ফস করে বলে ওঠে, 'ও ছোটকাকা, তোমার ঘড়ি কই?'

অ্যাঁ, তাই তো! ঘরের সবাই দেখল যে তখনো রিভলবার ধরা ছোটকার পুরুষ্টু ফর্সা ডান হাতের কবজিতে শুধু একটা ঘড়ির মাপের গোল দাগ। কিন্তু সোনার ব্যান্ড লাগানো দামি বিদেশি ঘড়িখানা নেই। ছোটকা ওই ডান হাতেই ঘড়ি পরেন।

কয়েক মুহূর্ত কারো মুখে কোনো কথা ফোটে না। তারপরই মিনু কাকিমা উদ্‌বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি ঘড়ি খুলে গিছলে?'

নিজের ডান হাতখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে ছোটকা হতভম্বের মতন ঘাড় নেড়ে মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করেন — 'না।'

চোখ কপালে তুলে উত্তেজিত রামুকাকা বলে ওঠেন — 'তবে গেছে। প্রসেশনে মেরে দিয়েছে। ওফ্ কী কাণ্ড দেখো' —

রামুকাকার কথা শেষ হওয়ার আগেই ছোটকা হনহন করে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

[অজ্ঞাত]

বাসে বুড়ি

মফস্‌সল লাইনের বাস। ঘড়ঘড়, ঝরঝর ভোকভোক করে চলেছে। কাছে কোথাও হাট বসেছে, বাসে বেশ ভিড়। ভিড়টা ছাদেই বেশি। অনেকেই দেখলাম বাসের ভিতর ঢোকার চেয়ে ছাদে চড়াই বেশি পছন্দ করে। কন্ডাক্টার গোঁত্তা মেরে এদিক ওদিক করছে। কারো বগলের নীচ দিয়ে, কারো ঘাড়ের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে টিকিট কাটছে। আমি মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি।

এক বুড়ি উঠল। তার কোলে একটা ছাগলছানা। বাসের মেঝেয় লোকের পায়ের ফাঁকে বুড়ি থেবড়ে বসে পড়ল। পাশে বসল তার ছাগল।

খানিকবাদে কন্ডাক্টার এসে বলল, 'একী তলায় কেন? ওই তো একটা লেডিস সিট খালি, উঠে বস।' বুড়ি কাতরকণ্ঠে বলল, 'না বাবা পড়ে যাব। যা ঝাঁকুনি।'

হঠাৎ বুড়ির সঙ্গীর ওপর কন্ডাক্টারের নজর পড়ল। অমনি এক ধমক — 'অ্যাই ছাগল তুলেছ যে? জান না বাসে গোরু ছাগল তোলা নিয়ম নেই।'

বুড়ি বলল, 'কেনে খেতিটা কী হয়েছে বাবা?'

— 'প্যাসেঞ্জারের অসুবিধে হয়।'

'বটে! কী অসুবিধে হচ্চে শুনি? ওই যে বউটার কোলে কচি মেয়েটা একনাগাড়ে চেল্লাচে, কানে তালা ধরিয়ে দিল গে, তার বেলায় কিছু নয়। ইদিকে আমার পুঁটি উঠে অবধি একটা রা কাড়েনি সে করল অসুবিধে?'

আর কথা না বাড়িয়ে কন্ডাক্টার বুড়ির কাছে টিকিট চাইল।

আঁচলের গিঁট খুলে দুটো পাঁচ পয়সা চোখের সামনে অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে দেখে বুড়ি ভাড়া দিল। পয়সা পেয়ে গুনে কন্ডাক্টার বললে, 'ছাগলের ভাড়া লাগবে।'

বুড়ি তেড়ে উঠল, 'হেই বাবা, উর আবার তাড়া কী? এট্টুকুন প্রাণী।'

বুড়ির ওপর কন্ডাক্টার চটেছিল। গলা একটু চড়িয়ে বলল, 'মালের ভাড়া লাগে। পয়সা দাও।' বুড়িও গলা চড়াল — 'ইঃ, বলি ওই যে লোকটা তিনটে নাউ নিয়ে চলেছে তা নাউয়ের ভাড়া লেগেছে নাকি? নাউগুলোর চেয়ে আমার পুঁটির ওজন কম। মেপে দেখো কেনে?'

বইখাতা হাতে কয়েকজন স্কুলের ছেলে মজা দেখছিল। তারা সরবে সাপোর্ট করল, 'ঠিক বলেছ বুড়িমা। ওজন হোক, লাউ ভারী না পুঁটি ভারী, তবে টিকিট।'

কন্ডাক্টার বলল, 'কিন্তু এ হল জ্যান্ত প্রাণী। জ্যান্ত জীবে ভাড়া লাগবে।

ভাবলাম এবার বুড়ির উপায় নেই। কঠিন যুক্তি। কিন্তু বুড়ি তৎক্ষণাৎ হাত মুখ নেড়ে বলে উঠল — 'বলে কী গো। দুমাসের ছানার আবার টিকিট। এই যে কচি মেয়েটা, ওর ভাড়া লেগেছে নাকি? অবলা মুখ্যু মেয়েমানুষ পেয়ে যাতা বোঝাচ্ছ কেন বাছা?'

ছাত্ররা হই হই করে উঠল। 'শাবাশ বুড়িমা, আচ্ছা দিয়েছ! পুঁটি মাইনর। ওর আবার টিকিট কী?'

— 'এই মেয়েটা মানুষের বাচ্চা।' কন্ডাক্টার গম্ভীরভাবে জানাল।

— 'মানুষ নয় বলে পুঁটিকে অবহেলা কোরো না। ওর ভারি বুদ্ধি। এক্কেবারে মানবের মতো।' বুড়িও ছাড়বার পাত্রী নয়।

কন্ডাক্টার এবার হাল ছেড়ে দিল। তর্ক করে সময় নষ্ট হচ্ছে। অন্য যাত্রীদের টিকিট কাটা দরকার। দু-একজন ইতিমধ্যে তাক বুঝে বিনা টিকিটে সটকে পড়েছে। এদিকে পুঁটির ভাড়া পাওয়ার আশা কম। সে বেজার মুখে একখানা টিকিট বুড়ির হাতে গুঁজে দিয়ে অন্যদিকে ফিরতে ফিরতে বলল — 'বাচ্চা কোলে নাও। মেঝেয় রেখেছ কেন?'

বুড়ি নির্বিকারভাবে পুঁটিকে আঁকড়ে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল।

একটু পরে। হঠাৎ শুনলাম তুমুল তর্জন গর্জন। একজন লোক চেঁচাচ্ছে। — 'এই বুড়ি তোর ছাগলের কাণ্ডটা দেখ। ইস! কতগুলো কচি ডাঁটা মুড়িয়ে দিয়েছে। কী লোকসান! আর এই বাসও হয়েছে যাচ্ছেতাই। ছাগল ভেড়া যা ইচ্ছে তুলবে। ওহে কন্ডাক্টার দেখো ইদিকে।'

উঁকি মেরে ঘটনাটা বুঝে দেখি সর্বনাশ। লোকটি ছোট এক ধামা পালং শাক রেখেছিল পুঁটির সামনে। বোধহয় বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছিল হাটে। মুখের কাছে রসাল খাদ্য পেয়ে পুঁটি আর লোভ সামলাতে পারেনি। কখন চিবোতে শুরু করে দিয়েছে।

কন্ডাক্টার হাজির। যো পেয়ে গেছে। চোখ পাকিয়ে বলল — 'কী রে বুড়ি, তোর ছাগলের নাকি বড় বুদ্ধি! বড় লক্ষ্মী! খুব যে বড় বড় কথা হচ্ছিল! এবার?'

একটা ছাত্র ফুট কাটল — 'আহা, বাচ্চা ছেলে খিদে পেয়েছিল। সকালে বেরিয়েছে, টিফিন হয়নি।'

পুঁটির ব্যবহারে বুড়ির বেজায় অপমান লেগেছে। সে পুঁটিকে দুই থাপ্পড় কষিয়ে দিল। — 'হতভাগা কেবল খাই খাই। আসার আগে অতগুলো পাতা খাওয়ানু না? বাসে উঠেছিস, বসতে পেয়েছিস, তা নয়। যত বিটকেলে বুদ্ধি। ছাগলার স্বভাব যাবে কোথা?'

চাঁটি খেয়ে পুঁটি ভ্যা ভ্যা করে কান্না জুড়ে দিল। ছেলেগুলো হট্টগোল করতে লাগল। কন্ডাক্টার বুড়িকে জোর করে নামিয়ে দেবে কিনা ভাবছে এমন সময় বুড়ি নিজেই ছাগল বগলে উঠে দাঁড়াল। বোধহয় তার যাওয়ার জায়গা এসে পড়েছে কিংবা বেগতিক দেখে আগেই কেটে পড়ছে। 'চ বাড়িতে দেখাচ্ছি মজা। আচ্ছা গেরো হয়েছে বাবা ছাগল পুষে। ঝাড়া হাত পা কুটুম

বাড়ি বেড়াতে যাব, উপায় নেই। দুদণ্ড না দেখলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবে। ফেলে আসব এবার, যত পারে চেল্লাক।' গজ গজ করতে করতে বুড়ি পুঁটিকে নিয়ে এগোল।

ঠিক নামার মুখে বুড়ি ঘাড় ঘোরাল। পালং শাকের মালিককে উদ্দেশ করে ঝাঁপিয়ে উঠল — 'তোমারও বাপু আক্কেল বলিহারি। ছাগলের জিবের ডগায় কচি শাক রেখেছ! বলি লোভ দেখালে মুনিরও মতিভ্রম হয়, এ তো অবোধ পশু! হবেই লোকসান।'

আচমকা ধমক খেয়ে শাকের মালিক ভ্যাবাচ্যাকা। 'ঠিক ঠিক' — ছেলেরা সায় দিল। বেশ খুশি খুশি হয়ে বুড়ি তখন বাস থেকে নামল।

(সত্য ঘটনা)

সাহিত্যিকের সঙ্কট

বিখ্যাত সাহিত্যিক কৃপাসিন্ধু সহায় তার ছোট্ট নোটবই খানার পাতায় চোখ বুলিয়ে রাখলেন, "এবং আজও দেখছি দুটো।"

ভাগ্নে মদন সামনে বসেছিল। জিজ্ঞাসা করল — "কোথায় কোথায়?"

"মহাবলী ব্যায়ামসমিতির বার্ষিক মিলনোৎসব আর স্বামী অদ্ভুতানন্দের স্মৃতিসভা। একটা হাওড়া, আর একটা বেলগেছে।"

"সময়?" জানতে চাইল মদন।

"ব্যায়ামসমিতি বিকেল পাঁচটায় আর স্মৃতিসভা সাড়ে পাঁচটায়। উঁহু দুটো পরপর ম্যানেজ করা যাবে না। যে কোনো একটা। কি-ন-তু কোনটা?"

মদন বলল, "স্মৃতিসভাটা বাদ দাও।"

"কেন?"

"ওসব মঠ ফটে খাওয়ায় না মোটে। মহা কিপ্‌পুস বড়জোর এক গ্লাস ঘোল নয়ত এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুট দেবে।"

"ঠিক বলছিস?"

"হ্যাঁ, আমি শুনেছি।"

আসলে মদনের স্মৃতিসভায় বেজায় আতঙ্ক। একটার পর একটা নাগাড়ে লেকচার চলে। একঘেয়ে। তার ঘুম পেয়ে যায়। বরং ব্যায়ামসমিতিতে ভ্যারাইটি-শোর ব্যবস্থা আছে। সময়টা খাসা কাটবে। তাছাড়া ব্যায়ামসমিতি যখন — জলযোগের ব্যবস্থাটাও নিশ্চয়ই বেশ জোরালো হবে।

কৃপাসিন্ধুবাবু বললেন, "বেশ আমি তবে ফোন করে বলে দেব — স্মৃতিসভায় যেতে পারব না। কিন্তু কারণটা কি বলা যায়?"

"মামা ভুলে যেও না কিন্তু" —

"কক্ষনো না। আমার অমন ভুল হয় না। তোদের কেবল যতসব" —

"হ্যাঁ, সেবার শিবপুরের পার্টি মনে নেই? স্রেফ ভুলে মেরে দিলে সভার কথা। পরদিন বাড়ি বয়ে এসে কি চোটপাটই করে গেল।"

"হুঁ, সেদিন খুব ব্যস্ত ছিলাম, তাই।"

মুখে রাগ দেখালেও সাংসারিক কাজে কৃপাসিন্ধুবাবু সত্যি বেশ ভুলো। মনে মনে জানেনও একথা, তবে বাইরে তা স্বীকার করতে আপত্তি।

কৃপাসিন্ধুবাবু বললেন, "বাড়ির টেলিফোন তো বিগড়ে আছে। অন্য কোথা থেকে ফোন করতে হবে। ঠিক আছে, আমি খেয়েদেয়ে বেরুব। কলেজস্ট্রিটে কাজ আছে। সেখান থেকে ফোর করে দেব।"

"তুমি বাড়ি ফিরবে কখন?"

"ফিরব না। কলেজস্ট্রিট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা হাওড়া যাব।"

"কিন্তু ওরা যে গাড়ি পাঠাবে তোমায় নিতে।"

"বারণ করে দেব। নইলে সেই চারটে থেকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখবে। পাঁচটায় যখন বলেছে — ছটার আগে শুরু হচ্ছে না সভা, জানি তো সব। ততক্ষণ ঠায় বসে বসে মাছি তাড়াও। আর অটোগ্রাফ দিতে দিতে আঙুল ব্যথা হয়ে যাক। ঠিক দশ মিনিট আগে যাব পাঁচটার। তুই চলে আসিস আমার কাছে সাড়ে চারটের মধ্যে। ওই যে বইয়ের দোকান, নাম — লেখাপড়া, সেখানে থাকব।"

কৃপাসিন্ধুবাবু উঠলেন! ঘর থেকে বেরিয়ে কয়েক পা গিয়ে আবার ফিরে এলেন। — "হ্যাঁরে, কী বলা যায়? কেন যাব না। একটা কারণ তো চাই।"

মদন নির্বিকার ভাবে বলল, "বলে দিও যা হয় কিছু। তোমার খুব জ্বর। ভুল বকছ।"

"না না, শেষে বাড়িতে চলে আসবে খবর নিতে। তাছাড়া আমি নিজে ফোন করছি যখন।"

"তবে বল, বড্ড পেট ব্যথা, আর একটু জ্বর হয়েছে।"

পেট ব্যথার মাহাত্ম্য মদনের মতো সদ্য স্কুল পাস করা ছেলেরা খুব ভালো ভাবে জানে। ক্লাস ফাঁকি দিতে এমন পন্থা আর হয় না। ডাক্তার-বদ্যি গার্জেনদের সাধ্য নেই যে ব্যথাটা আসল না নকল যাচাই করে। কৃপাসিন্ধুবাবু খুশি হয়ে ঘাড় নাড়লেন। পরামর্শটা তাঁর মনে ধরল।

সরস্বতীপুজোর মরশুম চলছে। এখন হপ্তাখানেক কলকাতা ও মফঃস্বলে পাড়ায় পাড়ায় বাণীবন্দনা উপলক্ষে সভা সমিতি উৎসব লেগে থাকে। তার সঙ্গে আছে নানান ক্লাব ও সংঘের বার্ষিক মিলনোৎসব বা স্মৃতিসভা জাতীয় অনুষ্ঠান। প্রত্যেক সভা বা অনুষ্ঠানে সভাপতি, প্রধান অতিথি ইত্যাদির অবশ্য প্রয়োজন। কৃপাসিন্ধুবাবু কলকাতানিবাসী প্রবীণ নামজাদা সাহিত্যিক। তাই এ সময়টা ভারি ব্যস্ত থাকেন। কোনো বিকেল বা সন্ধেয় তাঁর ফাঁক নেই। একটা না একটা সভা অলংকৃত করার দায়িত্ব থাকবেই। কখনো একই দিনে দুটো বা তিনটে সভাতেও যেতে হয়।

প্রায় প্রত্যেক সভায় সভাপতি, প্রধান অতিথির জন্য নোনতা, মিষ্টি, লুচি, মাংস ইত্যাদিতে দিব্যি জলযোগের ব্যবস্থা থাকে। কৃপাসিন্ধুবাবু কিঞ্চিৎ পেটুক মানুষ। ওই দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটাতেই তাঁর প্রধান আকর্ষণ। ওই লোভেই কেউ ডাকলেই তখনকার মতো রাজি হয়ে যান। তবে বলে রাখেন, অসুবিধা হলে পরে জানিয়ে দেব।

বাড়িতে গৃহিণীর রাজ্যে ইদানীং খাওয়া-দাওয়ায় বড্ড কড়াকড়ি। কারণ — নাকি তাঁর বয়স

হয়েছে এবং হজমটাও সুবিধের যাচ্ছে না। সুতরাং ঘরের এই অভাবটুকু কৃপাসিন্ধুবাবু বাইরে পুষিয়ে নেন। অবশ্য গিন্নি জানেন না এখবর। বাড়িতে বলেন — স্রেফ একটি মিষ্টি আর চা, আর কিচ্ছু ছুঁই না।

বছর খানেক হল সভাটভায় যেতে হলে কৃপাসিন্ধুবাবু ভাগ্নে মদনকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। একা একা যেতে আসতে ভালো লাগে না। তাছাড়া কবে কোথায় প্রোগ্রাম একটু খেয়াল করিয়ে না দিলে গুলিয়ে যায়। সরস্বতীপুজোর সময় তো মদন মামা বাড়িতে থেকেই যায় কয়েকদিন। শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছেন মদনকে। মামির কাছে সভায় জলযোগের ব্যাপারটা যাতে-না ফাঁস করে ফেলে।

মদনের মন্দ কাটে না সময়টা।

মামার সঙ্গে তারও ভূরিভোজ জোটে। মোটর চড়ে যাওয়া আসা। নাচ, গান, ম্যাজিক ইত্যাদি বিচিত্রানুষ্ঠান দেখতে পাওয়া যায় বিনাটিকিটে। তবে কখনো লম্বা লম্বা বক্তৃতা শুনতে হয় — এই যা যন্ত্রণা। তেমন শুধু লেকচারের সভা থাকলে সে কেটে পড়ার চেষ্টায় থাকে।

যে কেউ আমন্ত্রণ জানাতে এলে কৃপাসিন্ধুবাবু নোটবইতে তাদের নাম ঠিকানা টুকে নেন। প্রোগ্রাম চেয়ে রাখেন। পরে মদনের সঙ্গে কনসাল্ট করে স্থির করেন কোনটায় যাবেন, আর কোনটা বাতিল করবেন। এ বিষয়ে মদনের মাথা ভারি সাফ। কোথায় গেলে পেটপুজো জমবে ভালো সে ঠিক বোঝে। সাধারণত কোনো সভা সমিতিতে যাওয়া বাতিল করতে কৃপাসিন্ধুবাবু যখন ফোন করেন, মদন তখন সামনে থাকে। মামাকে কথা আর বুদ্ধি জুগিয়ে দেয়।

বিকেল চারটের মধ্যে মদন কলেজস্ট্রিটে হাজির হয়ে দেখল, 'লেখাপড়া' নামে বইয়ের দোকানের সামনে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কৃপাসিন্ধুবাবু তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে হাত-টাত নেড়ে বেজায় সাহিত্যিক তর্ক জুড়েছেন।

মদন পাশে দাঁড়িয়ে রইল। এক ফাঁকে বলল, "মামা ফোন করেছিলে?"

"হুঁ।" সংক্ষেপে জবাব সেরে কৃপাসিন্ধুবাবু আবার ঘোরতর তর্কে মগ্ন হলেন।

"মামা, সাড়ে-চারটে বাজে।" মনে করিয়ে দিল মদন।

"একটা ট্যাক্সি ডাক।" আদেশ দিলেন কৃপাসিন্ধুবাবু।

ট্যাক্সি এল।

কৃপাসিন্ধুবাবু তাঁর বন্ধুকেও ট্যাক্সিতে তুললেন। — "না না আলোচনাটা শেষ হল না। চলুন এক সঙ্গে। আপনি তো উত্তরপাড়ার ট্রেন ধরবেন। হাওড়া স্টেশনে নামিয়ে দেব আপনাকে।"

গাড়িতে সমানে দু-জনে তর্ক করতে করতে চললেন। মদনের ভয় হচ্ছিল, তাঁদের চিৎকারের চোটে ট্যাক্সি ড্রাইভারের হাত কেঁপে অ্যাক্সিডেন্ট না হয়।

বন্ধুকে হাওড়া স্টেশনে নামিয়ে দেওয়ার পর কৃপাসিন্ধুবাবু চুপচাপ। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করছেন, মাথা নাড়ছেন। মদন কয়েকবার তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। কৃপাসিন্ধুবাবু আমল দিলেন না। একবার শুধু জিজ্ঞেস করলেন — "সভাটা কীসের জানি?"

"মহাবলী ব্যায়াম সমিতির।"

"হুম্।" কৃপাসিন্ধুবাবু ফের চিন্তাসাগরে ডুবে গেলেন। বোধহয় বন্ধুর সঙ্গে আবার দেখা হলে আর এক দফা তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার বাসনায় যুক্তিকে শান দিতে লাগলেন মনে মনে।

নোটবই খুলে ঠিকানা দেখে হাওড়া শহরের এক ছোট রাস্তায় ট্যাক্সি থামানো হল। কাছেই এক মাঠ। মাঠটা ঘেরা হয়েছে। ভিতরে রঙচঙে কাপড়ের প্যান্ডেল। গেটে ভলান্টিয়ার। হুড়হুড় করে লোক ঢুকছে। অনেকে ব্যস্ত ভাবে ছোটাছুটি করছে। নিশ্চয়ই এই সেই সভাস্থল।

মদন ট্যাক্সি থেকে নামল। কৃপাসিন্ধুবাবু জানলা দিয়ে মুন্ডু বের করে এদিক সেদিক চাইতে লাগলেন। কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না। হয়তো কৃপাসিন্ধুবাবুর নাম সবাই জানে কিন্তু চেহারা কেমন ধারণা নেই।

মদন প্যান্ডেলের কাছে এগিয়ে গেল। একজন গাট্টাগোট্টা যুবক, নির্ঘাৎ ব্যায়ামবীর অর্থাৎ ব্যায়ামাগারের সভ্য—তাকে ধরল মদন। — 'দাদা শুনছেন?"

— "কী?"

— "ওই যে ট্যাক্সিতে বসে, উনি হচ্ছেন শ্রীকৃপাসিন্ধু সহায়। উনি অরগানাইজারদের কাউকে ডাকছেন।"

"ও ভুতোদা, ভুতো — দা।" বিকট কণ্ঠে হাঁক পাড়ল সেই যুবক।

"কীরে ভোম্বল, হলটা কী? আমার বলে মরবার ফুরসৎ নেই!"

— ক্ষীণকায়, ফুলপ্যান্টের ওপর সবুজ পাঞ্জাবি, লম্বাচুলো, বছর চল্লিশ বয়সের এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলেন।

"দেখ কি বলছে।"

মদন আবার নিবেদন করল — "ওই যে কৃপাসিন্ধুবাবু এসেছেন।"

"কিপাসিন্ধু! কীসের আর্টিস্ট?" ভুতোদা ভুরু কুঁচকোলেন।

"আজ্ঞে আর্টিস্ট নয়। সভাপতি। আপনাদের সভায় ওনাকে সভাপতি হওয়ার জন্য নেমন্তন্ন করা হয়েছে।"

"ওঃ সভাপতি। ও আমার ডিপার্টমেন্ট নয়। আমার শুধু আর্টিস্ট। সভাপতি, বক্তাফক্তা ফুচুর চার্জে। দিচ্ছি ডেকে।"

"ফুচু। এই ফুচু" — ভাঙা গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে ভুতোদা অদৃশ্য হলেন। ভোম্বল সরে পড়ল। আর্টিস্ট নয় জেনে, তার আর আগন্তুক সম্পর্কে উৎসাহ নেই।

মদন গিয়ে দাঁড়াল মামার কাছে। ট্যাক্সিওলা ঘ্যানঘ্যান শুরু করল — "ছেড়ে দিন আমায়। দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

এখন তাকে ছেড়ে দিতে হলে নিজের পকেট থেকে ভাড়া গুনতে হয়। অতঃপর সভার উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে যদি সে টাকা আদায় না হয়? সুতরাং কৃপাসিন্ধুবাবু ট্যাক্সিওলার তাগাদা উপেক্ষা করলেন।

কোঁচানো ধুতি-পাঞ্জাবি শোভিত বেশ পালোয়ান গোছের একজন আবির্ভূত হলেন। বোধহয় ইনিই ফুচুবাবু। তাকে দেখে কৃপাসিন্ধু জানালেন — "আরে ইনিই তো আমায় নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিলেন।"

"আরে কী সৌভাগ্য। আপনি এসে পড়েছেন! উঃ কী মুশকীলে যে পড়েছিলুম। আপনার ফোন পেয়ে — কী আর বলব। যাক এখন কেমন আছেন? শেষ পর্যন্ত যে এসেছেন। এতে আমরা — কী আর বলব।" বিগলিত ফুচুবাবু হাঁকহাক করে ভিড় জমিয়ে ফেললেন।

ট্যাক্সিওলা গলা বাড়িয়ে বলল — "আমার ভাড়াটা?"

"হাঁ-হাঁ দিচ্ছি ফেয়ার। কী দরকার ছিল ট্যাক্সির। ফোন করলেই গাড়ি পাঠিয়ে দিতাম। মিছিমিছি কষ্ট হল আপনার। এই শরীরে" —

কেমন খটকা লাগল মদনের। প্যান্ডেলের দিকে সদলবলে এগোনোর ফাঁকে মামাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল — "কাকে ফোন করে যেতে পারবে না বলেছিলে? কোন্ নাম্বারে?"

"কেন প্রথমটায়।"

"খেয়েছে। ওটাইতো ব্যায়াম সমিতির। আর গাড়ি বারণ?"

"করেছি। নিচের নাম্বারে।"

নোটবইয়ে দুটো ফোন নাম্বার কাছাকাছি লেখা ছিল। ওপরে ব্যায়াম সমিতির — নিচেরটা স্মৃতি সভার। গুলিয়ে ফেলেছেন কৃপাসিন্ধু বাবু। স্মৃতি সভার বদলে ব্যায়াম সমিতিকেই না করে দিয়েছেন। তাই এরা কৃপাসিন্ধুবাবুর আগমনে এত অবাক হয়েছে। কেবল শরীর কেমন? শরীর কেমন? করছে। মামার যা কাণ্ড — ভাবল মদন।

"মামা নাম্বার গোলমাল হয়ে গেছে বোধহয়।" সংক্ষেপে জানাল মদন।

"ও" কৃপাসিন্ধুবাবু কীন্তু নির্বিকার। ফুচুবাবু আর একবার তাঁর শরীরের খবর জিজ্ঞাস করাতে কৈফিয়ৎ হিসেবে বললেন — "এখন অনেকটা ভালো। ভেবেছিলাম হয়তো আসতে পারব না। তাই জানিয়েছিলাম।"

"হাঁ হাঁ আপনি বলেছিলেন চেষ্টা করব। কীন্তু সত্যি যে আসবেন। ওঃ কী বলব" —

কৃপাসিন্ধুবাবুর এই অভূতপূর্ব কর্তব্য নিষ্ঠার উদাহরণে সবাই কৃতার্থ হয়ে গেল।

কয়েকজন ইয়া ইয়া পেশিবহুল জোয়ান কনুই ও বাইসেপের গুঁতোয় ভিড় পরিষ্কার করে আগে আগে পথ দেখিয়ে চলল। যেতে যেতে ফুচুবাবু একজনকে উদ্দেশ করে বললেন, "ওরে কেষ্টা কোথায়?"

"কেষ্টা সভাপতি ম্যানেজ করতে গেছে।"

"জানি জানি। কীন্তু গেল কোথা?"

"ও নিমাই স্যারের বাড়ির সামনে গার্ড দিচ্ছে।"

— "কেন?"

"কবি স্যার আসতে চাইছে না। বলছে সিনেমা যাবে। টিকীট কাটা হয়ে গেছে। কেষ্টা নজর রাখছে। সিনেমা দেখতে বেরলেই ধরে আনবে।"

"কেষ্টাকে বলে দে, আর দরকার নেই। আসল সভাপতি এসে গেছেন।" বললেন ফুচুবাবু।

"কী ব্যাপার?" কৌতূহলী কৃপাসিন্ধু জানতে চাইলেন।

"ও কীছু না। হাসলেন ফুচুবাবু। "মানে আপনি তো হঠাৎ আসবেন না জানালেন। তখন আর বাইরের সভাপতি পাই কোথা। তাই লোকাল সভাপতির খোঁজে পাঠিয়েছিলাম।"

"কবি স্যার কে?"

"নিমাই কুণ্ডু। টিচার। পাড়ায় থাকেন।"

"লেখেন টেখেন বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ পদ্য। ইস্কুল ম্যাগাজিনে। তবে বক্তৃতা দেন দারুণ। এমনি ফ্যাঁসাদে পড়লে ওঁকে দিয়ে আমরা কাজ চালিয়েনি।"

ফুচুদা কৃপাসিন্ধুবাবুকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন প্যান্ডেলের ভিতরে, উঁচু মঞ্চের ওপর চেয়ারে, প্রধান বক্তা অধ্যাপক বটকৃষ্ণ বটব্যালের পাশে। মদনও বসল মঞ্চে। তবে কৃপাসিন্ধুবাবুর পিছনের সারিতে।

বিচিত্রানুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রিত শিল্পীদের কয়েকজন তখনও অনুপস্থিত ছিল। সুখের কথা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মিনিট পনেরোর মধ্যে তারা এসে পড়ল। প্রোগ্রামে ছাপানো সময় থেকে মাত্র আধঘণ্টা দেরিতে সভা শুরু হয়ে গেল।

একটা জিনিস লক্ষ করে একটু উদ্বিগ্ন হল মদন। যে কটি গাইয়ে পরে এল, তারা কীন্তু সোজা মঞ্চে এসে উঠল না। কোথায় জানি নিয়ে যাওয়া হল তাদের। খানিক পরে তারা পান চিবুতে চিবুতে মঞ্চে এসে আসন নিল।

ওরা খেয়ে দেয়ে এল নাকী? জলযোগ হয়ে গেল? কই তাদের তো ডাকল না? খচখচ করতে লাগল মন। হয়তো ওরা আগে চলে যাবে। আমাদের ব্যবস্থা সভার শেষে। অধ্যাপক বটব্যালকে জিজ্ঞেস করলে হয়। ওঁনার পাট চুকে গেছে না বাকি? নাঃ, সে ভারি অভদ্রতা হবে। মিষ্টিমুখ করাবে ঠিকই। সভার আগে কিংবা পরে। আগে হলেই ভালো হত। খালি পেটে এতক্ষণ থাকা। মামা যে দেরি করল — একেবারে লাস্ট মোমেন্টে এল। ওদের গাড়িতে, হাতে একটু সময় রেখে জলযোগের পার্ট আগেই চুকে যেত ঠিক। মদন মনে মনে এসব ভাবতে ভাবতে সভার কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেল।

সমিতির বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠ, প্রধানবক্তা ও সভাপতির ভাষণ সমাপ্ত। এবার — ভ্যারাইটি শো।

বক্তৃতা চলাকালে দর্শকরা অনেকে গলা নামিয়ে গল্প করছিল। তারা খাড়া হয়ে বসল। অনেক চেয়ার খালি পড়েছিল — দেখতে দেখতে সেগুলি ভর্তি হয়ে গেল। মঞ্চের প্রতি এতক্ষণে নিবিড়ভাবে মনোনিবেশ করল দর্শক ও শ্রোতাবৃন্দ। মদনও জলযোগের সমস্যা ভুলে সজাগ হল।

সভাপতি, প্রধান বক্তা প্রভৃতি মঞ্চে আসীন বিশিষ্ট অতিথিদের চেয়ার মঞ্চের একধারে সরিয়ে দেওয়া হল। যাতে তাঁরা পাশ থেকে ভালো করে অনুষ্ঠান দেখতে পারেন।

খাসা প্রোগ্রাম। গান : রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আধুনিক, ম্যাজিক, পেশি সঞ্চালন, যোগব্যায়াম, বাহুবল এবং দন্তবল প্রদর্শন (দাঁত দিয়ে লোহার রড বেঁকানো)। মুকাভিনয়।...

ঘনঘন হাততালি, হুল্লোড়-হাসি উৎসাহিত কলরবে সরগরম হয়ে উঠল প্যান্ডেল। কোথা দিয়ে যে দুটো ঘণ্টা কেটে গেল।

শেষ হল সভা। উঠে দাঁড়াল সবাই।

মদন টের পেল ক্ষিদেয় পেট বেশ চুঁই চুঁই করছে।

ফুচুবাবু এসে কৃপাসিন্ধুবাবুর সামনে করজোড়ে দাঁড়ালেন —

"এদিকে আসুন স্যার। এক জায়গায় একটু বসে যাবেন। আপনিও চলুন প্রফেসর বটব্যাল। একটুক্ষণ ওয়েট করবেন। সামান্য আয়োজন, কতক্ষণ বা লাগবে। আপনার অবশ্য ও সব হয়ে

গেছে। তবু আর এক কাপ চা খেতে নিশ্চয়ই আপত্তি নেই? গল্পটল্প করবেন ওঁনার সঙ্গে। তারপর এক গাড়িতে পৌঁছে দেব। একই তো রাস্তা আপনাদের। কী অসুবিধে হবে?"

কৃপাসিন্ধুবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মদন চট করে মামার পিছনে সেঁটে গেল। বটব্যালমশাই বললেন — "বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। অসুবিধার কী। ওঁনার সঙ্গে দুটো কথা বলতে পাওয়া তো পরম সৌভাগ্য। এতক্ষণ তো সুযোগই হয়নি।"

ওই পাড়ারই এক বাড়ির এক তলার ড্রয়িংরুমে সবাইকে বসানো হল। ফুচুবাবু তাঁর হাতির শুঁড়ের মতো হাত দুখানা কৃপাসিন্ধুবাবুর নাকের ডগায় কচলাতে কচলাতে বললেন — "আপনার স্পিচটা যা দারুণ হয়েছে স্যার! ওফ্— কী আর বলব! সবাই একেবারে।' —

অধ্যাপক বটব্যালও যোগ দিলেন — "সত্যি অপূর্ব। আহা কী শুনলাম — জাগুক জাগুক পেশির নাচন পাড়ায় পাড়ায় —। ধন্য আপনার প্রতিভা। একি আপনি আগে থেকেই ভেবে এসেছিলেন? না এখানে বসে বসেই রচনা করলেন?"

ফুচুবাবু অমনি ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন, "ওঃ গ্র্যান্ড। কী আর বলব।"

কৃপাসিন্ধুবাবু কোনো জবাব দিলেন না। মৃদু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন।

মদন ভাবল — বটে। যতক্ষণ মামা বক্তৃতা করেছে, ফুচুবাবু মঞ্চের পিছনে দাঁড়িয়ে একজনের সঙ্গে সমানে গুজগুজ করে গল্প করে গেছেন। সে দেখেছে। তবে ওঁনার আর দোষ কী? সেই কি আর শুনেছে মামার ভাষণ!

একটি ছেলে এসে কৃপাসিন্ধুবাবুর সামনের টেবিলে একটা ট্রে নামিয়ে রাখল। সুদৃশ্য ট্রে-র মাঝখানে এক মস্ত শ্বেতপাথরের গ্লাস। তাতে রুপোর ঢাকনা। এক কাপ চা-ও রয়েছে ট্রেতে।

ছেলেটি চা-টা এগিয়ে দিল বটব্যালমশাইয়ের কাছে আর গ্লাসটা রাখল কৃপাসিন্ধুবাবুর সামনে।

ফুচুবাবু ভারি কাঁচুমাচু হয়ে বলতে লাগলেন — "জানি স্যার আপনার শরীর খারাপ। পেট ভালো নেই। কিচ্ছুই খাবেন না। ওঃ কি আফশোস যে হচ্ছে। সামান্য মিষ্টিমুখটুকু করাতে পারলাম না। তবু, এই শরবতটুকু চেখে দেখুন। ঘোলের শরবত। গ্যারান্টি দিচ্ছি স্যার কোনো অপকার হবে না। আমাদের ক্লাবের ম্যাসাজম্যান রামলক্ষ্মণ সিংয়ের নিজের হাতে তৈরি। পেটের পক্ষে মহৌষধ।

কৃপাসিন্ধুবাবু থ হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

ঘোল তাঁর দুচক্ষের বিষ। কারণ বিশেষে লোকের মাথায় ঢালা ছাড়া ওর কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তিনি মানেন না। এই নিদারুণ শক্ খেয়ে চেয়ার থেকে পড়তে পড়তে কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে কাষ্ঠ হেসে বললেন — "নাঃ থাক।"

"আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি স্যার।" ফুচুবাবু অনুনয় জানালেন।

কৃপাসিন্ধুবাবু দৃঢ় ভাবে মাথা নাড়লেন — "না না।"

চায়ে চুমুক দিতে দিতে বটব্যালমশাই বললেন, — "থাক থাক, ওঁকে আর জোরাজুরি করবেন না।

আমি জানি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে উনি ভীষণ সংযমী। তাই তো এখনও কী ফিট!

এখনও কী প্রচুর লিখছেন, কী বিপুল সৃষ্টি করে চলেছেন। আর পেটের অসুখের সবচেয়ে বড় ওষুধ কী জানেন? উপোস।"

অগত্যা ঘোল ফিরে গেল।

ফুচুবাবু মদনকে ইশারায় ডাকলেন। মদন কাঠ হয়ে ব্যাপার দেখছিল। ডাকা মাত্র তড়াক করে উঠে সে ফুচুবাবুর পিছনে পিছনে পাশের ঘরে ঢুকল। তক্ষুণি তার সামনে রাখা হল এক মস্ত প্লেট। তাতে রকমারি খাদ্যবস্তু।

"ওখানে দিলাম না ভাই তোমায়।" ফুচুবাবু বললেন, "তোমার মামা যদি রাগ করেন। ভাজাভুজি আছে। কিচ্ছু ভয় নেই। সব ভালো দোকানে বানানো। আরে কীক আর বলব, তোমাদের বয়সে আমি লোহা চিবিয়ে হজম করতে পারতাম।"

প্লেটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে মনে মনে বলল মদন, "আমিও পারি।"

ফেরার পথে গাড়িতে বটব্যালমশাই কৃপাসিন্ধুবাবুর সঙ্গে সাহিত্য বিষয়ে আলোচনার অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু কৃপাসিন্ধুবাবু গম্ভীর আনমনা। দায়সারা গোছের উত্তর দিলেন। আলাপ জমল না। বটব্যালমশাই ভাবলেন, সাহিত্যিকের মাথায় হয়তো কোনো গল্পের প্লট ভর করেছে। তাই এমনি ভাব। এখন ডিসটার্ব করা উচিত নয়।

বাড়িতে নেমেই কৃপাসিন্ধুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কী কী খেলিরে মদন?"

"দুটো কচুরি, আলুরদম, দুটো ফুলকপির শিঙাড়া, একটা জলভরা সন্দেশ — এই এত্ত বড়, একটা রাজভোগ, আর সেই ঘোলের শরবত। কী চমৎকার টেস্ট! তুমি তো খেলে না"!

কৃপাসিন্ধুবাবু ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

তারপর বললেন — "দেখ্ মদন কোনো প্রোগ্রাম ক্যানসেল করতে হলে আমার অসুখ-টসুখ বলা চলবে না।"

"তাহলে কী বলবে?"

"বলব বলব — আমার বাড়িতে কারো অসুখ। অন্য কারো, আমার নয়। বুঝলি।"

[অজ্ঞাত]

উসুল

বড়মামির তলব পেয়ে ভোম্বল হাজির হল। মামিমা কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন, "বাবা ভোম্বল দেখ কী অলুক্ষণে কাণ্ড। উনি নাকি পরশু অমাবস্যার রাত্তিরে কোন এক সাধুর আখড়ায় গিয়ে কাটাবেন। আমার ভারি ভয় করছে। তুই ওঁর সঙ্গে যা বাবা। ওঁকে একা ছাড়তে আমার সাহস হচ্ছে না। কত বারণ করছি, কিছুতেই শুনছে না।'

'কোথায় যাবে মামা?' ভোম্বল জিজ্ঞেস করল।

'তা ঠিক জানি না। তবে কলকাতার বাইরে। কী করতে যাবে তাও জানি না। তবে শুনেছি সাধুটা নাকি কাপালিক। অমাবস্যার রাতে নিশ্চয়ই ভয়ানক কিছু হবে।

সদ্য রিটেয়ার করেছেন নিবারণবাবু মানে ভোম্বলের বড়মামা। বাড়িতে বসে থাকতে একঘেয়ে লাগে তাই সময় কাটাতে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ান। মাঝে মাঝে সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছেও যান। মিনমিনে মিষ্টি মিষ্টি কথা কওয়া সাধু তাঁর পছন্দ নয়। তাঁর আকর্ষণ কড়া ধাতের সাধুর ওপর। তাই তান্ত্রিক সাধুর খোঁজ পেলেই ছোটেন। কারও শিষ্য টিষ্য অবশ্য হননি এখনও। শুধু তাদের ব্যাপার-স্যাপার দেখেন। তবে এতটা বাড়াবাড়ি করেননি এর আগে। তান্ত্রিক সাধুর ডেরায় অমাবস্যার রাতে থাকা! স্বাভাবিকভাবেই মামিমা বেজায় ঘাবড়েছেন।

'এ সাধুর খোঁজ পেল কী করে মামা!' ভোম্বল জানতে চাইল।

'অপিসের এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গেসলেন ট্রেনে চেপে, সেখানে খোঁজ পেয়েছে। ওইখানেই থাকে সাধু।'

ভোম্বলের বড়মামা-মামির ছেলেপুলে নেই। বড়মামি ভোম্বলকে ছেলের মতো ভালোবাসেন। কলেজের পড়ুয়া ভোম্বলের সিনেমা রেস্টুর‍্যান্টের খরচ জোগাতে বড়মামিই ভরসা। বড়মামা ভারিক্কি চালের লোক। ভোম্বল তাঁকে একটু এড়িয়েই চলে। তাই ভয়ে ভয়ে বলল ভোম্বল —সঙ্গে যেতে আর অসুবিধা কী, কিন্তু মামা যদি রাজি না হয়?'

'আলবত হবে। একি ছেলেখেলা?'

বড়মামার সঙ্গে ভোম্বলের যাওয়ার অনুমতি মামিমাই আদায় করে দিলেন। মামা ভীষণ আপত্তি করেছিলেন গোড়ায়। তখন মামিমা বললেন, 'বেশ ভোম্বলকে যদি না নিয়ে যাও তো আমিই যাব তোমার সাথে, মোটকথা তোমায় একা ছাড়ছিনে।'

অগত্যা বড়মামা ভোম্বলকেই মেনে নিলেন।

ভোম্বল ঠিক করল সে একা নয়, ফটিককেও সঙ্গে নেবে। ঝাড়পিটের কেস হলে সে একাই ম্যানেজ করতে পারত কিন্তু অচেনা জায়গায় শুধু গায়ের জোরে হয়তো কাজ হবে না। বিপদে পড়লে ব্রেন চাই। আর সে ব্যাপারে ফটিক ওস্তাদ। ফটিক রোগা ঢেঙা ল্যাকপ্যাকে কিন্তু পেটে পেটে বুদ্ধি। ফটিককে সঙ্গে নেওয়ার পারমিশানও মামীমা আদায় করে দিলেন।

অমাবস্যার দিনে দুপুরে নিবারণবাবুর সঙ্গে ভোম্বল ও ফটিক হাওড়া স্টেশনে হাজির হল। ইলেকট্রিক ট্রেনে উঠে বসল। নিবারণবাবুর মুখ থমথমে। ভোম্বলদের সঙ্গে মোটে কথাবার্তা বলছেন না। একবার কেবল শাসিয়েছেন — 'একদম চুপচাপ থাকবি। ডেঁপোমি করেছিস কি থাপ্পড় মেরে ভাগিয়ে দেব। সে তোর মামি যা বলে বলুক গে।'

লোকাল ট্রেন। মেন লাইনে চলেছে। ঘণ্টাখানেক পরে তারা নামল এক স্টেশনে।

বড়মামা সাইকেল রিকশায় উঠলেন। ভোম্বলদের ইশারা করলেন, আর একটা রিকশা চেপে তাঁর পিছনে পিছনে আসতে।

স্টেশনের কাছে ছোট্ট মফঃস্বল শহর। শহরের মধ্য দিয়ে গিয়ে রিকশা গ্র্যান্ড-ট্র্যাঙ্ক রোড ধরল। শহরের সীমানা ছাড়াল। এবার দু-পাশে শুধু ধানখেত। ছোট্ট এক গ্রাম এল। রিকশা থামল। নামল তিনজনে। নিবারণবাবু ঢুকলেন গ্রামের ভিতর।

এক মাটির বাড়ির বাইরের দাওয়ায় ছোটখাটো ভিড়। তার মাঝে বসে ইয়া তাগড়াই এক সাধু। নিবারণবাবু সাধুকে প্রণাম করে বারান্দার এক কোণে গিয়ে বসলেন। ভোম্বল আর ফটিকও প্রণাম করল সাধুকে কিন্তু তারা বসল না, একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

জবরদস্ত দেখতে বটে সাধুবাবা। অঙ্গে কৌপীনমাত্র সম্বল। মুখভর্তি গোঁফ দাড়ির জঙ্গল। মাথায় প্রকাণ্ড জটা। টকটকে লাল দুই চোখ। কপালে সিঁদুরের তিলক। সারা গায়ে ছাই মাখা। কম্বলের ওপর বসে আছেন টান হয়ে। চোখ আধবোজা। সাধুজির দুপাশে বসে দুই চেলা। একজন বেশ লম্বা চওড়া। অন্যজন মোটা বেঁটে। তাদের গায়েও ছাইভস্ম। কপালে তিলক। তবে কৌপীনের বদলে গেরুয়া লুঙ্গি পরা।

সাধুকে ঘিরে থাকা ভক্তরা বেশিরভাগই গ্রাম্য লোক। বাইরের তিনজন শহুরে লোকের আগমনে তারা দু-একবার কৌতূহলী চোখে চাইলেও খুব বেশি অবাক হল না। হয়তো এমন লোক এখানে মাঝেমাঝেই আসে।

একটু পরেই ভোম্বলদা বুঝল বাবাজি এখন মৌনী। অর্থাৎ কথা বলছেন না। কেউ কোনো আর্জি পেশ করলে বা প্রশ্ন করলে শুধু হাত ও চোখের বিচিত্র ভঙ্গি করে জবাব দিচ্ছেন। এবং সেই ভঙ্গির মানে বুঝিয়ে দিচ্ছে তার চেলারা।

ঘণ্টা দেড়েক পর ভিড় একটু পাতলা হল। নিবারণবাবু ঠায় বসে আছেন। ভোম্বল আর ফটিকের পা ধরে যেতে কাছেই একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসেছে। সাধুর মোটা শিষ্যটি হঠাৎ উঠে এসে নিবারণবাবুকে ইঙ্গিতে ডাকল। দুজনে একটু ফাঁকায় গেল। ভোম্বল ও ফটিক অমনি গুটিগুটি তাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। সাধুর চেলা ভোম্বলদের বলল — 'এই ভাগ্।'

ভোম্বল আঙুল দেখিয়ে বলল — 'আমার মামা।'

'আপনার লোক?' চেলাটি নিবারণবাবুকে জিজ্ঞাসা করল।

'হুঁ।' অনিচ্ছা ভরে জানালেন নিবারণবাবু।

'এসব ঝামেলা আনলেন কেন?' যদি ভয়-টয় পায়? বলেছিলাম না একা আসতে?' চেলা বেশ বিরক্ত।

নিবারণবাবু ভুরু কুঁচকে রইলেন। আপদগুলো কেন যে জুটেছে তা আর ভাঙলেন না। শুধু মৃদুস্বরে বললেন, 'থাক, ওরা কোনও গোলমাল করবে না।'

চোখ পাকিয়ে ভোম্বল আর ফটিককে একবার দেখে নিয়ে চেলাটি গুজগুজ করে নিবাবরণবাবুর সঙ্গে কথা শুরু করল। কান খাড়া করে শুনতে লাগল ভোম্বলরা।

'গুরুজিকে রাজি করিয়েছি বাবু, অনেক বলে কয়ে। ভারি সাদা লোক কিনা এসব শক্তিটক্তি দেখাতে চান না মোটে। নেহাত আপনার খাতিরে —'

'দেখা পাব তো আজ?' নিবারণবাবুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'হাঁ পেতে পারেন। গুরুজির সাধনার জোর, মায়ের কৃপা, আপনার বরাত। শুনুন সন্ধ্যার পর আসবেন। এই গাঁ ছাড়িয়ে বাস রাস্তা ধরে খানিক উত্তরে গিয়ে দেখবেন একটা মস্ত বটগাছ। তখন বাঁদিকে নামবেন রাস্তা ছেড়ে। পাশে শ্মশান। তারপর মাঠ। ওই মাঠের মাঝে একটা শেওড়া গাছের কাছে গুরুজি বসবেন। ওইখানে পুজো হবে। হাঁ, অন্ধকার হলে তবে আসবেন। আর কাউকে বলবেন না একথা। লোকে ভিড় করলে গুরুজি নারাজ হবেন কিন্তু।'

'বেশ তাই হবে।' নিবারণবাবু সম্মতি জানালেন। 'তাহলে এখন ঘুরে আসি। সন্ধেবেলা ওই মাঠে যাব ঠিক।'

সাধুকে প্রণাম করে নিবারণবাবু আপাতত বিদায় নিলেন।

নিবারণবাবু চললেন শহরের দিকে।

ভোম্বল পাশে এসে জিজ্ঞাসা করল — 'আচ্ছা, সাধুবাবা কী দেখাবে?'

'দেখতেই পাবি।'

'মানে' ভয়ের কিছু বুঝি!

'তোদের মতো চ্যাংড়ারা ভয় পেতে পারে।'

'কী দেখাবে?' একটু বুক ঢিব ঢিব করে ভোম্বলের।

'দেখাবে স্বয়ং মা-কালীকে।'

'অ্যাঁ!'

'হুঁ'। সাধুবাবা সিদ্ধপুরুষ। ইচ্ছে করলে মন্ত্রের জোরে মা-কালী আহ্বান করতে পারেন।'

'কে বলল তোমায়?'

'ওই শিষ্যটি। জিজ্ঞেস করছিলাম, সাধুজির বিভূতি-টিভূতির জোর কেমন? তখন কথায় কথায় বলে ফেলল। তখুনি ধরে বসলাম, আমাকে একবার দর্শন করাতেই হবে। রাজি কি হয়, অনেক তোষামোদ করে তবে। মোটা মতো, শিষ্যটি, ওই সব ব্যবস্থা করেছে। সাধু তো প্রায় কথাই বলেন না বাইরের লোকের সঙ্গে। ওঁর এই ক্ষমতার কথা এখানকার লোক জানে না।

'এ জিনিস করা নাকি ভারি শক্ত। সামান্য ভুলত্রুটি হলে সাধকের জীবন নাশ হতে পারে। যাকে তাকে দেখানো উচিত নয়। তাই আমায় বারণ করেছে — আর কাউকে না বলতে।' নিবারণবাবু গর্বিতসুরে বললেন কথাগুলো। কারণ তাঁর জন্য স্পেশাল ব্যবস্থা হয়েছে।

'পয়সা-কড়ি চায়নি কিছু?' ফটিক ফুট কাটল।

'না।' ঝেঁজে উঠলেন নিবারণবাবু। পুজোর খরচার জন্য মাত্র পঁচিশ টাকা অ্যাডভান্স

করেছি। আর ওই শিষ্য বলেছে, গুরুদেব কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে চান, যদি ইচ্ছে হয় কিছু দান করতে। বলেছি দেব, মায়ের দর্শন পেলে ভালো মতোই দেব। ভাবছি শিষ্যও হয়ে যাব ওঁর। এমন সাধক তো মেলে না বড়। দেখা পেয়েছি এ আমার সৌভাগ্য।'

তিনজনে রেল স্টেশনের কাছে গঞ্জ-শহরে পৌঁছল। এখানে হরিবাবু থাকেন, নিবারণবাবুর অফিসের বন্ধু। হরিবাবুর বাড়ি বেড়াতে এসেই নিবারণবাবু এই সাধুর সন্ধান পান।

হরিবাবুর বাড়ির সামনে এসে ফটিক বলল, 'আমি একটু ঘুরে আসছি।' সে সরে পড়ল। বোধহয় নিবারণবাবুর গম্ভীর সঙ্গ তার পছন্দ হচ্ছিল না। একটু হাঁপ ছাড়বে এবার। ভোম্বলেরও তাই ইচ্ছে হল কিন্তু বড়মামাকে একা ছাড়ার অর্ডার নেই মামির।

হরিবাবুর বাড়িতে খুব খাতির-যত্ন এবং পেটপুরে জলযোগের ব্যবস্থা হল। অনেক আড্ডা দিয়ে সন্ধে নামতে নিবারণবাবু উঠলেন। হরিবাবু অনুরোধ করলেন, 'রাত হয়ে গেল, এখানেই থেকে যাও আজ।'

'নাঃ থাক। কতক্ষণেরই বা পথ, মেলাই ট্রেন আছে কলকাতা ফেরার।' বললেন নিবারণবাবু। আসলে রাতটা যে কোথায় কাটাবেন তা চেপে গেলেন।

প্রায় নিশুতি গ্রাম পেরিয়ে ভোম্বল এবং বড়মামা মেঠো রাস্তায় নামল। তখনই অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। টর্চ এনেছিলেন নিবারণবাবু। আলো জ্বেলে বুঝলেন যে শ্মশানের পাশ দিয়ে চলেছেন। পোড়া কাঠ হাড়গোড় পড়ে আছে। এক মস্ত শিয়াল পালাল গা ঘেঁষে। হুস করে কয়েকটা বাদুড় উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। দূরে মাঠের ভিতর দেখা গেল আগুন জ্বলছে।

ধড়াস ধড়াস করছে ভোম্বলের বুক। ফটিকটা ফিরল না। বেগতিক দেখে পালিয়েছে। ভিতু। ফিরে গিয়ে নেব একচোট। ওঃ ঘোর কাপালিকের পাল্লায় পড়েছি। ভালোয় ভালোয় ফিরতে পারলে হয়। নেহাত মামিমার হুকুম নইলে সেও কেটে পড়ত। বড়মামার মাথাটা বিগড়েছে। মরবে একদিন। হাতাহাতি ছুরি বোমাকে ভোম্বল ডরায় না কিন্তু এসব ভূতুড়ে কারবারে সে দারুণ নার্ভাস হয়ে পড়ল। ফটকেটা সঙ্গে থাকলেও যা হোক একটু বল পাওয়া যেত।

ধুনির আগুনের সামনে সাধুবাবা টান হয়ে বসে আছেন। ভয়ংকর দেখাচ্ছে তাঁকে। মোটা শিষ্যটি নিবারণবাবুকে বলল — 'এখনি পুজো শুরু হবে। খুব মন দিয়ে মাকে ডাকবেন। আজে বাজে কুচিন্তা করবেন না। তাহলে কিন্তু ফল খুব খারাপ হয়। মা দেখা দেন না। উল্টে পাঠিয়ে দেন তাঁর চেলা চামুণ্ডা। তখন বিপদ হতে পারে।' শেষ কথাগুলো বলার সময় তার লক্ষ্য ছিল ভোম্বল।

নিবারণবাবু কিছু দূরে বসে পড়লেন। ভোম্বল তাঁর পিছনে বসল। ভোম্বল দেখল সাধুর দুই শিষ্যের মধ্যে কেবল মোটা উপস্থিত, অন্যজন নেই।

পুজো আরম্ভ হল।

সাধুবাবা হুংকার দিয়ে মন্ত্র পড়ছেন আর থেকে থেকে মুঠো করে কী জানি ছুড়ে দিচ্ছেন অগ্নিকুণ্ডে। দপ্ করে জ্বলে উঠছে শিখা। বাতাসে কটু গন্ধ। মন্ত্রের ভাষা কিছু বুঝল না ভোম্বল। শুধু অনুস্বর বিসর্গের প্রবল ঝংকার। ওঁং বং ছং — কঃ খঃ নমঃ ইত্যাদি অদ্ভুত সব শব্দ। কখনও কখনও সাধু একটা নরমুণ্ডের খুলি তুলে চুমুক দিচ্ছেন। বাটির মতো খুলিটায় কী এক

তরল পদার্থ রয়েছে। শিষ্যটি হাতজোড় করে বসে — এটাসেটা এগিয়ে দিচ্ছে গুরুকে। নিবারণবাবুও জোড়হস্ত।

ভোম্বল আড়চোখে তাকাতে লাগল চারধারে। বুকের ধুকপুকুনি তার বেড়েই চলেছে।

গাঢ় কালো অমাবস্যার আকাশ। মেঘ নেই। অসংখ্য তারা ঝকঝক করছে। পিছনে ঝাঁকড়া গাছটা যেন জমাট অন্ধকারের পাহাড়। কাছাকাছি কিছু ঝোপঝাড়। সেখানেও যেন খাবলা খাবলা আঁধার জমে আছে। তার ভিতর টিপ টিপ করে জ্বলছে নিবছে জোনাকি। তীক্ষ্ণস্বরে টানা ডেকে চলেছে অজস্র ঝিঁ ঝিঁ। আরও কত অদ্ভুত ডাক কানে আসছে। ছমছম করছে প্রকৃতি। গ্রামের দিকে কোনো আলোর চিহ্ন নেই। নেই কোনো মানুষজনের সাড়া। শুধু দূরে গ্রান্ড ট্র্যাংক রোড ধরে এক একটা লরি চলে যাচ্ছে শব্দ করে। তাদের হেডলাইটের আলো মনে কিঞ্চিৎ ভরসা জাগায়। নয়তো বোধ হত সভ্য দুনিয়ার অনেক বাইরে কোনো অলৌকিক অবাস্তব জগতে এসে পড়েছে তারা।

হঠাৎ সাধু মন্ত্র পড়া বন্ধ করলেন। একবার লাফিয়ে উঠল ধুনির আগুন। সাধু দুবার গভীর কণ্ঠে ডাক দিলেন — 'মা মা।' তারপর তিনি ধ্যানস্থ হলেন।

ভোম্বল বুঝল এবার চরম মুহূর্ত আগত। সে ঘাড় ঘুরিয়ে মাঠের ভিতর দেখতে থাকে। ওই অন্ধকার ফুঁড়ে হয়তো আবির্ভূতা হবেন কালী-মা।

সাধুর চেলার চোখও অন্ধকার মাঠের দিকে। নিবারণবাবুও একটু চঞ্চল।

প্রথমে ভোম্বলই দেখল সেই মূর্তি।

ডানদিকে খানিক দূরে খাড়া হয়ে উঠছে কী এক বস্তু। একটা ভয়ার্ত চিৎকার বেরিয়ে আসে তার গলা চিরে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের দৃষ্টিও তার চোখকে অনুসরণ করল।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল বস্তুটি। ধুনির আগুনের আভা পড়ল তার গায়ে। উঃ কী ভীষণ দৃশ্য!

একটা দীর্ঘ নরকঙ্কাল— এগিয়ে আসছে দুহাত ছড়িয়ে। দপ্ দপ্ করে জ্বলছে তার দুই কোটরগত চক্ষু।

'হিঁ হিঁ হিঁ — চাপা গর্জন করে উঠল সেই কঙ্কাল। অপার্থিব সেই স্বর।

'আরি ব্বাপ্‌রে।' প্রথমেই লাফিয়ে উঠলেন সাধুজি। সোজা টেনে দৌড় মারলেন মাঠ ভেদ করে। সঙ্গে সঙ্গে মোটা চেলাটি 'বাবগো' — বলে চিৎকার দিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে গুরুর পিছনে ধাওয়া করল। ভোম্বলও মারল ছুট।

একটুখানি গিয়েই ভোম্বলের খেয়াল হল — মামা কই?

নিবারণবাবু ভোম্বলের পাশ কাটিয়ে দৌড়ে এসে হুড়মুড়িয়ে আছড়ে পড়লেন মাটিতে। তৎক্ষণাৎ মামাকে টেনে তুলল ভোম্বল। ভারি শরীর মামার। কোনো রকমে তাঁকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল।

'এই ভোমলা। ভোমলা।'

ডাক শুনে ভোম্বল ফিরে দেখল সেই বিভীষণ মূর্তি তখনও দাঁড়িয়ে আছে। কঙ্কালটা হাতছানি দিয়ে ডাকল যেন। দিশেহারা ভোম্বল আবার মামাকে টেনে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করে।

সেই কঙ্কাল মূর্তি দ্রুত ধেয়ে এল কাছে। ভোম্বলের হাত পা অসাড়। এবার টিপল বুঝি গলা। আর রক্ষা নেই।

'এই ভোমলা, আমি ফটিক। এই দেখ।'

অবাক হয়ে ভোম্বল দেখল, কঙ্কাল ধড়ের ওপর ফটিকের মুখ। নক্ষত্রের আবছা আলোয় বেশ চেনা যাচ্ছে। হাসছে ফটিক। ওর গলার স্বরও ভুল হওয়ার নয়।

'অ্যাঁ তুই!'

'হ্যাঁরে!'

'তুই চলে যাসনি?'

'গিসলাম। হাওড়ার এক মেক-আপ-এর দোকান থেকে এই কঙ্কালের ড্রেস আর মুখোশটা ভাড়া করে নিয়ে চলে এলাম। তারপর লুকিয়ে ছিলাম ওই ঝোপে।'

নিবারণবাবুর তখন প্রায় জ্ঞানহারা অবস্থা। চক্ষুমুদে প্রাণপণে জড়িয়ে আছেন ভোম্বলকে। তাঁকে ঝাঁকুনি দিয়ে ভোম্বল ডাকল — 'মামা দেখ, ও ভূত নয় ফটিক।'

'কে?' নিবারণবাবুর সম্বিৎ ফিরল। ফটিকের মুখে টর্চের আলো ফেলে দেখে নিয়ে তিনি একটু ধাতস্থ হলেন।

ব্যস্ত হয়ে ফটিক বলল, 'টর্চ মারবেন না মামা, ওরা দেখে ফেলবে।'

'এর মানে?' মামা জানতে চাইলেন।

'আজ্ঞে একটু মজা করলাম। বলছিল কিনা আমরা ভয় পাব, তাই দেখলাম ওদের সাহস কত।' ফটিক খিকখিক করে হাসল।

'হুম্।' নিবারণবাবু একবার চাইলেন চারধারে। সাধু ও তাঁর চেলা বেপাত্তা। ধুনির আগুনে নিবু নিবু। তিনি গুম মেরে রইলেন খানিকক্ষণ। সাধু না ফটিক, কার ওপর বেশি চটেছেন ঠিক বোঝা গেল না।

ফটিক চটপট ছদ্মবেশ খুলতে থাকে।

একটা কালো রঙের কাপড়ের আলখাল্লা, তার ওপর মোটা সাদা দাগ দিয়ে কঙ্কাল আঁকা। আঁটো করে পরেছে। আলখাল্লাটা খুলে সে গুটিয়ে নিল। কঙ্কালের মুন্ডু আঁকা মুখোশটা তো আগেই খুলে হাতে নিয়েছে।

'মুখোশের চোখ দুটো অমন জ্বলছে কেন রে?' ভোম্বল সন্ত্রস্তভাবে জিজ্ঞেস করল।

'জোনাকি ধরে আঠা দিয়ে সেঁটে দিয়েছ চোখের গর্তে।' জানাল ফটিক।

নিবারণবাবু হঠাৎ গটগট করে পিচ রাস্তার দিকে পা চালালেন। ভোম্বল ও ফটিক তাঁর পিছু নিল।

একটু এগিয়ে থমকে দাঁড়াল তারা।

ঝোপের ভিতর থেকে একটা আওয়াজ আসছে, কেমন অদ্ভুত ধরনের।

'কে?' নিবারণবাবু হাঁক দিলেন।

কিন্তু কোনো উত্তর এল না।

নিবারণবাবু শব্দ লক্ষ্য করে টর্চ ফেললেন। আর অমনি তিনজনে আঁতকে পিছিয়ে এল। মিশকালো বিকট এক মূর্তি পড়ে রয়েছে ঝোপের ধারে মাটিতে।

কয়েক মুহূর্ত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ফের সাহস করে আলো ফেললেন নিবারণবাবু। কাছে এগিয়ে গেল তিনজনে।

একি, এ যে স্বয়ং মা-কালী।

'আরে এ সেই লম্বা চেলাটা, মা-কালী সেজেছে।' বলে উঠল ভোম্বল।

ঘষড়ে গিয়ে মা-কালীর মুখের রং খানিক চটে গেছে। খসে গেছে তার লোল জিহ্বা। আসল রূপটি বেরিয়ে পড়েছে। থরথর করে কাঁপছে লোকটা, আর গোঁ গোঁ করছে।

'বুঝলি ব্যাপার', ফটিক খোঁচা মারল ভোম্বলকে, 'ইনিই কালী সেজে দেখা দিতেন। বেটা ভণ্ড সাধু। আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল। এ বেটা আমায় দেখে ভয়ে ফেন্ট হয়ে গেছে।'

মুখে আলো পড়তে মা-কালী চোখ খুলল। ঘোলা চোখে তাকাল। অমনি ফটিক কঙ্কাল-মুন্ডু আঁকা মুখোশখানা নিজের মুখে চেপে ধরে কালীর ওপর ঝুঁকে পড়ে এক হুংকার ছাড়ল। ব্যস্ ফের দাঁত-কপাটি লেগে গেল নকল মা-কালীর।

'ওকে আমি পুলিশে দেব।' নিবারণবাবু ক্রুদ্ধস্বরে ঘোষণা করলেন।

'কী দরকার থানা পুলিশে?' ভোম্বল আপত্তি তোলে।

'হুঁ যা বলেছিস। বাছাধনদের খুব শিক্ষা হয়েছে।'

বলল ফটিক।

সহসা ফটিক নিচু হয়ে মা-কালীর মাথার পরচুলটা হেঁচকা টানে খুলে নিল। সেটা ঝুলিয়ে দেখে বলল — 'বাঃ গ্র্যান্ড চুল। আমাদের থিয়েটার ক্লাবে কাজে লাগবে। মামা আপনার পঁচিশ টাকা অ্যাডভান্স উসুল হয়ে গেল।'

'হুম্।' নিবারণবাবু আবার বড় রাস্তার দিকে রওনা দিলেন।

[অজ্ঞাত]

নকুল নস্করের ঠেকা

সকাল আটটা নাগাদ। সাইকেলে বাজার যাচ্ছিল নিতাই! হঠাৎ ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে নেমে পড়ল। নিজের চোখকেই যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না। নকুল নস্কর না? হুঁ তাই! কী ব্যাপার? নিতাই হাঁ হয়ে দেখতে থাকে।

নকুলবাবু পথ দিয়ে চলেছেন, আর পেছনে পেছনে চলেছে একটা ঘেয়ো নেড়ি কুকুর। কুকুরটা মোটেই মিছিমিছি নকুলবাবুর পিছু ধরেনি। নকুলবাবু ডেকে ডেকে নিয়ে চলেছেন তাকে। ঘাড় ফিরিয়ে ডাক দিচ্ছেন সমানে — আঃ আঃ। আয় আয়...

শুধু মিষ্টি কথায় ডাকাডাকির কারবার নয়, রীতিমতো ঘুষ দিয়ে ডেকে নিয়ে চলেছেন কুকুরটাকে। নকুলবাবুর হাতে কয়েক পিস পাঁউরুটি। মাঝে মাঝে থামছেন তিনি এবং পাঁউরুটির ছোট্ট এক টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে ছুড়ে দিচ্ছেন নেড়িকে — এই নে।

অমনি কপাৎ করে রুটির টুকরো মুখে পুরছে নেড়ি। ফের হাঁটা দিচ্ছেন নকুলবাবু ডেকে ডেকে — আয় আয়। তু তু... হাত তুলে দেখাচ্ছেন রুটি। মুখ উঁচু করে নেড়িটিও চলেছে তার পিছু পিছু, আশায় আশায়।

নকুলবাবুর এই রাস্তার কুকুরকে রুটি খাওয়ানোর ব্যাপারটাতেই নিতাই এমন অবাক হয়ে গিয়েছিল। হাড়কিপটে বলে নকুল নস্করের মহা বদনাম। ওর নাম করলে নাকি হাঁড়ি ফেটে যায়। লম্বা সিড়িঙ্গে নকুলবাবু থলি হাতে হাটে ঢুকে কোনও ব্যাপারীর সামনে দাঁড়ালেই সে অন্য দিকে মুখ ফেরায়। পাঁচ-দশ পয়সা দাম কমাতে নাগাড়ে ধস্তাধস্তি চালাবেন। হবে না বললেও রেহাই নেই। কেন হবে না তার কৈফিয়ৎ চাই। ন্যায্য দাম দিতে আপত্তি কোথায়? ব্যাপারীর কড়া কথা গায়ে মাখেন না। ঘ্যান ঘ্যান চালিয়েই যাবেন। ফলে অন্য খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলায় বাধা পড়ে। অনেক ব্যাপারী তাই নকুলবাবু সামনে এলেই এক লাফে দোকান ছেড়ে পালায়। নকুলবাবু সরে না যাওয়া অবধি ফেরে না।

নিজে খাবার জন্য নকুলবাবু কখনও পাঁউরুটি কিনেছেন এমন খবর শোনেনি নিতাই। নকুলবাবুর মতে দোকানের চা বিস্কুট পাঁউরুটি ঘোর বিলাসিতা। এ হেন লোক রাস্তার কুকুরকে পাঁউরুটি খাওয়াচ্ছেন সেধে সেধে!

নিতাই সাইকেল ঠেলে ঠেলে নকুলবাবু এবং সেই নেড়ির পেছনে পেছনে যেতে যেতে

ভাবে, ভদ্রলোকের মাথার গন্ডগোল হয়েছে নাকি? কিংবা হয়তো জৈন হয়ে গেছেন। জৈনরা শুনেছি পশুপাখিকে খাওয়ায় পুণ্য করতে। উঁহু জৈন-টৈন নয়। গতকাল সন্ধেতেই দেখেছি বুড়োশিবের মন্দিরে বারবার পেন্নাম ঠুকছেন। তবে?

নকুলবাবু তার বাড়ির সামনে থামলেন। এবার এক স্লাইজ পাঁউরুটি থেকে বড় বড় টুকরো নিয়ে ছুড়ে ছুড়ে খাওয়াতে লাগলেন নেড়িকে। নেড়িটার ফুর্তি দেখে কে! ল্যাজ নাড়ে আর কপাকপ খায়। রুটির স্লাইজটা শেষ হতেই নকুলবাবু কুকুরটাকে বললেন, যা ভাগ। আর দেব না।

কিন্তু তাড়াতুড়ি দিলেন না। নেড়িও ঠায় চেয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। নকুলবাবু বললেন, আজ আর নয়। কাল আসিস।

নেড়ি অবশ্য নড়ল না।

শুধু নিতাই নয় আরও কয়েকজন দর্শক জুটে গেছে। পাশের পানের দোকানি মুখ বের করে দেখছে। পথ চলতি পাড়ার এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে গেছেন এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে। নকুলবাবু পাঁউরুটির বাকি খণ্ডগুলি কাগজে জড়িয়ে পকেটে পুরে বাড়ি ঢোকার জন্য পা বাড়াতেই নিতাই আর থাকতে পারল না। সাইকেলটা স্ট্যান্ডে খাড়া করে এগিয়ে গিয়ে নকুলবাবুকে জিজ্ঞেস করল, কুকুরটাকে পুষছেন বুঝি?

ভ্যাট। — খিঁচিয়ে ওঠেন নকুলবাবু, আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই।

তাহলে? — নিতাই অবাক।

ওয়াচ করছি হে। ওয়াচ — জবাব দিলেন নকুলবাবু, এটা থার্ড দিন।

— ওয়াচ! কেন?

— আমার কর্মফল।

মানে কী ব্যাপার? — নিতাই থই পায় না।

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে নকুলবাবু বললেন, বুঝলে হে, গত পরশু সকালে বাজার করতে বেরুচ্ছি। ওই বেটা নেড়ি শুয়ে ছিল সিঁড়ির গোড়ায়। তাড়াহুড়োয় খেয়াল করিনি, দিলাম মাড়িয়ে। অমনি বেটা দিল এক কামড়। কুকুরের কামড় বড় ভয়ঙ্কর। জলাতঙ্ক হতে পারে। তাই ছুটলাম ডাক্তারের কাছে। হেলথ সেন্টারের ডাক্তারবাবু সব শুনে একটা ইঞ্জেকশন দিলেন আর বললেন যে কুকুরটাকে ওয়াচ করতে হবে। যদি দশদিন বেঁচে থাকে তো কোনো ভয় নেই। কিন্তু যদি তার আগেই অক্কা পায় তাহলে ইনজেকশন ছাড়া গতি নেই। এখানে জলাতঙ্কের ইনজেকশন দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। অতএব কলকাতা ছুটতে হবে পাস্তুর হাসপাতালে। ওরে ব্বাপ চোদ্দোটা ফোঁড় আর ভীষণ নাকি ব্যথা লাগে। তার ওপর কলকাতা যাওয়ার খরচ। স্রেফ দেউলে হয়ে যাব।

জুল জুল চোখে তাকিয়ে থাকা নেড়িটির দিকে বিষ দৃষ্টি হেনে নকুলবাবু বলে চলেন, গতকাল সক্কালে উঠেই খুঁজতে গিয়েছিলাম দেখতে, বেটা আছে না টেঁসে গেছে? খুঁজে পাওয়া কি সোজা। রাস্তার কুকুর দুনিয়া চষে বেড়ায়। অফিস দেরিই হয়ে গেছে। কি হ্যাঙ্গাম। দাসু এই বুদ্ধিটা দিল। তাই আজ খাবার লোভ দেখিয়ে টেনে এনেছি এখানে। অনেকখানি পাঁউরুটি খাওয়ালাম। দাসু বলছে, দেখবেন রোজ ও ঠিক এই সময় নিজে থেকেই আপনার

বাড়ির সামনে হাজির হবে। নেড়িরা নাকি পাঁউরুটি খেতে দারুণ ভালোবাসে। ইস সব নবাব পুত্তুর! তা পড়েছি ঠেলায়, উপায় কী? রাজভোগ চাইলে তাই জোগাতে হবে।

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। নিতাই বলল, তা বটে ভারি মুশকিল। তবে ওকে আর এক পিস দিলে পারতেন। দেখছেন, কেমন তাকিয়ে আছে। বেশি পেলে লোভটাও বেশি ধরবে। কাল এ সময়ে আর না এসে পারবে না। দাসু বলেছে ঠিকই।

বলছ? — নেহাত অনিচ্ছায় নকুলবাবু আর এক পিস পাঁউরুটি বের করে টুকরো করে ছুড়ে ছুড়ে খাওয়ালেন নেড়িটাকে। তারপর সটান ফিরে ঢুকে পড়লেন বাড়িতে। বোধহয় ফের যদি আর এক পিস খাওয়ার বায়না ধরে, সেই ভয়ে।

পরদিন সকালেও বাজার যাওয়ার পথে নকুলবাবুর বাড়ির সামনে থামল নিতাই। নকুলবাবু তখন এক পিস পাঁউরুটি হাতে ডাক দিচ্ছেন — আয় আয়, আঃ আঃ — তাকাচ্ছেন চারপাশে। পাশের দোকানি মুন্ডু বাড়িয়ে দেখছে।

নেড়িটার সময়জ্ঞান খাসা। ঠিক আটটা বেজে দু মিনিটে দেখা গেল সে ছুটতে ছুটতে আসছে। নকুলবাবুর মুখে হাসি ফুটল। তিনি পাঁউরুটির টুকরো ছুড়তে লাগলেন।

আধ পিস বিলোবার পরেই বাকিটুকু তিনি পকেটে পুরলেন। নিতাই বাধা দিল, আহা, আজ আবার ওর রেশন কমালেন কেন? দেখছেন না কেমন লক্ষ করছে। শেষে চটে গিয়ে যদি কাল থেকে না আসে?

হাঁ হাঁ বাবু ঠিক কয়েছেন, — আপাতমস্তক কয়লার গুঁড়ো মাখা একটা বছর বারো তেরোর ছোকরা বলল। কখন সে গুটিগুটি এসে দাঁড়িয়েছিল কাছে। ও সামনে কোলা তৈরির কারখানায় কাজ করে। ছেলেটা বলল, বাঘা খুব তেজী বটেক।

কে বাঘা? — নকুলবাবু জানতে চাইলেন।

আজ্ঞে ওই যাকে রুটি খাওয়াচ্ছেন কাল থেকে — ছোকরা আঙুল দেখায়।

ইঃ বাঘা! কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন, — খেঁকিয়ে উঠলেন নকুলবাবু, ঘিয়ে ভাজা কোথাকার। ওর নাম নেড়ি।

— না বাবু বাঘা খুব লড়াকু আছে।

তুই থাম বেটা কেলেভূত। — নকুলবাবুর ধমক খেয়ে ছেলেটা দুপাটি সাদা ধবধবে দাঁতের বাহার দেখিয়ে এক গাল হাসল।

কী হল দিলেন না? আধ পিস-এর জন্য কি আর ও রোজ হাজিরা দেবে। কত চায়ের দোকানে চেখে বেড়ায় রুটি বিস্কুট, বলল নিতাই।

বলছ? — নকুলবাবু রুটির বাকি আধখানা বের করলেন। টুকরো করে খাওয়াতে লাগলেন কুকুরটাকে। ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন নিজের কলজেখানাই ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়াচ্ছেন।

প্রত্যেকদিন সকালে বাজারে যাওয়ার সময় বাঘা ওরফে নেড়িকে পাঁউরুটি খাওয়ানো দেখা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেল নিতাইয়ের। আরও দুটি নিয়মিত দর্শক ছিল। পানের দোকানি এবং কোলার কারখানার ছেলেটা। এছাড়া উটকো দর্শক দু-চারটি রোজই জুটত। এমন দৃশ্য কী সহজে মেলে? খবরটা চাউর হয়ে গেল গোটা বোলপুর শহরে। নকুলবাবুকে দেখলেই লোকে জিজ্ঞাসা করে, কী দাদা, কুকুরটা ঠিক আছে তো? খেয়াল রাখবেন।

বাঘা নামটা যে সার্থক প্রমাণ হয়ে গেল ষষ্ঠ দিনে। আর একটা পুরুষ কুকুর কাছে ঘেঁষছিল পাঁউরুটির লোভে। বাঘা ভীষণভাবে তেড়ে গেল। তার যে কটা লোম আছে তাই ফুলিয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে। সাইজে বাঘার চাইতে বড় হলেও নতুন কুকুরটা ভয় পেয়ে পালাল। কেলেভূত গালভরা হাসি দিয়ে বলল, হ হ দেখলেন বাঘার তেজ?

সপ্তম দিনে নেড়ি লেট করল পনেরো মিনিট। ভাবনায় নকুলবাবুর চুল প্রায় খাড়া। পানের দোকানি নেমে এল দোকান ছেড়ে। কেলেভূত সপ্তম স্বরে চিৎকার জুড়ল, আঃ, আঃ বাঘা, আ তুঃ —

যাহোক নেড়ি দর্শন দিল এবং সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। নকুলবাবু সেদিন তাকে দু পিস রুটি দান করে বসলেন। হয়তো ও অন্য কোথাও ভালোমন্দ পেয়ে দেরি করেছে। পাঁউরুটির টোপটা আরও জোরালো করা দরকার। রিস্ক নিয়ে কাজ নেই।

অষ্টম দিনে নেড়ি ঠিক সময়ে হাজির হল বটে কিন্তু তার পেছনে পেছনে এল একটি মেয়ে কুকুর। বোঝা গেল নেড়ি তাকে সঙ্গে এনেছে। বোধহয় পাঁউরুটির আশা দিয়ে।

নিতাই অবাক হয়ে বলল, এটা আবার কে? নেড়ির জুড়ি দেখছি!

নকুলবাবু থ। তিনি পাঁউরুটি ছুড়তে ভুলে গেলেন।

জুড়ি প্রবল বেগে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে আবেদন জানাল — ভৌ।

নেড়ি একটু দূরে থাবা গেড়ে বসে ছিল। খেতে দিতে দেরি হচ্ছে দেখে একবার নালিশ জানাল — ভুক।

নকুলবাবু মেয়ে কুকুরটাকে তাড়া মারলেন, এই ভাগ।

জুড়ি তৎক্ষণাৎ এক লাফে দূরে। কিন্তু নেড়িও যে পালাচ্ছে।'

নিতাই আটকাল, আহা করেন কী? গিন্নিকে সঙ্গে এনেছে পাঁউরুটি খাওয়াবে বলে। এখন প্রেস্টিজ পাংচার হলে যদি কাল থেকে না আসে? আয় আয়। কই দিন ওদের খেতে।

নকুলবাবু গম্ভীর মুখে নেড়িকে তাক করে পাঁউরুটি ছুড়লেন। কিন্তু নেড়ি এগোবার আগেই তার জুড়ি বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে সেটি মুখে পুরল। গোটা পিসটায় মাত্র এক টুকরো জুটল নেড়ির ভাগ্যে। বাকিটা গেল জুড়ির পেটে।

নেড়ি করুণ চোখে চেয়ে আছে। নিতাই বলল আর এক পিস দিন ওদের। নেড়ির তো কিছুই জুটল না। ওর গিন্নিই মেরে দিল সব।

হুঁ আর এক পিস দেব না কচু, — নকুলবাবু তেড়িয়া, কে আনতে বলেছিল? এরপর বাচ্চা-কাচ্চা সমেত গুষ্টিসুদ্ধ জুটিয়ে আনবে আর সব কটাকে আমায় ভোজ দিতে হবে। আবদার!

— আহা বুঝছেন না, এ একরকম ভালোই হল। বউ বাচ্চাদের তাগিদেই ঠিক সময়ে হাজিরা দেবে। বাচ্চা-টাচ্চা বোধহয় নেই। থাকলেও সেয়ানা হয়ে গেছে। ওদের সঙ্গে আর ঘোরে না। তবে ওর গিন্নির জন্য এক পিস না হয় বেশিই যাবে। কিন্তু কর্তার ভাগ্যে নবডঙ্কা জুটলে অভিমান করে যদি কাল থেকে আর না আসে ও। শুধু গিন্নিটাই হাজিরা দেয়। তখন? আর তো মোটে দুটো দিন।

হাঁ হাঁ ঠিক ঠিক, — সায় দিল দোকানি এবং কেলেভূত।

ওঃ বেটা শয়তানের ধাড়ী। বুক ভাঙা এক নিঃশ্বাস ফেলে নকুলবাবু ফের এক পিস রুটি বের করলেন। এবার জুড়িটার জন্য ছুড়লেন দূরে, ছোট্ট এক টুকরো। আর সেই ফাঁকে নেড়িটাকে দিলেন বড় টুকরো কয়েকখানা। এইভাবে নেড়ির কিঞ্চিৎ খিদে মিটল।

এগারো দিনের দিন। আজই শেষ। নকুলবাবু তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে খুশি খুশি মুখে অপেক্ষা করছেন। পানের দোকানদার গলা বাড়িয়ে আছেন। নকুলবাবুর বাড়ির জানলায় উঁকি দিচ্ছে কয়েকটি মুখ। কেলেভূত চেঁচাচ্ছে — আয় আয় বাঘা, আতুঃ —

নিতাই হাজির হয়ে লক্ষ করল যে নকুলবাবুর হাতে পাঁউরুটি নেই। সে জিজ্ঞেস্ করল, নকুলদা রুটি আনেননি আজ?

নাঃ, আজ আবার খাওয়াব কেন? জবাব দিলেন নকুলবাবু, আজ একবার চোখে দেখলেই নিশ্চিন্দি। কাল থেকে ও আর না আসে তো বয়েই গেল। বেটা তিনদিন ধরে ফ্যামিলি নিয়ে আমার ঘাড়ে টিফিন করেছে। আজ কাঁচকলা খাওয়াব।

নিতাই মনে মনে বেশ চটল। বেচারিরা আশা করে আসবে। না হয় দু পিস বেশিই যেত। কী এমন দালান উঠবে ওই খরচা বাঁচিয়ে। সাধে কি আর লোকে নাম দিয়েছে হাঁড়ি ফাটা নকুল।

জুড়ি সমেত নেড়ি দেখা দিল। দশ মিনিট দেরি হয়ে গেছে। তাই হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসছে।

নকুলবাবু বললেন, সেই কুকুরটাই তো? ঠিক করে দেখ হে নেতাই।

হুঁ তাই। — জানাল নিতাই।

হুঁ তিনিই বটেন। — বলল কেলেভূত এবং সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ল পানের দোকানি।

ব্যস মার দিয়া কেল্লা। নকুলবাবু সদর্পে ফিরে চললেন বাড়ির দিকে। পিছনে পিছনে চলল তার গোড়ালি ঘেঁষে জুড়ি আর খানিক তফাতে নেড়ি।

ফাঁকি দেবে বুঝতে পেরেই বোধহয় নেড়ি বকুনি দিল — ভৌ ভৌ ভ্যাক।

তবে রে বেটা, খাপ্পা হয়ে নকুলবাবু ঝট করে একখানা ইঁট তুলে নিয়ে তেড়ে গেলেন নেড়িকে। আর তখুনি ঘ্যাঁক। ভয় পেয়ে কিংবা সঙ্গীকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে যে কারণেই হোক, পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় নকুলবাবুর পায়ে এক কামড় বসাল মেয়ে কুকুরটা।

হাউমাউ করে উঠলেন নকুলবাবু। হাতের ইঁটটা তাক করলেন জুড়িকে লক্ষ্য করে।

আরে আরে করেন কী? — বাধা দিল নিতাই, মারলে যদি আর না আসে? আজ থেকে তো ওকে ওয়াচ করতে হবে। দশদিন।

অ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছ, — নকুলবাবু কাঁদো কাঁদো। তিনি হাঁক দিলেন, ওরে ট্যাপা রান্না ঘরের তাকে সবুজ কৌটোয় দু পিস পাঁউরুটি আছে। দে শিগগির।

[অজ্ঞাত]

শান্তিময়ী চ্যালেঞ্জ কাপ

ফাল্গুন মাসের গোড়ার দিকে এক বিকেল। পুব পাড়ায় মস্ত অশ্বত্থ গাছের নিচে বাঁধানো বেদিটায় বসেছিল দেবু। তার মুখ নড়ছে। হজমি গুলিটা চুষছে, আর মাঝে মাঝে অধীর আগ্রহে তাকাচ্ছে মোড়ের দিকে। গ্রামের বুক চিরে যাওয়া কাঁচা রাস্তাটা যেখানে বাঁক খেয়েছে। শিব এখনো আসছে না কেন?

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না দেবুকে। মিনিট পনেরো বাদেই দেখা গেল শিব আসছে দ্রুত পায়ে।

শিব ধপ্ করে বেদির ওপর দেবুর পাশে বসে পড়ে গজগজ করে বলে উঠল,— যত্ত সব। আমাদের গ্রামটা একেবারে যা তা।

কেন কী হল? মিটিং হয়েছে? — বলতে বলতে দেবু পকেট থেকে শিশি বের করে একটা হজমি গুলি ধরিয়ে দেয় শিবের হাতে।

হয়েছে বইকি। — গুলিটা মুখে ফেলে বলল শিব।

সবাই এসেছিল?

— প্রায় সবাই।

— ক'জন প্লেয়ার পাওয়া যাবে?

শিব ফের ফোঁস্ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,— হোপ্‌লেস।

কাউকে পাওয়া যাবে না? — দেবু ভুরু কুঁচকোয়।

যাবে। মাত্র চারজন। — শিব উত্তেজিত স্বরে বলে : বুঝলি, আমাদের গাঁয়ে এত লোক। তাদের মাত্র চারজন পাতে দেওয়ার মতো ফুটবলার আত্মীয়। ভাবা যায়? আবার সন্দীপের কেসটা যে কী দাঁড়াবে? আর দূর্, দূর্, অন্য কতরকম রিলেটিভের যে খবর শুনলাম মিটিংয়ে! দুজন ব্যায়ামবীর। তিনজন ভলিবল প্লেয়ার। তাদের মধ্যে একজন আবার বেঙ্গল খেলে। জনাদশেক ফার্স্ট ক্লাস কবাডি প্লেয়ার পাওয়া গেছে। এমনকী দু'জন ফার্স্ট ডিভিশনে খেলা ক্রিকেটার অবধি রয়েছে। কিন্তু ফুটবলার মোটে চার। বাঙালির সব চেয়ে পপুলার গেম! ভাবতেই পারিনি। গাঁয়ে এরকম ফুটবল রিলেটিভের আকাল চললে আমাদের আর কোনোদিন জিততে হবে না।

মাত্র চারজন? — দেবুও চিন্তিত : আমার ধারণা ছিল অনেক বেশি পাওয়া যাবে। তাদের মধ্যে থেকে বেছে নিতে পারবি। মথুরাপুরের খবর কী? ওরা ক'জনকে পেয়েছে?

তা ঠিক জানি না। আজ রাতে বা কালই খবর পাওয়া যাবে। ওদেরও আজ মিটিং ছিল এই নিয়ে। তবে ওদের অবস্থা আমাদের মতন করুণ হবে না। কারণ আগেরবার ওরা যে আটজনকে হায়ার করেছিল, আমি শুনেছি যে তাদের ভিতর পাঁচজনই মথুরাপুরের কারও না কারও আত্মীয় ছিল। আরও খুঁজলে আরও কজন বেশি মিলবে ঠিক।

— শুধু মিটিংয়ে যারা এসেছিল তারা ছাড়াও অন্যদিকের বাড়ি বাড়ি একটু ঘুরতে হবে। হয়তো তাদেরও কারও কারও—

সে কি আর ঘুরিনি! — শিব বলে ওঠে : সারা দুপুর ওই করেছি আমি আর বেচুদা। তাতে ভালো প্লেয়ার একজনের মোটে খোঁজ পেলাম ভোলোা সাধুখাঁর সম্পর্কে ভাইয়ের ছেলে। হাওড়ায় থাকে। ভোলোাদা আজই তাকে চিঠি লিখবেন বলেছেন। বলছেন তো জ্যাঠার অনুরোধ ঠেলতে পারবে না পরেশ। তাকে ধরেই চারজন হচ্ছে। বুঝলি, সিধুখুড়ো আবার গাছে তুলে মই কেড়ে নিল।

— মানে!

— আরে, সিধুখুড়োর সম্পর্কে এক নাতি নাকি ইন্ডিয়ান নেভি টিমের রেগুলার ফুটবলার। দারুণ স্ট্রাইকার। শুনেই তো আমরা লাফিয়ে উঠেছি। অমনি খুড়ো মাথা নেড়ে বললেন— কিন্তু।

— কিন্তু কী?

— আমাদের মুখ দিয়েও ঠিক ওই প্রশ্নটা বেরিয়েছিল। খুড়ো বলল, কিন্তু তার নাতি এখন সমুদ্রে। জাহাজে চেপে ঘুরছে। মাস দুইয়ের আগে ফিরবে না। থাকলে খুড়ো তাকে ঠিক আনত। বোঝ্ ব্যাপার! কী লাভ শুনিয়ে? সিধু খুড়োর নাতির জন্যে তো আর এই ম্যাচ পিছিয়ে দেওয়া যাবে না।

হুম্! — দেবু চিন্তিত হয়। জিজ্ঞেস করে : কোন্ কোন্ পজিশনে বাইরের প্লেয়ার পাওয়া যাবে?

শিব বলল,— গোলকিপার। একজন হাফ। একজন ফরোয়ার্ড। আর সন্দীপকে পেলে একজন ফরোয়ার্ড বাড়বে।

— কে সন্দীপ?

— রানুদির বোনপো। বদন ঘোষের স্ত্রী রানুদি। দু বছর আগে ও পুজোর সময় এসেছিল এই গাঁয়ে। তোর সঙ্গে আলাপও হয়েছিল, মনে নেই?

দেবু বলল, — ওঃ হো, মনে পড়েছে। বোলপুরে থাকে। ভালো ফুটবল খেলে শুনেছিলাম।

— ভালো মানে, দারুণ। গতবার বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট রিপ্রেজেন্ট করেছে। তবে একটু খিচ্ আছে।

— খিচ্!

— হুঁ। ওর নাকি এক পিসি থাকে মথুরাপুরে। নিজের পিসি নয়। ওর বাবার খুড়তুতো

বোন। তাই মথুরাপুরও হয়তো ট্রাই করবে ওকে বাগাতে। বেচুদা বলেছে, কাল সকালেই বেরিয়ে যাবে সন্দীপকে ধরতে। কথা আদায় করে আসবে।

বাঃ! সন্দীপ আর তুই পাশাপাশি খেললে চন্দনার ফরোয়ার্ড লাইনটা দারুণ হবে। — দেবু উৎফুল্ল।

— হুঁ, বেচুদাও তাই বলছিলেন।

বেচুদার কথা উঠতেই দেখা গেল স্বয়ং বেচুদা আসছেন। বেচুদা চন্দনা স্পোর্টিং ক্লাবের সেক্রেটারি।

শিব, তোমায় খুঁজছিলাম, ব্যস্ত হয়ে বলেন বেচুদা : শোন কাল সন্দীপের কাছে তুমিও যাবে আমার সঙ্গে। তোমার সঙ্গে তো ভাব আছে সন্দীপের। ওর সঙ্গে দেখা হয়?

— তা হয়। মাস দুই আগে দেখা হয়েছিল আহমদপুরে একটা টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়ে। আমাদের দু'জনকেই হায়ার করে নিয়ে গিয়েছিল টিমটা।

— ব্যস্ ব্যস্ চমৎকার। তোমার রিকোয়েস্টেই বেশি কাজ দেবে। আমিও বলব।

বেশ যাব। — শিব রাজি : তাহলে দেবুও চলুক। ওর সঙ্গেও আলাপ আছে সন্দীপের।

বেচুদা হাসেন, — বুঝেছি। মানিকজোড় একসঙ্গে থাকলে ভরসা পাও। বেশ, চলুক।

শিব দত্ত এবং দেবু মজুমদার ছোটবেলা থেকে পরম বন্ধু। দু'জনে এক ক্লাসে পড়ে, কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে। একসঙ্গে ঘোরে প্রায়ই। তাই লোকে ওদের ঠাট্টা করে ডাকে মানিকজোড়।

অবশ্য স্বভাবে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে দুজনার। শিব বেজায় ডানপিটে। ভালো খেলোয়াড়। পড়াশুনায় চলনসই। পাশ করে যায় কোনও মতে। আর দেবু খুব মেধাবী ছাত্র। ফার্স্ট সেকেন্ড হয় ক্লাসে। প্রচুর বই পড়ে। তবে গোবেচারি নয় মোটেই। দরকারে দেবুর সঙ্গে জুটে ডানপিটেমিও করে। আর আছে ওর তীক্ষ্ণ দুষ্টু বুদ্ধি। সে খবর শুধু রাখে শিব। বাইরে যদিও দেবু ভারি ভালো মানুষ। তাই শিব ছুটে আসে দেবুর কাছে পরামর্শের জন্য। শিবের আশা দেবু সঙ্গে থাকলে সন্দীপকে বাগাতে সুবিধে হবে।

কাল ভোরে ফার্স্ট বাস ধরব। বাস স্ট্যান্ডে থেকে। এই বলে বিদায় নিলেন বেচুদা।

কীসের উত্তেজনা? কীসের ম্যাচ? কেনই বা চন্দনা এবং মথুরাপুর গ্রামের মধ্যে এই রেষারেষি? এই ফাঁকে বরং এইসব প্রশ্নগুলির উত্তর জানানো যাক সংক্ষেপে।

বীরভূম জেলায় ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে পাশাপাশি দুই গ্রাম চন্দনা ও মথুরাপুর। বছর পাঁচেক আগে এই দুই গ্রামের মধ্যে একটি বাৎসরিক ফুটবল ম্যাচ চালু হয়। সিউড়ির উকিল অবলাকান্ত দফাদার এই উদ্দেশ্যে একটি মস্ত কাপ উপহার দেন তাঁর মায়ের নামে — শান্তিময়ী চ্যালেঞ্জ কাপ। ঠিক হয় যে ম্যাচটা হবে দুই গ্রামের মাঝামাঝি ভাগাড়ের মাঠে।

ভাগাড়ের মাঠ! নামটা এমন বিশ্রী হলেও মাঠটা কিন্তু খাসা। সমতল ও সমান করে ছাঁটা সবুজ ঘাসে ঢাকা। এককালে এখানে ভাগাড় ছিল। মৃত পশুদেহ ফেলা হত এই মাঠে। দুঃখের বিষয়, আজও সেই নামটাই বয়ে বেড়াচ্ছে গ্রাউন্ডখানা।

প্রথম দু'বছর এই ম্যাচ হয়েছিল দিব্যি সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে। এই ম্যাচ উপলক্ষে দুই

গ্রামের লোকের মেলামেশা-হুল্লোড়, দিনটাকে মাতিয়ে দেয়। হারজিত নিয়ে ভাবেনি কেউ। অবলাকান্তের উদ্দেশেও নাকি তাই ছিল। দুই গ্রামের মধ্যে মেলামেশা বাড়ানো। দুই গ্রামেই তাঁর অনেক মক্কেল, ঢের চেনাশোনা। কিন্তু গত দুবছর যাবৎ ম্যাচটার চেহারা পাল্টে গেছে। প্রচণ্ড রেষারেষি শুরু হয়েছে এই ফুটবল ম্যাচ ঘিরে। শান্তিময়ী চ্যালেঞ্জ কাপ এখন দুই গ্রামের মধ্যে রীতিমতো অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ম্যাচটা হয় চৈত্র মাসের মাঝামাঝি।

গত দুবছর যাবৎ হায়ার অর্থাৎ বাইরে থেকে ভাড়া করা খেলোয়াড় খেলাচ্ছে দুই গ্রাম। গত বছর তো চরমে ওঠে। চন্দনা গ্রামের নিজেদের প্লেয়ার খেলে মাত্র চারজন এবং মথুরাপুরের ছিল নিজেদের তিনজন। বাকিরা সব নানা জায়গা থেকে জোগাড় করা। বাইরের প্লেয়াররা কেউ খেলেছে নগদ অর্থ বা উপহারের বিনিময়ে। কেউ কেউ অবশ্য খেলেছে চেনাশোনার খাতিরে। ম্যাচ ড্র হয়। সেই ম্যাচ দেখে দর্শকরা চেঁচামেচিও করে খুব। তবু ম্যাচ দেখতে দেখতে দু গ্রামের লোকেরই যেন মনে হচ্ছিল দুটো বাইরের দলের খেলা দেখছে। এগুলো যেন তাদের ঘরের টিম নয়। এরপর হয়তো এগারো এগারো বাইশজনই বাইরের খেলবে এই ম্যাচ। আর তাদের ঘিরে দুগ্রামের লোক নাচানাচি ফাটাফাটি করবে। ধ্যুৎ, ধ্যুৎ তাতে মন ভরে না। এমন ম্যাচ না হওয়াই ভালো। এর জন্যে খরচা খরচা চাঁদা দেবে কেন গাঁয়ের লোক?

এ বছর ম্যাচের আগে গত পরশু দু'গ্রামের মাতব্বররা আলোচনায় বসে একটা ফয়সালা করেন। নিয়ম হয়, যে কোনও টিমেই পাঁচজনের বেশি বাইরের প্লেয়ার খেলানো চলবে না। বাকি ছয়জনকে হতে হবে গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। এছাড়াও আর একটা নিয়ম হয়। হায়ার মানে বাইরের খেলোয়াড়রা কেউ সম্পূর্ণ বাইরের লোক হওয়া চলবে না। যে গ্রামের হয়ে খেলবে সেই গ্রামের কারও না কারও জ্ঞাতি হওয়া চাই। দূরে সম্পর্কের হলেও এবং ওই গ্রামে সাতজন্মে পা না দিলেও। এই ধরনের হায়ার প্লেয়ারকে পয়সা দিয়ে ভাড়া করা চলতে পারে, অথবা অনুরোধ উপরোধে খেলাও— তবে কারও জ্ঞাতি হওয়া চাই।

এর ফলে দুকূলই রক্ষা পাবে। কিছু বাইরের খেলোয়াড় থাকলে খেলার মান বাড়বে। ম্যাচ জমবে বেশি। আবার গোটা টিমটাকেই নিজেদের গ্রামের বলে ভাবতেও অসুবিধা হবে না। আপাতত এই ফরমুলা মেনেই দু গ্রামের লোক প্লেয়ার জোগাড় করতে উঠে পড়ে লেগেছে। তাই নিয়েই এত গভীর উত্তেজনা।

দুই

পরদিন সকাল ছ'টা নাগাদ বোলপুর যাবার বাস ধরল শিব, দেবু ও বেচুদা।

দুটো স্টপেজ পরেই মথুরাপুর। দেবুরা অবাক হয়ে দেখল যে মথুরাপুর গ্রামের নিমাই মান্না এবং হরিপদ গড়াই উঠলেন সেই বাসে। চন্দনার তিনজনকে একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে তাঁরা গম্ভীরভাবে বসলেন দূরের সিটে।

বাস এগিয়ে চলে। লাভপুর ছাড়ল। কির্ণাহার পেরল। মথুরাপুর পার্টি গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। নামার লক্ষণ নেই। মাঝে মাঝে তেরচা চোখে দেখছে দেবুদের। দেবু ফিসফিস করে বলল,— এরাও বোলপুর যাবে নাকি?

হুম্।— সন্দেহটা বেচুদার মনেও দানা বাঁধে। এরাও কি চলেছে সন্দীপের কাছে?

বাস বোলপুর পৌঁছল। দু পক্ষই নামল বাস থেকে। সন্দীপের বাসা বাস টার্মিনাস থেকে মিনিট দশেকের পথ। দু দলই হাঁটা দিল সেই দিকে।

সন্দীপের বাড়ির কাছে পৌঁছে বেচুদা বললেন, — উঁহু এখন ঢুকব না, এদের সামনে। এই চায়ের দোকানটায় বসি খানিক। দেখা যাক ওরা কী করে? বলা যায় না হয়তো ওরা হাটে এসেছে অথবা কোর্টে — এই পথেই সেগুলো।

বেচুদা চায়ের দোকানে ঢোকা মাত্র দেখা গেল মথুরাপুর পার্টি দাঁড়িয়ে পড়েছে। কী সব বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে। তারপর তাঁরাও ঢুকে পড়ল রাস্তার উল্টো দিকে একটা চায়ের দোকানে।

দেবুদার সন্দেহটা তীব্র হয়।

মিনিট কুড়ি কাটল চায়ের দোকানে। দুদলই পরস্পরকে লক্ষ করছে। সন্দীপ একবার ইতিমধ্যে দরজা খুলে তাদের বাইরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে থেকে ফের ঢুকে গেল ভিতরে। সন্দীপকে দেখেই উঠে পড়েছিল শিব। বেচুদা বাধা দিলেন, — এখন নয়। ওদের এড়িয়ে কথা বলতে হবে। নইলে ভাঙচি দেবে।

দেখা গেল উল্টো দিকে মথুরাপুরও আধখানা দাঁড়িয়ে উঠেছে। কিন্তু তারাও এগুল না। বোধহয় একই মতলব।

নাঃ। আর অপেক্ষা করার মানে হয় না। মথুরাপুরের নড়ার লক্ষণ নেই। যদি সন্দীপ বেরিয়ে যায়? বেচুদা উঠে সদলবলে চললেন সন্দীপের বাড়ি লক্ষ্য করে।

অমনি মথুরাপুরের দুজনও প্রায় ছুটে গিয়ে সন্দীপের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ল।

সন্দীপ দরজা খুলে দেখে বাইরে পাঁচজন। সে ওদের মধ্যে দেবু ও শিবকে চেনে। বাকি তিনজন অচেনা বয়স্ক ব্যক্তি। দেবু ও শিবের দিকে চেয়ে সন্দীপ হেসে বলল,— কী খবর? ভালো?

হ্যাঁ ভাই, তোর কাছে এলাম একটা বিশেষ দরকার। — বলতে বলতে শিব সন্দীপকে প্রায় ঠেলে নিয়ে ওদের বৈঠকখানায় ঢোকে। বাকি চারজনও তাদের পিছু ধরল গায়ে গায়ে।

সন্দীপ একটু অবাক হয়ে তাকাচ্ছে অচেনা তিন ব্যক্তির দিকে, মথুরাপুরের নিমাই মান্না ফস্ করে পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে সন্দীপের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল,— তোমার নাম তো সন্দীপ। আমি মথুরাপুর থেকে আসছি, তোমার পিসি এই চিঠিটা দিয়েছেন।

অমনি বেচুদাও একখানা চিঠি বের করে সন্দীপের হাতে দিয়ে বললেন,— তোমার মেজমাসি এই চিঠিটা পাঠিয়েছেন। আমি চন্দনা গ্রামের ক্লাবের সেক্রেটারি। শিব দেবু আমাদের ক্লাবের ছেলে। তুমি তো গেছো চন্দনায়।

সন্দীপ দু'হাতে দুটো চিঠি নিয়ে খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, তারপর এক কোণে বসে পড়ল চিঠি দুটো হাতে নিয়ে। চিঠি পড়া শেষে উদ্বিগ্নভাবে ঘরে সবার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে সে হঠাৎ টপ্ করে উঠে বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

চন্দনা এবং মথুরাপুরের দল পরস্পরের প্রতি একপ্রস্থ বিষ দৃষ্টি হেনে গম্ভীর বদনে অপেক্ষায় রইল।

বাড়ির অন্দর থেকে চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে গুজগুজ ফুসফাস কানে আসে। মিনিট দশেক কাটল এইভাবে। সন্দীপের দেখা নেই। সে আর এলই না। তার বদলে দেখা দিলেন তার বাবা।

ভদ্রলোককে দেখেই মনে হয় নিরীহ মানুষ। তিনি ঘরে সবার উদ্দেশে একবার হাতজোড় করলেন। অতঃপর কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে খানিক ইতস্তত করে খুব নিচু গলায় জানালেন,— আজ্ঞে সন্দীপ বলছে—

কী ? — পাঁচটি কণ্ঠ ফুকরে ওঠে।

ভদ্রলোক আরও ঘাবড়ে গিয়ে মিনমিন করে বলেন,— ও বলছে যে একজন মাসি আর অন্যজন পিসি। ওকে দুজনেই লিখেছেন তাঁর গ্রামের হয়ে খেলতে। দুজনাই সমান আপন। এখন একজনের গাঁয়ের হয়ে খেললে অন্যজন যে রাগ করবেন। ইয়ে মানে তাঁকে অসম্মান করা হয়। সেটা খুব খারাপ হবে। তাই ও ভেবে পাচ্ছে না কার কথা রাখবে?

আপনার কী মত? — জিজ্ঞেস করেন বেচুদা।

ইয়ে মানে, আমিও তো ভেবে পাচ্ছি না। —সন্দীপের বাবা মাথা চুলকান!

বেচুদা বললেন,— গতবার এই ম্যাচে আমরা সন্দীপকে খেলাব ঠিক ছিল। ওর জ্বর হওয়ায় পারেনি খেলতে। তাই আমাদের দাবিটাই একটু বেশি। কী বলেন?

তা বটে। — সন্দীপের বাবা ঘাড় নাড়েন।

গতবার আমরাও চেয়েছিলাম ওকে খেলাতে। শুনলাম ওর জ্বর তাই আর ডিসটার্ব করিনি। সুতরাং আমাদের দাবিটাও কম নয়। — তৎক্ষণাৎ ওকালতি করেন নিমাই মান্না।

ডাহা গুল। গতবার ম্যাচে মথুরাপুর মোটেই সন্দীপের কথা ভাবেনি। চন্দনা সত্যি ডেকেছিল ওকে। বেচুদা কটমট করে একবার নিমাই মান্নাকে দেখে নিয়ে বললেন, — এখানে আজ সন্দীপ আমাদের সঙ্গে প্রথম কথা বলেছে। শ্রীকৃষ্ণের থিওরি মানলে আমাদেরই ফার্স্ট প্রেফারেন্স। মানে অর্জুনকে প্রথম দেখেছিলেন বলেই কৃষ্ণ পাণ্ডব পক্ষে যোগ দেন।

তা বটে। — সায় দিলেন সন্দীপের বাবা।

সেখানে শুধু চোখে দেখার উল্লেখ আছে। কথা বলার কেস নয়। সন্দীপ যে আমাদেরই প্রথম দেখেনি তার প্রমাণ? তাছাড়া মহাভারতের যুগের কেস কলি যুগে অচল। — নিমাই মান্নার পাল্টা যুক্তি!

তা ঠিক। — সন্দীপের বাবা এবারও মাথা নাড়েন : ইয়ে মানে আপনারা পাঁচজনই একসঙ্গে এসেছেন। সবারই সমান অধিকার। এখন সন্দীপ যা বলে—

কী বলছে সন্দীপ? — পঞ্চ কণ্ঠে একই প্রশ্ন।

— বলছে ও কারোর হয়েই খেলবে না।

ওকে আর একবার ভেবে দেখতে বলুন। — অনুরোধ জানায় বেচুদা।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের কেসটা আর একবার বিচার করতে বলুন। — বলে ওঠেন নিমাই মান্না।

হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলব ভেবে দেখতে। — সন্দীপের বাবার আশ্বাস।

তাহলে আবার কবে আসব? — মান্না মশায়ের জিজ্ঞাসা।

না না আপনাদের আর এখানে আসতে হবে না। — সন্দীপের বাবা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন : খোকা মানে সন্দীপ নিজেই জানাবে। মানে যদি খেলতে চায় কারও হয়ে।

আপাতত এর বেশি আর কাজ এগুনোর সম্ভাবনা নেই। পাঁচ আগন্তুকই তাই এবার বিদায় নিলেন। সন্দীপের বাবা ধড়াম করে দরজায় কপাট দিয়ে বুঝি হাঁপ ছাড়লেন।

বাইরে এসে মথুরাপুর ও চন্দনা দু'পক্ষই পরস্পরের দিকে পুনরায় একদফা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরল।

দেবু বলল, — আচ্ছা বেচুদা, আমরা যে ফার্স্ট বাসে আসব ওরা জানল কী ভাবে? ওদের আগে এসে ধরলে সন্দীপ আমাদেরই কথা দিত।

বোধ হয় ওদেরও একই মতলব ছিল। নাঃ সন্দীপের আশা নেই। — বেচুদার সখেদ আক্ষেপ।

দেবু বলল, — বেচুদা আপনি ফিরে যান। আমার এক মামা থাকেন এখানে। তার সঙ্গে দেখা করে পরে যাব আমরা। বাড়িতে বলে এসেছি।

বেচুদা চলে যেতে দেবু বলল, — সন্দীপকে আর একবার ভজাতে হবে। তবে বাড়ি যাব না। মাঠে প্র্যাকটিসের সময় ধরব বিকেলে। মামার বাড়িতে খেয়েদেয়ে রেস্ট নিয়ে যাব গ্রাউন্ডে।

খেলার মাঠে দেবু ও শিবকে দেখে এগিয়ে এল সন্দীপ।

শিব বলল, — কী রে পালালি কেন?

— কী করব ভাই, মাথা গুলিয়ে গেল।

দেবু বলল, — তোমার কিন্তু ভাই চন্দনার হয়ে খেলা উচিত। রানুদি নিজের মাসি। তুমি চন্দনায় গেছ কতবার।

আমারও তাই ইচ্ছে। কিন্তু খান্তপিসিকে তো জান না?

খান্তপিসি? মানে মথুরাপুরের পিসি?

হুঁ। ডেন্‌জারেস মেজাজ। ভীষণ জাঁদরেল। বাবা অবধি খান্তপিসিকে দারুণ ডরায়। ইয়া চেহারা। তেমনি গলা। ওঁর রিকোয়েস্ট না রাখলে যদি এখানে এসে হামলা করেন? সেই ভয়েই। মেজমাসি অবশ্য কক্ষনো জোরাজুরি করবেন না জানি। ভারি ভালো মানুষ। জান, মথুরাপুরের সেই দুই ভদ্রলোক খানিক বাদে বাবাকে বাজারে ধরেছিল আমার জন্যে খুব ঝুলোঝুলি করেছে।

অ্যাঁ! মথুরাপুর তো আচ্ছা ঘুঘু পার্টি! — চমকায় শিব: তোর বাবা কী বলেছেন?

বাবা রাজি হয়নি কথা দিতে। ইস্, পিসিকে যদি ম্যানেজ করা যেত? কিন্তু খান্তপিসিকে চটিয়ে? বাপরে! সে আমি পারব না।

তিন

শান্তিময়ী চ্যালেঞ্জ কাপ খেলার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল পুরোদমে।

নিয়মিত প্র্যাকটিস চাই। গ্রামের খেলোয়াড়দের যথাসম্ভব তৈরি করতে হবে। ছ'জনের জায়গায় বলা যায় না হয়তো আট জনকেই খেলতে হবে চন্দনা থেকে। আরও দু'জন ভালো হায়ার প্লেয়ারের সন্ধান এখনো মেলেনি। গ্রামের টিম একসঙ্গে কিছুদিন প্র্যাকটিস করলে বিলক্ষণ লাভ আছে। বাইরের প্লেয়াররা তা আর প্র্যাকটিসে আসবে না। ম্যাচের দিন দুই আগে তারা হাজির হবে বড়জোর।

বাইরের খেলোয়াড়দের ব্যাপারে মথুরাপুরের খবর যা পাওয়া গেল তা চন্দনার পক্ষে মোটেই স্বস্তির কারণ নয়। এরা সাতজন হায়ার প্লেয়ার পেয়েছে তার মধ্যে পাঁচজনকে বেছে নেবে। সন্দীপের স্ট্যান্ডার্ডে না হোক ভালোই একজন স্ট্রাইকার পেয়ে গেছে ওরা।

মথুরাপুরের গতিবিধি জানতে ওই গ্রামের একজনকে ফিট্ করে রেখেছেন বেচুদা। তবে চন্দনাতেও নির্ঘাৎ মথুরাপুরের গুপ্তচর আছে। সেটার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল ক'দিন বাদেই। তবে ব্যক্তিটি যে কে তা ধরা গেল না।

হায়ার প্লেয়ার আনতে এবং ম্যাচের জন্য খরচখরচা আছে। প্র্যাকটিসের পর খেলোয়াড়দের টিফিন দেওয়া উচিত। অতএব চাঁদা তোলা হল অন্যবারের মতো। এ বছর সবাই প্রায় চাঁদা দিলেন সাধ্যমতো। গ্রামের প্রেস্টিজ বলে কথা। এমনকী হাড়কিপ্টে মদন দাস অবধি এবার এককথায় হাত উপুড় করলেন। যদিও টুকে দিলেন— খরচখরচার হিসেবটা একবার দেখিও হে।

কেউ কেউ বললেন,— প্রয়োজনে আরও দেব। মথুরাপুরের নাকটা ঘষে দেওয়া চাই। বড্ড বাড় বেড়েছে। এমনভাব দেখাচ্ছে যেন জিতে গেছে ম্যাচ।

হঠাৎ চন্দনার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি তারকের মাথায় একটা আইডিয়া খেলল। একজন কোচ নিয়োগ করলে কেমন হয়? সবারই মনে ধরল প্রস্তাবটি। স্যুটিং-পাশিং বল-কন্ট্রোল ফিটনেস ও কম্বিনেশন ইত্যাদি কিছুটা তো বাড়বে কোচের তত্ত্বাবধানে। নিজেরা এলোপাথাড়ি খেলার চেয়ে এতে ঢের কাজ দেবে। হপ্তা পাঁচেক আর দেরি আছে ম্যাচের। অন্তত মাসখানেক যদি কোচিং পায় প্লেয়াররা। তবে এ ব্যবস্থা শুধু গ্রামের খেলোয়াড়দের কাজ দেবে। বাইরের খেলোয়াড়দের পাওয়া যাবে না কোচিংয়ে।

কোচ কাকে করা যায়? কোচকে অবশ্য গ্রামের কারও কুটুম হওয়ার প্রয়োজন নেই। অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক হল যে লাভপুর স্কুলের গেম্‌স্-টিচার হরেন স্যারকে ডাকা যাক। কাছে থাকেন। হপ্তায় তিনচার দিন আসতে পারবেন। একসময় উনি ভালো ফুটবলার ছিলেন। ফুটবল কোচিংয়ে একটা সার্টিফিকেটও আছে কোথাকার। চন্দনার বেশিরভাগ ফুটবলারদের উনি চেনেন। খেলা দেখেছেন। ওকে আনতে খরচও কম। সবদিক থেকেই সুবিধে।

দু'দিন বাদে রবিবার সকালে হরেন স্যারের কাছে হাজির হল বেচুদা। হরেনবাবু তার প্রস্তাব শুনে সবিনয়ে জানালেন, — ইস্! একদিন আগে এলে না ভাই? গতকালই আমি কথা দিয়ে ফেলেছি মথুরাপুর স্পোর্টিংকে, ওদের ছেলেদের কোচিং দেব হপ্তায় তিন দিন। ওই ম্যাচটার জন্যে।

বেচুদা থ। জিজ্ঞেস করলেন, — ওরা কখন এসেছিল?

— খুব সকালে। ভোরে জগিং করে এসে দেখি বাড়ির দরজায় ওই গ্রামের দু'জন। সকালে ঘুম থেকে উঠে অল্প কিছু খেয়ে নিয়ে আমি রোজ এক পাক দৌড়ে আসি। তাই তো এই বয়সেও কেমন ফিট আছি। হেঃ হেঃ!

গ্রামে ফিরে রিপোর্ট করলেন বেচুদা। সবাই তাজ্জব। গ্রামে কেউ নিশ্চয়ই স্পাই আছে মথুরাপুরের নইলে এত তাড়াতাড়ি খবরটা ওদের কানে যায় কী করে? সতর্ক হতে হবে। ফের পরামর্শ বসল গোপনে।

শশীখুড়ো বললেন, — কুছ পরোয়া নেই, আমরা হরেন মাস্টারের থেকে ভালো কোচ

আনব। হাওড়ায় আমার এক বন্ধুর ছেলে ফুটবল কোচিং পাশ। কয়েকটা টিমকে কোচিংও দিয়েছে। ছেলেটা শুনেছি বেকার। কালই যাচ্ছি হাওড়ায়। মানুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব।

শশীখুড়ো হাওড়ায় গেলেন বটে। তবে বন্ধুর ছেলে মানুকে সঙ্গে আনতে পারলেন না। মানু বেড়াতে যাচ্ছে সাউথ ইন্ডিয়ায়। ফিরে এখানে আসবে ম্যাচের দিন পনেরো আগে। তাই সই। ঠিক হল যে চন্দনারই এক ভূতপূর্ব প্লেয়ার ফটিকদা কোচিংয়ের ভার নিন এই ক'দিনের জন্য। ফুটবলের খুঁটিনাটি খবর, পৃথিবী বিখ্যাত ফুটবলারদের জীবনী এবং ফুটবলের বহু মডার্ন টেকনিক, পত্রপত্রিকা ও বই পড়ে ফটিকদার মুখস্থ। হাতে কলমে শেখাতে না পারলেও লেকচার দিয়ে তিনি প্লেয়ারদের ফুটবল জ্ঞান বৃদ্ধি করবেন এবং তাতিয়ে তুলবেন।

এই সময় দেবু টুক করে কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় ঘুরে এল তার কাকার সঙ্গে। দেবুর ছোটকাকা রামপুরহাট কলেজে পড়ান। মাঝে মাঝে আসেন গ্রামে।

শিব জিজ্ঞেস করে দেবুকে— হঠাৎ কলকাতা গেলি যে?

দেব হেঃ হেঃ করে বলল,— পাতাল রেলে চড়ে এলাম। অনেকদিনের শখ ছিল। ছোটকাকা যাচ্ছিল একটা কাজে। সঙ্গ ধরলাম। ভোরে তো প্র্যাকটিসে কামাই করা চলবে না, নইলে তোকেও নিতাম। ম্যাচ হয়ে যাক আবার যাব তোকে নিয়ে। আঃ দারুণ এক্সপিরিয়েন্স ভাই মেট্রো রেলে।

শিব একটু ক্ষুণ্ণ হয়। কারণ সেও পাতাল রেলে চাপেনি। তবে মুখে কিছু বলে না। ঠিক আছে হয়ে যাক ম্যাচটা। মথুরাপুরকে হারাতে পারলে মহানন্দে পাতাল রেল চড়া যাবে।

এ বছর শান্তিময়ী চ্যালেঞ্জ কাপের ম্যাচে রেফারি কে হবে তাই নিয়ে সমস্যা দেখা দিল।

কাছাকাছি এলাকার কেউ এই ম্যাচ খেলাতে রাজি হচ্ছে না। বদনাম হয়ে গেছে ম্যাচটার। যা প্রচণ্ড উত্তেজনা হয় দর্শক ও খেলোয়াড়দের মধ্যে, যে কোনও সময় মারপিট লেগে যেতে পারে তুচ্ছ কারণে। রেফারির ওপর পড়তে পারে চোট। গতবার এ অঞ্চলের অন্যতম অভিজ্ঞ ও প্রবীণ রেফারি তারাপদ মাস্টার প্রায় মার খেতে খেতে বেঁচে গেছেন। কারণটা হল, তিনি মথুরাপুরের একটা গোল নাকচ করেন অফ-সাইডের কারণে। ব্যস্, খেলা শেষে মথুরাপুরের কিছু ক্ষুব্ধ সাপোর্টার তাড়া করে রেফারিকে। অবশ্য তাঁকে বাঁচিয়ে দেয় মথুরাপুরেরই অন্য লোকেরা।

তাই স্থানীয় কোনও রেফারি শান্তিময়ী চ্যালেঞ্জ কাপ খেলাবার ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। নগদ পঞ্চাশ টাকা দক্ষিণার লোভ দেখিয়েও স্থানীয় কাউকে রাজি করানো যায়নি এ পর্যন্ত। কলকাতা থেকে জাঁদরেল কোনও রেফারিকে আনাও সম্ভব নয়। তাতে খরচ ঢের। তাছাড়া তেমন কেউ আসবে না এই দূর অজ পাড়াগাঁয়ে।

চন্দনা ও মথুরাপুর যুক্তি করল যে শের খাঁকে অনুরোধ করা যাক রেফারি হতে।

ফুটবল রেফারি হিসেবে এ অঞ্চলে শের খাঁর দারুণ খ্যাতি। সুবাদার শের খাঁ এক্স মিলিটারিম্যান। অর্থাৎ আগে ছিলেন ভারতীয় ফৌজে। এখন অবসর নিয়েছেন। থাকেন আহমদ্পুরে। ছয় ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা। বলিষ্ঠ গড়ন। টকটকে রং। বাঁকানো তরোয়ালের মতন জোড়া মোচ। কদম ছাঁট চুল। হুংকারে যেন বাঘের গর্জন। চলাফেরা শার্দূলসুলভ। বয়স বছর পঞ্চাশ।

শের খাঁ মিলিটারিতে থাকার সময় ফৌজি ফুটবল ম্যাচে রেফারিং করতেন। এখনো শখটা রয়েছে। পরনে কালো হাতা স্পোর্টস গেঞ্জি, গাঢ় নীল হাফ-প্যান্ট, পায়ে বুট ও ফুল মোজা গলায় হুইসিল ঝুলিয়ে গটগট করে যখন তিনি মাঠে নামেন, লোকে সসম্ভ্রমে তাকিয়ে থাকে। তাঁর হুইসিল মাঝে মাঝে এমন জোরে বাজে যে প্লেয়াররা মায় দর্শকরা চমকে ওঠে। খেলা শুরুর আগে গোঁফ চোমড়াতে চোমড়াতে তিনি দু দলের প্লেয়ারদের ওপর এমন কটমটিয়ে চোখ বুলিয়ে নেন যে তাতেই অনেক খেলোয়াড়ের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। মারকুটে বদরাগী খেলোয়াড়রা তটস্থ হয়ে থাকে শের খাঁ রেফারিং করলে। দর্শকদের চিৎকার প্রতিবাদ তিনি গ্রাহ্যই করেন না। শের খাঁর পকেটে থাকে দু'রকম কার্ড। লাল ও হলুদ। কোনও খেলোয়াড় সামান্য বেয়াদবি করলেই তিনি তুলে ধরেন লাল কার্ড। অর্থাৎ— গেট আউট। খেলোয়াড়টি তখন বেরুতে আপত্তি করলে স্রেফ ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাকে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দেন।

বোলপুরে একটা ম্যাচে শের খাঁ রেফারিং করেছিলেন। খেলার শেষে নাকি গ্রাউন্ডে ছিল এক পক্ষের আটজন এবং অন্যপক্ষের সাতজন। বাকিরা লাল কার্ড দেখার ফলে বহিষ্কৃত হয়েছিল। তবু মাঠে কোনওরকম গোলমাল হয়নি এবং দর্শকরা ধন্য ধন্য করেছিল শের খাঁ কোথাও পক্ষপাতিত্ব করেছেন। লোকে এমনও বলে যে কলকাতায় বড় বড় টিমের ম্যাচ শের খাঁকে দিয়ে খেলালে বড় টিমের বেআদব তারকা প্লেয়ারদের ত্যান্ডাই-ম্যান্ডাই বন্ধ হয়ে যেত। ম্যাচ নির্বিঘ্নে হত।

শের খাঁ বাংলা হিন্দি ইংরেজি তিনটে ভাষাই জানেন। তবে রেফারিগিরির সময় বাংলা বলেন না। হিন্দি বা ইংরেজি বুলি ঝাড়েন।

খোশমেজাজে থাকলে দিব্যি গল্প করেন শের খাঁ। বলেন,— ব্রাদার, কতগুলি গোলা লড়া আর্মি জওয়ানদের ম্যাচ কন্ট্রোল করেছি আর এরা তো রসগুল্লা মার্কা সিবিলিয়ান।

শের খাঁ নাকি একবার আলিপুর জেলে কয়েদিদের মধ্যে একটা এক্‌জিবিশন ফুটবল ম্যাচ খেলিয়েছিলেন। সে ম্যাচে খেলানোর জন্যে কোনও ভালো রেফারি পাওয়া যাচ্ছিল না। কেউ রাজি হচ্ছিল না খেলাতে। শের খাঁ তখন ফোর্ট উইলিয়ামে পোস্টেড। খুঁজে খুঁজে তাঁর ডাক পড়ল এই কাজে।

সেই জেলখানার ম্যাচে খেলোয়াড়দের অনেকেই ছিল সাংঘাতিক খুনে গুন্ডা আসামি। যমদূতের মতো চেহারা তাদের। ম্যাচের আগেই একপক্ষ অপরপক্ষকে ঘুসি দেখাচ্ছে। ছুরি মারব, খুন করব, ঠ্যাং ভেঙে দেব ইত্যাদি বলে শাসাচ্ছে চিৎকার করে।

শের খাঁ খেলার আগে দু দলকে সার বেঁধে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে জ্বলন্ত চোখে ধমকালেন, — খেলার সময় এতটুকু বেচাল দেখলেই তোকে যে শুধু বের করে দেব তা নয়। পানিশমেন্ট হবে সাত দিন ডান্ডাবেড়ি। ভুলো মৎ, হম্ হ্যায় সুবাদার শের খাঁ।

শের খাঁর ওই বাঘের মতন মূর্তি দেখে কুঁকড়ে গিয়েছিল জেলখানার খেলোয়াড়রা। খেলার সময় একটা ফাউল অবধি হয়নি। গর্বিত সুরে শের খাঁ বলেন, — মেজর ক্রিস্টোফারের কাছে আমার ট্রেনিং। সমঝা? মেজর ক্রিস্টোফার ইচ্ছে করলে বাঘ সিংহের ম্যাচ খেলিয়ে দিতে পারতেন।

শের খাঁর মুখে শোনা এসব গল্প সত্যি না মিথ্যে তা অবশ্য যাচাই করা হয়নি, তবে লোকে অবিশ্বাসও করেনি। ফলে শের খাঁর প্রতি তাদের সমীহ বেড়েছে।

শের খাঁ একা খেলাতে আসেন না। দু'জন লাইন্সম্যানও সঙ্গে আনেন এবং আরও দু'তিনজন মাসল্‌ম্যান অর্থাৎ বডিগার্ড। রেফারির ওপর হামলা হলে তারা হামলাকারীদের শায়েস্তা করতে তৈরি থাকে। খেলা পরিচালনার জন্য তিনি নগদ অর্থ নেন না বটে তবে খাঁসাহেবকে আনানো খরচসাপেক্ষ। কারণ যাতায়াতের ভাড়া দিতে হয় তাঁর পুরো টিমকে। এছাড়া পুরো দলকে খাওয়াতে হয় ম্যাচের আগে চা বিস্কুট সেদ্ধ ডিম এবং খেলার পরে পেট ভরে মুরগির মাংসের ভোলো, ভাত ও রসগোল্লা।

শের খাঁর একটা পিস্তলও আছে। তেমন গুরুতর ম্যাচ হলে রেফারিং করার সময় পিস্তলের খাপটা ঝোলে তাঁর কোমরে। পিস্তলটা বোধহয় থাকে ওঁর কোনও বডিগার্ডের কাছে।

এ হেন স্বনামখ্যাত শের খাঁকে শান্তিময়ী চ্যালেঞ্জ কাপ খেলানোর জন্য বলতে গেলেন চন্দনা ও মথুরাপুরের দুই বিশিষ্ট অধিবাসী। সুখের বিষয় খাঁ সাহেব রাজি হয়ে গেলেন।

চার

ম্যাচের দিন পনেরো আগে শশীখুড়োর বন্ধুর ছেলে মানু সত্যি সত্যি হাজির হলেন চন্দনায় ফুটবল কোচিং দিতে।

খুব জমে উঠল প্র্যাকটিস। গ্রামের বহুলোক প্রতিদিন বিকেলে মাঠে যায় ফুটবল দেখতে, এমনকী কিছু অল্প বয়সি মেয়েও যায়। রেডিও টি.ভি.-র কল্যাণে এখন মেয়েরাও বেশ ফুটবল বোঝে। এ নিয়ে দু'কথা বলতেও পারে।

খবর আসে মথুরাপুরেও ম্যাচ প্র্যাকটিস চলছে। হরেন স্যার যাচ্ছেন। তবে ওদের বেশ গা ঢিলে ভাব। যেন নিয়মরক্ষা। কারণ ওদের প্রধান ভরসা বাইরের খেলোয়াড়রা। তারা তো আর প্র্যাকটিসে আসছে না। চন্দনাকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘরের আটজনকেই খেলাতে হবে। এখনো তেমন দু'জন হায়ার প্লেয়ারের হদিশ মেলেনি।

প্র্যাকটিস সেরে ফিরছিল শিব। তপুর বোন অপু একগাল হেসে বলল, — তোমরা কোন্ ছকে খেলবে শিবদা? ফোর-ফোর-টু? না ফোর-থ্রি-থ্রি?

যত্ত পাকামি। মনে মনে গজরায় শিব। তবে বাইরে তা প্রকাশ করে না। গম্ভীরভাবে বলে,— সেটা কোচ জানে। আমায় বলেনি এখনো।

শিবের এমন নিস্পৃহ ধরন দেখে অপ্রতিভ অপু সরে পড়ে।

আসলে শিবের মনটা খিঁচড়ে ছিল অন্য কারণে। দেবু শিবকে লুকিয়ে চলে গেছে কলকাতায় হাবলুদার বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে। এটা কী রকম হল?

হাবলুদা কানাই দত্তর ছেলে। কলকাতায় থাকেন। সদ্য ডাক্তারি পাশ করেছেন। দিন পনেরো আগে জানা যায় যে হাবলুদার বিয়ে। হঠাৎ ঠিক হয়েছে। বিয়ে হবে কলকাতায়। বউভাত সোদপুরে। যেখানে হাবুলদার বাবা মা থাকেন। চন্দনা গ্রামে থাকেন শুধু হাবলুদার এক জ্যাঠামশাই। চন্দনার অনেককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বিয়েতে। গতকাল হাবলুদার

জ্যাঠা সপরিবার গেছেন বিয়েতে যোগ দিতে। এছাড়া চন্দনার আরও পাঁচ ছয়জন। দেবুর ছোটকাকা হাবলুদার বিশেষ বন্ধু। তিনিও গেছেন বিয়েতে। দেবু সঙ্গ নিয়েছে।

আসলে বিয়েটা ছুতো। দেবুকে কলকাতার নেশায় পেয়েছে। সিনেমা, থিয়েটার, মেট্রো-রেল। রেস্টুরেন্টে খাওয়া — এইসব ফুর্তি করবে। অথচ? যাকগে? দেবুর ওপর রাগটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে শিব প্র্যাকটিসে মন দেয়।

দেবু ফিরল ম্যাচের তিন দিন আগে। শিব গেল না দেখা করতে। দেবু নিজেই এল। শিবের মুখ থমথমে। উদাস সুরে শুধু বলল, — কী ? নেমন্তন্ন কেমন খেলি?

— ভালো।

শিব গোঁজ হয়ে যায়। কথা বলে না।

দেবু হেসে বলে, — বুঝেছি, খুব চটেছিস?

মিথ্যেবাদী, বিশ্বাসঘাতক। — ফেটে পড়ে শিব : তুই না বলেছিলি পরের বার একসঙ্গে যাব কলকাতায়। আমায় লুকিয়ে একা একা ফুর্তি মেরে এলি। লজ্জা করল না?

— না ভাই ফুর্তি করিনি। সময়ই পাইনি। স্রেফ বিয়ে বাড়িতেই কেটেছে। একা একা কি ভালো লাগে ঘুরতে? পরের বার দু'জনে গিয়ে খুব ঘুরব। সত্যি বলছি।

মুখের ভাব দেখে মনে হল যে শিব কিছুটা নরম হয়েছে।

এখানকার খবর কী ? — জিজ্ঞেস করে দেবু।

খবর মন্দ নয়। ভালোই প্র্যাকটিস চলছে। আর — মুচকি হেসে থেমে যায় শিব।

— আর কী?

— দুটো ব্যাপার ঘটেছে। এক নম্বর — মথুরাপুরের একজন হায়ার প্লেয়ার খেলতে গিয়ে চোট পেয়েছে পায়ে। ডাক্তার বলছে তাকে, এক মাস মাঠে নামা চলবে না।

— বাঃ! আর দ্বিতীয়টা?

— ওদের আর একজন হায়ার, দুর্গাপুরের ভোম্বল কেটে পড়েছে।

— মানে!

ভোম্বলকে কেউ একটা বেনামী চিঠি দেয় ভয় দেখিয়ে। এই ম্যাচে খেলতে নিষেধ করে। শিবুর কণ্ঠে খুশি উথলে ওঠে : তাইতে ঘাবড়ে গিয়ে ভোম্বল পালিয়েছে ওর দিদি জামাইবাবুর কাছে। মথুরাপুরকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে যে ও হঠাৎ জামশেদপুর যাচ্ছে ভীষণ জরুরি কাজে। ম্যাচ খেলতে পারবে না। সেই জরুরি কাজটা যে ঠিক কী তা ভোমলার বাবাও জানেন না। তবে বললেন যে ভোম্বলের নামে একটা চিঠি এসেছিল। আর সেটা পড়েই ও অস্থির হয়ে ওঠে এবং পরদিনই জামশেদপুর যাওয়ার জন্য জেদ ধরে। জামাইবাবুর সঙ্গে নাকি ওর ভীষণ দরকার। ভোম্বলের বাবার অবিশ্যি ধারণা, জামাই ভোমলার জন্যে কোনও চাকরির ব্যবস্থা করেছে।

তবে যে তুই বলছিলি ভোম্বলকে ভয় দেখিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে ম্যাচ খেলতে বারণ করে? — জেরা করে দেবু : কী করে জানলি?

মনে মনে আন্দাজ করছি। — শিব থতমত খায়।

— বুঝেছি।

— কী?

— ও চিঠি তুই লিখেছিস কিংবা তোর কোনও শাগরেদ।

— হেঁ, হেঁ ঠিক ধরেছিস। আমিই লিখেছি। বলিসনে কাউকে। কেউ জানে না। এমনকী এ গাঁয়েরও কাউকে বলিনি। প্যাঁচটা যে এমন লেগে যাবে ভাবতেই পারিনি। তবে ভাই আইডিয়া তোর থেকে ধার করা।

কীরকম? — দেবু অবাক।

সেই যে বলেছিলি মথুরাপুর যাদের হায়ার খেলাবে তাদের নাম ঠিকানা জোগাড় করতে। আর কার কী উইক্‌নেস আছে মানে কে কীসে ভয়-টয় জানতে। বলেছিলি, কার যে কীসে ভয় থাকে কে জানে? কারও ভুতের ভয়। কারও কারও বাবা কাকা হেডমাস্টারের ভয়। কারও টিকটিকিতে ভয়। ঠিকঠাক ভয়ের জায়গায় ঘা দিতে পারলে বেশির ভাগ লোককেই ঘায়েল করা যায়। মজা করে বলেছিলি যে ওদের হায়ার প্লেয়ারগুলোকে ভয় দেখিয়ে চিঠি ছাড়লে কেমন হয়? এই ম্যাচে খেললে প্রাণনাশের হুমকি। মৃত্যুদুতের পরোয়ানা। রহস্য রোমাঞ্চের বইগুলোর কায়দায়। ওয়ার্ল্ড ফেমাস প্লেয়ারদের নাকি মাঝে মাঝে চিঠি বা ফোনে এমনি হুমকি দেওয়া হয়। তোর আইডিয়াটা ভাবলাম একবার ট্রাই করে দেখি।

দেবু ভুরু কুঁচকে বলে,— তুই কি মথুরাপুরের সব হায়ার প্লেয়ারকে এমনি চিঠি ছেড়েছিস?

না না শুধু ভোম্বলকে। — জানায় শিব : শুনলাম ক'দিন আগে ভোম্বল বৈঁচিতে একটা গ্রামের টিনের হয়ে হায়ার খেলতে গিয়ে দারুণ বিপদে পড়েছিল। ওর গোলেই লোকাল গ্রামের টিম হারে। স্থানীয় দর্শকরা হজম করতে পারেনি হারটা। খেলার পর ছুতো করে ঝগড়া বাধিয়ে তারা প্রতিপক্ষের হায়ার প্লেয়ারদের ঠ্যাঙাবে বলে তাড়া করে। ভোম্বল এবং আরও দু'জন ওই টিমের হায়ার প্লেয়ার প্রাণপণে ছুটে ধানক্ষেতে সারা রাত লুকিয়ে থেকে পরদিন আধমরা হয়ে বাড়ি ফেরে। জানতাম ভোমলাটা এমনিতেই ভিতু টাইপের। ভাবলাম দিই ঠুকে একটা ভয় দেখিয়ে চিঠি।

ফাস্‌ক্লাস। — শিবের পিঠে চাপড়ে দেয় দেবু। বলে : আজ সন্ধ্যায় প্র্যাকটিসের পর তোকে নিয়ে যাব ছোটকার কাছে। কাকার কী দরকার আছে তোর সাথে।

সেদিন ফুটবল প্র্যাকটিসের পর শিব আর দেবু আসছে, পাঁচকড়িদার সঙ্গে দেখা। পাঁচকড়িদার বয়স বছর তিরিশ। সিড়িঙ্গে চেহারা। নিজে খেলেটেলে না কিন্তু এই ম্যাচের ব্যাপারে দারুণ উৎসাহ। পাঁচকড়িদা বললেন, — এই যে মানিক জোড়, চললে কোথায়? তারপর খুব সিরিয়াসলি বললেন, — আরও দুজন হায়ার প্লেয়ার জোগাড় হল?

শিব বিষণ্ণ সুরে বলে, — কই আর? খোঁজা তো হচ্ছে।

পাঁচকড়িদা হতাশ ভাবে জানালেন,—মথুরাপুর অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যাবে। ওরা তো শুনছি বেশ ভাল পাঁচজনকে পেয়ে গেছে বাইরে থেকে।

দেবু বলে উঠল,—পশ্চিমপাড়ার নন্দ কাকার মেয়ে টুনিদির এক দেওরের ছেলে নাকি দারুণ ফুটবল খেলে। ভাল নাম হীরালাল ঘোষ। ডাক নাম বোধহয় ঘোঁতন। টুনিদির ওই দেওর থাকে বজবজে না জয়নগরে। ঠিকানাটা জানি না।

কে বললে?— প্রশ্ন করেন পাঁচকড়িদা।

ওই শিব বলছিল।—দেবু বলে : গত বছর টুনিদি যখন এসেছিলেন পুজোয় শিবকে

বলেছিলেন হীরালালের কথা। এখন টুনিদি বর তো ট্রান্সফার হয়ে চলে গেছেন অনেক দূরে দিল্লিতে। হীরালালের ঠিকানাটা যদি পাওয়া যেত? কাগজে দেখেছি, একজন হীরালাল ঘোষ এবার জুনিয়ার বেঙ্গল খেলেছে। মনে হয় সে টুনিদির ওই দেওয়রের ছেলেই। শিবটা এমন, এতদিন ভুলেই গিছল টুনিদির কথাটা। আজ বলছে আমায়। হাতে সময়ও নেই। টুনিদির আত্মীয়, সুতরাং হীরালালকে খেলানো যেত চন্দনার হয়ে।

হুম।—সায় দেন পাঁচকড়িদা।

—আচ্ছা পাঁচুদা, টুনিদির ওই দেওর তো মথুরাপুরের নাড়ু ঘোষের সম্পর্কে ভাই হয়। দু'ভাইয়ে কাটাকাটি। কেউ কারও খবর রাখে না। তাই হীরালালের কথা জানে না। নইলে ওরা ঠিক হীরালালকে খেলানোর চেষ্টা করত। পাঁচুদা আপনার সঙ্গে তো নাড়ু ঘোষের আলাপ আছে। কায়দা করে হীরালালের ঠিকানাটা জেনে নিতে পারেন? তবে বলবেন না যেন কি জন্যে চাইছেন। ঠিকানা পেলে যে কেউ সোজা চলে যেতাম হীরালালের কাছে।

দেখি চেষ্টা করে।—পাঁচুদা হনহনিয়ে চলে যায়।

এই—পাঁচুদা এগোতেই শিবু লাফিয়ে উঠে : আমি আবার কখন বললাম, টুনিদির দেওরের ছেলে দারুণ ফুটবল খেলে? ওর ভাল নাম হীরালাল কি না তাও জানি না। টুনিদি শুধু বলেছিলেন, ওর দেওরের ছেলে আমারই বয়সি। ডাক নাম ঘোঁতন। বজবজে থাকে। ব্যাস্। তখন তো তুইও ছিলি। পাঁচুদাকে এসব উল্টোপাল্টা বললি কেন?

—আরে দুর! নাড়ু ঘোষও কি আর ঘোঁতনের ভাল নাম জানে? দু ভাইয়ের দেখা সাক্ষাৎই নেই কত বছর। আর কোন বাঙালি ছেলে না ফুটবল খেলে? তা সে কেমন খেলে সে খোঁজ কি আর নাড়ু ঘোষ রাখবে?

—তাহলে এসব গুল মারলি কেন?

—কারণ কালই মধুরাপুরের কেউ বজবজ ছুটবে হীরালালের খোঁজে এবং হাতাশ হয়ে ফিরবে আমাদের মুন্ডুপাত করতে করতে। বুঝলি, আসলে পাঁচুদার পজিশনটা মথুরাপুরে কিঞ্চিৎ ঢিলে করে দিতে চাই, তাই টোপটা ফেললাম। পাঁচুদার নির্ঘাৎ মথুরাপুরের স্পাই। আমি লুকিয়ে দেখেছি ওকে মথুরাপুর ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট রমজান আলির সঙ্গে গুজগুজ করতে। হঠাৎ আমায় দেখে চুপ করে গেছিল। ওই আমাদের খবর সব লিক্ করছে মথুরাপুরে। দেখিলি না হীরালালের খবরটা শুনেই কেমন ব্যস্ত হয়ে উঠল। দেখবি আমাদের বলবে, ঠিকানাটা পেলুম না। যা আমরা না যেতে পারি ঘাঁতনের খোঁজে। তা ওরাই যাক।

হি হি কর হাসতে থাকে দেবু।

ঘরের দরজাটা বন্ধ করে চাপা কণ্ঠে বললেন দেবুর কাকা—শিব, একটা সুখবর আছে হাবলুর বিবাহসুত্রে চন্দনা দুজন বাইরের প্লেয়ার পাচ্ছে এই ম্যাচে। দুই ভাই। কনের দুই মামাতো দাদা। দুজনেই খেলে এরিয়ানে। রেগুলার প্লেয়ার।

বাঃ দারুণ বিয়ে হয়েছে তো!—শিব উচ্ছ্বসিত।

—বলতে পার ঘটানো হয়েছে, দেখেশুনেই।

কীভাবে?—শিব অবাক।

ছোটকাকা বললেন,—অরিজিনাল আইডিয়াটা দেবুর। ওর মাথাতেই প্রথম আসে বুদ্ধিটা। তখন আমায় বলে : চন্দনা বাইরের প্লেয়ার খুঁজছে। এই একটা উপায়। চলে গেলাম কলকাতায় হাবলুর কাছে। ও বিয়ের জন্য পাত্রী খোঁজা চলছিল। আমার প্রস্তাবে হাবলু তক্ষুনি রাজি হয়ে গেল। হাবলু চন্দনায় থেকে স্কুলে পড়েছে। নিজে ভাল ফুটবল খেলত। চন্দনা স্পোর্টিংয়ের পেট্রন।

তিনদিন ময়দানে গরু খোঁজা খুঁজে পেয়ে গেলাম পছন্দসই কনে। যার দু দু'জন দারুণ ফুটবলার আত্মীয় রয়েছে। কনেও অবশ্য ফেলনা নয়। দেখতে সুশ্রী এবং গ্র্যাজুয়েট। হাবলু পণ নেবে না। কোনও দাবিদাওয়া নেই। শুধু দুটো শর্ত। খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে হবে এই ম্যাচের আগেই এবং কনের মামাতো দাদাদের খেলতে হবে এই ম্যাচ চন্দনার হয়ে।

কনেপক্ষ তো লুফে নিল প্রস্তাব। সুখের বিষয়, মেসোমশাই মানে হাবলুর বাবাও রাজি হলেন এ বিয়েতে।

—শোন একদম গোপন রাখবে খবরটা। এ খবর শুধু জানে হাবলু আম, দেবু, মেসোমশাই, সেক্রেটারি বেচু। আর জানলে তুমি। এমনকি কনেও জানে না। তবে পাত্রীপক্ষের কয়েকজন জানে। তাদের বলা হয়েছে ব্যাপারটা এক্কেবারে গোপন রাখতে। কনের ফুটবলার দাদাদের বিয়েতে অবধি আসতে দেওয়া হয়নি পাছে মথুরাপুর কিছু টের পায়। বলা যায় না কৌশলটা জেনে গেলে মথুরাপুর হয়তো এমনি বিয়ে লাগিয়ে দিয়ে দারুণ কয়েকজন ফুটবলার জোগাড় করে ফেলবে। অবশ্য এমনি কিছু বিনা পণে বিয়ে হলে সমাজের উপকারই হয়। তবে মথুরাপুরের তেমন কোনও সৎকর্ম পরেরবারের জন্য তোলা থাক।

ওই প্লেয়ার দু'জন কবে আসবে?—জিজ্ঞেস করে শিব।

—ম্যাচের আগের দিন। অর্থাৎ কাল। হাবলু নিজে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। মাঠে ঢোকার আগে অবধি অন্যরা জানবে না—ওদের আসার উদ্দেশ্য বা আসল পরিচয়।

শিব দেবুর দিকে চেয়ে দেখল যে সে ঠোঁট টিপে হাসছে। এখন শিব বোঝে দেবুর ঘনঘন কলকাতা যাবার কারণ।— দেবুর ওপর তার সব রাগ অভিমান জল হয়ে যায়। উঃ, কী বুদ্ধি ওর!

পাঁচ

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ শিব হাজির হল দেবুর কাছে শিবের থমথমে মুখ দেবে দেবু বুঝল, কিছু গোলমাল হয়েছে। জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার?

শিব বলল,—আমাদের যে গোলকিপার খেলবে ঠিক হল, লাভপুরের অনাথ দাস, সে আজ ভোরে এসে জানিয়েছে যে ও খেলতে পারবে না।

কেন?

—বেচারাকে বাধ্য করা হয়েছে। অনাথদের অবস্থা খুব খারাপ। ওর বাবা জমি বন্ধক রেখে অনেক টাকা ধার নিয়েছিলেন মথুরাপুরের গৌড় সাহার থেকে। ধার শোধ হয়নি ঠিক সময়ে। শয়তান গৌড় সাহা ওর বাবাকে ওয়ার্নিং দিয়েছে যে অনাথ যদি চন্দনার হয়ে খেলে এই ম্যাচে তাহলে ওদের জমি দখল করে নেবে। তাই অনাথ বাধ্য হয়ে—

এখন গোলি কে খেলবে?

—আমাদের গ্রামের ছেলে বাবুকেই খেলাতে হবে। হায়ার ভাল। কাউকে আর পাচ্ছি কই? মন্দ খেলে না বাবু। তবে এরকম ম্যাচে যদি নার্ভাস হয়ে পড়ে? জানিস একটা খবর শুনলাম অনাথের মুখে। মথুরাপুর সন্দেহ করছে যে চন্দনার কেউ চিঠি দিয়েছে। ভোম্বলকে, ভয় দেখিয়ে। সেই রাগে ওরা অনাথকে আটকাছে। ভাই নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। আমার জন্যেই অনাথকে হারালাম।

ভোম্বলকে ভয় দেখিয়েছিস, বেশ করেছিস। অমন ভীতুর ফুটবল খেলা উচিত নয়। তা ওরা আমাদের হায়ার প্লেয়ারদের তোর কায়দায় ভয় দেখাতে পারত। কিন্তু এভাবে চাপ দেওয়া? অতি নীচ কৌশল। ভেরি ভেরি আনস্পোর্টিং।—দেবু গুম মেয়ে যায়।

খানিক বাদেই হঠাৎ দেবু মাথা ঝাঁকিয়ে তেড়েফুঁড়ে বলল,—অলরাইট। তুই তৈরি হয়ে নে। আমরা এখুনি বোলপুর যাব।

—বোলপুরে কেন? সন্দীপের কাছে?

—সন্দীপ কি খেলবে?

—দেখা যাক।

বোলপুরের পথ বাসে শিব লক্ষ্য করে যে দেবুর হাতে খবরের কাগজে জড়ানো একখানা বই বা খাতা। সে জিজ্ঞেস করল,—এটা কিরে?

কিছু না, একটা বই।—নিস্পৃহ সুরে জবাব দেয় দেবু।

বেলা এগারোটা নাগাদ দেবুরা বোলপুরে পৌঁছল। তারপর সোজা হাজির হল সন্দীপের বাড়ি।

দেবু ও শিবকে দেখে একটু অবাক হয়ে সন্দীপ হেসে বলল,—কী খবর?

শিব বলল,—তুই ভাল তো?

—হ্যাঁ। তোদের ম্যাচ তো কাল?

এবার দেবু কথা কয়,— হুঁ কাল ম্যাচ। সেইজন্যেই এসেছি একটা কাজে। শোন, এই বইটা রেখে যাব এখানে। গল্পের বই। দারুণ ইন্টারেস্টিং। একজনের সঙ্গে দেখা করব। সেই আবার না এটা পড়তে চায়। সেই ভয়েই এখানে রেখে যাচ্ছি। একটু বাদেই এসে নিয়ে যাব বইটা।

বলতে বলতে দেবু কাগজের মোড়ক খুলে একখানা মাঝারি সাইজের ফ্ল্যাট ছেঁড়া বই রাখে টেবিলে। শুধু মলাট নয় বইটায় গোড়ার দিকে আরও কয়েকটা পাতা উধাও। লেখকের নাম জানা যাচ্ছে না। তবে ওপরের পাতায় দেখা গেল বইয়ের নাম—নিশীথের আতঙ্ক। তার নিচে ছাপা—প্রথম পরিচ্ছেদ এবং তারপরই শুরু হয়েছে কাহিনি।

অর্থাৎ বইটা আস্তই আছে তবে মলাট, লেখকের নাম, প্রকাশকের নাম ঠিকানা ইত্যাদি সহ পাতাগুলো নেই।

বই রেখে দেবু শিবের হাত ধরে টান দিয়ে বলল,—চ।

দরজার বাইরে এসে দেবু শিবকে প্রায় টানতে টানতে হনহন করে হেঁটে রাস্তার বাঁক ঘুরে থমকে দাঁড়াল।

শিব এতক্ষণ কিছুই থৈ পচ্ছিল না। দেবু যাচ্ছে কোথা? সন্দীপের সঙ্গে তো ম্যাচ নিয়ে

একটা কথাও বলল না। শিব ভেবেছিল যে দেবু হয়তো সন্দীপকে বলেকয়ে রাজি করাবে চন্দনার হয়ে খেলতে। অথচ? সে বেশ বিরক্ত হয় বলে,—কোথায় যাবি?

দেবু জবাব না দিয়ে ফের গুটিগুটি উল্টো পথে ফিরে মোড়ের কাছে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে, চা অমলটে অর্ডার দিয়ে জুত করে বসল বেঞ্চিতে। সেখানে থেকে সন্দীপের বাড়ি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওদের বাইরের ঘর দরজা খেলা। দেখা গেল সন্দীপ চেয়ারে বসে, টেবিলে মাথা ঝুঁকিয়ে এক মনে পড়ছে কিছু একটা।

আধঘণ্টা বাদে খাবারের দাম মিটিয়ে উঠল দেবু। শিবকে ডাক দিল,— আয়।

সোজা সে চলল সন্দীপের বাড়ি। যেতে যেতে শুধু একবার বলল শিবকে,—সন্দীপ যদি আমার বইটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে তুই বাধা দিবি। আমি একা হয়তো পারব না ওর সঙ্গে।

—কেড়ে নেবে কেন?

চান্স আছে।—আর কথা বলে না দেবু।

টেবিলের ওপর একখানা খোলা বই। সন্দীপ ঘাড় নিচু করে যেন গোগ্রাসে গিলছে বইখানা। সেই নিশীথের আতঙ্ক। আধাআধি পড়া হয়েছে বইটা। দেবু একেবারে গা গেঁষে দাঁড়াতে সন্দীপ চমকে মাথা তুলে বলল,—কে? এ্যাঁ তুই। এসে গেলি?

দেবু টপ করে টেবিল থেকে বইখানা তুলে দিয়ে বলল,—হ্যাঁ কাজ হয়ে গেছে, এবার ফিরব।

আরে আরে, একটু বোস। বইটা শেষ করিনি।—কাতরে ওঠে সন্দীপ।

সরি।—যাবার জন্য পা বাড়ায় দেবু।

— প্লিজ ভাই।

দেবু দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়ে।

আর একটুখানি বাকি। এখন নিয়ে যাবে মানে?—রেগে ওঠে সন্দীপ।

তা কী করব? আমি তো বইটা তোমায় পড়তে বলিনি?—দেবু নির্বিকার।

এ্যাই দাও বলছি।—সন্দীপ এবার জোর করে দেবুর হাত থেকে বইটা কেড়ে নেবরা মতলবে এগোয়।

এ্যাই!—অমনি শিব মাঝখানে পড়ে বাধা দেয়।

সন্দীপ অসহায় চোখে চায়। দু'জনকে কাত করে বই ছিনিয়ে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া বাড়ির মধ্যে ঝুটোপুটি লাগলে বাবা এসে পড়বেন। তাকেই বকবেন। সে আবার গরম ছেড়ে নরম পন্থা নেয়। মিনতি জানায়,—উঃ বাকিটুকু না পড়লে মরে যাব ভাই।

দেবু গম্ভীর কণ্ঠে জানায়,—বাকিটুকু পড়াতে পারি তবে একটা শর্তে।

—কী?

—চন্দনার হয়ে তোমায় খেলতে হবে কালকের ম্যাচে।

—সেকী! আমি যে বলেছি খেলব না। কারও পক্ষেই।

—মোটেই খেলব না বলনি। বলেছিলে, ভেবে দেখব। পরে জানাব যদি খেলি। ভাবনাটা এখুনি ফাইনার করে ফ্যালো।

—কিন্তু খান্তপিসি?

—সে রিস্ক তো নিতেই হবে। নইলে আর বাকিটা পড়া হচ্ছে না।

দেবুর হাতে ধরা বইখানার দিকে লুব্ধ দৃষ্টি হেনে সন্দীপ বলল,—আচ্ছা ভাই, খুনটা কে করেছে?

দেবু বলল,—সেটা ডিটেকটিভ পুলক রায় আন্দাজ করেছে। এক্কেবারে শেষে ফাঁস করবে।

ওই মুখোশধারী কে?—সন্দীপের আকুল প্রশ্ন।

বলব না।—দেবুর সাফ জবাব : সেটাই আসল রহস্য।

শিব, তুই পড়েছিস বইটা?—এবার ঝুঁকি শিবের থেকে কিছু আদায়ের ধান্দা সন্দীপের।

দুঃখের বিষয়, শিব মাথা নাড়ে—'না'।

আর একবার বইটার পানে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে সন্দীপ মরিয়া কণ্ঠে বলে ওঠে,—ঠিক আছে। তোমাদের হয়েই খেলব। দাও বই।

দেবু বাঁকা হেসে মাথা নাড়ে,—এখন নয়। কাল ম্যাচের পরে পাবে।

—উঃ আজ রাতে যে ঘুম হবে না ভাই বাকিটুকু না জানলে।

একদিন ঘুম কম হলে কিছু এসে যায় না। পরদিন ডবল ঘুমিয়ে নিও।—দেবু বিন্দুমাত্র টলে না।

আচ্ছা, জুয়েলার অনন্তরামের মেয়ে শর্মিলাকে কি উদ্ধার করতে পারবে পুলক রায়?—সন্দীপের কৌতূহল বাধ মানে না।

সেটা জানতে পারবে কাল ম্যাচের পরেই। অবশ্য যদি বন্দনার হয়ে খেলো।—নির্বিকার দেবুর জবাব।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে নিরুপায় সন্দীপ বলল,—বেশ কাল যাবো খেলতে। কটায় খেলা?

দেবু বলল,—কাল নয়, আজই যেতে হবে। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা ফিরব। বিকেলের বাসে যাব। চন্দনার আগেই নেমে পড়ব। অন্ধকারে একটু ঘুরপথে গা ঢাকা দিয়ে ঢুকব গ্রামে। তারপর সোজা আমার বাসায়। আশা করি বেশি কারও নজরে পড়ব না। অবশ্য চন্দনা বা মথুরাপুরের খুব কম লোকই তোমার মুখ চেনে। যদিও নাম জানে অনেকেই। তোমার বাড়িতে বলে যেও, মাসির বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি। পরশু ফিরব।

তবে, দেবু আবার বলে : ম্যাচের আগে মাসির সঙ্গে দেখা করা চলবে না। ততক্ষণ অবধি লুকিয়ে থাকতে হবে আমার বাড়িতে। মাসি টের পাবেন না যে তুমি এসেছ। ম্যাচের পরে যেখানে খুশি যেতে পার, থাকতে পার।

সন্দীপ কথা বলে না। উদ্বিগ্ন মুখে শোনে।

দেবু বলল,—ঘাবড়িও না। আমার বাড়িতে তোফা থাকবে। তুমি আর আমি একটা আলাদা ঘরে শোব। তোমায় আলাদা বিছানা দেব। রাতে মুর্গি, মাছ যা খেতে চাও। বাড়িতে দুটোরই অর্ডার দিয়ে এসেছি। ইচ্ছে হলে দুই-ই খাবে। এখন আমরা যাচ্ছি। বিকেল চারটে নাগাদ আসব তৈরি থেকো। নিশীথের আতঙ্ক বগলদাবা করে গটগটিয়ে বেরিয়ে যায় দেবু। শিব সঙ্গ ধরে।

ছয়

বেলা তিনটের সময় শান্তিময়ী চ্যালেঞ্জ কাপের ম্যাচ। ঘণ্টা দুই আগে থেকেই ভাগাড়ের মাঠে দর্শক জমতে শুরু করল। শুধু চন্দনা বা মথুরাপুর নয়, আশেপাশের বহু গ্রাম থেকে লোক আসছে। মাঠের ধারে অশ্বত্থ গাছটার ডালে ডালে ছেলের দল বসে যায় গ্যালারি অধিকার

করে। এবার ম্যাচটা যে খুব জমবে সে বর রটে গেছে। চন্দনা ও মথুরাপুরের সাপোর্টাররা দাঁড়ায় দু পাশে মুখোমুখি।

দুটো নাগাদ এসে পড়লেন রেফারি শের খাঁ সদলবলে। এসে পড়েন স্থানীয় পঞ্চায়েত সভাপতি শশাঙ্ক পাল। আজ তিনিই পুরস্কার বিতরণ করবেন। বিজয়ী দল পাবে শান্তিময়ী চ্যালেঞ্জ কাপ এবং দু দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে দেওয়া হবে একটি করে ফুলের তোড়া।

দুঃখের বিষয় বগলাবাবু জানিয়েছেন যে তিনি এবার আসতে পারবেন না। হয়তো মাঠে হাঙ্গামার আশঙ্কায়।

খেলার মিনিট পনেরো আগে দু দলের খেলোয়াড়রা মাঠে নেমে পড়ে। যারা খেলবে এবং আরও কিছু বাড়তি প্লেয়ার। খেলোয়াড়রা দৌড়ঝাঁপ, অল্পস্বল্প এক্সারসাইজ করে গা গরম করতে থাকে। গোলে স্যুটিং প্র্যাকটিস চলে। চন্দনার ছেলে বাবুকে গোলকিপার দেখে মথুরাপুরের লোক দাঁত বের করে হাসে।

চন্দনার জার্সি গায়ে দু'জন খেলোয়াড়কে দেখে বেশ অবাক হয় মথুরাপুর স্পোর্টিংয়ের কর্মকর্তারা। চন্দনা কাকে কাকে হায়ার করছে তার নাড়িনক্ষত্র খবর রেখেছে মথুরাপুর। কিন্তু এ দুজন কোত্থেকে? জানাজানি হয় যে এরা সদ্য বিবাহিত ডাক্তার হাবলুর শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে আত্মীয় এবং কলকাতার ফার্স্ট ডিভিশনে খেলে।

ঐ তিন-চারজন বাদে চন্দনা গ্রামের বাকি লোকও অবাক হয়। এবং যে হাবলুর শ্যালক এবেং ভাল প্লেয়ার কেউ জানতে পারেনি। ভেবেছিল হাবলুর বন্ধু বেড়াতে এসেছে।

প্লেয়াররা মাঠে নামার কয়েক মিনিট বাদেই দুই লাইন্সম্যানসহ শের খাঁ প্রবেশ করলেন গ্রাউন্ডে। তাঁর পোশাক যথারীতি একই। আজ আবার কোমরে ঝুলছে পিস্তরের খাপটা। লাইন্সম্যান দুজনও বেশ গাঁট্টাগোট্টা। তাদের পরনে কালো হাফ সার্ট, কালো হাফ-প্যান্ট, কেডস্ জুতো ও মোজা। হাতে সাদা ফ্ল্যাগ। তিনজনেরই হাঁটাচলা ধরনধারণ রীতিমত গাম্ভীর্যপূর্ণ। দেখলেই সমীহ হয়।

শের খাঁ লাইন্সম্যানদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে মাঠ দেখলেন। গোলের নেট এবং মাঠের দাগগুলো পরীক্ষা করলেন। তারপর মাঠের মাঝামাঝি বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে হাতে রিস্ট-ওয়াচের ওপর নজর রেখে অপেক্ষায় রইলেন।' তিনটে বাজার পাঁচ-মিনিট বাকি থাকতে একবার তিনি কান ফাটানো হুইসিল বাজিয়ে হিন্দীতে নির্দেশ দিলেন—যারা খেলবে, তারা ছাড়া সবাই বেরিয়ে যাও গ্রাউন্ড ছেড়ে।

এক্সট্রা প্লেয়ারা গুটিগুটি বেরুতে থাকে। এবার দু'দলের খেলোয়াড়দের মুখোমুখি সার বেঁধে দাঁড়াতে বললেন রেফারি। এমন সময় চন্দনার জার্সি গায়ে একজন দৌড়ে মাঠে ঢুকল।

তাকে দেখেই চমকে উঠলেন মথুরাপুরের নিমাই মান্না। আরে, বোলপুরের সন্দীপ যে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাঠে ঢুকলেন সন্দীপকে বের করে আনতে।

শের খাঁ সন্দীপের গায়ে জার্সি দেখে তাকে কিছু বললেন না কিন্তু নিমাই মান্নাকে লক্ষ্য করে হুংকার ছাড়লেন,—আভি ঘুসো মৎ। নিকালো।

সেই প্রচণ্ড দাবড়ানি খেয়ে থমকে গেলেন মান্নামশাই। মুখ কালো করে ফিরে চললেন সাইড লাইনে। সন্দীপ গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল চন্দনার প্লেয়ারদের সঙ্গে।

শের খাঁ দু দলের খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে ইংরেজি ও হিন্দীতে কিছু উপদেশ দান করলেন। যেমন—মাঠে পারফেক্ট ডিসিপ্লিন চাই। ফুটবল, স্পোর্টসম্যানের খেলা ইত্যাদি। অতঃপর হুকুম দিলেন,—নাউ টেক ইওর পজিশন।

খেলা শুরুর আগে একটা অবজেক্শন দিল মথুরাপুর। কারণ, চন্দনার রতিয়া একটা ভয়ংকরদর্শন খেঁকি নেড়িকুত্তাকে চেনে বেঁধে এনে মথুরাপুরের গোল পোস্টের পাশে দাঁড়িয়েছে। ও কি করে জেনে ফেলেছে যে মথুরাপুরের গোলকিপারের বেজায় কুকুরে ভয়। কারণ, তাকে নাকি একবার কুকুরে কামড়েছিল এবং ফলে ইনজেকশন নিতে হয়েছিল। পোস্টের পাশে কুকুর দেখা মাত্র সিঁটিয়ে গেছে বেচারি।

রেফারি হুকুমে সেই কুকুর হটানো হল।

যদি কুকুর ডাকি, ওদের গোলের পিছন থেকে?—দুষ্ট রতিয়া দেবুর পরামর্শ চায়।

—ডাক্। তাতে আপত্তি করতে পারে না, দেবুর পরামর্শ ওদের গোলি ঠিক বল ধরার মুখে ডাকবি চমকে দিয়ে বল ফসকাতে পারে।

খেলা শুরু হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল চিৎকারে ফেটে পড়ল মাঠ।

প্রচণ্ড হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। দু দল সমান লড়ছে। তবে শিব লক্ষ্য করে সন্দীপ আজ যেন তেমন ফর্মে নেই। ওর সেই ডিফেন্স চিরে হঠাৎ হঠাৎ তীব্র গতি দৌড় কই? বল রিসিভ করতে বারবার ফসকাচ্ছে। অথচ কি চমৎকার ওর বল কন্ট্রোল দেখেছে। সন্দীপ একটি মাত্র শট নিতে পারল মথুরাপুরের গোল লক্ষ্য করে কিন্তু সেটাও বেরিয়ে গেল পোস্টের অনেক বাইরে দিয়ে। ওর কি মন নেই খেলায়? বইয়ের লোভে অনিচ্ছার সঙ্গে খেলছে, তাই? মনটা হয়তো পড়ে আছে সেই গল্পে।

হাফ-টাইমের বাঁশি বাজল। ম্যাচে তখনো গোলশূন্য ড্র। দু পক্ষে কেউই অন্যের গোলে একটও জুতসই কিক্ নিতে পারেনি। হাবলুর দুই শ্যালক চমৎকার খেলছে। তবে তারা দুজনেই ডিফেন্সের প্লেয়ার। তাদের জন্যই চন্দনার বাবুকে একটাও কঠিন শট রুখতে হয়নি।

হাফ টাইমে সন্দীপ মাঠে মাথা নিচু করে বসে লেবু চুষছে। নিমাই মান্না তার কাছে এসে কড়া গলায় বললেন,—সন্দীপ, এটা কেমন হল?

সন্দীপ মাথা তোলে না।

এরপরেই নিমাইবাবুর খেয়াল হয় যে কাছেই দাঁড়িয়ে শের খাঁ, হাতে শরবতের গ্লাস, ঘাড় বেঁকিয়ে চোখ পাকিয়ে দেখছে তাকে। আর ধমকাতে সাহস হল না। নিমাই মান্না সভয়ে সরে পড়লেন।

দেবু এসে বসল সন্দীপের পাশে। নিচু স্বরে কি জানি বলল ওকে। সন্দীপ খাড়া হয়ে বসে। দেবু উঠে চলে গেল মাঠের বাইরে। এ সমস্তই লক্ষ্য করে শিব।

হাফ টাইমের পর সন্দীপ যেন জ্বলে উঠল। তেড়েফুঁড়ে খেলতে লাগল। তাকে আটকাতে হিমশিম খেতে লাগল মথুরাপুর। তবু সন্দীপ গোল করে বসল। দুর্দান্ত এক ভলিতে। শেষ পর্যন্ত সন্দীপের দেওয়া গোলেই চন্দনা ম্যাচ জিতল এক শূন্য গোলে।

ম্যাচ শেষে চন্দনার সাপোর্টারদের অভিনন্দন, করমর্দন, আলিঙ্গনের প্লাবন থেকে নিজেকে কোনও রকম ছাড়িয়ে নিয়ে সন্দীপ এসে দেবুকে ধরল,—ওবার বই দাও।

দেবু বলল,—এখুনি পড়বে না প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের পর?

—এখুনি।

বেশ।

—সে শিবকে বলল : সন্দীপকে নিয়ে আমার বাড়ি যাচ্ছি। প্রাইজ দেবার ব্যবস্থা রেডি হলে আমাদের ডাক দিস।

দেবু ও সন্দীপ কয়েক পা এগিয়েছে এমন সময় তাদের সামনে পড়ল হাবলুদার দুই শ্যালক প্লেয়ার। তারা সন্দীপের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল,—চমৎকার খেলেছ ভাই, দারুণ গোল।

ভবিষ্যতে বড় ক্লাবে খেলার ইচ্ছে থাকলে কলকাতায় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ কোরো বুঝলে।

সন্দীপ ফ্যাকাসে হেসে বলল,—আচ্ছা।

এমন লোভনীয় অফারে ছেলেটি তেমন উৎসাহ দেখাল না দেখে কলকতার প্লেয়াররা একটু ক্ষুণ্ণ হয়। তাদের ভাব বুঝে দেবু সামাল দেয়,—নিশ্চয়ই যোগাযোগ করবে। এ তো সৌভাগ্য। ওর পরীক্ষাটা হয়ে যাক।

চল।—ইতিমধ্যে দেবুর জামা ধরে টান মেরেছে সন্দীপ। তার আর তার সইছে না।

হ্যাঁ যাই। আচ্ছা আমরা একটু আসছি।—দেবু বিদায় নিয়ে দৌড় মারে। পিছু পিছু সন্দীপ।

ওদের কিসের এত তাড়া। অবাক হয় এরিয়ানের দুই খেলোয়াড়।

এবার প্রাইজ দেবে চল্।—আধঘণ্টাটাক বাদে সজোরে সাইকেল চলিয়ে এসে দেবুর বাড়ির দরজায় নেমে হাঁক দিয়ে শিব দেখল বারান্দায় দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়য়ে বসে সন্দীপ, ঘাড় গুঁজে পড়ছে সেই বইটা। পরনে পুরো খেলার পোশাক। হাত মুখও ধোয়নি।

সন্দীপ এককবার মাত্র মাথা তুলে বলল, এক মিনিট। আর দুটো পাতা বাকি।

ফের সে ডুব দিল বইয়ে।

শিবের গলা পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে দেবু। এককটা দুরন্ত কৌতূহল ছটফট করছিল নিজের মনে।'সে দেবুকে খানিক তফাতে নিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল,—হ্যাঁরে, হাফ টাইমের সময় সন্দীপকে কী বলছিলি?

মাত্র দুটো বক্তব্য।—দেবু মিচকে হেসে জানায় : এক নম্বর—গোল দিতে পারলে ওকে এমন বই আরও একখানা পড়াব। সেটা আরও টেরিফিক। দুই—খান্ত পিসিকে ম্যানেজ করে দিয়েছি। সন্দীপের নাম করে হাইক্লাস এক কৌটো জর্দা উপহার দিয়ে। সন্দীপ যে দিকেই খেলুক পিসি আর কিছু বলবে না। দেখলি তো শুনেই কেমন চাঙা হয়ে উঠল সন্দীপ। খেলা খুলে গেল।

অমন জর্দা পেলি কোথায়?

—হাবলুদা এনেছেন। বলে দিয়েছিলাম আনতে। অতি উত্তম কাশীর জর্দা। খবর

পেয়েছিলাম যে খান্ত পিসি পান খায় এবং জর্দাখোর। আজ সকালে রতিয়ার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম প্রেজেন্ট। পিসি শুনলাম, ড্যাম প্ল্যাড। রতিয়া বলল, খানিক বাদেই মথুরাপুরের একজন খান্ত পিসির কাছে যেই নালিশ করেছে যে সন্দীপ কেন খেলল না মথুরাপুরের হয়ে অমনি পিসি তাকে যা কথা শুনিয়ে দিয়েছেন, আমার ভাইপো যার হয়ে খুশি কেলবে। ওকি কারও গোলাম। এইসব।

ওফ্।—বই শেষ করে ভারমুক্ত পরম তৃপ্তির একটা আওয়াজ ছেড়ে গা এলিয়ে দেয় সন্দীপ। তারপরেই তড়াক করে উঠে দেবুর হাতে বইখানা দিয়ে বলল,—আরেকটা কবে দেবে? গোল দিয়েছি যে।

দেব। নিশ্চয়ই দেবে।—দেবুর আশ্বাস : কালই তুমি যাবার সময় পাবে। দু-তিন দিন পরে নিয়ে আসব ফেরত।

বাইরে তখন চন্দনার বিজয় উৎসবে দমাদম্ পটকা ফাটছে।

উপকারের ফ্যাসাদ

এক

ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে চন্দনা গ্রাম।

গরমকালে এক নিরালা দুপুর।

দেবু দোতলায় তার নিজের ছোট্ট ঘরে বিছানায় শুয়ে একখানা ডিটেকটিভ বই গিলছিল।

ঘরের ভেজানো দরজা খোলার শব্দ হল। দেবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, শিব ঢুকছে। সে না উঠেই মুখে বলল,— বোস। এই চ্যাপটারটা শেষ করেনি। উঃ যা জমেছে। সে আবার চোখ নামায় বইয়ের পাতায়। পড়তে পড়তেই পাশে রাখা হজমগুলির শিশিটা শিবের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, — নে খা।

কয়েক মিনিট কেটেছে। দেবু তখনো গল্পে তন্ময়। খাটের পাশে চেয়ারে বসা শিব ফোঁস করে সজোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে নিজের মনেই বলে উঠল,— বৃথা। বৃথা এই জীবনটা।

দেবুর তরফে কোনো সাড়া মিলল না। ডিটেকটিভ পঞ্চু তরফদার কি পারবে অন্ধকূপে বন্দি অসহায় কিশোরী কাঞ্চনকে রক্ষা করতে? সেই মারাত্মক উৎকণ্ঠায় সে তখন ডুবে রয়েছে।

কী লাভ? কী লাভ এভাবে জীবনটাকে কাটিয়ে? আমরা স্বার্থপর। বুঝলি, আমরা ঘোর স্বার্থপর। শুধু নিজেরটুকু বুঝি।— শিব ফের একটু জোরে জোরেই বলে।

হুঁ। — দেবু বই থেকে চোখ না সরিয়ে আনমনাভাবে সায় দেয়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই। — এবার শিবের কণ্ঠ আর পর্দা চড়ে : এই যে চারপাশে এত দুঃখ, এত কষ্ট, কত লোকের সমস্যা — আমরা তাই নিয়ে কতটুকু ভাবি? কতটুকু সাহায্য করি এদের? শুধু নিজেরটা নিয়েই আছি। আমরা, আমরা বোগাস্। এরকম জীবন কাটানোর চেয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া ঢের ভালো।

হুঁ।— দেবু আবার সায় দেয়। তবে মনে তার শিবের কোনো কথাই ঢোকেনি। কারণ পঞ্চু তরফদার তখন দেয়াল আঁকড়ে আঁকড়ে আপ্রাণ চেষ্টায় অনেক উঁচুতে ছোট্ট একটা খোলা জানলার কাছে পৌঁছে দেখতে পেয়েছে ভিতরে বন্দি কাঞ্চনকে। গরাদ ভাঙছে। এরপর সে দড়ি নামিয়ে দেবে কাঞ্চনের কাছে। তাকে টেনে তুলবে। কিন্তু হাতে যে আর মাত্র আধঘণ্টা সময়। ডিটেকটিভ জানে না তা। আধঘণ্টা বাদে চুরমার হয়ে যাবে এই পোড়ো বাড়িটা। টাইম

বোমা ফিট করা আছে ওই ঘরে। আর মাত্র আধ পাতা বাকি আছে সেই নিদারুণ অবস্থার পরিণতি কী হবে জানতে। এখন কি অন্য দিকে মন দেওয়া যায়?

হ্যাঁ। আমি সন্ন্যাসীই হয়ে যাব। চাপা গর্জন ছাড়ে শিব।

দেবু ধড়মড় করে খাড়া হয়ে বসে। হৃদয় প্রফুল্ল ফুরফুরে। শ্রীমতী কাঞ্চনমালা রক্ষা পেয়েছে। বিস্ফোরণের মাত্র তিন মিনিট আগে বেরিয়ে পালিয়েছে তারা। শয়তান ক্রিমিনাল রক্তপাঞ্জাব চক্রান্ত এবারও ব্যর্থ করেছে ডিটেকটিভ তরফদার। হালকা সুরে দেবু বলল,— অ্যাঁ সন্ন্যাসীর কথা কী বলছিলি?

বলছিলাম আমি সন্ন্যাস নেব ভাবছি। শিব ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

মহা বিস্ময়ে দেবু বলে, — কেন? হঠাৎ কী হল?

— নইলে কি এই স্বার্থপর জীবন কাটাব চিরটা কাল? দিব্যি খাচ্ছিদাচ্চি, খেলছি, ফূর্তি করছি। এই কি আদর্শ জীবন? পরের জন্য কতটুকু সাহায্যে হাত বাড়াচ্ছি? বরং সন্ন্যাস নিয়ে সেবাধর্মে ঝাঁপিয়ে পড়লে একটা কাজের কাজ হবে।

দেবু চোখ ছোট করে বলল, — এসব তোকে কে বোঝাল?

শিব বলল,— কেউ বোঝায়নি। একটা লেকচার শুনলাম আজ। তাই থেকে মনে হল।

— লেকচার? কোথায় শুনলি?

— লাভপুর টাউন ক্লাবে হলে। স্বামী পরহিতানন্দ বক্তৃতা দিলেন। একটা কাজে গিয়েছিলাম লাভপুরে। ঢুকে পড়লাম শুনতে।

স্বামী কি নন্দ। — ভুরু কুঁচকোয় দেবু।

— পরহিতানন্দ। কী সুন্দর চেহারা, গমগমে গলা! গেরুয়া আলখাল্লা পরা। মাথায় গেরুয়া পাগড়ি। খুব পণ্ডিত লোক। হরিদ্বারে ওর আশ্রম আছে। ওনার আর ওঁর শিষ্যদের জীবনের আদর্শ পরের সেবা করা।

হুম্। দেবু গম্ভীর ভাবে বলে : — তা স্বামীজি কী বললেন? সেবা করার জন্য সন্ন্যাস নিতে?

না, — তা বলেননি। উনি বলেছেন সব মানুষেরই উচিত চেষ্টা করা কীভাবে অন্যের কিছু উপকার করা যায়। তা সন্ন্যাসী হয়ে করা যায়। আবার সংসারে থেকে, মানে পড়াশুনো, খেলাধুলা, কাজকম্ম করতে করতে করা যায়। এই সেবাধর্মের ভিতর দিয়েই আমাদের আত্মার উন্নতি হয়। হৃদয়ে প্রকৃত সুখ শান্তি লাভ করে। মানবজন্ম সার্থক হয়।

দেবু বলল, — তা তো ঠিকই। এইজন্যেই তো আমাদের চন্দনা স্পোর্টিং ক্লাবে একটা সেবা বিভাগ করা হয়েছে। আমরা ভলেন্টিয়ারি করি মেলায়, পুজোয়, বন্যার সময়। গরিবদের জন্যে টাকাকড়ি কাপড় জামা জোগাড় করে বিলোই। সত্যি ভাই এ কাজে আনন্দ আছে। মন ভরে যায়। এবার আমরা গ্রামের মেন রোডটা সারিয়ে ফেলব। উঁচু করে দেব। বর্ষায় জল জমে। কাদা হয়। গাঁয়ের লোক খুব খুশি হবে। অনেকে রাস্তাটা ঠিক করতে রিকোয়েস্ট করছে ক্লাবকে।

না না, — শিব ঘাড় নাড়ে : ওভাবে নয়। লোকে সাহায্যের জন্য রিকোয়েস্ট করল। তখন ঢাকঢোল পিটিয়ে উপকারে নামব। তাতে সেবাধর্মের মূল্য কমে যায়। স্বামীজি বলেছেন, সজাগ থাকবে, খেয়াল করবে তোমার চারপাশে, কার কী সাহায্য দরকার। না চাইলেও এগিয়ে

যাবে নিজে থেকে। এগিয়ে দেবে সাহায্যের হাত। যতটুকু পারো করবে উপকার। সবাই তো আর মুখ ফুটে তাদের দুঃখকষ্টের কথা বলতে পারে না। বেশির ভাগেরই সংকোচ থাকে কোনোই সাহায্য চাইতে।

শিব বেশ আবেগে বলে চলে। দেবু বুঝল, শিব স্বামীজির বক্তৃতাখানা বেশ ভালোই হজম করেছে। ভাষাটাও নিশ্চয়ই স্বামীজির।

শিব বলল, — জানিস দেবু, স্বামীজি আরও কী বলেছেন?

— কী?

— বলেছেন উপকার করে নিজেকে জাহির করবে না। যতটা সম্ভব আড়ালে রাখবে নিজেকে। নইলে উপকার যে পায় তার ঋণের ভার পীড়া দেবে। সংকুচিত বোধ করে। উপকারের ঋণ শোধ করার চেষ্টা করে প্রাণপণে। তাতে তোমার সেবাকর্মের সার্থকতা কমে যাবে। চেষ্টা করবে, তোমার ডান হাতের দান যেন বাঁ হাত অবধি টের না পায়।

দেবু খানিক চিন্তিতভাবে বলল,— তা উচিত কথাই বলেছেন স্বামীজি। তবে একটা অসুবিধা হতে পারে।

— কী অসুবিধে?

— মানে এই যেচে গায়ে পড়ে উপকার করতে যাওয়ায় কিন্তু বিপদ আছে। মানে সাধারণ মানুষ তো সন্দেহবাতিক। যেচে উপকার আর কে কার করে? তাই করতে গেলে লোকে হয়তো অন্য ভাবে নেবে, উল্টো ভাববে। ভাবতে পারে নিঃস্বার্থ উপকার নয়। অন্য মতলব আছে কিছু। সন্ন্যাসীদের কেস ছেড়ে দে। তাদের লোকে অন্য চোখে দেখে। কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ মানুষের বেলায় উদ্দেশ্যটা না ভুল বুঝে যদি সন্দেহ করে আর কিছু?

শিব একগাল হেসে জানাল, — একথাটাও বলেছেন স্বামীজি। তিনি বলেছেন, যেচে উপকার করার চেষ্টা করলে অনেক সময় ভুল বুঝতে পারে লোকে। উপকারীর উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ করতে পারে। তবু দমবে না। চটে যাবে না। ক্ষোভ জমতে দেবে না মনে। চেষ্টা চালিয়ে যাবে। দিনে এভাবে একটি উপকারও যদি করতে পারো মানুষের, দেখবে হৃদয় ভরে উঠবে পরম তৃপ্তিতে।

হুম্। — দেবু আর এ-নিয়ে কথা বাড়ায় না। শুধু বলে : আমাদের সেবা বিভাগের কাজে তাহলে তুই যোগ দিবি না?

তা কেন দেব না? — শিব জানায়,— দেব বইকি। তবে আমি একা নিজে নিজেও চেষ্টা চালিয়ে যাব।

এই ফাঁকে শিব আর দেবুর পরিচয়টা একটু দিই। দুজনে পরম বন্ধু। এক গ্রামে থাকে। একই স্কুল, একই ক্লাসে পড়ে। ক্লাস নাইনে। শিব বেজায় ডানপিটে। খেলাধুলোয় ওস্তাদ। সহজ সরল রোখা স্বভাব।

দেবু পড়াশুনায় দারুণ। তবে সে গুডবয় মার্কা গোবেচারি মোটেই নয়।

দুই

পরদিনই পরোপকারের একটা সুযোগ মিলে গেল শিবের। গ্রামের ছুটি চলছে স্কুলে। সকাল ন'টা নাগাদ পড়া সেরে শিব বেরোল পথে। ইচ্ছে পুব পাড়ায় গিয়ে ডাংগুলি খেলবে।

ধীরে সুস্থে চলেছে শিব পেয়ারা চিবুতে চিবুতে।

হঠাৎ দেখে, একটা ডোবার ধারে ঝোপঝাড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে খ্যান্ত বুড়ি। বুড়ি উদ্বিগ্ন চোখে এদিক সেদিক তাকাচ্ছে আর বিড়বিড় করছে।

বুড়ি কী করছে ওখানে? কিছু খুঁজছে মনে হয়। কৌতূহলী শিব দাঁড়িয়ে পড়ে। নজর করে বুড়িকে।

খ্যান্ত বুড়ির শুকনো চেহারা। শনের মতন পাকা চুল। বড় গরিব। ভাঙাচোরা ভিটেটা আগলে বুড়ি পড়ে আছে গাঁয়ে। একা থাকে। স্বামী মারা গেছে অনেককাল। একটি মাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছে দূরে কোনো গ্রামে। কখনো কখনো সে মাকে দেখে যায়। দু-তিন দিন থাকে মায়ের কাছে। ব্যস্। আর বুড়ির তিনকুলে কেউ নেই বোধহয়। খ্যান্ত বুড়ি বাড়ি বাড়ি কাজ করে পেট চালায়।

তাবলে খ্যান্ত বুড়ি নেহাত গোবেচারি নয়। খুব মুখরা। এখনো খাটতেও পারে বেশ। শিবের বাড়ি খ্যান্ত ধান ভাঙতে যায়। ছোটবেলা থেকে তাকে চেনে শিব। মাঝে মাঝে চিঁড়ে মুড়ির মোয়া খাইয়েছে শিবকে।

এমন সময় তো খ্যান্ত পিসির বনবাদাড়ে ঘোরার কথা নয়। এখন সে কাজে যায়। শিব খানিক দেখে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, — পিসি কিছু খুঁজছ নাকি?

হ্যাঁ গো— জবাব দেয় খ্যান্ত : পটল যে কোথায় গেল! কত খুঁজছি।

— কে পটল?

— পটল গো, আমার কমলির ছেলে।

ওঃ হো! — এবার বুঝতে পারে শিব। কমলি হচ্ছে খ্যান্তর পেয়ারের ছাগল। খ্যান্ত যে সব বাড়িতে কাজ করতে যায় অনেক সময় সঙ্গে নিয়ে যায় কমলিকে। বেঁধে রাখে সেই বাড়ির কাছে। তরকারির খোসা খাওয়ায় ছাগলকে। মাস ছয়েক হল কমলির একটি ছানা হয়েছে। তারই নাম বুঝি পটল। শিব দেখেছে পটলকে। দিব্যি নধর কালো কুচকুচে লম্বকর্ণ একটি। ছানা হওয়ার পর বুড়ি আর কমলিকে সঙ্গে নিয়ে কাজে বেরয় না। দুটোকেই রেখে আসে।

কমলি রয়েছে? — জিজ্ঞেস করে শিব।

— ছাড়া ছিল বুঝি?

— হ্যাঁ। সক্কালে উঠে ছেড়ে দিই। ঘুরে ঘুরে ঘাস-পাতা খায় দুজনে। একটু বেলা বাড়লে কাজে বেরুবার আগে ডাকি। ঠিক তখনি চলে আসে দুটোয়। আশেপাশেই থাকে। জল রেখে কচি পাতা মুছে ধরিয়ে উঠোনে বেঁধে রেখে আসি ওদের লম্বা দড়ি দিয়ে। ফের খুলি কাজ থেকে ফিরে বিকেল বেলা। তা আজ কত ডাকলাম। কমলি এল, কিন্তু পটলটার দেখা নেই। ভাবনা হচ্ছে, গেল কোথা? দুষ্টু লোকের তো অভাব নেই দেশে। অমন তেল চিকন কচি পাঁঠা।

সত্যি কেউ চুরি করেছে? পালিয়ে যায়নি তো? — শিব জানতে চায়।

— তা বাপু কথাটা উড়িয়ে দিতে পারচি না। ইদানীং উনি লায়েক হয়েছেন। মায়ের সঙ্গ ছেড়ে ইদিক সিদিক ঘোরেন। গত দিনও খুব দেরি করে এসেছিল অনেক ডাকাডাকির পর। তাইতো খুঁজছি হেথাহোথা। দেরি হয়ে যাচ্ছে। কাজে যাই।

তোমার পটলের কপালে সাদা তিলকের মতো দাগ আছে তাই না? — শিব জিজ্ঞেস করে।

হাঁ গো। আর চারটে পায়ে খুরের ওপর একগোঁজ করে সাদা ছোপ। ভারি সোন্দর দেখায়। — বুড়ি জবাব দেয়।

শিবের আর সেদিন খেলতে যাওয়া হয় না।

এই তো একটা সুযোগ মিলেছে। খ্যান্ত পিসির ছাগলটা খুঁজে দেওয়া যাক। আহা, একা অসহায় বুড়ি মানুষ।

শিবও পটলের সন্ধান শুরু করে।

ঘুরে ঘুরে শিব পুকুর পাড়ে, ঝোপের ঝাড়ে, গেরস্থের বাগানে উঁকি মারতে থাকে। শাক পাতা ঘাসের লোভেই ঘুরবে পটল। আচ্ছা ছাগলে কোন্ কোন্ শাক বেশি পছন্দ করে? কোন্ ধরনের ঘাস? গাঁয়ে এতগুলো পকুর, এত বাগান, এত ঝোপঝাড় — সবখানে কি খুঁটিয়ে খোঁজা সম্ভব?

ঠিক ধারণা নেই শিবের। পথে ভুবন সরকারকে পেয়ে শিব শুধাল তাই, জ্যাঠা — ছাগলে কী কী ঘাস পাতা বেশি পছন্দ করে খেতে?

ভুবন সরকার কৃপা করে হেসে বললেন,— তা বাবা তোমরা আধুনিক শিক্ষিত ছেলে। ইস্কুলে সেই গ্রাম্য প্রবাদটা শেখায়নি বুঝি : তা শেখাবে কেন? এখন কত শক্ত শক্ত ব্যাপার চাঁদে যাওয়া, অ্যাটম বম্ব বানানো, হুঁ!

শিব ভারি অপ্রস্তুতভাবে হাত কচলিয়ে ঘাড় নাড়ে।

ভুবন সরকার সুর করে বলে ওঠেন,— ছাগলে কি না খায়! শুনেচ কথাটা?

আজ্ঞে শুনেচি — শিব থ : সব খায় বুঝি?

আরে না না, ওটা কথার কথা। তাবলে কি আর নিম পাতা, টগর পাতা, বিছুটি পাতা, — এসব খায়। তেতো কষা বিষাক্ত মোটেই খায় না ছাগল। তবে বেশিরভাগ ঘাস পাতাই তার খাদ্য। বুঝেচ?

হু! — শিব আর কথা না বাড়িয়ে সরে পড়ে।

এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতে শিব নিজের পাড়া ছাড়িয়ে অন্য পাড়ায় হাজির হয়।

— কোথাও ছাগল দেখলেই সে দ্রুত পায়ে গিয়ে নজর করছে শ্রীমান পটল কিনা? পাঁচিল ঘেরা বাড়ির উঠোনেও উঁকি দিতেও ছাড়ে না। আর ছাগলের ব্যা ব্যা শুনলেই একেবারে কাঠ। কণ্ঠের মালিককে না দর্শন করে ছাড়ে না। যদি কেউ আটকে রাখে পটলকে। কয়েকবার বন্ধ দরজা ঠেলে অকারণে ভিতরে উঁকি মেরেই বেকায়দায় পড়ে গেল। প্রশ্ন হল — কী চাই?

না মানে, আমাদের কুকুর ছানাটা! আমতা আমতা করে কেটে পড়ে শিব।

একবার ফস্ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল— আজ্ঞে। আমাদের ছাগলটা খুঁজছি।

অ্যাঁ, কী ভেবেছিস, তোদের ছাগল চুরি করেছি? আচ্ছা আস্পর্ধা তো! তুই কোন বাড়ির

ছেলে রে? — পুরু চশমা চোখে তিরিক্ষি মেজাজ বৃদ্ধ কানু ঘোষের নজর থেকে দৌড়ে পালায় শিব। ভাগ্যি চিনতে পারেনি!

— এই তো পেয়েচি! কুচকুচে কালো। কপালে সাদা তিলক। একজনের বেড়ার ধারে চরছে কচি পাঁঠাটি।

শিব তিনলাফে গিয়ে ধরল তাকে। বাপ্‌রে, অ্যাদ্দুর এসেছে! আরে, এর গলায় যে ঘুঙুর বাঁধা। খ্যান্ত বুড়ি বলেনি তো ঘুঙুরের কথা!

অ্যাই কী হচ্ছে? — ভারি গলায় হাক শুনে শিব দেখে যে মোটামতন এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক।

আজ্ঞে আমাদের এই পাঁঠাটা। — শিব জবাব দেয়।

— এটা তোমাদের পাঁঠা?

— আজ্ঞে।

ঠিক দেখেচ? — ভদ্রলোক হুংকার দেয়।

থতমত খেয়ে শিব বলে, — আজ্ঞে তাই। এই যে কালো রং। কপালে সাদা দাগ। আর — বলতে বলতে পাঁঠাটির পায়ের দিকে নজর করে চমকায় শিব। চার খুরের ওপর সাদা কই? সে বিষম ঘাবড়ে গিয়ে বলল,— আজ্ঞে না, ভুল হয়েছে। প্রায় সেইটের মতন দেখতে।

বটে! ভুল হয়েছে! দেখে ফেললাম বলে ভুলটা স্বীকার করা হল — নইলে নিজের বলে গায়েব করতে না। বলতে বলতে ভদ্রলোক এগোতে থাকেন। অমনি শিব পাঁঠা ছেড়ে পেছোতে থাকে। লোকটির অভিসন্ধি সন্দেহজনক। মারবে টারবে নাকি?

মোটা ভদ্রলোক গর্জন ছাড়লেন, — বাড়ি কোন্ পাড়ায়?

— আজ্ঞে পশ্চিম পাড়া।

— বাপের নাম কী?

— আজ্ঞে হরিধন রক্ষিত।

— তোমার নাম?

— আজ্ঞে নাড়ু।

পাড়া, বাপের নাম, নিজের নাম সবই বেবাক গুল। পশ্চিম পাড়ায় এক হরিধন রক্ষিত আছেন বটে। তবে তাঁর ছেলেই নেই। বাড়িতে যদি রিপোর্ট করে কী ঝঞ্ঝাট বাঁধবে কে জানে? সত্যি বলে কি ফ্যাসাদে পড়ব?

— যাও ভাগো। এ পাড়ায় ফের যদি দেখি, যাব তোমার বাবার কাছে। এই বয়সে চোর হয়েচ! একেবারে পাঁঠা চুরি!

লোকটির কথাগুলো গরম সিসের মতো কানে ঢুকে মাথায় অপমানের জ্বালা ধরায়। কিন্তু প্রতিবাদ নিরর্থক। শিব পিছু ফিরে হাঁটা দেয়। মনে ক্ষোভ জাগে। হায়, এই কি সৎকাজের পুরস্কার?

তবু শিব হাল ছাড়ে না।

পঞ্চাননতলার মোড়ে শিব দেখল, বিল্টু, গজা আরও তিনটে ছেলে রকে বসে কথা বলছে। বিল্টু তাদের ক্লাসেই পড়ে। তবে ওর সঙ্গে তেমন ভাব নেই তার। ছেলেটা মহা ওস্তাদ। ওদের

কাছে একবার খোঁজ নেওয়া যাক পটলের মতন দেখতে কোনো পাঁঠাকে চরতে দেখেছে কিনা?

শিব কাছে যেতেই বিল্টুরা কথা থামিয়ে চুপ মেরে গেল।

শিব জিজ্ঞেস করল,— কীরে কী কচ্চিস?

এই গল্প করছি। — বিল্টু নীরস স্বরে জবাব দেয়।

ওই দলে সব চাইতে বয়সে ছোট খোকা হঠাৎ উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠল, — ফিস্টি করব। তাই প্ল্যান করছিলাম গো।

তুই থামবি? কেবল বকবক। দাবড়ে বিল্টু চুপ করিয়ে দেয় খোকাকে : চ চ ঢের কাজ আছে। বলে বিল্টু উঠে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও।

কী সলাপরামর্শ করছিল বেটারা? শিব খানিক ঘুরপথে গিয়ে খোকাকে তার বাড়ির কাছে ধরল।

— হ্যাঁরে তোদের ফিস্টি কবে?

কাল। — খোকা জবাব দেয়।

— তা আমাকে দেখে চুপ মেরে গেলি কেন?

আসলে বিল্টুদা তোমায় নিতে চায় না ফিস্টিতে। যদি আসতে চাও তাই বারণ করল বলতে। — খোকা কাঁচুমাচু ভাবে জানায়।

ও। — শিব ভাবে, আমার বয়ে গেছে হতভাগা বিল্টুর সঙ্গে ফিস্ট করতে। জিজ্ঞেস করে : তোরা ক'জন করছিস?

—আট জন।

— তোদের মেনু কী কী?

— স্রেফ ভাত আর মাংস।

— মাংস! বাঃ।

সস্তায় পাওয়া গেল কিনা পাঁঠাটা! বিল্টুদা আর গাবলুদা পাঁঠা দিচ্চে। বাকি আমরা চাল মশলা, আর সব।

বিল্টু গাবলু পাঁঠা দিচ্চে? শিব সচকিত। দুটোই ধুরন্ধর। অন্যের হাঁস মুরগি চুরি করে মাঝে মাঝে ফিস্ট করে শুনেছে। সুযোগ পেলেই অন্যের গাছের ফলফলারি চুরি করে। এবার কি পাঁঠা হাতিয়েছে? পটল ওদের খপ্পরে পড়েনি তো?

শিব খোকাকে প্রশ্ন করে, — ফিস্টের পাঁঠাটা আছে কোথায়?

—জগাই মুচির বাসায়। ওই কেটে কুটে দেবে। বদলে ছালটা নেবে।

— শিব সিধে চলল জগাইয়ের বাড়ি।

জগাই তখন বাড়ি ছিল না। জগাইয়ের বউ বলল, — পাঁঠা ওই তেঁতুলতলায় ঝুড়িতে আছে। আমি বাপ দেখাতে লারব। হুকুম নেই। উ নিজে এসে দেখাক।

ঝুপড়ির ভিতর থেকে মাঝে মাঝে একটা পাঁঠার ব্যা ব্যা ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।

এক ঘণ্টা অপেক্ষার পর জগাই ফিরল। সে শিবকে চিনত। বলল, — কী ব্যাপার, পাঁঠা দেখতে চাও কেন?

— মানে মাংস কুলোবে কি না দেখে যাই।

— তুমিও কি ফিস্টি পার্টিতে আছ?

— বলচে থাকতে। তবে একটা কাজ আছে। দেখি —

ঝুপড়ি থেকে পাঁঠা বের করল জগাই।

ধুত্তেরি! এ যে অন্য পাঁঠা। বেকার এতক্ষণ নষ্ট হল। বিরক্ত শিব বাড়ি ফেরে দুপুরে খেতে।

বিকেলে এদিক ওদিক পটলের সন্ধান করতে করতে শিব হাজির হল খ্যান্ত বুড়ির বাসায়।

খ্যান্ত তখন পরম যত্নে একটি কচি পাঁঠাকে কাঠাল পাতা খাওয়াচ্ছে। পাঁঠাটির চেহারা দেখে শিব বলল, — এ পটল বুঝি?

হ্যাঁ গো, — হেসে জানায় খ্যান্ত : বিকেলে বাসায় ফিরে দেখি শ্রীমান উঠোনে বসে।

— ও ছিল কোথায়?

তা কী করে জানব? ওর ভাষা তো বুঝি না। — নির্বিকার খ্যান্তর জবাব।

হতাশ শিব ফিরে আসে। এ কেসটা বৃথা গেল।

তিন

দুটো দিন শিবের আর পরোপকারের উৎসাহ রইল না। তারপর ফের গা ঝাড়া দিয়ে তৈরি হল। সুযোগও একটা মিলে গেল।

রবিবার সকাল।

শিবের মা অনেকক্ষণ ধরে তাড়া দিচ্ছেন, — ও ঠাকুরপো আর দেরি কোর না। ভালো জিনিস সব ফুরিয়ে যাবে যে।

ঠাকুরপো অর্থাৎ শিবের ছোটকাকার কিন্তু গরজ নেই। গড়িমসি করেই চলেছেন।

শিব দেখতে দেখতে বলল, — কাকার বুঝি হাটে যেতে ভাল লাগে না?

মা বললেন,— তা কী আর লাগে! চাকরিতে হপ্তায় একটা ছুটির দিন। হাটে গিয়ে সকালটা নষ্ট। কী করবে? তোর বাবার সময় হয় না। হপ্তায় অন্তত একদিন হাটে না গেলে চলে! গাঁয়ে আর কী পাওয়া যায়?

শিব ইতস্তত করে বলল— আমি যাব?

তুই? দূর, তুই পারবি নে। — মা তার প্রস্তাব উড়িয়ে দিলেন।

কথাটা শিবের কাকার কানে গিয়েছিল। তিনি লুফে নিলেন, — যাক না শিব। ওর বয়সে আমি কতবার হাট করেছি। ভালো ট্রেনিং হবে।

অগত্যা মা শিবকেই হাটে পাঠালেন। যা যা কিনতে হবে উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিলেন বারবার।

টাকা আর থলি নিয়ে শিব সাইকেল চড়ে রওনা দিল লাভপুরের হাটে।

মাইল দুই পথ।

মেঠো রাস্তা ধরে ধীরে সুস্থে সাইকেল চালাচ্ছে শিব। কিছু শিবের গ্রামের লোক, কিছু ভিন্ন গ্রামের লোকও চলেছে হাটের দিকে ওই পথে।

হাট আর আধমাইল বাকি। শিব লক্ষ করল সামনে একজন বয়স্ক টাকমাথা রোগামতন

অচেনা লোক চলেছে। তার পরনে খাটো ধুতি ও হাফ শার্ট। দু হাতে দুটো বড় বড় ভর্তি থলে। লোকটি খুব ধীরে ধীরে চলছে ঝুঁকে পড়ে। হাতের মাল নিশ্চয়ই বেশ ভারি। কারণ লোকটি একবার থামল হাতের বোঝা দুটো মাটিতে নামিয়ে। ফের রওনা দিল আস্তে আস্তে।

শিব ওই লোকটির কাছাকাছি গিয়ে বুঝল কোনো চাষি হবে। তেমনি রোদেপোড়া চেহারা। থলেতে কিছু নিয়ে যাচ্ছে হয়তো হাটে বেচতে। শিবে তার পাশে গিয়ে সাইকেল থেকে নামল।

সাইকেল ঠেলে পাশাপাশি যেতে যেতে শিব লোকটির পানে চেয়ে হেসে বলল, — দাদু হাটে যাচ্ছেন?

হুঁ। —খসখসে গলায় আওয়াজ বেরোয়।

— বইতে কষ্ট হচ্ছে বুঝি?

হঃ — চলতে চলতে বৃদ্ধ গলা থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ করে মাত্র।

শিব বলল, — আপনার থলি দুটো আমার সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে দিতে পারেন। একটু আরাম পাবেন। আমার কোনো কষ্ট হবে না। আর বোঝা তো বইবে সাইকেল। আমি হাটের মুখে আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।

শুনেই বৃদ্ধ খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল, — থাক, ঢের হয়েছে। এবার কাটো তো দিকি। আর উবগারে কাজ নেই।

শিব অবাক হয়ে বলল, — কেন দাদু, খারাপ কী বললাম?

বৃদ্ধ খিঁচিয়ে উঠল,— বলি আমায় কি বোঝা ঠাউরেচ?

ঠিক বুঝেচ থলেতে আম আছে। পাকা আম। ব্যস, গন্ধে গন্ধে হাজির। একবার আমি নিয়ে রওনা হলে আর তোমার দর্শন মিলবে? মতলব বুঝচি না ভেবেচ?

মর্মাহত শিব বলল, — ছি ছি, কী বলছেন দাদু?

— ঠিক বলচি। নিধিরামের মতো ঠকব ভেবেচ?

মানে? — শিব তো অবাক।

বৃদ্ধ ভেংচে ওঠেন, — ওঃ জান না বুঝি কিছু? এই গত হপ্তাতেই আমাদের গাঁয়ের নিধে হাট থেকে ফিরছিল একটা মস্ত পাকা কাঁঠাল কিনে। বাড়িতে গিয়ে খাবে। তা কোত্থেকে একটা চেনা ছোঁড়া সাইকেলে চেপে এসে বলল, কাকু বইতে কষ্ট হচ্ছে? তা দিন না আমার সাইকেলের ক্যারিয়ারে চাপিয়ে। সামনে মদনের দোকানে আপনার নাম করে রেখে যাব। মাইল টাক একটু আরামে হাঁটুন।

তা নিধে সরল বিশ্বাসে ছোঁড়ার সাইকেলে তুলে দিল কাঁঠালটা। ছেলেটা নিধিরামের নামধাম জেনে নিয়ে সাইকেলে চেপে এগিয়ে গেল। ব্যস, সেই যে গেল তো গেল। না সেই ছোঁড়া, না তার কাঁঠাল! কারও আর পাত্তাই পেল না নিধে।

শিব বেগতিক বুঝে সাইকেলে উঠে পড়ল। মরুকগে বুড়ো থলি বয়ে।

হাটে দু চারটে টুকিটাকি জিনিস কেনার পর একটা হইচই। শিব দেখল, ইয়া এক ষাঁড়, লোকজনের মাঝখান দিয়ে গটগট করে চলেছে। কোনো পরোয়াই নেই। শিং দিয়ে গুঁতোচ্ছে

না বটে কিন্তু সেই বিশাল বপুর সাইড পুশে লোকে বাপ্‌রে বলে ছিটকে পড়ছে। শিব সতর্কভাবে সরে দাঁড়াল।

শিবের সামনে দিয়ে যেতে যেতেই ষাঁড়টা ঘাড় ফিরিয়ে মাটিতে বসা এক ব্যাপারির ঝুড়ি থেকে বড় একফালি কুমড়ো টেনে নিল তার মুখগহ্বরে।

'হায় হায়' — করে উঠল বেচারি সবজিওলা। ষাঁড় ভ্রূক্ষেপ না করে পরম আয়েসে কুমড়ো চিবুতে চিবুতে চলল।

শিব অবাক হয়ে লক্ষ করল, হাটের মানুষরা ষাঁড়টার অত্যাচারে গালমন্দ করছে, পালাচ্ছে তার পথ থেকে, হই হই করছে পেছনে, কিন্তু বেটাকে তাড়া দিয়ে হাটের ভিড় থেকে বের করে দেওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে না। বোধহয় ভয়ে। যা লাশ! লম্বা দু'খানা শিং। ডানপিটে শিবের রক্ত গরম হয়ে উঠল। সে এক ব্যাপারির পাশে রাখা লাঠিখানা চেয়ে নিয়ে দ্রুত পায়ে ধেয়ে গিয়ে ষাঁড়টার পেছনে জব্বর দুই লাঠির ঘা বসিয়ে হুংকার ছাড়ল,— হেট হেট। গেট আউট।

যতটা না আঘাতের ফলে, তার চেয়ে ষাঁড়টা বিলক্ষণ ঘাবড়ে গেল অন্য কারণে। হাটুরে মানুষকে সে অ্যাদ্দিন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনি। হঠাৎ তাদের দিক থেকে এমন আক্রমণ!

চমকে ষাঁড়টা সুখাদ্যের লোভ ত্যাগ করে ভিড় ভেদ করে দিল ছুট।

ব্যস, একটা ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধে গেল।

ষণ্ডবীর কাউকে শিঙের গুঁতোয়, কাউকে কাঁধের ধাক্কায় ছিটকে দিয়ে দোকানপাট মাড়িয়ে দৌড়চ্ছে। আর্তনাদ ও হল্লায় কানে তালা লাগার জোগাড়।

শিব থ। এমন যে এক কাণ্ড ঘটে যাবে সে কল্পনাও করেনি।

ষাঁড়টা হাটের বাইরে অদৃশ্য হতে হাটের লোক শিবের ওপর মারমুখী হয়ে উঠল, — কে হে তুমি? ইয়ার্কির জায়গা পাওনি? ষাঁড়টাকে মারলে কেন? আহা, হাটের পোষা ষাঁড়। তোমার কী ক্ষতি করেছে?

অ্যাঁ। পোষা ষাঁড়! — শিব তাজ্জব!

— তা নয়তো কি? ধম্মের ষাঁড়। খুশিমতো ঘোরে হাটে। তোমার এত বীরত্ব জাগল কেন হে? বেআক্কেলে ছোকরা!

ভাগ্যিস শিবের ক'জন গাঁয়ের লোক তাকে বাঁচিয়ে দিল। নইলে শিবের আরও হেনস্তা হত।

যাকগে! ঘটনাটা শিব ঝেড়ে ফেলে মন থেকে। লিস্টি মিলিয়ে বাজার করতে লেগে যায়।

আরে, ওই বাচ্চা ছেলেটা কে? বছর চারেক বয়স হবে। ফুটফুটে দেখতে। হাফ শার্ট হাফ প্যান্ট পরা পায়ে জুতো, দেখে মনে হয় ভদ্রবাড়ির ছেলে। একা একা এদিক সেদিক ঘুরছে। শিব খানিকক্ষণ ধরে ওকে নজর করছে। ওর সঙ্গে কি কেউ নেই? দেখছি নাতো কাউকে। আপাতত ছেলেটি একটা তেলে ভাজার দোকানের সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে।

শিব গুটিগুটি বাচ্চাটির পাশে গিয়ে মিষ্টি হেসে তাকে জিজ্ঞেস করল, — খোকা কী করছ?

ওই দেখচি। — উনুনে বসানো কড়াইয়ের গরম তেলে বেগুনি ভেজে ছাঁকনি দিয়ে তুলে তুলে বারকোষে রাখছিল দোকানি। সেই দিকে দেখায় ছেলেটি।

তোমার নাম কী? — প্রশ্ন করে শিব।

— তাতু।

— তুমি কার সঙ্গে হাটে এসেছ?

— দাদু।

— দাদু কোথায়?

— জানি না।

—সেকী! দাদু হারিয়ে গেছে?

হ্যাঁ। — নির্বিকার ভাবে জানায় তাতু।

— তোমার দাদুর হাটে দোকান আছে?

— না।

—ও! হাট করতে এসেছে বুঝি দাদু?

— হুঁ।

তাতু কথা বলছে বটে, কিন্তু তার লোভী দৃষ্টি গরম বেগুনি থেকে নড়ে না।

— কোথা থেকে এসেচ তোমরা? কোন্ গ্রাম?

হুই নদীর ধারে। — জবাব দেয় তাতু।

— নাম কী গাঁয়ের?

জানি না। — তাতু মাথা নাড়ল।

শিব ভাবে, নদীর ধারে তাদের গ্রাম চন্দনা। কিছু দূরে নদীর পাড়ে মথুরাপুর গ্রাম। আবার নদীর অপর পাড়েও একটা গ্রাম আছে। তাদের গ্রামের ছেলে কি? না, অন্য গাঁয়ের? সে প্রশ্ন করল,— তোমার দাদুর নাম কী?

দাদু। — চটপট জবাব আসে।

— না না ভালো নাম, এই যেমন আমার ভালো নাম শিবপদ দত্ত। তেমনি তোমার দাদুর নামটা কী বলতো?

দাদু। — একই সুরে উত্তর হয়।

একটু হতাশ হয়ে শিব জিজ্ঞেস করে, — তোমার বাবার নাম জানো?

হুঁ, বাবা। — তাতু তৎক্ষণাৎ জানায়।

নাঃ, এ লাইনে কাজ হবে না। শিব প্রশ্ন করে, — তোমরা কী ভাবে এসেচ হাটে?

— গরুর গাড়িতে।

বাঃ, একটা ক্লু পাওয়া গেল, — তা গাড়িটা রয়েছে কোথায়?

হুই দিকে। — আঙুল তুলে দেখায় তাতু।

চল, তোমাদের গাড়ির কাছে যাই। তোমাদের দাদু ভাবছে খুব, তাতু কোথায় গেল?

— দাদু হাট করচে।

— তা এতক্ষণ নিশ্চয়ই হাট হয়ে গেছে। গাড়ির কাছে ফিরে গিয়ে কাঁদছে দাদু। বলছে, তাতু কোথায় গেল? চল।

না আমি বেগুনি খাব। — তাতু দৃঢ় কণ্ঠে গোষণা করে।

— চল। দাদু কিনে দেবে।

—না। এখানে খাব।

শিব বুঝল বেগুনি না পেলে তাতু নড়বে না। বেগুনি তো আর বিনি পয়সায় দেবে না দোকানি। সে তাতুকে জিজ্ঞেস করে মজা করে, — পয়সা চাই যে। তোমার পয়সা আছে বেগুনি কেনার?

না। — ঘাড় নাড়ে তাতু।

— তবে কী করবে।

বেগুনি খাব। — তাতু লুব্ধচোখে তাকিয়েই থাকে বেগুনির থালায়।

মহা মুশকিল। বেগুনি না পেলে এ ছেলে তো নড়বে না। একে একা ফেলে যাই কী করে? কাদের ছেলে, তাও বুঝচি না। অগত্যা একখানা বেগুনি কিনে তাতুর হাতে দিয়ে শিব বলল, — এবার চল তোমাদের গাড়ির কাছে।

তাতু পরম তৃপ্তিতে একটু একটু করে বেগুনিতে কামড় দেয়, হুস্‌হাস্‌ ঝোল টানে আর এগোয়। শিবও চলে সঙ্গে সঙ্গে কচ্ছপগতিতে। এখনো কয়েকটা বাজার বাকি।

হাটের সীমানা ফুরোয়। বেগুনি ততক্ষণে চেটে পুটে শেষ।

অনেক গরুর গাড়ি সেখানে মুখ থুবড়ে অপেক্ষা করছে। বলদগুলো তাদের গাড়ির কাছাকাছি বাঁধা।

কোনটা তোমাদের গাড়ি? — তাতুকে জিজ্ঞেস করে শিব।

তাতু গাড়ির সারির দিকে চোখ বুলিয়ে বলল,— ইখানে নেই।

— সব্বনাশ। তা হলে কোথায়?

— ওই দিকে। ওই দিকে। এত্‌ত বড় গাছের তলায়।

এবার শিব আন্দাজ করে। তারা উল্টো দিকে এসেছে।

তাতুর হাত ধরে ফের হাটের ভিতর দিয়ে চলল শিব।

খানিক গিয়েই তাতু একটা তেলেভাজার দোকানের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে জানাল, — বেগুনি খাব।

খাবে খাবে। চল, আগে দাদুর কাছে যাই।—বলতে বলতে তাকে টেনে নিয়ে যায় শিব।

বিচ্ছু ছেলেটা সড়াৎ করে শিবের হাত পিছলে এক ছুটে গিয়ে ফের হাজির হয় সেই তেলেভাজার দোকানের সামনে। হন্তদন্ত শিব কাছে যেতেই সে বলে উঠল,—না যাব না। আগে বেগুনি খাব।

মুশকিল! দেরি করিয়ে দিচ্ছে। পরের ছেলেক কি জোরজার করে ধরে নিয়ে যাওয়া চলে! কে কী ভাববে? নিরুপায় শিব ফের একটা বেগুনি কিনে তাতুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে একটু রাগী গলায় বলল,— বেশ, এবার চল।

তাতু বেগুনি খেতে খেতে ধীরেসুস্থে চলে।

আরে! এই তো! মথুরাপুরের নন্দ সমাদ্দার ছুটে এসে তাতুকে বুকে তুলে নেয় : কোথায় গিছলি অ্যাঁ?

মথুরাপুরের নন্দবাবুকে শিব বিলক্ষণ চেনে। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করে, — জ্যাঠা, এ আপনার কে হয়?

— নাতি। মেয়ের ছেলে। বেড়াতে এসেছে মেয়ে। নাতিটা জেদ ধরল, গাড়ি চেপে হাটে যাবে। তা হাটের ভিড়ে একে সঙ্গে নেওয়া ঝামেলা। তাই গাড়িতে বসিয়ে রেখে গিছলুম। আমি গেছি, আমার গাড়োয়ানটি চা খেতে গেছে কাছেই। ব্যস, সেই ফাঁকে পালিয়েছে! এক্কেবারে বাঁদর। ফিরে এসেতক কত খুঁজছি!

শিব বলল, — দেখলাম একা একা ঘুরছে। তাই নিয়ে আসছিলাম সঙ্গে করে। বাড়ির লোকের নাম বলতে পারছিল না।

তা বেশ করেছ। বেশ করেছ,— বলতে বলতে তাতুর হাতের দিকে চেয়ে আঁতকে ওঠেন নন্দলাল : এ্যাঁ তেলেভাজা পেলি কোত্থেকে?

আজ্ঞে আমি কিনে দিয়েছি। চাইল খেতে। — সবিনয়ে জানায় শিব।

নন্দলাল গম্ভীরভাবে বলেন, — ছি ছি তোমরা শিক্ষিত ছেলে! হাইজিন জানো না? বাচ্চাকে বাজারের তেলেভাজা খাওয়ালে। ছেলেটা পেটের অসুখে ভোগে। দেখ কাণ্ড। দে ফেলে!

সঙ্গে সঙ্গে তাতু বাকি বেগুনিটুকু মুখে চালান করে দিল। শিবের প্রতি একঝলক বিরক্তি ঝরা দৃষ্টি হেনে নন্দলালবাবু নাতিকে কোলদাবা করে পিছু ফিরে হনহনিয়ে হন্টন দিলেন।

শিব থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে, আমি কি নিজে থেকে খাইয়েছি? ছেলেটা জোর করে আমার ঘাড় ভাঙল। এখন কিনা দোষটা এই শর্মার?

মেজাজটা এমন খিঁচড়ে গেল শিবের, বাড়িতে মাকে বাজারের হিসেব দিতে গিয়ে গরমিল হয়ে গেল।

কোন জিনিস, কী দরে, কিনেছে গুলিয়ে গেছে নানান উত্তেজনায়। শিবের মা গজগজ করেন, — তাইতো বলেছিলাম তুই পারবি না।

কাকা ফোড়ং কাটেন, — কত মিলছে না?

এক টাকা চল্লিশ পয়সা। — জানান মা।

হয়ে যাবে। প্র্যাকটিস করতে করতে। — কাকার মন্তব্য।

আড়ালে পেয়ে কাকা শিবকে বললেন, — তোরা হোপলেস। তোদের বয়েসে আমিও মাঝে মাঝে বাজার করে কিছু কি আর সরাইনি? সরিয়েছি। কিন্তু বাবা, হিসেবে, কোনো ভুল হত না। এক্কেবারে পাই টু পাই মিলিয়ে দিতাম।

শিবু কাতরভাবে বলে, সত্যি বলছি কাকা—

ছোটকাকা বিজ্ঞ হাসি দিয়ে শিবের কথা নস্যাৎ করে চলে গেলেন।

চার

কয়েকটা দিন শিবের পরোপকারের উৎসাহটা আর চাগল না। ইতিমধ্যে একদিন সে দেবুর কাছে গিছল। জিজ্ঞেস করেছে, — হ্যাঁরে তোদের সেই রাস্তা তৈরির প্ল্যান কদ্দুর?

দেবু বলছে, — হচ্ছে হচ্ছে, ক্লাবে মিটিং হয়েছে। সেক্রেটারি মানে বেচুদাকে ভার দেওয়া হয়েছে চাঁদা তোলার। খোয়া ইটের টুকরো রাবিশ এইসব ফেলে রাস্তাটা আগে উঁচু করতে হবে। লেবার মানে শ্রম দান করবে ক্লাবের ছেলেরা। রাস্তাটা পিটিয়ে সমান করবে তারা। তোর

কেমন চলছে? মানে যেচে উপকার?

চলছে। — ভুরু কুঁচকে জানায় শিব : মানে সবাই যে ঠিক ভাবে নেয় তা নয়। তবে স্বামীজি তো বলেইছিলেন এমনটা হতেই পারে।

বেশ বেশ চালিয়ে যা। আমাদের কাজে হাত লাগাবি তো?

হুঁ। বলেছি তো লাগাব। ডাকিস যখনই দরকার। — ক্লাবের রাস্তা তৈরির ব্যাপারে আজ শিবের যেন অনেক বেশি আগ্রহ।

স্কুল খুলে গেছে। সেদিন ক্লাস শেষের ঘণ্টা বেজেছে স্কুলে। ছেলের দল হই হই করে বাড়ি ছুটছে। শিব হেডমাস্টার মশায়ের ঘরের সামনে বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে একটা ছাতা দেখে থমকে দাঁড়াল। বারান্দার রেলিঙে ঝোলানো ছাতাটা যে চেনাচেনা ঠেকছে? হুঁ, এ তো মহিম স্যারের ছাতা! সেই বণাশের বাঁকানো বাঁট। বিরাট সাইজের। আজই সে দেখেছে মহিম স্যারকে এই ছাতা হাতে স্কুলে ঢুকতে।

শিব লক্ষ্য করে দেখে, ছাতাটা একটু ভিজে। হুঁ, বোঝা গেছে কেসটা।

মহিমবাবু যখন খোলা উঠোন পেরিয়ে হেডস্যারের ঘরের দিকে গেলেন তখন বৃষ্টি পড়ছিল ঝমঝম করে। আজ গোটা দিনই এমনি বৃষ্টি পড়ছে থেকে থেকে। মহিম স্যার ছাতা খুলে উঠোন পেরিয়ে হেডস্যারের বারান্দায় উঠলেন। বোঝা যাচ্ছে, এইখানে ভিজে ছাতাটা ঝুলিয়ে রেখে মহিমবাবু হেডস্যারের ঘরে ঢোকেন। তারপর কাজ সেরে চলে যাওয়ার সময় ছাতা নিতে ভুলে গেছেন। মহিম স্যারের পক্ষে এটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ মহিমবাবু নাম করা ভুলো। বহুবার তাঁর জিনিস হারিয়েছে। এভাবে ভুলে যাওয়াটা কত পরে যে তাঁর নিজেরই মনে পড়বে, অথবা তাঁর বাড়ির লোক খেয়াল করিয়ে দেবে কোনো ঠিক নেই।

শিব ভাবে, ছাতাটা এ ভাবে পড়ে থাকলে খোয়া যেতে পারে। কোনো দুষ্টু ছেলে যদি তুলে নিয়ে যায়? স্কুলের ছোকরা বেয়ারাটির নাকি একটু হাতটান আছে। এছাড়া বিল্ডিং রং করা হচ্ছে বলে হরদম বাইরের মজুরের আনাগোনা হচ্ছে উঠোনে।

শিব ছাতাখানা রেলিং থেকে তুলে নিয়ে সোজা চলে গেল টিচার্স রুমে।

লম্বাটে ঘরখানায় দেয়াল ঘেঁষে ডেস্কের সারি। প্রতি ডেস্কের পেছনে চেয়ার। প্রত্যেক টিচারের একটা করে ডেস্ক বরাদ্দ। শিব ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, এক কোণে জলিল সাহেব ছাড়া আর কোনো মাস্টারমশাই নেই ঘরে। জলিল সাহেব তার চেয়ারে বসে একমনে খাতা দেখছেন।

স্যার, মহিমবাবুর এই ছাতাখানা। — জলিল সাহেবকে বলল শিব।

মহিমবাবু বাড়ি চলে গেছেন। — মুখ না তুলেই জবাব দেন জলিল স্যার।

— তাহলে ওঁর ছাতাটা? ফেলে গিছলেন বারান্দায়। নিয়ে এসেছি।

জলিল সাহেব শিবের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বললেন —রেখে যাও ওর ডেস্কের পাশে। তিনি ফের খাতায় মন দিলেন।

তাই ভালো। মহিমবাবু কাল স্কুলে এসে হারানো ছাতাটা দেখে দারুণ অবাক হয়ে যাবেন। হয়তো জানতেই পারবেন না কে এ উপকারটি করল!

পরদিন সকালে স্কুলের গেটে পা দেওয়ামাত্র দারোয়ান শিবকে বলল, — হেডমাস্টারমশাই

তোমায় ডেকেছেন। স্কুলে এলেই দেখা করতে বলেছেন।

কী ব্যাপার? এমন জরুরি তলব? দুরু দুরু বক্ষে হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে ঢোকে শিব।

হেডমাস্টারমশাই বুঝি শিবের অপেক্ষাতেই ছিলেন। শিব সামনে খাড়া হওয়ামাত্র চশমার পুরু কাচের আড়ালে জ্বলজ্বলে করা দুইচোখে শিবকে বিদ্ধ করে জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, না বলিয়া পরের দ্রব্য লইয়া আত্মসাৎ করিলে তাকে কী বলে জানো?

আজ্ঞে? — শিব থৈ পায় না।

তাকে বলে চুরি। — জবাবটা হেডস্যারই দিলেন।

— হ্যাঁ স্যার?

তাহলে আমার ছাতাটা যে তুমি কাল না বলে নিয়ে গেছ তাকে নিশ্চয়ই চুরি বলা যায়। — হেডমাস্টারমশাই একই সুরে বলে যান : তোমায় তো ভালো ছেলে বলে জানতাম। এসব কী হচ্ছে?

আজ্ঞে...আপনার ছাতা...আমি চুরি.. শিব ভীষণ ঘাবড়ে আমতা আমতা করে।

— হ্যাঁ। সামনের বারান্দার রেলিংয়ে শুকতে দিয়েছিলাম ছাতাটা। তুমি নিয়ে গেছ। না বলে। নকুল বেয়ারা দোতলা থেকে দেখেছে তোমায় ছাতাটা নিতে। পরে যখন আমি ছাতা খুঁজছি, পাচ্ছি না, তখন বলে তোমার কথা।

না, মানে, হ্যাঁ স্যার। কিন্তু স্যার আমি জানতাম না ওটা আপনার। — শিব কাতর স্বরে জানায় : আমি ভেবেছিলাম ওটা মহিমবাবুর। ওখানে ফেলে রেখে গেছেন। ঠিক ওইরকম ছাতা আছে মহিমবাবুর।

— ও। কিন্তু মহিমবাবুর ছাতা আমার ঘরের সামনে থাকবে কেন?

— আজ্ঞে মহিমবাবুকে দেখেছিলাম আপনার ঘরের দিকে যেতে ছাতা হাতে। তাই ভাবলাম, ভিজে ছাতাটা বুঝি ওখানে রেখে ঢুকেছেন। পরে নিতে ভুলে গেছেন।

— ও। তা ছাতাটা আমার কিনা এ প্রশ্ন তোমার মনে জাগল না?

আজ্ঞে— না , মানে আপনার হাতে দেখেছি গত পরশু, অন্য ছাতা। ফোল্ডিং। — শিব ঘামতে থাকে।

— আমার দুটো ছাতা আছে। এ ছাতাটা কয়েকবার এনেছি স্কুলে।

সরি স্যার। আমায় মাপ করবেন। — শিব তোতলায়।

— ছাতাটা আছে না বেচে দিয়েছ?

— আছে স্যার।

— কোথায়?

আজ্ঞে, টিচার্স রুমে কাল মহিমবাবুর ডেস্কের ওপর রেখে এসেছিলাম। — জানায় শিব।

নিয়ে এসো। এক্ষুনি। — হুংকার দেন হেডস্যার।

শিব ছুট টিচার্স রুমে।

এখনো স্কুল শুরুর ঘণ্টা পড়েনি। টিচার্স রুমে অনেক মাস্টারমশাই। দেখা গেল মহিমবাবু নিজের ডেস্কের সামনে চেয়ারে বসে। ডেস্কের ওপর একই রকম দেখতে দুটো ছাতা।

শিব গুটিগুটি মহিমবাবুর কাছে গিয়ে মৃদু স্বরে বলল, —স্যার কালকে ছুটির পর

হেডমাস্টারমশাইয়ের ছাতাটা ভুল করে আপনার ভেবে এখানে রেখে গিয়েছিলাম। জলিল সাহেব জানেন।

মহিমবাবু হেঁড়ে গলায় বলে ওঠেন, — ওঃ হো। তাই? আমি ভাবছি আমার ছাতাটা ডবল হল কী করে?

কি ব্যাপার? — কয়েকজন টিচার কাছে আসেন।

শিব অল্প কথায় ব্যাপারটা জানায়। হাসির হররা ওঠে।

শিব বলল, — স্যার ছাতাটা ফেরত দিয়ে আসি।

অফ কোর্স। — মহিমবাবু একখানা ছাতা এগিয়ে দেন।

হেডমাস্টারমশাই শিবের হাত থেকে ছাতা নিয়ে একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেই গর্জে উঠলেন, — একী! আমার ছিল ব্র্যান্ড নিউ। এটা তো পুরনো।

শিব আবার ছুটল ছাতা নিয়ে টিচার্সরুমে। মহিমবাবু শুনে বলেন,— দেখ কাণ্ড! তুমি দেখছি বড্ড ভুলো। চিনে নেবে তো ঠিকমতো।

দ্বিতীয় ছাতাখানা নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে শিব ভাবে, বাঃ : নিজেই এগিয়ে দিলেন। এখন বলছেন আমার ভুল।

হেডমাস্টার দ্বিতীয় ছাতাখানা দেখে নিয়ে খুশিমুখে বললেন,— ইয়েস এইটা। এবার থেকে কোনো কিছু করার আগে একটু কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করবে। বুঝেচ।

আজ্ঞে। — যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে শিবের।

ঘটনাটা টিচার্সরুম থেকে বাইরে চাউর হয়ে যায়। দেবুর কানেও গেল। এক ফাঁকে দেবু সান্ত্বনা দিল শিবকে, — মুশকিল! একটা ভালো কাজ করতে চাইলি। পাবলিক শুধু ভুলটাই দেখল। হাসি ঠাট্টার খোরাক হলি। কী অন্যায়!

দেবুর কথার লুকনো খোঁচাটা বাধ্য হয়ে হজম করতে হয় শিবকে।

পাঁচ

চন্দনা গ্রামে মহা হই চই-র কারণ ঘটল ক'দিনের মধ্যে। কারণটা হল হাবুলের বাড়ি থেকে চম্পট।

শ্রীমান কার্তিকচন্দ্র দাস ওরফে হাবুল থাকত চন্দনার পুব পাড়ায়। পড়ে শিব দেবুদের ক্লাসেই। তবে অন্য সেক্শনে। অমন বাঁদর ছেলে চন্দনায় কমই আছে। মা ঠাকুমার অতিরিক্ত আহ্লাদ তার মাথাটি খেয়েছে। হাবুলের বাপ ভূষণচন্দ্র অতি গোবেচারি মানুষ। জমি জায়গা আর ধানকলের সামান্য চাকরি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কারও সাতে পাঁচে নেই। বাড়িতে স্ত্রী মা এক মেয়ে আর পুত্র হাবুল:

শ্রীচরণেষু ঠাকমা বাবা মা

নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলাম। প্রকৃত মানুষ হতে চাই। আমার অনুসন্ধানে বৃথা কষ্ট কর না। একটি অনুরোধ। আমার খোঁজ করতে পুলিশে খবর দিও না। ক্ষমাপ্রার্থী।

তোমাদের হাবুল

হঠাৎ কি এমন ঘটল যে হাবুল বাড়ি ছাড়ল? কী হতে চায় সে? বাড়ির লোক গ্রামসুদ্ধু, হতবাক।

হাবুলের মা ভাবলেন, বোধহয় টাকা চেয়ে পায়নি, সেই রাগে। দিন দশেক আগে হাবুল মায়ের কাছে দশটা টাকা চেয়েছিল। সিনেমা দেখবে বলে। মা দেয়নি। কারণ মাত্র হপ্তাখানেক আগেই সে মায়ের থেকে পাঁচ টাকা আদায় করেছে। সিনেমা দেখার নাম করে। ভূষণচন্দ্র নেহাতই ছা-পোষা মানুষ। ছেলের খেয়ালখুশি মতো টাকা জোগানো সম্ভব নয় এ সংসারে। হাবুল মাঝে মাঝেই মায়ের ওপর চাপ দেয় পয়সা আদায়ের ধান্দায়। কখনো পায়, কখনোবা পায় না। সংসারের মুখ চেয়ে এমন বড়লোকি শখ না করার জন্য সেদিন অনুযোগ জানিয়েছিলেন মা। সেই কারণেই কি প্রকৃত মানুষ হওয়ার সাধনায় হাবুলের গৃহত্যাগ?

হাবুলের বাবা ভাবলেন, বোধহয় সেদিন বকুনি খাওয়ার জন্য ও বিবাগী হল।

সন্ধের মধ্যে বাড়ি ফিরে পড়তে না বসায় বাবার কাছে বকুনি খেয়েছিল হাবুল। কিন্তু এমন বকুনি তো ও হরদম খেত। পড়াশুনোয় হাবুল বড্ড ফাঁকিবাজ। তেমন কড়া কথা কিছু বলেনি তো ভূষণচন্দ্র। তাও সেটা দিনসাতে আগের ঘটনা। বকুনির সঙ্গে ভালো করে লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে উপদেশ দিয়েছিলেন ভূষণচন্দ্র। তারই কি এই পরিণতি?

হাবুলের ঠাকুমা কেবলই তারস্বরে কাঁদেন আর বলেন, ছেলেটা নিশ্চয়ই সন্ন্যেসী হয়ে গেছে গো। ওরে, তোর মনে এই ছিল।

গাঁয়ের আর পাঁচজনের মতো শিবও কৌতূহলে হাজির হয় হাবুলদের বাড়ি। গাঁয়ের লোক নানান পরামর্শ দিতে থাকে হাবুলের বাবাকে।

পুলিশে খবর দিতে হাবুলের মা ও ঠাকুমার ঘোর আপত্তি। পুলিশ গিয়ে পাকড়াও করলে ও নির্ঘাৎ আত্মঘাতী হবে। ছেলে অভিমানী। বারণ করেছে যখন, নিজেরাই খোঁজ। আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি বাড়ি চিঠি লেখ। টেলিগ্রাম কর। দরকারে নিজেরা যাও। চিঠি টেলিগ্রাম পেতে আজকাল তো অনেক সময় বড্ড দেরি হয়।

এমন কাণ্ড! দেবুর সাথে এ নিয়ে দুটো কথা না বললে কি চলে? হাবুলের বাড়ির ভিড়ে কই দেবুকে দেখা যায়নি। সন্ধ্যায় শিব দেবুর কাছে হাজির হল।

দেবু ঠোঁট উল্টে বলল, — ও যা ছেলে। নির্ঘাৎ বাপের পকেট সাফ করে বম্বে পালিয়েছে সিনেমায় হিরো হতে। চিঠিতে জ্ঞান দিয়ে গেছে। পয়সা ফুরোলে ঠিক ফিরবে সুড়সুড় করে।

শিব জানাল, — না না, পয়সাকড়ি কিছু সরায়নি হাবুল।

ওর বাবা ভালো করে দেখে শুনে বলেছে।

তবে মায়ের গয়না হাতিয়েছে, — নির্বিকারভাবে মন্তব্য করে দেবু।

— না, না। তাও কিছু নেয়নি। কোনও দামী জিনিস হারায় নি বাড়ি থেকে। ওর বাড়ি লোক বলছে।

— তবে কাছে পিঠেই আছে। খোঁজ করলেই পেয়ে যাব।

শিব জানে না যে, হাবুলের এই সিনেমায় নামার উদ্দেশ্যে বাড়ি ছাড়ার থিওরিটা ওর দিদিরমনেও জেগেছে। কারণ ছেলেটা যা সিনেমার পোকা।

উদ্‌ভ্রান্ত হাবুলের বাবা সাতদিন কাছে পিঠে আত্মীয় চেনাশোনাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরলেন

বাসে ট্রেনে পায়ে হেঁটে। কিন্তু ছেঁলের কোনও পাত্তাই পাওয়া গেল না। কাজকর্ম পণ্ড, চাকরিতে কামাই আর প্রচুর অর্থ ব্যয় হল। ক্লান্তি ও হতাশায় ভেঙে পড়লেন ভূষণচন্দ্র। তেমন জ্ঞাতি কেউ নেই যে অনুসন্ধানে কাজে বিশেষ সাহায্য করে। গাঁয়ের লোক উপদেশ দেয় মুখে। আসল কাজে আসে না। তখন শিব হাবুলকে খোঁজার সাহায্যে এগিয়ে এল নিজে থেকে।

হাবুলের খবর জানতে চিঠি ফেলা, টেলিগ্রাম করা শুধু নয়, হাবুলের কয়েকজন দূর দূর আত্মীয়র বাড়িতে শিব স্বয়ং চলে গেল।

তবু দশ দিনেও হাবুলের সন্ধান পাওয়া গেল না।

দেবু এবার শিবকে বলল, — হুঁ ব্যাপারটা দেখছি সিরিয়াস। পুলিশে যখন খবর দেবে না, একটা কাজ করতে পারিস। ওর বাবাকে বল, খবরেরকাগজে ওর বর্ণনা দিয়ে ছবিসুদ্ধ একটা বিজ্ঞাপণ দিতে। ওকে ফিরে আতে অনুরোধ জানিয়ে। আর কেউ যদি ওর খোঁজা দিতে পারে, তার জন্যে কিছু পুরস্কার ঘোষণা করলে ভাল হয়। সংবাদ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দে। ওটার সারকুলেশন অনেক।

দেবুর পরামর্শটা হাবুলের বাবারমনে ধরল। পুরস্কার? কত ঘোষণা করা যায়? বেশি দেবার সামার্থ্য নেই ভূষণবাবুর। দুশো টাকার প্রতিশ্রুতি দিই। বিজ্ঞাপণে লেখা থাকবে হাবুলের শোকে ওর ঠাকুমা শয্যাশায়ী, মৃতপ্রায়।

পরদিনই শিব কলকাতা চলে গেল। সংবাদে বিজ্ঞাপন ছাপার ব্যবস্থা করে এল। বিজ্ঞাপনটা বেরুল তিন দিন বাদে।

আশ্চর্য ব্যাপার! হাবুলের উদ্দেশে বিজ্ঞাপনটায় কাজ হল ম্যাজিকের মতো। হাবুলের সন্ধান জানিয়ে এক ভদ্রলোকের চিঠি এল মাত্র তিনদিন বাদে। হাবুলের বাবা সেই দিনই শিবকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। হাবুলসহ ফিরে এলেন পর দিন। গ্রামে আর এক দফা হুলস্থুল বেধে গেল।

ফিরেই শিব ছুটল দেবুর কাছে। হাবুল উদ্ধারের রোমাঞ্চকর কাহিনি বর্ণনা করতে।

ছয়

বদন মুখুজ্যের বাড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় শিব।

বদম মুখুজ্যের বাড়ি ঘিরে মাটির পাঁচিল। পাঁচিলের গা ঘেঁষে একটা মস্ত পেয়ারা গাছ। গাছে বড় বড় পেয়ারা। ডাঁসা। পাকা। পাঁচিলের বাইরে ঝুঁকে পড়েছে গাছটার দুটো ডাল।

শিব দেখল, একটা গোদা হনুমান কাছে বিরাট একটা জাম গাছের ডালে গুটিগুটি এগিয়ে আসছে। পেয়ারা গাছটা তাক করে। এই হনুমানটাকে বিলক্ষণ চেনে শিব। মহা শয়তান। ওর জ্বালায় গাছে ফলপাকুর রাখা দায়। যত না খায়, তার চেয়ে নষ্ট করে বেশি। ইস্ বদন মুখুজ্যের পেয়ারাগুলো গেল।

বদন মুখুজ্যেকে মোটেই দেখতে পারে না শিব। লোকটির প্রচুর পয়সা কিন্তু হাড়কঞ্জুষ এবং খিটখিটে স্বভাবের। গ্রামের বেশিরভাগ লোকের সঙ্গেই ওর আদায় কাঁচকলা সম্পর্ক। গত বছর বদন মুখুজ্যের বাড়িতে যখন আগুন লাগে, শিব দলবল জুটিয়ে অনেক কষ্টে আগুন নেবায়। শুধু গোয়ালঘরটার ওপর দিয়ে ফাঁড়া কেটে যায়। আর কোনো ঘর পোড়েনি।

অকৃতজ্ঞ বদন মুখুজ্যে যে খুশি হয়ে শিবদের একটু মিষ্টি মুখ করাবেন তা তো নয়ই, এমনকী দুটো মিষ্টি কথায় প্রশংসা অবধি করেননি। বরং আগুন নেভাবার সময় বাঁশের ঘা দেওয়ার ফলে মাটির রান্নাঘরের খুঁটি আর চালের পাতাগুলো ভেঙেছিল বলে সমানে খুঁতখুঁত করেছেন।

সেই বদন মুখুজ্যের পেয়ারা হনুর ভোগে লাগলে শিব অন্য সময় বিন্দুমাত্র দুঃখিত হত না। বরং খুশিই হত। আজ কিন্তু তার পরোপকারী সত্তাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। পুরনো রাগ ভুলে হনুমানটাকে তাড়াতে সে পকেট থেকে গুলতি বের করল।

গুলতি দেখেই হনুটা মুহূর্তে পিছটান দিল। ঝপাঝপ্ দুলাফে লুকালো গিয়ে দূরে ডালপালার আড়ালে। ফটাস্! হনুমানটাকে লক্ষ্য করে একবার গুলতিতে পাথর ছুড়ল শিব।

— কে রে?

হুংকার শুনে শিব চমকে ফিরে দেখে, স্বয়ং বদন মুখুজ্যে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে।

এখানে কী হচ্ছে? — আবার খিঁচোয় মুখুজ্যে।

ওর ভঙ্গি দেখে শিবের মাথায় চড়াৎ করে রক্ত উঠে যায়। এক কঠিন জবাব ঠোঁটের ডগায় আসলেও কোনো রকমে নিজেকে সামলে নেয় সে। শান্তভাবে বলে, — আজ্ঞে হনুমান তাড়াচ্ছি। আপনার পেয়ারা খেতে আসছিল।

কই হনু? — এদিক সেদিক তাকার মুখুজ্যে।

ওইখানে লুকিয়েছে। — আম গাছটা দেখায় শিব।

আম গাছের পানে একবার দৃষ্টিপাত করে এবং হনুমান দর্শন না পেয়ে বদন মুখুজ্যে খেঁকিয়ে উঠলেন, — থাক থাক। আর বাজে বকতে হবে না। হনু! আমায় বোকা পেয়েচ? ফের যদি পেয়ারা চুরির তাল করেছ, দেখবে মজা।

সঙ্গে সঙ্গে অ্যাবাউট টার্ন করে দ্রুত পায়ে হাঁটা দিল শিব। তালু তার জ্বলছে রাগে। সত্যি সত্যি একদিন ওর পেয়ারা গাছ সাফ করে দিলে এই অভদ্রতার উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়।

শিব যখন দেবুর বাড়ি পৌঁছল ততক্ষণে সে আবার নিজেকে ঠান্ডা করে ফেলেছে। বেয়াড়া লোক তো থাকেই কিছু সংসারে।

শুনেছিস তো হাবুল ফিরেছে? — দেবুর কুঠুরিতে মুখোমুখি বসে বলল উত্তেজিত শিব।

— হুঁ।

— সে এক কাণ্ড! আমি গিয়েছিলাম হাবুলের বাবার সঙ্গে। বোলপুরের কাছে একটা গ্রাম থেকে ধরে এনেছি।

ওর খবর পেলি কী করে? — জানতে চায় দেবু।

— ওখানে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিল পরিচয় ভাড়িয়ে। তিনিই চিঠি লিখে খবর দেন। ওঃ, তোর সাজেশনটা দারুণ কাজে দিয়েছে। কাগজে ছবি দেখে, বিজ্ঞাপন পড়ে ভদ্রলোক ব্যাপারটা ধরতে পারেন।

— ওখানে কী করছিল হাবুল?

সে অনেক ব্যাপার। শিব হাবুলের নিরুদ্দেশ হওয়ার যে কাহিনি বলল তার সারমর্ম হল : বাড়ি থেকে পালিয়ে ঘুরতে ঘুরতে হাবুল হাজির হয় বোলপুর শহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে

এক গ্রামে। গ্রামটা বাসরাস্তা থেকে খুব দূরে নয়। ওখানে যে কেন গিছল হাবুল? গ্রামটার কাছেই একটা খুব পুরনো মন্দির আছে, বোধহয় সেই টানেই গিছল। মন্দিরের কাছে হাবুলের সঙ্গে একটা ছেলের আলাপ হয়।

ওই ছেলেটা মানে চানুর খুব ভালো লেগে যায় হাবুলকে। হাবুলের চেহারাখানা তো মিষ্টি! আর দরকারে দিব্যি মিষ্টি কথা বলতে পারে। ভেতরে ভেতরে ও যে কী চিজ কে বুঝবে! চানুর কাছে হাবুলটা দিব্যি এক গপ্পো ফাঁদে ওর বাড়ি থেকে পালানোর কারণ হিসেবে।

হাবুলের নাকি বাবামা ভাইবোন কেউ নেই। মামার বাড়িতে থাকে। মামারা তাকে মোটে দেখতে পারে না। খুব বকাঝকা করে। তাই হাবুল মামার বাড়ি ছেড়েছে নিজের পায়ে দাঁড়াবে বলে।

চানু হাবুলের দুঃখের কাহিনি শুনে তাকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যায়। চানুর বাবা হলধর হালদারও গলে যান হাবুলের কথা শুনে। উনি তাকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেন।

এদিকে হাবুলের আবার সম্মানজ্ঞান টনটনে। মাগনায় সে কিছুতেই থাকবে না। তাই সে হালদারবাড়ির দুটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে পড়াত। থাকা খাওয়ার প্রতিদান হিসেবে। হলধরবাবু নাকি ওকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে সেখানে থেকেই ইস্কুলে পড়তে। মামার ঠিকানা কিছুতেই বলেনি। হালদারমশাইও এ নিয়ে বেশি চাপাচাপি করেননি। পাছে ও ঘাবড়ে গিয়ে ফের পালায়। তলে তলে নাকি সন্ধান করছিলেন হাবুলের মামার বাড়ির।

আরও একটা কারণও ছিল। ওখানে এক সাধু এসেছিলেন। হাবুল নাকি ঘনঘন যেত তার কাছে। সাধুকে নাকি বলেছিল, সে সাধুবাবার সঙ্গে হরিদ্বারে গিয়ে সন্ন্যাস নেবে। সাধু অবশ্য রাজি হননি। কথাটা হালদার মশায়ের কানে যেতে ভয়ে ভয়ে থাকতেন, ছেলেটা আবার না ভেগে পড়ে। চোখে চোখে রাখতেন হাবুলকে। ওদের বেশ মায়া পড়ে গিছল হাবুলের ওপর। তারপর খবরের কাগজে নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপনটা চানু নজরেক পড়ে। সে তার বাবাকে দেখায়। তখন চিঠি লেখা হয় এখানে। গোপনে।

ফিরতে হাবুল গোলমাল করেনি? — জিজ্ঞেস করে দেবু।

— একদম না। প্রথমটা আমাদের দেখে থমত খেয়ে গিছল বটে। তবে যেই শুনল মা ঠাকুমা ওর শোকে শয্যাশায়ী, ব্যস সুড়সুড় করে চলে এল আমাদের সাথে।

পালাবার কারণটা কী বলল? মানে আসল কারণটা? — জানতে চায় দেবু।

— যা বলল, অদ্ভুত। দেশে বিদেশে কত লোক তো বাড়ি থেকে পালিয়ে নিজের চেষ্টায় স্বনামধন্য হয়েছে। হাবুলও সেই চেষ্টায় ছিল। ব্যস, এর বেশি কিছু নয়। কে জানে বাবা, ওর মাথায় এসব ভাবনা এল কোত্থেকে? ওকে তো নেহাতই,— ভয় হয় আবার না কবে মাথায় পোকা ঢোকে।

দেবু মুচকি হেসে বলল, — ভয় নেই, মআস্টার হাবুল আর হাওয়া হবেন না। কারণ ওর বাজি জেতা হয়ে গেছে।

— মানে?

—শিবের কথার জবাব না দিয়ে দেবু প্রশ্ন করে,— আচ্ছা হাবুলের জন্য পুরস্কারের দুশো টাকা কে পেল?

শিব বলল, — হালদারমশাইকে দিতে চেয়েছিলেন হাবুলের বাবা। হালদারমশাই নেননি। তখন হাবুল নিজেই বলল, যদি দিতেই হয় চানুকে দাও। তা চানুও প্রথমে নিতে চায়নি। শেষে হাবুলের বাবা জোর করে তাকে দিয়ে এসেছে একশো টাকা। মিষ্টি খেতে আর গল্পের বই কিনতে। তার বেশি কিছুতেই নিল না চানু। ভারি ভালো ছেলে।

শিব ফের আগের কথার জের টানে, — বাজি জেতার কথা কী বলছিলি?

বলছিলাম খবরের কাগজে হাবুলের ছবি ছাপা হল। ফলে ভুতোর থেকে বাজি জিতল এবং আমারও কিছু লাভ হয়ে গেল।

কী আজেবাজে বকছিস? হেঁয়ালি রেখে খুলে বল। — শিব চটে যায়।

বলছি বাবা, রাগ করিসনি, — দেবু হেসে বলে : এত সব ঝামেলার কারণটা কে জানিস? ওই বেটা ভুতো।

— অ্যাঁ। মানে হাবুলদের সেকশনের ভূতনাথ দাস?

হ্যাঁ। লাভপুরে ডিবেট কম্পিটিশনে থার্ড হওয়ায় ভুতোর বীরভূম বার্তায় নাম বেরিয়েছিল। তাই নিয়ে ভুতো বেজায় চাল মারতে থাকে হাবুলের কাছে।

দেখেশুনে বেজায় খচে গিয়ে হাবুল ফস্ করে বলে বসে, — ধুস্, এ আর এমনকী ক্রেডিট!

ভুতো চটে বলে, — ও তুই পারবি?

হাবুল বলে, — আলবাৎ পারব। ঢের ভাল কাগজে পারব আমার নাম ছাপাতে। এমনকী ছবিও ছাপাব দেখে নিস।

সঙ্গে সঙ্গে ভুতো চ্যালেঞ্জ দেয়, — বেশ। এক বছর সময় দিলাম। দশ টাকা বাজি। দেখি তোর কত মুরোদ।

চ্যালেঞ্জ তো অ্যাকসেপ্ট করল হাবুল, কিন্তু পড়ল ভাবনায়। কাগজে নাম ছাপা যায় কী ভাবে? শেষে আমার কাছে এল পরামর্শ করতে। কয়েকটা উপায়ও বলল যেমন, কোনো ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে যদি ঢিল ছোড়ে?

সে কীরে! তা হলে তো তক্ষুনি অ্যারেস্ট করবে পুলিশ। — বলে ওঠে শিব।

— তা করুক। নাম তো বেরুবে কাগজে। হাবুল তখন মরিয়া। ভুতোর কাছে হার মানা চলবে না। এমনি আরও কতগুলো উদ্ভট আইডিয়া বলল হাবুল। হ্যাঁ, আর একটা ছিল — রেল লাইনের ওপর শুয়ে থাকবে সুইসাইড করার ভান করে। তাতে নিশ্চয়ই হইচই হবে। কাগজে নাম উঠবে। যদিও লোকে যা-তা বলবে ওকে। যাক্‌গে, আমি ওর সবকটা প্ল্যান বাতিল করে দিয়ে খুব সোজা বুদ্ধি দিলুম। বাড়ি থেকে পালা। তারপর তোর বাবাকে দিয়ে নাম করা কাগজে একটা নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে। চাই কি ছবিও ছাপা হতে পারে। কন্ডিশন, দশ টাকা বাজি জিতলে দুটাকা দিতে হবে আমায়।

হাবুল এক কথায় রাজি হয়ে গেল।

দেবু মুচকি হেসে বলল, — ওর পালাবার ব্যবস্থাটাও আমিই করে দিলুম। চানুরা আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। চানুর কাছে চিঠি লিখে ব্যবস্থা করলাম হাবুল বাড়ি থেকে কেটে এদিক সেদিক খানিক ঘুরে হাজির হবে চানুর কাছে। চানু তাকে নিয়ে তুলবে নিজের বাসায়। তারপর

চানুর কাজ সংবাদ নামে দৈনিক পত্রিকায় নিরুদ্দেশ কলামে নজর রাখা। কারণ কেবলমাত্র ওই কাগজখানাই যায় চানুদের পাশের গ্রামের লাইব্রেরিতে।

যা ভেবেছিলাম তাই ঘটল, বুঝতেই তো পারছিস। চানুর থেকেও পুরস্কারের ভাগ কিছু আদায় করতে হবে। নিদেনপক্ষে এ একখানা গল্পের বই। আমার দৌলতেই তো ওর এই প্রাপ্তি। কী বলিস?

শিব হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে। খানিকক্ষণ তার মুখে কোনো কথা ফোটে না। উঃ তলে তলে এই ষড়যন্ত্র! সবটাই সাজানো ব্যাপার। আর তার জন্যে সে কী ছোটাছুটিই না করল!

চাপা একটা গজরানি বেরোয় শিবের মুখ দিয়ে, — এসব আগে বলিসনি কেন? মিছিমিছি—

দেবু বলল, — আহা, আমি তো বললাম সেদিন। হাবুল ঠিক ফিরবে। চিন্তা নেই। তা আমার কথা শুনলি না। ঝাঁপিয়ে পড়লি।

শিব সটান উঠে দাঁড়িয়ে থমথমে মুখে।

ওর মনের ভাব টের পেয়ে দেবু সান্ত্বনা দেয়, — মিছিমিছি বলছিস কেন? হাবুলের বাবা তোর কাছে কত কৃতজ্ঞ হলেন। সবাই জানল তুই কত হেল্প করেছিস।

শিব জবাব না দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ায়। পেছন থেকে দেবু বলে, — এসব কথা কাউকে বলিসনি যেন। জানলে হাবুলের বাবা হাবুলের পিঠের চামড়া তুলে নেবে।

সাত

হনহন করে যাচ্ছিল শিব। হাবুল দেবুর চক্রান্তের কথা জেনে তার গোটা শরীরে যেন আঁচ বেরুচ্ছে রাগে। বদন মুখুজ্যের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে ফের থমকে দাঁড়ায়। তার চোখ আটকে যায় লক্ষ্মীর ওপর।

মুখুজ্যেদের বসত বাড়ির গায়েই ওদের ছোট আম কাঁঠালের বাগান। একটা পুকুর আছে মাঝে। পুকুপাড়ে লক্ষ্মী দড়ি দিয়ে খোটায় বাঁধা। নামে লক্ষ্মী হলে কী হবে, এমন বেয়াড়া গরু সারা গাঁয়ে আর দুটি নেই। ছাড়া পেলেই সে উধাও হয়। তখন খুঁজে পাওয়া দায়। মাঠে চড়াবার সময় রাখাল তাই সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখে গরুটাকে। তবে গরুটা দুধ দেয় প্রচুর। নইলে ওর পেছনে যে হয়রানি হয়, বদন মুখুজ্যে কবেই ওকে বিক্রি করে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলত।

লক্ষ্মীকে দেখেই শিবের মনে বদন মুখুজ্যের ওপর রাগটা ফের চাগিয়ে ওঠে। ভাবে, পরোপকার তো ঢের করলাম। এবার উল্টোটা করি। খানিক শোধ নিই।

শিব সতর্কভাবে দেখল চারপাশে। মুখুজ্যেবাড়ির কাউকে দেখা গেল না। সে নিঃসাড়ে গাছের আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটানে খোঁটা থেকে লক্ষ্মীর দড়িটা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোট ঢিলও মারল গরুটার গায়ে। লক্ষ্মী ভয় পেয়ে সরতে গিয়ে টের পেল যে বাঁধন নেই। অমনি সে গটগট করে চলল মুখুজ্যে বাড়ির এলাকা ছেড়ে। শিবও দ্রুত

পায়ে হাঁটা দিল পথ ধরে। গরুটা ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে ঝোপঝাড়ের ভিতর। ভারি একটা খুশিতে ভরে যায় শিবের বুক। উপকারের মর্যাদা তো দেয়নি। এবার উল্টোটা করে দেখি, কেমন জব্দ হয়!

স্বামী পরহিতানন্দের উপদেশ আর কাজ হয় না।

রাতে শিব বাড়িতে বেশ পেট ভরে তৃপ্তি করে খায়। আজ প্রথমে বদন মুখুজ্যে এবং পরে হাবুল বৃত্তান্তের কারণে মনে যে রাগের টগবগানি ফুটছিল, লক্ষ্মীকে ছেড়ে দিয়ে তা প্রায় শান্ত হয়েছে।

বাইরের দিকে বৈঠকখানায় শোয় শিব। খাবার পর লণ্ঠনের আলোয় ক্লাসের পড়া করল অনেকক্ষণ। তারপর শুয়ে পড়ল।

বিছানায় শুয়েও শিবের ঘুম আসে না।

নাঃ, যেচে গায়ে পড়ে উপকারের চেষ্টা আর নয়। কখনো লোকে ভুল বোঝে, কখনো খাটুনিটা বেকার হয়। ঠিকই বলেছিল দেবু। পরের হিত করতে হলে বরং খানিক বুঝেসুঝে এগোনো উচিত। পরে আপশোস করতে হয় না।

এপাশ ওপাশ করতে করতে সবে তন্দ্রা নেমেছে চোখে, হঠাৎ কী একটা আওয়াজ কানে আসতে সজাগ হয়ে উঠল শিব।

দূর থেকে থেকে ভেসে আসছে বহু কণ্ঠের শোরগোল! শিব তড়াক করে উঠে খোলা জানলার কাছে এগিয়ে যায়।

চোর! চোর! চোর...!

পাশের পাড়া থেকে আসছে চিৎকারটা। অর্থাৎ কোথাও চোর পড়েছিল। কৌতূহলী হয়ে শিব দরজা খুলে বাইরে রোয়াকে গিয়ে দাঁড়ায়।

চিৎকার থামে না।

শিবের কৌতূহল বাড়ে। সে রোয়াক থেকে পথে নামে। ভাবে, যাব নাকি দেখতে ব্যাপারটা কী? এ পাড়া এখনও নিশুতি। কারও ঘুম ভাঙেনি। শুধু হাতে যাওয়া ঠিক নয়। ঘরে গিয়ে লাঠিটা নিয়ে আসি। এসব ভাবতে ভাবতেই শিব দেখল যে দূরে একটা লোক বাঁক ঘুরে তাদেরই বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসতে লাগল।

ওই কি চোর? হয়তো তাই। ইস্, লাঠিটা নিয়ে বেরোইনি কেন? চোরের কাছে অস্ত্র থাকতে পারে। মরিয়া লোকটা। খালি হাতে ওকে বাধা দিতে গিয়ে যদি সে জখম হয়? ঘরে গিয়ে লাঠি আনারও সময় নেই আর।

অমাবস্যা সবে কেটেছে। খুব আবছা চাঁদের আলো। শিব চট করে সরে যায় পথের ধারে খেজুর গাছটার আড়ালে। লোকটা খুব কাছাকাছি আসতে আবছায়ায় যেটুকু নজরে এল তাতেই শিবের মনে হল, লোকটা অচেনা। চোরই হবে। নইলে একা ছুটছে কেন?

সামনে দিয়ে বেগে পেরুচ্ছে লোকটা। শিব সবেগে লাফ মারল তাকে লক্ষ্য করে। একেবারে ফ্লাইং ট্যাকল্। সাদা বাংলায় যাকে বলে লেঙ্গি। মুহূর্তে লোকটা আঁক্ করে এক আওয়াজ ছেড়ে ছিটকে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। শিবও পড়ল রাস্তায়।

কিন্তু লোকটা মাটি ছেড়ে ওঠার আগেই শিব দুই লাফে গিয়ে চড়াও হল তার ওপর। কয়েকটা ঘুসি মারল লোকটার মুখে বুকে। তাকে ঠেসে ধরল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার জুড়ে দিল —চোর! চোর!...

লোকটা দারুণ জোয়ান। বেশিক্ষণ তাকে আটকে রাখার সাধ্য ছিল না শিবের। আচমকা আছড়ে পড়ে আঘাত পেয়েছে লোকটা। তাই সামান্য সময় কোনো বাধা না দিয়ে লোকটা মার খেল। তার পরই সামলে নিয়ে খপ করে শিবের ডান হাতখানা ধরে ফেলে ঠেলে ওঠার চেষ্টা করল। শিব প্রাণপণে তাকে জড়িয়ে ধরে চেপে রাখে আর চেঁচায় — চোর চোর। হেল্প হেল্প!

দড়াম্ করে শিবের বাড়ির সদর দরজা খুলে গেল। হুড়মুড়িয়ে বেরুলেন শিবের বাবা কাকা আর বড়দা। তারা ছুটে গেলেন শিবের কাছে। ব্যস, এবার লোকটা বন্দি হল চারজনের হাতে। তার হাত পা বেঁধে ফেলা হল। কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই অনেক বাড়ির দরজা খুলে পিলপিল করে বেরিয়ে আসতে লাগল পাড়ার লোক।

দূরে হল্লা আর চোর চোর চিৎকারটা ততক্ষণে থেমে গেছে। শিবের পাড়ায় তখন শোরগোল ক্রমেই বাড়ছে।

বন্দি লোকটাকে চেনা গেল। পাশের গ্রামের এক দাগি চোর। তার কাছে একটা থলিতে পাওয়া গেল সিঁধকাঠি, ছেনি হাতুড়ি এমনি কিছু চুরি করার সরঞ্জাম। তবে চোরাই মাল কিছু মিলল না।

ওঁ পাড়ার ব্যাপারটা কী দেখে আসি। — কয়েকজন ছুটল সেদিকে। খানিকবাদেই ফিরল তারা। সঙ্গে ওপাড়ার একগাদা লোক। চোর দেখতে এসেছে।

ওখানে কার বাড়িতে চুরি হয়েছে? — ওপাড়ার হারুকে জিজ্ঞেস করে শিব।

চুরি তো হয়নি। — হারুর জবাব।

তবে সে চেঁচাচ্ছিল চোর চোর বলে?—শিব অবাক।

চোর দেখে নয়। চোরের ভয়ে। — মুচকি হেসে জানায় হারু।

— মানে?

মানেটা জানা গেল : এককড়ি হঠাৎ ঘুম ভেঙে তার শোবার ঘরের জানলার বাইরে ঘসঘস শব্দ শুনে ভাবে, চোর সিঁধ কাটছে। সে বেজায় ভিতু। বেরোবার সাহস হয়নি। ঘরে বসে বসেই প্রাণপণে চেঁচায় 'চোর চোর'। সঙ্গে গলা মেলায় তার তিন ছেলেমেয়ে বউ আর মা।

পাশেই তার ভাই দুকড়ির বাসা। সেও সমান ভিতু। দাদার চিৎকার শুনে সেও ঘরে বসে 'চোর চোর' বলে চেঁচাতে থাকে।

তাদের বিকট হল্লায় পাড়ার লোক বেরিয়ে আসে। আলো নিয়ে খোঁজে। তখন দেখে, কোথায় চোর? এককড়ির জানলার নিচে বদন মুখুজ্যের দুষ্টু গরুটা। লক্ষ্মী। হয়তো দেয়ালে গা ঘষছিল। কিংবা খাচ্ছিল কিছু খচমচ করে। চুরির কোনো চিহ্নই নেই এককড়ির বাসায়।

এ নিয়ে খুব হাসাহাসি হচ্ছিল পাড়ায়। এমনসময় এদিক থেকে হল্লা শোনা যায়। জানা গেছে, এদিকে নাকি সত্যি একটা চোরকে পাকড়াও করা হয়েছে।

তা লোকটা কি চুরি করছিল কোথাও? প্রশ্নটা সবার মনে। লোকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে এবং খানিক বাদে হদিশও পাওয়া যায়।

এককড়িদের কয়েকটা বাড়ি তফাতে বনমালির সরকারের বাড়ির মাটির দেওয়ালে আবিষ্কার হয় সিঁধ কাটার চিহ্ন। আর মাত্র ইঞ্চি খানেক কাটতে পারলেই চোর ঢুকতে পারত বনমালির শোবার ঘরে। যেখানে তার সিন্দুক আর দামি জিনিস থাকে। বনমালি এককড়ি দুকড়িদের ডাকে চোর খুঁজতে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু তখনো মোটেই নজর করেনি চোর তারই ঘরে হানা দিয়েছিল।

বোঝা গেল যে এককড়িদের চিৎকারে নার্ভাস হয়ে চোর কাজ শেষ না করেই পিট্‌টান দেয়। তারপর শিবের হাতে ধরা পড়ে।

গ্রামের লোক লক্ষ্মী আর শিবের প্রশংসায় মুখর হল। তবে দুষ্টু গরু লক্ষ্মীর জয়গানটাই বেশি। ওর জন্যেই বেঁচে গেছে আজ বনমালি। তবে হ্যাঁ, শিব ছেলেটার সাহস আছে বটে!

শিব নিজের মনে বিড়বিড় করে— যাঃ বাবা। এ তো দেখছি উল্টা বুঝলি রাম!

তবে বাইরে সে সবিনয়ে ঠোঁটে স্মিতহাসি টেনে প্রশংসাগুলি হজম করে। মনে মনে ভাবে, ঢের হয়েছে। আর এ লাইনে নয়। আমার বরাতটা দেখছি আজব। কোন্ চেষ্টায় যে কী ফল হবে, বোঝা মুশকিল!

পরদিন শিবু দেবুর কাছে হজির হয়ে জানতে চাইল,—তোদের রাস্তা তৈরি স্টার্ট হচ্ছে কবে?

দেবু বলল, — আসছে সপ্তাহেই কাজ শুরু হবে। তখন ডাকব তোকে। ওঃ, তুই তো দারুণ হিরো হয়ে গেছিস। কী কাণ্ড করলি!

গর্বভরা লাজুক হাসি দিয়ে শিব বলল, ওই আর কী! হয়ে গেল হঠাৎ।

ছোটোগল্প

খেই

দু-দুবার ক্যাশ গুনে, টেবিলের উপর জড়ো করা নোট আর খুচরোগুলোর দিকে চেয়ে অত্যন্ত বিমর্ষ মনে বসে রইল নরহরি। মোটে দশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা। সমস্ত দিনের রোজগার। হায় হায়, এ কী আকাল পড়ল! অথচ চার মাস আগেও মডার্ন সেলুনের দৈনিক আয় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকার নীচে নামত না। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা অবধি, কেবল দুপুরে ঘণ্টা তিনেক ফাঁক দিয়ে খদ্দেরের আনাগোনার কামাই ছিল না। দু-দুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়েও এক-একদিন সে হিমশিম খেত খদ্দের সামলাতে।

মর্ডান সেলুনের দৌলতে নরহরির অবস্থা ফিরে গিয়েছিল। দোকানের জায়গাটা পেয়েছিল খাসা। দক্ষিণ কলকাতার এক পরিচ্ছন্ন এলাকা। পয়সাওলা লোকের বাস। ধারে কাছে অন্য কোনও ভাল সেলুন নেই। দেড় বছরের মধ্যেই তার সেলুন জমে উঠেছিল। নরহরির চটপটে ধরন। বিনয়ী আচরণ। ছেলে বুড়ো সকলের সঙ্গে ভাব জমানোর ক্ষমতা—হু হু করে খদ্দের টেনেছিল। বিশেষত আশপাশের যুবকরা মডার্ন সেলুনের বাঁধা খদ্দের হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পাড়ার ইয়ংম্যানরা সবাই কেশ বিন্যাস সম্বন্ধে বেজায় হুঁশিয়ার। চুল ছাঁটার স্টাইল নিয়ে তাদের নানা বিচিত্র আবদার। নরহরির মস্ত গুণ সে কখনো ধৈর্য হারায় না। প্রত্যেকের কথা মন দিয়ে শোনে। আর খদ্দেরের মর্জিমাফিক তার কেশ বিন্যাসের চেষ্টা করে। অ্যাসিস্ট্যান্ট হারু বা পটল কারো চুল কাটলেও নরহরি নিজে এসে একবার দাঁড়াবে তার কাছে। এবং ফিনিশিং টাচ সম্পর্কে স্বয়ং দু-একটা নির্দেশ দেবে।

আসলে হয়তো অ্যাসিস্ট্যান্টরা ঠিকই কেটেছে চুল, তবু খদ্দের ভাবে, হ্যাঁ এইবার ঠিক হল। তারা খুশি হয়ে যায়। এখনো নরহরির ব্যবহারে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। মডার্ন সেলুনকে নিন্দা করে কেউ একটি বাক্যও উচ্চারণ করেন না। তবু কেন এই দুরবস্থা? নিয়তি। বরাত। তাছাড়া কাকেই বা দোষ দেবে নরহরি।

রাত প্রায় আটটা বাজে। মিছিমিছি খদ্দেরের আশায় বসে বসে মশার কামড় খেয়ে লাভ কী? দোকানে তালা লাগিয়ে রাস্তায় বেরুল নরহরি।

মাথার ওপর সাইন বোর্ডে চোখ পড়ল। মাত্র ছয় মাস আগে এই নতুন সাইন বোর্ডখানা

ঝুলিয়েছে। গাঢ় হলুদের পিঠে বড় বড় কালো হরফে বাংলায় লেখা—দি মডার্ন সেলুন। প্রোপ্রাইটার—শ্রীনরহরি ভাণ্ডারি।

সেলুনের দরজার পাশে খাড়া করা থাকে একখানা ব্ল্যাক বোর্ড। তাতে খড়ি দিয়ে লেখা থাকে রেট। গত দু-মাসে চুল কাটার রেট দু-দুবার মুছে ফেলে পালটাতে হয়েছে। প্রথমে ১.২৫ টাকা থেকে ১ টাকা। পরে আরও কমে হয়েছে ৮০ পয়সা। কিন্তু তাতেও ফল হয়নি। ভাটার টানের মতো খদ্দেরের আগমন দিনে দিনে কমেই চলেছে।

দাড়ি চাঁচার সংখ্যা অবশ্য একই আছে। কমেছে চুল কাটার খদ্দের। আর ওদের থেকেই তো দোকানের আসল লাভ।

গতমাসে হারু ও পটলকে জবাব দিয়েছে মানে দিতে বাধ্য হয়েছে। নিজেরা পেট চলে না, ওদের মাইনে জোগাবে কোত্থেকে? ফাইফরমাশ খাটতে এক ছোকরাকে রেখেছে কেবল।

নরহরি একা তো নয়। সংসার আছে। স্ত্রী এবং একটি বাচ্চা। তার ওপর বাসা ভাড়া, দোকানের ভাড়া। কলকাতা শহরে জিনিসপত্র যা আক্রা। প্রতিটি জিনিস কিনে খাওয়া, নিমপাতা কি হিঞ্চে শাক, তাও পয়সা ফেলে কেনো। মাছ মাংস ডিম দুধ তো ছেড়েই দিলাম। অনেক সাধ করে গ্রাম থেকে কলকতায় নিয়ে এসেছিল পরিবার। এখন যা হাল, আবার হয়তো ফেরত পাঠাতে হবে গ্রামে। মাঝে মধ্যে কথাটা পেড়ে দেখেছে। বউয়ের মুখ অন্ধকার হয়ে যায় দেশে ফেরার নামে। শহরে সিনেমা-থিয়েটারের স্বাদ পেয়েছে যে। কিন্তু সে নিরুপায়। ধার জমে যাচ্ছে বাজারে।

রাস্তার উল্টো পারে ফুটপাতের ওপর গুলতানি করছে দশ বারোটি যুবক। কেউ রকে বসে, কেউ দাঁড়িয়ে। তাদের পানে চোখ পড়তেই নরহরির গা রি রি করে উঠল।

ওদের পোশাক-আসাক দিব্যি।

প্যান্ট-শার্ট, পাজামা, পাঞ্জাবিতে সুশোভিত—ঝকঝকে তকতকে। কিন্তু তাদের মাথার দিকে তাকানো যায় না। সবাই যেন এক একটি সাক্ষাৎ মুনি-ঋষি। প্রত্যেকের মাথায় এক বোঝা রুক্ষ চুল, সিঁথিমিতির বালাই নেই প্রায়। ঘাড় ছাড়িয়ে লম্বা চুল ঝুলছে ঝপর ঝপর। কেউ চুলের গোছাকে সযত্নে আঁচড়ে রবার-ব্যান্ড বা ফিতে দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে বেঁধে। চুলের সঙ্গে তাল দিয়ে কেউ রেখেছে ইয়া চওড়া জুলফি। কেউ মোটা ঝোলানো গোঁফ। কেউ বা দাড়ি। এ সবের দৌরাত্ম্যে মুখের জিওগ্রাফি প্রায় ঢেকে গেছে।

গোঁফ দাড়ির সঙ্গে নরহরির বিরোধ নেই। রাখুক যা খুশি। কিন্তু ওদের চুলের বাহার দেখলে নরহরির হাত নিশপিশ করে। ইচ্ছে হয় এখুনি কাঁচি চালিয়ে সব কটাকে ভদ্রস্থ করে দিই।

অথচ এরাই ছিল তার লক্ষ্মী। প্রতি মাসে অন্তত একবার, কেউ বা আবার দু'বার আসত মডার্ন সেলুনে চুলের কেয়ারি করতে। কিন্তু আজ কয়েক মাস যাবৎ এই এলাকার কোনও যুবক মাথার চুলে কাঁচি ছোঁয়ায় না। এ নাকি আধুনিক ফ্যাসান।

শুধু ছেলে ছোকরা নয়, ধেড়ে ধেড়ে আপিসের বাবুরা অবধি এই ফ্যাসানে মজেছে। এমনকী আধখানা টাকপড়া আধবুড়োরাও লম্বা চুল রাখছে। নেহাৎ একটু আধটু ছাঁটার দরকার হলে বাড়ির লোককে দিয়েই কাঁচি চালিয়ে নেয়। নাপিতের কাছে ঘেঁষে না।

নরহরি ভাবে—আজ সারা দিনে চুল কাটার কেস এসেছে মাত্র ছ'টি। বাকি সব দাড়ি কামানো। একটা ছোট ছেলেকে তার বাবা কান পাকড়ে নিয়ে এসেছিল চুল কাটাতে। উঃ কী বিচ্ছু ছোঁড়া! ঝাড়া চল্লিশ মিনিট ধস্তাধস্তি করে কাল ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছে হতভাগ। আগে এসব কেস মডার্ন সেলুনে পা দিতে সাহসই পেত না। এখন রেট কম, চেয়ার খালি, তাই ঢুকে পড়ছে।

আবার এক দাদুর কী আবদার! ম্যাসাজ লাগাও। সেন্ট স্প্রে কর। আগে ম্যাসাজের জন্য বাড়তি কুড়ি পয়সা চার্জ করত। আজ আর চাইতে ভরসা হল না। যদি এ খদ্দেরটিও খসে পড়ে। এভাবে আর চলে না। ছেড়ে দেব লাইন। অন্য কিছু ধরব।

বেহালার এক সেলুনওয়ালার সঙ্গে কথা হচ্ছিল গত পরশু। ওর এলাকাতেও এই মারাত্মক স্টাইল ঢুকেছে। ব্যবসায় মন্দা পড়েছে। তবে তার মতন এত খারাপ নয়। চলে যাচ্ছে কোনও রকমে। কিন্তু নরহরির অবস্থা যে কাহিল!

কাল যাব একবার কার্তিকদের কাছে। কার্তিক নরহরির মাসতুত ভাই। দর্জির দোকান দিয়েছে শ্যামবাজারে। ভারি তুখোড় ছেলে। দেখি ও যদি কিছু উপায় ঠাওরাতে পারে।

শ্যামবাজারে এক গলির মধ্যে কার্তিকের দোকান—ফিটফাট টেলারিং।

ছোট্ট দোকান। দু-জন কর্মচারী ঘর্ঘর শব্দে সেলাইয়ের পা কল চালাচ্ছে। কার্তিক ফিতে দিয়ে কাপড় মাপচে টেবিলে ঝুঁকে। নরহরিকে দেখে সাদর আহ্বান জানাল—"আরে নরু যে! অনেকদিন পরে এমন অসময়ে? দোকান বন্ধ বুঝি আজ?"

"হুঁ।"

"তারপর সেলুন কেমন চলছে? খুব জমিয়েছে শুনলাম?"

"আর সেলুন!" ম্লান হাসল নরহরি।

"কী ব্যাপার বলতো?"

নরহরি কর্মচারীদের দিকে চেয়ে ইতস্তত করে। বুঝে ফেলল কার্তিক। বলল, "চল ভিতরে। ওরে গজা, দু কাপ চা বলে আয়, আর দুখানা করে নিমকি বিস্কুট।"

দোকানের পিছনে এক খুপরি ঘর। কার্তিকের অফিস। আবার খদ্দেরদের পোশাক ট্রায়াল দেওয়ার জায়গাও বটে। চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসল দুজনে। কার্তিক বলল, "বল শুনি কী হয়েছে। ব্যবসা ভাল চলছে না?"

"না।"

"কেন, বদনাম হয়ে গেছে নাকি? কারো কানটান কেটে ফেলেছ বুঝি? আমি তো ভাই ওই ভয়েই কাঁচি ধরলাম না।"

নরহরি তেতে উঠল। "মোটেই না। নরহরি ভাণ্ডারি কারো গায়ে আঁচড় দিয়েছে কেউ বলুক দিকি। তেমন গুরুর কাছে শিক্ষে নয়। লোকে বলত পাঁচু পরামানিক চোখ বুজে কাঁচি চালাতে পারে। সেই পাঁচু মাস্টারের কাছে ট্রেনিং নিয়েছিলাম তিন বছর। দোকান বেশ চলছিল। দু'জন অ্যাসিস্ট্যান্টও রেখেছিলাম। কিন্তু ভাই অদৃষ্ট। নইলে"—ফোঁস করে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল নরহরি।

একটু একটু করে নরহরির কাছ থেকে সমস্যাটা জেনে নিল কার্তিক। তারপর চায়ে চুমুক

দিতে দিতে ইঞ্জিনের মতো সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভ্রূক্ষেপকুটিল ললাটে মিনিটখানেক গভীরভাবে চিন্তা করে বলল—"তোমার পাড়ায় হিরো আছে? বেশ লিডার গোছের ছোকরা।"

"আছে।"

"আলাপ আছে তার সঙ্গে? মানে খানিক অন্তরঙ্গতা?"

"তা আছে। আমার দোকানে চুল কাটতে আসত সে।"

"ব্যস, তাহলেই হবে।"

"কী হবে?"

"কাজ উদ্ধার।"

"কী করে?"

"যেমন করে আমার লাল কাপড়টা চালিয়ে দিলুম। একটু খেই ধরিয়ে দাও।"

নরহরি হতভম্ব হয়ে যায়। কার্তিকের কথাবার্তার কোন মানে বুঝতে পারে না।

কার্তিক রহস্যটা খোলসা করে।

"বুঝলে কিনা, গত হপ্তায় গজাকে পাঠিয়েছিলাম হাওড়া হাটে ছিট কিনতে। শরীরটা ভাল ছিল না, তাই যাইনি নিজে।"

"তা গজা উজবুক। বড় একথান লালা টকটকে কাপড় এনে হাজির। নাকি সস্তায় পেয়েছে। অতি রদ্দি মাল। রেগে বললাম—কী কম্মে লাগবে এটা? বেটা মাথা চুলকোতে লাগল। এ কাপড়ে কেউ কিছু বানাবে তা ভরসা হল না। আমার তো মাথায় হাত। গজাকে যাচ্ছেতাই করে বকলাম।"

"পরদিন এ পাড়ার মাস্তান লিডার ভেলো দত্ত এল আমার দোকানে প্যান্টের ট্রায়াল দিতে। মহা কাপ্তেন ছোকরা। নানান উদ্ভট ড্রেস করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। পাড়ার অন্য ছেলেরা ভেলোর স্টাইল নকল করতে মুখিয়ে থাকে। ধাঁ করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

"লাল কাপড়ের থানটা সামনে ফেলে দিয়ে বললাম—ভেলোদা, একটা ছিট এনেছি, দেখুন।"

"ভেলো কাপড়ে আঙুল ঘষে বলল—বড্ড রাফ।"

"বললাম—এক ধোপ দিলেই নরম হয়ে যাবে। কিন্তু রঙখানা দেখুন।"

"ভেলো বলল, বড্ড ক্যাটক্যাটে।"

"আমি বললাম—ক্যাটক্যাটে নয় দাদা, বলুন উজ্জ্বল ডার্ক কালার। একখানা শার্ট করে দিই। আপনাকে যা মানাবে।"

"দেখলাম, ভেলো একটু ভিজেছে। তবে খুতখুত করছে। তাড়াতাড়ি বললাম, পয়সা পরে দেবেন। আপনাকে দিয়ে বউনি করব পিসটা, তাই মেকিং চার্জ ফ্রি। একখানা নতুন ডিজাইনের শার্ট বানিয়ে দিচ্ছি—হনুলুলু হাফ্। দেখুন লোকে কি বলে। পাবলিক যদি ট্যারা না হয়ে যায় তো দাম চাই না এক পয়সা। উল্টে আমায় নাকে খৎ দেওয়াবেন বড় রাস্তায়।

"ভেলো রাজি হয়ে গেল। পরদিন ওই কাপড়ের একখানা শার্ট বানিয়ে কেচে ইস্ত্রি করে ভেলোর হাতে দিয়ে এলাম বাড়ি বয়ে।"

"ব্যস, কেল্লা ফতে। তিনদিনে পুরো থান সাফ। দেড় ডজন শার্ট বানিয়েছি। আরও এক ডজনের অর্ডার বাকি। কাল হাটে যাব ওই রঙের কাপড় কিনতে। তাই বলছিলাম—ওই একটু খেইে ধরিয়ে দিতে হবে। ব্যস্।"

এরপর কার্তিক ও নরহরি গুজ গুজ করে কিছু শলা-পরামর্শ করল।

মাত্র সাতদিন পরের কথা।

সকাল প্রায় দশটা বাজে। মডার্ন সেলুনের রকে ছোটখাটো এক জনতা। সকলেই কাছাকাছি পাড়ার ছেলে। প্রত্যেকেই যেন অস্থির উন্মনা—ঘন ঘন নজর করছে মডার্ন সেলুনের দরজায়। কাছে পিঠে ফুটপাতে আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে। তারা কিঞ্চিৎ বয়স্ক বা বেপাড়ার লোক। তাই সরে সরে রয়েছে। বোঝা যায় তারাও অপেক্ষা করছে কিছুর জন্য। ওধারে খাইখাই কেবিনে কয়েকজন খদ্দের চায়ের কাপ সামনে রেখে খাড়া বসে। তাদেরও লক্ষ্য মডার্ন সেলুন।

মডার্ন সেলুনের সুইং-ডোর খুলে গেল। মাথার চুলে সন্তর্পণে হাত বোলাতে বোলাতে বেরিয়ে এল এক যুবক, মুখে গর্বিত হাসি। অমনি নরহরি মুন্ডু বের করে হাঁক দিল—শ্রীবাচ্চু ব্যানার্জি। নাম্বার ফোর্টিন।

রকের আড্ডা ছেড়ে একজন ছিটকে এল। এবং লাফাতে লাফাতে গিয়ে ঢুকে পড়ল সেলুনে। মডার্ন সেলুনের অন্দরমহল থেকে ভেসে আসছে কয়েক জোড়া কাঁচির অবিশ্রান্ত গুঞ্জন—কুচ্ কুচ কিচ্ কিচ্।

একটি মুখ সেলুনের দরজা ঠেলে উঁকি মারল ভিতরে। নরহরি হাত জোড় করল, "আজ আর হবে না স্যার। গোটা দিন বুক হয়ে গেছে। কাল সকালে আসুন ন'টার মধ্যে। বলুন নাম, লিখে নিচ্ছি।"

ক'দিন ধরেই এমনি চলছে। হারু ও পটল ফিরে এসেছে। চুল কাটার রেট এক টাকা পঁচিশ থেকে বেড়ে হয়েছে দেড় টাকা। তবু দিনের বেলা ভাল করে নাওয়া-খাওয়ার ফুরসৎ পাচ্ছে না নরহরি এবং তার দুই সহকারী। অবশ্য এজন্য তাদের তিলমাত্র খেদ নেই। হাসি মুখে কাঁচি চালিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে আঙুলগুলো ঝেড়ে গাঁট ছাড়িয়ে নিচ্ছে। নরহরি ঘোষণা করেছে—যদ্দিন এমনি খদ্দেরের ভিড় লেগে থাকবে দৈনিক এক টাকা বোনাস পাবে হারু ও পটল।

মডার্ন সেলুনের এই হঠাৎ ভাগ্য পরিবর্তনের পিছনে সামান্য ইতিহাস আছে।

কার্তিকের কাছ থেকে ফিরে নরহরি সোজা এসে হাজির হয়েছিল পাড়ার দুর্দান্ত হিরো বাপি বোসের বাড়ি। বাপিকে আড়ালে ডেকে সবিনয়ে নিবেদন জানিয়েছিল—"বাপিদা, একটা নতুন হেয়ার-কাট শিখেছি, একবার ট্রাই করে দেখবেন?"

"নতুন কাট? কী রকম?" বাপি ভুরু কুঁচকোয়।

"আমার এক ফ্রেন্ড আতাউল্লা জাহাজি লোক, দেশে বিদেশে ঘোরে, কাল এসেছিল আমার কাছে। দেখলাম দারুণ একখানা ছাঁট দিয়েছে চুলে। জিজ্ঞেস করতে বলল, বিলেতে কেটেছে। খাস সাহেবি দোকানে। স্টাইলখানা নাকি খুব চলেছে বিলেতে। এদেশে আসেনি এখনো। আতাকে দেখতে আস্ত মর্কট। ওর অবধি ভোল ফিরে গেছে

বিলিতি কাটের গুণে। আপনাকে যা মানাবে না। খুব ভাল করে দেখেশুনে রপ্ত করে নিয়েছি।”

“বিলেতে চলছে। সত্যি বলছ?” জিজ্ঞেস করেছিল বাপি।

“আজ্ঞে হ্যাঁ। তিন সত্যি। আতার তাড়া ছিল, চলে গেল, নইলে নিয়ে আসতাম আপনার কাছে।”

“কিন্তু হঠাৎ স্টাইল বদলাব, বন্ধুরা যদি খেপায়? আমতা আমতা করেছিল বাপি।

গরম হয়ে উঠেছিল নরহরি—“আপনাকে খেপাবে? কার এত বুকের পাটা? একটা কথা বলি বাপিদা আপনাদের এক বটঝুরি, থুড়ি, লম্বা চুলের স্টাইল তো পুরনো হয়ে গেছে। আর কদ্দিন টানবেন? মনে আছে, আপনিই প্রথম এই স্টাইলটা আমদানি করেন পাড়ায়। আর এখন? যদু মধু সব্বাই ওই রকম চুল রাখছে। মুড়ি মিছরি এক দর। আপনার ইজ্জতটা থাকছে কোথায়। আবার নতুন কিছু দেখান। লোকে ফের চিনুক আপনাকে। তাই তো এই নতুন কাট্‌টা দেখে আপনার কাছে ছুটে এলাম।”

বাপি বোস গোঁফ চোমরাতে চোমরাতে ভাবতে লাগল। নরহরি এবার শেষ টোপটা ফেলেছিল।

“দাদা, বউনি করলে আপনার সম্মানী দিতে আমি ভুলব না। পঁচিশ টাকা নগদ। মডার্ন সেলুনে আপনার ছ'মাস চুল দাড়ি কাটা ফ্রি। তাছাড়া প্রেসেন্‌টেশন—শ্যামবাজারের ফিটফাট টেলারিং-এর বিখ্যাত শার্ট হনুলুলু হাফ্ এক পেয়ার।”

নগদ অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় বাপি বোসের বাকি দ্বিধাটুকু উবে গিয়েছিল। যত বড় হিরোই হোক না কেন সে বেচারা কাঠ বেকার। তাই হরদম পয়সার টানাটানিতে ভোগে। বাপি বলেছিল—“অলরাইট, কাল সকালে যাব তোমার সেলুনে। হ্যাঁ, ওসব আতা-ফাতা বাদ দাও। আমি নতুন নাম দেব স্টাইলটার।”

পরের দিন বাপির চুল দেখে পাড়ার ছেলেরা থ।

আগেকার গর্দান ছাপানো কেশরাশি অনেকখানি ছোট করে ছাঁটা। চওড়া জুলপি অল্প খাটো হয়েছে। তবে মাথার মধ্যিখানে চুলের বোঝা বিশেষ হালকা হয়নি। কয়েক জায়গায় খাবলা খাবলা কমেছে শুধু। কপালে S-এর মতো এক গোছা চুল লুটিয়ে আছে। ঝোলা গোঁফের প্যাটার্ন একই রকম। দাড়ি নেই, আগেও ছিল না। সব মিলিয়ে বেশ কেমন আলুথালু—কেয়ারফুল কেয়ারলেস ভাব।

“এ আবার কী!”

উচ্চাঙ্গের হাসি দিয়ে বলেছিল বাপি—“কেন খারাপ লাগছে?”

“না না। দারুণ। মারভেলাস। গ্রান্ড। কোথায় কাটলি, কখনো দেখিনি আগে।”

“কী করে দেখবি? কারণ বলতে পারিস ইণ্ডিয়াতে ও কাট্‌টা আমিই প্রথম দিলাম। খাঁটি ফরাসি কেতা।”

“মানে?” বাপির সঙ্গীদের চোখ ছানাবড়া।

বাপি বলেছিল, “ছোটকাকার চুল দেখে তুলে নিলাম স্টাইলটা। ছোটকাকা প্যারিসে থাকে। তিন দিনের জন্য ইন্ডিয়ায় এসেছিল। কাল রাতে এসেছিল আমাদের বাড়ি। আজ ভোরে আবার

চলে গেছে প্যারিস। প্যারিসে এই হেয়ার স্টাইলটা সবে চালু হয়েছে। অল্প দিনেই সাংঘাতিক পপুলার হয়ে গেছে। নর্মাল কোর্সে এ স্টাইল ফ্রান্স থেকে ইন্ডিয়ায় আসতে কমসে কম বছর খানেক লাগত। ছোট কাকার কৃপায় আগেই পৌঁছে গেল।"

"কে কেটেছে তোর চুল?"

"নরহরি। ওকে তক্ষুনি ডেকে এনে ছোটকাকার পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললাম—ডিজাইনটা মুখস্থ করে নাও। তা মোটামুটি ঠিকই কেটেছে।"

বাপি বোসের বন্ধুরা বৃথা বাক্যব্যয় না করে মডার্ন সেলুনের উদ্দেশে দৌড়েছিল।

দেখতে দেখতে রটে গিয়েছিল খবরটা। শুধু পাড়া নয়, দূর দূর থেকে লোক আসতে লাগল প্যারিসিয়ান হেয়ার কাটের অব্যর্থ আকর্ষণে।

কাঁচি চালাতে চালাতে নরহরি ভাবল—ইস্ কার্তিকের কাছে যাওয়া হচ্ছে না কিছুতেই। রোজই সে ভাবে—যাব। কার্তিককে ধন্যবাদ জানিয়ে আসব। কিন্তু রাতে দোকান বন্ধ করার পর এমন ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে নড়বার ক্ষমতা থাকে না। যাক্‌গে, আর দুটো দিন পরে যাওয়া যাবে। রবিবার দোকান বন্ধ—ওইদিন। এক হাঁড়ি রাজভোগ ঝুলিয়ে নিয়ে যাব হাতে।

[১৯৭৮, পক্ষীরাজ শারদীয়া]

ভজার চাঁদা তোলা

ইয়াং-বেঙ্গল স্পোর্টিং-ক্লাবের সভ্যরা ঠিক করল যে, এবার সরস্বতী পুজোটা একটু ধুমধাম করে করবে।

ইয়াং-বেঙ্গলের তরফ থেকে এই একটাই পুজো হয়। পাড়ায় এই একটাই বারোয়ারি সরস্বতীপুজো। তাই ধুমধাম মন্দ হয় না। তবে এবার একটু স্পেশাল ব্যবস্থা হোক—ক্লাবের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে।

ক্লাবের মাতব্বর ছেলেরা মিটিং করে ঝটপট একটা প্রোগ্রাম ছকে ফেলল—কী কী স্পেশাল হবে। স্পেশাল প্যান্ডেল, স্পেশাল বিসর্জন এবং পুজোর পরদিন এই সুবাদে একটা জলসা। বাকি সব অর্ডিনারি। অর্থাৎ আর-আর বছর যা হয় তাই।

ফাংশনটার উপরই জোর পড়ল সবচেয়ে বেশি। শুধু পাড়ার ছেলেমেয়েদের দিয়ে নাচ-গান আবৃত্তি নয়, যেমন গত বছর ও পাড়ার ভারতী সংঘ করেছিল। বাইরে থেকে দু-চার জন নামকরা গাইয়েকে আনতে হবে। একজন পুরস্কার পাওয়া সাহিত্যিককে আনবে প্রধান অতিথি করে। কিন্তু এমন একটা আয়োজন করতে যা সব-চাইতে বেশি দরকার তা হল টাকা। বাইরের শিল্পীরা তো বিনি পয়সায় আসবে না। সুতরাং এবার চাঁদা ওঠাতে হবে ঢের বেশি। আর এইখানেই যা মুশকিল।

পুজোর খরচা বাড়ছে বলে পাড়ার লোকের কাছে প্রতিবারই, কিঞ্চিৎ বেশি চাঁদা চাওয়া হয়। সবাই শুনে গাঁইগুঁই করে, অবশেষে কেউ কিছু বেশি দেয়, কেউ তা দেয় না। এবার এক্কেবারে দু-তিন গুণ বেশি চাইলে তা আদায় করা যাবে কি? যাহোক, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। দেখাই যাক কেমন চাঁদা ওঠে। বেগতিক বুঝলে না হয় শেষমেশ কিছু অনুষ্ঠান কাটছাঁট করা যাবে।

মিটিংয়ে ঠিক হল ক্লাবের ছোট বড় সব মেম্বারকে এবার চাঁদা তুলতে বেরতে হবে। সবাই বেশি করে চাইবে চাঁদা। ক্লাবের জয়ন্তী-উৎসবের কথাটা বুঝিয়ে বলবে লোককে। মাতব্বর দাদারা তো আছেই, ছোটদের এবার খুব চেষ্টা করতে হবে চাঁদা বাড়াতে।

সাহিত্যিক হারাধনদা হাত তুলে বলল, "আমার একটি প্রস্তাব আছে, আমাদের কনিষ্ঠ সভ্যভাইদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি চাঁদা তুলবে তাকে একটা পুরস্কার দেওয়া যেতে পারে।

বিচিত্র অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, রচনা-টচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার দেওয়ার সময় এটিও দেওয়া হবে। কী, কেমন হয়?"

সকলে হই হই করে উঠল। "দারুণ, দারুণ! টপ।"

"কী প্রাইজ?" ভজা জানতে চাইল।

সবাই থমকে গিয়ে তাকাল ভজার দিকে।

গোলগাল ফর্সা ভজা, ক্লাস নাইন-এ পড়ে। তাকে দেখায় একটু ক্যাবলা ক্যাবলা ভালমানুষ। তবে পাড়ার ছেলেরা জানে, ওটা চোখের ভুল।

হারাধনদা আমতা আমতা করল, "ধরো পদক। পদক দেওয়া যেতে পারে।"

"যদি কয়েকজনে মিলে একসঙ্গে তোলে, আর ফার্স্ট হয়, সব্বাই মেডেল পাবে?" ভজা জিজ্ঞেস করল।

"তা বটে, তা বটে।" হারাধনদা মাথা চুলকোয়, "না না, তা কী করে হয়। অতগুলো পদক। অনেক খরচা।"

"বেশ, কুড়ি টাকার প্রাইজ দেব মোট," ক্লাবের সেক্রেটারি ভুতের দল সমাধান দিল, "যদি কোনও গ্রুপ ফার্স্ট হয়, ওই টাকা তাদের মধ্যে ভাগ হবে।"

"ও টাকায় ইচ্ছে-মতো খেতে পাব?" বলেই ভজার চোখ দুটো চকচক করে ওঠে।

"না না তা কি হয়," ভজাকে বোঝাল ভুতোদা, "সেটা খারাপ দেখায়। বই কিনে দেব। গল্পের বই। যা তোমরা চাইবে।"

"মানে ওই টাকার মধ্যে কিন্তু।" ভজার মেজদা কোষাধ্যক্ষ গাবু সমঝে দেয়।

পেটুক ভজার মুখ একটু ব্যাজার হল।

হারাধনদা বলল, "খাওয়াটা কি বড় কথা ভাই? সবার সামনে মঞ্চে উঠে বই পুরস্কার নেবে। সেটা কত বড় সম্মান। সকলে জানতে চাইবে কী পেলে। বই শুনলে সবাই খুশি হবে। আর খাবার জিনিস দিচ্ছে শুনলে লোকে যে হাসবে। কী, তাই না, বলো তোমরা?"

লোকলজ্জার ভয়ে ভজা এই যুক্তি মেনে নিল। অন্য সব জুনিয়ার মেম্বারদের মুখ দেখে মনে হল, গল্পের বইয়ের চাইতে রসনা পরিতৃপ্তির ওপরেই তাদের ঝোঁক বেশি। নেহাত ক্লাবের প্রেস্টিজ বাঁচানোর খাতিরেই বই প্রাইজ নিতে রাজি হচ্ছে।

সেক্রেটারি ভুতো উৎসাহ দিল, "বেশ, প্রাইজ জিতলে খাওয়ানোও হবে। যার যা ইচ্ছে। চার—আচ্ছা না হয় পাঁচ টাকার। এটা আলাদা ফান্ড!"

ভজা ও অন্য ছোটদের মুখে এবার হাসি ফুটল।

ছোটদের পাঁচটা দল হল। চারটে দলে দুই বা তিনজন করে ছেলে। পঞ্চমটিকে ঠিক দল বলা যায় না, কারণ তাতে মাত্র একজন—স্বয়ং ভজা। অন্যরা যে যার পছন্দমতো বেছে নিল সঙ্গী। অনেকেই ভজাকে চেয়েছিল। কিন্তু ভজা বলল, "আমি একাই তুলব। আমার সঙ্গে আর কাউকে চাই না।"

ভজার কোনও বাছবিচার নেই। অন্যরা পছন্দমতো তাদের চাঁদা তোলার এলাকা ভাগ করে নিলে পর যা বাকি রইল তা নিল ভজা। পাড়ার একদম সীমানার বাড়িগুলোই পড়ল তার ভাগে। তার কিছু বাড়ির বাসিন্দা পাড়ায় তেমন চেনা নয়। পাড়ায় একটা ফ্ল্যাট বাড়ি উঠেছে

সবে। তার ভাড়াটেরা বছর খানেকের বেশি আসেনি। তাদের অনেকে আবার অবাঙালি। তাদেরকে পাড়ার পুজোর ঐতিহ্য বা জয়ন্তী উৎসবের মর্যাদা বোঝানো কঠিন। ভজা ছাড়া আর কেউ ওই বাড়িটায় চাঁদা তুলতে যেতে চাইল না।

তখনও পুজোর প্রায় দেড় মাস বাকি। ঠিক হল পুজোর অন্তত সাত দিন আগে সবাই জানাবে কে কেমন চাঁদা জোগাড় করতে পেরেছে। সেই বুঝে হবে খরচ-খরচার হিসেব।

ভজা বলল, "ভুতোদা বিল-বইয়ে ছেপে দেবেন—'জয়ন্তী উৎসব'। নাহলে ছোটদের কথায় বিশ্বাস করতে চাইবে না লোকে।"

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

এরপর থেকে পাড়ায় ছোট ছেলেদের হাবভাব গেল পালটে। তারা সদাই ব্যস্ত। যথেষ্ট ছেলে হয় না বলে বিকেলে লেক-মাঠে তাদের ক্রিকেট খেলা জমছে না। ছুটির দিনে পাড়ার রাস্তায় ইঁটের উইকেট খাড়া করে ছেলেদের টেস্ট-ক্রিকেটের আসর বসে না। পাড়াটা যেন খাঁ খাঁ করে। প্রায়ই দেখা যায় দুটো বা তিনটি ছেলে একসঙ্গে চলেছে, হাতে চাঁদার খাতা। পাড়ার রোজগেরে লোকেরা আতঙ্কিত। তারা বিল-বই হাতে ছেলে দেখলেই চলার গতি বাড়িয়ে দেয়। বাড়িতে খোঁজ করলে হামেশাই শোনা যায়, বাড়ি নেই, শরীর খারাপ। "পরে এসো।"

"ও, বেরিয়েছেন?"

ছেলেরা নাছোড়বান্দা। তারা পরম ধৈর্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে বাড়ির সামনে। শেষে বাইরে থেকে না এসে অনেক সময় বাধ্য হয়ে ঘর থেকেই বেরুতে হয় শিকারকে, এবং তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে।

কেবল ভজারই যেন কেমন গা-ছাড়া ভাব।

অবশ্য তাকে মাঝে-মাঝে দেখা যেত জামা-প্যান্টে ফিটফাট, চকচকে জুতো পায়ে, সযত্নে টেরি বাগিয়ে নিজের এলাকার দিকে চলেছে। তবে তেমন ঘোরাঘুরি করে বলে মনে হয় না। কখনও বা সে বিকেলে একা-একা চৌধুরিদের রকে বসে ঠ্যাং দোলায়। সন্ধে হলে ঠিকসময় বাড়ি ঢোকে। অপর সব ছেলেদের মতো হরদম দেরি করে বাড়ি ফেরার জন্যে বকুনিও খায় না।

ভজার হাল-চাল ক্লাবের বড়দেরও নজরে পড়ল। ব্যাপারটা কী! ও ফি বছর ভালই চাঁদা তোলে। পাড়ার কাকা, জ্যাঠা, মাসি, পিসিদের সঙ্গে ওর বেশ খাতির।

ভজাকে চাঙ্গা করতে হারাধনদা একদিন বলল, "কী ভজা, কেমন উঠছে চাঁদা? এবার কিন্তু খাটতে হবে। শ্রম চাই। কবি কী লিখেছেন জানো! —কষ্ট বিনা কেষ্ট লাভ হয় কি মহীতে?"

ভজা হেসে ঘাড় দোলাল।

পুজোর সাত দিন আগে। ইয়াং-বেঙ্গলের সভ্যরা তাদের আদায় চাঁদা জমা দল। ভজার জমার পরিমাণ দেখে সবাই থ। পাঁচশো পঁচিশ টাকা পঞ্চান্ন পয়সা। এত টাকা জুনিয়াররা দূরে থাকুক, সিনিয়ারদের মধ্যেও কোনও দল তুলতে পারেনি। বড় ছেলেদের যে-দলটি এর চাইতে বেশি চাঁদা তুলেছে তার পাণ্ডা খোদ সেক্রেটারি ভুতো। তারা গিয়েছিল পাড়ার বাছা-বাছা

লোকদের কাছে। ক্লাবের মুরুব্বি পয়সাওলা লোক যারা। আর ভজা একা এই কাণ্ড করেছে! আধচেনা বাড়িগুলোয় ঘুরে!

উচ্ছ্বসিত হারাধনদা বলে উঠল, "চমৎকার! অপূর্ব! এই অদ্ভুতকর্মা পুরুষটিকে, ইয়ে মানে বালকটিকে আমি কী বলে যে অভিনন্দন জানাব ভেবে পাচ্ছি না। আমি আমি..." সে কথা হারিয়ে ফেলল।

সেক্রেটারি ভুতোদা ভজার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'শাব্বাশ ভজা। কনগ্র্যাচুলেশনস।'

ভজা লাজুক-লাজুক হাসল।

অন্য ছোটরা অবিশ্বাস ও ঈর্ষা-মেশানো চোখে তাকিয়ে থাকে ভজার দিকে। মেজদা গাবু ভুরু কুঁচকে বলল, "এর সবটাই চাঁদা তো?" অর্থাৎ তার সন্দেহ, অন্য কোথা থেকে টাকা জোগাড় করে চাঁদা বলে চালিয়ে দিচ্ছে না তো ভজা। শেষে ফেরত না দিতে হয়।

"বিল-বই দেখে মিলিয়ে নিতে পারো।" ভজা গম্ভীর ভাবে জবাব দিল।

"ঠিক আছে। ঠিক আছে।" গাবু বাদে ক্লাবের সব সিনিয়ার মেম্বারই ভজার কথা বিনা দ্বিধায় মেনে নিল।

সেই দিনই বিকেলে সেক্রেটারি ভুতোকে ধরল ভজা, "ভুতোদা, আমার প্রাইজ?"

"হবে হবে, তাড়াহুড়োর কী। সময় আছে।"

ভজা কিন্তু ছাড়ে না। এখুনি চাই। হয়তো ভাবল, জয়ন্তীর হুল্লোড়ে প্রাইজ না ধামা-চাপা পড়ে যায়!

অগত্যা ভুতোদা বলল, "বেশ, চলো যাই দোকানে। আচ্ছা, আমি না, কাজ আছে, হারাধনকে নিয়ে যাও। টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি। বইয়ের ব্যাপার ও বোঝে ভাল।"

"আর পাঁচ টাকা? আমার খাওয়ার?" ভজা জানতে চাইল।

ভুতোদা ঢোক গিলল।

"খেও একদিন। নিশ্চয়ই পাবে।"

"না, আজই দিন।"

"আজই?"

"হুঁ, বড্ড ইচ্ছে করছে।"

"একাই খাবে? বন্ধুদের খাওয়াবে না?"

ভজা গাল ফুলিয়ে চোখ পিটপিট করতে লাগল। সাড়া দিল না। অর্থাৎ এসব ফালতু উপদেশ তার পছন্দ নয়। তার হক্কের ধনে অন্যে ভাগ বসাবে কেন?

"আচ্ছা, নাও তবে।" ভুতো পকেট থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বের করে ভজার হাতে দিল।

বইয়ের দোকানে হারাধনদা ভজাকে দু-একখানা মহাপুরুষের জীবনী গছাতে চেষ্টা করেছিল। ভজা কানই দিল না। সে নিল অ্যাডভেঞ্চার এবং ভূতের গল্পের বই। তারপর ঝুলোঝুলি—"বইগুলি আমি এখন নিয়ে যাই। পড়ে দেব।"

হারাধনদা বোঝাল, "পুরস্কার নেওয়ার আগেই কি সে-বই পড়ে ফেলতে আছে? পরে পড়বে, নইলে মজা থাকে না। তা ছাড়া ময়লা হয়ে যাবে।"

"আমি মলাট দিয়ে পড়ব। না পড়লে রাত্তিরে ঘুম আসবে না। সত্যি বলছি।"

বাধ্য হয়ে চারখানার মধ্যে দু-খানা বই ভজাকে দিতে হল। বই দুটো বগলদাবা করে সে তখুনি সরে পড়ল। বোধ হয় পাঁচ টাকার পেট-পুজো করার তাগিদে।

পুজোর আর তিন দিন বাকি।

রাস্তার একধারে ফুটপাতের অনেকখানি জুড়ে প্যান্ডেল বাঁধা হচ্ছে। দু-দুটো প্যান্ডেল। একটায় হবে পুজো, অন্যটায় জলসা। ইয়াং-বেঙ্গলের ছেলেদের আর নাওয়া-খাওয়ার ফুরসত নেই।

বিকেল বেলা। ভুতো এবং তার কয়েকজন সাঙ্গোপাঙ্গ প্যান্ডেলের কাছে এক রোয়াকে বসে। ঠাকুর বিসর্জনের শোভাযাত্রা কোন পথে যাবে তাই নিয়ে তুমুল তর্ক চলছে। একটা মোটরগাড়ি এসে থামল সামনে। নামলেন স্যুট-টাই পরা, টাকমাথা, মোটাসোটা এক ভদ্রলোক। এগিয়ে গেলেন আধখানা-খাটানো প্যান্ডেলের দিকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে নিজের মনেই জোরে জোরে মন্তব্য করলেন, "বাঃ। বেশ। ফাইন।"

ভদ্রলোক চাইলেন ভুতোদের পানে। একটু হাসলেন।

ভুতোর দল উঠে দাঁড়াল। ভদ্রলোককে তারা চেনে। মিঃ দত্ত। ওই নতুন তৈরি ফ্ল্যাটটায় এসেছেন। বড় চাকুরে।

"আনন্দ ঘোষ...। মানে ভজা আছে?" জিজ্ঞেস করলেন মিঃ দত্ত।

"ভজা!" এদিক-সেদিক তাকাল ভুতো, "নাঃ, দেখছি না। কিছু দরকার আছে?"

"হ্যাঁ, মানে তোমাদের প্রোগ্রামটা ফাংশনের" ভদ্রলোক ইতস্তত করেন।

"হয়ে গেছে ছাপা," জানাল ভুতো, "কাল-পরশুই পাবেন।"

"অল রাইট। কাল সকালে এসো তাহলে, ন'টার মধ্যে প্রোগ্রামটা নিয়ে। একটু আগে না জানলে অসুবিধে। সেদিন আবার তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে অফিস থেকে। হ্যাঁ, ফাংশন শেষ হতে খুব দেরি হবে না তো? আমি আবার রাত দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ি।"

"দশটা?' ভুতো কান চুলকোয়। "হোল-নাইট প্রোগ্রাম যে।"

মিঃ দত্ত বুঝলেন। বললেন, "ঠিক আছে, আমায় আগে ছেড়ে দিও। আর ভজাকে বোলো একবার যেতে।"

তিনি হাত নেড়ে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি চলে গেল।

"ওঃ খুব উৎসাহ!" বলল ভুতো, "মোটা চাঁদা দিয়েছেন। ওকে একটু খাতির করে বসাতে হবে, খেয়াল রাখিস। সকালে প্রোগ্রামটা দেখিয়ে আনব, না হয় ভজাকেই বলব নিয়ে যেতে।"

আরও আধ ঘণ্টাটাক কেটেছে। বছর তিরিশের এক ভদ্রলোক, লম্বা, রোগা, পরনে কালো কোট এবং সাদা ফুলপ্যান্ট, গটগটিয়ে হেঁটে এসে থামলেন প্যান্ডেলের কাছে। এধার ওধার চেয়ে ভুতোদের জিজ্ঞেস করলেন, "এটা ইয়াং বেঙ্গল ক্লাবের পুজো প্যান্ডেল?'

"হ্যাঁ।"

"ভজা আছে? মানে আনন্দ ঘোষ।"

"ভজা? কই, দেখছি না," ভুতো জবাব দিল।

"এই ক্লাবের কারও সঙ্গে কথা বলতে পারি?"

"আমি সেক্রেটারি। বলুন কী কথা?" বলল ভুতো।

"আমি মিস্টার বোনার্জির কাছ থেকে আসছি। ওঁর জুনিয়ার।"

"মি- বোনার্জি। ব্যারিস্টার। ওই নতুন লাল বাড়িটায় এসেছেন?" বলল ভুতো।

"রাইট। স্যার জানতে চাইলেন, আপনাদের প্রতিমা উন্মোচন কটার সময়?"

"প্রতিমা উন্মোচন!" ভুতো থতমত খেল।

"হুঁ। ভজা আই মিন, আনন্দ ঘোষ স্যারকে বলে এসেছিল যে, ঠিক সময়টা আপনারা মানে ক্লাবের সিনিয়াররা গিয়ে পরে জানিয়ে আসবেন। কিন্তু এখনও কেউ এল না দেখে স্যার আমাকে খোঁজ নিতে পাঠালেন। স্যার বিজি মানুষ। হুট করে বললেই কি আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারেন? স্যার বলেছেন, প্রোগ্রামটা সন্ধে ছ'টার পর ফেলতে। নইলে একটু অসুবিধে আছে।"

ভুতো হারাধন নিতাইরা চোখাচোখি করল।

তাদের ভাব-গতিক দেখে ব্যারিস্টার বোনার্জির জুনিয়ারের কেমন ধাঁধা লাগল। তিনি বললেন, "আপনাদের প্রতিমা তৈরি কদ্দূর?"

"হয়ে গেছে। পরশু ডেলিভারি নেব।" জানাল ভুতো।

"ডেলিভারি! কোথায় বানাচ্ছেন?"

"পটুয়াটোলা।"

"পটুয়াটোলা!" ভদ্রলোকের ভুরু কুঁচকে যায়, "আপনাদের কীসের ঠাকুর?"

"কেন, মাটির।"

"তবে যে বলল...."

"কী বলল?"

"আপনারা এবার কুমড়ো-বিচির ঠাকুর গড়ছেন। লবঙ্গ পাল তৈরি করবে।"

"ভজা বলেছে?" গরম হয়ে নিতাই কিছু বলতে যেতেই ভুতো তাকে এক অদৃশ্য গুঁতো মেরে থামিয়ে দিয়ে নিজে কথা বলল, "দেখুন দাদা, ইচ্ছে তো ছিল। পারলাম না। বড্ড খরচ। বাজেটে কুলোবে না। তাই এবার মাটির ঠাকুরই অর্ডার দিয়েছি। তবে দেখবেন কী দারুণ পোজ। আর কী বিউটিফুল সাজাব। আচ্ছা ভজা কী বলে এসেছে?"

"ভজা বলেছিল, কুমড়ো-বিচরি ঠাকুর হবে। আর স্যার যদি প্রতিমা উন্মোচন করেন তো খুব ভাল হয়। ক্লাবের বড়রা এসে ঠিক সময়টা জানিয়ে যাবে পরে। স্যার রাজিও হয়েছিলেন মোটামুটি। তা আপনাদের এই চেঞ্জটা আগে জানানো উচিত ছিল। মাটির ঠাকুর? দেখি স্যার কী বলেন। আচ্ছা আসবেন কাল সকালে ন'টা নাগাদ। আমি স্যারকে রাজি করাতে চেষ্টা করব।"

ব্যারিস্টার বোনার্জির জুনিয়ার একটু হতাশভাবে বিদায় নিলেন। "দেখছিস ভজাটার কাণ্ড।" নিতাই রাগে ফেটে পড়ল।

ভুতো বলল "হুঁ। যা-তা ভোগা দিয়ে ব্যারিস্টারের কাছ থেকে কত টাকা আদায় করেছে জানিস? পঞ্চাশ। আমি বিল-বই দেখেছি। কোনও রকমে ম্যানেজ করলাম। এ যে ভজার কীর্তি, তা তো বুঝবে না, মাঝপথে ক্লাবের বদনাম হয়ে যাবে। কী ওস্তাদ ছেলে! আমায় এসে

বলল একদিন—ভুতোদা, এবার কুমড়ো বিচিরি ঠাকুর করলে কেমন হয়? যেমন আগের বার শ্যামবাজারে করেছিল। লবঙ্গা পালকে অর্ডার দাও। ঘটা করে উন্মোচন হবে। কাগজে ছবি উঠবে। আমি বলেছিলাম, দেখি ভেবে। অনেক খরচ। ব্যাস, তারপর এইসব করে এসেছে লুকিয়ে। বিচ্ছুটা এমনভাবে বলেছে যে, শেষে দোষটা আমাদের ঘাড়েই পড়বে। ওর মুখ দেখে তো বুঝবে না কেউ, বেটা কত বড় ঘুঘু। ভাববে আমরাই ওকে বলতে পাঠিয়েছিলাম। এখন বেকায়দায় পড়ে মিছে কথা বলছি।"

"এখন কর্তব্য?" বিব্রত হারাধন জানতে চাইল।

সেক্রেটারি ভুতোর মাথা ঠান্ডা। এমনি অনেক ঝক্কি তাকে পোয়াতে হয়। খানিক ভেবে বলল, "ব্যারিস্টার সাহেব যদি রাজি থাকেন, না হয় লাগিয়ে দেব উন্মোচন। শাঁসালো মক্কেল। চটানো চলবে না। তাহলে একটা পয়সাও চাঁদা দেবে না পরের বছর।"

মিস মিত্রকে খট খট করে জুতোর শব্দ তুলে সবেগে আসতে দেখা গেল।

মিস মিত্র এই পাড়ার পুরনো বাসিন্দা। স্থানীয় মেয়ে-স্কুলের হেড মিসট্রেস। তিনি বিপুলবপু। চোখে পুরু কাচের চশমা। বছরভর তাঁর নিত্যসঙ্গী একটি কালো রঙের বেঁটে ছাতা। অত্যন্ত কড়া ধাতের মহিলা।

ওঁর বাড়িতেও ভজাকে পাঠানো হয়েছিল কারণ আর কেউ ওখানে চাঁদা চাইতে যেতে চায়নি। চাঁদা মিস মিত্র দেন বটে, তবে যৎসামান্য, এবং সেটুকু পাওয়ার আগে আদায়কারীকে মিস মিত্রের লেকচার হজম করতে হয় অন্তত ঘণ্টাখানেক। বিষয়—ছাত্র-জীবনের কর্তব্য। দুর্নীতির পরিমাণ। ইত্যাদি গুরুতর সব ব্যাপার।

এ হেন মিস মিত্রকে সটান এদিকে আসতে দেখে ভুতোরা পালাবে কিনা ভাবতে-লাগল। কিন্তু ভাবনাকে কাজে ফলাবার আগেই মিস মিত্র সামনে এসে পড়লেন এবং তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, "ভজা আছে?" "কস, দেখছি না।" জানাল কেষ্টা।

"তোমাদের সেক্রেটারি কে?"

ফ্যাকাশে-মুখ ভুতোকে বন্ধুরা ঠেলে এগিয়ে দিল।

"পুজোর ক'দিন বাকি?" ভুতোর নাকের ডগায় ছাতাটাকে নাচিয়ে নিয়ে মিস মিত্র প্রশ্ন করলেন।

"আজ্ঞে তিন দিন।" ভুতো ভয়ে ভয়ে জবাব দিল।

"বেশ। কিন্তু এখনও আমার কাছে কবিতাগুলো পাঠাওনি কেন?"

"আজ্ঞে কবতি! কীসের কবিতা?" ভুতো অগাধ জলে।

"বাঃ! চমৎকার! এই তোমাদের দায়িত্ব-জ্ঞান। তোমরাই না দেশের ভবিষ্যৎ?" মিস মিত্রের কণ্ঠ আরও উঁচু পর্দায় ওঠে।

ভুতোরা বুঝল এও ভজার কীর্তি। সে কিছু ঝামেলা পাকিয়ে এসেছে। ঘাবড়ে গিয়ে ওই নামটাই বেরল ভুতোর মুখ দিয়ে। "মানে ভজা?"

"ভজার নাম কোরো না।" ধমকালেন মিস মিত্র, "তার কর্তব্য সে করেছে, কিন্তু তোমাদের কর্তব্য? তার কী হল?"

"মানে কী বলেছিল?" ঢোক গিলল ভুতো।

"বাঃ চমৎকার! স্রেফ ভুলে মেরে দিয়েছ?" মিস মিত্রের কণ্ঠে ধিক্কার, "এদিকে তোমরাই বলে পাঠিয়েছ তাকে দিয়ে। ছিঃ, যত বাজে কাজে ব্যস্ত যে দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতি নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কই?" মিস মিত্র কটমট করে সবার মুখে চোখ বুলিয়ে নিলেন।

"সত্যি বলছি, ভজা কিছু বলেনি আমাদের।" ভুতো তোতলাতে থাকে।

"ভজাকে দোষ দিও না। ও ছোট ছেলে। হয়তো ভুলে গেছে সব বলতে। কথা ছিল তোমরা বড়রা আসবে পরে। যাওনি কেন? তখনই ফের বলে দিতাম।"

"আজ্ঞে, ভজা কী বলেছে আপনাকে?" ভুতো কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

"ভজা বলেছে, তোমরা আমায় আবৃত্তি প্রতিযোগিতার বিচারক করতে চাও। আমি রাজি হয়েছিলাম। আমার শত কাজের মাঝেও পাড়ার প্রতি এ কর্তব্যটুকু আমি এড়াতে পারিনি। কিন্তু বলেছিলাম যে, প্রতিযোগিতার কবিতাগুলো অন্তত চারদিন আগে আমায় টুকে পাঠাতে হবে। সৎ বিচারকের উচিত, কবিতাগুলো আগে থেকে পড়ে, ভেবে তবে প্রতিযোগীদের আবৃত্তি শোনা। হেলাফেলা করে কাজ করা আমার দস্তুর নয়।"

মিস মিত্র তাঁর হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, "হ্যাঁ শোনো। আজকেই কবিতাগুলো টুকে আমার বাড়িতে দিয়ে আসবে। আমি এখন বেরুচ্ছি। রাত আটটায় ফিরব। আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে আসা চাই। নয়তো এই দায়িত্ব গ্রহণে আমি অক্ষম। চলি।"

ধপ করে রকে বসে পড়ে ভুতো বিড়বিড় করে, "পাজি ভজা। তাই দশ টাকা দিয়েছে। কোনওবার দু-টাকার বেশি ঠেকায় না। বিল-বই দেখে আমি তখন হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম।"

"কী করবি?" উদ্বিগ্ন নিতাই জানতে চায়।

"ওঁকে একটা জাজ করতেই হবে।"

নিতাই বলল, "যারা কবিতা বলবে, ওঁকে দেখেই তো তারা নার্ভাস হয়ে যাবে।"

ভুতো বলল, "উপায় নেই। নইলে সারা পাড়া তুলকালাম করবেন, অপমান করেছি বলে। যা জাঁদরেল, ওঃ। ওঁর ছাত্রীদের হয়তো নিষেধ করে দেবেন আমাদের ফাংশনে গাইতে। ভাই হারাধন, কবিতাগুলো টুকে মিস মিত্রকে পৌঁছে দিস আজ সাড়ে আটটার মধ্যে। দেখি ভজাকে পেলে ওকে দিয়েই টোকাব। এই যে গাবু, ভজা কোথায় জানিস? ভীষণ দরকার।"

ভজার মেজদা গাবু তখুনি হাজির হয়েছিল। বলল, "কই, দেখিনি অনেকক্ষণ। আচ্ছা দেখে আসছি বাড়িতে আছে কিনা।"

কেষ্টা বলল, "হ্যাঁরে ভুতো, মিস্টার দত্ত যে এসেছিলেন, ভজা ওঁর কাছ থেকে চাঁদা নিয়েছে, না?"

"হুঁ।"

"ভজা ওঁকেও কোনও কথা-টথা দিয়ে ঝুলিয়ে আসেনি তো? কী রকম যেন উল্টো পাল্টা বকছিলেন?"

"হতে পারে," ভুতো হাল ছেড়ে দেয়, "কাল সকালে দেখা হলেই টের পাব কী বলেছে।"

গাবু ফিরে এসে থমথমে মুখে জানাল, "ভজা হঠাৎ মামার বাড়ি চলে গেছে আজ ভোরে।"

"কোথায়?"

"সোদপুর। কাল রোববার। পরশু সকালে ফিরবে। মাকে বলেছে ভজা, বড়মামাকে আচার খাওয়াইনি অনেক দিন। তোমার নতুন বানানো কুলের আচার নিয়ে যাই একশিশি। ব্যস, অমনি মা গলে গিয়ে মত দিয়ে দিয়েছে।"

গাবুকে প্যান্ডেল খাটানোর তদারকিতে রেখে ভুতোরা কেটে পড়ল। কে জানে আরও কাকে কী ভড়কি দিয়ে চাঁদার পরিমাণ বাড়িয়েছে ভজা। আজ প্যান্ডেল উঠতে দেখে সব একে একে হাজির হচ্ছে খোঁজ নিতে।

পরদিন সকালে গাবু জানাল, "কাল সন্ধ্যায় মিস্টার আয়ার এসেছিলেন। ভজা নাকি ওকে বলেছে, ওঁর টবের ফুল সাজিয়ে প্যান্ডেলে একটা ফ্লাওয়ার শো করতে চায় ক্লাব। ভদ্রলোক মহা খুশি। তবে বার বার বলে দিলেন, খুব সাবধানে নেওয়া-দেওয়া করতে হবে টব। খবরদার, একটাও যেন না ভাঙে। কোথায় সাজানো হবে টবগুলো, দেখতে চাইছিলেন। বলেছি, আমি জানি না।"

ভুতো বলল, "আয়ার কত টাকা চাঁদা দিয়েছে রে?"

"পঁচিশ।" রসিদ বই খুঁজে পেতে জানাল নিতাই।

"হুঁ, ভজার টোপ গিলেছে। ভজা একবার আমায় বলেছিল বটে, মিস্টার আয়ার ফুলের টবগুলো পুজো প্যান্ডেলে সাজালে হয়। ও পারমিশন জোগাড় করে দেবে। আমি বলেছিলুম, তা মন্দ হয় না। তারপর আর কিছু বলে-টলেনি। পাছে ওকে টব বইতে বলি, বোধহয় সেই ভয়ে। কম ধড়িবাজ? যাকগে, আনতে হবে টবগুলো। একটা জায়গা ঠিক করে রাখ।" ভুতো দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

"আর..." গাবু শুরু করে।

"আবার কে?" ভুতো চমকায়।

"মিসেস তলাপাত্র এসেছিলেন। চার নম্বর বাড়ির দোতলা। জিজ্ঞেস করছিলেন আমাদের প্রোগ্রাম কদ্দুর। আর উনি কী গাইবেন—আধুনিক না রবীন্দ্রসংগীত?"

"মানে?"

"ভজা ওঁকে বলে এসেছে গাইতে।"

"ও! তাই খুব প্র্যাকটিস চালাচ্ছে ক'দিন ধরে। বাপ রে, কী চাঁচা গলা! দেখ তো কত চাঁদা দিয়েছে?" বলল ভুতো।

"চল্লিশ।" জানাল নিতাই।

"তাহলে দিতেই হবে চান্স।" ভুতোর সিদ্ধান্ত, "তবে দুটোর বেশি কিছুতেই নয়, সাফ বলে দেব।"

মিঃ দত্তর কাছ থেকে ঘুরে এসে ভুতো রিপোর্ট দিল, "ভজা বলে এসেছে যে, পুরস্কার বিতরণী সভায় ক্লাবের তরফ থেকে মিস্টার দত্তকে সহ-সভাপতি করতে চায়। বোঝো ঠেলা। ভাগ্যি ভাল, ভদ্রলোক বক্তৃতা দিতে পারেন না। আর রাত দশটার মধ্যে পালাবেন। স্টেজে সভাপতির পাশে বসতে পেলেই খুশি। কী আর করা, তাই হবে।"

"সহ-সভাপতি আর কেউ আছে নাকি?" হারাধন উৎকণ্ঠিত।

"নাঃ। সেই বাঁচোয়া!" দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল ভুতো।

গাবু দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "ফিরুক ভজা।"

"আর ও ফিরেছে পুজোর আগে!" ভুতো মাথা নাড়ল।

ঠিকই তাই, ভজা ফেরেনি পুজোর আগে। ফিরেছিল তার পরদিন। সন্ধ্যায় ফাংশন শুরু হওয়ার একটু বাদেই।

মেজদার হাতের গোটা দুই গাঁট্টা হজম করেই সে এক ছুটে ঢুকে পড়ল প্যান্ডেলে। সোজা গিয়ে বসল মঞ্চের ধারে। ফাঁকে ফাঁকে নমস্কার করে নিল—মি- দত্ত, বোনার্জি সাহেব, মিস মিত্র, মিঃ আয়ার, মিসেস তলাপাত্র এবং এলাকার আরও কিছু মান্যগণ্য চাঁদাদাতাকে। তারপর সে যথাসময়ে হাসিমুখে মঞ্চে উঠল, শ্রেষ্ঠ চাঁদা সংগ্রাহকের পুরস্কার নিতে—তার পাওনা বাকি দুখানি বই।

পরে ক্লাবসুদ্ধ লোকের বকুনির উত্তরে নির্বিকার ভজা জানাল, "আমি তো আর কথা দিইনি কাউকে। শুধু বলেছিলাম, রাজি আছেন কিনা জেনে যাচ্ছি। এরপর বড়রা এসে পাকা কথা কইবে। তা ওনারা কেন ধরে নিলেন যে আমার কথাই ফাইনাল!"

[১৯৮১, আনন্দমেলা পুজাবার্ষিকী]

নতুন পাড়ায় নন্তু

নতুন পাড়ায় অনেকের সঙ্গে একে একে ভাব হল নন্তুর। নন্তুর বয়সি এবং নন্তুর চেয়ে ছোট বড় অনেক ছেলে থাকে পাড়ায়। নন্তু তাদের সঙ্গে মিশে স্কুলে যায়। ফুটবল খেলে। গুলি খেলে। লাট্টু খেলে। ঘুড়ি ওড়ায়। এ পাড়ার ছেলেগুলো ভালই শুধু এক ভোম্বা বাদে।

ভোম্বা নন্তুর চেয়ে বয়সে বেশ বড়। মাথায়ও ঢের উঁচু। যদিও পড়ে মাত্র এক ক্লাস ওপরে—ক্লাস এইটে। বার কয়েক নাকি ফেল করেছে। তার চওড়া গড়ন। শক্ত শক্ত হাত পা। মাথার চুল খাড়া খাড়া। ওর খুদে খুদে চোখের বাঁকা চাউনি দেখলে নন্তুর বুক দুরদুর করে। পাড়ার ছোট ছেলেরা ভোম্বাকে বেজায় ভয় পায়। কারণ ভোম্বা ছোটদের ওপর অযথা জোর জুলুম করে। তিন চারটি চেলা আছে তার। নন্তুর বরাত খারাপ। নতুন পাড়ায় এই সে এ হেন ভোম্বার বিষ নজরে পড়ে গেল।

দক্ষিণ কলকাতার এই বাসায় নন্তুরা তখন এসেছে মাত্র দুদিন। বিকেলে গলির ভিতর তিনটি ছেলে গুলি খেলছিল। কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিল নন্তু। তার পকেটে মার্বেল। ইচ্ছে খেলার। কিন্তু মুখ ফুটে বলার সাহস নেই। এমন সময় ভোম্বা এল, সঙ্গে দুই শাগরেদ।

কিরে তোরা নতুন এসেছিস? ভোম্বা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল নন্তুকে।

হ্যাঁ, মাথা নাড়ল নন্তু।

আগে কোথায় থাকতিস?

সুখচর।

সেটা আবার কোথা?

ব্যারাকপুর লাইনে। পানিহাটির কাছে।

হুঁ, তাচ্ছিল্লের আওয়াজ ছাড়ল ভোম্বা, কলকাতায় এসেছিস আগে?

না—

এমন চেহারা বানালি কী করে? খেতে পাস না? আহা যেন খ্যাংরা কাঠির মাথায় আলুরদম।

ভোম্বার চেলারা গুরুর রসিকতায় দাঁত বের করে হাসতে লাগল। মরমে মরে গেল নন্তু।

সে রোগা। তাই তার মনে একটু দুঃখ আছে। তা বলে কিন্তু সে ঘরকুনো দুর্বল নয়। খুব দৌড়ঝাঁপ করে।

গুলি খেলতে পারিস? ভোম্বার প্রশ্ন।

হ্যাঁ, নন্তু ঘাড় নাড়ে।

আছে গুলি?

হুঁ।

বেশ খেলবি আয়। দেখি তোর ঢক। ভোম্বা তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের দিকে চেয়ে চোখ মটকে বলল, বেটাকে একটু নাকে দড়ি দিয়ে খাটাই। এই খবরদার, খাটান না দিয়ে পালাতে পারবি নে।

ভোম্বার হাবভাব দেখে নন্তুর খেলার উৎসাহ উঠে গেল। কিন্তু তখন আর পেছাবার জো নেই। খেলা শুরু হল। যারা খেলছিল, খেলা বন্ধ করে তাদের ঘিরে দাঁড়াল কৌতূহলে।

ভোম্বা কিন্তু জুৎ করতে পারল না। মুখে যতই বড়াই করুক তার টিপ মোটেই ভাল নয়। বরং নন্তুর পাতলা নরম আঙুলে ঢের টিপ বেশি। হেরে গেল ভোম্বাকে তাই খাটতে হল উল্টে। অবশ্য খাটনি সে দিল না। গলা এবং গায়ের জোরে দণ্ড মকুব করিয়ে নিয়ে বলল, আয় ফের খেল।

সেবারও হারল ভোম্বা—পরপর তিনবার।

ভোম্বার চোখ মুখ লাল। দর্শকরা মুচকি মুচকি হাসছে। নতুন বাচ্চা ছেলেটার হাতে ভোম্বার দুর্দশায় অনেকেই খুশি। হঠাৎ ভোম্বা ফেটে পড়ল—যা আর খেলব না। আজ টিপ আসছে না। আর তুই বেটা জোচ্চোর।

বারে। জোচ্চুরি করলাম কখন। নন্তু প্রতিবাদ জানাল।

ভোম্বা চিৎকার করে উঠল, ফের তক্ক। মারব এক থাবড়া। তুই লুকিয়ে লুকিয়ে আঁট এগুচ্ছিলি, আমি দেখেছি। যা ভাগ।

ভয়ে ভয়ে চলে গেল নন্তু।

পাঁচজনের সামনে হেনস্তা হওয়ার কথাটা ভোম্বা ভুলল না। তাই নন্তুকে দেখলেই সে এক চোট শোধ তুলে দেয়।

এক ছুটির দিন সকালে পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে লেকে সাঁতার কাটতে গেল নন্তু। সবাই জলে দাপাদাপি করছে, এমন সময় ভোম্বা হাজির।

সে জলে নেমেই ছোটদের এক এক করে চোবাতে শুরু করল। একটা করে ছেলেকে ধরে, তার মাথাটা জলের নিচে ঠেসে রাখে। ছেলেটা ভীষণ হাঁসফাঁস করতে থাকলে তবে ছাড়ে। জল খেয়ে হেঁচে কেশে পালায় ছেলেটা। ভোম্বা আর তার শাগরেদরা হি হি করে হাসে। তবে যেসব ছেলের ষণ্ডামার্কা দাদা টাদা আছে তাদের ঘাঁটাল না ভোম্বা।

এই ইদিকে আয়, নন্তুকে ডাকল ভোম্বা।

ভোম্বার কাণ্ড দেখে নন্তুর বুক শুকিয়ে গিছল। সে কাছে এল না। ওকে কি আর এক চুবুনিতে ছাড়বে?

আয় বলছি, ভোম্বা গর্জন ছাড়ল।

না ভোম্বাদা, অনুনয় জানাল নন্তু।

আয় শিগগিরি—ভোম্বা নন্তুর দিকে এগোয়।

নন্তু দূরে সরে যায়।

তবে রে—ভোম্বা প্রবল দাপটে সাঁতরাল নন্তুকে ধরতে। কিন্তু পারল না।

ভোম্বার গায়ের জোর বেশি কিন্তু সাঁতারের কায়দা তেমন রপ্ত হয়। যত জল ছেটায় তত জোরে এগোয় না। নন্তু ছোট থেকে গঙ্গায় সাঁতরেছে। সে মহা ভয়ে মাছের মতো জল কেটে পালাল। খানিক ধাওয়া করে ভোম্বা বুঝল নন্তুকে পাকড়ানো তার কম্ম নয়। সে গজরাতে গজরাতে ফিরে এল।

রেহাই পেল না নন্তু। ডাঙায় উঠে ভিজে প্যান্ট বদলে বাড়ি রওনা দিয়েছে, পিছন থেকে এসে কঁ্যাক করে তার চুলে মুঠি চেপে ধরল ভোম্বা। তারপর ঠাঁই ঠাঁই দুই গাঁট্টা। ব্যথায় চোখে জল বেরিয়ে গেল নন্তুর।

জলে চোবাতে না পারার শোধ তুলল বটে কিন্তু ভোম্বা নন্তুর ওপর আরও চটল। কারণ সে যে সাঁতারে নন্তুর কাছে হেরে গেছে এটা ঠিক চাউর হয়ে যাবে পাড়ায়।

ভোম্বার অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠল নন্তুর। দেখা হলেই কোনও না কোনও ছুতোয় ভোম্বা তাকে কষাবে গাঁট্টা, চড়। রীতিমতো জোরে। খুব লাগে। ফুটবল খেলার সময় উল্টো দলে থাকলে, সামনে পড়লেই মারবে তাকে লাথি। আর তার নাম দিয়েছে—'আলুরদম'। ভোম্বার দেখাদেখি পাড়ার কিছু ছেলে নন্তুকে ওই নামে ডাকতে শুরু করল। দুষ্টু ছেলেরা তার বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে যেতে হাঁক পাড়ে—'আলু—দম্।'

মারধরের চেয়ে এই নামের খোঁচাটাই নন্তুর মনে বেশি বেঁধে।

সেদিন নন্তু বাইরের ঘরে বসে পড়ছে। একটা ছেলে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বলল, "কী রে আলুদ্দম্। খুব পড়ছিস?'

নন্তুর ছোট বোন অবাক হয়ে দাদার মুখের দিকে দেখে। নন্তুর কান ঝাঁ ঝাঁ। ঘাড় নিচু। ভান করে যেন শুনতে পায়নি কথাটা।

একদিন নন্তু তার দুই বন্ধুকে নিয়ে মহা উৎসাহে গল্প করছিল—সুখচরে কী রকম মস্ত জামরুল গাছে উঠে সে জামরুল পেড়ে খেত। ভোম্বা শুনে ফেলল। অমনি হুকুম দিল, "বটে। ওঠ দেখি ওই গাছটায়।"

সে এক বাড়ির বাগানে একটা খাড়া সুপারি গাছ দেখিয়ে দিল।

নন্তু কাতর ভাবে বলল, "ওটায় পারব না ভোম্বাদা।"

"পারতেই হবে। চাল মারার জায়গা পাসনি। ওঠ্, নইলে তোকে আজ মজা দেখাব।"

মারের ভয়ে সুপুরি গাছটায় উঠতে চেষ্টা করল নন্তু। কিন্তু আধাআধি গিয়ে আর পারল না। আধঘণ্টা ওইখানে গাছ আঁকড়ে ঝুলে থাকার পর সে নামতে পেল। হাত পা ছড়ে চোখ মুছতে মুছতে বাড়ি ফিরল।

নন্তু ভেবে পায় না কী করবে? মনে মনে ভারি একটা রাগ আর অভিমান জমে। হে ভগবান, আমি কী দোষ করেছি?

বাবাকে নালিশ করব ভোম্বার নামে? লাভ হবে না। বরং বাবা তাকেই বকুনি দেবে। বাবা

বলেন, ছোটদের ঝগড়াঝাঁটিতে বড়দের নাক গলানো উচিত নয়। ওরা নিজেরাই মিটমাট করুক।

ভোম্বাদার বাবাকে বলে দেব? কিন্তু ভদ্রলোক যা গম্ভীর, কথা কইতে ভয় হয়।

বেশ ছিলাম সুখচরে। কত বন্ধু ছিল। সেখানে দুষ্টু ছেলেদের দু-চারটে চড় চাপড় যে খেত না তা নয়। তবে ভোম্বার মতন কেউ ছিল না। কেউ বেশি বাড়াবাড়ি করলে পাড়ার বড় ছেলেদের নালিশ করে দিলে অত্যাচারীকে ধমকে দিত। এখানেও কয়েকজন মাতব্বর বড় ছেলে আছে। কিন্তু সে নতুন। তাকে কি পাত্তা দেবে কেউ। বরং হিতে বিপরীত হবে। কানে গেলে ভোম্বা খাপ্পা হয়ে উঠবে। নন্তু মনে মনে ভোম্বাকে জব্দ করার কত উপায় ভাবে।

এক বিকেলে সে লেক থেকে বেড়িয়ে ফিরছিল হাবুর সঙ্গে। হাবু বলল, "কুস্তি দেখবি?"—"কোথায়?"

একটা বড় বাড়ির উঠোনে ঢুকল তারা। ওখানে এক ব্যাগার। নানান বয়সি ছেলে এবং বয়স্ক লোকেও শরীরচর্চা করছে। কথাবার্তা খুব কম। কেবল ব্যায়ামের তালে তালে হুস্‌হাস্, ফোঁস্‌ফোঁস্ দম ফেলা। ঘামে ভেজা শরীরে সবল পেশির ঢেউ। নন্তু মুগ্ধ হয়ে দেখে।

নন্তুর পাড়ার একটি কলেজে পড়া ছেলে ব্যায়াম করছিল। সে নন্তুদের চিনে মাথা নাড়ল। নন্তু পায়ে পায়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, "মানিকদা, আমি একসারসাইজ করব। নেবেন?"

মানিকদা বলল, "বেশ বেশ, তবে এখন নয়।" আরও বছর খানেক পরে। এখনও তোমার বয়স হয়নি।"

"আচ্ছা একসারসাইজ করলে গায়ের জোর হতে কদ্দিন লাগবে?" নন্তু ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞেস করল।

মানিকদা হেসে বলল, "কী রকম গায়ের জোর চাই শুনি?"

"এই মানে"—কথাটা বলতে গিয়েও চেপে গেল নন্তু। তারপর তার চেয়ে কিছু বড় একটি ব্যায়ামরত দৃঢ় শরীর ছেলেকে দেখিয়ে? বলল, "ওই রকম।"

"বছর দু-তিন। যদি মন দিয়ে কর।"

মনে একটা আশা নিয়ে ফিরল নন্তু। আর কয়েক বছর, তারপর সে দেখে নেবে ভোম্বাদাকে কিন্তু এই কটা বছর কাটাই কী করে?

হাবু বলল, "জানিস আমার এক মাসতুতো দাদা যুযুৎসু আর ক্যারাটে শেখে। জাপানি প্যাঁচ। দারুণ। দু'গুণ বড় ছেলেকে পটকে দেওয়া যায়।"

নন্তু হাবুকে ধরল, "আমি শিখব। কোথায় শেখে?"

হাবু খোঁজ নিয়ে বলল, "ধর্মতলায় ক্লাব আছে। মাসে পঁচিশ টাকা চাঁদা।"

দমে গেল নন্তু। পঁচিশ টাকা! সে কোথায় পাবে? তাদের কোনও রকমে দিন চলে। পাড়ার ক্লাবে এক টাকা চাঁদা। তাই সাতবার তাগাদা দিয়ে মার থেকে আদায় করতে হয়।

রবিবার। দুপুরে ঘুমচ্ছিল নন্তু। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। কানে এল একটা শোরগোল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল, রাস্তার ওপারে বাড়িটার সামনে বেজায় ভিড়। সবাই

উত্তেজিত হয়ে হাঁকডাক চেঁচামেচি করছে। আর বাড়িটার তেতলার জানালা দিয়ে হু হু করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ঘন কালো ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে যাচ্ছে। বাতাসে বিশ্রী পোড়া গন্ধ। নির্ঘাৎ আগুন লেগেছে। নন্তু লাফ দিয়ে বাইরে বেরুল।

আগুন লাগা বাড়িটা তিনতলা। সেই বাড়ির বাসিন্দারা তখন ফুটপাতে এসে দাঁড়িয়েছে। একতলা এবং দোতলার জিনিসপত্র ডাঁই করা হচ্ছে রাস্তার ওপর। একবার করে লোকে বাড়িটার ভিতরে যায়। কিছু মাল বয়ে এনে বাইরে ফেলে। আবার ছোটে। তবে লোকে তেতলায় ঢুকতে আর সাহস পাচ্ছিল না। ওইখানে লেগেছে আগুন। স্টোভ ধরাবার সময় তেল গড়িয়ে এই বিপত্তি। তেতলায় ঢোকার মুখে রান্নাঘরে আগুন দাউ দাউ করছে। তেতলার বাকি জিনিসের জন্যে চলছে হাহুতাশ কান্নাকাটি।

কাঁউ কাঁউ!—হঠাৎ আগুন লাগা বাড়ির ওপরতলা থেকে একটি কুকুরের আর্ত কণ্ঠে চিৎকার শোনা গেল।

সবাই হায় হায় করে উঠল। ছাতে ওঠার সিঁড়ির নিচে বাঁধা ছিল বিল্টু। তেতলার লোকেরা তাড়াহুড়োয় নেমে আসার সময় বিল্টুকে খুলে আনতে ভুলে গেছে। তেতলায় রান্নাঘর থেকে ছাদের সিঁড়ি বেশ তফাতে। তবে এখন হয়তো আগুন ততদূর এগিয়েছে। টানা চেঁচিয়ে চলেছে বিল্টু। কী করুণ অসহায় কান্না!

কেউ কিন্তু বিল্টুর উদ্ধার করে আনতে ভরসা পেল না। সবাই বলল, "দমকল আসুক।"

বিল্টুর গা ভরা ধবধবে সাদা লোম। কী সুন্দর দেখতে! নন্তু কতদিন ওই তেতলায় গেছে বিল্টুকে আদর করার লোভে। দমকল আসার আগেই যদি ওর সর্বনাশ হয়ে যায়? নন্তু ছটফট করে।

আগুন লাগা বাড়িটার গা ঘেঁষে একটা মস্ত আমগাছ। ছাদের ওপর তার একটা ডাল ঝুঁকে রয়েছে। নন্তু গাছটাকে লক্ষ করল ভাল করে। সে তেতলার বঙ্কিমবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "ছাদের দরজাটা কি খোলা?"

"হ্যাঁ—।"

নন্তু তরতর করে গাছে চড়তে শুরু করল।

লোকে গোড়ায় টের পায়নি ওর মতলব। বোঝার পর চেঁচাল—"খোকা নেমে এসো। নন্তু নেমে আয়। পাগল নাকি! মরবি।"

নন্তু কান দেয় না। দেখতে দেখতে সে পৌঁছে যায় ছাদের ওপর। তারপর লাফ নিয়ে নামে ছাদে।

চিলে-কোঠার দরজা দিয়ে ধোঁয়ার স্রোত বেরিয়ে আসছে। দু-হাতে চোখ ঢেকে নন্তু নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। বিল্টু প্রাণপণে চেন টানছে, লাফাচ্ছে। বাঁধন ছেড়ার চেষ্টা করছে। বেচারির চোখ ঠিকরে এসেছে, জিভ বেরিয়ে পড়েছে। ভাগ্যি ভাল আগুন তখনও বিল্টুর কাছে পৌঁছয়নি। কিন্তু কী ভীষণ তাত! আর ধোঁয়ায় দম আটকে যাবে বুঝি।

নন্তু পলকে বিল্টুর গলা থেকে চেনটা খুলে তাকে জড়িয়ে তুলে দৌড়ে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে ছাদে। খোলা ছাদে এসে বেদম কাশতে লাগল। তার বুকের ভিতর বিল্টু তখন থরথর করে কাঁপছে।

আট-দশ হাত উঁচুতে আম গাছের ডাল, নাগালের অনেক বাইরে। গাছ বেয়ে নামার উপায় নেই। নন্তু বিল্টুকে কোলে নিয়ে ছাদের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল।

নিচ থেকে শত কণ্ঠে উপদেশ আর নির্দেশ ভেসে এল—"ভয় নেই। দমকল আসছে।"

সত্যি দমকল এসে পড়ল। পাড়ার লোক চিৎকার করে অনুরোধ জানাল, "ওই যে ছোট ছেলেটা, ছাদে কুকুর নিয়ে, ওকে আগে বাঁচান। শিগগির।"

পরদিন বিকেল। নন্তু যাচ্ছিল পাড়ার রাস্তা ধরে। তার মন ভারি খুশি। কাল থেকে কত প্রশংসা জুটছে।

"এই বেটা আলুদ্দম।"

আচমকা ভোম্বার ডাক শুনে সে থমকে গেল। পাশের গলি থেকে বেরিয়ে ভোম্বা তার পথ আগলে দাঁড়াল।—"কী রে চললি কোথা? কেয়ারই নেই?" ভোম্বা দস্তুর মাফিক হাত তুলল।

নন্তু কাঠ। তার গতকালের বহাদুরি নিশ্চয় ভোম্বার মনের বলা আরও বাড়িয়েছে। এবার ভুগতে হবে। কিন্তু ভোম্বার হাত নন্তুকে আঘাত করল না। মাঝ পথেই থেমে গেল। সে বলে উঠল, "খুব দেখিয়েছিস কাল! তোর কলজের জোর আছে বেটা আলুদ্দম।"

ভোম্বার গলার স্বরে মুখের ভাবে কী একটা চকিতে নজর করে নন্তু বুক ঠুকে বলে ফেলল, "ভোম্বাদা ও নামটায় ডেক না আমায়। লজ্জা করে। সবাই বড় খেপায়।"

"কী নাম? আলুদ্দম?"

"হুঁ।"

"ওঃ কি আমার ইয়েরে। ভোম্বা চড় ওঠায়। কিন্তু জোরে নয়, আলতো ভাবে তার হাতটা ছুঁয়ে গেল নন্তুর মাথা।

"ভোম্বাদা প্লিজ্। আর তুমি না করে দিলে আর কেউ আমায় ও নামে ডাকতে সাহস পাবে না।"

ভোম্বা মুরুব্বি চালে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "আচ্ছা আচ্ছা, হবে হবে। এখন লাট্টু খেলবি তো চ।"

[১৯৮১, পক্ষীরাজ, শারদীয়া]
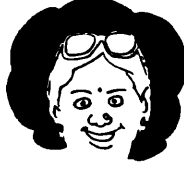
বাসে বিপত্তি

বাপি বুঝল যে আজ কপালে কষ্ট আছে।

সকাল আটটা থেকে ঝাড়া আধঘণ্টা বোলপুর চৌমাথায় দাঁড়িয়ে থেকেও দিঘা-সিউড়ি এক্সপ্রেস বাসের দেখা মিলল না। অতএব আজ আর আসছে এটি! সাধারণত এই বাসটাতেই সে যায়। চেনাশোনা ডেইলি-প্যাসেঞ্জাররা তার বসার জায়গাও রাখে।

বাপি যাবে এখান থেকে দুর্গাপুর। দুর্গাপুর থেকে আসানসোল। মাঝে মাঝেই তাকে আসানসোল যেতে হয় ব্যবসার কাজে।

সিউড়ি-বাঁকুড়া বাসটা এল। বেজায় ভিড়। তাই সই। ঠেলেঠুলে তার ভিতরে সেঁধোয় বাপি। প্রচণ্ড ঠেসাঠেসি। ভাল মতো পা ফেলারও জায়গা নেই। কোনও রকমে রড আঁকড়ে ঝুলে থাকা।

এর মাথা ওর নাকে ঠোক্কর মারছে। কত চশমা হড়কে পড়তে পড়তে বেঁচে যাচ্ছে। কার পকেটে কে যে হাত ভরছে। ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয়।

কেবলই শোনা যায়—'প্লিজ দাদা, পা-টা একটু সরিয়ে। আমার পায়ের ওপর আপনার জুতো।'

কেউ তাতে কান দিচ্ছে? কেউ দিচ্ছে না। উপায় কী? সরালে তো আরেক জনের পায়ের ঘাড়ে নিজের জুতোটা চাপাতে হয়। বেশি ঘ্যানঘ্যান করলে পা দু-এক ইঞ্চি নড়ে। ভ্যাপসা গরমে যাত্রীদের মেজাজ চড়ছে। কেবলই তর্ক বাধছে। নেহাতই হাতাহাতি করার মতো জায়গার অভাব। তাই অতদূর গড়াচ্ছে না।

পকেট নিয়ে বাপির উদ্বেগ নেই। বেশি টাকা ফুলপ্যান্টে কোমরের কাছে ভিতরের পকেটে। পাশের পকেটে শুধু একটা ঘেমো রুমাল, একটা চিরুনি এবং মাত্র বাস ভাড়াটুকু।

আজ নাকি বিয়ের ডেট। তাই রুটে বাস কম। অনেক বাস যে গেছে বিয়েতে ভাড়া খাটতে।

গজগজ করে যাত্রীরা।—'একই দিনে এতগুলো বিয়ে, মানে হয়? গোটা মাসটাই তো হাতে। একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে করলে কি ক্ষতি? যত্তো সব!'

একজন জানালেন সরবে, 'আমাদের পাড়ায় মশাই আজ তিনটে বিয়ে। তিন জায়গাতেই

না গেলে নয়। প্রেজেনটেশনও চাই। এক রাতে কি তিনটে খেয়ে উসুল করা যায়? তিনটে তিন দিনে ফেলতে পারত। যত বেআক্কেলে কারবার।'

এইভাবেই দুর্গাপুর স্টেশন এল।

বাপি নেমে ছুটে গিয়ে দেখল যে আসানসোলগামী ১০-১৫'র মিনি বাসটা নেই। স্টেশনে ঢোকেনি এখনো। আসবে কিনা ঠিক নেই। ১০-৩০'এর মিনিটা দাঁড়িয়ে। অগত্যা বাপি তাতেই উঠল। বসল সিটে। নাঃ, একেই দেরি হয়ে গেছে, আরও লেট হবে। তাহলে আজ হয়তো অর্ধেক কাজই সারা যাবে না।

হঠাৎ বাপি দেখে ১০-১৫'র মিনিটা ঢুকছে স্টেশনে। বাসগুলোর চেহারা ড্রাইভার কন্ডাক্টার সব তার চেনা। সে লাফ দিয়ে নেমে গিয়ে উঠল ১০-১৫'র বাসটায়। খানিকটা সময় অন্তত মেক-আপ হবে। ভাগ্যি ভাল যে বসার জায়গাও পেয়ে গেল।

'দেরি হলো যে?' কন্ডাকটারকে শুধোয় বাপি।

'কী করব? ড্রাইভার এল দেরিতে। পরশু তার ভাইয়ের বিয়ে। ভীষণ ব্যস্ত।'

কন্ডাক্টার গম্ভীর মুখে জানাল, 'শুনলাম, সামনে গন্ডগোল। ডবল-ডেকার একটা মোটর-সাইকেলকে ধাক্কা মেরেছে। খুব হৈ চৈ হচ্ছে। পাবলিক নাকি রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে।'

বাপি প্রমাদ গুনল।

কিন্তু অদ্দূর পৌঁছল না এই বাস। তার আগেই ব্রেক-ফেল্। সব যাত্রী নেমে পথে দাঁড়ায়। মিনিট কুড়ি বাদে দর্শন দিল সেই ১০-৩০'এর মিনি।

অন্যদের সঙ্গে সঙ্গে বাপিও ঢুকল ওই বাসের খোলে।

সমস্ত বসার সিট ভর্তি। তবে দাঁড়ানো যায় মোটামুটি। বাপি জুলজুল করে দেখে তার পুরনো সিটটা। ড্রাইভারের পাশে খাসা সিটখানা। আপাতত অন্যের দখলে। উঃ লাক্টা আজ যা বিট্রে করছে। দেরি তো যা হওয়ার হয়েছে। এখন গোটা রাস্তাটাই কি দাঁড়িয়ে যেতে হবে?

সেই অ্যাক্সিডেন্টের জায়গাটা এসে পড়ল।

বিশাল ভিড় জমেছে। দু'ধার থেকে আসা সব বাসকে থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রাইভেট গাড়ি বা লরিগুলো ভয়ে ভয়ে দূর দিয়ে কাটিয়ে যাচ্ছে। ডবল-ডেকারটাকে দেখা গেল। জনতার মাঝে মাথা তুলে বেচারি তার বিশাল বপু নিয়ে অসহায় ভাবে খাড়া। অবশ্যই আরোহীশূন্য।

যেসব বাস থামছে, তাদের যাত্রীরা অধিকাংশই নেমে পড়ছে পথে হুজুগ দেখতে। বাপির বাসের যাত্রীরাও নেমে পড়ল।

শোনা গেল যে মোটরবাইকের আরোহীটি গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে গেছে। তবে দোমড়ানো মোটরবাইকটি তখনো রাস্তায় শুয়ে। অকুস্থল পরিদর্শনে ছুটল অনেকে।

বাপি ভিড়ে ঢুকল না। নেমে বাসের কাছেই রইল। এই নতুন আপদে তার মন একদম খিঁচড়ে গেছে। বাপির বাসের ড্রাইভার ভিন্ন সবাই নেমেছে। মায় কন্ডাক্টার অবধি।

পুলিশও এসেছে অনেক। জনতার উত্তেজনা ক্রমে বাড়ছে—চড়ছে রোষ। উচ্চকণ্ঠে নানান মন্তব্য কানে আসে—

'আগুন লাগাও!'

'ডবল-ডেকারটা জ্বালিয়ে দে!'

'শুধু ওটা কেন? আরও বাস পোড়াব। পেয়েছেটা কী? খুশি মতো চালায়!'

পুলিশকে বলতে শোনা গেল—'না না, ওসব করবেন না। পাবলিক প্রপার্টি। আপনাদের প্রপার্টি। বাস পুড়লে প্যাসেঞ্জারদেরই অসুবিধা হবে।'

তা হয় হোক। একটু শিক্ষা দেওয়া উচিত। মাঝে মাঝে পোড়ানো দরকার। নইলে ব্যাটাদের বাড় বেড়ে যায়।'

'নো নো'—পুলিশের হুঁশিয়ারি।

'আলবৎ পোড়ায়।' অপর পক্ষের দৃপ্ত ঘোষণা।

দেখা গেল, কিছু তৎপর পাবলিক ছোটাছুটি করছেন তাদের কারও কারও হাতে কেরোসিনের টিন। ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়িয়ে মশাল বানানো হচ্ছে। উত্তেজনার সঙ্গে বেশ একটা উৎসব উৎসব ভাব। আসামি ডবল-ডেকারটাকেই প্রথম চিতায় তোলার তোড়জোড় চলছে।

এদিকে পুলিশদের মুখ ক্রমেই থমথমে হচ্ছে। তারা লাঠি বাগাচ্ছে। মাথায় হেলমেট টাইট করছে।

স্থানীয় দারোগা চোঙা মুখে লাগিয়ে চিৎকার করলেন জনগণের উদ্দেশে—'আর এক মিনিট সময় দিচ্ছি। এখুনি রাস্তা সাফ করে চলে যান সবাই। কেউ দাঁড়িয়ে ভিড় করবেন না। গাড়ি আটকাবেন না। নইলে অ্যাকশন নিতে বাধ্য হব। মনে রাখবেন, পাবলিক প্রপার্টিতে আগুন লাগানো গুরুতর অপরাধ।'

একদল লাঠি-হাতে সেপাই মশ্‌মশ্‌ করে চলল ডবল-ডেকার বাসটার দিকে। দারোগা খাপ থেকে রিভলবার বের করলেন।

গতিক সুবিধে নয়। বাপি গিয়ে বাসে উঠল। আরও কিছু যাত্রী এসে চড়ে পড়ল বাসে। ড্রাইভার দু'বার হর্ন বাজিয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছে। কন্ডাক্‌টার বাসের দরজায়। মোটামুটি সব বাসের অবস্থাটাই এই রকম।

হঠাৎ একরাশ ইট-পাটকেল উড়ে এল পুলিশদের তাক করে। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রকণ্ঠে হুংকার শোনা গেল —'চার্জ!'

মার্‌ মার্‌ করে লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেপাইরা। মুহূর্তে সে কী বিশৃঙ্খলা! তাণ্ডবও বলা যায়। হট্টগোল চেঁচামেচি। দৌড় দৌড়—

বৃষ্টির ধারার মতন ঢেলা বর্ষণ হতে লাগল পুলিশের দিকে, আশপাশ বাড়ির আনাচ-কানাচ থেকে। লড়াই পুরোপুরি জমে গেল।

গোঁ গোঁ শব্দ করে ঝাঁকুনি মেরে বাপিদের মিনি স্টার্ট দিল। শেষ সময়ে অনেকে ছুটে এসে উঠেছে বাসে। সবাই উদ্‌ভ্রান্ত। কেউ কেউ চটি হারিয়েছে। কারও জামা ছিঁড়েছে। লাঠিও খেয়েছে কেউ কেউ। প্রবল উত্তেজনায় ঘেমে নেয়ে অস্থির সবাই। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিচ্ছে বহু কণ্ঠ উচ্চরবে।

বাপি কান পেতে শুনছে সব। গল্প করতে পারবে বাড়ি ফিরে। তবে মনে একটু আশঙ্কা। কারণ ইতিমধ্যে সে অধিকার করেছে তার সেই আগের সিটটা, ড্রাইভারের পাশে। সিটের আসল মালিক না ফের হাজির হয়ে দাবি জানায়।

নাঃ কেউ তাকে তুলল না। নিশ্চিন্ত হয় বাপি। তাহলে আসল মালিক হয় উঠতে পারেনি, অথবা অন্য জায়গায় বসেছে। কিংবা আর বসবেই না মোটে। বাঁচা গেল।

বাপি নজর করে যে প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে কিছু পুরনো মুখ নেই। বাসে ভিড়ও খানিক পাতলা। যাক আরও দেরি হল বটে তবে একটু আরামে বসে যাওয়া যাবে বাকি পথ।

হু হু করে চলছে বাস। হঠাৎ হৈ চৈ। কানে আসে কাতর কণ্ঠ—'দোহাই দাদা, আমায় নামিয়ে দিন। আমি প্যাসেঞ্জার নই। আমার সেলুন খোলা পড়ে আছে।'

'কোথায় সেলুন?'

'ওই মোড়ে।'

'তা সেলুন ফেলে বেরিয়েছিলেন কী কত্তে?' আসল প্যাসেঞ্জারদের প্রশ্ন।

'আজ্ঞে স্যার, খদ্দের উঠে গেল হাপ-কেটে। ব্যাপার দেখতে। আমিও তাই—

'কী হাপ? চুল না দাড়ি?'

'চুল'।

বাপি খানিক উঠে সিটে হাঁটু ঠেকিয়ে ডিঙি মেরে দেখে। বাস থামে না। কন্ডাক্টার নির্বিকার।

হাঁউমাউ করে ওঠে সেলুন মালিক।—'প্লিজ স্যার। সব্বনাশ হয়ে যাবে! ফাঁক হয়ে যাবে দোকান।'

'হ্যাঃ। সেলুনে নেবেটা কী?'

'কাঁচি ক্লিপ চিরুনি ক্ষুর—যা পাবে। ওখানটা ছ্যাঁচোরের আড্ডা মশাই।

'তা এই বাসে উঠলেন কেন?'

'তাড়া খেয়ে দাদা। মাথার কি ঠিক ছিল?'

'এতক্ষণ হয়তো হাপ-কাট খদ্দের এসে দাদার শ্রাদ্ধ করছে।' টিপ্পনী কাটে একজন।

কিছু যাত্রীর মত—'একে নামিয়ে দেওয়া হোক। বেকায়দায় পড়ে গেছে।'

আর একদল বলল, 'আগে নয়। স্টপেজ আসুক। রগড়-দেখার সাধ মিটুক।'

মনোমতো সিট পেয়ে বাপি এখন উদার। তার সঙ্গে কন্ডাক্টারের বিলক্ষণ দোস্তি ছিল। সে ওকে অনুরোধ জানায়—'দাও ভাই নামিয়ে। ফেঁসে গেচে।'

'রোক্কে!' কন্ডাক্টার চেঁচায়।

বাস থামে। সেলুন মালিক লাফিয়ে নামে। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়য় উল্টো দিকে।

বাঘ বিপাক

দুলাল যখন গ্রামে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা নেমেছে। ভাদ্র মাস। সারাদিনের গুমোটের পর একটু বাতাস বইছে। এক ফালি চাঁদ সবেমাত্র দেখা দিয়েছে ঝকঝকে তারা ভরা আকাশে।

বাসরাস্তা থেকে গ্রাম তিনমাইল পথ। দুলাল প্রত্যেক দিন বাসে চেপে অফিস করতে যায়। বাস রাস্তা অবধি যাওয়া আসা করে সাইকেলে। বাস-স্টপেজের গায়ে একটা চায়ের দোকানে সাইকেল রাখে। ফেরে বিকেলে বা সন্ধ্যায়।

টর্চটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাই খুব ধীরে ধীরে সাইকেল চালাচ্ছিল দুলাল। চেনা পথ, বলতে গেলে মুখস্থ। তবে গাঁয়ে ঢোকার মুখে পথটুকু খারাপ। রাস্তা এবড়ো খেবড়ো। দুচার বার ঝরাং-ঝরাং করে লাফিয়ে উঠল সাইকেল। বর্ষার জল বয়ে নালা হয়েছে পথে। পড়তে পড়তে বেঁচে গেল দুলাল। তাই সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। শ-খানেক হাত সাইকেল ঠেলে নিয়ে গেলে ফের সমান রাস্তা পাবে। তখন সাইকেলে উঠবে।

এখানে বাড়ি ঘর তেমন ঘন নয়। পথের এক পাশে দূরে দূরে এক-একটা খড়ের বাড়ি-বড় বড় গাছপালায় ঘেরা। ছায়া ছায়া অন্ধকার। পথের অন্য পাশে ফাঁকা হাত পঞ্চাশ দূর দিয়ে একটা খাল গেছে রাস্তা বরাবর। রাস্তা ও খালের মাঝে ধান খেত। খালের গায়ে উঁচু পাড়ে কিছু ঝোপঝাড়।

হঠাৎ দুলাল থমকে গেল। খালের ধারে ঝোপের আড়ালে কী একটা প্রাণী গুঁড়ি মেরে বসে আছে? মাথাটা বেশ বড়, গোল। গায়ের রংটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। জন্তুটাও যেন তাকিয়ে আছে দুলালের দিকেই। কী জন্তু?

দুলাল মোটেই ভিতু নয়। কিন্তু এই নির্জনে আবছা চাঁদের আলোয় ওই অদ্ভুত জন্তুটাকে দেখে তার গা ছমছম করে উঠল। যোঁক করে একটা শব্দ করল জন্তুটা। তারপরই হঠাৎই উঠে একলাফে নেমে গেল পাড়ের ওধারে চোখের আড়ালে।

ওই ঝোপের দিকে ঠায় নজর রেখে দুলাল ফের এগোল, খুব টিপে টিপে। এমনিভাবে অনেকটা পথ পেরিয়ে সে আবার সাইকেলে উঠে প্যাডেল মারল। জন্তুটার অবশ্য আর দেখা পাওয়া গেল না।

গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায় নাড়ু ঘোষের দাওয়ায় যথারীতি আড্ডা বসেছে। মাঝে দুটো লণ্ঠন জ্বেলে রেখে কয়েকজন ঘিরে বসে গল্প-গুজব করছে। এখন চাষের কাজ কম। চাষিবাসী মানুষ তাই দুপুরে আরাম করে ঘুমোয়। বেশ রাত অবধি আড্ডা দেয়। কোথাও কোথাও বসে তাস বা দাবার আসর।

দুলাল তামল। নাড়ুদা তাকে এক কৌটো নস্যি কিনতে দিয়েছিলেন। সে নস্যির কৌটোটা বের করে নাড়ু ঘোষকে দিল। নাড়ুদা বললেন, 'আজ যে দেরি হল?'

দুলাল জবাব দিল, 'হ্যাঁ, সাড়ে পাঁচটার বাসটা যে চলল না। আর আমাদের গাঁয়ে ঢোকার পথটা যা হয়েছে, সাইকেল চালানো মুশকিল।' বলতে বলতেই তার মনে পড়ল সেই জন্তুটার কথা। বলল, 'জান নাড়ুদা, আজ খালপাড়ে কী জানি একটা জন্তু দেখলাম। অদ্ভুত দেখতে। অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারলাম না। লাফ দিয়ে নেমে গেল।

"শেয়াল বোধহয়', বললেন নাড়ু ঘোষ।

'উঁহু, শেয়াল নয়। মাথাটা এই এত্ত বড়। গোলপানা।'

'রংটা কী রকম?' নাড়ু ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন।

মনে হল হলুদের ওপর কালো ছোপ। আড্ডার চারজন চোখাচোখি করল। প্রৌঢ় নসুকাকার মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরল—'হুম।'

দুলাল আর দাঁড়াল না। তার ছেলের পরীক্ষা। রোজ সে অফিস থেকে ফিরে ছেলেকে খানিক পড়ায়।

দুলাল চলে যেতেই নাড়ু বললেন 'নসুকাকা কী বুঝলেন? জন্তুটা কী মনে হয়?' নসুকাকা একটু মাথা ঝাঁকিয়ে তার আশুমুখুজ্জেমার্কা ঝুলো গোঁফের ফাঁক দিয়ে ফের আওয়াজ করলেন, 'হুম।'

কুড়োরাম আড্ডায় সব থেকে চ্যাংড়া অর্থাৎ কম বয়সি। সে এতক্ষণ উসখুস করছিল। নসুকাকার মন্তব্যটা না শুনে নিজে কিছু বলাটা ভাল দেখায় না। তাই কোনও রকমে দম আটকে ছিল। নসুকাকা ঝেড়ে কাশছেন না দেখে সে আর থাকতে পারল না। বলে ফেলল, 'আমার মনে হয়—'

'কী?' নসুকাকা ভুরু কুঁচকে তাকালেন। কুড়োরাম আমতা আমতা করে, 'মানে এই সময়টায় আগেও কয়েকবার বেরিয়েছে শুনেছি—'

'কী বেরিয়েছে?' আড্ডার সবার চোখ ছোট হয়।

'মানে আমি ভাবছিলাম হয়তো বাঘ।'

'ভাগ্', শিবপদ তেড়ে উঠল, 'এদিকে আবার বাঘ কই? যত উদ্ঘুটে কল্পনা।'

'কেন, আছে তো দুমকা পাহাড়ের জঙ্গলে। চারবছর আগেই তো একটা ছটকে এসেছিল ইদিকে। ধানখেতে লুকিয়ে ছিল কদিন। সাঁওতালরা মারল।'

যাঃ। শিবপদ উড়িয়ে দেয়, 'সে তো পলাশপুরে এসেছিল। পাহাড়ের কাছে গাঁয়ে। এখান থেকে ঢের দূর।'

'কেন অসম্ভবটা কী হল শুনি? এতবড় গোলমাথা। লাফ দিল। বাঘ হতে অসম্ভবটা কী? রংটাও যা বলল মিলে যাচ্ছে। বাঘ অনেক দূরে চলে আসে শুনেছি। কুড়োরাম রেগে তর্ক জোড়ে।

'হুঁ, কুড়োর কথাগুলো একেবারে ফেলনা নয়,' এতক্ষণে মুখ খোলেন নসুকাকা, 'তবে—'আবার তিনি চিন্তামগ্ন হলেন।

'তা বটে', বললেন নাড়ু ঘোষ, 'আমাদের ছেলেবেলায় তো দু-এক বছর অন্তরই গুলবাঘ ছটকে আসত এধারে। তবে এখন আর জঙ্গল কই? বাঘও কমে গেছে।

গদাই এতক্ষণ চুপচাপ বিড়ি টানছিল। এবার উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তবে কি গত পরশু শ্যামানন্দের যে পাঁঠাটা হারাল! শ্যাম তো ধরে নিয়েছে পাড়ার বদমাশ ছোঁড়াগুলোর কীর্তি। কিন্তু এখন তো অন্যরকম মনে হচ্ছে!'

নসুকাকা ঘাড় নাড়লেন সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে। কেষ্ট এসে দাঁড়াল—'কী হয়েছে?' সেও এই আড্ডায় বসে। আজ দেরি হয়েছে। আসতে আসতেই কানে গেছে গদাই এর কথা।

'বাঘ', কুড়োরাম তক্ষুনি শুরু করে দেয়। হড়বড়িয়ে বলে দুলালের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। গদাইও ফাঁক পেলে মুখ খোলে। দুলালের বর্ণনার ওপর দুজনেই কিঞ্চিৎ রং চড়ায়।

শুনেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল কেষ্ট। 'তবে তো গাঁয়ের লোককে একটু সাবধান করে দেওয়া উচিত। গরু ছাগলের ভাবনা তো আছেই, হঠাৎ সামনে গিয়ে পড়লে মানুষজনেরও বিপদ ঘটতে পারে। কাল সাঁওতালদের বলতে হবে জানোয়ারটাকে খুঁজে বের করতে। কেষ্ট টর্চ বাগিয়ে পা চালাল। এটা তার স্বভাব। কোথাও কিছু ঘটলেই তা সারা গাঁয়ে চাউর না করা অবধি তার শান্তি নেই।

আড্ডা ভেঙে গেল। সবাই ফিরে চলল যে যার বাসায়। বুক দুরু দুরু। পথে কাউকে পেলে খবরটা শুনিয়ে দিতে হবে। অবশ্য কেষ্টর মতো এখুনি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘোষণা করার মতো উৎসাহ নেই অন্যদের। শুধু শিবপদ যেতে যেতে ব্যাজার মুখে বিড়বিড় করল, 'কেষ্টর সব তাতেই বাড়াবাড়ি। কী দরকার লোককে এই রাত্তিরে ব্যস্ত করা। সত্যি বাঘ কিনা তাই বা কে জানে?'

নিতাই রায়ের বৈঠকখানার দরজা খোলা। ঘরের মেঝেতে মাদুরে বসে হ্যারিকেন লণ্ঠনের পাশে দুটি নিথর মূর্তি। দুজনেরই মাথা সামনে ঝোঁকা। চোখ দাবা বোর্ডের ওপর।

কেষ্ট থামল। নিতাইদা সরল মানুষ সহজেই বিশ্বাস করানো যাবে কিন্তু ওই বৃদ্ধ ভব সরকার লোকটি অতি ত্যাঁদোড়। সব কিছুতেই যুক্তিতর্ক ফাঁদা চাই। ওকে এড়িয়ে চলে কেষ্ট। যা হোক তবু এত বড় খবরটা দেওয়ার লোভ সে সামলাতে পারল না। ঘরের দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে খুব গম্ভীর স্বরে বলল, 'নিতাইদা শুনেছেন খরবটা?'

দাবাড়ুরা চোখই তুলল না।

বার কয়েক গলা খাঁকরি এবং কথা বলার পর বুঁদ হওয়া মানুষ দুটোর ধ্যান ভাঙল। '—অ্যাঁ কে? কী ব্যাপার?'

দুলাল ধৈর্য হারিয়েছিল। জোরে বলল, 'শোনেননি, বাঘ বেরিয়েছে। একটু সাবধানে থাকবেন। যাচ্ছিলাম এ পথে, ভাবলাম বলে যাই।'

ভব সরকারের মাথা জোড়া টাক। চোখের আলসেতে সাদা ভুরুর জট। নাকের আগায় ঝোলা গোল চশমার পাঁচিল ডিঙিয়ে পিটপিট করে তাকিয়ে চাঁচা সুরে বললেন, 'কে দেখেছে?'

'আজ্ঞে দুলাল।'

'ও, তুমি দেখনি?'

'আজ্ঞে না।'

'দুলাল ঠিক দেখেছে কিনা জানলে কী করে?'

'আজ্ঞে ও যা বলল।' কেষ্ট সংক্ষেপে দুলালের অভিজ্ঞতা শোনায়।

ভব সরকার খাড়া হয়ে বসে নাক কুঁচকে কড়া গলায় বললেন, 'এতে মোটেই প্রমাণ হয় না যে ওটা বাঘ। 'সর্পে রজ্জু ভ্রম' বলে একটা কথা আছে শুনেছ? এ-ও তাই। আমার তো একবার আঁধারে কলাগাছের পাতা নড়া দেখে মনে হয়েছিল হাতি শুঁড় নাড়ছে। তোমারও বলিহারি খেয়েদেয়ে কাজ নেই, পরের মুখের ঝাল খেয়ে নেচে বেড়াচ্ছ। যত্ত সব। একখানা মোক্ষম চাল ভাবছিলাম, দিল গুলিয়ে।'

নিতাই রায় একটু বিচলিত হয়েছিলেন। বললেন, 'ভব তুমি বরং এখন বাড়ি যাও। কে জানে কী জন্তু?' ভব সরকার খেঁকিয়ে উঠলেন, 'আরে ধ্যাৎ, বাঘ অত সস্তা নয়। আর হলেই বা কী? বড় জোর গুল বাঘ। ওরা গাঁয়ে ঢোকে না। মানুষকে ডরায়। নাও নাও খেল—'

বাপরে কী মেজাজ! কেষ্ট ঘামতে ঘামতে বেরিয়ে এল। কয়েকটা বাড়ি পেরতেই পল্টন হাজরার মুখোমুখি। পল্টনের বাবার সাধ ছিল ছেলে মিলিটারিতে ঢুকবে। তাই আগে ভাগেই এই নামকরণ। দুঃখের বিষয় বাপের আশা পূরণ হয়নি কারণ পল্টন বেজায় ভিতু।

কেষ্ট বলল, 'পল্টন শুনেছিস গাঁয়ে বাঘ বেরিয়েছে?'

'অ্যাঁ!' পল্টন হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। 'কে বলল?'

'কে আবার বলবে, আমি নিজে দেখেছি।'

'অ্যাঁ, কোথায়?' পল্টনের চোখ ছানাবড়া।

'খালপাড়ে। এই তিন হাত উঁচু। ল্যাজ আছড়াচ্ছিল। খুব বেঁচে গেছি আজ।'

ভব সরকারের পাল্লায় পড়ে কেষ্ট বুঝেছিল যে অন্যে দেখেছে বললে লোকে বাঘের কথাটা বিশ্বাস নাও করতে পারে।

পল্টন কয়েক মুহূর্ত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ 'চলি গো', বলে মারল এক দৌড়। বুদ্ধিখানায় এমন হাতে নাতে ফল হল দেখে কেষ্ট খুশি মনে এবার চলল ক্লাবের দিকে। যাক পশ্চিমপাড়ায় যাওয়ার খাটুনিটা বেঁচে গেল। ওখানে পল্টনই খবরটা ছড়াবে।

গাঁয়ের পুব ধারে ক্লাব বাড়ি। পাশাপাশি দুটো ঘর। বারান্দায় হ্যাজাকের আলোয় তাস খেলছিল চারটি ছেলে। তাদের ঘিরে তিনজন দর্শক। সামনের চত্বরে বসে দুজন মেম্বার ঘোর তর্ক করছিল। বিষয়-এ বছর ফুটবলে আই. এফ. এ শিল্ড। লাইব্রেরি ঘরে এক মনে কাগজ পড়ছিল আরও দুজন। এরা সবাই যুবক। কেউ চাষ করে, কেউ চাকরি, কেউ বেকার, কেউ বা কলেজের পড়ুয়া।

কেষ্ট বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে এক নজরে সব কটিকে দেখে নিয়ে তাসের দর্শক ভোম্বলকে বেছে নিল। ছেলেটা একটু বোকাসোকা টাইপের, যা বলব চট করে মেনে নেবে। এঁড়ে তক্ক জুড়বে না। কেষ্ট বলল, 'ওহে ভম্বল সাবধানে থেকো। বেশি রাত কোরো না।'

'কেন কেষ্টদা?' ভোম্বলের প্রশ্ন। কয়েকজন কৌতূহলী হয়ে তাকায়।

'যা দেখলাম সতর্ক হওয়াই উচিত।' বলল কেষ্ট।

'কী দেখলেন?'

'মনে তো হল বাঘ।'

'সে কী!' সবাই চমকায়। 'কোথায়? আপনি নিজে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ তা দেখলাম বটে। ওইখাল পাড়ে। অবিশ্যি চাঁদের আলোয় খুব স্পষ্ট ঠাহর হয় না। তবু যা মনে হল বাঘই। নসুকাকাও তাই বললেন শুনে। আরও কে একজন নাকি দেখেছে।' এরপর কেষ্ট তার ব্যাঘ্র দর্শনের রোমহর্ষক বর্ণনা ফাঁদে। বলতে বলতেই বাঘটার আকার আরও বাড়ে। তেজও বাড়ে। নিজের কাছেই মনে হতে থাকে যেন সত্যি সে দেখেছে জ্যান্ত বাঘটাকে। ক্লাবের সবাই রুদ্ধশ্বাসে শোনে।

শেষে কেষ্ট বলল, 'বোধহয় দুমকা পাহাড় থেকে ছটকে এসেছে। নসুকাকা বলছিলেন আগে নাকি ফি বছরই এমনি আসত।'

ক্লাবের একটি ছেলে বলল, 'সার্কাসের বাঘও হতে পারে। গত বছর কাগজে পড়েছিলাম, একটা সার্কাসের বাঘ পালিয়েছিল সিউড়ির কাছে। কয়েকজনকে জখম করেছিল। তারপর তাকে মারে।'

'হুঁ, তাও হতে পারে'। সায় দিল কেষ্ট।

কেষ্ট বিদায় নিল। ক্লাবও তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল। কেষ্ট ভাবল এবার বাড়ি ফেরা যাক। গ্রাম নিশুতি হয়ে গেছে। একটু ভয়ভয় করছে ঘুরতে। যদিও ছোট বাঘ। মানুষকে আক্রমণ করে কদাচিৎ। তবু সাবধানের মার নেই। যাওয়ার পথে মকাই শার বড় কলকের আড্ডাতে একবার ঢুঁ মেরে যাব কি? না। দরকার নেই। গেঁজেলদের মগজে কিছু ঢোকানো ভারি কঠিন। বরং চণ্ডীতলায় যাত্রা রিহার্সালের আসরটায় একবার ঘুরে যাই। আজ রাতের মতন এইটুকুই থাক।

রাত আটটা অবধি ছেলের ইংরিজি ট্রানস্লেশন নিয়ে ধস্তাধস্তি করে দুলাল ক্ষান্ত দিল। ছেলের চোখ তখন ঘুমে জড়িয়ে আসছে। বাপের মেজাজ সপ্তমে।

'রবি ফিরেছে?' খোঁজ নিল দুলাল। রবি তার ছোট ভাই। মাধ্যমিক পাশ করে ঘরেই আছে। চাষবাস দেখে। চাকরিও খুঁজছে।

দুলালের স্ত্রী বলল, 'ঠাকুরপো ফেরেনি এখনো। যা তাসের নেশা। এক একদিন সাড়ে আটটা হয়ে যায়। কেন তোমার কি খিদে পেয়েছে? দেব খেতে?'

'না। থাক। রবি আসুক।' দুলাল উঠোনের খাটিয়ায় চিৎপাত হল।

রবি এল মিনিট পাঁচেক বাদেই। হন্তদন্ত হয়ে এসেই বলল, 'একি বাইরে কেন? শোননি বাঘ বেরিয়েছে? খালপাড়ে দেখা গেছে।'

দুলাল ধড়মড় করে উঠে বলল, 'অ্যাঁ বাঘ কে দেখেছে?'

'কেষ্টদা।'

দুলালের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। তবে তো সেই অদ্ভুত প্রাণীটা বাঘ। হুঁ ঠিক তাই। উ। সে খুব বেঁচে গেছে। বাড়িতে ভয় পাবে বলে নিজের অভিজ্ঞতা সে আর ভাঙল না।

তাড়াতাড়ি সদরে খিল পড়ল। গোয়ালটা একবার দেখতে গিয়ে দুলালের চক্ষুস্থির। বুধন কই?

বুধন তার বকনা বাছুর। ভারি সুন্দর চকচকে চেহারা কিন্তু মহা দুষ্টু। কেবল পালায়। স্ত্রীর ওপর দুলাল তম্বি করল, 'কারো যদি খেয়াল থাকে'। স্ত্রী দোষটা চাপাল কাজের লোক ভূষণের ঘাড়ে। খানিক চেঁচামেচির পর দুলাল ডাক দিল, 'রবি, সড়কি দুটো বের কর। আর দুটো টর্চ। চ আমার সঙ্গে।'

দুলালের বউ হাউ মাউ করে উঠল, 'সে কী গো, তুমি বেরুবে নাকি গরু খুঁজতে? শুনলে না বাঘ বেরিয়েছে?'

দুলাল দৃঢ়স্বরে বলল, 'যেতেই হবে। জেনেশুনে তো ছেড়ে দিতে পারি না যমের মুখে। গো হত্যার ভাগী হব। হয়তো এখনো বেশি দূর যায়নি। সারারাত বাইরে থাকলে কি আর ও বাঁচবে?'

রবিকে দেখে বোঝা গেল সে বিলক্ষণ ভয় পেয়েছে। কিন্তু দাদাকে একা ছাড়া যায় না। যা রোখ দাদার, আর কেউ না গেলে একাই যাবে। এখন পাড়ার কাউকে ডাকলেও বেরোবে কিনা ঘোর সন্দেহ।

পথে বের হল দুজন। গাঁ শুনশান। একটিও লোক নেই বাইরে। সড়কি বাগিয়ে আশেপাশে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে চলল তারা। চরণ দাসের বাড়ির জানালা দিয়ে হাঁক এল, 'কে?' উত্তর হল, 'আমি দুলাল। বকনাটা পালিয়েছে, তাই খুঁজছি।' চরণ বলল, 'পাগল নাকি? শোননি বাঘ বেরিয়েছে? প্রাণটা খোয়াবে যে।'

দুলাল জবাব না দিয়ে এগোল।

কোথায় বুধন? পাত্তা নেই।

দুলাল বলল, 'রবি চল ঠাকুরপুকুরটা দেখে আসি। আগে একবার ওখান থেকে ধরে এনেছিলাম বুধনকে। বেটা কচি ঘাসের লোভে ওর পাড়ে যায়।'

'ঠাকুরপুকুর!' কাঁপা গলায় উচ্চারণ করল রবি।

গাঁয়ের পুব সীমানায় ঠাকুরপুকুর। মস্ত জলাশয়। জায়গাটা ভারি নির্জন, ফাঁকা।

ঠাকুরপুকুরের ধারে গিয়ে দুজনে চুপচাপ। কান খাড়া, খর দৃষ্টি। টর্চ জ্বালতে ভয় হচ্ছে। যদি ধারে কাছে থাকে বাঘটা, আলো দেখে নজর করবে তাদের। হঠাৎ তাদের কানে এল কেমন বিদঘুটে কতগুলো শব্দ। দুজনে কাঠ। রবি দাদার পিছনে সেঁটে গেল। দুলালের তীক্ষ্ণ নজর ঘুরতে ঘুরতে সহসা স্থির হল। সে দেখতে পেল পুকুর পাড়ে একটা ঝোপের পাশে সেই অদ্ভুত জন্তুটা। মানে বাঘ। চাঁদের আলো ও গাছের ছায়ার আলো আঁধারিতে আবছা দেখা যাচ্ছে। তেমনি গুঁড়ি মেরে বসে আছে জন্তুটা। মস্ত গোল মাথাখানা নাড়ছে।

দুলাল পা টিপে টিপে পেছোতে লাগল। রবি ব্যাপার ঠিক না বুঝেই দাদার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনে লাগা কামরার মতো পিছু হটে। হঠাৎ দুলালের কানে এল একটা ক্ষীণ ডাক-ম্যাঁ। তার সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। এ ডাক তার চেনা। বুধনের গলা। বাঘটার কাছাকাছি থেকেই ভেসে এসেছে বেচারের কাতর প্রার্থনা।

দুলাল ভেবে নিল, প্রথমে বাঘটার মুখে জোরালো আলো ফেলব, তারপরই বিকট চিৎকার দেব। ছোট বাঘ, হয়তো ঘাবড়ে গিয়ে পালাতে পারে। তা নইলে যাব তেড়ে। যা থাকে কপালে। সে তাক করে টর্চের আলো ফেলল বাঘটার মুখের ওপর। কিন্তু পরক্ষণেই হুংকারটা

আর দেওয়া হল না। একেবারে থ মেরে দেখল-গুঁড়ি মেরে বসে আছে গাঁয়ের সব চাইতে বিচ্ছু চোর ঘিয়ে রঙের নেড়ি কুকুরটা। তার গলায় একটা মেটে হাঁড়ির কানা।

কুকুরটা নির্ঘাৎ খাবারের লোভে হাঁড়িটার সরু মুখে ঠেলে মাথা ঢুকিয়েছিল। কিন্তু মুন্ডুটা আর বের করতে পারেনি টেনে, আটকে গেছে। ঠুকে ঠুকে হাঁড়ির দেহটা ভেঙে ফেলেছে, তবে ভাঙা হাঁড়ির গোল মাথাটা এখনো ঝুলছে তার গলায়। আর কুকুরটির পাশে খাড়া পলাতক বুধন।

পুঁচকের বাহাদুরি

রতন একটা হনুমান পুষেছে।

হনুমানটাকে রতন এনেছিল যখন এক্কেবারে বাচ্চা। ওর মা হঠাৎ মরে গিয়েছিল ইলেকট্রিক তারের শক লেগে। কাকেরা ঠোকরাচ্ছিল মরো-মরো ছোট্ট বাচ্চাটাকে। আর রাস্তার কুকুরগুলো ওৎ পেতেছিল ছাদ থেকে নিচে নামলেই ওকে ধরবে। অন্য হনুরা কেউ তখন কাছে ছিল না ওকে বাঁচাতে।

বাচ্চাটাকে রতন বাড়ি নিয়ে এল। অনেকে সেবাযত্ন করে তাকে সুস্থ করে তুলল। ওর নাম রাখল পুঁচকে।

পুঁচকে রতনের বেজায় ন্যাওটা হয়ে উঠল। রতন বাড়ি থাকলে সবসময় তার পায়ে পায়ে ঘোরে। রতন কাছে কোথাও গেলে পুঁচকে তার কাঁধে চড়ে বেড়ায়। রতন দূরে গেলে পুঁচকেকে বেঁধে রেখে যায়।

চার হাত উঁচু এক বাঁশের খুঁটি। তার উপর একটা কাঠের বাক্স। পুঁচকের আস্তানা। পুঁচকে লম্বা দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে খুঁটির মাথায়। কখনও পুঁচকে বাক্সের উপর বসে চুপচাপ গাল-গলা চুলকোয়। এদিক সেদিক তাকায়। কখনও সে ভারি ব্যস্ত হয়ে পায়চারি করে। পায়চারি অর্থাৎ ক্রমাগত খুঁটির গা বেয়ে একবার নিচে নামে আবার উপরে ওঠে।

পুঁচকে সবচেয়ে ভালবাসে রতনের সঙ্গে সাইকেল চেপে ঘুরতে।

রতনের একটা বাইসাইকেল আছে। সাইকেলে চড়ে কাছাকাছি গেলে সে পুঁচকেকে সঙ্গে নেয়।

পুঁচকে যখন ছোট ছিল তখন সাইকেলে বেরলে সে রতনের কাঁধে উঠে বসে থাকত। কখনও বা বসত সাইকেলের হাতলে। সাইকেল ছুটলে ভারি মজা পেত। পিটপিট করে দেখতে দেখতে যেত চারধার। কোনও কুকুর ওকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করলে ঝপ্ করে উঠে বসত রতনের কাঁধে।

দেখতে দেখতে পুঁচকে আর কিন্তু পুঁচকে রইল না। মস্ত বড় হয়ে গেল। রীতিমতো গোবদা হনুমান। রতনের সঙ্গে সাইকেলে বেরলে আর সে রতনের কাঁধে চাপে না। বেজায় ভারী হয়ে গেল যে। সামনে হাতলে বসলেও মুশকিল। সাইকেল চালাতে অসুবিধা হয়। তাই এখন পুঁচকে

বসে সাইকেলের পিছনের সিটে। হাত দিয়ে ধরে থাকে সিটের নিচে অথবা রতনের কোমর। তার লম্বা লেজটা পাছে সাইকেলের চাকায় জড়িয়ে যায় তাই গুটিয়ে সামনে তুলে রাখে।

সব জায়গায় আর তাকে নিয়ে যায় না রতন। অতবড় গোদা হনুকে দেখে অনেকে ভয় পায়। তবে অশ্বত্থতলার বেদিতে যখন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে যায় রতন, তখন অবশ্য পুঁচকে সঙ্গে থাকে। যতক্ষণ রতন গল্প করে পুঁচকে সে সময়ে গাছের ডালে ডালে ঘোরে। গাছে বা কাছাকাছি মাটিতে বেড়িয়ে এটা সেটা খায়।

একদিন সকালে রতন আড্ডা মারতে বেরচ্ছে অশ্বত্থতলায়, তার মা বললেন, 'রতন, দোকান থেকে একটু গরম-মশলা কিনে আনিস। এই নে পয়সা। বাজারের মোড়ে দশকর্মা ভাণ্ডার, সেখান থেকে কিনিস। ওখানকার মশলা ভাল। কিনে এখুনি দিয়ে যেতে হবে না। ফেরার সময় আনলেই হবে। রাতে রান্নার জন্যে লাগবে।'

রতন পুঁচকেকে নিয়ে বেরল সাইকেলে। ভাবল, যাওয়ার পথেও মশলাটা কিনে নিয়ে যাই। নইলে হয়তো ভুলে যাব পরে।

দশকর্মা ভাণ্ডারের গায়ে সাইকেল ঠেস দিয়ে রেখে রতন ভিতরে ঢুকল। সাইকেলে তালা লাগাল না। ভাবল, একটুখানি মশলা, এখুনি কিনে নিয়ে বেরিয়ে আসব। তার জন্যে আর তালা লাগানোর ঝামেলা করার দরকার কী? তাছাড়া দোকান থেকেই সাইকেলের উপর নজর রাখতে পারব।

রতনের গরম-মশলা কেনা কিন্তু চট করে হল না।

দোকান বেশ ভিড়। কর্মচারীরা ছোটাছুটি করছে।

রতন চাইল তার জিনিস।

দোকানের একজন লোক মুখে বলল বটে, 'দিচ্ছি', তবে দেখা গেল তারা বড় বড় খদ্দের সামলাতে বেশি ব্যস্ত। রতনের ওই সামান্য জিনিস দিতে কারও আগ্রহ নেই।

রতন জোর তাগাদা শুরু করে দিল।

এই সময় একটি লোক গুটি গুটি এসে দাঁড়াল রতনের সাইকেল ঘেঁষে। সে একটু দূরেই ছিল। নজর রাখছিল অন্যদের সাইকেলের দিকে। সে লক্ষ করল রতনের সাইকেলে তালা পড়ল না। লোকটা একজন সাইকেল চোর।

সাইকেল চোর উঁকি মেরে দেখে নিল যে রতন দোকানের ভিড়ের আড়ালে। এবং সাইকেলের দিকে রতনের চোখ নেই। অমনি ঝট করে সাইকেলটা টেনে নিয়ে চেপে বসল চোরটা। সে উধাও হয়েই যেত কিন্তু পারল না।

পুঁচকে দোকানের এক কোণে বসে মেঝে থেকে চাল গম ছোলা এইসব খুঁটে খুঁটে তুলে খেয়ে সময় কাটাচ্ছিল। হঠাৎ দেখল, একটা অচেনা লোক তাদের সাইকেলটা নিয়ে চলে যাচ্ছে। পুঁচকের মনে ভারি ধোঁকা লাগল। তার বোধ হল, লোকটার রকম ভাল নয়। ওকে আটকানো উচিত।

অমনি পুঁচকে 'হুপ' বলে এক ডাক ছেড়ে লম্বা লাফে পড়ল গিয়ে সাইকেলের চোরের ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মুঠো করে আঁকড়ে ধরল লোকটার চুলের গোছা।

চোর তো 'বাপ্‌রে' বলে সাইকেলসুদ্ধ হুমড়ি খেয়ে পড়ল চৌরাস্তায়।

'কী হলো? কী হল?' লোকজন ছুটে এল। হই হই কাণ্ড।

অন্যদের সঙ্গে রতনও ছুটল ব্যাপার দেখতে। ভিড় ঠেলে সামনে গিয়েই সে থ'। আরে এ যে তারই সাইকেল পড়ে আছে রাস্তায়। আর পাশেই কাত হয়ে শোওয়া একটা লোকের উপর চেপে বসেছে পুঁচকে। এক হাতে সে পাকড়ে ধরেছে লোকটার চুল এবং ভীষণভাবে দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখাচ্ছে লোকটাকে।

রতন বুঝে ফেলল, ওই লোকটা নির্ঘাত সাইকেল চোর। ভাগ্যিস পুঁচকে ধরেছে। সে চারপাশে ঘিরে থাকা জনতাকে চটপট বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা।

ব্যাস, তারপরই-'মার মার।' খুব পিটুনি খেল চোরটা।

এরপর থেকে লোকের মুখে মুখে শুধু পুঁচকের বাহাদুরির গল্প।

ফেকলুদার গাড়ি

সেদিন স্কুলে ছুটি ছিল। সকাল এগারোটা নাগাদ কয়েক রাউন্ড গুলি খেলার পর দক্ষিণ কলকাতার যতীন দাস রোডে বাঁড়ুজ্যেদের রকে বসে আড্ডা দিচ্ছিল অন্তু, ছোটন, শিবু। এমন সময় ভজা এল।

ভজা কাছে এসেই সতর্ক চোখে চারপাশটা দেখে নিয়ে নিচু গলায় বলল, "এই যে, তোদেরই খুঁজছিলুম। শোন, গাড়ি চড়ে বেড়িয়ে আসবি একদিন? বিনি পয়সায়। বাসে-ট্রেনে নয়, প্রাইভেট মোটরে। বলে-কয়ে ম্যানেজ করেছি। পরশু যাব। রোববার।"

"কোথায়?" তিনজনে সমস্বরে জিজ্ঞেস করে।

ভজা বলল, "বেশি দূরে নয় অবিশ্যি, টিটাগড়। ব্যারাকপুর লাইনে। সকালে বেরোব। বিকেলে ফিরে আসব।"

"কার গাড়ি?" "কাকে ম্যানেজ করেছিস?" "আর কে কে যাবে?" পরপর অনেকগুলো প্রশ্ন হয়।

ভজা বলল, "আমরা চারজন আর ড্রাইভার। মানে গাড়ির মালিক স্বয়ং। আর কেউ নয়। নির্ঝঞ্ঝাট তোফা ট্রিপ। উনি একটা কাজে যাবেন টিটাগড়ে। গাড়ি ফাঁকা যাবে কেন? তাই আমাদের সঙ্গে নিতে রাজি করিয়েছি।"

"কার গাড়ি?" জিজ্ঞেস করে অন্তু।

'অম্বুজাক্ষবাবুর, মানে ফেকলুদার। টিটাগড়ে ওঁর শ্বশুরবাড়ি। কী একটা কাজে যাবেন। আসলে নতুন গাড়ি কিনেছেন কিনা, তাই একবার দেখিয়ে আসতে চান।"

"অ্যাঁ, ফেকলুদা!" অন্তু ছোটন শিবু তিনজনেরই চোখ বড়-বড়।

শিবু বলল, "ফেকলুদার গাড়িতে অত দূর। উঁহু, খুব রিস্কি।"

"কেন, কীসের রিস্ক?" ভজা তেড়ে ওঠে।

অন্তু মাথা চুলকে চিন্তিতভাবে বলল, "তা একটু রিস্ক আছে বইকি। কেমন জানি টাল খেতে-খেতে গাড়ি চালান।"

"সে প্রথম-প্রথম চালাতেন। এখন দিব্যি ড্রাইভ করেন। আমি নিজে চড়ে দেখেছি।" ভজা দাবড়ে দেয়।

"তা বেশ। কিন্তু যদি বারবার গাড়ি ঠেলতে হয়?" ছোটন প্রশ্ন তোলে।

"হবে না", ভজা অভয় দেয়। ফেকলুদা বলেছেন ইঞ্জিনের ওই ডিফেক্টটুকু ঠিক করে ফেলবেন। এঃ, তোদের দেখছি বেশি-বেশি। নেহাতই যদি দু-একবার ঠেলতেই হয় কয়েক পা, কী এমন কষ্ট রে? ননীর পুতুল সব। ইদিকে ফ্রিতে এতটা বেড়াবি। ফেকলুদার শ্বশুরবাড়িতে ফাসক্লাস খাওয়াবে বলেচে। আর কী চাই? শোন্, ফেকলুদা প্রোগ্রাম ঠিক করেছেন সকালে টিফিন করে বেরোব। দুপুরে ওঁর শ্বশুরবাড়িতে লাঞ্চ। তারপর খানিক রেস্ট নিয়ে ব্যাক।"

অন্তুরা দোটানায় পড়ল। বাসে-ট্রামেই তারা ঘোরে। কারও নিজস্ব মোটরে চেপে বেশি দুর ভ্রমণ তাদের ভাগ্যে জুটেছে কদাচিৎ। ফেকলুদার শ্বশুরবাড়িতে নেমন্তন্নটাও টানছে। তবু মনে খচ্খচ্। ফেকলুদার গাড়িতে যাওয়া কি নিরাপদ হবে? ঝামেলায় পড়বে না তো? তবে ভজা যখন অভয় দিচ্ছে আর সঙ্গেও যাচ্ছে।

একটা প্রশ্ন ছোটনের মাথায় আসে। বলে, "আচ্ছা, শ্বশুরবাড়িতে ফেকলুদা কি একা যাবেন?'

"হ্যাঁ।" জানায় ভজা।

"কেন, বউদি আর ওঁদের মেয়ে যাবে না?"

"নাঃ বউদির কাজ আছে। ফার্নিচার রং করাবেন। ওঁরা আর একদিন যাবেন। কিন্তু ফেকলুদা আর ওয়েট করতে রাজি নন। ওঁর এক শালা নাকি গাড়ি কিনেই এখানে ড্রাইভ করে এসে চাল মেরে গিয়েছিল। ফেকলুদার বদলা চাই। বউদিরা পরে যেতে চান, যাবেন। ফেকলুদার এই রোববারেই সুবিধে। আবার কখন সময় পাবেন ঠিক নেই। আমরা না গেলে একাই যাবেন।"

"ঠিক আছে, যাওয়া যাবে, কী বলিস?" শিবু দোনোমনো ভাবটা ঝেড়ে ফেলে অন্তু ও ছোটনের দিকে তাকিয়ে বলে।

"অলরাইট", অন্তু ঘাড় নেড়ে বলে। ছোটনও সায় দেয়।

ভজা বলল, "শুধু আমরা চারজন। পাড়ার ছেলেরা আর কেউ যেন আগে না জানতে পারে। তা হলে আরও অনেকে যেতে চাইবে। ফেকলুদা বিগড়ে যাবেন। কাউকে নেবেন না। আমাদের সবার যাওয়াই ভেস্তে যাবে। চুপচাপ বাড়ি থেকে পারমিশন নিয়ে রাখিস, ব্যস।"

মোটর চেপে বেড়িয়ে আসা তো আনন্দের ব্যাপার। তবু ফেকলুদার গাড়ি চড়তে অন্তুদের এত দ্বিধা কেন? কারণটা বুঝতে হলে ফেকলুদা এবং তাঁর মোটরের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা দরকার।

ফেকলুদার ভাল নামটা ভারিক্কি। শ্রীঅম্বুজাক্ষ বরাট। এ-পাড়ায় অনেক দিনের বাসিন্দা। বয়স বছর বত্রিশ। শ্যামবর্ণ, রোগা চেহারা। লম্বাটে মুখে নাকের নীচে একচিলতে গোঁফ। স্বভাব হাসিখুশি। ফেকলুদার একটা ছাপাখানা আছে ভবানীপুরে। ইদানীং ব্যবসায় ভাল আয় হচ্ছে। বিশেষত ওঁর প্রেসের এলাকায় দু'বছরে পরপর দুটো ইলেকশন হওয়ায় ইস্তাহার ছাপিয়ে প্রচুর পয়সা কামিয়েছেন। এরপর ফেকলুদা একটা মোটরগাড়ি কিনে ফেলেছেন। গাড়ি নতুন নয়, পুরনো, কয়েক হাত-ফেরতা। কচ্ছপের আকৃতির কালো রঙের ছোট্ট গাড়ি!

ফেকলুদা অবিশ্যি বলেছেন যে, নতুন না হলেও খাস বিলিতি জিনিস, আজকালকার নতুন গাড়িকে টেক্কা দেয়।

গাড়ি কেনার আগে কয়েকদিন যাবৎ ফেকলুদাকে মোটর চালানো শিখতে দেখে পাড়ার লোক অবাক হয়েছিল। মোটর ট্রেনিং কারগুলিকে বিলক্ষণ চেনে লোকে। এল-মার্কা পাউরুটি গড়নের গাড়ি। পিছন দিকে দু-সারি বেঞ্চে উদ্বিগ্ন -মুখ কিছু আরোহী। অতি সাবধানে এগোয়। এমনি চলন্ত গাড়িতে পাড়ার লোকের চোখে কয়েকবার পড়েছেন ফেকলুদা, কখনও ড্রাইভারের পাশে, কখনও বা স্টিয়ারিং হুইল ধরে। উদ্দেশ্যটা বোঝা গেল গাড়ি কেনার পর।

নিজের গাড়ির পিছনে 'এল' লেখা বোর্ড লাগিয়ে ফেকলুদা নিজেই গাড়ি চালিয়ে ঘুরতে শুরু করেছেন মাসখানেক হল।

প্রথম দিন-পনেরো ফেকলুদার গাড়ি আসতে দেখলেই পাড়ার লোক চটপট রাস্তা থেকে ফুটপাতে উঠে পড়ত। যারা ফুটপাত দিয়ে রাস্তার ধার ঘেঁষে চলেছে, তারা যথাসম্ভব অন্যধারে সরে যেত। এখন অবশ্য তাদের ভয়টা কমেছে, তবু পুরোপুরি আস্থা জন্মায়নি। ফেকলুদার গাড়ি আসতে দেখলে সবাই সতর্ক দৃষ্টি রাখে, যতক্ষণ না গাড়িটা পেরোয়।

ফেকলুদার এ-সবে দৃকপাত নেই। গাড়ি চালাতে চালাতে চেনা কাউকে দেখলেই তিনি জানলা দিয়ে মুখ দেখিয়ে হাসেন। গাড়ির স্পিড কমিয়ে আহ্বান জানান লিফ্‌ট দেবার। লোকে অবশ্য সবিনয়ে তাঁর আহ্বান এড়িয়ে যায়।

ফেকলুদার গাড়ি চড়তে পাড়ার লোকের আগ্রহের অভাব আর একটা কারণে। ফেকলুদার গাড়ির একটা বদনাম রটে গেছে। গাড়িটা নাকি কখনও-কখনও স্টার্ট নিতে চায় না। তাকে তখন ঠেলা দিয়ে স্টার্ট করাতে হয়।

গাড়ি দিব্যি চলছে, থামছে। ফের চলছে থামছে। হঠাৎ কী যে মর্জি হয়, এক্কেবারে নট-নড়নচড়ন। তখন ঠেলা দিয়ে খানিক গড়িয়ে নিয়ে যাবার পর বার দুই হেঁচকি তুলে ইঞ্জিন ডাক ছাড়ে।

গাড়ির এই খুঁত যথাসম্ভব গোপন রেখেছিলেন ফেকলুদা। পাড়ার ভিতরে তিনি কদাপি স্টার্ট বন্ধ করতেন না। প্রয়োজনে ইঞ্জিন চালু রেখে গাড়িতে বসে কথাবার্তা সারতেন। তবু ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেল।

ইন্দুবাবু একদিন জানালেন যে, তিনি দেখেছেন, হাজরা রোডে কয়েকটি ছোকরা ফেকলুদার গাড়ি ঠেলছে। এমনি ঠেলতে ঠেলতেই গাড়ি স্টার্ট নিল। এমন রিপোর্ট আরও একজনের মুখে মিলল। মহাদেবদা ফেকলুদার গাড়ি ঠেলতে দ্যাখেন কলেজ স্ট্রিটে। বদনামটা চরমে উঠল বদি মুখুজ্যের রিপোর্টের পর। মুখুজ্যেমশাই মর্নিং ওয়াকে যান প্রতিদিন। ফেকলুদার বাড়ির কাছে থাকেন। ভোরে বেরিয়ে মুখুজ্যে দ্যাখেন, ফেকলুদা বাড়ি থেকে গাড়ি চালিয়ে বেরোচ্ছেন। মুখুজ্যেমশাইকে ডাক দেন ফেকলুদা, "লেকে যাচ্ছেন তো? আমিও যাচ্ছি। আসুন না গাড়িতে একসঙ্গে যাই।"

ফেকলুদার গাড়ির বিচিত্র মেজাজের খবর জানতেন না মুখুজ্যে। সানন্দেই তিনি রাজি হন। ইঞ্জিন না বন্ধ করে গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলে দেন ফেকলুদা। মুখুজ্যেমশাই ওঠেন।

লেকে গাড়ি রেখে এক চক্কর হন্টন দিয়ে ফেরার সময় ফ্যাসাদ। বাহন আর চলে না। তখন

মুখুজ্যেমশাইকে অন্য লোকদের সঙ্গে গাড়ি ঠেলে স্টার্ট করাতে হয়েছিল। এই খবর রটে যাওয়ার পর পাড়ার কেউ আর ফেকলুদার মোটরে উঠতে চায় না। পাড়ার লোক কানাকানি করে যে, এই ঝামেলার ভয়েই নাকি ফেকলুদার নিজের বাড়ির লোকও পারতপক্ষে ওই গাড়িতে চড়ে না। গাড়ি কেনার দিন-কুড়ি বাদে একমাত্র ভজাকেই দেখা যেতে লাগল মাঝে-মাঝে ফেকলুদার পাশে বসে ওই গাড়ি চেপে চলেছে।

ভজা বলত, "ওটা লাকের ব্যাপার। আমি তো আট-দশ বার চাপলাম। একদিন মাত্র গাড়ি বিগড়েছিল।"

পাড়ার ছেলেরা লক্ষ করেছিল যে, এই সময়ে ভজার আইসক্রিম, ঝালমুড়ি খাওয়াটা বেশ বেড়েছে। দেবু একদিন নিজের চোখে দেখেছে, ভজা একটা চকোলেট-আইসক্রিমের ডগা চুষছে, আর ফেকলুদা তার দাম মেটাচ্ছেন। সুতরাং তাদের সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে, ভজাকে চাপিয়ে নিজের গাড়ির পাবলিসিটি দিতে ফেকলুদা নির্ঘাত ঘুষ দিচ্ছেন ভজাকে। ভজা অবিশ্যি এসব কথা উড়িয়ে দিত। বলত, "তোরা ভিতু, তাই উঠিস না। নতুন চালাচ্ছেন কিনা। এক বছর যাক, তখন ওঁর গাড়িতে চাপতে ঝুলোছুলি করবি। আমার কল্‌জে তোদের মতো দুবলা নয়। ভাবছি ওঁর কাছে ড্রাইভিংটাও শিখে ফেলব।"

ক্লাস টেনের ধাড়ি ছেলে। ছুটির দিনে বেড়াতে যাবে চেনা লোকের বাড়িতে। তাই বেড়াতে যাওয়ার অনুমতি মিলতে চার বন্ধুর কারও আটকাল না। তবে দু-একটা ছোট্ট মন্তব্য শুনতে হল।

ভজার বাবা ভুরু কুঁচকে বললেন, "কে ড্রাইভ করবে, ফেকলু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ও পারবে অতটা যেতে? নতুন শিখেছে।"

"এখন বেশ চালান", ভজা ফেকলুদার হয়ে ওকালতি করে।

"হুম।" ভজার বাবার মনের মেঘ পুরো কাটে না। তবে আপত্তিও করেন না। বলেন, "বেশ যাও, বলছ যখন পারবে। কিন্তু ওই এলমার্কা বোর্ডটা এখনও গাড়ি থেকে খোলেনি কেন?"

ছোটনের কাকা বাঁকা হেসে বললেন, "ফেকলুর গাড়িতে যাবি? গাড়ি ঠেলে ঠেলে গায়ে ব্যথা হয়ে যাবে দেখিস। বাস-ভাড়াটা সঙ্গে নিস। শেষমেশ একদম না চললে ফিরবি কী করে?"

অন্তু ও শিবুর বাড়িতেও ফেকলুদার গাড়িতে যাওয়া নিয়ে কিঞ্চিৎ উদ্বেগ দেখাল। যদিও যাওয়ার অনুমতি মিলল।

রবিবার সকালে দেশপ্রিয় পার্কের পশ্চিমে উলটো দিকের ফুটপাতে জড়ো হল ভজা, অন্তু, শিবু, ছোটন। ভজা বলে রেখেছিল, "পাড়ার ভিতরে গাড়িতে উঠব না, যদি আর কেউ সঙ্গে যাবে বলে বায়না ধরে? ফেকলুদা তাঁর শ্বশুরবাড়িতে নাকি খবর পাঠিয়েছেন, শুধু চারজন সঙ্গে যাবে। হঠাৎ কেউ বাড়তি গেলে ওদের অসুবিধে হতে পারে।"

সাড়ে সাতটায় ফেকলুদা গাড়ি চালিয়ে হাজির হলেন নির্দিষ্ট জায়গায়। গাড়ি থামল ফুটপাত ঘেঁষে, তবে ইঞ্জিন বন্ধ হল না। গাড়ির দরজা খুলে চটপট ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল চার বন্ধু, গাড়ি ফের চলল।

ভজা বসেছে ফেকলুদার পাশে, সামনে। বাকি তিনজন পেছনের সিটে। গাড়ি এগোচ্ছে বটে, তবে যাকে বলে শম্বুক গতিতে। পাশ দিয়ে অন্য প্রাইভেট-কার বাস লরি সব্বাই ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মায় একটা বাইসাইকেল অবধি স্পিডে হারিয়ে দিল ফেকলুদার গাড়িকে। রীতিমতো প্রেস্টিজ যাচ্ছে অন্তুদের। কিন্তু উপায় কী? বোঝা গেল, ভিড়ের রাস্তায় এর চেয়ে জোরে যেতে ফেকলুদার ভরসা নেই। তিনি আড়ষ্ট ভাবে স্টিয়ারিং হুইল আঁকড়ে রয়েছেন।

স্পিড যাই হোক, নিশ্চিন্তে গা ছড়িয়ে মোটর চাপার ফুর্তিতে ছোটনের গলা দিয়ে গান বেরিয়ে গেল, 'চল চল চল। ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল—'

"সাইলেন্স", ফেকলুদার ধমক।

ভজা ঘাড় ফিরিয়ে ইশারা করল, চুপ। অর্থাৎ কনসেনট্রেশন নষ্ট হলে মুশকিল হতে পারে। অতএব...

যাব্বাবা, আচ্ছা গেরো! থাকো মুখ বন্ধ করে। এই সামান্য গানের শব্দে যদি চালাতে না পারে, তা হলে বাস বা প্রতিমা বিসর্জন পার্টির ড্রাইভাররা চালায় কী ভাবে? যা হোক, অ্যাকসিডেন্টের ভয়ে তিনজনে আর কথা না বলে ব্যাজার মুখে বাইরে তাকিয়ে রইল।

শ্যামবাজার ছাড়িয়ে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে পড়ে ফেকলুদা একটু সহজ হলেন। বি. টি. রোড মস্ত চওড়া সিধে রাস্তা। তাই দিয়েও গাড়ি ছুটছে বটে তবে কলকাতার রাস্তার মতন আঁকাবাঁকা নেই। ফেকলুদা নিজে থেকেই বললেন হেসে, "এবার তোমরা গাইতে পারো। নো প্রবলেম।"

অন্তু শিবু ছোটনের গানের মুড চলে গিয়েছিল। তবে এবার তারা গল্প জুড়ল।

খানিক এগিয়ে ফেকলুদা বললেন, "একবার চা খেতে হয়।"

"চা, কোথায়?" জিজ্ঞেস করে ভজা।

"এই রাস্তাতেই কোনও চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে যাই।"

ভজা একটু ভেবে বলল, "বেশ।"

রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানের কাছে গাড়ি থামালেন ফেকলুদা। ফেকলুদার মুখ থেকে কথা, বেরোবার আগে ভজাই অর্ডারটা দিল, "পাঁচ কাপড় চা আর দুটো করে নিমকি বিস্কুট দিন।"

চা-বিস্কুট খাওয়া হল। অতঃপর সগর্বে মোটরে আরোহণ। ফেকলুদা বার-কয়েক স্টার্ট মারলেন, ফস্ ফস্ ফস্। ইঞ্জিন গর্জাল না। ফেকলুদা কাতর চোখে ভজার দিকে তাকালেন। ভজা তার বন্ধুদের বলল, "চ, একটু ঠেলে দিই। ইঞ্জিন গড়বড় করছে। গাড়িটা দেখছি ঠিকমতন সারায়নি।"

"হুঁ", ফেকলুদা সায় দিলেন।

নিতান্ত নগণ্য চায়ের দোকানের মালিক তার বছর পনেরোর ছোকরা কর্মচারী এবং জনাতিনেক চা-পানরত স্থানীয় লোক এমন গাড়ি চড়া খদ্দেরদের আগমনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। এখন সেই আরোহীদের গাড়ি ঠেলতে দেখে তারা বেজায় মজা পেল। রগড় দেখতে আরও কয়েকজন পথচারী জুটে গেল। দর্শকদের অনেকেই দাঁত বের করে হাসছে।

রাগে গা রিরি করছিল অন্তুদের, অথচ নিরুপায়।

স্টিয়ারিং হুইলে গম্ভীরবদন ফেকলুদা। পেছনে প্রাণপণে গাড়ি ঠেলছে অন্তুরা। ঠেলা খেয়ে গাড়ি এগোয়। দর্শকদের গোটা দলটা মায় দোকান ফেলে দোকানিসুদ্ধু মোটরের পিছু নিয়েছে। নানান রসাল মন্তব্য কানে আসে।

"ওরে এটা ট্রলি-মোটর। ঠেলে নিয়ে গিয়ে লাফিয়ে চড়ে বসবে। পেট্রোল বাঁচে।"

কয়েকজন উৎসাহী বাইরের লোক অন্তুদের সঙ্গে ঠেলতে হাত লাগায়। আওয়াজ ওঠে, "মারো জোয়ান হেঁইও। আউর থোড়া হেঁইও।"

গাড়ি গড়াতে গড়াতে একবার ভটভট করে ওঠে। হয়েছে, হয়েছে। জনতার উল্লাস। কিন্তু ব্যস, ফের ঝিমিয়ে পড়ে ইঞ্জিন। ফলে আবার ঠ্যালো। বার দুই ফল্‌স্‌ দেওয়ার পর গাড়ি সত্যি স্টার্ট নিল।

"কুইক"। হাঁক দিলেন ফেকলুদা। অন্তুরা ছুটে গিয়ে গাড়িতে ওঠে। দর্শকদের করতালি পিছনে ফেলে ফেকলুদার মোটর ছুটল।

মিনিট পাঁচেক গুম হয়ে থাকে, অন্তু ছোটন শিবু। ভজা একবার মন্তব্য করে, "গাড়িটা কিস্‌সু সারায়নি, স্রেফ ঠকিয়েছে।"

"হুম।" মাথা নাড়লেন ফেকলুদা।

মিনিট দশেক বাদে গাড়ি চালাতে চালাতে ফেকলুদা ঢোক গিলে বললেন, "ভজা, আমি একটা পান খাব।"

"পান!"

"হ্যাঁ ভাই। চায়ের মিনিট-দশ-পনেরো বাদে একটা পান না খেলে আমার শরীর কেমন আনচান করে। অভ্যেস।"

ফেকলুদার ঘন ঘন চা ও পান চলে, জানত ভজারা। কিন্তু এই বিশেষ অভ্যেসটির কথা জানত না।

"বেশ খান না পান," ভজা বলে।

"কিন্তু তা হলে যে গাড়ি থামাতে হয়।"

"কেন?" বলল ভজা, "আপনার ডিবেটা কোথায় আছে বলুন। আমি একটা পান বের করে আপনার মুখে দিয়ে দিচ্চি।"

"সরি। তাড়াহুড়োয় ডিবেটা আনতে ভুলে গেছি", কাঁচুমাচু ফেকলুদা জানাল।

"তা হলে কী করবেন?"

"কোনও দোকান থেকে পান কিনে নিই।"

"থামলে যে গাড়ি চলবে না।" ভজা বিরক্ত।

"কী করব ভাই? আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করচে। একটা দোক্তাপান না খেলে নয়। অন্য সময় হলে না হয় আরও খানিকক্ষণ কাটিয়ে দিতাম, যা-হোক করে। কিন্তু গাড়ি চালাচ্ছি। এখন নার্ভ স্টেডি না থাকলে...। ওই চায়ের দোকানের কাছে পানের দোকান ছিল না, তা হলে ওখানেই কিনে নিতাম।"

আঁতকে ওঠে অন্তুরা। খেয়েছে, অ্যাকসিডেন্ট না করে বসেন। বরং খেয়ে নিন পান। না হয় ঠেলব গাড়ি।

ভজা বলল, "আচ্ছা তা হলে পানের দোকান দেখে গাড়ি থামান। তবে দোকানের কাছে নয়, একটু দূরে ফাঁকায় রাখবেন।"

পানিহাটির কাছে অমনি এক জায়গায় গাড়ি থামল।

ফেকলুদা কয়েক খিলি পান কিনে, একটা মহানন্দে চিবুতে চিবুতে অন্যগুলো ঠোঙায় পুরে রাখলেন গাড়িতে। এবারও গাড়িকে ঠেলে ঠেলে স্টার্ট দেওয়া হল। খানিক ফাঁকায় হলেও কিছু পথচারী দর্শক ঠিক জুটে গিয়েছিল। তাদের গা-জ্বালা-করা কিছু কথাও হজম করতে হল চারজনকে।

ইঞ্জিন চালু হতে গাড়িতে উঠেই ভজা বলল, "আর কোথাও থামবেন না। সোজা টিটাগড়ে।"

"আরে না, না," ফেকলুদার আশ্বাস, "আর থামি? খেপেচ।"

ফেকলুদা কথা রাখলেন। একেবারে শ্বশুরবাড়ির গেট দিয়ে গাড়ি ঢুকিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করলেন। পথে ভজাকে দু'বার ফেকলুদার মুখে পান ঠুসে দিতে হয়েছিল।

মোটরসমেত জামাইকে ফেকলুদার শ্বশুরবাড়ির লোক হইহই করে অভ্যর্থনা জানাল। ফেকলুদা সদম্ভে নামলেন গাড়ি থেকে। পিছু-পিছু ভজারা চারজন।

"এত দেরি হল যে?" শাশুড়ির প্রশ্ন।

"এই মানে সবাই জড়ো হয়ে স্টার্ট করতে একটু লেট হয়ে গেল।"

ফেকলুদা কাটান দেন।

ফেকলুদার শ্বশুরবাড়ির সবাই গাড়িখানা ঘিরে দেখতে থাকে। ফেকলুদার মেজ শ্যালক বেচুদা একবার মন্তব্য ছুড়লেন, "পুরনো।"

"হুঁ, তবে বিলিতি গাড়ি। ইঞ্জিন বডি ফাসক্লাস।" ফেকলুদা গম্ভীর কণ্ঠে জানালেন।

বেচুদা একটু ঠোঁট বেঁকিয়ে সরে গেলেন। ভাবে বোঝা গেল যে, নেহাত ভগ্নিপতি, তাই এ-নিয়ে আর খোঁচালেন না।

"তোমরা এখন রেস্ট নাও।" ভজাদের বৈঠকখানায় রেখে ফেকলুদা বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন।

বৈঠকখানা ভোঁ ভোঁ। ভজারা চারজন শুধু বোকার মতন বসে। সবারই খুব তেষ্টা পেয়েছে। বছর সাত-আটেকের একটি ছেলে যাচ্ছিল ঘর দিয়ে। ভজা তাকে বলল, "একটু খাবার জল আন তো খোকা।"

ছেলেটা টেরিয়ে দেখে জিভ ভেঙিয়ে অন্য দরজা দিয়ে দৌড়ে পালাল।

মিনিট-পাঁচেক অপেক্ষা করে শিবু বাড়ির অন্দরে উঁকি দিয়ে এক ভদ্রলোককে ডেকে বলল, "একটু জল খাওয়াবেন?"

খানিক বাদে একজন মাঝবয়সি কাজের লোক এক গ্লাস জল হাতে হাজির হল। ছোটন তাকে খিঁচিয়ে উঠল, "মাত্র এক গ্লাসে কী হবে? আমরা সব্বাই খাব।"

লোকটি গ্লাসটা ঠক করে টেবিলে রেখে রাগী মুখে চলে গেল। অল্পক্ষণ বাদে ফের তার আগমন, এবং এক-জগ জল টেবিলে নামিয়ে রেখেই প্রস্থান।

খানিকক্ষণ বাদে সেই কাজের লোকটি আবার এল। তার হাতে ট্রেতে চারটি কাচের প্লেট।

প্রত্যেক প্লেটে মাত্র দুটি করে অ্যারারুট বিস্কুট এবং একটি করে পায়রার ডিমের সাইজের রসগোল্লা। সঙ্গে এলেন জাঁদরেল এক প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা। মহিলা পরিচয় দিলেন, "আমি হলুম পিসিমা।"

ট্রে রাখা হল ভজাদের সামনে। পিসিমা বললেন, "খাও, খাও, লজ্জা কোরো না।"

আধ মিনিটেই ভজাদের প্লেট খালি। দু-দু'বার গাড়ি ঠেলতে কম মেহনত হয়নি। কিন্তু খিদে মেটা তো দূরে থাক, বরং আরও চাগিয়ে উঠল। একমুঠো ধুনো ছুড়লে আগুনের শিখা যেমন লকলকিয়ে ওঠে।

পিসিমা ইনিয়েবিনিয়ে বলতে থাকেন, "তোমাদের বাবা মোটর চড়ার খুব শখ তাই না। হ্যাঁ, তা তো হবেই, ছেলেমানুষ। আমাদের অম্বুজ আবার পাড়ার ছেলেপিলেদের বড্ড ভালোবেসে। তোমরা ধরেছিলে, তাই না-করতে পারেনি। তবে বাপু, আমরা খুব আশা করেছিলুম জয়ি আসবে। জয়ির মেয়ে আসবে। ওদের আর এবার আসা হল না।"

ভজা বলল "কেন?"

পিসিমা বললেন, "তোমরা এলে কিনা, তাই। জয়ি আবার গাড়িতে ঘেঁষাঘেঁষি করে চাপতে পারে না। তা জামাই বলেছে। ফের আসবে গাড়িতে মেয়ে-বউকে নিয়ে, যত শিগগিরি পারে।"

ভজা যেন কিছু বলতে মুখ তুলে ফের ঘাড় নামিয়ে নিল।

পিসিমা বললেন, "পরের বার তোমরা কিন্তু বাবা ফের গাড়ি চড়ার আবদার ধোরো না।"

কাজের লোকটি ফোড়ন কাটে, "সেজদি অনেকদিন আসেনি।"

পিসিমা বললেন, "যা বলেছিস রামু। আহা, এবার খুব আশা করেছিলুম গো।"

অন্তুর ভারী রাগ হল। কেন ভজা তাদের জুটিয়ে আনল। কিন্তু ফেকলুদার স্ত্রী জয়া-বউদির না-আসার কারণ তো শুনেছে অন্য!

পিসিমা ও রামু চলে যাওয়ার পর ভজা বলল, "চ, একটু বেড়িয়ে আসি।"

পথে বেরিয়েই ছোটন বলল, "এই ভজা, তুই আমাদের সেধে সেধে আনলি কেন? এরা আমাদের হ্যাংলা ভাবছে। যেন কখনও মোটর চড়িনি!"

এই নিয়ে অন্তুর শিবুও ভজার উপরে রেগে যায়। ভজার মুখ থমথমে। তবে জবাব দেয় না। পিসিমার বাক্যবাণে সেও বেশ চটেছে মনে হল।

ঘণ্টাখানেক এদিক-সেদিক ঘুরে ফেকলুদার শ্বশুরবাড়িতে ফিরতেই সেই পিসিমা ঝঙ্কার দিলেন, "ইশ, বেলা বারোটা বাজে, খাবে কখন? তোমাদের দেরি দেখে অম্বুজ নেয়ে নিয়ে খেতে বসে গেছে। চান করে এসেছ তো, না নাইবে এখন? গামছা-টামছা আছে সঙ্গে?"

ভজা বলল, "হ্যাঁ, আমরা চান করে এসেছি। খেতে দিন।"

যদিও স্নান করে বেরোয়নি ভজারা, কিন্তু এরা এত ব্যস্ত হচ্ছে দেখে আর দেরি করতে চাইল না। হাত-মুখ ধুয়ে এসে বসে গেল বৈঠকখানায় পরপর পাতা আসনে। রামু এল খাবার নিয়ে।

স্রেফ ডাল, ভাত, ডাঁটা-চচ্চড়ি, বেগুনভাজা, কাঁটা-ভর্তি চারাপোনার ঝোল আর

তেঁতুলের ডাক। নো দই-মিষ্টি। এর নাম কি নেমন্তন্ন! এমনকী, বিঘত-খানেকের চেয়ে খাটো মাছও একটার বেশি দু'খানা দিল না। বার দুই কেবল রামু বলল, "ভাত চাই? ডাল আর দেব?"

ভজাদের খাওয়া শুরু হতেই পিসিমা সরে পড়েছিলেন। তদারকিতে ছিল শুধু রামু। গোমড়া মুখে ঘাড় গুঁজে ঝটপট খাওয়া শেষ করল চারজন।

খাওয়ার পর মুখ-হাত ধুয়ে বৈঠকখানায় এসে বসেছে ভজারা, এমন সময় ফেকলুদার আবির্ভাব। পরনে গেঞ্জি ও লুঙ্গি। পান চিবোতে-চিবোতে ঘরে ঢুকে বললেন, "কী খাওয়া শেষ? বেশ বেশ। এবার এট্টুখানি জিরিয়ে নাও, তারপর রওনা হব।" ফেকলুদা ফের অন্দরমহলে অদৃশ্য হলেন। ভজা কটমট করে তাঁর যাওয়া দেখল।

ফেকলুদা চলে যেতেই ভজা চাপা ক্রুদ্ধ স্বরে ফিসফিসিয়ে বলল, "লায়ার। মিথ্যুক। এখানে বলেছে, আমরা সেধে এসেছি। আরে, উনিই তো আমায় ধরাধরি করলেন, আর-ক'জনকে সঙ্গে জোটাতে। যদি পথে গাড়ি ঠেলতে হয়, তাই। গাড়ি মোটেই সারায়নি। ওই ভয়েই তো জয়া-বউদি সঙ্গে আসেননি। পথে গাড়ি ঠেলে ঠেলে স্টার্ট করাতে হলে বেইজ্জতি হয়, সেইজন্যে। আর এখানে কিনা আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছেন। বলেছিলেন, দারুণ খাওয়াবে। সেটাও গুল। দেখলি তো খ্যাঁটের ছিরি। একবার খবর নিল না অবধি আমাদের। ভাবলাম পাড়ার লোক, নতুন গাড়ি কিনে শ্বশুরবাড়িতে দেখাতে চায়। একা যেতে সাহস হচ্ছে না। একটু হেল্প দিই। এই তার রিটার্ন! রোসো, দেখাচ্ছি মজা।"

গোল গোল ফর্সা ভেজা, দেখায় নিতান্ত গোবেচারা। কিন্তু ও যে কী চিজ, পাড়ার প্রায় সবাই জানে। অন্তত ছোটন শিবু বুঝল, ফেকলুদার কপালে দুঃখ আছে।

দুপুর তিনটে নাগাদ রওনা দিলেন ফেকলুদা। ভাগ্য বটে। শ্বশুরবাড়ি থেকে ফেকলুদার মেজাজি গাড়ি নিজে-নিজেই দিব্যি স্টার্ট নিল। ফেকলুদা খুশিতে গদগদ। পাশে-বসা ভজাকে বললেন, "গাড়িটার বুদ্ধি আছে হে। শ্বশুরবাড়িতে আমার প্রেস্টিজ রেখেচে।"

মোটর মিনিট-পনেরো চলেছে। ফেকলুদা গুনগুন করে গান গাইছেন ফুর্তিতে। হঠাৎ ভজা বলল, "এক কাপ চা খেয়ে নেবেন নাকি ফেকলুদা?"

"চা? তা মন্দ নয়।" চা-পানে কখনও আপত্তি নেই ফেকলুদার।

পথের ধারে এক দোকানে চা খেলেন ফেকলুদা। ভজা বলল, "আমরা এখন চা খাব না। একটু আগে ভাত খেয়েচি। পরে শ্যামবাজারে খাব।"

গাড়িতে উঠে বারকয়েক স্টার্ট মারলেন ফেকলুদা। ঘোঁত-ঘোঁত করল গাড়ি, কিন্তু প্রাণ খুলে ডাক ছাড়ল না ইঞ্জিন। অর্থাৎ সেই পুরনো রোগ আবার ফিরে এসেছে। ফেকলুদা বললেন, "ওহে, ঠেলতে হবে।"

ভজারা চারজন যথারীতি গাড়ির পিছন দিকে গেল। ভজা বলল, "একটু অপেক্ষা করুন, ফুলপ্যান্টটা খানিক গুটিয়ে নিই।"

ভজা কিন্তু মোটেই প্যান্ট গুটোবার উদ্যোগ দেখাল না। তার দৃষ্টি আরও পেছনে। জায়গাটার কাছেই একটা বাস-স্টপ। একটা বাসকে আসতে দেখে ভজা হাত তুলে তাকে থামতে ইঙ্গিত করে বন্ধুদের ধাক্কা দিয়ে বলল, "আয় কুইক।" বলেই সে ছুটল।

ব্যাপারটা কী ঘটছে, বোঝার চেষ্টা না-করেই বাকি তিনজন ভজার পিছু-পিছু দৌড়ে গিয়ে বাসে উঠে পড়ল।

ফেকলুদা স্টিয়ারিং হুইল ধরে রেডি। এক্ষুনি ঠেলা খেয়ে গড়াবে তাঁর গাড়ি। শ্যামবাজারগামী একটা বাস তাঁর গাড়িকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। বাসের দরজায় হ্যান্ডল ধরে ঝুলে ভজা ফেকলুদার দিকে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বলল, "টা টা। বাই বাই।"

ফেকলুদা স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

[১৯৮৭, অক্টোবর ১৪, আনন্দমেলা]

মেলার মজা

কী দারুণ গন্ধ! লম্বা একটা দম টেনে মনে-মনে একটা কামড় দিয়ে ওই অপূর্ব বস্তুটির স্বাদ কেমন তা খানিক বোঝার চেষ্টা করে বুবাই। দোকানটার সামনে তার পা যেন আটকে যায় মাটিতে। মুগ্ধ নয়নে দেখতে থাকে বস্তুটি বানানোর কায়দা। এ দৃশ্য বহুবার দেখেছে। তবু সাধ মেটে না। তারিয়ে-তারিয়ে দ্যাখে।

চারদিকে মেলার হট্টগোল। দু'পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে মানুষের স্রোত। কেবলই পথচলতিজনের ধাক্কা ও কনুইয়ের গুঁতো। সেসব কিছুতেই বুবাইয়ের খেয়াল নেই। সে একমনে দ্যাখে।

গনগনে উনুনের ওপর বসানো মস্ত লোহার চাটু। এক থাবা নরম ময়দার লেচি কেমন মাছ ধরতে জাল ছোড়ার ঢঙে হাত ঘুরিয়ে বারকয়েক ফেলছে কারিগর, উনুনের পাশে রাখা কাঠের বারকোশে। ময়ূরের মতন পেখম মেলে। পড়ছে সেটি। কয়েকবার পর সেটা থালার মতন গোল আকার নিচ্ছে। তখন সেটি তুলে ফেলা হচ্ছে উনুনে বসানো তেল ছড়ানো চাটুতে। এইবার তাতে পড়ছে পুর। এক মুঠো কুচো বিট-গাজর আরও কী কী। ফট করে ভেঙে ঢেলে দিচ্ছে একটা আস্ত ডিম। খুন্তির খোঁচায় গুটিয়ে-গুটিয়ে কয়েক ভাঁজ করে লম্বাটে পরোটাখানা পাচ্ছে তার নিজের রূপ। তখন তাকে উলটে পালটে উচিতমতো ভাজা। সঙ্গে-সঙ্গে খুশবু ছড়ায়। পরোটা বনে যায় মোগলাই। যার নাম মোগলাই পরোটা। তার গন্ধ নাকে এলে ভরা পেটও চনমন করে। খিদেয়। আর কারও না করুক, অন্তত বুবাইয়ের করে।

মোগলাই পরোটাখানা ভাজা হলে সাবধানে খুন্তিতে তুলে রাখা হয় প্লেটে। পাশে দেয় এক চামচ চাটনি অর্থাৎ সস। অমনই প্লেটসুদ্ধু অমৃত চলে যায় খদ্দেরের উদ্দেশে।

বুবাইয়ের ভারি রাগ হয়। মেলার দোকানে এমন সামনের দিকে রাস্তার ধারে বানায় কেন মোগলাই পরোটা লেককে দেখিয়ে-দেখিয়ে। এভাবে লোভ দেখানো কি উচিত? দোকানের ভেতরে বানাতে পারে, যেমন বানায় শিঙাড়া কচুরি।

শান্তিনিকেতনে পৌষমেলা চলছে। আজ মেলার তৃতীয় বা শেষ দিন। নয়ই পৌষ সন্ধ্যা নেমেছে। অসংখ্য বাতির আলোয় ঝলমল করছে মেলা। শীত পড়েছে জাঁকিয়ে। বুবাই এক

রাউন্ড নাগরদোলা চড়ে মেলার পেছন দিকের দোকানগুলো দেখতে-দেখতে এসে হঠাৎ এই রেস্টুরেন্টটার সামনে পড়ে গেছে।

ইচ্ছে করেই বুবাই গত দু'দিন মেলার এপাশটা এড়িয়ে গেছে। এটা রেস্টুরেন্টের সারি। পর-পর রেস্টুরেন্ট। নানা জায়গা থেকে এসেছে। তাদের কয়েকটাতে তৈরি হচ্ছে মোগলাই পরোটা।

বুবাই মোগলাই পরোটার ভীষণ ভক্ত। কাছেই বোলপুর শহরে একটা দোকানে মোগলাই পরোটা বানায় বটে, কিন্তু একদম জুতের নয়। ওই দোকানের একজন পেঁয়াজি-ফুলুরির কারিগর কোত্থেকে এই পরোটা বানানো শিখেছে। তবে এখনও নিতান্তই কাঁচা হাত। বোলপুরের ওই দোকান সারা বছর মোগলাইয়ের খদ্দের ক'টাই বা পায়? আলুর চপ আর তেলেভাজা বিক্রি করেই চলে। ওই কারিগরটির আর মোগলাইয়ে হাত পাকে না। এই মেলার দোকানে মোগলাই পরোটা খেলে বোলপুরের মোগলাই আর মুখে রুচবে না। বুবাই ফি বছরই কয়েকটা মোগলাই পরোটা খায় মেলায়। মেলার খরচ উপলক্ষে পাওয়া পয়সা থেকে।

এবারও সে খেয়েছে মোগলাই, এক্কেবারে প্রথম দিনে। নিজের গাঁটের পয়সায়। কারও ঘাড় ভাঙার সুযোগ পায়নি। ছোটপিসি ও পিসেমশাই একদিনের জন্য এসেছিলেন মেলায় বেড়াতে। সাতই পৌষ। ওরা বুবাইকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন রেস্টুরেন্টে খেতে। কিন্তু কিছুতেই মোগলাই পরোটার দোকানে ঢুকলেন না। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারার লোভে ঢুকলেন কালোর দোকানে। সেখানে ওঁদের বন্ধুরা বসে ছিলেন। খেলেন ফিশ-ফ্রাই আর কচুরি। ওখানে মোগলাই পরোটা বানায় না।

এ-বছর বড্ড দাম বেড়ে গেছে মোগলাই পরোটার। বুবাই হিসাব করে দেখেছে যে, একটার বেশি মোগলাই খেলে তার বেশ কয়েকটা অন্য শখ মেটানো বাদ পড়ে যাবে। মোগলাই অবশ্যই তার সবচেয়ে প্রিয়। তবু আরও তো কিছু শখ থাকে মেলায়। আরও কিছু খাওয়া। এ ছাড়া নাগরদোলায় চড়া, এয়ারগানে লক্ষ্যভেদ, ম্যাজিক, সার্কাস দেখা, এমনই সব শখ। বছরে একবার শুধু পৌষমেলাতেই তাদের দেখা মেলে। তাই বুবাই মোগলাই পরোটার দোকানের সামনে দিয়ে আর হাঁটেনি। পাছে মন ফের উচাটন হয় এবং তহবিলে টান পড়ে অন্য খাতে।

এই দোকানটার মোগলাই খায়নি বুবাই। প্রথম দিন যেটায় খেয়েছে এই সারির একেবারে অন্য প্রান্তে, 'পরোটা হাউস', সেটা খাসা ছিল। কিন্তু বুবাইয়ের কেবলই মনে হতে লাগল যে, এই দোকানটায় আরও ঢের ভাল বানায়। গন্ধতেই তা মালুম হচ্ছে। এখানে একটা মোগলাই না খেলে এ-বছর তার মেলায় আনন্দ বৃথা যাবে। এ-দোকানটা গত বছরও দেখেছে। তবে এরা আগেরবার মোগলাই বনায়নি। কিন্তু খাবে যে পয়সা কই?

দোকানের সামনে রাখা ব্ল্যাকবোর্ডে খাবারের দাম লেখা আছে চকখড়িতে। মোগলাই পরোটার দাম—তিন টাকা। সব দোকনেই ওই এক দাম মোগলাইয়ের।

বুবাইয়ের পকেটে আছে মোটে পঁচাত্তর পয়সা। দিনের শুরুতে ছিল বটে পাঁচ টাকা, কিন্তু বারকয়েক নাগরদোলা চড়ে আর একবার ভেলপুরি খেয়ে আপাতত এই পঁচাত্তর পয়সা সম্বল।

মনে-মনে ভেবে নেয় বুবাই। কারও কাছে কিছু প্রাপ্তির আশা আছে কি? না, ভরসা পায় না সে। মা, বাবা, মাসি, পিসি, ঠাম্মা—সব সোর্স খতম। বরং ছোট বোনের কাছে একটা টাকা ধার হয়ে গেছে। সামনের মাসে বাবার থেকে হাত খরচ পেলে শোধ দেবে কথা দিয়েছে। একমাত্র উপায় ঠাম্মা। যদিও ঠাকুমার কাছ থেকে মেলার পাওনা সে পেয়ে গিয়েছে, তবু ধরাধরি করলে আদরের নাতিকে আরও তিনটে টাকা তিনি দিতেও পারেন। কিন্তু এখন বাড়ি ফিরলে আর সে বেরোতে পারবে না। সন্ধের পর ছোটদের মেলায় ঘোরা বারণ। বাড়ি ফেরার সময় হয়ে গেছে।

আজ এখন বাড়ি ফিরে ঠাম্মার কাছ থেকে পয়সাটা ম্যানেজ করে কাল এসে যে এই দোকানে মোগলাই খেয়ে যাবে, সে গুড়েও বালি। কাল সক্কালে বাড়িসুদ্ধ বক্রেশ্বরে বেড়াতে যাওয়ার প্রোগ্রাম। ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে। তারপর আর মেলায় আসার আশা নেই। যদিও নয়ই পৌষমেলা শেষ হওয়ার কথা, তবু রেস্টুরেন্টগুলো বেশির ভাগই বলেকয়ে আরও একটা দিন বাড়তি থেকে যায়। তবে দশই পৌষের পর দোকান গুটিয়ে ফেলে। অতএব দোকানটায় আর মোগলাই খাওয়ার সুযোগ নেই। বুবাইয়ের মনটা হুহু করে। আফসোস জাগে—ইস, আগে যদি এদিকটায় ঢুঁ মারতাম। তাড়াহুড়ো করে প্রথম দিনেই হাতের কাছে পরোটা-হাউসে ঢুকে না পড়ে অন্য দোকানগুলো নজর করে দেখতাম যদি।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে বছর-ষোলোর একটি ছেলেকে পথে দাঁড়িয়ে লুব্ধ নয়নে তাঁর দোকানের মোগলাই পরোটা ভাজা দেখছে লক্ষ করে 'খাই-খাই' নামে রেস্টুরেন্টের মালিক বুবাইয়ের উদ্দেশে ডাক দিলেন, "কী ভাই, খাবে নাকি মোগলাই?"

অন্য রেস্টুরেন্টগুলির মতোই খাই-খাই রেস্টুরেন্টের সামনেটায় কোমরসমান উঁচু রঙিন কাপড়ের আড়াল। মাঝখানে খানিক ফাঁক, যাতায়াতের জন্য। তার এক পাশে ভাজা হচ্ছে মোগলাই পরোটা। আর অন্যপাশে কোণের দিকে, সামনে টেবিলের ওপর ক্যাশ বাক্স নিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে চেয়ারে বসে আছেন স্বয়ং দোকানের মালিক। শ্যামবর্ণ, নধরকান্তি, মাঝবয়সি এক ভদ্রলোক।

দুঃখের বিষয়, খাই-খাই-এ আজ তেমন বিক্রি নেই। দোকানটা সারির একদম শেষে। হয়তো তাই। এতখানি জায়গা নিয়ে দোকান। প্রচুর বেঞ্চি ও টেবিল সাজানো। অনেক কর্মচারী। খরচা ঢের। এবার মেলায় না লোকসান দিতে হয়।

সবচেয়ে সমস্যা হল খাই-খাইয়ে মোগলাই পরোটা কাটছে না মোটে। টুকটাক খদ্দের জুটছে বটে মোগলাইয়ের, তবে নেহাতই কম। অথচ এবার মোগলাই পরোটা বানানোর জন্য স্পেশাল কারিগর আনা হয়েছে মোটা রোজের চুক্তিতে।

মালিকের নির্দেশে খাই-খাই রেস্টুরেন্টের বয়গুলো থেকে-থেকে হাঁক ছাড়ছে, "চলে আসুন। আসুন বাবু। আসুন দাদা। মোগলাই খেয়ে যান। মেলার সেরা মোগলাই।"

কখনও-কখনও দোকানের মালিক নিজেও ডাক দিচ্ছেন খদ্দের পাকড়াতে। নেহাতই কাহিল অবস্থা, নইলে কি আর বুবাইয়ের মতন খদ্দেরকে তিনি এত খাতির করে ডাকেন।

"এসো ভাই, একটা মোগলাই খেয়ে যাও। মেলার সেরা মোগলাই।" খাই-খাইয়ের মালিক আবার আহ্বান জানালেন বুবাইকে, আপ্যায়নের সুরে।

বুবাই দু'পা এগিয়ে যায় নিজের অজান্তেই। তারপর বোকার মতো বলে ফেলে "কত দাম?"

"তিন টাকা। ওই যে লেখা। বেশি নিচ্ছি না। কোথাও এর কমে পাবে না।"

বুবাই পকেটে হাত ঢোকায়। কিছু খুচরো বের করে। যেন গুনে নেয় রেস্ত। যদিও সে ভালভাবেই জানে তার সম্বল। এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ায়। অতঃপর করুণভাবে মাথা নেড়ে বলে, "নাঃ, অত নেই।"

খাই-খাইয়ের মালিকের মুখখানা অমনই ব্যাজার হয়ে যায়। যত্তসব ফালতু কেস। বুবাইয়ের মন গলাতে তিনি যতটা বিগলিত ভাব দেখিয়েছিলেন, দ্বিগুণ গম্ভীর হয়ে চোখ সরান অন্য খদ্দেরের আশায়।

বুবাই তবুও নড়ে না। ভাজা মোগলাই পরোটার সুবাস ভাসছে বাতাসে। সেই গন্ধ তাকে চুম্বকের মতো টেনে রাখে।

এটা বুবাই লক্ষ করেছে যে, এই দোকানটায় মোগলাই পরোটা তেমন বিক্রি হচ্ছে না। এমনিতেই এই দোকানে খদ্দের ঢুকছে কম। তাদের মধ্যে মোগলাইয়ের খদ্দের নেহাতই অল্প। অন্তত পনেরো মিনিট সে দাঁড়িয়ে আছে এখানে। এর মধ্যে মাত্র দুটো মোগলাই ভাজা হল।

বুবাই হাঁটতে লাগল ধীরে-ধীরে। এই সারির রেস্টুরেন্টগুলোকে মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে-করতে ও-মুড়ো অবধি পৌঁছে ফের ঘুরে এল খাই-খাইয়ের সামনে। খাই-খাইয়ে মোগলাইয়ের খদ্দের কম হওয়ার রহস্যটা সে কিঞ্চিৎ ধরতে পারে। একেবারে সামনের দিকের দোকানগুলোয় তো দিব্যি ভিড়। মোগলাইও কাটছে বেশ। অর্থাৎ গোড়ার দিকের দোকানগুলোই টেনে নিচ্ছে বেশিরভাগ খদ্দের। মোগলাইয়ের খদ্দেরসুদ্ধু। খাই-খাইয়ের ভাগ্যে জুটছে তলানিটুকু। লোকে মেলায় এসে প্রথম দিককার দোকানগুলোতেই ঢুকে পড়ছে বেশিরভাগ। সারির গোড়ায় দিকের রেস্টুরেন্টগুলোর জাঁকজমক হাঁকডাকও বেশি।

কিন্তু অন্যরা যতই খদ্দের টানুক, বুবাইয়ের দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, খাই-খাইয়ের মোগলাইয়ের কাছে কেউ লাগে না। যেসব দোকানে মোগলাই পরোটা বানাচ্ছে, বুবাই তাদের প্রত্যেকটার সামনে একবার দাঁড়িয়েছিল। বুকভরা শ্বাস টেনে মোগলাই ভাজার গন্ধ নিয়ে সে বুঝে ফেলেছে, ওইসব দোকানের মোগলাইয়ের কেমন স্বাদ।

খাই-খাইয়ের কর্মীদের কাতর কণ্ঠে খদ্দের আহ্বান এবং মালিকের শুকল উদ্বিগ্ন মুখ দেখতে-দেখতে ঝট করে একটা বুদ্ধি খেলে যায় বুবাইয়ের মাথায়। সে গুটি গুটি দোকানের ভেতরে ঢুকে মালিকের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

মালিক ভদ্রলোক সন্দিগ্ধ চোখে চাইলেন বুবাইয়ের দিকে। চাউনিতে বোঝালেন, কী মতলব?

বুবাই নিচু সুরে প্রশ্ন করে, "আপনারা কোত্থেকে আসছেন?"

"দুর্গাপুর।"

বুবাই সহানুভূতির সুরে বলল, "আপনাদের দোকানে তো তেমন ভিড় হচ্ছে না।"

"হুম।" মালিকের কণ্ঠ থেকে ক্ষুব্ধ আওয়াজ বেরোয়।

"দোকানটা একটু একটেরে পড়েছে কিনা। কিন্তু আপনাদের মোগলাইয়ের যা গন্ধ! ফাসক্লাস," বুবাই মুখে হাসি ফোটায়, "নিশ্চয়ই, খেতেও খুব ভাল।"

"হুম।" এবার মালিকের মুখ কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হয়। বলেন, "মেলা কমিটিকে জায়গার অ্যাপ্লিকেশন দিতে দেরি হয়ে গিয়েছিল যে। হতভাগা বঙ্কুটার জন্য।'

"বঙ্কু কে?"

"আমার গুণধর ছোট ছেলে। ওর মায়ের আবদারে গোল্লায় গেছে। দুর্গাপুরের দোকন ফেলে আমার নিজে আসতে অসুবিধা ছিল। তাই বঙ্কুকে পাঠালাম অ্যাপ্লিকেশনটা জমা দিতে। তা নবাবপুত্র কলকাতা ঘুরে তিনদিন পরে এখানে হাজির হলেন। ব্যস, তদ্দিনে সামনের ভাল প্লটগুলো ফসকে গেছে।"

একজন খদ্দের দাম দিতে এল কাউন্টারে। দাম মিটিয়ে ক্যাশ-বাক্সের পাশে রাখা প্লেট থেকে ভাজা মৌরি মুখে ফেলে খদ্দেরটি বেরিয়ে যেতেই বুবাই হঠাৎ বলে উঠল, "আপনারা কমিশন দেন খদ্দের ধরে দিলে?"

মালিক অবাক হয়ে বুবাইয়ের মুখের দিকে তাকালেন। ছেলেটার কথার অর্থ ঠিক ধরতে পারেন না।

"এই মানে," বুবাই ব্যাখ্যা করে, "ধরুন, যদি আমি কয়েকজন মোগলাই পরোটার খদ্দের ধরে দিই, আমায় কিছু কমিশন দেবেন?"

"দিতে পারি," মানেটা তরল হয়েছে। সোজা ব্যবসাদারী গলায় মালিক প্রশ্ন করলেন, "কত চাও? রেট কী?"

"না, না, নগদ চাই না। ধরুন, যদি কয়েকটা মোগলাই পরোটা বিক্রি করিয়ে দিই, তা হলে আমায় একটা মোগলাই খাওয়াতে হবে ফ্রিতে।"

মালিক ভুরু কুঁচকে গম্ভীর হয়ে মনে-মনে কিছু হিসাব কষলেন। তারপর জানালেন, "বেশ, দশটা মোগলাই সেল করিয়ে দিলে একটা ফ্রি দিতে পারি। পুরো দশটা চাই কিন্তু।"

আচ্ছা, দেখি ট্রাই করে।"

বুবাই বেরিয়ে গিয়ে দোকানের সামনে দাঁড়ায়। তার নজর ঘুরতে থাকে খাই-খাইয়ের মোগলাই পরোটার খদ্দের জোগাড়ের আশায়।

প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। মোটেই সুবিধা করতে পারেনি বুবাই। এতক্ষণ চেনা লোকের ওপর তাগ করে যাচ্ছিল কিন্তু একটিও পরিচিত লোককে ধরতে পারেনি। পান্তুদাকে দেখে ভারি খুশি হয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। পান্তুদা শান্তিনিকেতনে থাকেন। তার বড়দার বন্ধু। খাবার দোকানগুলো দেখতে-দেখতে আসছিলেন পান্তুদা আর পান্তু-বউদি। বুবাই এগিয়ে গিয়ে ধরল, "এই যে পান্তুদা, বউদির মোগলাই পরোটা খাবেন? এই দোকানটায় যা মোগলাই বানায়। দুর্দান্ত।"

"তুমি জানলে কী করে?" পান্তুদার প্রশ্ন।

"খেয়েছি যে একটা সকালে। ভাবছি আবার খাব।"

"না, এখন থাক।" চলে গেলেন পান্তুদারা।

এইভাবে যে ক'জন চেনা লোককে ধরার চেষ্টা করল, সবাই এড়িয়ে গেল। কী ব্যাপার? সবারই কি মোগলাই পরোটা খাবার সাধ মিটে গেছে? না, ছোট ছেলে বলে বুবাইয়ের কথা বিশ্বাস করছে না?

অগত্যা চেনা ছাড়াও অচেনা লোককে পাকড়াতে চেষ্টা করে বুবাই।

যে-কেউ খাই-খাইয়ের সামনে খিদে-খিদে মুখে দাঁড়ালেই বা দোকানটার দিকে তাকিয়ে চলার গতি কমালেই বুবাই তার বা তাদের কাছে গিয়ে নিচু গলায় ভারি একটা গোপন সংবাদ ফাঁস করে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে, "মোগলাই পরোটা খাবেন? এই দোকানটায় যান," সে আঙুল তুলে খাই-খাই দেখায়, "মেলার সেরা মোগলাই।"

"কে, অয়ন?"

পেছনে ভিড় থেকে একটা গম্ভীর গলায় ডাক শুনে চমকে ফিরে বুবাই দেখল, হিস্ট্রি-সার মাধববাবু। 'অয়ন' বুবাইয়ের ভাল নাম।

মাধববাবু বেজায় কড়া শিক্ষক। লম্বা, রোগা চেহারা। চোখে পুরু কাচের চশমা। রাগী-রাগী চাউনি। পরনে ধুতি ও সেই বিখ্যাত কালো কোট। মাথায় কান-ঢাকা টুপি। প্রায় হাঁটু অবধি ঝুল ওই কালো কোটখানা শীতের প্রথমেই মাধববাবুর শরীরে চড়ে। শরীর থেকে নামে একেবারে শীত বিদায় নিলে। বাড়ির বাইরে দিনে-রাতে গোটা শীতকাল তাঁর একই পোশাক। গায়ে কালো কোট ও ধুতি। পায়ে জুতো-মোজা। রাতে বা বেশি শীতে মাথায় দেন কান-ঢাকা টুপি।

"এখানে কী করছ?" হিস্ট্রি-সার প্রশ্ন করেন।

বুবাই ইতিহাসে ভালই। তাই মাধববাবুর কিঞ্চিৎ প্রিয়পাত্র। সে টপ করে সারের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বলল, "আজ্ঞে এই মানে দেখছিলুম। এই দোকানটায়।"

"কী দেখছিলে?"

"আজ্ঞে, মোগলাই পরোটা ভাজা।"

"মো-গ-লাই পরোটা।" সারের নজর ঘোরে। খাই-খাইয়ে সত্যি তখন একটা মোগলাই ভাজা হচ্ছিল। যদিও বুবাইয়ের তাতে কোনও শেয়ার নেই।

সার কৌতূহলীভাবে মোগলাই পরোটা তৈরি দেখছেন দেখে বুবাই ভরসা পেয়ে দুম করে বলে বসল, "সার, মোগলাই পরোটা খাবেন? এরা দারুণ বানায়।"

"নো। নেভার।" গর্জে ওঠেন সার, "মেলায় ভাজাভুজি খাওয়া একদম উচিত নয়, ভেরি ভেরি রিস্কি। দেখছ কত ধুলো পড়ছে? কী তেল দিচ্ছে গড নোজ। অ্যাঁ, তুমি খেয়েছ বুঝি?"

"না সার," জোরে মাথা নাড়ে বুবাই, "গন্ধে মনে হচ্ছিল বোধ হয় খেতে ভাল।"

"হুম। গন্ধটা লোভনীয় বটে। কিন্তু খবরদার। ওটা টোপ। খেলেই মরবে। যদি খিদে পায় চিনেবাদাম ভাজা খাও। গোটা-গোটা কাঁচা চিনেবাদাম শুকনো বালিতে ভাজা। নো ভেজাল এবং অতীব স্বাস্থ্যকর। বুঝেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সার।" তৎক্ষণাৎ ঘাড় হেলায় বুবাই।

"গুড।" হিস্ট্রি-সার ফের পা চালালেন। মিশে গেলেন ভিড়ে।

"মরব, না কচু।" নিজের মনে গজরায় বুবাই, "আমি কম মোগলাই খাইনি। কিসসু হয়নি। কালই তো দেখেছি সারের মেয়ে রানুদি বন্ধুদের সঙ্গে বসে মোগলাই পরোটা খাচ্ছিল। রানুদির কী হয়েছে? আজ দেখেছি দিব্যি ঘুরছে হ্যাঁ, ঝালনুন দিয়ে চিনেবাদাম ভাজা মন্দ নয়। তবে মোগলাইয়ের কাছে লাগে না।"

আবার বুবাই মোগলাইয়ের খদ্দের ধরার চেষ্টা চালায়। দু-একজন ইতস্তত করল বটে কিন্তু ফাঁদে পড়ল না কেউ। বড়জোর বলল, "দেখি। পরে আসা যাবে।"

সহসা বুবাই দেখল যে, একটা বড় দল হইচই করে আসছে। বুবাইদের পাড়ারই হাবুদা, হাবু-বউদি, তাদের আট-দশ বছরের দুই ছেলেমেয়ে। সঙ্গে এক স্বামী-স্ত্রী এবং হাবুদার ছেলের বয়সি আর-একটা বাচ্চা ছেলে। ওরা হাবুদার গেস্ট। হাবুদাদের বাড়িতেই উঠেছে। বড় ও ছোট মিলে মোট সাতজন। ওদের চোখ ঘুরছে রেস্টুরেন্টগুলোর ওপর। অমনই বুবাই হাবুদাদের দিকে এগিয়ে গেল।

দলটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। টুকরো-টুকরো কথা শোনা যাচ্ছে।

"উঃ, অনেক ঘোরা হয়েছে। এবার একটু বসা যাক। চা-টা খাই। গলা শুকিয়ে গেছে। কী বলেন জামাইবাবু?" হাবু-বউদির সঙ্গী মহিলার অনুরোধ।

"তা বেশ।" জামাইবাবু ওরফে হাবুদা রাজি, "কোথায় ঢুকবে?"

"কী হাবুদা, মেলা দেখছেন? বউদি কী কী কিনলেন? হাসি-হাসি মুখে আবির্ভূত হয় বুবাই।

হাবুদা একটু হেসে মাথা ঝাঁকালেন। বউদি খলবল করে উঠলেন, "কিনেছি তো ভাই অনেক কিছু। এই যে ..." হাতে পলিথিনের ব্যাগটা দেখালেন বউদি, পা ধরে গেছে ঘুরতে-ঘুরতে। তুই এখানে কী করছিস?'

"মোগলাই পরোটা বানানো দেখছিলুম। এই দোকানটায় দারুণ বানায়। এদের মোগলাই খেয়েছেন?"

"কী করে জানলি দারুণ?" বউদির প্রশ্ন।

"সকালে খেয়েছি যে একটা। ভাবছিলুম আবার খাই।"

"কী গো, মোগলাই খাবে নাকি?" বউদি জিজ্ঞেস করেন হাবুদাকে।

"তা মন্দ নয়," ফুট কাটে হাবুদার শ্যালিকা, "এখানে চা পাওয়া যায়?"

"হ্যাঁ, চা কফি সব পাবেন।" জানায় বুবাই।

দোকানের সামনে দাম লেখা বোর্ডে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হাবুদা বললেন, 'অল রাইট, মোগলাই হোক। তবে এই দোকানটায় ঢুকবে, না এগিয়ে যাবে? ওই যে পরোটা-হাউস ওই দোকানটায়?"

বুবাই তৎক্ষণাৎ ওকালতি করে, "ওর চেয়ে এখানে ঢের ভাল বানায়। পরোটা-হাউসে আমি খেয়েছি কাল।"

"তবে এটাতেই ঢোকো।" হাবু-বউদির ঘোষণা।

বুবাইয়ের সঙ্গে গোটা দলটা ঢুকল খাই-খাইয়ে। বুবাই তাদের বেঞ্চিতে বসিয়ে হাঁক দিল, "এই টেবিলে কে আছে? অর্ডার নিয়ে যাও।"

হাবু-বউদি বুবাইকে বললেন, "তুইও একটা মোগলাই খেয়ে যা আমাদের সঙ্গে। এত ভাল লেগেছে যখন।"

শুনেই বুবাইয়ের জিভে জল এসে গেল। বসে পড়তে-পড়তে কোনওমতে সামলে নিল নিজেকে। না, দান নয়। খাব। তবে নিজের রোজগারে। এতক্ষণের চেষ্টায় একটা পার্টিকে জপাতে পেরে তার মন ভারি খুশি। সে নিজে রোজগারের স্বাদ পেয়েছে। বলা যায় জীবনে এই প্রথম। যদিও রোজগারের লক্ষ্য এখনও পূরণ হয়নি। সে হেসে বলল, "এখন থাক বউদি। সকালেই খেয়েছি একটা। আপনারা খান। আমি চলি।"

দোকান থেকে বেরোতে-বেরোতে বুবাই কাউন্টার ঘেঁষে গিয়ে এক পলক থেমে ফিসফিসিয়ে বলে গেল মালিককে, "সাতটা মোগলাইয়ের খদ্দের দিয়ে গেলুম। মনে রাখবেন।"

দোকানটার সামনে থেকে আপাতত সরে যায় বুবাই। হাবুদারা যদি ভাবে লোভ দিচ্ছে। পেটে খিদে মুখে লাজ।

হাবুদারা খেয়েদেয়ে চলে যাওয়ার পর ফের বুবাই পজিশন নিল খাই-খাইয়ের সামনে।

আরও প্রায় আধ ঘণ্টা কাটে। বেশ দমে গেছে বুবাই। বাকি তিনটে শিকার আর কিছুতেই ধরতে পারছে না। হাবুদাদের আনবার পর মনে হয়েছিল যে, আর মাত্র তিনজনকে জোগাড় করতে কতক্ষণ। এক্ষুনি পেয়ে যাবে। কিন্তু কই?

খাই-খাইয়ে মোগলাই পরোটা ইতিমধ্যে বিক্রি হয়েছে বটে মাঝে-মাঝে। তবে তাতে বুবাইয়ের কোনও হাত ছিল না। সেসব খদ্দের নিজে থেকে সটান ঢুকে অর্ডার দিয়েছে মোগলাই।

কান ঘেঁষে ফসকে গেছে দুটি কলেজের ছাত্র।

দু'জন আসছিল গল্প করতে-করতে। হঠাৎ থমকে গিয়ে মোগলাই পরোটা ভাজা হচ্ছে দেখে খাই-খাইয়ে ঢুকে পড়ল। তারপর চেঁচিয়ে অর্ডার দিল, "দুটো মোগলাই দেখি।"

ব্যাপার দেখে বুবাইয়ের কী আফসোস। ইস, কে জানত যে ওরা মোগলাই তাগ করেই আসছিল। চেনা ছেলে। দিব্যি ওদের সঙ্গে নিয়ে ঢুকতে পারত।

মিনিট কুড়ি কাটল আরও। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পা টনটন করছে বুবাইয়ের। খোলা আকাশের নিচে হিমে চুপচাপ এক জায়গায় থাকায় ঠান্ডাটা চেপে ধরেছে। গায়ে সোয়েটার ভেদ করে টের পাচ্ছে কনকনে শীত। তাই প্যান্টের পকেট থেকে মাঝে-মাঝে হাত বের করে ঘষে গরম করে নীচের তালু দুটো। কয়েকবার ভাবল, যাই চলে। কিন্তু এতখানি এগিয়ে আশা ছাড়তেও পারছে না। খাই-খাইয়ের মালিক দেখছেন বুবাইকে। একটু মুচকি হাসি ঝিলিক দেয় তাঁর মোটা গোঁফের আড়ালে। বোধ হয় ভাবছেন—না, ছেলেটার আজ ফ্রি মোগলাই জুটল না। বুবাই দেখল যে কানু আসছে এই দিকে। কানু তার ক্লাসে পড়ে। পেটুকটা মেলার পেছন দিকে তেলেভাজার দোকানগুলোয় লুকিয়ে-লুকিয়ে কিছু খেয়ে এল নাকি!

বুবাই ঝপ করে ওর পথ আগলাতে কানু চমকে গিয়ে বলল, "আরে বুবাই! এখানে কী করছিস?"

"দেখছি, আর ভাবছি।"

"মানে কী দেখছিস?"

"মোগলাই পরোটা ভাজা। এই দোকানটায় যা বানায়। ও, দারুণ।" আঙুল তুলে খাই-খাইয়ের দিকে দেখায় বুবাই।

"কী করে জানলি?"

"সকালে একাটা খেয়েছি যে। এখন ভাবছিলুম ফের একটা খাই। কিন্তু হতাশভাবে মাথা নাড়ে বুবাই।

কানু মনোযোগ দিয়ে খাই-খাইয়ের ভেতরে দেখে।

"তুই মোগলাই পরোটা খেয়েছিস?" জানতে চায় বুবাই।

"না।"

"সে কী রে! এখনও মেলায় মোগলাই খাসনি। যা, যা, এই দোকানটায় ঢুকে পড়। এটাই বেস্ট।

কানুর মুখ দেখে মালুম হয় যে, তার মানে ছটফটানি জেগেছে। মোগলাই পরোটা তাকে টানছে। তুব সে খুঁতখুঁত করে, 'এরা বেস্ট। প্রমাণ?"

"আমি তিনদিন, তিন জায়গায় মোগলাই টেস্ট করে দেখেছি। এদের জবাব নেই। সাধে কি আর ভাবছিলুম ফের একটা..."

"দাম কত?"

"ওই যে লেখা তিন টাকা। সব দোকানেই এক দাম।"

"কানু বলল, "একা খেতে জুত হয় না, তুই যদি সঙ্গে যাস তা হলে খাই। তবে ভাই হিজ হিজ, হুজ হুজ। আমার কাছে এক্সট্রা পয়সা নেই। থাকলে ঠিক খাওয়াতাম।"

মিথ্যুক। একা খেতে জুত হয় না? সকালেই তো দেখেছি তোমায় দিব্যি একা ল্যাংচা-মহলে ল্যাংচা খাচ্ছ। আর পকেটে পয়সা থাকলেও তুই খাওয়াবি কাউকে? তুই যা কিপ্টে। মনের ভাবটা চেপে রেখে প্রসন্ন মুখে জানায় বুবাই, "তুই একাই যা না।"

"না, একা-একা ভাল্লাগে না।"

বুবাই বুঝল যে, ও নিশ্চয় খাদ্যটি সত্যি উত্তম কি না যাচাই করতে চায় বুবাইকে সঙ্গে রেখে। বুবাইও নিজের পয়সা খরচ করে খেলে নিশ্চিন্ত হবে এখানকার মোগলাই সম্বন্ধে। খুব হুঁশিয়ার।

অগত্যা বুবাই বলে, "আমি? মানে এখন আবার? যাকগে, চল।"

বুবাই ভাবে, পকেটে মোগলাই খাবার পয়সা থাকলে কি আর তোমার সঙ্গে যাই? কিন্তু উপায় কী? সঙ্গে না গেলে এ-কেসটাও হাতছাড়া হবে। কী উপায়ে ম্যানেজ করা যায় তাই তার মাথায় ঘোরে

দু'জনে খাই-খাইয়ে ঢোকে। গোপনে বুবাই একবার মালিকের সঙ্গে চোখাচুখি করে নেয়। চাউনির ইশারায় বোঝায়—ইনি হচ্ছেন আমার আট নম্বর।

এক কোণে বসে দুই বন্ধু। কানু পেছনে তাকাতে যাবে অর্ডার দিতে, হঠাৎ দ্যাখে, বুবাই বেজায় চোখ-মুখ কোঁচকাল।

"কী হল?" কানু অবাক।

"পেটটায় মোচড় দিল।" যন্ত্রণাকাতর মুখে জানায় বুবাই, "খানিক আগে ভেলপুরি খেয়েছি। তারপর থেকেই পেটটায় এমন হচ্ছে মাঝে-মাঝে। ওটায় কিছু গড়বড় ছিল। তাই তো ভরসা পাচ্ছিলাম না এখন মোগলাই খেতে।"

"কী করবি তা হলে?"

"তুই খা না। আমি বসে থাকি। সঙ্গ দিচ্ছি। খেয়ে দ্যাখ, সত্যি টেরিফিক। ভাল না লাগলে আমি দাম দিয়ে দেব, কথা দিচ্ছি।"

"ধুস, সেটা কেমন দেখাবে? একা খাব?"

"আরে লজ্জা কী? আমি তো এখানে খেয়েছি আগে।"

ঠিক তখনই বুবাই দেখল যে, তিনজন খদ্দের—বছর তিরিশের এক অচেনা ভদ্রলোক। এক বিবাহিতা মহিলা এবং তাদের সঙ্গে একটি আট-ন বছরের ছেলে দোকানে ঢুকে বসল খানিক তফাতে। অতঃপর ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা খাবারের মেনু-কার্ডটা বেঞ্চি থেকে তুলে মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকেন।

বুবাই টপ করে উঠে তাদের কাছে গিয়ে ঝুঁকে নিচু গলায় বলল, 'আপনার কী খাবেন?"

ভদ্রলোক বললেন, "ভাবছি ভেজিটেবল চপ।"

বুবাই যে কে, তিনি তা বুঝে উঠতে পারেন না। ভাবলেন, ও এই দোকানেরই কেউ।

"কেন, মোগলাই পরোটা খান না। এরা খাসা বানায়। আমি সকালে খেয়ে দেখেছি।"

"তুমি কে?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন ভদ্রলোক।

"আজ্ঞে, আমি একজন স্টুডেন্ট। বোলপুরে পড়ি। ক্লাস নাইনে। এবেলা ফের একটা মোগলাই খেতে লোভ হল। অর্ডারও দিয়ে ফেলেছি। কিন্তু পেটটা হঠাৎ কেমন ব্যথা-ব্যথা করে উঠল। তাই আর সাহস পাচ্ছি না। আপনারা যদি মোগলাই খান তো আমার অর্ডারটা আপনাদের দিতে বলি। নইলে আমার থেকে দাম নেবে। তাই খেতেই হবে। বানাতে শুরু করেছে কিনা। কিন্তু খেলে পেটটা যদি বেশ কিছু..." মুখখানা কাঁচুমাচু করে বুবাই।

ছোট্ট ছেলেটি হাঁ করে শুনছিল এতক্ষণ। এবার চ্যাঁ করে উঠল, "আমি মোগলাই খাব।"

মোগলাইয়ের নামে ভদ্রলোকেরও একটু লোভ হল। তবু কিঞ্চিৎ ইতস্তত করেন, কারণ খরচ কিছু বেশি পড়বে। চপ—দেড় টাকা। মোগলাই—তিন টাকা। কিন্তু ছেলেটা যখন বায়না ধরেছে। দোনামনা হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন স্ত্রীকে, "কী খাবে?"

"ওই মোগলাই পরোটাই বলো এখানকার মোগলাই ভাল তো?"

"ফাস্টক্লাস। সত্যি বলিছ," দৃঢ় কণ্ঠে জানায় বুবাই, "নইলে কি ফের ঢুকি খেতে? নেহাতই পেটটা কেমন হঠাৎ। বেশ, তা হলে আমি বলে দিচ্ছি আমারটা এখানে দিতে। মোট তিনটে তো?"

ভদ্রলোক মাথা নাড়ামাত্র বুবাই হনহন করে গিয়ে খাই-খাইয়ের মালিককে বলল, "ওখানে তিনটে মোগলাই।" তারপর সে চাপা গলায় জানাল, "সাত আর তিনে দশ। ব্যস, এবার আমারটা ফ্রি।"

"তুমি তো ওদের আনোনি?" মালিক প্রশ্ন করেন।

"তাতে কী? ভেজিটেবল চপকে মোগলাই বানিয়ে দিলুম যে? জিজ্ঞেস করুন, ওরা প্রথমে চপ খেতে চাইছিল কিনা?" একইরকম নিচু সুরে যুক্তি দেখায় বুবাই।

"হুম।" মালিক গম্ভীর মুখে ঘাড় নাড়েন। ব্যাপারটা তাঁর নজর এড়ায়নি। কথাবার্তাও কিছু কানে এসেছে। বললেন, "বেশ, পাবে। কথা যখন দিয়েছি।"

মহাখুশি বুবাই বলল, "আমাদের টেবিলে তা হলে দুটো মোগলাই পাঠাবেন। একটা নগদ। আর-একটা ফ্রি। ওখানে তিনটে দেবেন আগে। তারপর আমাদেরটা। যখন বলব দিতে, তখন পাঠাবেন। হ্যাঁ, এই এগারো নম্বর অর্ডারটা আপনার ফাউ।"

বুবাই ফিরে এসে সামনে বসতেই কানু প্রশ্ন করে, "কী কথা বলছিলি? ওরা কারা?"

"চেনা লোক। বড়দার বন্ধু। বর্ধমানে থাকে। মেলা দেখতে এসেছেন। দাদার খবর জিজ্ঞেস করছিলেন। ওঁদের অর্ডারটাও দিয়ে দিলুম। মোগলাই খাবেন।"

"আমার অর্ডারটা এবার দিই?' কানুর আর তর সয় না।

"একটু বাদে," ঠেকায় বুবাই, "পেটটা মনে হচ্ছে ঠিক হয়ে গেছে। ফিট লাগলে আমিও খাব। খানিক দেখে নিই। হ্যাঁ রে, তুই ইলেকট্রিক নাগরদোলায় চড়েছিস? উঃ কী উঁচুতে ওঠে! যখন নামে পেটের ভেতরটা কেমন খালি-খালি লাগে। তাই না? একটি গ্রামের মেয়ে উঠেছিল আমদেরটায়। এক পাক ঘুরতেই ভয়ে কী চিৎকার বাবা গো মরে যাব। নামিয়ে দাও। প্রথমবার চড়ে আমারও ভাই অমনই ফিলিংস হয়েছিল, তবে চেঁচাইনি। দাঁতে দাঁত চেপে ছিলুম। এখন ভীষণ মজা লাগে। তোর প্রথমবার চড়ে ভয় লাগেনি? এমনই আলতু-ফালতু গল্প জোড়ে বুবাই। আর নজর রাখে দাদার বানানো বন্ধুর দিকে।

তিনখানা মোগলাই পরোটা এল ওদিকে।

কয়েক মিনিট বাদে বুবাই হাত তুলে ইঙ্গিত করল খাই-খাইলেয়র মালিককে—এবার আমাদের দুটো দিন।

গরম মোগলাই পরোটা এক টুকরো ছুরি দিয়ে কেটে কাঁটা দিয়ে মুখে তুলে পরম তৃপ্তিতে চিবোতে-চিবোতে আড়চোখে দেখল বুবাই—সেই ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী খাওয়া ভুলে থ হয়ে দেখছেন তাকে। তাঁদের ছেলেটির অবশ্য ওসবে খেয়াল নেই। তার মনোযোগ তখন নিজের প্লেটের ওপর।

[১৯৯২, সেপ্টেম্বর-৩০, আনন্দমেলা]

স্টপেজ চাই

এক্সপ্রেস বাস। ছুটছিল ভালই। অমন ছুটলে আর আধঘন্টার মধ্যে মানে সকাল দশটা নাগাদ দুর্গাপুর পৌঁছনো যেত।

গোল বাধল পানাগড়ের কিছু আগে।

দেখা গেল যে বাসরাস্তার উপর অনেক লোক। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বা বাসে। বাসখানাকে আসতে দেখেই কয়েকজন লোক লাঠিতে লাগানো পোস্টার উঁচিয়ে ধরল রাস্তার মধ্যিখানে। বাকি লোকেরা হই হই করে বাসের পথ আগলে দাঁড়াল।

ব্যাপারটা কী? বাস থেমে গেল লোকগুলোর সামনে এসে। অমনি স্লোগান উঠল রাস্তা অবরোধকারীদের কণ্ঠে—'এক্সপ্রেস বাসের স্টপেজ চাই। স্টপেজ চাই। ইনক্লাব। জিন্দাবাদ। আমাদের দাবি মানতে হবে। মানতে হবে। স্টপেজ চাই। স্টপেজ চাই। ইনক্লাব। জিন্দাবাদ।'

দেখা গেল যে পোস্টারগুলোয় বড় বড় লাল অক্ষরে লেখা-এক্সপ্রেস বাসের স্টপেজ চাই।

এতক্ষণে ব্যাপারটা খানিক মালুম হল।

খেয়েছে। কন্ডাক্টরের পিছু পিছু বাসের বেশির ভাগ যাত্রী হুড়হুড় করে নেমে পড়ল পথে। তবে ড্রাইভারসাহেব নামলেন না। প্রৌঢ় মানুষটি গ্যাঁট হয়ে বসে রইলেন নিজের সিটে। শুধু স্টিয়ারিং থেকে হাত গুটিয়ে সিটে হেলান দিয়ে ঘাড় কাত করে জানলা দিয়ে নির্বিকার চোখে দেখতে লাগলেন ঘটনা।

জায়গাটার আসল নাম বলছি না। কারণ ওই রুটে বাসে আজও আমায় হরদম যাতায়াত করতে হয়। ওই জায়গার অনেকেই চেনে আমায়। বেফাঁস কিছু লিখে ফেলে ওখানকার লোককে চটিয়ে দিয়ে কী বিপদে পড়ব?

তাই বানানো একটা নাম দিই। এই ধরুন আমড়াতলা। ওই নামের জায়গায় সেদিন কী ঘটেছিল তা সত্যি লিখলে নিশ্চয় কারও আপত্তি হবে না।

আমড়াতলা গ্রামটা পিচ বাঁধানো বাস রাস্তার ঠিক ধারে নয়। আধমাইলটাক মাঠের মাঝে ঢুকে। গরুর গাড়ি চলার মতো একটা কাঁচা পথ আমড়াতলা স্টপেজ থেকে দু'পাশে চাষের জমির বুক চিরে এঁকেবেঁকে কিছুটা গিয়ে দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। তার এক প্রান্ত পৌঁছেছে

আমড়াতলায়। অন্য প্রান্তের শেষ তার থেকে খানিক দূরে আর একটা ছোট গ্রামে। ধরা যাক সে গ্রামের নাম গাবতলা।

আমড়াতলা বেশ বড় গ্রাম। গাঁয়ে কোঠা বাড়ি অনেক।

আমড়াতলা স্টপেজে লোকাল বাস থামে। এক্সপ্রেসের স্টপেজ আরও মাইলখানেক তফাতে। আমড়াতলা স্টপেজে আছে একটি মাত্র ছোট চায়ের দোকান। আর মস্ত একটা বটগাছ।

আমড়াতলা স্টপেজ পেরুবার সময় লক্ষ করেছি যে প্রায়ই সেখানে জনা কয়েক যাত্রী বাসের অপেক্ষায় রয়েছে। কখনও কখনও তারা এক্সপ্রেস বাসকে থামাবার চেষ্টায় হাত তোলে, ছাতা তোলে।

তা এক্সপ্রেস এখানে থামবে কেন? হু হু করে বেরিয়ে যায়। আজ কিন্তু থামতে বাধ্য হল।

স্লোগান সমানে চলছে।

'এক্সপ্রেসের স্টপেজ চাই। ই-নক্লাব জিন্দাবাদ'। অন্তত জনা পঞ্চাশ লোক জুটেছে রাস্তা অবরোধ করতে।

ডেইলি প্যাসেঞ্জাররা বাস রোকো পার্টির কাছে জোড়হাতে অনুনয় করতে থাকে—'দাদারা ছেড়ে দিন প্লিজ। জরুরি কাজ আছে।'

'আপিসে লেট হয়ে যাবে দাদা।'

'এরকম হঠাৎ থামানো কিন্তু ঠিক নয়। আগে থেকে নোটিশ না দিয়ে—দু'একজন বাসযাত্রী প্রতিবাদ জানায়।

'জ্ঞান দেবেন না।' বাস রোকো পার্টি গরম হয়, 'এক দিন দেরি হয় হোক। মহৎ আন্দোলনে কিছু লোকের অসুবিধে হয়ই।'

'আমার বোনের খুব অসুখ। দুর্গাপুরে দেখতে যাচ্ছি। প্লিজ ছেড়ে দিন।' এক প্যাসেঞ্জার কাকুতি মিনতি করে।

'সরি। নো উপায়।' তার আবেদন খারিজ হয়ে যায়।

আবার তুমুল স্লোগান ওঠে—

'আমড়াতলায় এক্সপ্রেস বাসের স্টপেজ চাই।'

'বিপ্লব চাই।'

'ই-ন-ক্লাব। জিন্দাবাদ।'

'আমাদের দাবি মানতে হবে।'

বেগতিক বুঝে বাসযাত্রীদের সুর বদলে যায়। তারা বলে—'দাদা আপনাদের আন্দোলন একদম কারেক্ট। এখানে আলবাৎ এক্সপ্রেসের স্টপেজ চাই। আমরাও যোগ দেব আপনাদের সঙ্গে আন্দোলনে। আর একটা ডেট ঠিক করুন স্যার। তৈরি হয়ে আসি। সেদিন আমরাও নামব পথে। জয়েন্ট মুভমেন্ট।'

আন্দোলনের নেতা এক রাগী চেহারার মাঝবয়সি রোগা বেঁটে রুক্ষচুল, চোখে পুরু কাচের চশমা, হাতে ডান্ডার মতো বাগানো একখানা ছাতা, পরনে আধময়লা ধুতি, শার্ট, ভয়ঙ্কর তেজি গলা —খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল — 'উঁহু, অন্য দিন নয়। আজই ফাইনাল। পাঁজিতে শুভ দিন দেখে কাজে নেমেছি। সিওর সাকসেস।'

'দেখুন না দাদা। কাছাকাছি যদি আর একটা ভাল ডেট পাওয়া যায় পাঁজিতে।' অনুনয় করে এক ডেইলি প্যাসেঞ্জার।

'আবার ডেট?' খেঁকিয়ে ওঠে লিডার, 'দু গাঁয়ের এতগুলো লোক জোটানো কি সোজা ব্যাপার? লোকের আর কাজকম্ম নেই?'

'তা বটে। তা বটে।' মেনে নেয় বাস যাত্রীরা।

'তাহলে উপায়? মানে কী চান আপনারা?'

'এখুনি কথা দিতে হবে, এক্সপ্রেস বাস এখানে থামবে। মানে আজ থেকেই।' লিডার ঘোষণা করে।

আর এক দফা স্লোগানের ঝড় বয় স্টপেজের দাবিতে।

এবার বাসযাত্রীরা গিয়ে কন্ডাকটারকে ধরে।

কন্ডাকটার বটগাছের শিকড়ের উপর বসে বিড়ি টানছিল। প্যাসেঞ্জাররা তাকে বলল, 'ও দাদা, কথা দিয়ে দিন না। ছাড়ান পেয়ে যাই।'

'খেপেছেন?' কন্ডাক্টার গম্ভীরভাবে মন্তব্য করে, 'আজ না হয় রেহাই পেলাম। তারপর কাল?'

'কেন কাল কী?'

কেন আবার? মালিক আছে, অ্যাসোসিয়েশন আছে। তারা যদি রাজি না হয় স্টপেজ দিতে। তখন?'

'আহা তখন বলে দেবেন যে মালিক অ্যাসোসিয়েশন রাজি হচ্ছে না। আপনার কী দায়?'

'ও তাই? মালিক অ্যাসোসিয়েশন বুঝি রোজ বাসে চেপে যায় এই পথে? আমি যাই। হাতের কাছে ওদের তো পাবে না, আমাকে পাবে। কথা দিয়ে খেলাপ করলে আমার হাড় মাস আলাদা করে ছাড়বে না আমড়াতলার পাবলিক? না মশাই, ও রিস্কে আমি নেই। আমি চাকরি করি। কথা টথা দিতে পারব না। তা দেবে দিক মালিক।'

কঠিন যুক্তি। দিশেহারা প্যাসেঞ্জাররা ভেবে পায় না কী করা? আমড়াতলা বা কন্ডাক্টার — দু পক্ষই নটনড়নচড়ন।

আধঘন্টা কাবার।

আর একটা দুর্গাপুরের দিকে যাওয়ার বাস হাজির হল।

বাসটার খোলে ছাদে ভর্তি লোক।

স্টপেজ চাই পার্টি বাসটাকে থামাল।

ঠিক থামাতে হয়নি। বাসটা নিজেই থেমেছে। কারণ ওটা লোকাল বাস। আমড়াতলায় স্টপেজ আছে। লোকাল বাসের কন্ডাক্টার প্যাসেঞ্জাররা কেউ বাস থেকেই হেঁকে, কেউ বা পথে নেমে জানতে চাইল—কেসটা কী?

লোকালের ড্রাইভার ইঞ্জিন থামিয়ে জানলা দিয়ে মুন্ডু বাড়িয়ে দিল।

'ওঃ লোকাল। তবে যেতে পার।' আন্দোলনকারীরা লাইন ক্লিয়ার দেয়। তাদের শুধু এক্সপ্রেস রোকা প্রোগ্রাম।

লোকাল কিন্তু চট করে যায় না। লোকালের কন্ডাক্টার হেল্পার সবাই। তারস্বরে চেঁচাতে

থাকে—'পানাগড়, দুর্গাপুর চলে আসুন'—মতলবটি সিধে। বেকায়দায় পড়া এক্সপ্রেসের কিছু যাত্রী ভাঙিয়ে নেওয়া।

বুদ্ধিটা খাটে।

আমড়াতলার যাত্রীরা তো লোকালেই চড়ল। এক্সপ্রেসেরও অনেকের ইচ্ছে লোকালে চলে যায়। এক্সপ্রেস যে কখন ছাড়া পাবে। মুশকিল হল যে তাদের টিকিট তো কাটা হয়ে গিয়েছে। এখন লোকালে চলে যেতে ইচ্ছুক এক্সপ্রেসের প্যাসেঞ্জাররা তাদের বাসের কন্ডাকটারকে ধরল—

'আমাদের পয়সা ফেরত দিন আমড়াতলা অবধি কেটে নিয়ে। লোকালে চলে যাই। এ বাস কখন ছাড়বে কে জানে?'

কন্ডাক্টার নির্বিকারভাবে জানাল, 'টিকিট ফেরত হবে না।'

'কেন?'

'বাস তো ব্রেকডাউন হয়নি। তাহলে ফেরত হত।'

এ নিয়ে তর্ক জুড়ল যাত্রীরা কিন্তু কন্ডাক্টার অনড়।

জোরে জোরে বারকয়েক হর্ন দিয়ে লোকাল স্টার্ট দিল।

এক্সপ্রেসের কয়েকজন লোকসান মেনেই চড়ে পড়ল তাতে। নেহাতই জরুরি দরকার নিশ্চয়ই।

এক্সপ্রেসকে টেক্কা মেরে বেরিয়ে যাচ্ছে বলে লোকালের প্যাসেঞ্জারদের কী উল্লাস! ছাতে বসারা হাত নেড়ে, ছাতা নেড়ে, গামছা নেড়ে হই হই করে বিদায় জানাল এক্সপ্রেসকে।

করুণ নয়নে তাই হজম করলাম। আর এক্সপ্রেসের ড্রাইভার জ্বলন্ত চোখে লোকালটাকে দেখতে দেখতে শুনিয়ে শুনিয়ে মন্তব্য ছাড়ল — 'হুঁ, কাদায় পড়েছি। মার লাথি'—

হঠাৎ শোনা গেল এক্সপ্রেসের কন্ডাক্টার চেঁচাচ্ছে—'ওই লাল গেঞ্জি কালো প্যান্ট ছোকরাটার ভাড়া নিইছিলি? মধ্যিখানে দাঁড়িয়েছিল। ইলেমবাজারে উঠেছিল।'

ছোকরা ক্লিনার জবাব দেয়, 'বাঃ আমি কেন? তোমার কাছ ঘেঁষে ছিল। ভাবলুম তুমি নিয়েচ।'

'ব্যস, ভেবে নিলি। কেন জিজ্ঞেস করতে কী হয়েছিল?'

'তা দাদা তুমিও তো খেয়াল করতে পারতে' বলল ক্লিনার।

কন্ডাক্টার ফোঁস করে ওঠে, 'বাসে ভিড়টা দেখেছিলি? বলে কিনা দম ফেলার ফুরসুৎ পাচ্ছিলেম না।'

জানা গেল যে ওই লাল গেঞ্জি কালো প্যান্ট পরা ছোকরা এক্সপ্রেসে টিকিট না দিয়েই লোকালে চেপে ভেগেছে। অর্থাৎ কিনা ইলেমবাজার থেকে আমড়াতলা অবধি জার্নি ফ্রি।

শুনে অন্য যাত্রীরা একগাল হাসল।

আর একটা বাস এসে পড়ল উল্টো দিক থেকে। সেটাকেও থামানো হল। ব্যাপার শুনে সেই বাসের ড্রাইভার বলল, 'এটা শুধু এক্সপ্রেস নয়। সুপার-ফাস্ট এক্সপ্রেস। ভায়া বোলপুর সিউড়ি যাচ্ছে। এতে ভাড়া ঢের বেশি। যেখানে সেখানে থামবে কেন?'

আন্দোলনকারীরা জানাল যে সুপার হোক, আর ফাস্টই হোক, এক্সপ্রেস তো বটে। অতএব এরও আমড়াতলায় স্টপেজ চাই। এবং এখুনি কথা দিতে হবে।

এবার কিছু দল ভারী পেয়ে দুই বাসের যাত্রীরা এক্সপ্রেস রোকো পার্টির সঙ্গে বাকবিতণ্ডা লাগিয়ে দিল। আজকের মতো মুক্তি দেওয়ার জন্য প্যাসেঞ্জারদের অনুনয় বিনয়ও চলল। আন্দোলন কিন্তু নরম হওয়ার লক্ষণ নেই। মজা দেখতে দুই গ্রাম থেকে দলে দলে লোক এসে জুটেছে আমড়াতলা স্টপেজে।

স্টপেজে, একমাত্র চায়ের দোকানের মালিক মহাখুশি। এক্সপ্রেস রোকো আন্দোলনকারীরা বাসের প্যাসেঞ্জাররা এবং দর্শকরা — সবাই হরদম চা পান করে গলা ভিজচ্ছে উত্তেজনায়।

ইতিমধ্যে কয়েকটা প্রাইভেট কার আর লরি পেরিয়ে গিয়েছে আমড়াতলা স্টপেজ। তাদের অবশ্য আটকানো হয়নি। গাড়িগুলো অতি ধীরে পিচ রাস্তা থেকে পাশের জমিতে নেমে পাশ কাটিয়ে গিয়েছে। ভিড় পেরিয়েই ভোঁ দৌড় দিয়েছে।

একটা মোটরবাইকও পেরিয়েছে। গিয়েছে পানাগড়ের দিকে। মোটরসাইক্লিস্টকে নামতে হয়েছিল গাড়ি থেকে। ভিড় কাটিয়ে গাড়ি ঠেলে ঠেলে কোনওরকমে যখন সে এগুচ্ছে একজন প্যাসেঞ্জার তার কানে কানে বলেছিল—'দাদা, থানায় একটা খবর দিয়ে দেবেন প্লিজ। এখানে বাস আটকাচ্ছে'—

মোটরসাইক্লিস্ট একবার প্যাসেঞ্জারটিকে টেরিয়ে দেখে নিয়ে একটু ঘাড় নেড়েছিল। তবে কোনও রা কাড়েনি।

আরও মিনিট কুড়ি কেটেছে।

দুটো গাড়ি হু হু করে হাজির হয়ে খ্যাঁচ করে থামল।

সামনে জিপে ড্রাইভারের পাশে বসে লোকাল থানার দারোগা। পিছনে লম্বাটে খাঁচার মতো কালো রঙের গাড়িতে একদল সেপাই।

জিপ থেকে নামলেন শ্যামবর্ণ, বিপুলবপু, ইয়া পাকানো গোঁফ দারোগাসাহেব। আর পিছনের গাড়ি থেকে ধপাধপ মাটিতে লাফাল আট দশজন লাঠিধারী সেপাই।

দারোগার পরনে খাকি ফুল প্যান্ট, খাকি শার্ট। পায়ে বুটজুতো। মাথায় ক্যাপ। কোমরে বেল্টে বাঁধা খাপে মোড়া রিভলবার। হাঁড়িপানা মুখ থমথমে। জবরদস্ত কড়া লোক বলে এই দারোগার নামডাক আছে।

দারোগা নেমেই বাজখাঁই গলায় গর্জে উঠলেন, 'কী ব্যাপার? হোটাস দিস? বাস আটকাচ্ছেন কেন?'

আন্দোলনের লিডার এগিয়ে এসে বলল, 'স্যার আমরা এখানে এক্সপ্রেস বাসের স্টপেজ চাই। কথা দিতে হবে থামবে। দিচ্ছে না তাই'—

লিডারকে ধমকে থামিয়ে দারোগার গলা আর এক পর্দা চড়ে—'তাই বাস আটকাবেন? উইদাউট নোটিশ। অ্যাঁ মগের মুল্লুক? স্টপেজ চাই তো বাস মালিকদের সঙ্গে কথা বলুন। তা বলে এমন হঠাৎ প্যাসেঞ্জারদের হয়রানি? একি!'

লিডার কী জানি বোঝাবার চেষ্টা করতেই ফের দাবড়ানি—'নো টক। কোনও কথা নয়। এই পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। রাস্তা ক্লিয়ার চাই। বাস যেতে দিন।'

দারোগাসাহেব বাঁ হাত তুলে রিস্টওয়াচের উপর চোখ রাখলেন। ডান হাত রিভলবারের বাঁটে। মাঝে মাঝে কটমট করে তাকাচ্ছেন জনতার দিকে।

দারোগার রুদ্রমূর্তি দেখে গ্রামের যারা হুজুগ দেখতে এসেছিল তারা সুড়সুড় করে বাস রাস্তা ছেড়ে খানিক দূরে মাঠে গিয়ে দাঁড়াল। আশার আলো পেয়ে প্যাসেঞ্জার ক্লিনার কন্ডাক্টাররা হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়ল যে যার বাসে। দুই বাসের ড্রাইভার স্টিয়ারিং আঁকড়ে খাড়া হয়ে বসল সিটে। রাস্তায় পড়ে রইল আন্দোলনের লিডার তার জনা তিরিশ চেলা। আর পুলিশরা।

লিডার বুঝেছে যে হাওয়া খারাপ। তবু প্রেস্টিজ বাঁচাতে সে দারোগার সঙ্গে তর্ক জোড়ার চেষ্টা করে-'স্যার এ অন্যায় অর্ডার। আমাদের ন্যায্য দাবি, আমাদের আন্দোলন, এভাবে গায়ের জোরে'—

দারোগা ঘড়ি থেকে নজর না সরিয়ে গর্জন ছাড়লেন, 'আর এক মিনিট।'

চেলারা —'মানতে হবে।'

নেতা — 'ই-ন্-ক্লাব।'

চেলারা—'জিন্দাবাদ।' স্টপেজ চাই। স্টপেজ চাই'।

দু রাউন্ড স্লোগানের পরেই সক্কলের গলা ছাপিয়ে দারোগার হুংকার — 'চার্জ।'

অমনি সেপাইরা ঝাঁপিয়ে পড়ল আন্দোলনকারীদের উপর।

কয়েক ঘা লাঠি খেতেই রাস্তা বিলকুল সাফ। দেখা গেল যে মাঠ ভেঙে দৌড়াচ্ছে গ্রামের লোকেরা। সব্বার আগে সেই আন্দোলনের লিডার—ছুটছে এবড়োখেবড়ো ধান জমি ভেদ করে, আল টপকাতে টপকাতে। তার হার্ডল রেসের স্পিড দেখে বাসের লোক, সেপাইরা মায় দারোগা সাহেব তাজ্জব।

অ্যারেস্ট হয়ে গেল মাত্র এক বেচারি। গাঁয়ের লোকটি অন্যদের নজর এড়িয়ে চায়ের দোকানটার খুপচি ঘরের ভিতর এক কোণে লুকিয়ে বসে মুড়ি পেঁয়াজি খেতে খেতে মাঝে মাঝে 'জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়ে বাইরের স্লোগানের সঙ্গে তাল দিচ্ছিল। খাওয়ার দিকেই আসল মন। রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে তাদের আন্দোলন পার্টির যে কী ফয়সালা হচ্ছে মোটে খেয়াল করেনি। হঠাৎ একটা বেশিরকম হইচই শুনে 'জিন্দাবাদ' বলে মুড়ির ঠোঙা হাতে বাইরে দেখতে বেরুতেই তাকে সেপাইরা খপ করে পাকড়াল। তারপর রদ্দা মারতে মারতে টেনে তুলল কালো গাড়িতে।

এবার দুটো বাস এবং পুলিশের গাড়ি দুটো রওনা দিল যে যার নিজের নিজের পথে।

[১৯৯৩, সন্দেশ শারদীয়া]

ভজার কীর্তি

সেকেন্ড পিরিয়ড শেষ হয়েছে। থার্ড পিরিয়ড শুরু হবে। ক্লাসে তখন কোনও মাস্টারমশাই নেই। এখনই আসবেন। ছাত্ররা টানটান হয়ে অপেক্ষা করছে পরের শিক্ষকের জন্য।

যে কোনও দু'পিরিয়ডের মাঝে যে সময়টুকু ক্লাস ঘরে কোনও শিক্ষক থাকেন না, ছাত্রেরা সেইটুকু সময় নিজেদের মধ্যে কথা বলে হাল্কা হয়ে নেয়। সেটাই রেওয়াজ। তবে আজ গুঞ্জনটা বেশ চড়া। বিশেষত পিছনের বেঞ্চিগুলোয়। সামনের বেঞ্চে গুডবয়রা খাড়া বসে, খানিক সন্ত্রস্তভাবে।

ভারতমাতা বিদ্যামন্দিরের ক্লাস নাইন সেকশন ছেলেদের ভিতর এই চাপা উত্তেজনার কারণ— আজ এক নতুন স্যারের আগমন ঘটবে। মাস্টারমশাইটি আজ জয়েন করেছেন এই স্কুলে। ইতিমধ্যেই অন্যান্য ক্লাসে কয়েকটি পিরিয়ড নিয়ে তিনি নাকি রীতিমতো জাঁদরেল হিসেবে নাম করে ফেলেছেন। খবরটা পৌঁছে গেছে এই ক্লাসেও।

আধ মিনিট বাদে নতুন স্যার ব্যোমকেশ বাঁড়ুজ্যের আবির্ভাব হল নাইন বি-তে। ঝপ্ করে থেমে গেল ছেলেদের কলরব। দরজার কাছে এক মুহূর্তে থমকে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে ক্লাসের দিকে একবার তাকিয়ে নতুন স্যার ধীর পায়ে ঘরে ঢুকলেন। ছাত্ররা উঠে দাঁড়াল। তারা জরিপ করে নেয় নতুন স্যারকে।

নতুন মাস্টারমশাইটি গম্ভীর বদন। শ্যামবর্ণ। লম্বা বেশি নয়। তবে বেশ গাট্টাগোট্টা। মাঝবয়সি। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। গোল ফ্রেমের চশমার পেছনে তাঁর কেমন রাগী রাগী চোখ, লোমশ ভুরু, বুরুশ গোঁফ আর ঘন কালো চুল দেখেই অনেক ছেলের বুকের ভেতর গুড়গুড়িয়ে ওঠে।

পিরিয়ডটা আবার পাটিগণিতের। সোজা ব্যাপার নয়। আগের স্যার নিমাইবাবু ছিলেন নরম ধাতের মানুষ। তাঁকে নিয়ে কখনো ছেলেদের উদ্বেগের কারণ ঘটেনি। পড়া না করলে বা ক্লাসে বেশি কথা বললে খানিক বকুনি খেয়েই পার পাওয়া যেত। বেশি বাড়াবাড়ি করলে বকুনি সহযোগে বড়জোর আলতো চাঁটি। ওসব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না ক্লাসের বিচ্ছু ছেলেরা। এখন নতুন স্যারটি আবার কেমন হবেন কে জানে।

নতুন স্যার চেয়ারে বসে ছেলেদের ইঙ্গিত করলেন—বসো।

ছেলেরা বসে পড়ে।

কাঁধের ব্যাগ থেকে একখানা পাটিগণিত বই বের করে সামনে টেবিলে রাখলেন স্যার। কিন্তু বই খোলার লক্ষণ দেখা গেল না। বরং কড়া নজরে ছেলেদের উপর চোখ বোলাতে থাকেন।

ক্লাসে টুঁ শব্দটি নেই। সামনের বেঞ্চের ছেলেরা কাঠ।

'ইউ!' আঙুল তুলে ভারী গলায় হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন নতুন স্যার, 'শার্টের কলার তুলেছ যে? বেশি লায়েক হয়েছ, না?' স্যারের তর্জনীর লক্ষ্য ফোর্থ বেঞ্চের শ্যামাপদ, 'কী নাম তোমার? স্ট্যান্ড আপ।'

শ্যামাপদ অপ্রতিভ মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আজ্ঞে, শ্যামাপদ।'

'ব্যস, শুধু শ্যামাপদ? পদবি নেই বুঝি?' ঝাঁঝিয়ে ওঠেন নতুন স্যার।

'আজ্ঞে, দত্ত।' ঢোক গিলে জবাব দেয় শ্যামা।

'নামাও কলার। আমার ক্লাসে এসব বেয়াদপি চলবে না,' হুকুম দেন স্যার।

শ্যামাপদ তাড়াতাড়ি তার শার্টের কলার টেনে নামাল। তার এই কলার তোলা পোজের জন্য ছেলে মহলে তার কত খাতির বেড়েছে। সেটা যে এই স্যারের এমন বিষ নজরে পড়ে যাবে কে জানত!

শ্যামাপদ অত সহজে নিস্তার পায় না। নতুন স্যার গোঁফ ফুলিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'লাস্ট অ্যানুয়ালে অঙ্কে কত পেয়েছ?'

'আজ্ঞে, ছেচল্লিশ,' মিনমিন করে শ্যামাপদ।

'ওঃ, তাতেই বাবুর একেবারে কলার উঠে গেছে। ষাট পেয়ে গেলে তো হ্যাট কোট চড়াতে। সিট-ডাউন।'

সেই প্রচণ্ড ধমকে আঁতকে উঠে শ্যামাপদ ধপ করে বেঞ্চের উপর বসে পড়ল।

শ্যামাপদর মতো ডানপিটে ছেলের এমন হেনস্তা দেখে ক্লাসসুদ্ধু ছেলেরা বেজায় ঘাবড়ে গেল। যে কোনও নতুন স্যার এলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে অর্থাৎ কিঞ্চিৎ বেকায়দায় ফেলতে ক্লাসের দুষ্টু ছেলেরা কিছু মতলব ভেঁজে রাখে। কিন্তু ব্যোমকেশ স্যারের দাপট দেখে ভয়ে সে সব প্ল্যান শিকেয় উঠল।

নতুন স্যারের রাগ যায় না। নিজের মনেই গজগজ করে চললেন, 'আজকালকার ছেলেগুলো গোল্লায় গেছে। এই যে পাটিগণিত শিখছ, তার উৎপত্তি কোথায় জান? আমাদের ভারতবর্ষে। কয়েক হাজার বছর আগে। সেই সুপ্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা নেই। কেবল ট্যাঁসগিরি করছ। ফিরিঙ্গিদের নকলে কলার তুলছ। ছি ছি।'

শ্যামাপদ ভাবল, খুব বেঁচেছি। সে এক ফেমাস বোম্বাই হিরোর নকলে কিছু দিন যাবৎ এই স্টাইল শুরু করেছে। ভাগ্যিস স্যার সেটা ধরতে পারেননি।

নতুন স্যার উত্তেজিতভাবে ছেলেদের সম্বোধন করে বক্তৃতার ঢঙে বলেন, 'নিজের দেশের খবর রাখবে। নিজের পূর্বপুরুষদের খবর রাখবে। আরে, বিলেতে শুনি, বাপ পিতেমোর খোঁজ রাখে না। ওটা কি সভ্যতা? জান, তোমাদের বয়সে আমি সাতপুরুষের নাম বলতে পারতাম।'

'গুল।'

একদম পেছনের বেঞ্চি থেকে অস্ফুট সেই শব্দটি নতুন স্যারের কান ঠিক ধরতে পারে না। তবে সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসে মৃদু গুঞ্জন শুনে স্যার জিজ্ঞেস করেন, 'অ্যাঁ কী বললে?'

ভজার মারাত্মক মন্তব্যটি চাপা দিতে শ্যামাপদ চোখ বিস্ফারিত করে তড়িঘড়ি বলে উঠল, 'সত্যি স্যার, সাত পুরুষ?'

গর্বিত কণ্ঠে স্যার জানালেন, 'আলবাত সত্যি।'

উৎসাহিত হয়ে তিনি এবার বললেন, 'আচ্ছা দেখি পরীক্ষা করে, তোমাদের দৌড় কদ্দূর? পূর্বপুরুষদের নাম বলতে হবে। পিতা, তাঁর পিতা—এমনি করে। জানি সাত পুরুষ ইমপসিবল। তবু দেখি কে কতটা পার!'

'ইউ স্টার্ট। তোমার থেকে শুরু করে।' প্রথম বেঞ্চির ডান দিকের প্রথম ছেলেটিকে নির্দেশ দেন স্যার।

সেকেন্ড বয় বিশ্বনাথ বেচারি ভড়কে গিয়ে বাবার পরে আর ঠাকুরদার নামটাই মনে করতে পারল না। বাবার নাম বলেই তোতলাতে লাগল।

নতুন স্যার ফতোয়া দিলেন, 'দাঁড়িয়ে থাক। মিনিমাম তিন পুরুষ, আই মিন ঠাকুরদা অবধি নাম না বলতে পারলে দাঁড়াতে হবে। ছিঃ ছিঃ, লজ্জাও করে না। নেক্সট।'

এক এক করে পাঁচটা বেঞ্চি শেষ হল। দেখা গেল যে প্রায় অর্ধেক ছেলের ভাগ্যেই দাঁড়িয়ে থাকার শাস্তি জুটেছে।

'হোপলেস!' নতুন স্যারের কণ্ঠ থেকে রাগ এবং তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ল। আসলে কিন্তু জানা থাকা সত্ত্বেও নতুন স্যারের খর দৃষ্টির সামনে পড়ে অনেক ছেলেরই বাপের নামের পরেই গুলিয়ে যায়।

যেমন অন্তু। বাবার নাম বলে বিড়বিড় করতে লাগল, 'হরি হরি'—

'হরি কী?' ধমকে ওঠেন স্যার, 'শুধু হরি আবার হয় নাকি? হরিদাস? না, হরিপদ? না-কি হরিপ্রসাদ? মানে হরির সঙ্গে কী ঠিক করে বলো।' তাড়া খেয়ে মনে আসতে আসতেও অন্তুর মগজ থেকে ঠাকুরদা হরিসাধনের সাধনটুকু বেমালুম উবে যায়। সে হতাশ করুণ নয়নে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

'থাক থাক, ঢের হয়েছে।' নতুন স্যার হাতে তুলে নাম বলা থামিয়ে দেন। সারা ক্লাসের ওপর নিতান্ত বিরক্ত দৃষ্টি হেনে স্যার গলা খাঁকরি দিয়ে লেকচার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। এমন সময় একটি হাত ওঠে। একদম পিছনে যেন একখানা বেঞ্চি থেকে।

স্যার জিজ্ঞেস করেন, 'ইউ। তুমি কিছু বলবে?'

সামনের দিকে সব বেঞ্চের ছেলেদের ঘাড় পেছনে ঘোরে। তাদের সবার চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে।

'হ্যাঁ স্যার।' হাত তোলা ছেলেটি উঠে দাঁড়ায়।

স্যার দেখলেন, গোলগাল ফর্সা, প্যান্ট শার্ট পরা সরল চাউনি, একটু যেন ক্যাবলা টাইপের একটি ছেলে। নরম গলায় তিনি বললেন, 'কী?'

ছেলেটি একবার কানের পাশটা চুলকে নিয়ে লাজুক ভাবে জানাল, 'স্যার আমি পারি। সাত পুরুষের নাম বলতে পারি।'

'অ্যাঁ পার।' বেজায় অবাক হয়ে নতুন স্যার বললেন, 'আচ্ছা। কী নাম তোমার?'

ছেলেটি উত্তর দেওয়ার আগেই ঘরের নানা কোণ থেকে অনেকগুলি কণ্ঠে রব ওঠে, 'ভজা। ভজা।'

'অ্যাঁ! ভজা।' নতুন স্যারের ভুরু কুঁচকে যায়।

ছেলেটি ভারি কুণ্ঠিত ভাবে জানায় 'ওটা স্যার আমার ডাক নাম। আমার ভাল নাম পুলকচন্দ্র ঘোষ।'

'ও! তা বেশ। তোমার পূর্বপুরুষদের নাম বল, শুনি!' অনুমতি দেন স্যার!

ভজা ডান হাতের আঙুলের কর গুনে গুনে থেমে থেমে শুরু করে, 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ। বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ। জগদীশচন্দ্র ঘোষ। গোষ্ঠচন্দ্র ঘোষ। সুভাষচন্দ্র ঘোষ। বিধানচন্দ্র ঘোষ। শ্রীতারকচন্দ্র ঘোষ। তস্য পুত্র পুলকচন্দ্র ঘোষ।' নিজের বুকে ডান বুড়ো আঙুলের একটি টোকা মেরে ভজা ক্ষান্ত দেয়।

ভজার প্রথম চার পুরুষ অবধি নতুন স্যার তালে তালে মাথা নড়ছিলেন। তারপরেই সারা ক্লাসে খুক খুক ধ্বনির প্রাদুর্ভাবে তাঁর কেমন খটকা লাগল। অন্য ছেলেগুলো যেন মাথা নিচু করে হাসি চাপছে। আর নাম বলা শেষ করা মাত্র চাপা হাঁচি কাশি ভয়ানকভাবে বেড়ে গেল। ভজা কিন্তু নির্বিকার। সে হাসি হাসি মুখে গর্বের সঙ্গে নতুন স্যারের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুঝি কিঞ্চিৎ প্রশংসা লাভের আশায়।

কিন্তু প্রশংসা ভজার ভাগ্যে জুটল না। নতুন স্যারের কপালের জটও খুলল না। তিনি বাকি ছেলেদের রকম-সকম দেখে সন্দিগ্ধ সুরে প্রশ্ন করলেন ভজাকে, 'কী হে, ঠিক বললে তো? বাংলার সব বিখ্যাত লোকদের নাম দিয়ে দেখছি তোমার পূর্বপুরুষদের নাম।'

ভজা নিতান্ত নিরীহভাবে জবাব দিল, 'আজ্ঞে স্যার, যদ্দুর মনে পড়ছে এই নামগুলোই শুনেছি। তবে স্যার অনেকদিন আগে শোনা।'

ক্লাসে চাপা হাসির একটা ঢেউ ফের চাগিয়ে ওঠে।

নতুন স্যার মাঝের বেঞ্চের একটা ছেলেকে ধমকালেন, 'অ্যাই, হাসছ কেন?'

অমনি মন্টু দাঁড়িয়ে উঠে বেগে মস্তক আন্দোলন করে প্রতিবাদ জানাল, 'কই স্যার, হাসছি না তো। কাশি আসছিল।'

'কাশি? হুম।' স্যারের কথার সুরে ঘোর অবিশ্বাস। যাহোক এই নিয়ে আর ব্যোমকেশবাবু জল ঘোলা করলেন না। একটুক্ষণ গুম মেরে থেকে তিনি ভজা ওরফে পুলকচন্দ্র ঘোষকে বসতে নির্দেশ দিলেন। একটু ক্ষুণ্ণ ভাবেই যেন বসে পড়ে ভজা।

ব্যোমকেশবাবুর মনে প্রবল সন্দেহ দানা বাঁধল। ভজা নামে ওই ছেলেটা কি তাঁকে ঠকিয়েছে? বানিয়ে বানিয়ে বলেছে ওর পূর্বপুরুষদের নাম? এর সত্যি মিথ্যে যাচাই করা খুব কঠিন। ওর বাড়িতে তাহলে জিজ্ঞেস করতে হয়। সেটা ভাল দেখায় না। এই ভজা ছেলেটি সম্বন্ধে বরং একটু খোঁজ নিতে হচ্ছে।

ব্যোমকেশবাবু অঙ্কের বই খুললেন বটে, তবে দায়সারা ভাবে ক্লাস শেষ করলেন।

সেদিনই ব্যোমকেশবাবু টিচার্স রুমে ভজা সম্বন্ধে খবর নিতে গিয়ে চমকে গেলেন।

অন্য শিক্ষকরা বললেন, 'কে? ভজা? ডেনজারেস ছেলে মশাই। ওকে বেশি ঘাঁটাবেন না।'

'কিন্তু দেখে তো মনে হয় না। ব্যোমকেশবাবু আমতা আমতা করেন।'

জবাব হয় 'আরে ওটাই তো মুশকিল। বাইরে থেকে দেখে কিসসু বুঝবেন না, ও কী চিজ। কেমন ভালমানুষ আলু-ভাতে মার্কা মুখখানি, আসলে কিন্তু হাড় বজ্জাত। পেটে পেটে শয়তানি।'

ভজার পূর্বপুরুষদের নাম নিয়ে আর সন্দেহ রইল না ব্যোমকেশবাবুর। ভজা যে তাঁকে কীভাবে বোকা বানিয়েছে সেটা আর ভাঙলেন না টিচার্স রুমে। মনে মনে তিনি ফুঁসতে থাকলেন, 'বোসো, দেখাচ্ছি মজা। এমন ঢের বিচ্ছু ছেলেকে আমি শায়েস্তা করেছি।'

এরপর থেকে নতুন স্যার ব্যোমকেশবাবু ভজার জীবন একেবারে অতিষ্ঠ করে তুললেন।

সপ্তাহে দুটো পাটিগণিত ক্লাস। ব্যোমকেশবাবু এসেই চাইতেন, 'হোম টাস্ক এনেছ?'

যে ছেলে হোম টাস্ক আনত না তাকে বেশ কয়েকটা রাম গাঁট্টা খেতে হত স্যারের হাতে। ভজা বেশির ভাগ দিনই হোম টাস্ক করে উঠতে পারত না। ফলে তার ভাগ্যে শাস্তিটা ছিল প্রায় বাঁধাধরা। অন্য ছেলেদের তুলনায় ভজার মাথায় গাট্টাটা যেন কিছু বেশি বার এবং কিঞ্চিৎ বেশি জোরেই পড়ত। যদি বা ভজা দৈবাৎ হোম টাস্ক করে আনত, ব্যোমকেশ স্যার ভজাকে বোর্ডে তুলতেন কোনও পুরনো অঙ্ক কষতে। ভজা বেশির ভাগ সময় তা পারত না। ফলে সেদিনও গাঁট্টার হাত থেকে তার রেহাই নেই। অর্থাৎ ব্যোমকেশবাবুর ক্লাসে ভজাকে প্রায় প্রত্যেক দিনই মার খেতে হত।

নিয়মিত পড়া করার মতো সময় কোথায় ভজার? হাজারটা কাজ তার। নাইন-বি অথবা ভারতমাতা বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে কারও ম্যাচ থাকলে ভজার সাপোর্ট মাস্ট। ভজার পাড়ার ক্লাবের সঙ্গে অন্য পাড়ার টিমের ম্যাচেও মাঠে লাইনের ধারে ভজাকে চাই। ভজা নিজে তেমন খেলতে পারে না বটে, কিন্তু নিজেদের টিমকে নানা কায়দা করে জেতাতে ওস্তাদ ভজা। তার দলবল নিয়ে মাঠের ধার থেকে নিজেদের টিমকে গলা ফাটিয়ে উৎসাহ জোগাবে। বিপক্ষ প্লেয়ারদের টিটকিরি কেটে খেলার মেজাজ নষ্ট করে দেবে। রেফারিকে ভয় দেখিয়ে ঘাবড়ে দেবে যাতে ভজাদের টিমের হয়ে টেনে খেলতে?? বাধ্য হয়। এমনি নানা ফন্দি। বিপক্ষ দলের দুর্বলতা কী কী তার সুলুকসন্ধান ঠিক জেনে ফেলে ভজা।

এই তো কিছুদিন আগে ভবানীপুর স্কুলের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচে ভারতমাতা স্কুল জিতে গেল স্রেফ ভজার বুদ্ধির জোরে। একটা মারাত্মক গোপন খবর বের করে ফেলে ভজা। ভবানীপুরের দুর্ধর্ষ গোলকিপার গাবুর নাকি ভীষণ কুকুরে ভয়। কারণ একবার তাকে কুকুরে কামড়ে ছিল।

ভজার দল ভবানীপুর স্কুলের গোলপোস্টের পিছনে ভিড় করে রইল। আর ভবানীপুরের গোলের কাছাকাছি বল এলেই ঘাউ ঘাউ করে কুকুরের ডাক ডাকতে থাকে। গাবু সেই ডাক শুনে কেবলই চমকে চমকে পিছনে তাকায়। এমনি একবার আনমনা হওয়ার ফলেই নেহাতই দুর্বল একটা কিক গাবুর হাত ফস্কে গোলে ঢুকে যায়। আর ওই গোলেই হারল ভবানীপুর স্কুল। ভবানীপুর নালিশ জানিয়েছিল ভারতমাতা স্কুলের সাপোর্টারদের বিরুদ্ধে। কিন্তু ফল হয়নি। কুকুর ডাকের গভীর রহস্য বোঝেননি রেফারি। সুতরাং তিনি নালিশে কান দেননি।

স্কুলে বা পাড়ায় যে কোনও ফাংশানে ভজাকে নাহলে চলে না। চাঁদা তোলা, প্যান্ডেল সাজানো—সব কিছুতে ভজা তার দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার ভজার কোনও বন্ধুর

গায়ে অন্য ছেলে হাত দিয়েছে বা পিছনে লেগেছে শুনলে তার বদলা না নেওয়া অবধি ভজার শান্তি নেই।

এসব ছাড়াও তার আরও কত ঝক্কি। এত সামলে কি পড়াশোনায় সময় খরচ করা যায়? ওই পরীক্ষার ঠিক আগে ক'টা দিন আদা জল খেয়ে লেগে কোনও রকমে উতরে যায় ক্লাসে। বাড়িতে কিন্তু ভজার উপর শাসনের কমতি নেই। পরীক্ষায় রেজাল্ট ভাল না করার দরুন এবং কেউ বাড়িতে ভজার নামে নালিশ করলেই বাপদাদাদের বকুনি আর চড়চাপড় জোটে ভজার বরাতে। সে সব অবশ্য ভজা মোটে পরোয়া করে না। গা সওয়া হয়ে গিয়েছে।

তবে পাড়ায় বা ইস্কুলে ভজাকে কেউ বেশি ঘাঁটায় না মোটে। সবাই জানে দুষ্টু বুদ্ধিতে ছেলেটার জুড়ি নেই। কী ভাবে যে কাকে ফ্যাসাদে ফেলবে কে জানে। কোনও ক্লাসের পড়ায় বেশিরকম গা ঢিলে দিলে মাস্টারমশাই বড়জোর ভজাকে কিছু চোখা চোখা উপদেশবাণীসহ বকুনি বর্ষণ করেন। হয়তো বা তার সঙ্গে মৃদু চাঁটি বা গাট্টাও যোগ হয়। তাতে ভজা কিছু মনে করে না। তবে ব্যোমকেশবাবুর পাল্লায় পড়ে মালুম হচ্ছে যে এবার ভজা জব্দ হয়েছে। প্রথম দিনে স্যারকে বোকা বানানোর জেরটা যে এতদিন ধরে চলবে, কেউ তা ভাবেনি।

দু'দিন ভজা ব্যোমকেশবাবুর ক্লাস কামাই করল। ব্যোমকেশ স্যারও কম যান না। খবর নিয়ে জানলেন যে ভজা ওই দু'দিন অন্য ক্লাস করেছে, শুধু তাঁর ক্লাসই ফাঁকি মেরেছে। পরের ক্লাসে বাগে পেয়ে তিনি গাট্টা সহযোগে ভজাকে শাসালেন, 'এরকম ফের করলে তোমার বাবার কাছে কমপ্লেন পাঠাব।'

শুনেই ভজার আক্কেল গুড়ুম। উরিব্বাস। এ যে বাঘের মুখ থেকে সিংহের থাবায়। ভজার প্রচণ্ড রাশভারী বাবা অকারণে ক্লাস ফাঁকি দেওয়াকে অতি জঘন্য অপরাধ বলে গণ্য করেন। এমন কী ফেল করার ভয়েও। জানলে ভজাকে আর আস্ত রাখবেন না। ভজা তাই ও পথ ত্যাগ করল।

অন্তু দিন দুই ধরে লক্ষ করছিল যে ভজা কী নিয়ে জানি ঘোঁট পাকাচ্ছে। পাড়ায় অন্তু ভজার সামনের বাড়িতে থাকে। দু'জনে পরম বন্ধু। তবে অন্তু ভালমানুষ প্রকৃতির পড়ুয়া ছেলে। দু'জনে এক সঙ্গে ফুটবল ক্রিকেট ইত্যাদি খেলে। পরস্পরের বাড়িতে অবাধে যাতায়াত। কিন্তু ভজার নানা ডানপিটেমি ও দুষ্টুমিকে অন্তু সভয়ে এড়িয়ে চলে। স্কুলে অন্তু বসে ফার্স্ট বেঞ্চে। ভজা বসে লাস্ট বেঞ্চে, কয়েকটি মহা ধুরন্ধর চেলা চামুণ্ডা নিয়ে। দু ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে আর টিফিনের সময় ভজা তার শাগরেদদের সঙ্গে কী সব গুজগুজ ফিসফাস করছে।

পরের দিন থার্ড পিরিয়ডে পাটিগণিত ক্লাস। ব্যোমকেশবাবু চক ডাস্টার হাতে যথারীতি গটগট করে ক্লাসে ঢুকলেন। বসলেন চেয়ারে। তখন শীতকাল। স্যারের গায়ে পাঞ্জাবির পর জহর কোট। আর তাঁর বাঁ কাঁধে ঝোলানো একটি কাশ্মীরি শাল। সাদা রঙের চমৎকার কারুকার্য করা। কেউ কোনও দিন তাঁকে শালখানাকে খুলে গায়ে জড়াতে দেখেনি। অমনি নিখুঁত ধবধবে পাট করা অবস্থাতেই শালটি সর্বদা স্যারের কাঁধে শোভা পায়।

ব্যোমকেশ স্যার হোম টাস্কের খাতা চাইলেন। সামনে টেবিলে সেগুলি জমা পড়ল। ভজা খাতা দিল না। স্যার ভজাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি হোম টাস্ক করনি?'

ভজা কাঁচুমাচু ভাবে জানায়, 'না স্যার।'

'কেন?' স্যারের চোখে মুখে ঝড়ের আভাস।

ভজা বলল, 'সময় পাইনি স্যার।'

'কী রাজকার্য ছিল শুনি?' স্যারের গলা কঠোর হয়।

'স্যার, পাড়ার একজনের অসুখ করেছে। তাই তার জন্যে ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা, এইসব করতে করতে—' ভজা মাথা চুলকোয়।

'কেন, আর কেউ ছিল না কাজ করার?' স্যার জেরা চালান।

ভজা জানায়, 'ছিল স্যার। তবু হেল্প করতে গিসলাম। পাড়ার লোক।'

ব্যোমকেশ স্যার খিঁচিয়ে ওঠেন, 'জগবন্ধু, অজয়— ওরাও তো তোমার পাড়ায় থাকে শুনেছি। ওরা হোম টাস্ক করল কী করে?'

ভজা অভিযোগের সুরে বলে, 'ওরা স্যার একটু থেকেই পালিয়ে এসেছে।'

'ও! আর তোমায় ঠায় বসে থাকতে হল। যত পড়া না করার ছুতো।' স্যারের মেজাজ চড়ে।

ভজা ফস করে ভারি বিজ্ঞের মতো বলে বসল, 'স্যার, মানুষকে দুর্দিনে সাহায্য করতে গিয়ে একদিন হোম টাস্ক না করা কি বড় অপরাধ? সেদিনই বাংলা স্যার যে বললেন, সেবা ধর্মই মানুষের সব চেয়ে বড় কর্তব্য!'

ব্যস, একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন ব্যোমকেশবাবু। হুংকার দিলেন, 'বটে। আবার ডেঁপোমি হচ্ছে?'

ভজা যেন ভারি ধন্ধে পড়ে অতি নিরীহ স্বরে জানতে চাইল, 'কেন স্যার, ভুল বলেছি? সেদিন তাই তো বললেন বাংলা স্যার।'

ক্ষিপ্ত ব্যোমকেশবাবু চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠে চেঁচালেন, 'ভুল কি ঠিক দেখাচ্ছি। এসো এদিকে। কাম-অন।'

ভজা খুব চিন্তিত মুখে ধীরে সুস্থে ব্যোমকেশ স্যারের কাছে গিয়ে বিড়বিড় করল, 'সেবা ধর্ম, না হোম টাস্ক? কোনটা বেশি ইম্পর্ট্যান্ট? কে জানে?'

ভজার শেষ বাক্যগুলি অবশ্যই স্যারের কানে পৌঁছল। 'রাসকেল। ইয়ার্কি হচ্ছে?' তাঁর গর্জনে গোটা ক্লাস কেঁপে উঠল। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তিনি বাঁ হাতে খপ করে ভজার চুলের মুঠি পাকড়ে ডান হাতে ভজার গালে কষালেন প্রচণ্ড এক থাপ্পড়। এরপরেই তিনি গাট্টা তাক করেছেন পরের ডোজ হিসেবে কিন্তু আগেই একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেল। ভজা একবার মাতালের মতো টাল খেয়ে ধড়াম করে সটান আছড়ে পড়ল মেঝেতে। স্যারের গাট্টা আর লক্ষ্যে আঘাত হানার সুযোগ পেল না। শূন্যেই আড়ষ্ট হয়ে যায় উদ্যত হাতখানা। তাঁর মুখ হাঁ, চক্ষু বিস্ফারিত, চশমাটা কোনওক্রমে নাকের ডগা আঁকড়ে ঝুলছে। গোঁফ খাড়া—একেবারে থ হয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন মাটিতে লম্ববান ভজার দিকে। ব্যস, ক্লাসে যেন দক্ষযজ্ঞ বেধে গেল।

প্রথমেই পেছনের বেঞ্চের কয়েকজন ছেলে লাফিয়ে এসে ভজাকে ঘিরে ধরল। তাদের ফাঁক দিয়ে বাকি ছেলেরা উঁকি মারল ভজাকে দেখতে।

ভূপতিত ভজা গোঁ গোঁ করতে করতে বারকয়েক ছটফট করে হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। তার

মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠতে লাগল। চোখ বোজা, মনে হচ্ছে বেহুঁস। ছেলেদের আর্ত রব উঠল, 'ভজা মরে যাচ্ছে স্যার। ভজা মরে যাচ্ছে—'

ব্যোমকেশবাবু দিশেহারার মতো দাঁড়িয়ে এদিক সেদিক দেখতে দেখতে বলতে থাকেন, 'অ্যাঁ, মরে যাচ্ছে? সে কী। কী করি? অ্যাঁ—'

ইতিমধ্যে কিছু ছেলে ক্লাস থেকে বেরিয়ে পড়ে বারান্দা দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটল। ব্যস, কয়েক মিনিটে সারা স্কুলে রটে গেল যে ব্যোমস্যার ভজাকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছেন।

বাঁধ ভাঙা স্রোতের মতো অন্য ক্লাসের ছেলেরা হুড়মুড়িয়ে ছুটে এসে ভিড় জমালো নাইন বি-র দরজার কাছে। শুধু ছাত্ররা নয়, কয়েকজন টিচারও এসে জুটলেন সেখানে। সবাই ভজাদের ক্লাসের ভিতর ঢুকতে চায়। মারের চোটে ভজা পটল তুলেছে—এ কী যে সে ব্যাপার? কিন্তু নাইন বি-র ছেলেরা, বিশেষ করে ভজার শাগরেদরা দরজা আটকে দাঁড়াল। বলল, 'না না, বেশি ভিড় নয় এ ঘরে। দম আটকে যাবে। না, ভজা এখনও মরেনি। তবে কেস খুব সিরিয়াস।'

ছাত্ররা বাধা পেলেও অন্য ক্লাসের কিছু টিচার অবশ্য ঘরে ঢুকলেন ঘটনাটা সরেজমিনে তদন্ত করতে। ভজার অবস্থা দেখে তাঁরাও হতভম্ব হয়ে গেলেন।

অন্তুর ঠিক সামনেই ঘটেছিল সমস্ত ব্যাপারটা। সে কাঠ হয়ে ভাবছিল, চড়টা নিশ্চয়ই খুব জোরে ছিল। কিংবা বেকায়দায় লেগে গেছে। নইলে যে ভজা হরদম তার বাবা দাদাদের হাতে পিটুনি হজম করে পোক্ত হয়ে গেছে এক চড়ে তার এই হাল হবে কেন? অন্য ছেলেদের সঙ্গে মারপিটে বেদম ধোলাই খেয়েও ভজা এমন কাবু হয়নি কখনও। ভজাটা কি সত্যি বাঁচবে না? ইস। তার কান্না পেয়ে গেল।

সহসা ব্যোমকেশবাবুর কাঁধের শালে টান পড়ে।

'এ কী, এ কী!' তিনি শাল আঁকড়ে ধরেন।

ভজার লাস্ট বেঞ্চের এক দোস্ত টুনু শালের অপর প্রান্ত টানতে টানতে বলে, 'স্যর শালটা দিন। ভজার মাথায় জল দিতে হবে। এটা ভিজিয়ে আনি।'

'না না, শাল নষ্ট হয়ে যাবে।' ব্যোমকেশবাবু শাল ধরে রাখেন।

'স্যার, একটা জীবনের চেয়ে কি একটা শালের দাম বেশি? দিন দিন স্যার শিগগিরি। দেখছেন না ওর কন্ডিশন। আর তো কিছু নেই ভেজাবার,' বলতে বলতে টুনু হেঁচকা মারে শালে।

ব্যোমকেশবাবুর অপরাধী মন জোর হারিয়ে ফেলে। তাঁর মুঠো আলগা হয়। শাল বেরিয়ে যায়।

ভজার দেহ মাঝে মাঝে থরথর করে কেঁপে উঠছে, আবার নিথর হয়ে যাচ্ছে। ফেনা বেরুচ্ছে তার মুখ দিয়ে। বহু দর্শক চিৎকার করছে, 'ডাক্তার। ডাক্তার ডাকো কুইক।' কিন্তু কে যে ডাক্তার ডাকবে? কোত্থেকে? তার সমাধান হচ্ছে না। শুধুই হট্টগোল বাড়ছে।

ভিজে শাল হাতে টুনু দুদ্দাড় করে ছুটে ফিরল। স্কুল কম্পাউন্ডের এক কোণে একটা খোলা চৌবাচ্চা ছিল। বারো মাস সেটায় জল জমে থাকে। বৃষ্টির জল। কস্মিনকালেও সেটা সাফ করা যায় না। জলে অসম্ভব দুর্গন্ধ আর কিলবিলে পোকা। সেই জলে শালটা আচ্ছা করে চুবিয়ে ভেজানো হয়েছে।

টুনু ভজার মুখের উপর শালটা নিঙড়াল। সেই বিকট নোংরা জল ভজার মুখ মাথা চুল ভিজিয়ে দিল। গুণ আছে বটে ওই জলের কারণ অমনি ভজার জ্ঞান ফিরে এল। সে মাথা এপাশ ওপাশ করতে করতে—'উঃ আঃ' কাতরানি শুরু করল।

টুনু আর একবার শাল নিঙড়াল ভজার মুখে। এবার ভজা চোখ মেলে হাতের এক ঝটকায় ভিজে শালখানা সরিয়ে দিয়ে ঠেলে উঠে বসল। তারপর ফ্যালফ্যালে দৃষ্টিতে চারধারে তাকাতে তাকাতে ক্ষীণ হয়ে প্রশ্ন করল, 'আমি কোথায়? আমার কী হয়েছে?'

এতগুলি কণ্ঠ সমস্বরে এর উত্তর দিল যে কারও কথাই স্পষ্ট বোঝা গেল না। ভজা নিজের মনেই তেমনই বেহুঁশ সুরে বলে ওঠে, —'ওঃ মনে পড়েছে।'

সহসা দরজার কাছে ভিড়টা দু ফাঁক হয়ে গেল। মাঝখান দিয়ে হেডমাস্টারমশাই হনহন করে ঘরে ঢুকে ভজার সামনে থমকে দাঁড়ালেন। অন্য দর্শকরা তটস্থ হয়ে একটু দূরে সরে যায়।

হেডস্যারকে দেখেই ভজার ঘাড় এক পাশে হেলে পড়ে।

থমথমে মুখে তীক্ষ্ণ চোখে ভজাকে অল্পক্ষণ নজর করে মন্তব্য করলেন, 'যাক, সেন্স ফিরেছে।' এরপর তিনি ভজাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন বোধ হচ্ছে? ব্যথা করছে?'

ভজা কাতর কণ্ঠে জবাব দিল, 'ভাল স্যার। ব্যথা নেই। মানে সামান্য। ও কিছু নয়। হঠাৎ কেমন জানি—' তারপরেই সে ব্যোমকেশবাবুর দিকে চেয়ে জোড়হাতে কাঁদকাঁদ স্বরে বলে উঠল, 'কোনও দোষ করে থাকলে মাপ করে দেবেন স্যার।'

মহা অপ্রতিভ ব্যোমকেশবাবুর মুখে কোনও কথা জোগাল না।

হেডমাস্টারমশাই গম্ভীর কণ্ঠে ঘরে অন্য শিক্ষকদের বললেন, 'আপনারা নিজেদের ক্লাসে যান।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধমকে ওঠেন দরজার ওপাশে ছাত্রদের, 'যাও, যে যার ক্লাসে যাও।'

বাইরে ভিড় ফাঁকা হয়ে গেল।

এরপর হেডস্যার ব্যোমকেশবাবুকে বললেন, 'আপনি একবার আসুন আমার সঙ্গে।' তিনি গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। পিছনে পিছনে ব্যোমকেশবাবু।

ভজা তেমনই মেঝেতে বসে নিজের শার্ট দিয়ে মাথা মুখ মুছতে লাগল আর আড় চোখে বারকয়েক টুনুকে দেখল।

বারান্দার প্রান্তে গিয়ে হেডস্যারের সঙ্গে ব্যোমকেশবাবুর একান্তে কিছু কথা বার্তা হল। আর কেউ তা শুনতে পায়নি। হেডমাস্টার মশাই চলে গেলেন নিজের ঘরের দিকে দোতলায়। ব্যোমকেশবাবু মুখ চুন করে ফিরলেন ক্লাস নাইন বি-তে।

ব্যোমকেশবাবু মেঝেতে বসা ভজাকে বেশ কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি এখানে রেস্ট নেবে? না, বাড়ি যাবে?'

ভজা কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে বলল, 'বাড়ি যাই স্যার। শরীরটা কেমন—'

ব্যোমকেশবাবু অমনি সম্মতি দিলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই যাও।'

ভজা হাতের উপর ভর দিয়ে যেন কষ্টে উঠে দাঁড়াল। তারপর এক পা বাড়িয়েই সে একবার টাল খেল। পাশ থেকে টুনু তাকে জাপটে ধরল।

ব্যোমকেশবাবু শশব্যস্ত হয়ে বললেন, 'না না, হেঁটে নয়। তুমি বরং রিকশা চেপে যাও।

এই নাও ভাড়া।' তিনি পকেট থেকে একটা টাকা বের করে ভজার হাতে দিলেন। এরপর ক্লাসের ছেলেদের উদ্দেশে বললেন, 'তোমরা কেউ যদি ওর সঙ্গে যাও ভাল হয়। ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো।'

'আমি যাচ্ছি স্যার,' টুনু তৎক্ষণাৎ রাজি।

টুনুর গায়ে ভর দিয়ে ভজা ধীরে ধীরে যাচ্ছে, হঠাৎ টুনু মেঝে থেকে কিছু কুড়িয়ে নিয়ে তড়বড়িয়ে এসে ব্যোমকেশবাবুর হাতে বস্তুটি গুঁজে দিয়ে, 'স্যর আপনার শাল,' বলেই লাফিয়ে গিয়ে ভজাকে আঁকড়ে ধরে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল।

হাতে ধরা সেই বস্ত্রপিণ্ডের দিকে চেয়ে ব্যোমকেশবাবু আঁতকে উঠলেন। হায় হায় তাঁর সাধের শালটির এ কী দুর্দশা। নোংরা, কালচে, দুর্গন্ধ জলে সপসপে ভেজা। চটকে মটকে একেবারে ন্যাতা।

বিকেলে পাড়ায় ভজাকে দিব্যি দৌড়ে খেলতে দেখে অন্তু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী রে, খেলছিস যে, মাথা ঘোরা ঠিক হয়ে গিয়েছে?'

ভজা মিচকে হেসে বলল, 'হুঁ।'

'খুব লেগেছিল?' অন্তু উদ্বিগ্ন।

ভজা অবজ্ঞার সুরে বলল, 'ধ্যুৎ, ও কিছু নয়।'

'তোর বাড়িতে কী বলল?'

'বাড়িতে?' ভজা ভুরু কোঁচকায়, 'বাড়িতে জানবে কেন?'

'বাঃ, রিকশা করে ফিরলি। জিজ্ঞেস করবে না?'

ভজা ফিক করে হেসে বলল, 'আরে দুর, একটু গিয়ে মোড় বেঁকতেই রিকশা থেকে লাফিয়ে নেমে রিকশাওলাকে কিছু পয়সা দিয়ে ভাগিয়ে দিলাম। আর বাকি পয়সায় দু'জনে ফুচকা খেলাম। তারপর ঘুরেটুরে ইস্কুল ছুটির সময় বাড়ি ফিরেছি। বাড়িতে জানবে কী করে?'

ভজা মিটিমিটি হাসল। অন্তুকে সাবধান করে দিল, 'এই, বাড়িতে কিছু বলবিনে কিন্তু। খবরদার।'

ব্যোমকেশবাবুর শিক্ষা হয়ে গেল। তিনি আর কোনও দিন ভজার গায়ে হাত তোলেননি। ওকে পড়াও ধরতেন না। হোমটাস্ক না আনলেও চোখ বুজে থাকতেন। পারতপক্ষে তার দিকে নজরই দিতেন না। ভজাও আর তাঁর ক্লাসে কখনও গোলমাল করেনি। ভজা স্কুল পাশ করে বেরিয়ে যেতে ওই স্কুলের আরও শিক্ষকের মতো ব্যোমকেশবাবুও হাঁপ ছেড়েছিলেন।

এর প্রায় পনেরো বছর বাদের কথা।

ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে চলেছেন ব্যোমকেশবাবু। তিনি তখন রিটায়ার করেছেন স্কুল থেকে। সেই তেজি চেহারা আর নেই। বয়সের ভারে একটু ঝুঁকে পড়েছেন। রোগা হয়ে গিয়েছেন। মাথায় পাতলা চুল সব সাদা। গোঁফও পাকা। পরনে মলিন পরিচ্ছদ। কেমন বিষণ্ণ চেহারা।

হঠাৎ একজন ইয়াং-ম্যান, ইয়া লম্বা চওড়া, টকটকে রং, পরনে দামি স্যুট, উল্টো দিক থেকে এসে পথ আগলে দাঁড়াল ব্যোমকেশবাবুর একেবারে মুখোমুখি। ব্যোমকেশবাবু থতমত খেয়ে থমকে গেলেন।

সেই সাহেবি চেহারার যুবকটি একটু ঝুঁকে ব্যোমকেশবাবুর মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে এক কাণ্ড করল। সেই রাস্তায় হাজার লোকের সামনে দুম করে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বসল।

ভীষণ চমকে কয়েক পা পেছিয়ে যান ব্যোমকেশবাবু।

গমগমে গলায় যুবকটি বলল, 'আমায় চিনতে পারছেন স্যার?'

'কে?' ব্যোমকেশবাবু অবাক হয়ে তাকান অপরিচিতের মুখে।

'স্যার, আমি ভজা,' জানায় যুবকটি।

'অ্যাঁ, ভজা।' ব্যোমকেশবাবু আকাশ থেকে পড়েন, 'আপনি, মানে তুমি?'

'বিদেশে, কানাডায় আছি স্যার। এই দিন পনেরো কলকাতায় এসেছি। আবার ফিরে যাব। আপনি কি স্যার ওই স্কুলেই আছেন?'

ব্যোমকেশবাবু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'না বাবা, আমি এখন রিটায়ার করেছি।'

'স্যর আপনি সেই আগের বাসাতেই আছেন? না বাড়ি বদলেছেন?' ভজা বিনীত ভাবে জানতে চায়।

'হ্যাঁ, সেই বাড়িতেই আছি,' জবাব দেন ব্যোমকেশবাবু।

'সন্ধেবেলা বাড়ি থাকেন স্যর?'

'হ্যাঁ বাবা, থাকি। টিউশনি করি।'

'আচ্ছা চলি স্যর। একদিন যাব আপনার বাসায়।' ভজা হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে লম্বা পায়ে এগিয়ে যায়। ব্যোমকেশবাবুকে আর কিছু বলার সুযোগ দেয় না।

সেই দিনই সন্ধ্যায়।

'স্যার।'

ভজার হাঁক শুনে ব্যোমকেশবাবু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসেন উঠোনে। ভজা যে সত্যি তাঁর বাসায় হাজির হবে বিশ্বাসই হয়নি। দামি কোট প্যান্টে সজ্জিত সেই সাহেব ভজাকে যে কোথায় বসাবেন তিনি ভেবে পাচ্ছেন না। ভজা কিন্তু বসল না। টিপ করে স্যারের পায়ে আবার পেন্নাম ঠুকে তাঁর পায়ের কাছে একটি কাগজের প্যাকেট রেখে দিয়ে বলল, 'স্যার, আমাদের দেশে গুরুদক্ষিণা দেওয়ার প্রথা আছে। এখন আমি রোজগার করি, এই সামান্য প্রণামীটুকু কিন্তু নিতে হবে স্যার। নইলে বড় দুঃখ পাব। এখন খুলবেন না। পরে। আমি চলে গেলে।' ভজা প্যাকেটটা তুলে একটা টুলে রাখে।

'তুমি কানাডায় কী কর বাবা? কৌতূহলী ব্যোমকেশবাবু জিজ্ঞেস করেন।'

'আজ্ঞে চাকরি। ওখান থেকেই ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে কাজ করছি। স্কুল ফাইনাল পাশ করেই চলে যাই কানাডায় কাকার কাছে। তারপর অনেক কষ্ট করে পড়েছি।'

ব্যোমকেশবাবু হতবাক। সেই ভজা, যে অঙ্কে এত কাঁচা ছিল। সে এখন ইঞ্জিনিয়ার। জগতে কত বিচিত্র ব্যাপারই না ঘটে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি সসঙ্কোচে বলেন, 'হ্যাঁ বাবা, সেই যে তোমাকে মেরেছিলুম। বড্ড লেগেছিল। না?'

ভারি লজ্জিতভাবে মাথা নিচু করে ভজা জবাব দেয়, 'আজ্ঞে তেমন কিছু নয়। মানে আসলে ভান। যাতে আর মার খেতে না হয়।'

যাক। ব্যোমকেশবাবুর মন থেকে একটা মস্ত ভার নেমে গেল। ভজার কেসটার পর তিনি আর কখনও কোনও ছাত্রকে জোরে মারেননি।

'আজ চলি স্যার। আপনার স্টুডেন্টরা বসে আছে।' ভজা বিদায় নেয়।

ব্যোমকেশবাবু উপহারের প্যাকেটটা খোলেন।

একটি অতি চমৎকার কাশ্মীরি শাল। অনেকটা তাঁর বহু পুরনো হতশ্রী শালটার মতো দেখতে। তবে এটা ঢের বেশি দামি।

[১৯৯৫, সন্দেশ শারদীয়া]

প্যাঁচ

আমাদের পরিবারের বার্ষিক পিকনিকটা বুঝি এবার ভণ্ডুল হয়। প্রতি বছরই অন্তুদের পরিবারের আত্মীয়স্বজনরা মিলে একটা পিকনিক করে পুজোর ছুটিতে কোনও একদিন। অন্তুদের যেসব আত্মীয়রা কলকাতায় থাকে, তারা সবাই প্রায় যোগ দেয় এই আনন্দ-উৎসবে। এমনকী কলকাতার বাইরে কাছাকাছি বাসিন্দা দু'চারজন আজও হাজির হয়। এ ছাড়া জাতিগোষ্ঠীর বাইরে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবও তাদের পিকনিক-পার্টির লোক। যেমন অন্তুর প্রাণের বন্ধু ভজা। পিকনিকের জোগাড়যন্ত্রে অন্তুর মতনই তার উৎসাহ।

দক্ষিণ কলকাতার যতীন দাস রোডে অন্তুদের বাড়ি হচ্ছে হেড-অফিস। এই পিকনিকে আগে সেখানে মিটিং বসে পিকনিকের জায়গা, রান্নার মেনু, চাঁদা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি স্থির করতে। বাবা কাকা জ্যাঠা মামা মা মাসি কাকি জনা-কয়েক সিনিয়র মেম্বারদের নিয়ে হয় বৈঠক। ছোটরা তখন ঘরের বাইরে ঘোরাঘুরি করে উদগ্রীব হয়ে। সভার আবহাওয়া কখনও নরম কখনও গরম। কখনও খোশমেজাজি আলোচনাতেই সমাপ্তি। কখনও থেকে তর্ক-বিতর্ক। কখনও এক বৈঠককেই সব সমস্যার ইতি, কখনও বা দু'তিনবারও বসতে হয়।

বছর দুই হল, অন্তু সাবালক হয়েছে। পিকনিকের উদ্যোগপর্বের সভায় ডাক পড়ছে তার। বেশ খানিকটা খাটাখাটুনি চাপে অন্তুর ঘাড়ে। তবে মিটিঙে কোনও মতামত প্রকাৰের অধিখার এখন তার নেই। স্রেফ শুনে যায়, বড়জোরর ঘাড় নাড়ে।

দু'একটা বিষয় নিয়ে অল্পবিস্তর কথা-কাটাকাটি ফি-বারই হয়। আবার মিটমাটও হয়ে যায়। যেমন, গতবার পিকনিকের জায়গা কোথায় হবে তাই নিতে গোটা একদিন কাবার হয়েছিল। রবিবার দুপুরে বসে রাত সাতটা বেজে গেছল মীমাংসায় পৌঁছবে। কিন্তু এবার এমন এক গিঁট লেগেছে, যা আর খুলতেই চাইছে না।

কারণটা বলা চলে নেহাতই তুচ্ছ। খিচুড়ি-ডিমভাজা না ভাত-মাংস? ব্যস, এই নিয়ে বেঁধে গেছে রবিকাকা আর চাঁদুকাকায়। অন্তুর রবিকাকা চাঁদুকাকা সম্পর্কে পরস্পরে জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো ভাই। দুজ'নেরই বয়স তিরিশের মাঝামাঝি। ছেলেবেলা থেকেই দু'জনে যত ভাব, আবার খিটিমিটিও লাগে তেমনি।

এবার পিকনিকের প্রথম মিটিঙে কিঞ্চিৎ টানাহ্যাঁচড়ার পর প্রায় সমস্ত দরকারি বিষয়গুলির

মীমাংসা হয়ে গেছল, শুধু একটি বাদে। পিকনিকের জায়গা ঠিক হয় ব্যাণ্ডেল-এ গঙ্গার ধারে। দিব্যি গড়িয়ে যাচ্ছে সভা। আর দ্বিতীয়বার মিলিত হবার প্রযোজন আছে বলে মনে হয়নি। কিন্তু ঠেকে গেল খাবারের মেনুতে এসে। রবিকাক বললেন, "খিচুড়ি, ডিমভাজা, বেগুনভাজা, চাটনি—ফাসক্লাস।"

চাঁদুকাকা জানালেন, "না, গরম ভাত আর মাংসের ঝোল সঙ্গে মুগের ডাল,। বেগুনভাজা, চাটনি, মিষ্টি থাকলে টপ্।"

"উঁহু", দৃঢ়কণ্ঠে আপত্তি করলেন রবিকাকা, "নো ভাত-মাংস। খিচুড়ি নইলে কি পিকনিক জমে?"

"আমরা তো বাদলা দিনে ঘরে বসে ভোজন করছি না যে খিচুড়ি খাব। গাছের তলায় আউটডোর লাঞ্চে ভাত-মাংস বেস্ট," চাঁদুকাকার মন্তব্য।

"আউটডোর লাঞ্চ। সিনেমা-পার্টি নাকি?" রবিকাকার সুরে বিদ্রুপ, "তা হলে প্যাকেট লাঞ্চ নিয়ে গেলেই হয়। স্রেফ স্যাণ্ডুইচ-কলা। কষ্ট করে রান্নাবান্নার দরকার কি?"

চাঁদুকাকা দমেন না। স্বর তুলে বললেন, "কারও সাধ থাকলে পাউরুটি চিবোক। আমার মত ভাত-মাংস।"

"আমার মত খিচুড়ি।" রবিকাকা একই সুরে জানালেন।

সভার আবহাওয়া থমথমে। বোঝা গেল দুই কাকা নিজেদের খাদ্যতালিকা থেকে একচুল নড়বেন না।

অন্তর জেঠু ইন্দুবাবু পড়লেন মহা আতান্তরে। তিনি এখানে বয়োজ্যেষ্ঠ। এবং বলা চলে সভাপতি। ভদ্রলোক অতি ভালমানুষ। নিরুপায় হয়ে তিনি আবেদন জানালেন, "কী গো চিনু, হাবু বউমারা, বলো তোমরা, কী রান্না হবে?"

অমনি রবিকাকা তাঁর স্ত্রী চিনুকাকিমা, এবং চাঁদুকাকা তাঁর গিন্নি হাবুকাকির দিকে এক ঝলক প্রখর দৃষ্টি হেনে মুখ ফরিয়ে গোঁজ হয়ে রইলেন। দুই কাকিমা নার্ভাস ভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। মুখ খুলতে সাহস পেলেন না।

"তোমরা কী বলো?" ইন্দুবাবু অন্যদের কাছে অনুরোধ রাখেন। অন্য সভ্যদের বেশির ভাগ চুপ। দু'একজন আমতা-আমতা করে। কেউ বলল, খিচুড়ি, কেউ জানাল, ভাত-মাংস।

রবিকাকার কাছ থেকে চিরকুট এল ইন্দুবাবুর হাতে, "খিচুড়ি-ডিমভাজা চাই।"

অমনি চাঁদুকাকার চিরকুট হাজির, "খিচুড়ি নয়। ভাত-মাংস হোক।"

চিন্তিত ইন্দুবাবু তাঁর কাঁচাপাকা চুলে হাত বোলাতে বালাতে ভাবলেন না ব্যাপারটার আজ আর নিষ্পত্তি হবার লক্ষণ নেই। দু'জনেরই রোখ চেপে গেছে। একটু ঠাণ্ডা হোক। ফের একদিন বসা যাবে। তখন বুঝিয়েসুঝিয়ে...।

সেদিনের মতো সভা ভঙ্গ হল। ঠিক হল, আগামী পরশু বুধবার ফের এই নিয়ে আলোচনা হবে সন্ধ্যায়। বুধবারও ব্যাপারটার সমাধান হল না। খিচুড়ির নাম হতেই চাঁদুকাকা দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়লেন এবং ভাত-মাংসের প্রস্তাব উঠতেই রবিকাকা মাথা নেড়ে প্রবল আপত্তি তুললেন। চিরকুট এগিয়ে আসে, 'নো খিচুড়ি। ভাত-মাংস লাস্ট।"

পরক্ষণেই অন্য চিরকুট, 'ভাতফাত চলবে না। খিচুড়ি-ডিমভাজা চাই।"

দুই কাকাই স্পিকটি নট্। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছেন না। ঠোঁট টিপে রয়েছেন। বাকি মেম্বাররা হতভম্ব, অসহায়। দুই কাকিমার চোখ ছলছল। অগত্যা ইন্দুবাবু ঘোষণা করলেন, "আচ্ছা, মেনু কী হবে সে আমি যা হোক ভেবেচিন্তে ঠিক করব পরে। যাওয়া তো হোক।"

নীরবে গম্ভীর মুখে বিদায় নিলেন রবিকাকা, চাঁদুকাকা। বাইরে বেরিয়ে কয়েকজন তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু দুই কাকার ভাবভঙ্গি বিন্দুমাত্র নরম হল না। দু'জনেরই মুখেই এক রা। আমি তো বলেই দিয়েছি, ব্যস্।

দুজনের এমন জেদাজেদির কারণটা কী? খুঁজলে কারণ একটা পাওয়া যায় বইকী, তাহলে মাস ছয়েক পেছিয়ে যেতে হয়। উপলক্ষটা ছিল ভাইঝির বিয়ে। নেমন্তন্নে রান্নার তালিকা কী হবে ভোজনরসিক দুই কাকা তাই নিয়ে মতামত প্রকাশ করেছিলেন। খানিক ধস্তাধস্তির পর অন্য আইটেমগুলো পাইনাল হয়ে গেলেও কেটা আইটেম-এ জোর তর্ক বেধে যায়। কে থাকবে? রবিকাকার পছন্দ ফিশ-ফ্রাই? না চাঁদুকাকার দাবি ভেজিটেবল চপ?

সমস্যা মেটাতে স্থির হয়, যে ওই দুই আইটেমই বাদ, তার বদলে নতুন পদ হোক ফিশ-চপ। অর্থাৎ দুই প্রস্তাবেরই আধখানা রইল এবং আধখানা ছাঁটাই হল। ভাবা গিয়েছি যে এতেই সমাধান। দু'জনেরই কারও মনেই আর খেদ থাকবে না। এখন বোঝা যাচ্ছে যে, দুই কাকার কাউকেই সন্তুষ্ট করা যায়নি। তারা রাগ পুষে রেখেছিলেন। এই পিকনিক উপলক্ষে তারই বিক্ষোভ।

ইন্দুজেঠু অন্তু তার ভজাকে বললেন, 'মহা মুশকিল দুটোই বাকী করেছে, এবার বরং পিকনিক বন্ধ থাক।

'না না, পিকনিক হোক। আর ভাববেন না,' ভজা ভরসা দেয়।

ইন্দুবাবুমাথা চুলকে বললেন, 'ওরা দুজনে কি যাবে?"

"যাবে, যাবে। আপনি বললে যাবে," বললভজা।

"হুঁ, তা যাবে বটে। তার মুখগোমড়া করে বসে থাকলে পিকনিকটা মেজাজটা নষ্ট হয়ে যাবে হে?

"ওসব রাগারাগি মিটে যাবে', বলে দিল ভজা।

"বলছ?" ইন্দুবাবু চিন্তিত, "বেশ করে তোড়জোড়। তোমাদের ওপরেই সব ব্যবস্থা ছেড়ে দিচ্ছি। আমি গোটা উৎসাহ পাচ্ছিনে।"

রবিকাকা থাকেন শ্যামবাজারে চাঁদুকাকা ভবানীপুরে। অন্তু ভজাকে নিয়ে প্রথমে গেল রবিকাকার কাছে চাঁদ আর করতে।

রবিকাকা থমথমে মুখে বললেন, "ওই হলে ভাত-মাংসই রইল, খিচুড়ি ক্যানসেলড?"

অন্তু আমতা-আমতা করে কিছু কথা দেবার আগেই ভজা তড়িঘড়ি বলে "না, রবিকা, এখনও কিছু ঠিক হয়নি। জেঠু ঠিক করবেন ভেবে।"

"কী ভাবে?" রবিকাকার প্রশ্ন।

"কে জানে? হয়তো টস করবেন?

"হুম্। অর্থাৎ হতে পারে, আবার নাও হতে পারে? চাঁদ যাচ্ছে?"

"ওঁর কাছে এখনও হইনি। যাব।

রবিকাকার ভুরুতে জট। খানিক মেরে থেকে বললেন, "দ্যাখো বোধহয় পিকনিকে যাওয়া সম্ভব হবে না। সেদিন বোধহয় আমার জরুরি কাজ পরে যেতে পারে। বরং তোমাদের কবিতা আর ছোটকু-ফুটকির চাঁদা নিয়ে যাও।

অন্তু বলল, "তা হবে না রবিকা। বলে দিয়েছেন, তোমায় যেতেই হবে?

ইন্দুবাবুকে সবাই মানা করে। ওই অনুরোধে না করা মুশকিল। রবিকাকা হাঁড়িমুখে বললেন, "ও। বড়দার অর্ডার। তবে তো না গিয়ে উপায় নেই।"

এবার চাঁদুকাকার পালা। তিনি প্রথমেই জানতে চাইলেন, "কী ঠিক হল ভাত না খিচুড়ি?"

"এখন ঠিক হয়নি কিছু ভাবছেন, "অন্তুর জবাব।

চাঁদুকাকা উদাস নয়নে ছাদের পানে চেয়ে বললেন, "বাড়ির অন্যরাযেযায় থাক, তবে আমার বোধহয় যাওয়া হবে না।

"কেন?" জিজ্ঞেস করে অন্তু।

"স্টমাকটা ইদানীং ট্রাবল দিচ্ছে। যা-তা খাওয়া সহ্য হচ্ছে না?"

অর্থাৎ খাদ্য হিসেবে খিছুড়ি যা-তা এবং অচল।

অন্তু বলল, "বড়জেঠু বলে দিয়েছেন, তুমি কেন নিশ্চয়ই যাও।"

"ও, বড়দার রিকোয়েস্ট। অলরাইট, তা হলে যাব। তবে বাপু যা-তা খেতে পারব না, বলে রাখছি।"

পিকনিকের দিন যতই এগিয়ে আসে ইন্দুবাবুর উদ্বেগ তত বাড়ে। রবি চাঁদু যদি বিগড়ে থাকে পিকনিকের বারোটা। জমবে না একদম। দু'জনেই মহা হুল্লোড়ে। পিকনিক বিয়েবাড়ি জন্মদিন ইত্যাদি উৎসবে ওদের ছাড়া চলে না। ব্যাণ্ডেলে গিয়ে সব্বাই কে নিয়ে গঙ্গায় নৌকা চড়াবে, ঘুরিয়ে দেখাবে, রগড় করে মাতিয়ে রাখবে?

চিনু হাবু রান্নার ভার নেয়। কর্তাদের ভয়ে যদি ওঁরা সরে থাকেন, কে রাঁধবে? ভাত-মাংস আবার খিচুড়ি-ভাজা, দু'পক্ষেরই মন রাখা কি সম্ভব? খরচ যে বেড়ে যাবে খুব। দু'রকম আয়োজন। বিরাট ব্যাপার। যারা রান্নার ভার নেবে, তাদের ওপর বড্ড চাপ পড়বে। ফূর্তি, বেড়ানো এসব শিকেয় উঠবে তাদের।

আরও সমস্যা, যে কোনটাখাবে? খিচুড়ি খেলেই তাকে বিপক্ষ বলে গণ্য করবে চাঁদু। আর ভাত-মাংসেরভক্তদেরপ্রতি একই মনোভাব জাগবে রবির তরফে। এমনকী রাঁধুনিদেরও হবে একই হাল।

আরও সমস্যা। চাঁদুর বোন পুতুল এমনি বেড়াতে গিয়েসবাইকে নিয়ে নাচে-গানে অভিনয়ে জমিয়ে তোলে। দাদা প্যাঁচার মতনবসেথাকলেকি আর পুতুলের মুড্ আসবে?

ইন্দুবাবু ভেবে-ভেবে কুল পান না।জটখোলার উপায়ও দ্যাখেন না। মাঝে-মাঝে সখেদে ভাবেন, 'ভুল করলাম, পিকনিক বাতিল করাই উচিত ছিল।'

কিন্তু প্রস্তুতিপর্ব যে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। কেনাকাটিও প্রায় শেষ। বাস-ভাড়ার ব্যবস্থা পাকা। অ্যাডভান্সও দেওয়া হতে গেছে। তা ছাড়া নেহাত কচিকাঁচাগুলোকে কী জবাবদিহি করব? বড়দের মান-অভিমানের বহরটা বোঝে না শিশুরা। নদীর তীর, খোলা মাঠ, গাছে ওঠা, নৌকায় চড়ার হাতছানিতেনাচছে তারা। বাঃ, এখন আর পেছনো যায় না।

ভজা অবশ্য ভরসা দিয়ে চলেছে, "চিন্তা করবেন না জেঠু, আশা করছি সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।"

কিন্তু কী উপায়ে? ভিতরে ভিতরে ভজা কি দু'জনকে বোঝাতে চেষ্টা করছে? দুই ভাই-ই অ্যাদ্দিনে নিশ্চয় বুঝেছে, কাণ্ডটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। দু'জনের হাবভাবে সেই কঠোর ভাবটা শিথিল যেন নরম ঠেকছে। তথাপি ভয়ঙ্কর প্রেস্টিজের ব্যাপার। শেষ অবধি কেউই বুঝি মচকাবে না?

ইন্দুবাবু একবার ভাবলেন, রবি-চাঁদু দুটোকে ছুতো করে ডেকে এনে হাতে-হাত মিলিয়ে দিই যদি?

ভজা বারণ করল, "এক্ষুনি নয়। জানাজানি হলে লোকে হাসবে। সেই ভয়ে আপনার হুকুমে হাত মেলালেও হয়তো সত্যি-সত্যি সহজ হবেন না। পিকনিকে গিয়ে ব্যাজার হয়ে থাকবেন। ওটা সেষ অস্ত্র, তুলে রাখুন। আর কিছুতে কাজ না হলে তখনওই চেষ্টা। দেখা যাক, অন্যকোনও ভাবে যদি..."

অন্তুভজা এবং ইন্দুবাবু ছাড়া আলাদা পরিস্থিতিটা কেউই...ঠিক জানে না। তোড়জোড় হচ্ছে দেবে পিকনিক কমিটির অন্য মেম্বারদের ধারণা হল যে, চাঁদু রবির মধ্যে গোপনে একটা ফয়সালা করে দিয়েছেন ইন্দুবাবু। কেউ কেউ জিজ্ঞেসও করেছিলেন, "চাঁদু-রবি যাচ্ছে তো?"

"হুঁ", সংক্ষেপে জবাব সেরেছেন ইন্দুবাবু।

"সেই ঝামেলাটা মিটেছে?"

ইন্দুবাবু কথা না বলে শুধু রহস্যময়ভাবে একটু মুচকি হেসেছেন। ওতেই নিশ্চিন্ত হয়েছেন অন্যরা।

পিকনিকের দিন। সকাল সোয়া সাতটায় অন্তুদের বাড়ির সামনে থেকে রওনা হবার কথা। সাতটা নাগাদ বাস আসবে। ভাড়া করা মিনিবাস।

অন্তুদের দুই আত্মীয়দের নিজেদের মোটরগাড়ি আছে। তবে এতগুলি লোক, তা ছাড়া বাসনকোসন মশলা আনাজপাতি চেয়ার শতরঞ্চি ইত্যাদি এক হরেকরকম জিনিস দুটো অ্যামবাসাডরে আঁটবে না। তাই বাস ভাড়া করার ব্যবস্থা। যাত্রীদের পিকনিকের জায়গায় নামিয়ে দিয়ে বিদায় নেবে বাস। আবার ফিরিয়ে নিতে যাবে বিকেলে।

সকাল ছ'টা থেকেই অন্তুদের বাড়িতে ভিড় লেগে গেল। নানা দিক থেকে আত্মীয়বন্ধুরা এসে জোড় হচ্ছে। অন্তুর বাড়ির লোকেরা অর্ধেক রেডি। সামনের ফুটপাথে এবং গাড়ি বারান্দার তলায় বড়দের ঘোরাঘুরি, ছোটদের ছোটাছুটি কলরব। ভারী ভারী মাল সব একে-একে ধরাধরি করে নামানো হচ্ছে দোতলা থেকে একতলায়। বাড়ির ভিতর থেকে ভেসে আসছে উত্তেজিত কথাবার্তা, হইচই, অল্পবয়সী মেয়েদের খুশি-ভরা কণ্ঠে টুকরো গান। মা-মাসিদের তাগাদা। এই মেয়েরা চটপট। আর সাজগোজ নয়, ঢের হয়েছে।'

সাত-আট বছরের বাদশা বুবাই ফুটপাথে এক-টক্কর গেলে নিয়েই আট-দশ মিনিট অন্তর অন্তর দৌড়ে বাড়িতে ঢুকে চেঁচাচ্ছে, "ও ঝুমাদি, ও রুপাদি, ও বুলবুলিদি, তাড়াতাড়ি এসো।"

সাড়ে ছ'টার মধ্যে এসে পড়ল বজবজ থেকে রাসুমাসি আর সন্টু লেক থেকে মিন্টুপিসে, অলকাপিসিরা সদলবলে নিজেদের ছোটরে চেপে। বাসের সঙ্গে-সঙ্গে যাবে তাদের গাড়ি।

বাইরে প্রকাশ না করলেও ইন্দুবাবুর বুকের ভেতর কেবলই দুরুদুরু করছে আশঙ্কার। কে জানে আজ ব্যাপারটা সেইদিকে গড়াবে? এই যে এত আশা, আনন্দ, সমস্ত না মাটি হয় দুই গোঁয়ারের পাল্লায় পড়ে। নাঃ, ভজার কথায় রাজি হয়ে মস্ত ভুল করলাম। তিনি অতি বিচলিত দিকে একটু করে একলা দাঁড়িয়ে সামনে মাথার চুল খামচান আর চোখ পিটপিট করেন।

সাতটা বাজারে দলে হাজির হলেন রবিকাকা। তার মিনিটখানেক বাদে চাঁদুকাকা। উভয়েই সপরিবারে ট্যাক্সি থেকে নেমে দুই পরিবারের কিছু লোক ঢুকে গেল অন্তুদের বাড়িতে, কেউ কেউ রইল বাইরে।

রবিকাকা চাঁদুকাকা রাস্তায় পা দিয়েই একবার হাতঘড়ি দেখলেন। অতঃপর ফুটপাথে পরস্পরথেকে হাত-কুড়ি তফাতে উলটো মুখে খাড়া হলেন। দু'জনেই কপালেই ভ্রূকুটি।

ইন্দুবাবু গতিক দেখে প্রমাদ গুনলেন। বাবা রেষারেষির ঘটনাটা জানত তারা রকম দেখে অবাক হল। তবে কি দু'জনের মিটমাট হয়নি? এমনি চালিয়ে যাবে, নাকি পিকনিকে গিয়েও— আচ্ছা বেআক্কেলে বটে।

বড়দের গুজগুজ ফুসফুস বুবাইয়ের কানে গিয়েছিল। সে দুই কাকাকে দেখিয়ে বাদশাকে বলল, "কাকাদের আড়ি হয়েছে।"

বাদশা বড়-বড় চোখে দুই কাকাকে পর্যবেক্ষণ করে জিজ্ঞেস করল "কেন রে?"

"কে জানে? এই বাদশা আমি কিন্তু বাসে জানলার পাশে বসব, নইলে আড়ি।"

বাদশা বুবাই ফের বড়ির ভিতরে ছুটল তাড়া দিতে।

সোয়া সাতটা বাজল। এখনও বাস এল, না কেন?

সাড়ে সাতটা। তবুও বাসের দেখা নেই। সবার মুখে চিন্তার ছাপ। কী ব্যাপার? বাস খারাপ হল নাকি?

ভজা ছুটল টেলিফোনে খবর নিতে। চেনা লোকের বাস। এই বাসেই তারা পিকনিকে যাচ্ছে গত দু'বছর। ভজা ফিরে এসে বলল, "বাস-মালিকের বাড়ির ফোন খারাপ। রিং হচ্ছে না।"

পৌনে আটটা। এবার সবাই সত্যি ঘাবড়ে গেল। সবার মুখ শুকনো। বাদশা বুবাই কাঁদো-কাঁদো। আশেপাশে বাড়ির অনেক কৌতূহলী চোখ দেখছে ব্যাপার। বেশ কিছু পাড়ার লোক এসে জুটেছে। দেরির কারণটা কী হতে পারে তাই নিয়ে চলছে জল্পনা-কল্পনা। রবিকাকা চাঁদুকাকা সিগারেট টানতে টানতে এধার ওধার পায়চারি করছেন অস্থির পারে। ঘড়ি দেখছেন আর বিড়বিড় করছেন। এই বিরক্তির খোঁজে তাঁদের দুরস্থান ও খানিক সে খেয়াল নেই।

বাস সাতটার মধ্যে আসবে এবং হয়েছিল ঠিক?" খোঁজ নিলেন রবিকাকা।

"হ্যাঁ, আমি নিজের মুখে বলে এসেছি," জানায় অন্তু।

অলকাপিসি বলল, "বাস আর বোধহয় আর আসবে না। কী করবে? আমাদের দুটো বাড়িতে মেয়েদের আর বাচ্চাদের নিয়ে রওনা হই। ছেলের জিনিসপত্র নিয়ে ট্যাক্সিতে হাওড়া যাক। তারপর ট্রেনে ব্যাণ্ডেল। এ ছাড়া উপায় কী?

ভজা বলল, "অন্তু তুই একবার খোঁজ নিয়ে আয় বাসওলার বাড়ি থেকে। বেশি দূরে তো নয়। তুই-ই ফাইনাল কথা বলেছিলি।"

"তুইও চ' না সঙ্গে।" অঙ্কু অনুরোধ জানায়।

"আমি, নানা। আমি বরং ইতিমধ্যে দুই মোটরে অ্যাডভান্স পার্টির সঙ্গে কী পাঠানো উচিত, তাই গুছিয়ে ফেলি। দেখছিস, তো দেরি হয়ে গেছে। বা চটপট। ভয় নেই, তুই ফিরে না আয় পর্যন্ত আমরা স্টার্ট করব না।"

"যাও অন্তু, কুইক্।" কয়েকজন সিনিয়র ভাড়া দিলেন।

অগত্যা অন্তু ছুটল এই অঘটনের রহস্য উদ্ধার করতে কালীঘাটে বাস-মালিকের বাসায়।

অন্তু অদৃশ্য হবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঝকঝকে এক মিনিবাস এসে থামল অন্তুদের বাড়ির সামনে। বাস এসে গেছে। এসে গেছে।" হইচই করে ওঠে পিকনিক-পার্টি।

"এত দেরি হল কেন?" জানতে চায় উত্তেজিত যাত্রিদল।

বছর তিরেশেকের স্মার্ট ড্রাইভার যুবকটি মুখ বাড়িয়ে নিরুদ্বিগ্ন স্বরে জবাব দিল, "দেরি। দেরি কেন হবে? আটটায় অ্যারাইভাল টাইম। এখনও বারো মিনিট বাকি।"

"আটটা নয়, সাতটায় আসবার কথা", প্রতিবাদ জানায় যাত্রীরা।

"নো স্যার, আটটা। মালিক তাই বলে দিয়েছে। রীতিমত নোট করে নিয়েছিলাম টাইমটা। কত পিকনিক পার্টির ভাড়া খাটি। আমার টাইম ফেল হয় না। নেভার।" ড্রাইভার তেতে ওঠে।

"ব্যস ঠিক করতে কে গিয়েছিল?" অনেকে খোঁজ নেয়।

"অন্তু" রবিকাকা জানালেন।

"তা হলে এমন হল কেন?" যাত্রীরা থই পায় না।

"মোস্ট ইয়েসপনসিবল", রবিকাকা গর্জন ছাড়েন, "নির্ঘাত সাতটা বলতে আটটা বলে এসেছে। পিকনিকের ডেটটা যে ভুল বলে আসেনি, এই ভাগ্যি।"

"হোপলেস। কলেজে উঠেছে, এখনও এইটুকু দায়িত্বজ্ঞান হল না। এত বছর হয়ে আমরা ম্যানেজ করছি, এমন কাণ্ড কখনও হয়নি।" চাঁদুকাকার মন্তব্য।

"কারেক্ট। গতবার তো আমি এই বাস ঠিক করে এসেছিলুম। পাংচুয়ালি পৌনে সাতটায় হাজির হয়েছে," বললেন রবিকাকা।

"তার আগেরবার আমি গেছলাম। এই একই বাস,এই মালিক, সেম ড্রাইভার। সাতটার পাঁচ মিনিট আগেই এসেছিল। নো নো, বাস কোম্পানির ভুল নয়। এ অন্তুর ফল্ট। যেদিকে নজর দেব না সেটাই গুবলেট করে বসবে। চাঁদুকাকা ফায়ার।

.... দাঁড়িয়ে। দু'জনেরই আঙুলে ধরা টাটকা একটা সিগারেট। দু'জনে সরবে মুণ্ডপাত করতে লাগলেন অন্তুর।

ইন্দুবাবু ভজাকে কাছে ডেকে বললেন, 'তুমিও তো সেদিন সঙ্গে গেছলে বাস ঠিক করতে?'

ভজা বলল, "আমি জেঠু, কথা বলিনি। একটু দুরে ছিলুম। অন্তুই বাস মালিকের সঙ্গে কথা বলল, অ্যাডভান্স দিল, পিকনিকের দিন, বাসের টাইম জানাল। কি জানি কেন যে ভুল হল।'

বাসে মাল তোলা হচ্ছে। ছোটরা বাসে সিট দখল নিতে ঝগড়া শুরু করেছে। রবিকাকা চাঁদুকাকাও কাজে হাত লাগালেন। সঙ্গে-সঙ্গে তাদের হাঁকডাকে আসর সরগরম। দুজনেই এখন পুরনো ফর্মে।

বাসে সমস্ত জিনিসপত্র এবং প্রায় সব যাত্রীরা উঠে পড়েছে।

"এবার রওনা দাও" অনেকে তাড়া লাগায়।

"অন্তু ফিরুক", জানালের ইন্দুবাবু।

"আঃ ওর এত দেরি হচ্ছে কেন?"

অন্তুর দেরি হয়নি মোটেই। মাত্র পঁচিশ মিনিট কেটেছে। কিন্তু অধৈর্য যাত্রীদের আর সবুর সয় না।

"বোধহয় ও বাস মালিককে বাড়িতে পায়নি। অতএব হাঁ করে বসে আছে অপেক্ষায়।" রবিকাকার তিক্ত মন্তব্য।

"ভেরি ভেরি পসিবল্। ব্যাটার ঘটে যা বুদ্ধি", চাঁদুকাকার সায়।

ভজা দুই কাকার সামনে ইতস্তত করে বলল, "জেঠু জানতে চাইছেন দুপুরের মেনু কী হবে?"

"সে যা হয় করো তোমরা," রবিকাকা উদারভাবে রায় দিলেন।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাদের কাকিমারা রয়েছে। রাসুমাসি অলকাপিসি আছে। ওদের সঙ্গে কথা বলো। আমাদের আরএ নিয়ে খামোখা ব্যস্ত কোরো না," নিতান্ত বিরক্তিভরে জানালেন চাঁদুকাকা, "আমাদের এখন অন্য প্রোক্সামগুলো ঠিক করতে দাও। হুঁ, রবি যা বলছিলুম ব্যাণ্ডেলে পৌঁছেই কিন্তু নৌকো বুক করে ফেলতে হবে। আচ্ছা, আগে চার্চ দেখে পরে নদীতে বেড়ানো? না নৌকোয় বেরিয়ে পরে চার্চ দেখবি?

ভজা একটু বাদে এসে ফের দুই কাকার কাছে দাঁড়ায়।

"কী চাই?" রবিকাকার প্রশ্ন।

ভজা কাঁচুমাচুভাবে বলল, "আজ্ঞে, ভুল করে মাংস কিনে ফেলা হয়েছে। আপনার জন্যে যদি আলাদা করেখিচুড়ি ডিম-ভাজা করা হয়?"

"আবার খিচুড়ির ঝঞ্ঝাট কেন?" রবিকাকা ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, "তোমাদের কাকিমারা কি সারাদিন খুন্তি নাড়বে? তা হলে বেড়াতে যাওয়া কী জন্যে? ওই ভাত-মাংসেই চালিয়ে দেব আমি।" গোলগোল ফর্সা ভজা, দেখায় কিঞ্চিৎ বোকা বোকা। ধমক খেয়ে ভারী অপ্রস্তুতভাবে সে পেছনে ফিরল। তারপর ইন্দুবাবুর কাছে গিয়ে চাপা উৎফুল্ল সুরে জানাল, "জেঠু প্রবলেম সলভড। দু'জনেই ভাত-মাংস খাচ্ছি।

দেখা গেল অন্তু আসছে হন্তদন্ত হয়ে।

ভজু দ্রুত পায়ে এগিয়ে অন্তুর কাছে গিয়ে বলল, "ব্যস এসে গেছে রে।"

অন্তু বাঘটাকে এক নজর দেখে নিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জানাল, "বুঝলি, বাস মালিক বাড়ি নেই। ওর এক কর্মচারী বলল যে, সাতটা নয় আটটায় নাকি টাইম ছিল। সেইমতো বাস গেছে একটু আগে।"

ভজা বলল, "ড্রাইভারও তাই বলছে, আটটা।"

"বাজে কথা", অন্তু ফুঁসে ওঠে।

"যাকগে, এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বাসওলা ভুল শুনেছে। শোন্ একটা সুখবর আছে। তুই কাকার ভাব হয়ে গেছে।"

"অ্যাঁ। কী করে?"

"পরে বলব", চাপা কণ্ঠে জানাল ভজা।

অন্তু বাসের কাছে পৌঁছতেই বেচারির ওপর দিয়ে একচোট ঝড় বয়ে গেল। নিরুপায় অন্তু মুখ বুজে সব সহ্যকরল।

চলেছে বাস। পিছনে এককোণে বিমর্ষ বসে অন্তু। পাশে ভজা। ভজা জিজ্ঞেস করল অন্তুকে, "কী ভাবছিস?"

"বাসওলাটার ওপর মা রাগ হচ্ছে কী বলব।"

ভজা ফিসফিসিয়ে বলল, "ওর দোষ নেই ভাই। দোষটা আমার। মাপ কর।"

"মানে।"

"মানে, আমিও ওকে পরে টেলিফোনে তোর নাম করে বলেছিলুম সাতটার বদলে আটটায় বাস পাঠাতে।

"কেন?" অন্তু থ।

"একটা প্যাঁচ ট্রাই করলাম। তোর ওপর ঝালঝাড়ার উপলক্ষে দুই কাকায় যদি ভাব হয়ে যায়? গুড্ লাক্ প্ল্যানটা লেগে গেল।"

তালা খোলার রহস্য

সকাল সাড়ে-সাতটায় অন্তু মদন স্যারের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দেখে ও বাড়ির গেটের সামনে ছোটখাটো ভিড়। সপ্তাহে চারদিন অন্তু তাদের স্কুলের শিক্ষক মদন মিত্রের কাছে এই সময়ে আসে ইংরেজি পড়তে।

কী ব্যাপার? অন্তুর বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। কোনও দুর্ঘটনা ঘটল নাকি স্যারের বাড়িতে। অন্তু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গেটের সামনে হাজির হয়।

প্রথমেই যেটা অন্তুর অদ্ভুত লাগে সেটা হল যে মদন স্যারের বাড়ির গেটটা তখনও তালাবন্ধ। রাতে এ বাড়ির লোহার গেটে একটা মোটা লোহার চেন জড়ানো থাকে গেটের গ্রিলে। সেই চেনের দুপ্রান্ত আটকানো থাকে তালা লাগিয়ে। গেট চেন তালা রাতে ঠিক যেমনটি থাকে তেমনই রয়েছে। গেটের দু ধারে লোক, ভিতরে ও বাইরে।

গেটের বাইরে মদনবাবুর পাড়ার কিছুলোক এবং আরও কিছু অচেনা মুখ। গেটের ভিতর দিকে অর্থাৎ বাড়ির কম্পাউন্ডের মধ্যে গেটের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং মদন স্যার। মদন স্যারের ফার্স্ট-ইয়ার কলেজে পড়া ছেলে গাবলু আর খানিক তফাতে বাড়িতে ঢোকার কাঁকর বিছানো পথে দাঁড়িয়ে স্যারের স্ত্রী। তিনজনেরই আলুথালু বেশ। মদন স্যারের পরনে স্রেফ লুঙ্গি গেঞ্জি। গাবলুদা হাফপ্যান্ট গেঞ্জি পরে। স্যারের মেয়ে ক্লাস সেভেনের টুসকিকেও দেখা গেল।

বাড়ির বারান্দায় বেদিতে গালে হাত দিয়ে বসে, গেটের দিকে তাকিয়ে আছে।

মদন মিত্রের বাড়িটা ছোট পাকা একতলা। বাড়ি ঘিরে পাঁচ-সাত কাঠার সীমানাটা ইটের পাঁচিল আর তার উপর কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। গেটটা বেশ উঁচু।

গেটের বাইরে ও ভিতরে দুই পক্ষই বেশ উত্তেজিত। তা তাদের চোখ মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। টুকরো টুকরো কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে উত্তেজিত কণ্ঠে।

এক নজর বুলিয়েই অন্তুর মনে হয় যে মদন স্যারের মুখে কেমন অসহায় ভাব। গাবলুদার মুখ বেশ রাগী রাগী। বউদি অর্থাৎ মদন স্যারের স্ত্রীর মুখও হাঁড়িপানা, যেন চাপা রাগ ফুটে বেরুচ্ছে। আর টুসকির ভঙ্গিটা নির্বিকার।

অন্তু গোঁত্তা মেরে ভিড়ের ভিতর ঢুকে পড়ে। দেখে পিন্টু আর বুবাইও হাজির। তাদের

হাতেও অন্তুর মতো বইখাতা। অর্থাৎ তারই মতো পড়তে এসেছে। অন্তুকে দেখে পিন্টু বুবাই মিচকে হাসল।

অন্তু পিন্টুর হাত ধরে ভিড়ের বাইরে আনে। জিজ্ঞেস করে, "কী ব্যাপার রে? গেট বন্ধ কেন? কী হয়েছে স্যারের?"

পিন্টু দাঁত বার করে এক গাল হেসে বলল, 'কেস জন্ডিস। স্যাররা গোটা ফ্যামিলি আটকে গেছে। বেরুতে পারছে না।'

'কেন?'

'গেটের চাবি হারিয়ে গেছে। স্যার হারিয়ে ফেলেছেন। কাল রাতে গেট বন্ধ করে কোথায় যে রেখেছেন মনে নেই। কিংবা হয়তো পড়ে গিয়েছে। লুঙ্গির ট্যাঁকে গুঁজে রেখেছিলেন। ওঃ হেভি ঝাড় খাচ্ছে স্যার বউদির কাছে। গাবলুদাও ফায়ার। খুব খিটিমিটি চলছে। আমি তো অনেকক্ষণ ধরে দেখছি।'

'বাড়িতে খুঁজেছে ভাল করে?' জানতে চায় অন্তু।

'অনেকবার খুঁজেছে। ভোরে স্যার গেট খুলতে গিয়েই চাবি পাননি। তারপর কয়েকবার খুঁজেছে বাড়িময়, গোটা ফ্যামিলি। আমি আসার পর ফের একবার খুঁজে এল। পাচ্ছে না। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়েছে।'

'ডুপ্লিকেট চাবি নেই?' জিজ্ঞেস করে অন্তু।

'না। সেটাও হারিয়েছে আগে। সেটা হারিয়েছে বউদি। তাই নিয়ে কেবল লেগে যাচ্ছে স্যার আর বউদিতে।'

'তা চাবিওলা ডাকলেই হয়। ওরা তালা খুলে দেবে।'

'কোথায় চাবিওলা? এই বোলপুরে একজনই আছে। হাটতলার কাছে থাকে। খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিল। চাবিওলা গরজু শ্বশুর বাড়ি গিয়েছে কাল। ফিরবে আজ সন্ধ্যায়। আর চাবিওলা যারা আসে সব বোলপুর শহরের বাইরে থেকে। তারা কখন আসে কোন দিকে যায় ঠিক নেই। ধরা মুশকিল। হাটের দিন দু'একজন বসে হাটের সামনে। আজ তো হাটবারও নয়।'

'তাহলে সন্ধে অবধি গেট খুলবে না?' অন্তু উদ্বিগ্ন। আবার একটু খুশি হয়ে বলে, 'আজ টিউশন?'

পিন্টু মিচকে হেসে বলে, 'আমরা গেট টপকে যেতে পারি। কিন্তু স্যারের কি আর মুড হবে? দেখি জিজ্ঞেস করে?' পিন্টু অন্তু ফের গেট ঘেঁষে দাঁড়ায়।

প্রতিবেশীরা নানা উপদেশ বর্ষণ করেই চলেছে মদনবাবুকে।

'বাড়িতে আর চাবি নেই ওরকম তালার?'

'আছে।' হতাশ কণ্ঠে উত্তর দেন মদনবাবু, 'দেখলাম তো সব ট্রাই করে। খুলছে কই? আপনাদের অমনি চাবি যদি থাকে? নিয়ে আসেন যদি?'

'আনছি।' ভিড় থেকে কয়েকজন হনহন করে বেরিয়ে গেল।

'স্যার আজকের পড়াটা? হেঁকে বলে পিন্টু।'

মদন স্যার জ্বলন্ত চোখে তিন ছাত্রকে দেখে নিয়ে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'যা পালা, আজ ছুটি।'

'গেট টপকে যাব স্যার?' পিন্টু নিরীহ কণ্ঠে জানায়।

'না।' ধমকে ওঠেন স্যার, 'ওঃ পড়ায় কী আগ্রহ! অন্যদিন তো আগে পালাবার জন্যে ছটফট করিস। আর হরদম কামাই। যা বাড়ি যা আজ।'

পিন্টু অন্তু বুবাই কিন্তু মোটেই বাড়ি যায় না। তারা একটু পেছিয়ে গিয়ে স্যারের নজর এড়িয়ে দেখতে থাকে।

গোছা গোছা চাবি এসে পড়ে আশপাশের বাড়ি থেকে। শুরু হয়ে যায় তালা খোলার কসরত। আধঘণ্টাটাক গলদঘর্ম হয়েও কিন্তু তালা খোলা যায় না।

এদিকে গেটের সামনে ভিড় বাড়ছে। পথ চলতি উটকো লোক অনেকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে মজা দেখতে।

যুধিষ্ঠিরও তেমনিভাবে জুটেছে। যাচ্ছিল সে সাইকেল চড়ে। নেমে পড়ে ভিড় দেখে। সে বোলপুর শহরের একটু বাইরে থাকে। এদিকে এসেছে একটা কাজে। সাইকেলটা তালা দিয়ে রেখে সে ভিড়ের মধ্যে উঁকি মারল ব্যাপার জানতে। ঘটনাটা বুঝতে পেরে সে দাঁড়িয়ে গেল। এমন ইন্টারেস্টিং কেস ছেড়ে কি যাওয়া যায়? কাজ থাক পরে হবে।

'এই যে বউদি ঢুকব কেমন করে?' মদনবাবুর বাড়ির কাজের মেয়ে মালতীর গলা শোনা যায় গেটের বাইরে থেকে।

মদনবাবুর স্ত্রী মালতীর গলা শুনেই তড়বড় করে গেটের কাছে গিয়ে অনুনয়ের সুরে বললেন, মালতীকে, 'চলে আয় না একটু কষ্ট করে।'

'মানে কী ভাবে?' মালতী ভুরু কুঁচকোয়।

'এই গেট পেরিয়ে।' মদনবাবুর স্ত্রী কিন্তু কিন্তু হয়ে বলে ফেলেন।

'টপকে? পারবনি।' চারপাশ দেখে নিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে আপত্তি জানায় মালতী।

'তাহলে একটু অপেক্ষা কর মা বাইরে। গেট এখুনি খোলা হবে। উপায় ঠিক বেরুবে একটা।'

'আমার মাথা ধরেছে। চা খেয়ে আসি।'

শুনেই হাঁ হাঁ করে ওঠেন মদনবাবুর স্ত্রী। একবার গেলে আর ও আসছে? তখন সব বাসন তাঁকে নিজে মাজতে হবে। তিনি কাতরকণ্ঠে বলেন, 'চা আমি করে আনছি দাঁড়া।'

'খালি পেটে আছি।'

ইঙ্গিতটা ধরতে অসুবিধা হয় না। বউদি বলেন, 'ঠিক আছে মুড়ি আনছি।'

একটু বাদে চায়ের কাপ আর মুড়ির বাটি গেটের শিকের ফাঁক দিয়ে মালতীর হাতে দেন মদনবাবুর স্ত্রী। মালতী একটু দূরে ফাঁকায় গাছতলায় টিফিন করতে বসে।

ঘ্যাচ। একটা জিপ থামে। বোলপুর থানার বড় দারোগা গাড়ি থেকে নামেন। প্রশ্ন করেন, 'কি ব্যাপার? এখানে ভিড় কীসের?'

'আজ্ঞে গেটটা খেলা যাচ্ছে না।' অনেকগুলি কণ্ঠ জবাব দেয়।

'কেন?'

'চাবি হারিয়েছে?'

'ও!'

দারোগাবাবু এগিয়ে আসেন গেটের কাছে। ভিড় ফাঁক হয়ে পথ করে দেয়। যুধিষ্ঠির একটু আড়ালে সরে যায়।

দারোগাবাবু গেটের তালাটা টেনেটুনে দেখেন। বাড়ির ভিতরে ও বাইরে জন সমাবেশের প্রতি ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তারপর নিরাশভাবে ঘাড় নাড়েন।

'দারোগাবাবু তালাটা খুলবার ব্যবস্থা করে দেন যদি প্লিজ।' মদনবাবু কাতস্বরে বললেন।

'সরি ওটা পুলিশের ডিউটি নয়।' গম্ভীরভাবে জানান দারোগা, 'বেআইনিভাবে তালা খুললে তাকে অ্যারেস্ট করতে পারে পুলিশ কিংবা তালা বন্ধ ঘরে লাশ-ফাশ কিছু থাকে যদি—তখন খোলার ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু এটা তো স্রেফ প্রাইভেট প্রবলেম। নিজেরা করুন।' দারোগাসাহেব গটমট করে গিয়ে ফের জিপে ওঠেন। জিপ চলে যায়। আবার ভিড়টা হামলে পড়ে গেটে। যুধিষ্ঠিরও এগিয়ে আসে।

'বাবা আমি কলেজ যাব কী করে?' গাবলু রাগী গলায় প্রশ্ন করে।

'যা না, কে আটকাচ্ছে? গেট টপকে চলে যা!' তিক্তকণ্ঠে জানান মদনবাবু।

'আমি না হয় টপকালাম, আমার সাইকেল টপকাবে কী করে?'

'তাহলে সাইকেল ছাড়াই যা।'

'চার মাইল পথ হেঁটে?'

'তাহলে যাসনি। একদিন না গেলে যেন ফেল মারবি? যত্তসব।'

'জান কলেজ সোসালের আজ ফাইনাল রিহার্সাল। আমার আবৃত্তি আছে। আমি কচ। দেবযানী এসে ওয়েট করবে। ডুয়েট। আমি না গেলে যে—'

'তবে অন্যের সাইকেলে জোগাড় করে যা। সব কেবল নিজের ধান্দা। আজ স্কুলে আমার জরুরি টিচার্স মিটিং। কী যে করি?'

'তুমি নিজেই তো হারিয়েছ চাবি।' গাবলু সটান বলে দেয়।

'আর ডুপ্লিকেটটা যে তোর মা। সেটা থাকলেও'—ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন মদনবাবু।

'দেখ আমি অনেক দিন তোমায় বলেছি, আর একটা ডুপ্লিকেট বানিয়ে নাও। গা করনি। এখন'—স্ত্রীর কড়াগলা শুনে মদনবাবু আর এ নিয়ে কথা না বাড়িয়ে গেটের বাইরে চেনা-শোনাদের কাছে আবেদন জানাল, 'কী করি বলুন তো?'

'দমকলে খবর দিন না!' একজন পরামর্শ দেয়, 'ওরা শুনেছি এমনি আটকে পড়া কেস উদ্ধার করে।'

ব্যাগড়া ওঠে, 'আরে দূর মশাই, সে সব হয় কলকাতায়। এমনি মফঃস্বল ছোট শহরে হয় না। এখানে বড়জোর আগুন লাগলে আসতে পারে। এ সব কেসে হেল্পই করবে না। তা দিতে পারেন খবর। তবে ওদের আশায় বসে থাকলে কখন বেরুতে পারবেন ঠিক নেই, বলে রাখছি।'

দেখা গেল যে এক্ষেত্রে দমকলের সাহায্য সম্বন্ধে বেশির ভাগেরই ওই মত। ফলে অন্য উপায় ভাবতে হয়।

'নিন বউদি। চা মুড়ির কাপ বাটি গেটের ফাঁক দিয়ে ফিরিয়ে দেয় মালতী। সুখের কথা, বাসনটা সে মেজে দিয়েছে, রাস্তার কলের জলে। মালতী বলে, 'আমি কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবনি এই রোদ্দুরে। বসছি ওই গাছতলায়।'

বউদি নিরুপায় ভাবে মালতীর দিকে তাকান আর চোখ পাকিয়ে দেখেন একবার স্বামীকে।

'নাঃ পেলাম না।' সাইকেল থেকে নেমে হাঁপাতে হাঁপাতে ওই পাড়ার ছেলে বিষ্টু এসে রিপোর্ট করে।

'কী পেলে না?' অনেকের প্রশ্ন।

'তালা-চাবির মিস্ত্রি,' জানায় বিষ্টু, 'হাটতলা, নিচুপট্টি রেল কলোনি—অনেক ঘুরলাম। চোখে পড়ল না।'

'ব্যাড লাক।' প্রচুর সহানুভূতি জোটে মদনবাবুর বরাতে কিন্তু কাজের কাজ কিছু এগোয় না।

'স্যার চাবি ছাড়া তালাটা খোলা যায় না? এই পেরেক-টেরেক বা সরু লোহা দিয়ে। চাবির গর্তে খুঁচিয়ে। যেমন সিনেমায় দেখি, বইতে পড়ি।'

'সে তো শুধু চোরেরা পারে।' গরম হয়ে বলেন স্যার। পিন্টুটা অতি পাকা।

'না না শুধু চোর নয় স্যার,' পিন্টু প্রতিবাদ জানায় 'ডিটেকটিভরাও পারে। আরও লোকে পারে। যেমন আমাদের ক্লাসের নিতাই। চেনা এক তালা-চাবি মিস্ত্রির কাছে শিখেছে। ও তালা খুলতে পারে।'

'অ্যাঁ, তাকে নিয়ে আয় এক্ষুনি।' মদনবাবু যেন অকূলে কূল পান।

'সে তো বোলপুরে থাকে না স্যার। গুসকরায় থাকে। ট্রেনে চেপে স্কুলে আসে। টিফিনের আগে কি আর আসতে পারবে আজ?'

ওঃ টিফিন। সেই দুপুর একটায়। আবার চুপসে যান মদনবাবু।

ভটভট করে একটা মোটর সাইকেল এসে থামে। দু'জন যুবক নামে মোটর সাইকেল থেকে। ফুলপ্যান্ট-শার্ট পরা কেতাদুরস্ত দুই মূর্তি। তারা গটমট করে গেটের কাছে আসে। তাদের একজন ভারিক্কি চালে প্রশ্ন করে, 'এটা কি মিস্টার মদন মিত্রের বাড়ি?'

'হ্যাঁ আমি।' গেটের ওপাশ থেকে জবাব দেন মদনবাবু।

'আমরা টিভির দোকান থেকে আসছি। মেকানিক। আপনার টিভিটা নাকি গড়বড় করছে? খবর দিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' জানাল মদনবাবু।

'বেশ গেট খুলুন, দেখছি টিভিটা।'

'গেটের তালাটা যে ভাই খুলতে পারছি না। চাবি হারিয়ে গিয়েছে।' অসহায়ভাবে জানালেন মদনবাবু।

'তাহলে ঢুকব কী করে?'

'মানে যদি গেট টপকে আসেন?'

'ইমপসিবল। গেট খুললে খবর দেবেন।' যুবকদ্বয় পিছু ফেরে।

'অ্যাঁ টিভি ঠিক হবে না? আজ বিকেলে শিল্ড ফাইনাল দেখাবে। ফুটবল।' গাবলু ককিয়ে ওঠে।

'আর সন্ধ্যায় আমার যে সিরিয়ালটা দেখা হবে না। মাতৃভূমি। ওটা না দেখলে আমার যে ঘুম হয় না বাবা।'

'তা কী করব? অন্য বাড়ি গিয়ে দেখুন।' এক মেকানিকের জবাব।

'আমি বাবা গেট টপকাব কি করে?' করুণ কণ্ঠে বলেন বউদি।

'গেট খুললে আজ দুপুর বারোটার মধ্যে খবর দেবেন দোকানে।'

বিকেলের আগে ঠিক করে দিয়ে যাব। শুধু ফিউজ গেলে হয়ে যাবে।' আর কথা না বাড়িয়ে দুই মেকানিক মোটর সাইকেলে উঠে স্টার্ট দেয়। হুস করে উধাও হয়।

সব শিয়ালের এক রা! মনে মনে হেসে ভাবে যুধিষ্ঠির। তার গিন্নিরও ওই মাতৃভূমি না দেখলে ভাত হজম হয় না। এক রোগ।

'যা হয় একটা ব্যবস্থা কর।' মদনবাবুর প্রতি ঝাঁজিয়ে ওঠেন তাঁর স্ত্রী।

'ও মা আমারও কি স্কুলে যাওয়া হবে না? আমি গেট টপকাব। যাহোক কিছু খেতে দিও। বেরিয়ে যাব। দাদা তো রেডি হয়ে গেছে বেরুতে।' এবার ধুয়ো তোলে টুসকি।

তা সত্যি। গাবলু ইতিমধ্যে শার্ট ফুলপ্যান্ট জুতো পরে নিয়েছে। সে হয়তো এক্কেবারে কলেজ রিহার্সাল টিভিতে খেলা দেখা সেরে বাড়ি ফিরবে। গাবলু ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখছে। খালি পেটে যাবে, না মা কিছু খাবারের ব্যবস্থা করবে? এইটুকু বুঝে নিতে হয়তো যা অপেক্ষা।

'একটা পেরেক নিয়ে আসুন তো। লম্বা পেরেক। দেখি চেষ্টা করে।' এক উৎসাহী দর্শক সাহায্যে এগিয়ে আসে।

গাবলু চট করে অমনি একটা বড় পেরেক নিয়ে আসে ঘর থেকে।

পেরেকটা তালার ফুটোয় ঢুকিয়ে কারিকুরি চলে। পিন্টুও হাত লাগায়। নিতাইকে যেমন দেখেছে একবার তালা খুলতে তেমনি কায়দায় পেরেকটা খোঁচায় তালার গর্তে। আরও কয়েকজন লেগে পড়ে ওই কায়দায় তালা খোলার চেষ্টায়। মিনিট কুড়ি-পঁচিশ পর সবাই ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়।—নাঃ হচ্ছে না।

'তালাটা ভেঙেই ফেলুন।' এক দর্শক উপদেশ দেয়। —'হাতুড়ি আছে? আর একটা লোহার রড? তাহলে ট্রাই করে দেখি।'

'আছে।' গাবলু দৌড়ল বাড়ির ভিতর।

'এমন ভাল তালাটা ভাঙবেন?' মিনমিন করেন মদনবাবু।

'হ্যাঁ ভাঙবে। কতক্ষণ বন্দি হয়ে থাকব?' স্ত্রীর সরোষ ঝঙ্কারে মদনবাবু সিঁটিয়ে গিয়ে আর বাধা দেন না।

এক দর্শক জিজ্ঞেস করে, 'লোহা কাটার ছেনি আছে? তালা না ভাঙতে পারলে, চেনটা কাটব।'

'ছিল তো, খুঁজতে হবে।' গাবলু জানায়। সে ততক্ষণে হাতুড়ি ও রড নিয়ে ফিরেছে।

তালার আঙটায় রডটা ঢুকিয়ে তালাটা গেটের গায়ে চেপে ধরে হাতুড়ির এক জোর ঘা পড়ল—ঠং। তালাটা ফস্কে গেটের গায়েই আঘাতটা পড়ল বেশি।

মদনবাবু শিউরে উঠে বললেন, 'ইস গেটটা যাবে। সাবধান।'

তালা ভাঙিয়ে অবশ্য মদনবাবুর কথায় কোনও ভ্রুক্ষেপ করল বলে মালুম হল না। সে ফের তালাটা চেপে ধরে হাতুড়ি বাগিয়ে তৈরি হল।

এতক্ষণ যুধিষ্ঠির চুপচাপ নজর করছিল ব্যাপার-স্যাপার। নিজের মনে বিড়বিড় করছিল

কখনও কখনও। হাসছিল মুচকি মুচকি। কিন্তু ঠং আওয়াজটা যেন তার বুকের মধ্যেই হাতুড়ির ঘা দিল। ব্যথায় মুচড়ে উঠল বুকটা।

ইস অমন খাসা মজবুত তালাটার বারোটা বাজাবে? খুলতে তো পারবে ছাই, মাঝ থেকে দেবে তালাটা জখম করে। বেআক্কেলে আনাড়ি লোকের কাণ্ড। সে আর থাকতে পারে না। ভিড় ঠেলে গিয়ে হাতুড়িধারী যুবককে একটু কড়া সুরে বলে, 'দাঁড়ান, আমি একবার ট্রাই করে দেখি।'

যুধিষ্ঠিরের হাবেভাবে এমন একটা মুরুব্বিয়ানা ছিল যে তালা ভাঙায় উদ্যোগী যুবকটি থতমত খেয়ে সরে গেল।

যুধিষ্ঠির তালাটা হাতে নিয়ে একটুক্ষণ লক্ষ করল নিবিষ্টচিত্তে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'সেই পেরেকটা কোথায়? যেটা দিয়ে খোঁচাচ্ছিলেন?'

পিন্টুর কাছে সেই লম্বা পেরেকটা ছিল। এগিয়ে দেয়।

'দেখি হাতুড়িটা।' যুধিষ্ঠির মাটিতে একটা পাথরের উপর পেরেকটা রেখে হাতুড়ির কয়েক ঘা দিল। পেরেকের ডগাটা সামান্য বাঁকল। পেরেকটা আর একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়ে যুধিষ্ঠির সেটার বাঁকা দিকটা তালার ফুটোয় ঢুকিয়ে দেয়। আধবোজা চোখে পেরেকটা নাড়াচাড়া করে তালার গর্তে।

রুদ্ধশ্বাসে দেখছে দর্শকরা।

মিনিট দুই বাদে যুধিষ্ঠির ব্যাজার মুখে একবার মাথা নাড়ে। যেন যা চাইছে তা ঠিক হচ্ছে না। তারপর সে পেরেকসুদ্ধু ডান হাতের মুঠোটা একবার তার পাঞ্জাবির পাশপকেটে ঢোকায়। ফের হাত বের করে পকেট থেকে।

যুধিষ্ঠিরের মুঠোয় ধরা পেরেকটা কিন্তু তখন বদলে গেছে। সেই পেরেকটা নেই। তার বদলে মুঠোয় তখন পেরেকটার সাইজের সরু একটু টুকরো লোহা। যুধিষ্ঠির লোহার টুকরোটা এমনভাবে আড়াল করে রাখে হাতের তালুতে যে এই বদলটা আর কারও চোখে পড়ে না।

ফের যুধিষ্ঠির বাঁ হাতে তালাটা ধরে, ডান হাতের লোহার শিকের মতো টুকরোটা তালার গর্তে ঢুকিয়ে দেয়। পেটের কাছে রাখে তালাটা শরীর দিয়ে আড়াল করে। তালার ভিতর খোঁচাখুঁচি চলে। এবার মাত্র আধ মিনিটের মধ্যে ফস করে তালার আঙটাটা খুলে আসে গর্ত থেকে। চেন মুক্ত হয় তালাটা।

হাসি মুখে 'লেন' বলে ঝনাৎ করে চেন ও তালা মাটিতে ফেলে দেয় যুধিষ্ঠির। মুহূর্তে তার হাতের যন্ত্রটি নিজের পকেটে ফেরত যায়। নেহাতই সাদামাটা দেখতে, আধময়লা ধুতি পাঞ্জাবি পরা এই প্রৌঢ় মানুষটি যে ভেলকি দেখাল! দর্শকরা থ। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই মহা শোরগোল লেগে যায়।

হাট হয়ে খুলে যায় গেট। বাইরের লোক ভিতরে ঢোকার আর ভিতরের লোক বাইরে বেরুবার উৎসাহে এক চোট ধাক্কাধাক্কি হয়। মদনবাবু লোকেদের পায়ের ফাঁক হাতড়ে তুলে নিলেন তালা ও চেন। তারপর—'ওঃ আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ' বলেই দেখলেন, যার উদ্দেশে কথাগুলি তিনি সেখানে নেই।

যুধিষ্ঠির ততক্ষণে সুড়ুৎ করে ভিড় থেকে গলে বেরিয়ে নিজের সাইকেলের চাবি খুলছে। হন্তদন্ত মদনবাবুকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখে যুধিষ্ঠির টপ করে সাইকেলে চেপে প্যাডেল মারল। আর যেতে যেতে হাত নেড়ে বলে গেল—'চলি দেখা হবে পরে। কাজ আছে।'

মদনবাবুর বাসায় যখন আনন্দ উত্তেজনা আর অচেনা সেই পরিত্রাতার কেরামতি নিয়ে সরব সবিস্ময় আলোচনা চলছে—পিন্টু বোঝাচ্ছে অন্তুকে, 'ঠিক এমনি কায়দায় তালা খোলে নিতাই, দেখেচি আমি'—যুধিষ্ঠির তখন জোরে সাইকেল ছুটিয়ে চলেছে। গলায় গুনগুনিয়ে গান। ভাবছে মনে—এ অঞ্চলে তালা আর সিন্দুক খোলে যে সব চোর, তারা কি মিছিমিছি তাকে ওস্তাদ বলে মানে? এত অল্প সময়ে ওই তালা এখানে আর কেউ খুলুক দেখি? সাধে কি গরজুও তাকে দেখে সেলাম ঠোকে। এলেমটা সৎ কাজে লাগিয়ে যুধিষ্ঠির খুশিতে ভরপুর।

[১৯৯৮, মেঘমল্লার]

ভালুর সন্দেশ ভোজ

বাপি অনাথের বাড়ি যাবে একটা কাজে—গেট অবধি গেছে বাইরে বেরুতে-বাপিদের কুকুর ভালু শুয়েছিল বাড়ির রোয়াকে—সে তড়াক করে উঠে ছুটে হাজির হল বাপির কাছে।

বাপি ধমকে উঠল, 'অ্যাই ফের সঙ্গ ধরছিস। না।'

বাপির ছোটবোন চুমকি ইতিহাস মুখস্থ করতে করতে মুখ তুলে বলল, 'আহা ওর কী দোষ? কত আশা করে আছে ফের যদি ভোজ জোটে সন্দেশ, তোর সঙ্গে গেলে।'

বাপি রেগে বলল, 'ফের সন্দেশ ভোজ? উঃ সেদিন যা জ্বালিয়েছ। শয়তান।' বলতে বলতে সে ভালুকে চেন দিয়ে বেঁধে রেখে গেট খুলে বেরিয়ে যায়।

ভালু উঁ-উঁ রবে একবার কাতর স্বরে ডাক ছেড়ে খানিকক্ষণ জুলজুল করে বাপির গমন পথের দিকে তাকিয়ে থেকে হতাশ হয়ে শুয়ে পড়ে।

ভালুর এই সন্দেশ ভোজের বিচিত্র কাহিনিটি জানতে হলে বছর খানেক পিছিয়ে যেতে হবে।

সেদিনটা ছিল রবিবার, ছুটির দিন। সকাল প্রায় আটটা বাজে। বাইরের ঘরে পড়াশুনা করছিল বাপি আর তার ছোট বোন চুমকি।

'দাদা আছেন নাকি?' ডাক শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে গেট খুলে বাপিদের বাড়ির ভিতরে ঢুকলেন গোবিন্দ সাহা তার পিছু পিছু আরও একজন লোক। গোবিন্দ সাহা বাপিদের পাড়াতেই থাকেন, অপর প্রান্তে। তাঁর বয়স সবে চল্লিশ পেরিয়েছে। শ্যামবর্ণ মোটাসোটা মানুষ। পরেছেন, ধবধবে ফর্সা পাটভাঙা আদ্দির পাঞ্জাবি আর কালো পেরে মিহি ধুতি।

গোবিন্দ সাহার গলা পেয়ে বাপি, চুমকির মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'উনি তো বাড়ি নেই, বেরিয়েছেন।'

গোবিন্দ সাহা জোড় হস্তে বিনীত সুরে বললেন, 'পেন্নাম হই বউদি। দাদা ফিরবেন কখন?'

'তা একটু দেরি হবে। অনেক কাজ নিয়ে গেছেন!'

'তাইতো?' গোবিন্দ সাহা জোড় হাত রেখেই বলেন, বলতে এসেছিলাম যে আমার গুরুদেব আসছেন আজ আমার বাড়িতে। সকাল দশটায়। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, দর্শন করতে যাবেন তখন। পাড়ার সবাইকে বলছি আমি।'

'আপনার গুরুদেব কে?' বাপির মা জানতে চান।

'আজ্ঞে মহাযোগী স্বামী শ্রী শ্রী মনোহরানন্দ। নাম শুনেছেন বোধহয়? এবার অনেক ধরাধরিতে আমার কুটিরে পা দিতে রাজি করিয়েছি। মাত্র কাল রাতে জেনেছি ওঁর প্রোগ্রাম। নইলে আগেই আসতেন বলতে। তা দাদা না যেতে পারলে আপনি যাবেন বউদি গুরুদেবের আগমনের সময়।'

বাপিদের মা কুণ্ঠিত ভাবে বললেন, 'আমার তো ভাই আজ সকালে বাড়ি ছেড়ে বেরুবার উপায় নেই। আজ কাজের লোক আসেনি। রান্না-বান্না ঘরের কাজ সব বাকি। পরে যাব আপনার গুরুদেবকে দর্শন করতে। উনি এলে বলবখন।'

খানিক নিরাশ হয়ে গোবিন্দ সাহা বললেন, 'তাই যাবেন বউদি।' তারপর তিনি বাপি চুমকির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেহাতই যেন নিয়মরক্ষার খাতিরে বললেন, তোমরাও যেতে পার। সবাই যাচ্ছে।'

সদ্য কলেজে ওঠা বাপি নিজেকে বেশ লায়েক মনে করে। সে গম্ভীর চালে জিজ্ঞেস করে, 'গুরুদেব কি গাড়িতে আসবেন?'

'হ্যাঁ।'

বাপি বলল, 'তবে আর দেখব কী করে? মোটর থেকে নেমেই তো উনি হুস্ করে ঢুকে যাবেন আপনার বাড়ির ভেতর।'

'না না দর্শন পাবে। পৌঁছে আগে উনি দর্শন দেবেন। প্রসাদ বিলানো হবে। তারপর গুরুদেব বিশ্রাম নিতে যাবেন ভেতরে। যাই বউদি। নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন গোবিন্দ সাহা এবং তার সঙ্গী।

গোবিন্দ সাহা একজন উঠতি বড়লোক। ওঁর লেখাপড়ার দৌড় বেশি নয়। নাকি ক্লাস নাইনের গণ্ডিও পেরুতে পারেননি। যাহোক বাবা মারা যাওয়ার পর গোবিন্দবাবু রোজগারের ধান্দায় পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া ছোট একটা মুদির দোকান চালাতে থাকেন। বেশ কয়েক বছর ওই দোকান নির্ভর করেই সংসার টানেন। মাত্র বছর সাতেক আগেই করেছেন জমির দালালি। আর তাই থেকেই লক্ষ্মী লাভ। এখন হু-হু করে অর্থ আসছে পকেটে।

বাপ ঠাকুর্দার ছোট্ট বাড়িখানা ভেঙে এখন মস্ত দোতলা বাড়ি বানিয়েছেন গোবিন্দ সাহা। নানান উপলক্ষ্যে সাড়ম্বরে খরচা করে পাড়ার লোককে তিনি পয়সা দেখান।

গোবিন্দ সাহা চলে যাওয়ার পর চুমকি বলল বাপিকে 'কীরে দাদা যাবি নাকি গোবিন্দকাকার গুরুদেবকে দেখতে?

'ধুৎ।' বাপি বলল, 'ওতে আমার ইন্টারেস্ট নেই। হ্যাঁ আসত যদি তেন্ডুলকার কিংবা সৌরভ গাঙ্গুলি, ঠিক যেতাম।'

'জানিস দাদা, মনোহরস্বামী নাকি দারুণ দেখতে।'

'কে বলেছে?'

'মিনু। ও দেখেছে কলকাতায়। ওর মামার বাড়ির পাড়ায় এসেছিলেন গত বছর। চ-না দেখে আসি।'

'খবরদার চুমকি ওখানে যাবে না। তোমার টিউশন আছে আজ। পড়তে যাবে।' মা কড়া গলায় হুকুম দিলেন ঘর থেকে।

শুনে চুমকি দমে গেল। মায়ের আদেশ অমান্য করার সাধ্যি কী? সে ম্লান সুরে বলে

বাপিকে, 'দাদা তুই যা-না দেখে আয়। দেখে এসে বলিস, মিনুর কথা সত্যি কিনা? গোবিন্দকাকা তো বললেন প্রসাদ খাওয়াবে।' চুমকি লোভ দেখায় বাপিকে।

'যা যাঃ। ওই শসা আর শাঁকালুর পিস খেতে কে যায়? বাপি উড়িয়ে দেয় টোপটা।

'শুধু শসা-টসা নয়, মিষ্টিও খাওয়াবে ঠিক। দেখিস ভাল মিষ্টি।'

হুঁঃ, ভালো মিষ্টি? পেসাদে মিষ্টি তো দেয় শুধু বাতাসা।'

'নারে দাদা, শুনেছি গোবিন্দকাকার বাড়িতে পুজোয় ভাল ভাল মিষ্টি দেয়—নারকেল নাড়ু, সন্দেশ মন্ডা। আশেপাশে বিলোয়?'

'ঠিক আছে বলছিস যখন তোদের ফেমাস গুরুদেব দেখতে কেমন সেটা না হয় একবার দেখে নেব। তারপর জটার কাছে যাব আড্ডা মারতে।'

আসলে বাপির মনে মনে বেশ কৌতূহল জাগছিল গোবিন্দকাকার গুরুদেব সম্পর্কে। আর নারকেল নাড়ু কী সন্দেশ, মন্ডা—তিনটেই খুব লোভনীয়। যদি মিলে যায় মন্দ কী?

দশটা বাজার ঠিক দশ মিনিট আগে বাপি রওনা দিল গোবিন্দ সাহার বাড়ি লক্ষ্য করে। আর কিছুদুর গিয়ে পিছন ফিরে সে চমকে ওঠে। ভালু! বাপিদের পেয়ারের দেশি কুকুর। কখন যে ভালু তার পিছু নিয়েছে নিঃশব্দে!

এই এক রোগ ভালুর। বাপি পায়ে হেঁটে বেরুলে মাঝে মাঝে তার সঙ্গ ধরবে। সাইকেলে চড়ে বেরুলে কিন্তু পিছু নেয় না। কারণ জানে যে সাইকেল বড় তাড়াতাড়ি ছোটে, তাল রাখতে পারবে না। আর যাবে অনেক দূর। কিন্তু হেঁটে গেলে বেশি দূর যাবে না। কেন যে ভালুর হঠাৎ হঠাৎ এমন ঝোঁক চাপে কে জানে। সঙ্গে গিয়ে অবশ্য তেমন ঝামেলা করে না ভালু। যে বাড়িতে ঢোকে বাপি সেই বাড়ির গেটের কাছে সে চুপচাপ থাবা ছড়িয়ে বসে থাকে। অপেক্ষা করে। বাপি ফিরলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরে পিছন পিছন। রাস্তার ধারে বা মাঠে বসে বন্ধুদের সঙ্গে বাপি আড্ডা দিলে ভালু কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বা বসে থাকে। নজর রাখে বাপির ওপর। আবার সঙ্গে ফেরে বাসায়।

গন্ডগোল লাগে যে বাড়িতে ঢুকেছে বাপি সেই বাড়িতে যদি পোষা কুকুর থাকে। তখন দুই কুকুরে ঝগড়া বেধে যায়। কখনও কখনও লড়াইও বাঁধে। বাপি বেশ বিব্রত হয় কুকুরদের ঝগড়া মারামারি থামাতে তার দম বেরিয়ে যায়।

পথে যেতে যেতেও সমানে অন্য কুকুরদের উদ্দেশে ভালু 'চলে আয়, দেখে নেব' গোছের আস্ফালন চালায়। তবে ভালু জাঁদরেল সারমেয়। দু'-একজন প্রতিপক্ষ তাকে কাবু করতে পারে না এই পাড়ায়। তাই বেশির ভাগ সময় দু-একটা কুকুর ভালুর মুখোমুখি হলে খানিক তর্জন-গর্জন করেই ফাঁড়া কাটে।

বাপিদের বাড়ির সীমানাটা ঘন করে বসানো টগর গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বাইরের গরু-ছাগল-কুকুর ইত্যাদি সহজে ঢুকতে পারে না বেড়া ভেদ করে। যদি না ঢোকার মতলব করে ভালুর দাপটে উঁকি মেরেই সরে পড়ে। কিন্তু ভালু স্বয়ং ইচ্ছে করলেই বেড়ার ফাঁক ফোকর দিয়ে বেরিয়ে বাইরে ঘুরে আসে।

আজ গোবিন্দ সাহার গুরুদেব দর্শনে রওনা হতে ভালু সঙ্গ ধরলে 'এই পালা, বাড়ি যা' ইত্যাদি ধমকে বাপি তাড়াবার চেষ্টা করে ভালুকে। ভালু থমকে যায়। কয়েক পা পিছোয়।

তারপর বাপি হন্টন দিলেই নাছোড়বান্দার মতো ফের বাপির পিছু নেয়।

এমনি বার কয়েক ভালুকে ঝেড়ে ফেলার ব্যর্থ প্রয়াস চালায় বাপি। এখন যে আবার বাড়ি ফিরে ভালুকে চেনে বেঁধে রেখে আসবে তার সময় নেই হাতে। আর দেরি করলে গুরুদেবের আগমনের দৃশ্যটাই হয়তো ফস্কে যাবে। শেষে চটে গিয়ে বাপি ভালুকে বলে, 'তবে চ, গুরুদেবকে দেখে আসবি। ওখানে গিয়ে যদি ঝামেলা পাকাস তো দেখাব মজা।' বলেই সে হন হন করে পা চালাল। ভালুও তার পিছু ধরল।

গোবিন্দকাকার বাড়ির কাছে পৌঁছে বাপি দেখল বেজায় ভিড়। গোবিন্দ সাহার বাড়ির এলাকা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বাড়ির একতলায় দক্ষিণমুখো উঁচু ভিতের টানা বারান্দা। বারান্দাটা ছাদ ঢাকা, তবে রেলিং ঘেরা নয়, খোলা। বারান্দার ঠিক সামনে অনেকখানি ফাঁকা জমি। সেই জমিতে সমান করে লনের মতো ছাঁটা ঘাস। আর তার ধারে ধারে কিছু ফুলের গাছ। বাড়ির মস্ত লোহার গেটটা হাট করে খোলা।

সাহা বাড়ির একতলার ওই বারান্দায় কয়েকজন ঘোরাঘুরি করছে ব্যস্তভাবে। বারান্দার সম্মুখে উঠোনে গিজগিজ করছে লোক। বাড়ির বাইরে প্রচুর মানুষ—বেড়ার গায়ে, রাস্তায়, ধারে কাছে বাড়িগুলোয়। সবাই উৎসুক হয়ে আছে স্বামী মনোহরানন্দের আগমন প্রতীক্ষায়।

বাপি লক্ষ করল যে সাহা বাড়ির উঠোনে যারা জড়ো হয়েছে তারা প্রায় সবাই বয়স্ক স্ত্রী পুরুষ। তার মতন ছেলে ছোকরা যারা জুটেছে, তারা রয়েছে বেড়ার বাইরে। দেখার উৎসাহে কয়েকজন ছেলে আবার কাছে একটা গাছে চড়েছে।

বাপি ভাবল, না, বেড়ার ভিতর উঠোনে ওই বড়দের ভিড়ে ঢুকে কাজ নেই। বাইরে থেকে দেখি। সে এক নজরে সার্ভে করে নিয়ে একটা জায়গা বেছে ফেলল। তারপর গোবিন্দ সাহার পাশের বাড়ির গেটের উঁচু চওড়া পাকা থামটার টঙে চড়ে বসল বেশ কসরত করে। ছাদ থেকে থামের মালিক ভুরু কুঁচকে বাপির দিকে একবার তাকালেন বটে তবে এই নিয়ে তখন আর আপত্তি তুললেন না। ভালু থামটার গোড়ায় ঘাঁটি গাড়ল।

এদিক-সেদিক তাকিয়ে ভালুর নজরে পড়ে গেল খানিক দূরে রাস্তায় টেংরিকে। টেংরি ওই এলাকার কুকুর। টেংরি ভালুর দিকে চেয়ে দাঁত খিঁচিয়ে গরগর করল। ভালুও জবাবে দাঁত বের করে গর্জন ছাড়ল।

'এই ভালু চোপ্' চাপা কণ্ঠে ধমকায় বাপি। আপাতত ঝগড়াটা বেশি দূর টানার ইচ্ছে ভালু টেংরি উভয়েই কিন্তু দমন করল। কারণ হয়তো এত মানুষের ভিড় আর হট্টগোল দেখে দুজনেই বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিল। কৌতূহলী চোখে তারা বোঝার চেষ্টা করে, ব্যাপারখানা কী?

'ওই আসছেন আসছেন'—কলরব ওঠে।

বাপি দেখল যে পিচরাস্তা বেয়ে দুটো সাদা রঙের মোটরগাড়ি হু হু করে ধেয়ে আসছে এই দিকে। দেখতে দেখতে গাড়ি দুটো এসে থামল গোবিন্দ সাহার বাড়ির সামনে। গাড়ি দুটো থেকে নামলেন স্বামী মনোহরানন্দ এবং আরও কয়েকজন। গোবিন্দ সাহা গুরুদেবকে প্রণাম করে পরম সমাদরে অভ্যাগতদের নিয়ে গিয়ে তুললেন এক তলায় দক্ষিণের বারান্দায়।

কেমন জায়গাটা বেছেছি? সব খাসা দেখা যাচ্ছে। আত্মপ্রসাদে ভারি খুশি হয়ে ওঠে বাপি।

মনোহরানন্দকে মাঝখানে রেখে তাঁর দু' পাশে এবং পিছনে দাঁড়ালেন সেই মফস্বল শহরের কিছু ভদ্রলোক। সেখানে দু-তিনজন গেরুয়াধারী অচেনা বাইরের শিষ্যও রয়েছেন। গোবিন্দ সাহা বিগলিত বদনে জোড় হস্তে গুরুদেবের ঠিক পাশে দণ্ডায়মান।

বাপি লক্ষ করে যে শুধু মাত্র শহরের কিছু মাতব্বর ব্যক্তি বারান্দায় ওঠার অধিকার পেয়েছেন। বাকি কিঞ্চিৎ সাধারণ দরের ভক্ত বা দর্শকরা রয়েছেন বারান্দার সামনে নিচু উঠোনে।

গুরুদেবকে সত্যি চমৎকার দেখতে। মাঝারি লম্বা। গায়ের রং টক্‌টকে ফর্সা। সুশ্রী দিব্যকান্তি। হাসি হাসি মুখ। মাথায় কুচকুচে কালো ঘন বাবরি চুল। পরনে তাঁর ঘিয়ে রঙা-ঢোলা হাতা সিল্কের জোব্বা। গলায় ফুলের মালা। গুরুদেব একবার ডান হাত তুলে নাড়লেন সমবেত জনতার উদ্দেশে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে। বারবার জয়ধ্বনি ওঠে গুরুদেবের নামে ভক্তদের কণ্ঠ থেকে।

তক্ষুনি লাল পেড়ে গরদের শাড়ি পরা গোবিন্দ সাহার স্ত্রী ও বোন বয়ে আনলেন বারান্দায় মস্ত মস্ত দুই ঝক্‌ঝকে কাঁসার থালায় প্রচুর বড় বড় সন্দেশ। কাছে একটা টেবিলে রাখা হল সন্দেশভর্তি থালা দুটো। গুরুদেব একটা থালা থেকে এক চিলতে সন্দেশ ভেঙে নিয়ে নিজের ঠোঁটে ছোঁয়ালেন। অর্থাৎ প্রসাদ করে দিলেন। তারপর তিনি থালার সন্দেশ তুলে তুলে বিতরণ করলেন বারান্দায় ভক্তদের মাঝে। তাঁরা পরম ভক্তি ভরে সেই সন্দেশ কপালে ঠেকিয়ে মুখে পুরলেন।

বারান্দায় প্রসাদ বিলানো শেষ হল গুরুদেব এবার একটি একটি করে সন্দেশ থালা থেকে তুলে নিয়ে ছুড়তে লাগলেন নিচে উঠোনে জমায়েত ভক্তদের মাঝে। সেখানকার মেয়ে পুরুষ সবাই লুফে লুফে নিয়ে প্রণাম করে খেতে লাগল প্রসাদী সন্দেশ।

ভক্তির তাগিদে নাহোক স্রেফ সন্দেশের লোভেই বেড়ার বাইরের বেশ কিছু লোক এবার ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতরে উঠোনে। রীতিমতো হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে গেল সন্দেশের জন্যে। যারা ভালু লুফতে ওস্তাদ তাদের ভাগ্যে সন্দেশ জুটতে লাগল বেশি। আবার বেঁটেদের তুলনায় ঢেঙারা কিঞ্চিৎ সুবিধে পেল এ ব্যাপারে।

বাঃ চুমকি তো ঠিক বলেছিল, ভাবে বাপি—গোবিন্দকাকা প্রসাদে ভাল মিষ্টিই খাওয়াচ্ছেন। সন্দেশের টানে থামের মাথা থেকে নেমে ওই উঠোনে ঢুকবে কিনা চিন্তা করছে বাপি এমন সময় এক কাণ্ড ঘটল। বোধহয় মিষ্টির গন্ধ পেয়ে কিংবা মুখরোচক কোনও খাবার দেওয়া হচ্ছে আঁচ করে ভালু এক দৌড়ে ঢুকে পড়ল সাহা বাড়ির উঠোনে জনতার পায়ের ফাঁকে। আর ভালুর দেখাদেখি টেংরিও তিরবেগে ঢুকে গেল সেখানে। মাটিতে পড়ে থাকা কিছু অতি চমৎকার কড়া পাকের সন্দেশের টুকরোর স্বাদ পেয়ে, ভালু টেংরি লোভে উত্তেজনায় বগবগিয়ে ওঠে। মানুষ ভক্তরা যত লাফায় গুরুদেবের হাত থেকে নিক্ষিপ্ত মিষ্টান্ন লুফতে ভালু টেংরিও লাফায় তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

কোত্থেকে আর একটা কুকুরও ছুটে এসে যোগ দিল ভালু টেংরির দলে। এই কুকুরটাকে চেনে বাপি। এই পাড়াতেই ঘোরে। ছেলেরা ওর নাম দিয়েছে কানকাটা। মারামারি করতে গিয়ে ওর একটা কানের ডগা উড়ে গেছে, তাই এই নামকরণ।

প্রসাদী মিষ্টি ভক্ষণের প্রতিযোগিতায় মানুষরা কিন্তু পিছু হটতে থাকে। তিনটে কুকুর লাফাচ্ছে গা ঘেঁষে হাঁ করে। মিষ্টির বদলে ওরা কারও হাতে দাঁত ফোটালেই চিত্তির। ইনজেক্‌শন্ নিতে হবে নির্ঘাৎ। ফলে ঘাবড়ে গিয়ে কেবলই মানুষ ভক্তদের মুঠো থেকে সন্দেশ ফস্‌কায়। আর ভূলুণ্ঠিত সে সব সন্দেশ তিন কুকুর গবাগব গেলে। এই সন্দেশ ভোজের ফাঁকে ফাঁকে ভালু টেংরি কানকাটা আবার পরস্পরকে মাঝে মাঝে দাঁত খিঁচোয়। তবে বেশি ঝগড়াঝাঁটিতে অযথা সময় নষ্ট করে না তারা।

একটা হুলস্থুল বেধে যায়। কুকুরদের দাপটে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে উঠোনের মানুষজন। মেয়েরাই ভয় পায় বেশি। 'ও-রে বাবারে, মা-রে' চিল চিৎকার ওঠে বামা কণ্ঠে। বারান্দার লোকেরা সমস্বরে হুংকার ছেড়ে কুকুর তাড়াবার চেষ্টা করে।

থামের টঙ থেকে আর নামা হয় না বাপির। থ হয়ে সে দেখে ভালুদের কাণ্ড।

ইতিমধ্যে এই বিপর্যয় দেখে গুরুদেব প্রসাদী সন্দেশ বিতরণ বন্ধ করে দিয়েছেন। দু-জন যণ্ডা চেলা লাঠি হাতে ছুটে আসে কুকুর তাড়াতে।

ভালুরা কিন্তু মহা চালাক। কিছুতেই তারা আর ফাঁকা জায়গায় যায় না। উঠোনে মানুষদের ভিড়ের মাঝে লুকোচুরি খেলতে থাকে ডান্ডাধারীদের সঙ্গে। লোকেদের পায়ের ফাঁকে ফাঁকে গোত্তা মেরে এঁকেবেঁকে পাক খেয়ে ছোটে যেন চোর পুলিশ খেলছে। পাছে মানুষদের গায়ে আঘাত লেগে যায় সেই ভয়ে ডান্ডাধারীরা এক ঘাও হাত খুলে লাঠি চালাতে পারে না কুকুরদের তাক করে। অবশেষে হঠাৎ তিন কুকুর উধাও হয়ে যায়। তারা কিন্তু বাড়ির বাইরে যায়নি। ওই বাড়ির পিছনে কম্পাউন্ডে কোথাও গা ঢাকা দিয়েছিল।

গুরুদেবের বিশ্রামের বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। তাই আর কুকুরদের পিছনে ছোটাছুটিতে ক্ষান্ত দিয়ে লাঠিধারী ভক্তরা সরে যায়। উঠোনের জনতা আবার ঘন হয়ে দাঁড়ায়। হাত পাতে প্রসাদের আশায়। গুরুদেব ফের স্মিতবদনে সন্দেশ নিক্ষেপ শুরু করেন।

বাপি গুটি গুটি থামের মাথা থেকে নামে। থামের আড়াল থেকে নজর রাখে। তবে সাহা বাড়ির উঠোনে ঢুকতে ভরসা পায় না। যদি কেউ চিনে ফেলে যে ভালু তার কুকুর? আর সেটা খুবই সম্ভব। তাহলে ভালুর অপরাধের চোটটা হয়তো ওর প্রভুর ঘাড়েই পড়বে।

বার কয়েক সন্দেশ বর্ষণের পরেই কিন্তু তিন-কুকুরের ফের আবির্ভাব হল। কোত্থেকে দৌড়ে এসে ভালুরা ঢুকে পড়ল উঠোনে মানুষের ভিড়ে। দ্বিগুণ উৎসাহে তারা লাফালাফি ছুটোছুটি করে মিষ্টির লোভে। ব্যস আবার লেগে যায় ধুন্ধুমার কাণ্ড। ফের লাঠি চার্জ করতে আসরে নামে দুই ভক্ত। ফের শুরু হয়ে যায় ভালুদের লুকোনো লাঠি থেকে প্রাণ বাঁচাতে।

গুরুদেব এবার নেহাতই বিরক্ত হয়ে আর প্রসাদ বিতরণ না করেই বারান্দা ছেড়ে সটান ঢুকে গেলেন বাড়ির অন্দরে। ফলে ভক্তদের জমায়েতও গেল ভেঙে। বেশিরভাগ লোক তখন বেরিয়ে যেতে থাকে গোবিন্দ সাহার বাড়ি ছেড়ে।

বাপিও বাড়ির পথে রওনা দেয় ক্ষুণ্ণ মনে। একটিও সন্দেশ যে তার বরাতে জোটেনি। দেরি হয়ে গেছে এখন আর জটার বাড়ি গিয়ে আড্ডা দেওয়ারও সময় নেই।

হঠাৎ পিছনে খচ্‌মচ্ আওয়াজ শুনে বাপি ঘুরে দেখে ভালু আসছে ঠোঁট চাটতে চাটতে।

সেই রাগে এখন বাপি বাইরে বেরুলে আর ভালুকের সঙ্গ ধরতে দেয় না পারতপক্ষে।

কাল্‌টির আজব ব্যারাম

কাল্‌টির এই অদ্ভুত রোগের কাহিনি বাপি শুনেছিল তার ছোটকাকার মুখে। কাল্‌টি ছিল একটি গোরু মানে গাভী। থাকত বাপিদের দেশের গ্রামের বাড়িতে। তাদের বাড়ির পোষা গোরু।

কাল্‌টির রং ছিল চকচকে কালো। তেল চুকচুকে লম্বা শিং। রং অবশ্য পুরোটা কালো নয়। গোটা দেহে কালোর মধ্যে শুধু কপালে একটি সাদা টিপ, আর চারপায়ে খুরের ওপরে সাদা সাদা ছোপ। বাকিটা কালো। অমনি কালো রঙের জন্যেই বাপির ঠাকুমা আদর করে তার নাম রেখেছিলেন — কাল্‌টি। ওই নামটাই বাড়িতে মায় গোটা গ্রামে চালু হয়ে গিয়েছিল।

বাড়ির ভারি পেয়ারে গোরু ছিল কাল্‌টি। অমন রূপ! গুণও তার কম নয়। সাধারণ অন্য দেশি গোরুর চেয়ে প্রায় দু'গুণ বেশি দুধ দিত কাল্‌টি। কী ঘন মিষ্টি সেই দুধ! বাপির ঠাকুমা বলতেন, তাঁর তিন মেয়ে। আসলে তাঁর নিজের দুই মেয়ে। কিন্তু কাল্‌টিকেও ধরতেন কিনা, তাই তিন।

দেশের বাড়িতে বাপির পূর্বপুরুষদের তখন মস্ত একান্নবর্তী সংসার। বাপি সেখানে জন্মায়নি, বড়ও হয়নি। কাল্‌টিকে সে চোখেও দেখেনি। তবে বাবা কাকা জ্যাঠা পিসিদের মুখে কাল্‌টির কত যে গল্প শুনছে।

শুধু নিজের বাড়িতে নয়। গোটা গাঁয়ের লোকই ভালোবাসত কাল্‌টিকে। বেশ উঁচু নজরে দেখত তাকে। গাঁয়ের কেউ কিংবা জ্ঞাতিগুষ্টি কেউ, কিছু কাল বাদে ওই বাড়িতে গেলে, বাড়ির অন্য মানুষ মেম্বারদের সঙ্গে সঙ্গে কাল্‌টিরও একবার খোঁজ নিত।

সব ভালো ছিল কাল্‌টির, শুধু মাত্র একটি খুঁত—একটু পেটুক বেশি। কত কী যে খায়, বাছবিচার নেই। নিজের বাড়ির খাদ্য খড় বিচুলি খোলটোল তো মেনুতে আছেই, এর ওপর চপ, কচুরি, শিঙাড়া, রুটি, জিলিপি, ছেঁড়া কাগজ, কাপড় ইত্যাদি কত কী যে খেত চেটেপুটে। লোকে বলত, আহা অমন যে দুধ দেয় তার ডায়েট মানে খাবার পছন্দটাও স্পেশাল হবে বৈকি। আর পাঁচটা গোরুর সঙ্গে একপাতে বসানো ঠিক নয়।

বাড়ির দাওয়ায় বসে কেউ গরম চপ দিয়ে মুড়ি খাচ্ছে, উঠোনে বাঁধা কাল্‌টি কিচ্ছুটি না বলে কেবল লোভী চোখে তাকিয়ে থাকত। যে খাচ্ছে ঠিক বুঝত। তাই খাওয়া শেষে কিছু

তলানি মুড়ি ও চপের টুকরো রেখে দিত কাল্‌টির সামনে। কাল্‌টি কৃতজ্ঞ দৃষ্টি হেনে সড়াৎ জিভে টেনে ঠোঙা সমেত মুড়ি চপ উদরস্থ করত।

বেশির ভাগ সময় বাড়িতেই বাঁধা থাকত কাল্‌টি। তবে মাঝে মাঝে খোলা থাকলে গাঁয়ে পায়চারি করতে বেরুত। পথে যেতে যেতে ভালোমন্দ যা পেত চেখে দেখত। তবে হ্যাঁ, অন্য বাড়িতে লুকিয়ে ঢুকে কিছু মুখে দিত না।

ছোটকাকা বলেছিল, কাল্‌টি নাকি সব চাইতে ভালোবাসত কাগজের পোস্টার খেতে। বেশি পোস্টার সে পেত না। মাইল দুই দূরে গঞ্জের সিনেমা হলের লোক নতুন কোনও সিনেমা এলেই ধারে কাছের গাঁয়ে বেশ কয়েকটা সচিত্র কাগজের পোস্টার সেঁটে দিয়ে যেত দেয়ালে দেয়ালে, বিজ্ঞাপন করতে। এছাড়াও গঞ্জে কোনও বাইরের নামকরা যাত্রাদল এলে আশপাশের গ্রামে গ্রামে হ্যান্ডবিল বিলোত, কিছু পোস্টারও সাঁটা হত। কাল্‌টি বাড়ি থেকে ঠিক নজর করত পোস্টার লাগানোর ছেলেগুলোকে। বগলে গুটানো পোস্টারের বান্ডিল, এক হাতে আংটায় ঝোলানো আঠার টিন—কাল্‌টির চিনতে ভুল হত না। সেদিন এক ফাঁকে টুক করে কেটে পড়ত বাড়ির বাইরে। তারপর গ্রামের পথে পথে ঘুরত পোস্টার সন্ধানে। নাগালের মধ্যে যে কটা পোস্টার পেত ছিঁড়ে নিয়ে আয়েস করে চিবিয়ে খেত, মায় কাঁচা আঠাসুদ্ধ। ঘরে ফিরত খোস মেজাজে, হাসি হাসি মুখে। যেন খাসা একটা ভোজ খেয়ে এসেছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার এত সব উল্টোপাল্টা খেয়েও কাল্‌টির অসুখ করত না। ঠাকুমা বলতেন, ও কি সাধারণ গাভি রে। শাপভ্রষ্ট।

সেই কাল্‌টির একবার ব্যারাম হল। ভীষণ অম্বল। সমানে ঘেঁয়াও ঘেঁয়াও করে ঢেকুর তুলছে। খাবারে রুচি নেই মোটে। নেহাতই পিত্তরক্ষার জন্য দুটি খায়। কাহিল হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। চেহারার জেল্লা কমে গেছে। দুধ দিচ্ছে যেন ছানার জল। সবাই ভেবে অস্থির।

কেন এমন হল? অনেকগুলো থিওরি বেরোয়। বেশির ভাগ গাঁয়ের লোকের মতো, পাঁচ-ছয় দিন আগে হেমামালিনীর ছবিওলা পোস্টার খেয়েই নাকি কাল্‌টির এই দুর্দশা। অত গুরুপাক খাদ্য হজম হয়নি।

কাল্‌টির রোগ সারাবার জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

প্রথমে দেওয়া হল বাড়ির লোকের জানা টোটকা ওষুধ। কিস্‌সু কাজ হল না। এরপর গ্রামের অভিজ্ঞ লোকেরা অনেক ওষুধ বাতলালে। তাতেও লাভ হল না। ওষুধে কাজ হবে কী করে? কালটি ওই সব ওষুধ শুঁকেই মুখ ফেরায়। তার পরম প্রিয় কচুরি ও বোঁদের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে সামনে ধরা হল। কাল্‌টি তা শুঁকে নিয়ে জিভ দিয়ে টুকটুক করে বারকয়েক চেটে মুখ ঘোরাল। মুখ ফাঁক করে জোর করে ওষুধ ঢেলে দিতেও ভরসা হচ্ছে না। বাপির ঠাকুমার প্রবল আপত্তি। রোগা শরীরে জোরাজুরি করলে যদি হার্টফেল করে?

তখন ছোটকাকা পড়ছে স্কুলে—ক্লাস নাইনে। বাপির বাবা জ্যাঠারা কলেজে উঠেছে। কাকাদের এক জেঠতুতো দাদা বাপির হারু জ্যাঠা তখন সবে চাকরিতে ঢুকেছেন কলকাতায়। গ্রাম থেকেই যাতায়াত করেন। খুব ইংরিজি বলেন। কলকাতার অনেক খবর রাখেন। তিনি অভয় দিলেন, ডোন্ট ঘাবড়াও। কলকাতায় এক জাপানি ডাক্তার এসেছে। আকুপাংচার করে। মানে ছুঁচ ফুটিয়ে ফুটিয়ে রোগ সারায়। অম্বল দারুণ সারাচ্ছে। আমি আজই তার কাছে যাব।

ডক্‌টরকে নিয়ে আসব কেল্‌টির ট্রিটমেন্ট করতে। ট্রেনে আসতে না চাইলে বাই কার — মানে ট্যাক্সিতে।

রাতে বাড়ি ফিরে হারু জ্যাঠা জানালেন, জাপ ডক্টর বলল যে সে মানুষ পশু সব্বার সব রকম অম্বলই সারাতে পারে আকুপাংচারে। তবে একটা প্রবলেম আছে। অম্বল সারাতে নাকি পায়ের তলায় ছুঁচ ফোটাতে হয়। কাল্‌টির যে পায়ের তলায় খুর । তাই ডাক্তার এ কেসটা নিতে চাইল না। বলল—সরি।

এখন কী হবে?

ছোটকাকা বলেছিল যে, গরাণ জ্যাঠা এবার বুদ্ধি করে একজন ভেটেরিনারি ডাক্তার মানে পশুর ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এলেন।

ডাক্তারটি ইয়াংম্যান। ফুলপ্যান্ট-শার্ট পরা। স্মার্ট। নাম—ললিত। তার চিবুকে লেনিনের মতো দাড়ি। তাই গরাণ জ্যাঠা তাকে ডাকেন— লেলিত।

লেলিত ডাক্তার গম্ভীর বদনে কাল্‌টির পেট টিপেটুপে পরীক্ষা করে দেখল। ওর জিভটাও দেখতে চাইল। কিন্তু কাল্‌টি জিভ দেখাতে রাজি হল না। কেউ জোর করতেও সাহস পেল না। যাহোক ডাক্তার বলল যে ওকে একটা ইনজেক্‌শন দিতে হবে।

ডাক্তারের কথা মতো থান কাপড়-পড়া মাঝবয়সি বিধবা পুঁটিদিদি এক গামলা কুসুম কুসুম গরম জল এনে হাজির করল। ডাক্তার ইনজেক্‌শনের সিরিঞ্জ বের করে, হাত সেই জলে ধুয়ে, ছুঁচ স্পিরিট দিয়ে মুছে, সিরিঞ্জে ওষুধ ভরে তৈরি হল।

কাল্‌টি দাঁড়িয়ে ছিল মানে বাঁধা ছিল গোয়ালের সামনে। তার পেছন দিকে কাছেই ছিদাম মুনিশ ঝুড়ি করে এনে গোবর ফেলে তাল করছিল। ছিদাম গোবরসুদ্ধু ঝুড়ি হাতে দাঁড়িয়ে গেল ইনজেক্‌শন দেওয়া দেখতে।

কাল্‌টি আড়চোখে ডাক্তারকে আর ডাক্তারের ব্যাপারস্যাপার নজর করছিল সন্দিগ্ধ ভাবে। এরপর লেলিত ডাক্তার কাল্‌টির পেটে যেই না ইনজেক্‌শনের ছুঁচ ফুটিয়েছে, কাল্‌টি পেছনের জোড়া পায়ে ছুড়ল এক লাথি, আর এক শিংয়ের ঝটকা। ভাগ্যিস লাগেনি কারও কিন্তু চমকে পালাতে গিয়ে প্রথমে পুঁটিদি পড়ল গোবরের তালে, তার ওপর পড়ল লেলিত ডাক্তার, আর তাদের ওপর পড়ল ছিদাম মুনিশ— ঝুড়ি ভরা গোবর সমেত। ইনজেক্‌শনের সিরিঞ্জ মাটিতে পড়ে ভেঙে টুকরো হয়ে গেল।

তিনজনেই গোবরে মাখামাখি। তারা উঠল যখন পুটিদির পেছন দিকটা সাদা আর সামনেটা পুরো কালো। লেলিত ডাক্তার বিড়বিড় করে ইংরিজি বাংলায় গাল পাড়তে পাড়তে, হাত মুখ কিছুটা ধুয়ে ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে বিদায় নিল। ফিজ তো সে নিলই, তার ওপর শার্ট-প্যান্ট ধোয়ার ধোপার চার্জ এবং ওষুধ ইনজেক্‌শনের দামও আদায় করল। কাল্‌টি ফের নির্বিকার উদাস ভাবে সব চেয়ে চেয়ে দেখছে আর মাঝে মাঝে ডাক ছাড়ছে— ঘেঁয়াও।

গোরুর ডাক্তার তো ফেল্‌। এবার কী হবে? কাল্‌টিকে কি বাঁচানো যাবে না? ঠাকুমা কান্না জুড়ে দিলেন। বাড়ির অন্য মেয়েদেরও চোখে জল। গাঁয়ের এক মাতব্বর ব্যক্তি পরামর্শ দিলেন, সুখু ওঝাকে একবার ডাকো। তার খুব খ্যাতি। অনেক অলৌকিক শক্তি ধরে। আর

ওঝার কাজ তো তফাতে থেকে মন্তর ঝাড়া। বড় জোর সরষে ফোড়ন। তাতে কেল্‌টির ব্যথা লাগবে না। চটবে না।

তা-ই হল। সুখু ওঝাকে ডেকে আনতে লোক গেল, দূর গ্রামে। সুখু ওঝা এল— টকটকে লাল লুঙ্গি পরা। কপালে লাল-রঙা তিলক। একমাথা রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল। মুখভর্তি কাঁচা-পাকা দাড়ি গোঁফ। গলায় রক্ত জবার মালা। খালি গা। রাগী রাগী চোখ দুটো লালচে। গায়ের রং মেটে মেটে। রোগা পাকানো চেহারা। কিঞ্চিৎ বেঁটে। তাকে দেখলেই বেশ সমীহ জাগে।

কাল্‌টিকে খুঁটো পুঁতে বাঁধা হল একটা আমগাছের নীচে। থেকে থেকে ডাক ছাড়ছে— ঘেঁয়াও।

সুখু ওঝা কাল্‌টির আপাদমস্তক দেখে নিয়ে একখানা চওড়া হাসি দিয়ে বলল, 'সারিয়ে দেব। ওকে গো-ভূতে ধরেছে। হুঁ হুঁ, এ বাবা সুখু ওঝা। দেখছেন না, আমায় দেখেই কেমন ঘেবড়ে গেছে।'

সুখু মাটি থেকে এক মুঠো ধুলো তুলে কাল্‌টির দিকে ছুড়ে দিয়ে হঠাৎ তারস্বরে ভাঙা গলায় চোখ পাকিয়ে মন্ত্র আওড়াতে শুরু করল— অং বং ঘ্রং... বাংলা সংস্কৃত মিশিয়ে কী-এক বিচিত্র ভাষায়। কেউ আর অর্থ ধরতে পারে না। তবে মন্ত্রের দাপটে আঁতকে উঠে কয়েক পা হটে যায় দর্শকরা। বাড়ির লোকেরা ছাড়াও তখন গ্রামের বহুলোক জুটে গেছে সেখানে।

সুখু ওঝা হাত নেড়ে বিকট স্বরে মন্ত্র বলতে বলতে কাল্‌টির চারপাশে পাক খেতে লাগল। মাঝে মাঝে মুঠো ভরা ধুলো ছুড়ছে। ছোটকাকা বলেছিল, 'বুঝলি বাপি, কাল্‌টি তো গোল গোল চোখে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওঝার মুভমেন্ট ফলো করে চলেছে। ঘেঁয়াও করতেও ভুলে গেছে। হঠাৎ সে খেপে গিয়ে খুঁটো উপড়ে শিং বাগিয়ে তেড়ে গেল ওঝার দিকে।

সুখু ওঝা তক্ষুনি মন্তর থামিয়ে এক দৌড়ে গিয়ে গুঁড়ি বেয়ে আমগাছে উঠতে লাগল। কিন্তু সে নাগালের বাইরে যাবার আগেই কাল্‌টি ধরে ফেলল ওর লাল লুঙ্গির খুঁট। মারছে টান। বেগতিক বুঝে ওঝা স্রেফ লুঙ্গি খুলে রেখে গাছের ওপর উঠে পড়ল। ডালে পাতার আড়ালে বসল গা ঢাকা দিয়ে।

নীচে দাঁড়িয়ে কাল্‌টি ওঝার লুঙ্গি খেতে লাগল।

সুখু হঠাৎ হাঁউমাঁউ করে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল যে ওর লুঙ্গির খুঁটে একখান দশ টাকার নোট বাঁধা আছে। কেউ যদি দয়া করে উদ্ধার করে দেয়।

কে দেবে? কার এত বুকের পাটা? যা রুদ্রমূর্তি দেখিয়েছে খানিক আগে। তবু সাহস করে তোর ঠাকুরদা মনে আমার বাবা একটু কাছে যেতেই কাল্‌টি ফোঁস করে শিং নেড়ে তাকে ওয়ার্নিং দিল। বাবা পিছিয়ে এল। ব্যস, আর কেউ ভরসা পেল না কাল্‌টিকে ডিস্টার্ব করতে। সুখু ওঝা হায় হায় করেই চলল আবডালে বসে। কাল্‌টি পরম তৃপ্তিতে ধীরেসুস্থে ওঝার নোট সমেত লাল লুঙ্গি পুরোটা চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। খাওয়া শেষ করে কাল্‌টি একটা মস্ত ঢেকুর তুলল— ঘেঁয়াত। তারপর গুটিগুটি নিজের ঘরের দিকে মানে গোয়ালের দিকে রওনা হল তোর ঠাকুমার পিছু পিছু।

ইদিকে সুখু ওঝা তো গাছ থেকে নামতে পারছে না। পরনে লুঙ্গি নেই যে। মেজদা মানে তোর বাবা একটা বুদ্ধি করল। একটা খালি চটের বস্তা, যার একদিক খোলা, তিন ধারে সেলাই,

তার খোলা পাশের উলটো দিকে দুই কোণ বঁটি দিয়ে তেরচা করে কেটে ফুটো করে, বস্তার ভেতরে দড়ি পুরে সেটা ছুড়ে দিল গাছে সুখু ওঝার হাতে। সুখু বস্তার ফুটো দিয়ে দুই পা গলিয়ে পেটের কাছে দড়ি দিয়ে বস্তাটা বেঁধে কোনওরকমে নেমে এল গাছ থেকে। তাকে একটা ছেঁড়া কাপড় দেওয়া হল। সুখু কাপড়টা লুঙ্গির মতন করে পরে সোজা হাঁটা দিল গ্রামের বাইরে একটিও কথা না বলে।

ছোটকাকা বলেছিল, আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এই ঘটনার পর কাল্‌টির ঢেকুর তোলা একদম বন্ধ হয়ে গেল। সেই আজব ব্যায়াম সেরে গেল। তার আগের খিদে ফিরে এল। এক্কেবারে নর্মাল, আগের মতো। বলতে পারিস দৈবাৎ কিংবা কাকতালীয়।

আমার বাপজ্যাঠারা অবিবেচক ছিলেন না। লোক মারফত সুখু ওঝাকে পাঠিয়ে দিলেন একখানা নতুন লুঙ্গির দাম আর কাল্‌টির ভোগে যাওয়া দশ টাকা। এছাড়া আরও পঞ্চাশ টাকা সুখুর দক্ষিণা বাবদ। তাকে খেতে নেমন্তন্ন করাও হয়েছিল। কিন্তু সুখু আসেনি। বোধহয় কালটির ভয়ে।

আমাদের গাঁয়ের লোক কী বলাবলি করত জানিস? হাজার হোক তান্ত্রিক ওঝার লুঙ্গি। তারও কি কম গুণ? ওতেই কাজ হয়েছে।

পকেট মারার ফলাফল

বেলা একটা নাগাদ। গ্রীষ্মকাল। দীপক খেয়েদেয়ে একটু দিবানিদ্রার উপক্রম করছে, ভবানী প্রেসের পিয়ন এসে জানাল, বাবু ডাকছেন। জরুরি দরকার। এখুনি যেতে বললেন।

যাচ্চলে! দীপকের মেজাজ গেল খিঁচড়ে। ডাকার আর সময় পেল না। কিন্তু যেতেই হবে। সম্পাদকের তলব। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে সাইকেল চেপে বেরুল দীপক।

বোলপুর শহর। ভবানী প্রেস। লম্বা প্রেস ঘরটার এক কোণে কাঠের পার্টিশন ঘোরা প্রেস মালিক ও সাপ্তাহিক 'বঙ্গবার্তা'র সম্পাদকের ছোট্ট অফিস ঘর।

দীপক সম্পাদকের কামরার দরজা ঠেলে ঢুকে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার, ডেকেছেন কেন?

সম্পাদক কুঞ্জবিহারী মাইতি খাড়া হয়ে বসেছিলেন চেয়ারে। বোধহয় দীপকের প্রতীক্ষায়। গম্ভীর স্বরে বললেন, বস।

কুঞ্জবিহারী মাঝবয়সি। শ্যামবর্ণ, মোটাসোটা মানুষ। ঝাঁটা গোঁফ। থমথমে মুখের ভাব। দীপক আন্দাজ করে গুরুতর কিছু ঘটেছে! সে বসে পড়ে সম্পাদকের টেবিলের উল্টো ধারের চেয়ারে।

দীপক রায় 'বঙ্গবার্তা'র একজন রিপোর্টার। বয়স বছর তিরিশ। গ্র্যাজুয়েট। পারিবারিক ব্যবসা দেখাশোনার ফাঁকে ফাঁকে করে সাংবাদিকতা। এ কাজে তার বেজায় উৎসাহ। সম্পাদকের প্রিয়পাত্র সে।

কুঞ্জবিহারী ধীর স্বরে বললেন, জানো আজ কী হয়েছে? সকালে বাজার করতে গেছি। বাড়িতে কুটুম এসেছে। মাছটা বেশ দেখেশুনে কিনে দাম দিতে পকেটে হাত দিয়ে দেখি টাকা নেই। গন। উধাও। পকেট মেরে দিয়েছে।

কোথায় রেখেছিলেন? কোন পকেটে?

সামনের বুক পকেটে। যেমন নিত্যদিন রাখি। কেলেংকারি ব্যাপার। তখন মাছ কেটেকুটে আমার ঝুলিতে। মাছ জমা রেখে, একজনের থেকে টাকা ধার করে দাম মিটিয়ে বাড়ি ফিরলাম। শুধু কি টাকা লস! কেসটা রটতেই ভিড় জমে গেল। কত যে উপদেশ বর্ষণ। কানে এল মন্তব্য—কেয়ারলেস। যাবেই টাকা। আরও কত গায়ে জ্বালা ধরানো কমেন্ট। যেন ইচ্ছে করেই গচ্চা দিয়েছি। বাড়িতে কিছু বলতে পারিনি লজ্জায়। গিন্নি তাহলে এক হাত নেবেন। অমন

ফাসক্লাস ট্যাংরা মাছের স্বাদই পেলাম না সেদিন।

দীপকের মনে রাগ জমে। বলে, লোকে তো ভুল বলেনি। সামনের বুক পকেটে বেশি টাকা রাখে কেউ? তার উপর ভিড় বাজারে! তা এটা জানাতে আমায় এখন টেনে আনলেন? বিকেলে বললে হত না? এই সামান্য ব্যাপার। আমার দুপুরের ঘুমের বারোটা—

ও সামান্য ব্যাপার? ফুঁসে ওঠেন সম্পাদক, আমারও যে দুপুরের ঘুমটা গেল! এত হেনস্তা হল! সেটা বুঝি কিছু নয়? বটে! 'বঙ্গবার্তা'র সম্পাদকের পকেটে হাত দেয় বোলপুরের পকেটমার! ভেবেছে কী?

আহা, ওরা সবাই কী আর চেনে আপনাকে? এটা ওদের প্রফেশন। এমন সোজা শিকার পেয়েছে—

চেনে না বলছ? বেশ এবার ওদের চিনতে বাধ্য করব। বোলপুরের সব পকেটমারদেরর।

কত গেছে? জানতে চায় দীপক।

আড়াই শো। টাকাটা বড় কথা নয়। কিন্তু প্রেস্টিজ? কেন আমি একবার লিখিনি বঙ্গবার্তায় পকেটমারদের নিয়ে? লিখিনি, আরও অনেক অপরাধীর মতো কেউ জন্মেই পকেটমার হয় না। অভাব আর আরও নানা পরিস্থিতির কারণে ছেলেবয়সে এই লাইনে আসতে বাধ্য হয়। ক্রমে তারা মার্কামারা পকেটমার হয়ে যায়। পরে ইচ্ছে হলেও আর সৎভাবে রোজগারের উপায় খুঁজে পায় না। মনে আছে, লেখাটায় আমি কত সমবেদনা জানিয়েছিলাম পকেটমারদের। সিমপ্যাতি। মনে আছে, কতকগুলো ঠিকানা ছাড়া চিঠি এসেছিল দফতরে। খুব সম্ভব পকেটমারদের কাছ থেকে আমায় ধন্যবাদ জানিয়ে। আর আজ এই প্রতিদান? অকৃতজ্ঞ।

রাগে কুঞ্জবিহারী গোদা হাতে দুম করে এক কিল মারেন টেবিলে। টেবিলের কাগজপত্রের তাড়া অর্ধবঘৎটাক লাফিয়ে উঠে ফের চিৎপাত হয় টেবিলে।

কুঞ্জবিহারীর গমগমে উত্তেজিত কণ্ঠ এবং কিলের শব্দে ব্যাপার কী ঘটছে জানতে কৌতূহলী বৃদ্ধ কম্পোজিটার হরিবাবু দরজার কপাট একটু ফাঁক করে উঁকি মারেন।

কী চাই? সম্পাদক তেড়ে ওঠেন।

না মানে...তোতলান হরিবাবু।

ডোন্ট ডিসটার্ব। সিরিয়াস কাজের কথা হচ্ছে। গর্জে ওঠেন কুঞ্জবিহারী।

হরিবাবু সুড়ুৎ করে কেটে পড়েন।

শোন দীপক, আমি একটা প্ল্যান ভেবেছি। তোমায় ডেকেছি সেটা বলব বলে।

তা আমি আগেই আন্দাজ করেছি। মনে ভাবে দীপক। সে নিরীহ স্বরে বলে, কী প্ল্যান?

বোলপুরের পকেটমারদের বিরুদ্ধে আমি মহাসমরে নামতে চাই। যুদ্ধ। তবে হাতাহাতি নয়। আর হাতাহাতির ইচ্ছে থাকলেও ওদের পাচ্ছি কই? আমি লড়ব কলম দিয়ে। বঙ্গবার্তায় লিখে। বোলপুরের পকেটমারদের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রোপাগান্ডা করে। খুঁচিয়ে তুলব বোলপুরের থানা-পুলিশ, এম.এল.এ., পাবলিক সব্বাইকে। আগুনঝরা লেখার পর লেখার সঙ্গে থাকবে আরও হরেকরকম প্রোপাগান্ডা। এ কাজে তুমি হবে আমার প্রধান সহায়। এই জন্যেই ডেকে পাঠিয়েছি তোমায়। প্ল্যানগুলো বলছি একে একে। তুমিও সাজেস্ট করো কিছু মাথায় এলে—

পরের সপ্তাহে 'বঙ্গবার্তা'য় সম্পাদকীয় লেখা বেরুল বোলপুরের পকেটমারদের বিরুদ্ধে। হেডিং বড় বড় অক্ষরে : সাবধান সাবধান। নীচে : ইদানীং বোলপুর শহরে পকেটমারের উপদ্রব ভীষণ বেড়েছে। পকেটমারদের স্বর্গরাজ্য পরিণত হয়েছে বোলপুর। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে যে আশপাশের অঞ্চল থেকেও বহু পকেটমার বোলপুরে এসে জুটেছে বেশি রোজগারের ধান্দায়। তার সঙ্গে স্থানীয় পকেটমাররা তো রয়েছেই। বোলপুরের নিরীহ সৎ বাসিন্দাদের পকেটের টাকার কোনও নিরাপত্তা নেই আজ...ইত্যাদি ইত্যাদি—

এর সঙ্গে যোগ হল, অভিনব পোস্টার প্রচার। সেই দিন থেকেই। পোস্টারগুলো তিন-চার দিন ধরে দীপক লিখেছিল বাড়িতে বসে। তার ভাইপো ছোটন আর ভাইঝি ঝুমা ছিল এ কাজে তার সহকারী বড় বড় সাদা কাগজে দীপক পেনসিলে লিখে দিয়েছিল পোস্টারের ভাষা। ছোটন-ঝুমা দু'জনেই মহা উৎসাহে লেখায় রং দিয়েছে। ছোটন পড়ে ক্লাস টেন-এ। আর ঝুমা এইটের ছাত্রী।

খবরদার। পোস্টার লাগানোর আগে এ খবরটা বাইরে ফাঁস করবি না। দু'জনকেই সাবধান করে দিয়েছিল দীপক।

ছোটন খুঁতখুঁত করে, সব গদ্যে। জানো কাকু, আমাদের ক্লাসের পরিমল স্বভাব-কবি। ইস্কুল ম্যাগাজিনে ওর কবিতা বেরোয়। যে কোনও বিষয়ে ও ঝপাঝপ চার-ছ'লাইন ফাসক্লাস কবিতা লিখে দিতে পারে। পরিমলকে দিয়ে কয়েকটা পদ্যে পোস্টার লেখালে কেমন হয়?

দীপক ভেবে বলে, মন্দ হয় না। কিন্তু তোদের পরিমল এখুনি সবাইকে রটিয়ে দেবে না তো ব্যাপারটা? তাহলে চমকটাই নষ্ট হবে।

না না, ও আমার ভীষণ বন্ধু। বারণ করে দিলে কাউকে বলবে না এখন।

বেশ, কটা লিখিয়ে আন পরিমলকে দিয়ে।

সেই দিনই বিকেলে ছোটন পরিমলের থেকে দশটা স্যাম্পল এনে হাজির করল। দীপক পড়ে দেখল যে ছন্দে মাঝেসাঝে কিছু গড়বড় আছে। তবে চলে যাবে। সে দুটো ছড়া বেছে নিল।

এক : এক পকেটে সব টাকা নয়
পকেটমারের সুবিধে হয়।

দুই : মা-বোনেরা জানুন
কাঁধ ব্যাগেতে বেশি (টাকা)
রাখার অভ্যেসটা ছাড়ুন।
কেটে নিলে ব্যাগের ফিতে
টাকার শোকে ঘুম হবে না রাতে।

যেদিন 'বঙ্গবার্তা'য় বোলপুর শহরে পকেট মারার উপদ্রব নিয়ে প্রথম সম্পাদকীয়টা বেরুল, সেই দিনই বোলপুরের লোক হতচকিত হয়ে গেল শহরের নানা জায়গায় পকেটমার থেকে সতর্ক করে অভিনব সব পোস্টার দেখে।

পোস্টার লাগানোর জন্য জনবহুল স্থানগুলিই বেছে নেওয়া হয়েছে। যেমন—রেল স্টেশন। বাস টার্মিনাস। সিনেমা হল। হাসপাতাল। পোস্ট অফিস। ব্যাঙ্ক। চৌরাস্তার মোড়। বাজারে

ঢোকার পথ। যেখানে মোটা টাকা পকেটে লোকের ভিড় হয় বেশি।

বোলপুরের জনসাধারণ তো প্রথমে থ। এর সঙ্গে সেই দিনে প্রকাশিত বঙ্গবার্তার অগ্নিবর্ষী সম্পাদকীয় পড়ে সারা শহরে তুমুল আলোড়ন জাগে। কাজও হল সঙ্গে সঙ্গে। সবাই সাবধান হয়ে যায় পকেটমারের বিপদ সম্পর্কে। লোকে ঘুরে ঘুরে পড়তে লাগল পোস্টারগুলো।

বেশিরভাগ পোস্টার দেওয়ালে সাঁটা। কিছু ঝুলছে গাছের ডালে বা অন্য উঁচু জায়গায়। সেগুলো শক্ত পিচবোর্ডে আটকানো। এ তো অনেকের কীর্তি। কারা? উদ্দেশ্য কী?

কিছু লোক জানাল যে ভোর রাতে কয়েকজন অল্পবয়সি ছেলেকে তারা ঘুরতে দেখেছে পথে, বগলে কাগজের বান্ডিল হাতে আংটাওলা বড় টিনের কৌটো ঝুলিয়ে। তারাই লাগিয়েছে। কৌটোয় আঠা ছিল নিশ্চয়।

ছেলেগুলো তো ভাড়া করা কিন্তু এদের লাগাল কে বা কারা? তাই নিয়ে জোর গবেষণা চলে। তবে সেদিন প্রকাশিত বঙ্গবার্তার সম্পাদকীয় পড়ে খানিক আন্দাজ পায় পাবলিক। বলাবলি করে—যদি বঙ্গবার্তার তরফ থেকে এই কাজ হয়ে থাকে খুব ভাল। উদ্দেশ্য মহৎ। জনসাধারণকে বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়াই তো আদর্শ সাংবাদিকের কর্তব্য।

'বঙ্গবার্তা'র ওই সংখ্যার বিক্রিও যায় বেড়ে।

পরদিন সকালে কিন্তু দেখা গেল যে পকেটমার সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া সমস্ত পোস্টার হয় উধাও কিংবা তাদের বেশি অংশই ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। ফের হইচই শুরু হয় বোলপুরে। এ কাদের কীর্তি? নির্ঘাৎ পকেটমারদের। পোস্টার লাগানোতে যে কাজ হয়েছিল তার চাইতে বেশি কাজ হয় পোস্টার সরিয়ে ফেলার চেষ্টায়। পোস্টারগুলোর সাবধানবাণী আরও দাগ কাটে লোকের মনে।

দীপক ছোটন আর ঝুমাকে নিয়ে লেগে যায় আর এক প্রস্থ পোস্টার বানাতে। তিন দিন পরেই নতুন পোস্টারে ছয়লাপ হয় বোলপুর শহর। পুরনোগুলো ছাড়াও কয়েকটা নতুন সাবধানবাণীর আবির্ভাব হয়।

আবার খোয়া যায় পোস্টার কিন্তু আগেরবারের চেয়ে কম। ওই ছিন্ন বা উধাও পোস্টারগুলি অচিরেই নতুন কলেবরে ফিরে আসে। এরপর বুঝি হাল ছেড়ে দেয় পকেটমাররা। তবে সব পোস্টার কি আর যত্নে রইল? কিছু খেল গরুতে। কিছু ছিঁড়ে নিল পুরনো কাগজবিক্রিরা। তবে বেশি নষ্ট হয় না।

আর একটা বুদ্ধি করেছিল দীপক। একজন বেকার ছেলেকে লাগিয়েছিল, পিঠে একখানা পিচবোর্ডে সাঁটা পোস্টার ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে ভিড়ের জায়গায়, জনবহুল পথে পথে সকালে এক ঘণ্টা। রেট দশ টাকা। লেখাটা সাদাসিধে কিন্তু মোক্ষম— পকেটমার হইতে সাবধান।

পোস্টারবাহী রেস্ট নিতে বসতে পারে কোথাও, যেখানে প্রচুর লোকের আনাগোনা। তবে খাড়া বসবে, যাতে পোস্টারখানা লোকের নজরে পড়ে।

তা প্রথম দিনেই আধঘণ্টার ভিতর কেউ টুক করে কেটে নিল পোস্টার পিঠ থেকে। এরপর দীপক নির্দেশ দিল যে পিঠে নয়, বুকে ঝোলাবে। তাহলে কাটতে পারবে না পোস্টার।

পরের সপ্তাহে ফের জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় বেরুল 'বঙ্গবার্তা'য় পকেটমার থেকে সাবধান করতে। সংখ্যা হিসেব করে দেখানো হল যে জনসাধারণের সচেতনতার ফলে সাত দিনেই

পিকপকেটিং অনেক কমে গিয়েছে। প্রায় অর্ধেক।

সব মিলিয়ে যথেষ্ট কাজ হল। কুঞ্জবিহারী মহা খুশি। দীপককে বললেন, জান কত চিঠি এসেছে পাবলিকের কাছ থেকে আমাদের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে। স্বয়ং এম.এল.এ এসে আমায় কনগ্র্যাচুলেশনস জানিয়ে গিয়েছেন। বলেছেন, আগামী ইলেকশনে তাঁর জন্যে পোস্টারের ভাষা ঠিক করার ভার আমায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন।

ও, সব পোস্টারের ভাষা বুঝি কেবল আপনি ঠিক করেছেন? দীপক ক্ষুব্ধ।

আহা চটছো কেন? তোমার কথাও বলেছি এম.এল.এ.-কে। কুঞ্জবিহারী দীপকের মান ভাঙান। জান দু'সপ্তাহেই 'বঙ্গবার্তা'র বিক্রি অনেক বেড়েছে। তোমায় কিছু বোনাস দেব আজই।

বোনাস! খুশি হয় দীপক। বেশ, ছোটন আর ঝুমাকে ভাগ করে দেয় টাকাটা। কম খেটেছে দু'জনে?

লোকাল থানাও নড়েচড়ে বসে। সেপাইদের উপর দারোগাবাবুর হুকুম হয়, যত চেনা পকেটমার আছে চোখে চোখে রাখ।

এ তো ভালর দিক। এই পকেটমার বিরোধী আন্দোলনের ফলে ঝুটঝামেলাও হচ্ছিল বিস্তর।

ঠেসাঠেসি ভিড় বাসে সহসা খ্যানখ্যানে গলা শোনা গেল, কী দাদা বারবার গায়ে ঢলে পড়ছেন কেন সাজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না?

সমান তেজে উত্তর হয়, ঢলাঢলি আপনি কম কচ্ছেন না মশাই! আমার গায়ে ক'বার পড়লেন খেয়াল আছে?

কী করব? যা ঝাঁকুনি!

আমারও তো সেম প্রবলেম শুধু নিজেরটাই ভাবছেন কেন?

অন্য এক ভর্তি বাস। হঠাৎ চিৎকার একি, আমার বুক পকেটের উপর হাত কেন?

উত্তর হয় জোর গলায়, কারণ এগুচ্ছি। রড ধরছি। নামব। আপনার পকেট ঘেঁষে রড না ধরলে যে হুমড়ি খাব।

বেশির ভাগ দণ্ডায়মান প্যাসেঞ্জার এক হাতে তার পকেটের টাকা আগলাচ্ছে, অন্য হাতে মাথার কাছে রড ধরে ল্যাকপ্যাক করছে। টাল সামলাচ্ছে বাসের ঝাঁকুনিতে। দু'হাতে রড আঁকড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে যে ভরসা নেই।

ছোটন একদিন কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, কাকু আমার টাকা মেরে দিয়েছে পকেট থেকে। দু'টাকা। আইসক্রিম খাব বলে নিয়ে যাচ্ছিলাম।

কোন পকেট থেকে?

জামার বুক পকেট।

কী ভাবে মারল?

তা জানি না। একটা বড় ছেলে সামনে থেকে এসে ধাক্কা মারল। নিজেই মারল আবার আমায় ধমকাল, অ্যাই দেখে পথ চল। তার একটু বাদেই পকেটে হাত দিয়ে দেখি নোটটা নেই।

বুক পকেটে রাখিস কেন? প্যান্টের পকেটে রাখতে পারিস না?

প্যান্টের পকেটে রাখলে যে নোট দুমড়ে যায়। ফিরিওলা নিতে চায় না। প্যান্টের পকেটে আরও জিনিস ছিল। কয়েত বেল, আমচুর, টফি। চটচটে হয়ে যায় নোট।

দীপক আর কথা না বাড়িয়ে ছোটনকে দুটো টাকা দিয়ে বলল, ঠিক আছে এই নে। বুক পকেটে রাখবি না খবরদার।

আর একদিন ভবানী প্রেসের হরিবাবু কুঞ্জবিহারীকে গিয়ে নালিশ জানালেন করুণ মুখে, দেখেন কাণ্ড। মাত্র পাঁচটি টাকা নিয়ে বাজারে গিছলাম হাট করতে। মেরে দিল। আলু কিনে দাম দিতে পকেটে হাত দিয়ে দেখি নেই। গরিবের কী লোকসান!

কোন পকেটে রেখেছিলেন?

বুকের কাছে। ভিতরের পকেটে। সামান্য টাকা নিয়ে যাই বাজারে। কখনও তো মার যায়নি। সবাই জানে আমার অবস্থা। মোটা টাকার দিকেই তো নজর পকেটমারদের।

হুম। কুঞ্জবিহারী বুঝলেন ব্যাপার। প্রতিশোধ। বঙ্গবার্তায় পকেটমারদের বিরুদ্ধে জেহাদের কারণে। মালিককে সুবিধে হয়নি তাই কর্মচারীর উপর শোধ তুলেছে। তিনি নিজের গ্যাঁট থেকে পাঁচটি টাকা হরিবাবুকে দিয়ে বললেন, এই নিন। সাবধানে রাখবেন।

এরপরেই ঘটল এক চমকপ্রদ ঘটনা।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরছে দীপক। একটু নির্জন জায়গায় কেউ ডাকল, দাদা। ও দাদা।

দীপক ফিরে দেখে গুরুপদ। গুরুপদ সামন্ত। সে হেসে বলে, আরে আপনি! অনেক দিন বাদে দেখা। কেমন আছেন? বাড়ির খবর ভাল?

গুরুপদর মুখে কিন্তু খুশি ফোটে না। কেমন দেঁতো হেসে বলল, এই আছি কোনওরকমে। ভাল নয়।

কেন? কী হয়েছে?

কী করে ভাল থাকব? রোজগারপাতি নেই মোটে। আপনারা যা শুরু করেছেন। কেন দেশে কি আর প্রবলেম নেই? বড় বড় চুরি ডাকাতি হচ্ছে না বোলপুরে? মোটা মোটা ঘুষ নিয়ে যে লাল হয়ে যাচ্ছে মোটা মাইনের চাকুরেরা। সেসব বরবাদ। কেবল এই গরিব পকেটমারদের পিছনে লেগেছেন। এ কী অন্যায্য ব্যবহার! বলতে বলতে গুরুপদ রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠল।

দীপক থ হয়ে খানিক তাকিয়ে থেকে বলল, আপনি কি পকেটমার?

হ।

কিন্তু তখন যে বলেছিলেন ব্যবসা করেন। ডট-পেন সাপ্লাই।

ওটা সাইড-বিজনেস। খুব অল্প রোজগার হয়। এই বিজনেসটাই আসল।

দীপক অপ্রতিভ। কী বলবে? কথা খোঁজে।

দীপকের সঙ্গে গুরুপদ সামন্তর আলাপ হয় বছর পাঁচেক আগে। দীপক গুরুপদর একটা উপকার করেছিল সেই সূত্রে।

বোলপুর শহরে বছরে একবার বিনা পয়সায় চোখের ছানি অপারেশনের ক্যাম্প হয়। দু-তিন দিন ধরে চলে অপারেশন। কিছু ওষুধপত্রও দেওয়া হয় বিনামূল্যে। বোলপুর শহরের এবং আশেপাশের গ্রামের বহু গরিব মানুষ এই ছানি অপারেশনের সুযোগ নেয়। স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে হয় এটি।

বছর পাঁচেক আগে। এমনি ছানি অপারেশনের আয়োজন হয়েছে। পরের দিন থেকে শুরু হবে অপারেশন। দীপক 'বঙ্গবার্তা'র তরফ থেকে গিয়েছিল খবরাখবর নিতে। সে প্রতিবারই যায় ওই ব্যাপারে রিপোর্ট করতে। এই কারণে ওখানকার কয়েকজন কর্মকর্তা ও চোখের ডাক্তারের সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে।

সেদিন দীপক কিছুক্ষণ ওখানে কাটিয়ে বেরিয়ে আসতেই গুরুপদ তাকে ধরে। করুণ স্বরে বলে, কাল থেকে এখানে ছানি অপারেশন হবে, তাই না?

হ্যাঁ।

আমার মায়ের চোখের ছানি অপারেশন করাব ভেবেছিলাম কিন্তু এরা বলছে আর পেশেন্ট নেওয়া যাবে না। লিস্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে। পরের বছর করাতে হবে। মার দুটো চোখেই ছানি পড়েছে বেশ। একদম ঝাপসা দেখে। কোনদিন হোঁচট খেয়ে আঘাত পাবে, ভয় হয়। অন্তত একটা চোখের যদি ছানি কাটা হত এ বছর!

দীপক দেখল যে লোকটি তারই বয়সি। রোগা। মাঝারি হাইট। শ্যামবর্ণ। অতি সাধারণ চেহারা। মুখে কাতর ভাব। আধময়লা জামাপ্যান্ট পরনে।

আপনি আগে থেকে নাম লেখাননি কেন? প্রশ্ন করে দীপক।

জানতাম না ডেটটা। দেরিতে জেনেছি। খুব আশা করে এসেছিলাম। যদি হয়—

আপনার বাড়ি কোথায়?

বোলপুরে। অনেকটা দূরে।

নাম?

আজ্ঞে গুরুপদ সামন্ত।

গুরুপদ ফের করুণ কণ্ঠে বলে, আপনার তো অনেক চেনা আছে এখানে। দয়া করে যদি এবার ব্যবস্থা করে দেন। নার্সিংহোমে রেখে অপারেশন করার সাধ্যি নেই আমার। আরও একটা বছর! মায়ের চোখের যা অবস্থা!

লোকটিকে দেখে, ওর কথা শুনে দীপকের মায়া হয়। বলে, কিছু খরচ তো আছে। ওষুধপত্র। তাছাড়া সেবা-যত্ন, ওষুধ দেওয়ার লোক চাই। অপারেশন করলেই শুধু হয় না।

আমার স্ত্রী আছে, সেবা করবে। বাকি খরচ জুটিয়ে নেব যাহোক করে।

দীপক ফের ভিতরে যায়। কর্মকর্তাদের বলেকয়ে গুরুপদর মায়ের কেসটা ঢুকিয়ে দেয় সেই বছরের অপারেশন লিস্টে। বঙ্গবার্তার রিপোর্টার। সেই কারণে তাকে কিঞ্চিৎ খাতির করেন কর্মকর্তারা।

এরপর গুরুপদর সঙ্গে দীপকের দেখা হয়েছে বড়জোর পাঁচ-সাতবার। কখনও পথে চলতে চলতে, কখনও বা বাসে। গুরুপদই যেচে কথা বলেছে, কেমন আছেন দাদা? বয়সে কিছু বড় হলেও গুরুপদ দীপককে দাদা বলে সম্বোধন করত।

আপনার মায়ের চোখ কেমন?

ভাল। পরের বছর আর একটা চোখও অপারেশন করিয়ে নিয়েছি ওখান থেকে। ওঃ, আপনি যা উপকার করেছিলেন সেবার!

তবে এমনি দু-চার কথা। ঘনিষ্ঠতা জন্মায়নি। বছরখানেক সাক্ষাৎ হয়নি তাদের। আজ এই দেখা।

গুরুপদর উত্তেজিত অভিযোগে প্রথমটায় থতমত খেয়ে যায় দীপক। তারপর বলে, দেখুন বোলপুরের পকেটমারদের বিরুদ্ধে এই জেহাদ কিন্তু আমার নয়। 'বঙ্গবার্তা'র সম্পাদকের পলিসি। আমি 'বঙ্গবার্তা'র রিপোর্টার। তাই ওঁকে সাহায্য করছি।

জানি জানি। কিন্তু উনি এই কাণ্ড শুরু করলেন কেন?

কারণ আছে। দীপক বোঝায়, উনি পকেটমারদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে লিখেছিলেন বঙ্গবার্তায়। আর ওঁরই কিনা পকেট মেরে দিল বাজারে! এটা কি উচিত কাজ হয়েছে? সম্পাদকমশাই তাই খেপে গিয়েছেন।

হুম। খুব অন্যায় হয়েছে জানি। গম্ভীর হয়ে বলে গুরুপদ। একটা ছোকরার কাজ। এ লাইনে নতুন এসেছে। চিনত না সম্পাদককে। আমাদের ইউনিয়ন লিডার ছেলেটাকে আচ্ছা করে কড়কে দিয়েছে। শাস্তি দিয়েছে।

অ্যাঁ! আপনাদের ইউনিয়ন আছে?

আছে বইকি। কাদের নেই? লিডারই পাঠাল আমায় আপনার কাছে, একটা মিটমাট করতে। কী করতে হবে বলুন? ক্ষমা চাইব? টাকা ফেরত দেব? কী বলেন উনি? আপনি প্লিজ একবার আলোচনা করে জানান আমাকে। কী শর্ত? এভাবে বেশি দিন চললে যে মারা পড়ব। রোজগার নেই মোটে।

এ লাইন ছাড়তে পারেন না?

ইচ্ছে তো আছে ষোলো আনা। পারছি কই? অন্য হাতের কাজ তো জানি না। তালেগোলে এ লাইনে এসে পড়েছি। বোলপুরের অনেক পকেটমারেরই এই অবস্থা। কয়েকবার চাকরি নিয়েছি। জানাজানি হতেই ছাড়িয়ে দিয়েছে, এমন দুর্ভাগ্য। স্ত্রীও পেড়াপেড়ি করে যাতে এ লাইন ছেড়ে দিই। একটা অন্য সৎ ব্যবসা ভেবেছি। কিছু পুঁজি দরকার। জমলেই ছেড়ে দেব এ লাইন। ছেলে-বউয়ের প্রেস্টিজের ব্যাপার। কিন্তু আপাতত উদ্ধার করুন দাদা। পুঁজি জমতে তো লাগবে কিছু দিন। ওঃ, আমার লাকটাই খারাপ। আজই তো ভেবেছিলাম এবার উদ্ধার পাব। অতগুলো টাকা। সব ভন্ডুল হয়ে গেল। গুরুপদ কপাল চাপড়ায়।

কেন? কী হয়েছিল? দীপক কৌতূহলী।

অদ্ভুত কেস। আজ সকালে উদ্ধারণপুরের বাসে আসছি বোলপুর। বেশ ভিড় বাসে। একজনের পকেট সাফ করে দিলাম। হাতে ছুঁয়েই বুঝেছিলাম বড় নোট, অনেকগুলো লোকটা কিস্সু টের পায়নি। টাকাগুলো হাতে নিয়েই আমার অ্যাসিসট্যান্টের কাছে চালান করে দিলাম। সে টুক করে নেমে গেল পরের স্টপে। লোকটা নামল আমি নামার আগের স্টপেজে। আমি ঠায় নজর রাখছি লোকটাকে। আশ্চর্য ব্যাপার। লোকটা বাস থেকে নেমেই একবার নিজের শার্টের বুক পকেটের উপর হাত রেখে থমকে দাঁড়াল। কয়েক সেকেন্ডে থেমে আবার সে হাঁটতে শুরু করল নির্বিকার ভাবে। যেন কিছুই হয়নি। পরে অ্যাসিসট্যান্টের থেকে টাকাগুলো পেয়ে দেখি পাঁচশো টাকার দশখানা নোট। কী বলল দাদা, দারুণ ফুর্তি হয়েছিল। অ্যাসিসট্যান্টকে ভাগ দিয়েও মোটা লাভ থাকছে। তারপর কেমন খটকা লাগল। নোটগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখি সব জাল নোট। ভাগ্যিস ভাঙাতে যাইনি।

অ্যাঁ, জাল নোট!

হ্যাঁ। নোট আমি খুব চিনি। চট করে দেখলে বোঝাই যাবে না। পাকা হাতের কাজ।

দীপকের মাথায় চকিতে একটা চিন্তা খেলে। সে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে, লোকটাকে চেনেন? যার টাকা মেরেছিলেন।

হুঁ চিনি। মানে আলাপ নেই তবে দেখেছি আগে। বোলপুরের লোক নয়। সেলসম্যানের কাজ করে ছোটখাটো কোম্পানির। মাস দুই বাদে বাদে আসে বোলপুরে। ওঠে যোগমায়া হোটেলে বছর দুই ধরে দেখছি আসতে। বর্ধমানের দিক থেকে আসে ট্রেনে। বোলপুর শহরে আর আশপাশে ঘোরে।

লোকটা এখনও আছে?

আছে বোধহয়। আজ বিকেলেই ওকে দেখেছি একটা দোকান থেকে বেরুতে।

আর বেশি কথা না বাড়িয়ে দীপক বলে, আচ্ছা চলি। কাল খোঁজ নেবেন একবার আমার বাড়িতে সন্ধের সময়।

গুরুপদ ফের অনুনয় জানায়, কুঞ্জবাবুকে বলবেন প্লিজ আমাদের প্রবলেম।

দীপক সোজা গেল ভবানী প্রেসে। ভাগ্য ভাল কুঞ্জবিহারী ছিলেন অফিসে। দীপক সম্পাদকের সামনে বসেই বলে, আচ্ছা আচ্ছা, এই পকেটমারদের বিরুদ্ধে অভিযান কি চালিয়েই যাবেন? অনকে দিন তো হল।

কেন? সম্পাদক যেন রুষ্ট।

মানে দেশে, বোলপুরে আরও কত ইম্পর্ট্যান্ট প্রবলেম আছে। পকেটমাররা তো আচ্ছা টাইট খেয়েছে।

আরও টাইট দেব। বেইমান।

ওরা ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত। ও একটা চ্যাংড়ার কাজ। তাকে ওরা খুব শাসন করেছে।

তুমি জানলে কীভাবে?

ওদের একজনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ওরা অনুতপ্ত। অনেকেই এ লাইন ছেড়ে দিতে চায় অন্য কাজ পেলে, পেট চালাবার মতো। পাচ্ছে না।

কতজন?

তা দশ-বারো জন।

অতজনকে তো আমি কাজ দিতে পারব না। দু-একজনকে জুটিয়ে দিতে পারি আপাতত। পরে আস্তে আস্তে। অবশ্য যদি সৎ পথে থাকে। সে সব পরে ভাবা যাবে। আরও কিছু দিন টাইট দিই ব্যাটাদের।

হঠাৎ দীপক সুর নামিয়ে বলে, জানেন একটা দারুণ ক্লু পেয়েছি জাল নোটের ব্যাপারে।

কুঞ্জবিহারী খাড়া হয়ে বসে বলেন, অ্যাঁ, কী?

দীপক প্রথমে জানায় গুরুপদর প্রস্তাব, তারপর জানায় জাল নোট বৃত্তান্ত। কাহিনি শেষে বলে, লোকটা নিশ্চয় জানত যে নোটগুলো জাল। তাই পকেটমার হয়েছে বুঝেও ব্যস্ত হয়নি, হইচই করেনি। বোলপুরে তো বছরখানেক ধরে জাল নোট ঢুকছে খুব। এ নিয়ে আপনি লিখেওছিলেন বঙ্গবার্তায়। মনে হয় ক্লুটা যদি—

হুম! আমারও তাই মনে হচ্ছে। চলো, এক্ষুনি থানায় যাই। সম্পাদক উঠে পড়েন।

আচ্ছা, পকেটমারদের কেসটা কি একটু কনসিডার করবেন? ওদের থ্রু দিয়েই তো এই ক্লুটা।

সে পরে ভাবব। চলো চলো—

দীপককে প্রায় টানতে টানতে কুঞ্জবিহারী বেরিয়ে গেলেন।

সেই রাতেই যোগমায়া হোটেল থেকে পুলিশ গ্রেফতার করল কমল ওরফে কামালকে। তার কাছে পাওয়া গেল পাঁচশো টাকার প্রচুর জাল নোট। জাল নোট তৈরি ও পাচার সম্বন্ধে ভাল একটা সূত্র পেল পুলিশ।

পরদিনই জাল নোট নিয়ে একটা স্পেশাল সংখ্যা বের করল 'বঙ্গবার্তা'। অন্য সংবাদপত্রগুলো খবরটা পেল কিছু দেরিতে। এটা অবশ্য দারোগাবাবুর সঙ্গে চুক্তি করে নিয়েছিলেন কুঞ্জবিহারী। হু হু করে কাটতি হল স্পেশাল সংখ্যা বঙ্গবার্তার।

কয়েকদিন বাদে। গুরুপদকে সঙ্গে নিয়ে সম্পাদকের কামরায় ঢুকল দীপক। রাশভারী কুঞ্জবিহারীর সামনে বসে গুরুপদ জড়সড়।

বাজখাঁই গলা যথাসম্ভব নামিয়ে, গুরুপদর দিকে চোখ পাকিয়ে কুঞ্জবিহারী বললেন, হুম, দীপকের মুখে শুনেছি সব। অলরাইট। আপাতত বোলপুরের পকেটমারদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা বন্ধ রাখতে পারি কিন্তু আমার কয়েকটা শর্ত আছে। কনডিশন।

আজ্ঞে, কী? ক্ষীণ কণ্ঠে বলে গুরুপদ।

ভবানী প্রেস বা 'বঙ্গবার্তা'র কোনও স্টাফের পকেট মারা চলবে না। তাদের বাড়ির লোকেরও নয়।

আজ্ঞে তাই হবে। সম্মতি জানায় গুরুপদ।

কোনও ছোট ছেলে-মেয়ে কিংবা কোনও গরিব মানুষের পকেট মারা চলবে না।

আজ্ঞে গরিব-বড়লোক ধরা বেশ মুশকিল। গুরুপদ মিনমিন করে, অনেক পয়সাওলা লোক এমন ময়লা সস্তা ড্রেস পরে থাকে।

ঠিক আছে, পরে জানতে পারলে তখন ফেরত দেবে।

ফেরত? কী ভাবে? তখন পুলিশে ধরবে যে।

অলরাইট। তাহলে 'বঙ্গবার্তা'র পোস্ট বক্সে টাকাটা ফেলে দেবে একটা খামে ভরে, চিরকুটে লিখবে কার টাকা। আমি ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করব।

আজ্ঞে তাই হবে যদি জানতে পারি। গুরুপদ রাজি।

হ্যাঁ, কেউ যদি পকেট মারার লাইন ছেড়ে অন্য অনেস্ট লাইনে আসতে চায় আমি যথাসাধ্য সাহায্য করতে প্রস্তুত।

ধন্যবাদ স্যার। অনেকে ধন্যবাদ। গদগদ গুরুপদ টেবিলের নিচে ঝুঁকে কুঞ্জবিহারীর পা হাতড়ায় প্রণাম করার জন্য।

আরে আরে করেন কী? কুঞ্জবিহারী চেয়ারে পা তুলে নিয়ে হাঁক ছাড়লেন প্রেসের পিয়নের উদ্দেশে, নাড়ু। তিন কাপ চা আর বিস্কুট আনো। চটপট।

বাসে মা কালী

সকাল নটা নাগাদ।

চলেছে মফস্বলের বাস। আজ সামনে কোথাও হাট বসেছে। বাসে ভিড় বেশ। অনেকেই দেখলাম, বাসের ভিতরে ঢোকার চেয়ে ছাদে ওঠাই বেশি পছন্দ করে। কয়েকজন বৃদ্ধা লেডিস সিট খালি থাকতেও মেঝেতে বসল। কন্‌ডাকটার তাদের ওঠাবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না।

—না বাবা পড়ে যাব। বড্ড ঝাঁকুনি। এক বৃদ্ধা কাতরস্বরে জানায়।

মেঝেতে বসা এক বুড়ির কোলের কাছে একটি জড়সড় ছাগলছানা। কয়েকজন স্কুলের ছাত্র চলেছে হাতে বই-খাতা। নানা সরস মন্তব্যে তারা জমিয়ে রেখেছে বাস। আমি দাঁড়িয়ে আছি মাঝামাঝি জায়গায়।

হঠাৎ হই হই শুনে মুখ ফিরিয়ে চমকে গেলাম। দেখি যে স্বয়ং মা কালী বাসে উঠছেন। প্রথমে বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। তারপরেই বুঝলাম ইনি বহুরূপী। একজন প্যাসেঞ্জার বলল, নারান বহুরূপী রে, হাটে যাচ্ছে সাজ দেখাতে। আগের হাটে সেজেছিল হনুমান। ছাত্ররা জয়ধ্বনি দিল, কালী মাই কি জয়!

দারুণ সেজেছে বটে লোকটা। মা কালীর মতনই গায়ের রং ঈষৎ চকচকে কুচকুচে কালো। বড় বড় টানা টানা লালচে চোখে রাগী চাউনি। টকটকে লাল লম্বা একটা নকল জিভ বিকট ভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে আছে মাথার ঘন কালো চুলের রাশ কোমর অবধি নেমেছে আর সব ঠিকঠাক। মানে আমরা যেমন ক্যালেন্ডারের ছবিতে বা পুজো মণ্ডপে কালী মূর্তি দেখি। চট করে খুঁত ধরা যায় না। দু কাঁধে দুটো কাঠের হাত উঁচু করে লাগানো। তার একটায় মুঠিতে ধরা ঝক্‌ঝকে টিনের খাঁড়া উচিয়ে রয়েছে। তলার হাত দুটো আসল। তারই একটা দিয়ে বাসের রড আঁকড়ে মা কালী স্থির হয়ে দাঁড়ালেন চলন্ত বসের ঝাঁকুনিতে তাঁর গলায় ঝোলানো কাঠের বলের ওপর আঁকা নরমুণ্ডের মালায় ঠকাঠক শব্দ হতে থাকে।

বাসে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেল।

এক বুড়ি ঢিপ করে মায়ের পায়ের কাছে এক পেন্নাম ঠুকল। একটা বাচ্চা ছেলে মাকে দেখে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল ভয়ে। দু'জন সাঁওতাল গভীর আলোচনা জুড়ে দিল মাকে নিয়ে।

—ইটা কি সত্যি ঠাকুর?

—ধুস্ ইতো সাজা ঠাকুর। দেখচিসনে চোকের পাতা পড়চে। বেটাছেলে কালী-মা সেজেছে।

দু'জনে ভিড় ঠেলে কাছে এসে মা-কালীর আপাদমস্তক ভালো করে দেখতে থাকে।

অন্য যাত্রীরা কিন্তু মা-কে একটু বাঁচিয়ে তফাতে দাঁড়াল। হয়তো হলেও নকল ঠাকুর-দেবতার গা ঘেঁষাঘেঁষি করা অস্বস্তিকর অথবা মায়ের গায়ের ওই ঘোর কালো রং পাছে তাদের জামা কাপড়ে লেগে যায় সেই আশঙ্কায়। ফলে বাসের ভিড়টা খানিক একপেশে হয়ে পড়ল।

একটি ছাত্র বলে ওঠে, মা একা কেন? বাবা বিশ্বনাথ কোথায়?

আর একজন ছাত্র ফুট্ কাটে, ও দিদিমা ছাগল সামলে। মা কচি পাঁঠা বড় ভালোবাসেন।

—যতসব অলুক্ষণে কথা। বলে, বুড়ি তার ছাগলছানাকে আঁকড়ে একটু সরে বসে। তার মাঝে মাঝে সন্দিগ্ধ চোখে দেখতে থাকে মা-কে।

মা-কালী ওরফে নারান বহুরূপী কিন্তু নির্বিকার।

হঠাৎ কন্‌ডাকটার এসে দাঁড়াল মা-কালীর সামনে এবং মায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, টিকিট।

শুনে বাসসুদ্ধু লোক অবাক। মায়ের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই, উদাস ভাবে বাইরে তাকিয়ে আছেন।

একজন ছাত্র টিপ্পনী কাটে, কি আস্পদ্দা দেখছিস? দেবে যখন মা ঘ্যাচ করে ওর মুন্ডুটা উড়িয়ে তখন বুঝবে ঠ্যালা।

কন্‌ডাকটার গজগজ করতে লাগল, ফি হাটবার সঙ সেজে এই বাসে যাওয়া চাই। সেদিন বারণ করে দিলাম না প্যাসেঞ্জারদের অসুবিধে হয়। আবার ফ্রিতে যাবে। আবদার। কেন অন্য বাস কি নেই? বলি তিন মাইল পথ পায়ে হেঁটে যেতে পার না? পা ক্ষয়ে যাবে বুঝি? তাহলে ছাদে উঠবে, ভিতরে নয়। কই ভাড়া দাও—

মা-কালী নিরুত্তর।

—মা চটেছে রে। গেল মুন্ডু। একটি ছাত্র ওয়ার্নিং দিল।

আর একজন বলল, কন্‌ডাকটারের বিবেচনা দেখ? ছাদে উঠলে হাওয়ায় ড্রেস খুলে যাবে না?

একজন ছাত্র মন্তব্য করে, কী বুদ্ধি? মাকে হাতে পেয়েছে, কোথায় বর-টর চেয়ে নেবে, না মাত্র তিন টাকা ভাড়ার জন্যে ঘ্যানঘ্যান করছে।

কন্‌ডাকটার কিন্তু নাছোড়বান্দা। —কী কানে যে কথাই ঢুকছে না? হয় ভাড়া দাও, নয়তো সামনের স্টপে নেমে যেতে হবে। নইলে কিন্তু—

মা-কালী আড়চোখে দেখে নেয় কন্‌ডাকটারের ক্রুদ্ধ মুখখানা। নাঃ লোকটা আচ্ছা কাঠগোঁয়ার।

বাস থামে স্টপেজে। মা-কালী নামবার উদ্যোগ করলেন। অন্য যাত্রীর তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে তাঁর পথ করে দেয়। ঝুমঝুম ঘুঙুর বাজিয়ে, ঘাড়ের হাত দু'খানা খাঁড়া সমেত বাঁচিয়ে মা সাবধানে নামলেন বাস থেকে।

ছাত্রগুলো আওয়াজ ছাড়ল, কালী মাইকি জয়। বোম্ কা-লী।

বাস ফের চলল।

আবার হই হই। দেখি অনেক যাত্রী পিছনের জানলা দিয়ে, নীচু হয়ে কী জানি দেখছে। আমি ঘাড় নীচু করে উঁকি দিলাম।

দেখলাম যে পথের ওপর দাঁড়িয়ে মা কালী। আমাদের বাসকে ভেঙাচ্ছেন। মস্ত জিভ তো বের করাই ছিল, তার সঙ্গে আসল দু হাতের দুই বুড়ো আঙুল নাচিয়ে নাচিয়ে কলা দেখাচ্ছেন।

প্রাণের বন্ধু

বলু বলল, "গোপাল, চ' ক'দিন বেড়িয়ে আসি। এই বেলদা টু খড়গপুর চাকরি করতে করতে একেবারে হেজে গেছি। বছরখানেক কোথাও বাইরে বেরোতে পারিনি।"

গোপাল ঠাস করে ক্যাশবাক্সর ডালাটা ফেলে দিয়ে বলল, "ঠিক বলেছিস। উঃ, আমারও তাই অবস্থা। এই চা-টোস্ট-অমলেট সাপ্লাই করতে করতে জীবনে ঘেন্না ধরে গেল ভাই। তোর তো তবু রোববার ফাঁক, আমার তা-ও জোটে না। ঝাড়া দেড় বচ্ছর কোথাও বেড়াতে যাইনি। এই তো ভাগনের বিয়ে হল পাটনায়। বরযাত্রী যেতে কত ধরল। পারলাম না যেতে। সবাই কী এন্‌জয়টা করে এল, ওঃ! পাটনা থেকে টুক্ করে ঘুরে এল রাজগির নালন্দা।"

বাইরে তখন সন্ধ্যা নেমেছে। মৌচাক কেবিনের ভিতরে উজ্জ্বল আলোর নীচে গুলতানিতে মগ্ন অনেকগুলি খদ্দের। খানিকক্ষণ ব্যাজার হয়ে থেকে তেড়েফুঁড়ে উঠল গোপাল, "ব্যস, ফাইনাল। বেরোতেই হবে। কবে যাবি? তবে চার-পাঁচদিনের বেশি থাকা যাবে না রে। ব্যবসার এই ঝামেলা। নিজে না দেখলে? সবে দাঁড় করিয়েছি রেস্টুরেন্টটা।"

বলু বলল, "হুঁ, আমিও বেশি ছুটি পাব না। কোথায় যাওয়া যায় বল দেখি?"

দুই বন্ধু ঘাড় নিচু করে বসে, মাথার চুল খামচে গভীর চিন্তায় একটা জুতসই বেড়াবার জায়গা হাতড়াচ্ছে, কানের কাছে শোনা গেল খুদুর গলা, "বলুদা, পাঁচটা টাকা দাও তো। মানে লোন।"

"ধুততেরি আপদ। দিলে মুডটা নষ্ট করে, "বলু মুখ তুলে কটমটিয়ে চেয়ে বলল, "নেই।"

"ও, পাঁচ নেই? কত আছে?" জিজ্ঞেস করে খুদু।

"কিস্‌সু নেই। একটা পয়সাও নেই।" কড়া সুরে জানাল বলু।

হতাশভাবে মাথা নেড়ে খুদু বলল, "নো লাক। একটা জিনিস কেনার দরকার ছিল। যাক্‌গে, গোপালদা, এক কাপ চা খাওয়াও প্লিজ।"

"চা?" গোপাল অতি বিরস বদনে বলল, "একটু দেরি হবে কিন্তু জল ফুটতে।"

"তা হোক", বলুর পাশে তক্তপোশে গ্যাঁট হয়ে বসল খুদু।

খুদু বলুর জাঠতুতো ভাই। অতি চৌকস ছেলে। বলুর চেয়ে বছর-তিনেক ছোট। বি এ পাশ করে আর কিছু পড়ছে-টড়ছে না। রোজগারের ধান্দাও নেই। দিব্যি বাপের হোটেলে

কাটাচ্ছে। থাকে বাঁকুড়ায়। নাকি ও থিয়েটার নিয়ে বেজায় মেতে আছে। মাঝেমধ্যে আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে হানা দেয়। এবং যার কাছে যেমন পয়সাকড়ি মেলে হাতিয়ে নিয়ে যায়। খুদুর ভাষায় অবশ্য এসব হচ্ছে লোন। অর্থাৎ ধার। পরে সব শোধ করে দেবে। বলু চাকরি পাওয়ার পর ছ'মাসের মধ্যে খুদু এই দ্বিতীয়বার এল তার ঘাড় ভাঙতে। গতকাল বেলদায় পা দিয়েই সে বলুর থেকে দশ টাকা লোন নিয়েছে। তাই আজ বলু নাচার।

খুদু হাসি-হাসি মুখে বলল, "কী নিয়ে ভাবছিলে এত?"

গোপাল বলল, "ইচ্ছে আছে, দু'জনে বেড়াতে যাব কয়েকদিন। তাই ভাবছিলাম কোথায় যাওয়া যায়।"

কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে খুদু বলল, "তা হলে ছোটকার কাছে যাও। ফাসক্লাস জায়গা। শুধু যাওয়া-আসার যা খরচ। বাকি সব ফ্রি।"

"ছোটকাকার কাছে?" বলল বলু, "মানে সুন্দরগড়? ওড়িশার ভুবনেশ্বরের কাছে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। বিউটিফুল জায়গা। ছবির মতন। চারদিক পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট শহর। পাহাড়ের গায়ে জঙ্গল। ছোটকার গাড়ি আছে। যত খুশি ঘুরতে পারবে। আর কী খাওয়াদাওয়া! পেটে সইলে দু'বেলা মুরগি চালাও, নো আপত্তি।"

"সুন্দরগড়। হুম্। তুই গেছিস?" জিজ্ঞেস করে বলু।

"গেছি বই কি", খুদুর জবাব।

"কবে?"

"গত বছর পুজোর পর। ওইটেই আইডিয়াল সময়। দেখবে, এমন জমে যাবে আর ফিরতেই পারবে না।"

"আচ্ছা দেখি ভেবে', বলল বলু।

"ভাববার কিছু নেই", খুদু উৎসাহ দেয়, "ছোটকাকে চিঠি দিও। স্টেশনে গাড়ি পাঠাবে।"

বলু ভাবে, ছোটকাকা বছর-তিনেক হল চাকরি নিয়ে সুন্দরগড়ে গিয়ে চিঠিতে নানাজনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেখানে যেতে। সপরিবারে এবং সবান্ধবে। তাদের মধ্যে বলুর নামটাও আছে। খুদু বাদে আর কারওই বোধহয় সেখানে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। জায়গাটা নাকি খাসা। গেলে হয়। ছোটকা জমাটি মানুষ। তবে একটু-যাকগে, তাতে কী? খুদু তো ঘুরে এসেছে।

চা এল। দুই চুমুকে চা শেষ করে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল খুদু।

ইশারায় খুদুকে দেখিয়ে বলু বলল, "মহা চালু। এসেই ধারের মতলব।"

গোপাল বলল, "হ্যাঁ ভাই। আমার দোকানে কল ও চ-অমলেট খেয়ে গেছে বাকিতে। শোধ কি আর করবে? ভাবছি আর ধারে চাইলে দেব না।"

বলু বলল, "ঠিক, আর দিসনি ধারে। তবে ও সাজেস্‌শনটা মন্দ দেয়নি। সুন্দরগড়েই চল। দুর্গাপুজোর পরে।"

দুপুরে সুন্দরগড় স্টেশনে নামল বলু আর গোপাল। অনেকক্ষণ ট্রেনে চেপে তারা ক্লান্ত। তকতকে ছোট্ট স্টেশন। ভিড় নেই। খাকি উর্দি গায়ে একটি লোক কাছে এসে বলল, "ম্যানেজার চৌধুরিসাহাবের কোঠি যাবেন?"

"হ্যাঁ," জানায় বলু।

অমনি লোকটি সেলাম ঠুকে বলল, "আসুন। সাহাব গাড়ি পাঠিয়েছেন।"

পিচঢালা ফাঁকা পথে হুহু করে ছোটা মোটরে আরামে গা এলিয়ে, দূরে পাহাড়ের ঢেউ দেখতে দেখতে বলু ভাবল, ভাগ্যিস ছোটকার কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছিল খুদু।

বলুর ছোটকাকা নরেন্দ্র চৌধুরি স্থানীয় এক মস্ত সিমেন্ট কোম্পানির ম্যানেজার। বাগান ও সবুজ ঘাসের লনে ঘেরা বিরাট তাঁর কোয়ার্টার। ছোটকাকা তখন অফিসে। কাকিমা বলুদের অভ্যর্থনা জানালেন। পেট পুরে চর্ব্যচোষ্য আহারের পর দুই বন্ধু বড় একটা ঘরে দু'খানা খাটে নরম বিছানায় শুয়ে টেনে ঘুম দিল। যখন উঠল বিকেল গড়িয়ে গেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় যেতেই ছোটকার মুখোমুখি। সেখানে তিনি বেতের চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে বসে চা খাচ্ছেন। বলুদের দেখে হাঁক দিলেন, "কী রে, উঠেছিস। বেশ, বেশ। বোস, চা-টা খা।"

ছোটকার চেহারাটি মাঝারি লম্বা। গাঁট্টাগোট্টা। শ্যামবর্ণ। ভারী মুখখানা। ঘন ভুরুর তলায় গোল-গোল তীক্ষ্ণ দুই চোখ। এক চিলতে বাটারফ্লাই গোঁফ। বাজখাঁই গলা। যেমন তাঁর হাসির দমক, তেমনি ধমকের বহর। দুই-ই পিলে-চমকানো। বয়স সবে চল্লিশ পেরিয়েছে। এখানে শুধু থাকেন কাকা-কাকিমা। ওঁদের একমাত্র ছেলে দার্জিলিঙে। হস্টেলে থেকে পড়ে।

ছোটকাকে প্রণাম করে বসল বলু ও গোপাল। গোপালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। কেক প্যাস্ট্রি সহযোগে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলু বলল, "ছোটকা, জায়গাটা দারুণ। আমাদের বেড়াবার প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলো। কাল থেকেই ঘুরতে বেরোব।"

ছোটকা বললেন, "এত তাড়া কীসের?"

"মানে ছুটি নেই, মাত্র তিনদিন সময় হাতে।"

ছোটকা চোখ পিটপিট করে বললেন, "হুম্।" এ বিষয়ে আর তিনি উচ্চবাচ্য করলেন না। নানান খোশগল্প জুড়ে দিলেন। গতিক সুবিধের ঠেকল না বলুর। ছোটকার ওই চোখ পিটপিট করার মানেটা সে জানে। যখনই ওঁর মাথায় কোনও দুষ্টুবুদ্ধি খেলে, তার বাইরের লক্ষণ ওই চোখ পিটপিটুনি।

পরের দিনটা ছোটকার পাত্তাই পাওয়া গেল না। সকালে অফিসে গেলেন, ফিরলেন সন্ধ্যায়। বলু গোপাল আশপাশ হেঁটে-হেঁটে ঘুরে দেখল। রাতে খাওয়ার সময় ছোটকা প্রাণ খুলে গল্প জুড়লেন। তাঁর ছাত্র জীবনের হরেক কীর্তিকলাপের কাহিনি এবং মাঝে-মাঝে ছাদ কাঁপানো হাসি।

বলু এক ফাঁকে বলল, "কাকা, কাল বেরোচ্ছ তো আমাদের নিয়ে পাহাড় দেখতে?"

"কাল? ইম্‌পসিবল। কাল অফিসে আমার জরুরি কাজ আছে।"

"তা হলে গড়িটা দিও, কাকিমাকে নিয়ে আমরাই ঘুরে আসব।"

"ইম্‌পসিবল। তোর মতন হনুমানকে একা ছাড়ব? শেষে একটা ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসলে গোটা চৌধুরি-ফ্যামিলি আমায় দুষবে। দূরে গেলে আমার সবঙ্গে ছাড়া খবরদার বেরোতে পারব না।"

"তা হলে পরশু দিন প্রোগ্রাম করো।"

"দেখি", ছোটকার সঙ্গে গাড়িতে চেপে সত্যি-সত্যি কাছের পাহাড়টায় বেড়াতে যাওয়া হল। কাকিমাও গেলেন। অপূর্ব পরিবেশ। এলাহি খাবারদাবারের ব্যবস্থা এবং জমাট আড্ডায় খাসা কাটল দিনটা।

বাড়ি ফিরে বলু বলল, "কাকা, কাল আমরা যাচ্ছি।"

"কাল যাচ্ছিস মানে?" ছোটকা ভুরু কোঁচকান।

"আমার ছুটি যে শেষ।"

"ইম্‌পসিবল। এখনও দূরের পাহাড়টা দেখা বাকি। আর একদিন নদীর ধারে পিকনিক হবে।"

"না, না, পরশু আমার জয়েন করতেই হবে।"

"যা, যা, মেলা ফ্যাচফ্যাচ করিসনি। সরকারি কাজে দু-চার দিন বেশি কামাই করলে ঘোড়ার ডিম হয়।"

"না কাকা, আমায় যেতেই হবে। এখনও কনফার্মড হইনি। মুশকিলে পড়ব।"

"বলবি অসুখ করেছিল। ডাক্তারের সার্টিফিকেট আমি ম্যানেজ করে দেব।"

"আমার বস্‌ বিশ্বাস করে না। শেষে চাকরি চলে যায় যদি?" বলু আশঙ্কিত।

"অ্যাঁ, চাকরি নট হয়ে যাবে? অলরাইট, ব্যবস্থা করছি।" ছোটকা হাঁক দিলেন, "হরিশচন্দ্র, সেক্রেটারিবাবুকে বোলাও।

ছোটকাকার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট গোপীনাথ মহাপাত্র ম্যানেজারের বাংলোয় বসে তখনও কিছু কাজ করছিলেন। বেয়ারা হরিশচন্দ্র তাঁকে ডেকে আনল। গোপীবাবু এসে কাছে দাঁড়াতেই ছোটকা বলুকে লক্ষ করে গরগর করলেন, "তুই কত টাকা মাইনে পাস?"

"ছ'শো", জানাল বলু।

অমনি ছোটকা গোপীবাবুকে অর্ডার দিলেন, "একটা ছ'শো টাকার চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার রেডি করে রাখবেন। এই হতভাগা বলাই চৌধুরির যদি চাকরি যায় তা হলে আমাদের কোম্পানিতে এসে জয়েন করবে।"

থতমত গোপীবাবু ঘাড় নাড়লেন।

গোপাল মিনমিন করল, "আমার ব্যবসায় যে বড্ড ক্ষতি হয়ে যাবে। ভাইটাকে দেখতে বলে এসেছি। কিন্তু ওর কোনও দায়িত্বজ্ঞান নেই।"

"ও", ছোটকা গোঁফ নাড়তে নাড়তে গোপালকে বললেন, "তোমার ডেইলি লাভ কত?"

"তা টাকা তিরিশ-চল্লিশ হয়।"

"ঠিক আছে, তিন দিনের পর এখানে যদ্দিন বেশি থাকবে, ডেইলি চল্লিশ টাকা কমপেনসেশন পাবে। আর যদি ফিরে গিয়ে দ্যাখো ব্যবসা লাটে উঠেছে সোজা চলে আসবে এখানে। আমাদের কারখানায় তোমাকে ক্যান্টিন খোলার ব্যবস্থা করে দেব। লাভ ডেইলি পঞ্চাশ টাকার কম হবে না। ব্যস্‌, প্রবলেম সলভড্‌। থ্যাংক্যু মিঃ মহাপাত্র।"

গোপীবাবু হতভম্বভাবে বিদায় নিলেন।

বলু খানিক গুম মেরে থেকে বলল, "না, আমরা যাবই কাল। সে তুমি পারমিশন দাও আর না-ই দাও। স্টেশনে যেতে গাড়ি না দাও তো হেঁটেই যাব।"

"হুম্‌," চোখের পাতা বারকয়েক খোলা বন্ধ করে দুই বন্ধুকে একপ্রস্থ জরিপ করে নিয়ে ছোটকা উঠে গটগট করে চলে গেলেন।

গোপাল ভয়ে ভয়ে বলল, "কী হবে ভাই, কাকা যে চটে গেলেন?"

বলু তেজের সঙ্গে জবাব দিল, "চটুকগে। আমরা কাল যাবই। দুটো ট্রেন আছে। সকাল ন'টায় আর বিকেল চারটেয়। বিকেলের গাড়িটাই সুবিধে। খেয়েদেয়ে বেরুব। বুঝছি হেঁটেই যেতে হবে স্টেশন অবধি। অনেকটা পথ।

কিছুক্ষণ বাদে নিজেদের ঘরে ঢুকে বলু গোপালের চক্ষুস্থির। তাদের সুটকেস উধাও। আলনায় রাখা জামাপ্যান্ট উধাও, মায় জুতো-মোজা উধাও। চুরি হয়ে গেল নাকি? হরিশচন্দ্রের কাছে ছুটল তারা। হরিশচন্দ্র জানাল, "আজ্ঞে, জিনিস হারায়নি। সাহেবের হুকুমে আপনাদের সব মাল সাহেবের ঘরে আলমারিতে গুছিয়ে তুলে রেখেছি। খোদ সাহেব আলমারিতে চাবি দিয়েছেন।"

দু'জনে ছুটল ছোটকার কাছে।

মহা বিরক্ত ছোটকা বললেন, "মিছে কাউমাউ কচ্ছিস কেন? সমস্ত ফেরত পাবি যাওয়ার সময়", তারপর মিটিমিটি হেসে বললেন, "জোর করে যাবি বলেছিলি যে কেমন—যা এবার?"

বলু কাতরায়, "দোহাই কাকা, আমাদের পয়সাকড়ি না হয় তোমার কাছে থাক, কিন্তু জামাপ্যান্টগুলো অন্তত দাও, আর জুতো মোজা। এই ড্রেসে সব সময় থাকব কী করে?"

ছোটকা বললেন, "কেন, ড্রেসটা খারাপ কীসের? হাতকাটা গেঞ্জি, পাজামা আর রবারের চটি। গরমের দেশে আর কী চাই? নোংরা হলে ওই ড্রেসই ফরসা দেখে বের করে দেব।"

"কিন্তু বাড়ির বাইরে একটু হাঁটতে বেরুব কীভাবে?"

"ইচ্ছে হলে এই ড্রেসেই যাবি। লজ্জা লাগলে যাবিনে। হুঁ হুঁ চাঁদ, খুদুর বেলা ওই ভুল করেছিলুম, আর নয়। খুদুটাও বলেছিল, জামা কাপড় জুতো দাও প্লিজ, মাঝে-মাঝে একটু কম্পাউন্ডের বাইরে বেরোব। ব্যস, ক'দিন বাদে গোপীবাবুর থেকে পঁচিশ টাকা ধার করে ট্রেনে চেপে হাওয়া। ওর খালি কিট্‌ব্যাগটা পড়ে আছে। তোরা নিয়ে যাস। চা-ফা যা খেতে চাস বাড়িতে বলিস, বানিয়ে দেবে। আর ফুঁকতে-টুকতে চাইলে হরিশচন্দ্রকে বলিস, এনে দেবে দোকান থেকে। কিন্তু হাতে নগদ কিস্‌সু পাবিনে। আর সব্বাইকে অর্ডার দিয়ে দিয়েছি, কেউ যেন তোদের একটি পয়সাও ধার না দেয়। হ্যাঁ, শোন, কাল বাদে পরশু আমরা দূরের পাহাড়টায় যাচ্ছি। তারপর পিকনিকের প্রোগ্রামটা ঠিক করা যাবে। আচ্ছা, গুড নাইট।"

এইজন্যেই ছোটকার কাছে আসতে বলুর মন কিঞ্চিৎ খুঁতখুঁত করছিল। মানুষটি বড্ড খেয়ালি, এবং ফিচেল বুদ্ধির জন্য কুখ্যাত। অনেক বছর আগের কথা, তখন ছোটকা খড়্গপুরে থাকেন। নতুন কেনা মোটর-সাইকেলে চেপে একদিন বেলদায় এলেন। সবাইকে তাঁর বাইকে চড়াতে সাধাসাধি করতে থাকেন। বলুর দাদা কানু প্রথমে রাজি হয়নি, "না বাবা, তুমি নতুন শিখেছ, কোথায় ঠোক্কর মেরে দেবে।" মনে-মনে চটলেও ছোটকা তখন মুখে কিছু বলেননি। যা হোক, অন্যদের চড়তে দেখে কানুর ভরসা হল এবং সে ছোটকার মোটর-বাইকের পিছনে চাপল। পাঁচ-ছয় মাইল গিয়ে পথের ধারে বাইক থামিয়ে কানুর হাতে চার-আনা পয়সা দিয়ে ছোটকা বলেছিলেন, "যা, পান কিনে আন।" ছোটকা গাড়িতে বসে রইলেন।

কানু দোকানের দিকে দু'পা যেতে না যেতেই গর্জন করে চলতে শুরু করল ছোটকার গাড়ি। হতভম্ব কানুর উদ্দেশে তিনি চিৎকার ছুড়ে দিলেন, "বাসে ফিরিস। ঠোক্কর খাবার ভয় নেই।" তারপর সোজা খড়গপুর।

কাকিমার কাছে কাঁদো-কাঁদো বলু হাজির হল। কাকিমার যেমন রান্নার হাত, মানুষটিও তেমনি চমৎকার। তিনি বললেন, "মহা মুশকিল। এখানে গল্প করার লোক জোটে না, তাই কেউ বেড়াতে এলে ছাড়তে চায় না কিছুতেই। সেবার খুদুকেও পাঁচদিন বেশি আটকে রেখেছিল। খুদু যত বলে, থিয়েটার আছে, রিহার্শাল কামাই হচ্ছে, কানেই নেয় না। শেষে পালাল লুকিয়ে। দেখি বুঝিয়ে বলে, তবে আমার কথা কি আর শুনবে?"

পরশু দূরের পাহাড়ে বেড়াতে গেল সবাই। সারাদিন কাটল নির্জন পাহাড়-জঙ্গলে। এ-জায়গাটা আরও সুন্দর। পেটপুজোর আয়োজনও ছিল অতুলনীয়। কিন্তু অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনায় বলু ও গোপালের মনে তেমন রং ধরল না। ছোটকার অবশ্য দৃক্‌পাত নেই। হাসি-গল্পে তিনি একেবারে টপ ফর্মে।

ব্যাপার দেখে কাকিমার মনে ভারি কষ্ট হল। বলুকে গোপনে ডেকে বললেন, "শোন, কাল আমি তোদের সব জিনিস আর টাকা বের করে দেব, উনি অফিসে গেলে। লুকিয়ে পালা এখান থেকে। তবে সাবধান, বাড়ির আর কেউ যেন টের না পায়। সব ওঁর স্পাই। পরে তোর কাকা অবশ্য চোটপাট করবে আমায়, তা হোক।"

দুপুর দুটো নাগাদ দারোয়ান খেতে যায় ফটক ভেজিয়ে। তারপরই টুক টুক করে বেরিয়ে পড়ল বলু আর গোপাল। তাদের এক হাতে সুটকেস, অন্য হাতে জুতো, পরনে গেঞ্জি ও পাজামা। হনহনিয়ে খানিকটা গিয়ে ঝোপের আড়ালে চটপট জামাপ্যান্ট জুতো পরে স্টেশনের দিকে পা চালাল তারা। বিকেল চারটেয় ট্রেন। ছোটকা সাধারণত পাঁচটা-ছ'টার আগে অফিস থেকে ফেরেন না। অতএব এ-যাত্রা ফাঁড়া কাটল।

কেটে পড়ার আগে বলু এক কীর্তি করেছে। কাকার বাড়ির বাগান থেকে দুটি কাঁচকলা কেটে বড় একটা ঠোঙায় ভরে মুড়ে রেখে এসেছে মালির কাছে। বলেছে যে, সাহেব বাড়ি ফিরলে এই ঠোঙাটা দিও আমার নাম করে। ছোটকারই ভাইপো বটে। কেউ কম যায় না!

টিকিট কেটে দু'জনে বসে আছে স্টেশনে। ট্রেন আসতে আর মাত্র দশ মিনিট বাকি। খুশিতে গদগদ বলু জানাল, "ওঃ, কাঁচকলা দেখে ছোটকা যা খেপবে না?"

তার মুখের কথা শেষ হতে না-হতে এক পুলিশ-অফিসারের আবির্ভাব হল সামনে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা মিঃ বলাই চৌধুরি আর গোপাল পাত্র?"

"হ্যাঁ", জবাব দেয় বলু।

"আপনাদের এক্ষুনি একবার থানায় যেতে হবে," জানালেন অফিসার।

"কেন?" চমকে ওঠে দুজনে।

"আপনাদের বিরুদ্ধে চার্জ আছে।"

"কীসের চার্জ!"

"সেটা থানায় গেলেই জানতে পারবেন।"

"কিন্তু আমাদের যে ট্রেন মিস হয়ে যাবে তা হলে", বলু অনুনয় করে।

কঠোর মুখে মাথা নাড়ে ইন্সপেক্টর, "সরি, উপায় নেই।" তিনি ইঙ্গিত করতেই দুজন সেপাই এসে দাঁড়াল পাশে। অগত্যা দুই বন্ধু সুড়সুড় করে গিয়ে পুলিশের জিপে উঠল। গাড়িতে যেতে যেতে তাদের কানে এল ট্রেনের শব্দ।

দুর্ভাবনায় আধমরা বলু গোপাল পুলিশ ইন্সপেক্টরের পিছু-পিছু তাঁর কামরায় ঢুকেই থ। চেয়ারে জাঁকিয়ে বসে চুরুট ফুঁকছেন ছোটকা। তাদের দেখে তিনি মিচকে হেসে বললেন, "কী রে, পালাবি না? এবার কেমন?" তারপর দু'হাতের বুড়ো আঙুল তুলে জোড়া কাঁচকলা দেখলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে থানা-কাঁপানো অট্টহাসি।

থানার অফিসারের গাম্ভীর্যের মুখোশও খসে পড়ল। তিনি একগাল হেসে বললেন, "ওঃ, খুব ধরেছি স্যার। আর একটু দেরি হলেই ট্রেন এসে পড়ত।"

দুই বন্ধুকে বগলদাবা করে ছোটকা নিজের মোটরে উঠলেন। পথে একবার জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ রে, জিনিসপত্র ম্যানেজ করলি কী করে?"

বলুরা চুপ।

তখন উত্তরটা তিনি নিজেই দিলেন, "বুঝেছি, ঘরের শত্রু বিভীষণ।"

বাড়ি ফিরে জানা গেল ধরা পড়ার কারণ। একটা দরকারে সাড়ে তিনটের সময় হঠাৎ বাড়ি আসেন ছোটকা। সঙ্গে-সঙ্গে মালি তাঁর হাতে দেয় কাঁচকলার প্যাকেট। তৎক্ষণাৎ ব্যাপার বুঝে থানায় ফোন করেন কাকা, ফেরারিদের পাকড়াতে। ওই কাঁচকলাই সর্বনাশের মূল। নইলে তক্ষুনি ফের বেরিয়ে যেতেন ছোটকা। বলুদের খোঁজও করতেন না। গোপাল বলুর ওপর রেগে কাঁই, "তুই সব গুবলেট করে দিলি।"

বেচারা বলু গোপাল একেবারে নেতিয়ে পড়ল হতাশায়। ছোটকার খপ্পর থেকে আর বুঝি নিস্তার নেই। বাড়ি ফেরামাত্র তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। স্রেফ আগের হাল।

ওদের চাঙা করতে পরদিন নদীর ধারে সবাইকে নিয়ে পিকনিকে গেলেন ছোটকা। দুই বন্ধুকে দুটো দামি শার্ট প্রেজেন্ট করলেন। এবং কী আশ্চর্য, তার পরদিন স্বয়ং দুজনকে সকাল ন'টার ট্রেনে ঘরমুখো তুলে দিতে এলেন। স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছোটকা বললেন, "বলু, তোর অফিসের বস্ তো রঘু। মানে রঘুনাথ মুখার্জি। ও আমার ক্লাসফ্রেন্ড ছিল কলেজে। ওকে বলবি আমি তোকে জোর করে আটকে রেখেছিলাম, তাই দেরি হল। দেখবি ঠিক বিশ্বাস করবে। আমায় বিলক্ষণ চেনে কি না। হেঃ হেঃ।

"গোপাল, তোমায় বাপু বলে রাখছি এই ক'দিনে তোমার ব্যবসায় যা লোকসান হবে সবটা বিল করে আমায় পাঠিয়ে দিও ঠিক। ঋণ রাখা আমার স্বভাব নয়, বুঝেচ। অ্যাই বলু, খুদুর ফেলে যাওয়া ব্যাগটা নিয়েছিস তো?"

মরণ ভয়

সকাল দশটা।

বোলপুর শহর। ভবানী প্রেস। লম্বা প্রেস ঘরের এক কোণে কাঠের পার্টিশনে ঘেরা প্রেস মালিক এবং সাপ্তাহিক 'বঙ্গবার্তা'র সম্পাদকের কুঠুরির সুইংডোর ঠেলে ভিতরে উঁকি দিয়ে রিপোর্টার দীপক রায় বেশ অবাক হয়।

সম্পাদক শ্রীকুঞ্জবিহারী মাইতি সামনের টেবিলে দু'কনুইয়ে ভর রেখে দুই করতলে মাথা চেপে মুখ নামিয়ে বসে আছেন চেয়ারে। একা মধ্যবয়সি কুঞ্জবিহারী মোটাসোটা, শ্যামবর্ণ, ছটফটে, সদাই ব্যস্ত মানুষ। কী ব্যাপার? শরীর খারাপ? না ভাবছেন কিছু?

দীপক ভয়ে ভয়ে বলে, আসতে পারি?

কুঞ্জবাবু মুখ তোলেন। তাঁর ঝাঁটা গোঁফ ঝুলে গেছে। ভাটার মতন চোখের খর চাহনি কেমন ঘোলাটে। কপালে ভাঁজ। তিনি ভারী গলায় চাপা আওয়াজ ছাড়েন, হুম্ এসো। তোমার কথাই ভাবছিলাম। নাঃ, আর উপায় নেই।

কীসের উপায়?

পারলমা না হে বাঁচাতে। কাগজটা এবার তুলেই দিতে হবে। কতদিন আর নিজের পকেট থেকে লোকসান টানব?

কেন? দীপক হকচকিয়ে যায়।

কেন আবার, ফেটে পড়েন কুঞ্জবাবু, জান, গত এক বছরে বঙ্গবার্তার সার্কুলেশন কত কমেছে? কমবে নাই বা কেন? সেই তো থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়। বাজার দর কমেছে না বেড়েছে? স্কুটার-বাস-মোটর অ্যাকসিডেন্ট। ফালতু সভা-সমিতির রিপোর্ট। কালেভদ্রে দু-একটা খুন-জখম। ব্যস, এই ছেপে যাচ্ছি কেবল। নতুন ইন্টারেস্টিং খবর কই? স্টোরি কই? তাই ভাবছিলাম যদি কিছু মাথায় আসে হাল ফেরাতে। তুমিও ভাব না কিছু। দায়টা কি শুধু আমার? সম্পাদক ধমকে ওঠেন।

দীপক তক্ষুনি গম্ভীর বদনে ছাদের দিকে চোখ তোলে। যেন ভাবছে কতই। অবশ্য সে দিব্যি জানে যে, কুঞ্জবাবু অন্যের পরামর্শ নেন না বড়।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ। তারপর সম্পাদক বলেন, হুম্। আইডিয়া একটা এসেছে মাথায়। কী রকম? দীপক উৎফুল্ল। কারণ তার নিজের ভাবনার ভানে ছুটি। এবার শোনার পালা।

বুঝলে হে, প্রতি সংখ্যা বঙ্গবার্তায় একটা করে ইন্টারেস্টিং স্টোরি থাকলে পাঠক টানবে ঠিক। কী বল?

হ্যাঁ। সায় দেয় দীপক।

একটা বিষয় এসেছে মনে। মরণ ভয়। কেমন হবে বলো তো? প্রতি সংখ্যায় একটা করে স্টোরি।

মরণ ভয়! সে আবার কী? দীপক ধাঁধায় পড়ে।

মরণ ভয়। মানে সোজা বাংলায় মৃত্যুভয় পাওয়ার অভিজ্ঞতা। আরে, কত রকমই তো অভিজ্ঞতা হয় লোকের। মৃত্যুভয়ের অভিজ্ঞতাও হয় নিশ্চয় দু-চার জনের। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখে পাঠাক। সংক্ষেপে লিখবে। এক পৃষ্ঠা বরাদ্দ। তবে সুইসাইড মানে আত্মহত্যা করতে গিয়ে ফেল করেছে, সে কেস চলবে না। রোগে ভুগে মরতে বসেছিল, সে কেসও নয়। ঘটনা মানে দুর্ঘটনা হওয়া চাই। ছদ্মনামে লিখতে পারে কেউ। কিন্তু সঠিক নাম-ঠিকানা জানাতে হবে সম্পাদককে। যাতে যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করে তাকে লেখকের হদিশ দিতে পারি। এই কন্ডিশন। যে কেউ লেখা পাঠাতে পারে। তবে লেখা পাঠালেই যে ছাপব তা নয়। পছন্দ হলে তবেই ছাপা হবে।

এতে কাজ হবে? মানে বিক্রি বাড়বে? দীপক সন্দিগ্ধ।

আলবাৎ হবে। দেখে নিও। যার লেখা ছাপা হবে সে তার জ্ঞাতিগুষ্টি বন্ধুবান্ধবদের নিজের পয়সায় কপি কিনে পাঠাবে পড়তে। কাগজে লেখা বেরিয়েছে। তার ওপর এমন দারুণ অভিজ্ঞতা। সবাইকে জানাতে চাইবে না সে? অন্য পাঠকদেরও কৌতূহল হবে। ফলে বিক্রি বাড়বে। হ্যাঁ, এই সিরিজের পুরো ভার তোমায় দিচ্ছি। তুমি লেখা বাছবে। ছাপবে। আমায় এ নিয়ে একদম জ্বালাবে না। তবে মাঝে মাঝে সময় পেলে খবর নেব কেমন চলছে স্টোরিটা। সামনের সংখ্যাতেই এ বিষয়ে একটা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দাও লেখা চেয়ে। দরকারে সম্পাদক লেখাটায় কলম চালাতে পারে তা জানিয়ে দিও। মানে তুমিই চালাবে দরকার বুঝে। বিজ্ঞপ্তিটা ছাপার আগে একবার দেখিয়ে নিও আমায়। ব্যস, আর কথা নয়।

দীপক উঠে পড়ে। দীপকের বয়স পঁচিশ। গ্র্যাজুয়েশনের পর সে অল্পস্বল্প বাবার ব্যবসায় সাহায্য করা ছাড়া বাকি সময় কাটায় 'বঙ্গবার্তা'য় সাংবাদিকতার নেশায়।

সাপ্তাহিক 'বঙ্গবার্তা'র প্রতি সংখ্যায় 'মরণ ভয়' নিয়ে লেখা ছাপা শুরু হয়েছে। কয়েকটা সংখ্যায় বেরিয়েছে ওই লেখা। সম্পাদক কুঞ্জবাবু এ নিয়ে কোনও আগ্রহ দেখান না। স্টোরিটা কেমন লাগছে পাঠকের তা বোঝার চেষ্টা করে দীপক। তবে দেখেছে সে, নতুন সংখ্যা 'বঙ্গবার্তা' বেরোবার পরেই ভবানী প্রেসের কর্মীরা হামলে পড়ে 'মরুণ ভয়' পড়তে। স্টেশনে আর বইয়ের দোকানে যেখানে বিক্রি হয় 'বঙ্গবার্তা' সেখানে আড়চোখে দেখেছে দীপক, কেউ কেউ একমনে 'মরণ ভয়' পড়ছে।

মাস তিনেক বাদে একদিন কুঞ্জবিহারী দীপককে ডেকে বললেন, কী হে, 'মরণ ভয়' স্টোরির লেখা পাচ্ছ কেমন?

পাচ্ছি প্রচুর, জানায় দীপক, রোজই প্রায় দু'একটা লেখা আসে। কেউ ডাকে পাঠায়। কেউ

কেউ নিজে হাতে দিয়ে যায়। সত্যি অবাক ব্যাপার। কে জানত যে এত লোক মরতে মরতে বেঁচে গেছে কত অদ্ভুত ভাবে। মৃত্যুভয় পেয়েছে।

কী ধরনের কেস আসছে শুনি।

বেশির ভাগ কেসই জলে ডুবতে ডুবতে বাঁচা। বাড়িতে বা পোশাকে আগুন লাগা। বিষাক্ত সাপের মুখে পড়া। ডাকাতের হাতে পড়া। এই সব। এছাড়াও আছে, উঁচু গাছ থেকে পড়ে দৈবাৎ রক্ষা পাওয়া। ভূতের কেসও আছে কয়েকটা। সত্যি ভূত দেখে কিংবা ভূতের খপ্পরে পড়েছে ভেবে ভয়ে হার্ট-ফেল করার উপক্রম হয়েছিল। কী নেই? তবে মনে হয় কিছু স্টোরি বানানো।

তা হোক। সে দায়িত্ব বঙ্গবার্তার নয়।

যদি ফলস্ নাম-ঠিকানা দেয় কোনও লেখক?

দিতে পারে। তার জন্যে 'বঙ্গবার্তা' দায়ী নয়।

এতদিনে সম্পাদক আগ্রহ্ দেখাতে দীপক উৎসাহিত হয়ে বলে চলে, জানেন কত রকম লোকের যে লেখা পাচ্ছি এই নিয়ে। মায় বোলপুর থানার বড় দারোগা আর দুজন কনস্টেবলও লেখা পাঠিয়েছে। ডাকাত দলের ছোড়া বোমা আর গুলির হাত থেকে একটুর জন্যে নাকি বেঁচে গেছে তাঁরা । দারোগাবাবুর মাথার ক্যাপ ছুঁয়ে নাকি বেরিয়ে গেছে গুলি। কে জানে সত্যি কিনা?

ভেরি গুড। সম্পাদক খুশি হয়ে বলেন, শোনো, বড় দারোগাটার অবশ্যই ছাপবে। আর সেপাইদের যে কোনও একটা। যেটা বেশি ইন্টারেস্টিং।

দীপক বলে, শুধু পুলিশ কেন একজন পকেটমারের লেখাও পেয়েছি 'মরণ ভয়' নিয়ে। সে লিখেছে যে পেশাধর্ম পালন করতে গিয়ে একবার নাকি ধরা পড়ে পাবলিকের হাতে গণধোলাই খেতে খেতে তার সত্যি সত্যি মনে হয়েছিল যে প্রাণপাখি বুঝি আজ তার দেহখাঁচা ছেড়ে পালাবে। ধরা সে আগেও পড়েছে কয়েকবার। কিন্তু সেবার মনে হয়েছিল মরেই যাবে। নেহাতই গুরুর কৃপায় মার হজম করার ট্রেনিং-এর জোরে আর সময়মতো পুলিশ এসে তাকে গ্রেফতার করায় সে-যাত্রা রক্ষা পায়।

ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং। কুঞ্জবাবু গোঁফ-ভুরু নাচিয়ে বলেন খুশি মুখে।

দীপক বলে, 'মরণ ভয়' নিয়ে বেশি লোকেই লিখেছে তাদের ছোটবেলার অভিজ্ঞতা।

হতেই পারে, সম্পাদক জানান, ওটাই ডানপিটেমির বয়স। অতশত না ভেবে ঝুঁকি নেবার বয়স। ওই বয়সেই লোকে বিপদে পড়ে বেশি। পরে তো সাবধানী হয়ে যায়। অবশ্য দুর্ঘটনা ঘটার বয়স নেই। আচ্ছা মেয়েদের লেখা কিছু পেয়েছ?

পেয়েছি কয়েকটা। সবই প্রায় রান্নাঘরে অ্যাকসিডেন্ট কেস। জ্বলন্ত স্টোভ ফাটার পর একটুর জন্যে বেঁচেছে কেউ। কারও কাপড়ে আগুন ধরে গেছে রান্না করতে করতে। মরতে মরতে বেঁচে গেছে। শুধু একটা কেস ভারি মজার।

কী রকম?

একটি অল্পবয়সি বউ খোলা বারান্দায় বসে বড় বড় পাকা ল্যাংড়া আম কাটছিল। হঠাৎ কোত্থেকে এক গোদা হনুমান লাফিয়ে এসে সামনে হাজির এবং আমের দিকে হাত বাড়ায়।

বউটি বাধা দিতে যেতেই তাকে টেনে এক চড় মারে হনুটা। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে বউটি অজ্ঞান। হুঁশ ফিরতেই বউটির নাকি মনে হয়েছিল—আমি আর বেঁচে নেই। মরে স্বর্গে এসেছি।

বাঃ! চলবে। ছাপাও। মত দেন কুঞ্জবিহারী।

এমনি কথাবার্তা চলছে সম্পাদক ও দীপকের, দরজা একটু ফাঁক হয়। প্রেসের বৃদ্ধ কম্পোজিটার দুলালবাবু মুন্ডু বাড়ালেন ভিতরে।

কী চাই? স্বভাবসিদ্ধ হেঁড়ে গলায় প্রশ্ন করেন কুঞ্জবাবু।

আজ্ঞে একটা লেখা। দুলালবাবু কামরায় ঢোকেন। তিনি ছোটখাটো রোগা চেহারার মানুষ। স্বভাব অতি নিরীহ।

কী লেখা?

দুলালবাবু আমতা আমতা করেন, আজ্ঞে ওই 'মরণ ভয়' নিয়ে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা। ভাবলুম লিখে ফেলি। এনেছি লেখাটা।

অ্যাঁ, আপনারও তেমন অভিজ্ঞতা হয়েছে? বলে দীপক।

দুলালবাবু পকেট থেকে কয়েক পৃষ্ঠা লেখা কাগজ বের করেন।

আগে শুনি ব্যাপারটা কী? খুব সংক্ষেপে বলুন। খাড়া হয়ে বসে হুকুম করেন সম্পাদক।

বেজায় নার্ভাস দুলালবাবু মিনমিনে কাঁপা কণ্ঠে মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে বলে যান, ছোটবেলার কথা, স্যার। ক্লাস সেভেনে পড়ি। হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষায় অঙ্কে একটু কম পেয়ে গেলাম। এই একশোয় আট। বিকেলে বাড়ি ফিরে মার্কশিটটা মায়ের হাতে গুঁজে দিয়ে বাড়ির বাইরে মনের দুঃখে ঘুরলাম খানিক। তাপ্পর খিদে লাগতে সন্ধের মুখে বাড়ির দরজায় এসেই শুনি আপিস-ফেরতা বাবার হুংকার—অঙ্কে ফাঁকি মারা বের কচ্চি। ফিরুক বাড়ি। চাবকে পিঠের ছাল তুলে নেব।

ব্যস। আমি এক ছুট। কাছেই একটা মস্ত জাম গাছে কিছু না ভেবেই সোজা উঠে পড়লুম। লুকোলুম পাতার আড়ালে। দূরে বাবার হাঁকডাক কানে এল কিছুক্ষণ। তারপর বাড়ি চুপচাপ। ভাবলুম, এবার নামি। অন্ধকার হয়ে গেছে। চারপাশ নিঝুম। ভয় করছে বেশ। খিদেও বেড়েছে। বাড়িতে ফিরতে তখনও সাহস হচ্ছে না। ভাবলুম, পাশের গাঁয়ে ছোটপিসির বাড়িতে পালিয়ে যাই। বাবার রাগটা কমলে তবে ফিরব কাল-পরশু। পিসিও বুঝিয়ে-শুঝিয়ে বাবাকে খানিক ঠান্ডা করতে পারবে। না হয় খাব দু-চার ঘা চড়চাপড়। কিন্তু গাছ থেকে নামতে গিয়ে আর পারি না। অত লম্বা খাড়া গুঁড়ি বেয়ে কী করে যে উঠলুম উঁচু ডালে, কে জানে? উঃ, সারা গা তখন জ্বলছে কাঠ-পিঁপড়ের কামড়ে। ভূতের ভয়ও করছে। তবু চেঁচিয়ে ডাকতে সাহস পাই না। তখনও যদি বাবার রাগ না কমে? এক এক সময়ে মনে হচ্ছিল, আজ আর নিস্তার নেই। হয় গাছ থেকে পড়ে মরব, নয়তো বাবার হাতে। রাত বাড়লে দেখি বাবা, কাকা আর দাদা লণ্ঠন, টর্চ নিয়ে বেরিয়েছে আমায় খুঁজতে। আমার নাম ধরে ডাকছে। ধরা গলায় সাড়া দিলুম গাছের ওপর থেকে। কাকা বলল, ভয় নেই। নেমে আয়। আমি বললুম, পারছি না যে নামতে। বড্ড ভয় করছে। তখন কাকা, দাদা মই এনে ধরে ধরে আমাকে নামায় গাছ থেকে। বাবা আমায় কান ধরে নিয়ে গেল বটে বাড়িতে। কিন্তু একটা হালকা গাঁট্টার বেশি শাস্তি পেতে হয়নি তখন। তবে পরদিন থেকে বিকেলে মাস্টারের কাছে অঙ্ক কষতে হত এক ঘণ্টা ডেইলি। উঃ, সত্যি স্যার, মরণ ভয় পেয়েছিলুম সেদিন।

অ্যানুয়ালে অঙ্কে পাশ করেছিলেন? কুঞ্জবাবুর প্রশ্ন।

আজ্ঞে হ্যাঁ। ফর্টিফোর। সগর্বে জানালেন দুলালবাবু।

চলবে। রেখে যান লেখাটা। নির্দেশ সম্পাদকের।

খুশিতে গদগদ দুলালবাবু লেখাটা টেবিলে রেখে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন কুঠুরি থেকে।

বেদম হাসি চাপতে দীপক খকখক কাশে। আর গোঁফ-ভুরু নাচিয়ে কুঞ্জবিহারী হাসেন মিটিমিটি।

শিগগিরই আর একজন বিচিত্র 'মরণ ভয়' লেখকের সাক্ষাৎ মেলে।

এক সকালে দীপক সম্পাদকের সঙ্গে বসে কাজ করছে। পিয়ন হারু এসে জানাল যে, এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান সম্পাদকের সঙ্গে।

কী জন্যে? কুঞ্জবাবু বিরক্ত।

কী একটা লেখা দিতে চান। জানায় হারু।

কী নাম?

এই যে। একখানা চিরকুট এগিয়ে দেয় হারু।

কুঞ্জবিহারী জোরে জোরে পড়েন—শ্রীবৃকোদর কর। অদ্ভুত নাম তো! বেশ, পাঠিয়ে দাও তাকে।

একটু বাদেই 'নমস্কার' বলে দরজা ঠেলে কুণ্ঠিত হেসে একজন মাঝবয়সি ভদ্রলোক প্রবেশ করেন সম্পাদকের দপ্তরে। দশাসই চেহারা ভদ্রলোকের। ছোট ধামার মতো ভুঁড়িটি। পরনে ধুতি ও শার্ট। কাঁধে একটা চটের ব্যাগ।

কী লেখা? সময় নষ্ট করেন না সম্পাদক।

আজ্ঞে ওই 'মরণ ভয়' নিয়ে একটা অভিজ্ঞতা। জবাব দেন বৃকোদর।

কার অভিজ্ঞতা?

আজ্ঞে আমার নিজের।

বসুন। শুনি ঘটনাটা কী? বলুন খুব সংক্ষেপে।

দীপক বোঝে যে, সম্পাদক দীপকের সময় বাঁচাতে চাইছেন। মুখে শুনে পছন্দ না হলে, এখুনি বাতিল করবেন এঁর লেখাটা।

বৃকোদরবাবু লাজুক ভাবে বলতে শুরু করেন—আজ্ঞে বেশি পারি বলে বোলপুরে আমার একটু নামডাক ছিল। তা যৌবনে পারতামও বেশ খেতে। মোটামুটি ভাত ডাল তরকারি খাওয়ার পর এক-দেড় সের মাংস আর ষাট-সত্তরটা রসগোল্লা উড়িয়ে দিতাম হেসে-খেলে। পাড়া-বেপাড়ায় বরযাত্রী দলে আমায় সেধে সেধে নিয়ে যেত। মানে কনেপক্ষকে আমার খাওয়া দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতলবে। আর বলতে পারেন, খানিক তাদের বিপাকে ফেলতে। তা বয়স বাড়তে আর খাই না অত। সাহস হয় না। বছর দুই আগে কী যে মতিভ্রম হল। একজনের সঙ্গে চটে গিয়ে বাজি ধরে বসলাম, রাতে যথারীতি ভাত ডাল ভাজার পর পঞ্চাশটা রসগোল্লা খাব। তা চল্লিশটা অবধি খাওয়ার পর বুঝলাম আর টানতে পারছি না। অভ্যেস নেই। বয়সও বেড়েছে। কিন্তু প্রেস্টিজ বাঁচাতে চালিয়ে গেলাম। তারপর এক একটা করে রসগোল্লা মুখে ঠুসি আর মনে হয় দম বন্ধ হয়ে যাবে। বুক ধড়ফড় করছে। গলা দিয়ে নামে না আর। খেলুম বটে পুরো পঞ্চাশ। কিন্তু তখন আমার যাই যাই অবস্থা। ডাক্তারের ওষুধ

গিলে কোনওরকমে টিকে গেলাম। চব্বিশ ঘণ্টা আর কিছু মুখে তুলিনি। সত্যি বলছি, সেদিন মনে হয়েছিল আর বুঝি বাঁচার আশা নেই। উঃ কী যে কষ্ট! মরণ ভয় বলতে পারেন।

কুঞ্জবিহারী গম্ভীর চালে বললেন, হুম্। চলবে। রেখে যান। মানে হবে ছাপা।

ভোজনবীর বৃকোদরবাবু একগাল হেসে ব্যাগ থেকে লেখাটা বের করে টেবিলে রেখে নমস্কার করে বিদায় নিলেন।

বৃকোদরের ধুপধাপ পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই হাসিতে ফেটে পড়ে দীপক। আরও দু'মাস কেটে গেছে।

রাত দশটা নাগাদ অন্য পাড়া থেকে আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরছে দীপক। শর্টকাট করতে একটা নির্জন সরু পথ দিয়ে চলেছে। চেনা পথ। প্রায়ই আসে-যায়। তাই রাতেও অসুবিধা হয় না হাঁটতে। দু'পাশে প্রচুর গাছপালাসুদ্ধু পুরোনো বাড়িগুলো তখন নিঝুম অন্ধকার। হঠাৎ আঁধার ফুঁড়ে কয়েকজন মানুষ তার পথরোধ করে দাঁড়াল। থমকে দীপক পিছনে তাকায়। পিছনেও কয়েকজন লোক। ছিনতাইবাজদের হাতে পড়লাম নাকি? ভাবে দীপক। সামনের একজন এগিয়ে আসে কাছে। কড়া গলায় বলে, আপনি তো বঙ্গবার্তার রিপোর্টার দীপক রায়?

হ্যাঁ। জানায় দীপক।

কেষ্টার লেখাটা তো ছেপেছেন, আমার লেখাটা এখনও ছাপা হয়নি কেন? রীতিমতো ধমকে ওঠে আগন্তুক।

কে কেষ্টা? কী লেখা? দীপক থৈ পায় না।

কেষ্টা মানে কৃষ্ণধন গড়াই। সিটি ক্লাবের সেক্রেটারি। 'মরণ ভয়' নিয়ে লেখায় কী হপ্তায় যা বেরুচ্ছে বঙ্গবার্তায়।

দীপক বলে, হুঁ, মনে পড়েছে। ভরা গঙ্গায় নৌকাডুবির পর সাঁতরে ভেসে বহুদূরে গিয়ে পাড়ে উঠে প্রাণ বাঁচানোর অভিজ্ঞতা। জমাটি লেখা। দারুণ অভিজ্ঞতা।

গুল। স্রেফ গুল। কেষ্টা দুশো হাত ঘোষ পুকুর সাঁতরে পেরোতে পারে না। সে সাঁতরেছে ভরা গঙ্গায়? বিলকুল বানানো গপ্পো ভয়ে ও বড় নদীতে নৌকোয় অবধি চাপে না।

সে আমরা কী করব? আপনি গিয়ে ওকে চ্যালেঞ্জ করুন। জানায় দীপক।

করলে কি স্বীকার করবে? জানাশোনা কাউকে সাক্ষী মেনেছে কি? দশ বছর আগে বিদেশ-বিভুঁইয়ে ঘটেছে বলে চালিয়ে দিল। কম শয়তান! যাহোক, ওর ওই লেখা বেরুবার পর সিটি ক্লাবের যা ডাঁট বেড়েছে। এখন আমার লেখাটা না ছাপলে বিবেক সংঘের প্রেস্টিজ থাকে না। ক্লাবের ছেলেরাই তাগাদা দিয়ে লেখাল আমাকে। কবে ছাপছেন আমারটা?

আপনার নাম? অন্ধকারে খানিক আন্দাজ করলেও দীপক নিশ্চিত হতে চায়।

শ্রীভোলানাথ দাস। বিবেক সংঘের সেক্রেটারি। দু-দু'বার। লোকে আমায় ভোলা দাস বলেই চেনে বেশি।

দীপক ঠিকই ধরেছে। এ ব্যক্তি ভোলা দাস। বয়স বছর তিরিশ। ইট-বালি সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করে। মারকুটে মাস্তান বলে বেশ দুর্নাম আছে।

নিজের ঘাড় থেকে ঝামেলা ঝেড়ে ফেলতে দীপক বলে, দেখুন, এ ব্যাপারে বঙ্গবার্তার সম্পাদক যা করবেন, তাই হবে। ছাপা না ছাপা তাঁর মর্জি। বিজ্ঞপ্তিতে তো লেখাই ছিল, সম্পাদক মনোনীত করলে তবেই ছাপা হবে 'মরণ ভয়'।

সে ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আপনার সম্পাদক কথা দিয়েছেন, লেখাটা ছাপা হবে।

মানে?

মানে আর কী? কাল সন্ধ্যায় আপনার সম্পাদককে পাকড়েছিলাম। জানতে চাই—আমার লেখাটা ছাপা হয়নি কেন? গোড়ায় একটু বেগড়বাই করছিল বটে, তবে খানিক ঝাড় দিতেই সম্পাদক মশায় রাজি হয়ে গেল তাড়াতাড়ি আমার লেখাটা ছাপতে।

আচ্ছা লোক বটে কুঞ্জবাবু! দীপক রাগ চেপে বলে, তবে আর আমায় বলছেন কেন?

বলছি। কারণ সম্পাদক বললেন, এই মরণ ভয়ের ব্যাপারে আপনিই সব। কী কী লেখা এসেছে? কোনটা ছাপা হবে? সব ভার আপনার। উনি খোঁজ রাখেন না কিছু। যাক্‌গে আপনার সম্পাদক যখন প্রমিস করেছেন, আমার লেখাটা ছেপে দিন চটপট। সিটি ক্লাব আমাদের ডাউন দেবে। ওদের সেক্রেটারি কাগজে গপ্পো ছেপে বুক বাজাবে। আর বিবেক সংঘ বসে বসে আঙুল চুষবে, তা হয় না।

কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে দীপক বলল, আপনার লেখাটার নাম কী?

ভূতের খপ্পরে। ভুতুড়ে বাড়িতে রাত কাটানোর ডেন্‌জারেস এক্সপিরিয়েন্স।

দীপকের আবছা মনে পড়ে লেখাটা। বলে, দেখুন ভোলাবাবু; আপনার লেখাটা বড্ড বড়। ভাষাটাও এলোমেলো। তাই ছাপতে পারিনি।

যা খুশি কাটছাঁট মেরামত করে নিন। আমার নামটা থাকলেই হবে। আরে মোশাই, সেই ইস্কুলে থাকতে দু-তিনটে পদ্য লিখেছিলুম। তাপ্পর কি আর সাহিত্য করার সময় পেয়েছি? কী ভেবেছেন, কেষ্টা ওটা নিজে লিখেছে? ঘোড়ার ডিম। নির্ঘাৎ কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে। এক পাতা শুদ্ধ বাংলায় চিঠি লিখতে ওর কলম ভেঙে যায়। ওর সঙ্গে এক ইস্কুলে পাঁচ বছর পড়েছি এক ক্লাসে। একসঙ্গে ক্লাস কেটেছি, ফেল মেরেছি, ফুটবল খেলেছি, আড্ডা দিয়েছি। ওর এলেম জানি না আমি? তখন আমার চেলাগিরি করত। বাপ মরে যেতে গম ভাঙার ব্যবসা হাতে পেয়ে এখন পয়সার ফুটানি হয়েছে। মোটা টাকা ডোনেশন দিয়ে সিটির সেক্রেটারি বনে গেছে।

দেখি কী করতে পারি? দীপক সহজে নত হয় না।

ভোলা দাস গলা চড়ায়, দেখিটেখি নয়। চটপট ছাপতে হবে। বিবেক সংঘের সাপোর্টাররা বেজায় তেতে আছে। ওই দেখুন শুনছে সব। আমারটা না ছাপালে বা বেশি দেরি করে ছাপালে ওরা কিন্তু অ্যাকশন নিয়ে ফেলবে। তখন বাঁচা-মরা আপনার লাক। আচ্ছা, গুডনাইট।

হতভম্ব দীপককে দাঁড় করিয়ে রেখে পলকে অন্ধকারে উধাও হয় ভোলা দাস এবং তার দলবল।

পরদিন বঙ্গবার্তার অফিসে কুঞ্জবাবুর কাছে রাগে ফেটে পড়ে দীপক—ভোলা দাসকে আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছেন কেন?

কী করেছে ভোলা? বসো বসো। বলেন সম্পাদক।

দীপক বিস্তারিত ভাবে জানায় গতকাল রাতের ঘটনা ভোলার ব্যাপারে।

সব শুনে কুঞ্জবাবু বলেন, হুঁ, দুটো ক্লাবে বড্ড রেষারেষি। ক্রিকেট, ফুটবল, বন্যাত্রাণ দুর্গাপুজো সব ব্যাপারেই। আবার ভোলা-কেষ্টর ব্যক্তিগত খেয়োখেয়ি। যাক্‌গে, তুমি বাপু

ভোলার লেখাটা ঠিকঠাক করে ছাপিয়ে দাও তাড়াতাড়ি।

দীপক উত্তেজিত স্বরে বলে, আপনি ওদের কথা দিতে গেলেন কেন? ভয়ে?

আরে না না। বলেন কুঞ্জবাবু, একটু হকচকিয়ে গিছলাম বটে প্রথমে। ছেলেগুলো যা মাথা গরম গুন্ডা প্রকৃতির। তারপরেই একটা আইডিয়া খেলে গেল। স্রেফ বিজনেস ট্যাকটিকস। ব্যবসার কৌশল।

আইডিয়া? কী রকম? দীপক তাজ্জব।

ভাবলাম ভোলার লেখাটা না ছাপালে বিবেক সংঘের সাপোর্টাররা বঙ্গবার্তা বয়কট করবে। কাগজের বিক্রি মার খাবে। আর যদি ছাপি, বিবেক-এর সাপোর্টার সবাই কিনবে বঙ্গবার্তা। বিক্রি বাড়বে। তাই তোমার কাছে পাঠালাম।

বুদ্ধি বটে! সম্পাদকের যুক্তি শুনে দীপক থ। নিজের ভয় পাওয়াটা কেমন কায়দায় চাপা দিলেন।

ফাইল থেকে ভোলা দাসের লেখাটা বের করে সম্পাদকের সামনে টেবিলে ফেলে দিয়ে দীপক বলল, পড়ে দেখুন। কী জঘন্য ভাষা! বানানের মা-বাপ নেই। বিরাট লেখা।

তুমি নিজের মতো লিখে নাও। পারমিশন তো দিয়েছেন।

আর মনে হচ্ছে এই ঘটনাটা টোকা। পড়েছি কোথাও।

তাতে আটকাবে না, কুঞ্জবাবু নির্বিকার, আমি দেখেছি, অনেক ভূতের গল্পে ভীষণ মিল।

লেখাটা টেনে নিয়ে দীপক গজগজ করে, বেশ। যা পারি ঠিকঠাক করে এটা দেব ছেপে পরের পরের সংখ্যায়। তবে এই শেষ। এত ঝুটঝামেলা বাজে খাটুনি আমার পোষাবে না। এর পর থেকে 'মরণ ভয়' স্টোরির দায়িত্ব হয় আপনি নিজে নিন, নয়তো আর কাউকে দিন।

সম্পাদক দরাজ গলায় বললেন, ব্যস ব্যস, আর দরকার নেই। ভোলার লেখাটা ছেপেই 'মরণ ভয়' সিরিজ শেষ করে দেব। আমার উদ্দেশ্য সফল। জান হে, এই ক'মাসে 'বঙ্গবার্তা'র বিক্রি কত বেড়েছে। বাৎসরিক গ্রাহকও বেড়েছে। আমার লোকসান উসুল হয়ে গেছে। ভোলার লেখাটা ছেপে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দাও—অনিবার্য কারণবশত 'মরণ ভয়' ছাপা আপাতত বন্ধ রাখা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে ফের শুরু করার ইচ্ছা রইল।

দীপক চলে যেতে উঠে দাঁড়িয়ে কুঞ্জবাবু মিচকে হেসে বললেন, তোমার স্টোরিটা দিয়ে 'মরণ ভয়' শেষ করলে কিন্তু দারুণ হত।

আমার স্টোরি? দীপক হতভম্ব।

হুঁ। এই যে ভোলা দাসের দলের হাতে পড়ে ভয় পেয়েছিলে। বলতে পার তা মরণ ভয়ের কাছাকাছি। এই ঘটনাটা। ওদের আসল নামগুলো দিও না। বদলে দাও।

দীপক ঠান্ডা গলায় বলে, তা লিখতে পারি তবে আপনার ভয় পাওয়ার কাহিনিও কিন্তু ঢোকাব। আর ওরা ঠিক বুঝে ফেলবে কাদের নিয়ে লেখা। তখন দুটো ক্লাবই হামলা করতে পারে বঙ্গবার্তা অফিসে।

অমনি সম্পাদক কুঞ্জবিহারীর হাসি মিলিয়ে যায়। বিরস কণ্ঠে বলেন, দরকার নেই তোমার লেখা। ভোলারটাই শেষ।

[২০০৮, শুকতারা শারদীয়া]

অ্যাডভেঞ্চার, রহস্য ও অলৌকিক অমনিবাসের বিপুল জনপ্রিয়তার পর অজেয় রায়ের সমস্ত হাসির এবং রম্য গল্প উপন্যাসকে এবার এক মলাটে নিয়ে আসা হল।

9 789389 890037